خطبات الإسلام

খুতবাতুল ইসলাম

জুমআর খুতবা ও সমকালীন প্রসঙ্গ

ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর

পি-এইচ. ডি. (রিয়াদ), এম. এ. (রিয়াদ), এম,এম, (ঢাকা)
সহযোগী অধ্যাপক, আল-হাদীস বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ঝিনাইদহ, বাংলাদেশ

خطبات الإسلام

খুতবাতুল ইসলাম

জুমুআর খুতবা ও সমকালীন প্রসঙ্গ

ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর
পি-এইচ. ডি. (রিয়াদ), এম. এ. (রিয়াদ), এম.এম. (ঢাকা)
সহযোগী অধ্যাপক, আল-হাদীস বিভাগ,
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স
ঝিনাইদহ, বাংলাদেশ

خطبات الإسلام

(خطب الجمع والعيدين من الكتاب والسنة)

تأليف: دكتور خوندكار أبو نصر محمد عبد الله جهانغير
دكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض
وأستاذ مشارك بالجامعة الإسلامية، كوشتيا، بنغلاديش.

খুতবাতুল ইসলাম

ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর

প্রকাশক
উসামা খোন্দকার
আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স
জামান সুপার মার্কেট (৩য় তলা)
বি. বি. রোড. ঝিনাইদহ-৭৩০০
ফোন ও ফ্যাক্স: ০৪৫১-৬৩৫৭৮; মোবাইল: ০১৭১১১৫২৯৫৪, ০১৯২২১৩৭৯২১

প্রাপ্তিস্থান:
১. দারুশ শরীয়াহ খানকায়ে ফুরফুরা, পাকশী, ঈশ্বরদী, পাবনা, মোবাইল: ০১৭১৭১৫৩৯২৩।
২. ইশায়াতে ইসলাম কুতুবখানা, ২/২ দারুস সালাম, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬, মোবাইল: ০১১৯৯০৮৩৬৫২
৩. আল-ফারুক একাডেমী, ধোপাঘাটা-গোবিন্দপুর, ঝিনাইদহ-৭৩০০, মোবাইল: ০১৯২০৪৫৯৩১০

প্রকাশ কাল : যুলহাজ্জ ১৪২৯ হিজরী
অগ্রহায়ন, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ,
ডিসেম্বর ২০০৮ ঈসায়ী

প্রচ্ছদ পরিচিতি ঃ মসজিদে নববীর মিম্বার

হাদিয়া: ৩৬০ (তিনশত ষাট) টাকা মাত্র

Khutbatul Islam (**Sermons of Islam:** A Collection of contemporary Kutba for Juma and Eid Prayer) by Dr. Khandaker Abdullah Jahangir. Published by As-Sunnah Publications, Jaman Super Market, B. B. Road, Jhenidah-7300. December 2008. Price TK 360.00 only.

সূচীপত্র

ক. ভূমিকা /৭-১২
খ. সুন্নাতের আলোকে খুতবা ও মাতৃভাষা /১৩-২৮
গ. খুতবাতুল হাজাত /২৯-৩০
ঘ. জুমুআর খুতবাসমূহ /৩০-৪৩৮
১. মুহার্‌রাম মাস / ৩১-৬২
(১) প্রথম খুতবা: হিজরী নববর্ষ ও আশুরা /৩১
(২) দ্বিতীয় খুতবা: আরকানুল ঈমান ও তাওহীদ /৩৯
(৩) তৃতীয় খুতবা: ঈমান বির-রিসালাত /৪৭
(৪) চতুর্থ খুতবা: রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মর্যাদা ও ভালবাসা /৫৫
২. সফর মাস /৬৩-৯৪
(৫) প্রথম খুতবা: রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আনুগত্য ও অনুকরণ /৬৩
(৬) দ্বিতীয় খুতবা: ফিরিশতা, কিতাব ও রাসূলগণের ঈমান /৭১
(৭) তৃতীয় খুতবা: আখিরাত ও তাকদীরের ঈমান /৭৯
(৮) চতুর্থ খুতবা: রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অসুস্থতা ও ওফাত /৮৭
৩. রবিউল আউয়াল মাস /৯৫-১২৬
(৯) প্রথম খুতবা: মীলাদুন্নবী ﷺ /৯৫
(১০) দ্বিতীয় খুতবা: কুফর ও তাকফীর /১০৩
(১১) তৃতীয় খুতবা: শিরকের পরিচয় ও কারণ /১১১
(১২) চতুর্থ খুতবা: শিরকের প্রকারভেদ /১১৯
৪. রবিউস সানী মাস /১২৭-১৫৮
(১৩) প্রথম খুতবা: ইলম, শিক্ষা ও স্বাক্ষরতা /১২৭
(১৪) দ্বিতীয় খুতবা: পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা /১৩৫
(১৫) তৃতীয় খুতবা: সালাতের গুরুত্ব ও ফযীলত /১৪৩
(১৬) চতুর্থ খুতবা: সালাতের আহকাম ও ভুলভ্রান্তি /১৫১
৫. জুমাদাল উলা মাস /১৫৯-১৯০
(১৭) প্রথম খুতবা: আযান, ইকামত ও মসজিদ /১৫৯
(১৮) দ্বিতীয় খুতবা: জুমুআর দিন ও জুমুআর সালাত /১৬৭
(১৯) তৃতীয় খুতবা: মৃত্যু, জানাযা ও দু'আ /১৭৫
(২০) চতুর্থ খুতবা: পোশাক ও পর্দা /১৮৩
৬. জুমাদাস সানিয়া মাস /১৯১-২২২
(২১) প্রথম খুতবা: হালাল ও হারাম উপার্জন /১৯১
(২২) দ্বিতীয় খুতবা: বান্দার হক্ক ও মানবাধিকার /১৯৯
(২৩) তৃতীয় খুতবা: পিতামাতার অধিকার /২০৭
(২৪) চতুর্থ খুতবা: সন্তানের অধিকার /২১৫

৭. রজব মাস /২২৩-২৫৪

(২৫) প্রথম খুতবা: ইসলামে নারীর অধিকার /২২৩

(২৬) দ্বিতীয় খুতবা: উপার্জন, শ্রম ও শ্রমিকের অধিকার /২৩১

(২৭) তৃতীয় খুতবা: বিবাহ ও পরিবার /২৩৯

(২৮) চতুর্থ খুতবা: ইসরা ও মিরাজ /২৪৭

৮. শাবান মাস /২৫৫-২৮৬

(২৯) প্রথম খুতবা: স্বামী-স্ত্রীর দায়িত্ব ও অধিকার /২৫৫

(৩০) দ্বিতীয় খুতবা: নিসফ শা'বান বা শবে বরাত /২৬৩

(৩১) তৃতীয় খুতবা: ইসলামের স্বাস্থ্যনীতি ও অসুস্থের প্রতি দায়িত্ব /২৭১

(৩২) চতুর্থ খুতবা: সিয়াম, রামাদান ও কুরআন /২৭৯

৯. রামাদান মাস /২৮৭-৩১৮

(৩৩) প্রথম খুতবা: আহকামে সিয়াম ও কিয়াম /২৮৭

(৩৪) দ্বিতীয় খুতবা: যাকাত /২৯৫

(৩৫) তৃতীয় খুতবা: শবে কদর, ইতিকাফ ও ফিতরা /৩০৩

(৩৬) চতুর্থ খুতবা: জুমুআতুল বিদা ও ঈদুল ফিতর /৩১১

১০. শাওয়াল মাস /৩১৯-৩৫০

(৩৭) প্রথম খুতবা: হজ্জ /৩১৯

(৩৮) দ্বিতীয় খুতবা: আল্লাহর পথে দাওয়াত /৩২৭

(৩৯) তৃতীয় খুতবা: জিহাদ ও সন্ত্রাস /৩৩৫

(৪০) চতুর্থ খুতবা: স্বাধীনতা ও বিজয় /৩৪৩

১১. যুলকাদ মাস /৩৫১-৩৮২

(৪১) প্রথম খুতবা: মাতৃভাষা /৩৫১

(৪২) দ্বিতীয় খুতবা: ভালবাসা দিবস, অশ্লীলতা ও এইডস /৩৫৯

(৪৩) তৃতীয় খুতবা: পানাহার, মাদকতা ও ধুমপান /৩৬৭

(৪৪) চতুর্থ খুতবা: যুলহাজ্জের তের দিন ও আল্লাহর যিক্র /৩৭৫

১২. যুলহাজ্জ মাস /৩৮৩-৪১৪

(৪৫) প্রথম খুতবা: ঈদুল আযহা ও কুরবানী /৩৮৩

(৪৬) দ্বিতীয় খুতবা: সৃষ্টির সেবা ও সুন্দর আচরণ /৩৯১

(৪৭) তৃতীয় খুতবা: দু'আ ও মুনাজাত /৩৯৯

(৪৮) চতুর্থ খুতবা: সুন্নাত, জামা'আত ও ফিরকা /৪০৭

তিনটি ৫ম খুতবা /৪১৫-৪৩৮

(৪৯) কবীরা গোনাহ ও দীনদারদের প্রিয় গোনাহ /৪১৫

(৫০) সালাম, মুসাফাহা, কোলাকুলি ও অনুমতি /৪২৩

(৫১) পহেলা এপ্রিল ও পহেলা বৈশাখ /৪৩১

ঙ. দুই ঈদের খুতবা /৪৩৯-৪৫৪

(৫৩) ঈদুল ফিতরের খুতবা /৪৩৯
(৫৪) ঈদুল আযহার খুতবা /৪৪৭

চ. বিবাহের খুতবা /৪৫৫-৪৫৬

ছ. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসসমূহ /৪৫৭-৪৭২

১. জানুয়ারী মাস/ ৪৫৭
১৯ জানুয়ারী: জাতীয় শিক্ষক দিবস /৪৫৭
২. ফেব্রুয়ারী মাস /৪৫৭
১৪ ফেব্রুয়ারী: সাধু ভ্যালেন্টাইন দিবস বা বিশ্ব ভালবাসা দিবস /৪৫৭
২১ ফেব্রুয়ারী: শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস /৪৫৭
৩. মার্চ মাস /৪৫৭-৪৫৯
৮ মার্চ বিশ্ব নারী দিবস /৪৫৭
মার্চ মাসের ২য় বৃহস্পতিবার: বিশ্ব কিডনি দিবস /৪৫৭
২২ মার্চ বিশ্ব পানি দিবস /৪৫৮
২৬ মার্চ: স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস /৪৫৮
৩১ মার্চ: জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস /৪৫৯
৪. এপ্রিল মাস /৪৫৯-৪৬০
২ এপ্রিল: বিশ্ব অটিযম দিবস /৪৫৯
৭ এপ্রিল: বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস /৪৬০
৫. মে মাস /৪৬০-৪৬২
১ মে: মে দিবস বা বিশ্ব শ্রমিক দিবস /৪৬০
মে মাসের দ্বিতীয় রবিবার: বিশ্ব মা দিবস /৪৬০
১৫ মে: আন্তর্জাতিক পরিবার দিবস /৪৬০
২৮ মে: নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস /৪৬০
৩১ মে: বিশ্ব তামাক মুক্ত দিবস /৪৬২
৬. জুন মাস /৪৬২-৪৬৩
৫ জুন: বিশ্ব পরিবেশ দিবস /৪৬২
জুন মাসের তৃতীয় রবিবার: বিশ্ব বাবা দিবস /৪৬৩
২৬ জুন: বিশ্ব মাদকমুক্ত দিবস /৪৬৩
৭. জুলাই মাস /৪৬৩
জুলাই মাসের ১ম শনিবার: আন্তর্জাতিক সমবায় দিবস /৪৬৩
৮. আগস্ট মাস /৪৬৪
১ আগস্ট: বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ দিবস /৪৬৪
৯. সেপ্টেম্বর মাস /৪৬৪
৮ সেপ্টেম্বর: বিশ্ব স্বাক্ষরতা দিবস /৪৬৪
২৩ সেপ্টেম্বর: বিশ্ব কন্যা শিশু দিবস /৪৬৪
২৯ সেপ্টেম্বর: বিশ্ব শিশু অধিকার দিবস /৪৬৪

১০. অক্টোবর মাস /৪৬৫-৪৬৭

১ অক্টোবর: আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস /৪৬৫

১২ অক্টোবর: বিশ্ব আর্থ্রাইটি দিবস /৪৬৫

১৫ অক্টোবর:বিশ্ব সাদা ছড়ি নিরাপত্তা দিবস /৪৬৫

১৬ অক্টোবর: বিশ্ব খাদ্য দিবস /৪৬৬

৩১ অক্টোবর: বিশ্ব মিতব্যয়িতা দিবস /৪৬৭

১১. নভেম্বর মাস /৪৬৭-৪৬৯

১ নভেম্বর: জাতীয় যুব দিবস /৪৬৭

২১ নভেম্বর: সশস্ত্র বাহিনী দিবস /৪৬৮

২৫ নভেম্বর: আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন বিলোপ দিবস /৪৬৮

১২. ডিসেম্বর মাস /৪৬৯-৪৭১

১ ডিসেম্বর: বিশ্ব এইডস দিবস /৪৬৯

৩ ডিসেম্বর বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস /৪৬৯

৯ ডিসেম্বর বেগম রোকেয় দিবস /৪৭০

১০ ডিসেম্বর: বিশ্ব মানবাধিকার দিবস /৪৭১

১৪ ডিসেম্বর: শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস /৪৭১

১৬ ডিসেম্বর: বিজয় দিবস /৪৭১

জাতীয় বৃক্ষরোপন পক্ষ /৪৭১

জ. সকল জুমুআর দ্বিতীয় খুতবা/৪৭৩-৪৭৪

ঝ. গ্রন্থপঞ্জী /৪৭৫-৪৮০

ভূমিকা

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

মহান আল্লাহ ইসলামের মাধ্যমে মানবজাতিকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা প্রদান করেছেন। ইসলামের ন্যূনতম অনুসরণ একজন মানুষকে শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক অসুস্থতা ও ভারসাম্যহীনতা থেকে রক্ষা করে। মানব দেহের মধ্যে যেমন মহান স্রষ্টা একটি বৈজ্ঞানিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা রেখে দিয়েছেন, তেমনি স্বভাবধর্ম ইসলামের মধ্যে একটি প্রাকৃতিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা রয়েছে।

আমরা জানি যে, প্রতিনিয়ত আমরা আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাস, পানাহার ইত্যাদির মাধ্যমে লক্ষ কোটি জীবানু গ্রহণ করছি, কিন্তু আমরা সর্বদা এ সকল রোগে আক্রান্ত হচ্ছি না। কারণ দেহের মধ্যে যে স্বয়ংক্রিয় প্রতিরোধ ব্যবস্থা রয়েছে তা এ সকল আক্রমনকারীকে ধ্বংস বা দুর্বল করে দিচ্ছে। অনুরূপভাবে বিভিন্ন দুর্ঘটনায় আমাদেরকে স্বয়ংক্রিয় প্রতিরোধ দিচ্ছে, যা আমাদেরকে অনেক ক্ষতি থেকে রক্ষা করে। মানুষের দায়িত্ব হলো দেহের প্রতিরোধ ব্যবস্থা রক্ষা করা ও শক্তিশালী করা। আর এজন্য প্রয়োজন হলো প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসরণ করা ও প্রকৃতি বিরুদ্ধ কর্ম থেকে বিরত থাকা।

একইভাবে ইসলামের ধর্মীয় ব্যবস্থার মধ্যে মহান আল্লাহ মানুষের দৈহিক, মানসিক, পারিবারিক ও সামাজিক সকল বক্রতা, অসুস্থতা বা ভারসাম্যহীনতার বিরুদ্ধে স্বয়ংক্রিয় প্রতিরোধ ব্যবস্থা রেখেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রদর্শিত পদ্ধতিতে ইসলামের বিধিবিধান ন্যূনতম পালন করতে পারলেই একজন মুসলিম এ সকল বক্রতা, জটিলতা বা অসুস্থতা থেকে বহুলাংশে রক্ষা পান। এগুলির বিস্তারিত আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। শুধু এ ব্যবস্থার মধ্যে সালাতুল জুমুআ ও খুতবার অবস্থান আমরা পর্যালোচনা করব।

মানুষ সামাজিক প্রাণী। মানুষের মধ্যে নিজের প্রাকৃতিক, জৈবিক, দৈহিক, মানসিক ইত্যাদি স্বার্থ রক্ষা করার শক্তিশালী প্রবণতা রয়েছে। এগুলি আমাদের মধ্যে অন্যান্য মানবেতর প্রাণী বা পশুর মতই বিদ্যমান। তাই এগুলিকে "পাশবিক" বলা হয়। পাশাপাশি আশপাশের অন্যান্য মানুষের স্বার্থে নিজের এ সকল স্বার্থ বিসর্জন দেওয়ার শক্তিশালী প্রবণতা ও মানসিকতাও তার মধ্যে বিদ্যমান। দ্বিতীয় প্রকারের এ প্রবণতাই মানুষকে "পশু" থেকে পৃথক করে। এজন্য এগুলিকে "মানবিক মূল্যবোধ" বলে আখ্যায়িত করা হয়। "পাশবিক" প্রবণতাগুলি সামাজিক বা মানবিক প্রবণতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হলে মানুষ ব্যক্তিস্বার্থে হিংস্র, দুর্নীতিবাজ ও ধ্বংসাত্মক হয়ে পড়ে। উভয় প্রকারের প্রবণতার ভারসাম্যপূর্ণ সংরক্ষণ ও উন্নয়নই মানুষকে পরিপূর্ণ মানবতা দান করে। এজন্য ন্যূনতম তিনটি বিষয়ের প্রয়োজন:

প্রথমত: সমাজের মানুষদের পারস্পরিক দেখাসাক্ষাত-কথাবার্তা ও সুসম্পর্ক (interaction)। এর অবিদ্যমানতা মানুষকে ক্রমান্বয়ে স্বার্থপর করে তোলে। সমাজের মানুষদের থেকে লজ্জা বোধ থাকে না এবং সমাজের কাছে নিন্দিত বা নন্দিত হওয়ার অনুভূতি চলে যায়। সমাজের মানুষদের প্রতি দরদ ও ভালবাসা তৈরি হয় না। তাদের সাথে দূরের শত্রু বা অপরিচিত লোকের মত আচরণ করা সম্ভব হয়।

দ্বিতীয়ত: ভয় ও লোভ। প্রতিশোধের স্পৃহা, সম্পদ, ক্ষমতা বা শক্তির লোভ ও অনুরূপ পশুপ্রবৃত্তি মানুষকে দ্রুত ও নগদ স্বার্থ হাসিলের জন্য দুর্নীতি ও হিংস্রতায় উদ্বুদ্ধ করে। ভয় ও লোভই তার "নগদ" প্রাপ্তির স্পৃহা নিয়ন্ত্রণ করে। এ ভয় ও লোভের তিনটি পর্যায়: (১) নিজের বিবেকের কাছে নন্দিত বা নিন্দিত হওয়ার ভয় ও লোভ। (২) সমাজ, রাষ্ট্র বা আইনের চোখে নিন্দিত, নন্দিত, তিরস্কৃত, পুরস্কৃত বা

শাস্তিপ্রাপ্ত হওয়ার আশা ও ভয়। (৩) আল্লাহর কাছে নিন্দিত, নন্দিত, তিরস্কৃত বা পুরস্কৃত হওয়ার আশা ও ভয়। এর মধ্যে তৃতীয় পর্যায়টিই প্রকৃতভাবে দুর্নীতি ও হিংস্রতা বন্ধ করতে পারে। কারণ, প্রত্যেকের পক্ষেই নিজের বিবেককে প্রবোধ দেওয়া সম্ভব। সকলেই জানে সমাজ, রাষ্ট্র বা আইনকে ফাঁকি দেওয়া যায় এবং এগুলির কাছে কোনো সঠিক মূল্যায়ন আশা করা যায় না। এজন্য প্রকৃত সততা তৈরি করতে আল্লাহর ভয় ও লোভ সৃষ্টির কোনো বিকল্প নেই। আল্লাহ সকল কষ্টের পরিপূর্ণ পুরস্কার দিবেন এবং সকল অন্যায়ের শাস্তি দিবেন বলে অবচেতনের বিশ্বাস লাভের পর মানুষ যে কর্মটি আল্লাহর কাছে অন্যায় বলে নিশ্চিত জানতে পারে সে কাজ করতে পারে না এবং আল্লাহর দৃষ্টিতে ভাল বলে প্রমাণিত কাজটি কোনো জাগতিক পুরস্কার বা প্রশংসার আগ্রহ ছাড়াই, বরং সকল প্রতিকুলতা সত্ত্বেও করার চেষ্টা করে।

তৃতীয়ত: জ্ঞান। মানুষকে সৎ সত্যিকার মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে তার মধ্যে সঠিক জ্ঞানের বিকাশ ঘটানো অতীব প্রয়োজন। অজ্ঞানতা ও বিকৃত জ্ঞান মানুষকে বিপথগামী করে। পক্ষান্তরে, ব্যক্তি নিজের, পরিবারের, সমাজের, রাষ্টের ও বিশ্বের প্রতি নিজের দায়িত্ব, করণীয়, পুরস্কার, শাস্তি ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারলে তার এ জ্ঞান তার বিবেককে পরিচালিত করতে পারে।

এ তিনটি বিষয় সৃষ্টি, সংরক্ষণ ও শক্তিশালী করার জন্য সালাতুল জুমুআ ও খুতবা একটি অতুলনীয় ব্যবস্থা। অন্য কোনো ধর্মে এরূপ বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা আছে বলে আমরা জানতে পারি নি। ইহূদী ও খৃস্টধর্মে শনি ও রবিবার সাপ্তাহিক দিবস হিসাবে থাকলেও গীর্জা বা সিনাগগে গমন এবং সালাতে অংশ গ্রহণ ও খুতবা শ্রবণের বাধ্যবাধকতা নেই। ফলে এ সকল সমাজের অধিকাংশ মানুষই কখনোই বিশেষ অনুষ্ঠান ছাড়া চার্চে গমন করেন না। পক্ষান্তরে ইসলামে শুক্রবারে সালাতুল জুমুআয় শরীক হওয়া এবং খুতবা শ্রবণ করাকে বাধ্যতামূলক ফরয ইবাদত বলে গণ্য করা হয়েছে। যে কোনো সমাজে যে কোনো পর্যায়ের শিক্ষিত, অশিক্ষিত ভাল বা মন্দ মুসলিম পাঁচ ওয়াক্ত সালাত জামাতে আদায়ের পাশাপাশি শুক্রবারের সালাতুল জুমুআ ও খুতবাতুল জুমুআ সুন্নাত নিয়মে আদায় করতে পারলে এ তিনটি বিষয়ই অর্জন করতে পারেন। তার মধ্যে সমাজের সকলের সাথে পরিচয় ও হৃদ্যতা তৈরি হয়। তার মধ্যে আল্লাহর শাস্তির ভয় ও তাঁর পুরস্কারের আশা শক্তিশালী হয়। তিনি নিজ, পরিবার ও সমাজের প্রতি তার দায়িত্ব সম্পর্কে তিনি সীমিত হলেও কিছু প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করতে পারেন। এতে অত্যন্ত সহজ ও প্রাকৃতিকভাবে তার মধ্যে স্বার্থপরতা, দুনীতি, প্রতিশোধস্পৃহা ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণের শক্তি তৈরি হয়।

বর্তমানে সমাজ থেকে দুর্নীতি, সহিংসতা, এইডস ইত্যাদি প্রতিরোধ বা দূর করতে বহুমুখি প্রচেষ্টা চলছে। কিন্তু দুঃখজনকভাবে আমরা "স্বাভাবিক" ও সহজ পথ বাদ দিয়ে "অস্বাভাবিক" ও বক্রপথে আমাদের প্রচেষ্টা সফল করার চেষ্টা করছি। আমরা দুর্নীতি, এ্যসিড, যৌতুক, এইডস ইত্যাদির বিরুদ্ধে এবং মানবাধিকার বা অনুরূপ বিষয়াদির পক্ষে কোটি কোটি টাকা খরচ করে প্রচারপত্র, বিলবোর্ড, সেমিনার, টেলিভিশন প্রোগ্রাম ইত্যাদি করছি। অথচ এগুলির ফলাফল প্রায় শূন্য।

"দুর্নীতিকে না বলুন" অথবা "এসিডের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড" ইত্যাদি প্রচারের ফল প্রায় শূন্য হওয়ার বহুবিধ কারণ রয়েছে। প্রথমত, শুধুমাত্র নীতিকথার কারণে কোনো মানুষ তার নগদ লাভ, লোভ বা প্রতিহিংসার প্রবল স্পৃহা ত্যাগ করতে পারে না। দ্বিতীয়ত, আমাদের দেশে আইনের বাস্তবায়ন ও প্রয়োগের দুর্বলতা সর্বজন বিদিত। কাজেই কেউই আইনকে বিশেষভাবে ভয় পায় না। তৃতীয়ত, আইনের প্রয়োগগত জটিলতার কারণে আইনের প্রয়োগ থাকলেও তা থেকে রক্ষা পাওয়ার বিভিন্ন পথ রয়েছে, যে কারণে মানুষের পশুপ্রবৃত্তি তাকে প্রবোধ দেয় যে, আইনকে এড়ানো যাবে। সর্বোপরি, কোনো নীতিকথাকে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে যিনি তা বলছেন তার গ্রহণযোগ্যতা মানুষের কাছে খুবই বড়

বিষয়। এ সকল "বিলিয়ন ডলার" প্রোপাগান্ডায় যারা কথা বলেন তাদের প্রতি সাধারণ মানুষের ভক্তি তো নেই-ই, বরং অভক্তি ব্যাপক। কাজেই এদের কথা তাদের মনে প্রভাব ফেলে না।

পক্ষান্তরে এরূপ "বিলিয়ন ডলার প্রোপগান্ডার" বদলে, যদি আমরা আমাদের সমাজের মানুষগুলিকে মসজিদমুখী করতাম এবং মসজিদের মিম্বারগুলিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতাম তাহলে অতি সহজেই আমরা আশাতীত ফল লাভ করতাম। দুর্নীতি ও সহিংসতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত আমাদের এ সমাজের সহিংসতা ও দুর্নীতিমুক্ত বা অপেক্ষাকৃত কম দুনীতিবাজ ও কম সহিংস মানুষগুলিকে নিয়ে সামান্য একটু গবেষণা করুন। দেখবেন যে, এদের সততার মূল কারণ হলো তাদের মধ্যে সৃষ্ট ধর্মীয় মূল্যবোধ, যা পারিবারিক, প্রাতিষ্ঠানিক বা পারিপার্শিক কারণে তাদের মধ্যে বিকাশ লাভ করেছে।

আমাদের সমাজের অধিকাংশ মসজিদ অবহেলিত। যোগ্য ও উচ্চ শিক্ষিত ইমামের চেয়ে সস্তা ও অনুগত ইমাম খোঁজা হয়। তদুপরি মসজিদ কমিটির খগড়ের নিচে বসে ইমাম সাহেব দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বলতে সাহস পান না। তারপরও সমাজের দুর্নীতি, যৌতুক, এসিড, সহিংসতা, মাদকতা, অশ্লীলতা ইত্যাদি রোধে এ সকল অবহেলিত মসজিদগুলির সস্তা ইমামগণ "বিলিয়ন ডলার" প্রকল্পের চেয়ে অনেক বেশি অবদান রাখছেন। মসজিদের মিম্বারগুলিকে সমাজগঠনে সঠিকভাবে ব্যবহারের জন্য আমাদের প্রয়োজন হলো: (১) পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ও জুমুআর সালাতের গুরুত্ব সম্পর্কে জাতীয় সকল প্রচার মাধ্যমে প্রচার চালানো এবং সকল মুসলিমকে মসজিদমুখি করার চেষ্টা করা। (২) মসজিদের জন্য যোগ্য আলিম ইমাম নিয়োগের ব্যবস্থা করা। (৩) ইমাগণের চাকুরী স্থানীয় মসজিদ কমিটির উপর ষোলআনা ন্যস্ত না করে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণে আনা। (৪) ইমামগণের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। (৫) কুরআন ও সুন্নাহের আলোকে জীবন ও সমাজমুখী খুতবা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি তাদের সামনে উপস্থাপন করা।

এ সর্বশেষ লক্ষ্য অর্জনের একটি ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা এ গ্রন্থটি। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের সুন্নাত থেকে আমরা দেখি যে, সাধারণ ধর্মীয় নির্দেশনার পাশাপাশি প্রতি সপ্তাহে নতুন নতুন ধর্মীয় বা সামাজিক বিষয়ে কুরআন ও হাদীসের আলোকে সমবেত মুসল্লীদেরকে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হলো জুমুআর খুতবার অন্যতম সুন্নাত। আমাদের দেশের অধিকাংশ ইমামই কুরআন হাদীস ঘেটে সমাজের বিভিন্ন বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দিতে সক্ষম হন না। তাদেরকে সহযোগিতা করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

আমার সকল লেখালেখি ও কর্মে প্রেরণার অন্যতম উৎস ছিলেন আমার শ্বশুর ফুরফুরার পীর আবুল আনসার মুহাম্মাদ আব্দুল কাহ্হার সিদ্দীকী, রাহিমাহুল্লাহ। ২০০৪ সালের দিকে তিনি জুমুআর খুতবার বিষয়ে একটি বই লেখার জন্য আমাকে অনুরোধ করেন। সে সময়ে কিছু বিষয় লিখেছিলাম। পরে অন্যান্য ব্যস্ততার কারণে খুতবার বিষয়টি একেবারেই থেমে গিয়েছিল। নানা ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি মাঝে মাঝে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতেন। ভাবছিলাম নতুন করে শুরু করব। হঠাৎ করেই ২০০৬-এর ডিসেম্বরে তিনি তাঁর মহান রব্বের ডাকে সাড়া দিয়ে আমাদের ছেড়ে চলে যান। তাঁর পুত্র ফুরফুরার বর্তমান পীর আবু বকর আব্দুল হাই মিশকাত সিদ্দীকী, হাফিযাহুল্লাহ- আমাকে মাঝেমাঝে এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করেছেন। কিন্তু নানা ব্যস্ততায় শুরু করতে পারছিলাম না। এর মধ্যে ঝিনাইদহে জেলা প্রশাসক হিসেবে আসলেন মুহতারাম আবু সাইদ ফকির সাহেব। সমাজ বিনির্মাণে মিম্বারের ভূমিকা সম্পর্কে তিনি সচেতন। তিনি সমাজমুখী ও জীবনধর্মী কিছু খুতবার একটি সংকলন তৈরি বারংবার অনুরোধ করেন এবং সকল প্রকারের সহযোগিতার আশ্বাস দেন। তার তাকিদে অনুপ্রাণিত হয়ে খুতবার বইয়ের কাজ নতুন করে শুরু করলাম।

আমরা বলেছি যে, খুতবার মাধ্যমে মুসল্লীদেরকে প্রতিনিয়ত প্রয়োজনীয় বিষয়ে দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়। এজন্য প্রতিনিয়ত খুতবার বিষয়ে কিছু পরিবর্তন ও সংযোজন হওয়াই স্বাভাবিক। সংকলিত

খুতবার মধ্যে এ সুযোগ থাকে না। তা সত্ত্বেও খুতবা সংকলনের গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ:

প্রথমত, বাংলাদেশের অধিকাংশ ইমাম বা খতীবের জন্য নিজের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় বিষয় মুক্তাদীদেরকে বলা সম্ভব হয় না। সংকলিত খুতবা থাকলে তার জন্য অন্তত কিছু দিক নির্দেশনা প্রদান সম্ভব হয়। অনেক ইমাম বা খতীব সংকলিত খুতবা অবিকল পাঠ করবেন। আর অন্যান্য অনেকে এগুলির সাথে প্রয়োজনীয় সংযোজন-বিয়োজন করে মুসল্লীদেরকে নতুন তথ্য দিতে পারবেন।

দ্বিতীয়ত, বছর ঘুরে আসতে আসতে প্রায় সকলেই পুরাতন বিষয়গুলি অনেকটাই ভুলে যান। কাজেই পরের বৎসর পুনরায় আলোচনা করলে প্রায় সকলেই নতুনভাবে সচেতন হন এবং উপকৃত হন।

তৃতীয়ত, অধিকাংশ সময় জানা বিষয়ও আলোচনা করলে সে বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পায় এবং কর্মস্পৃহা বাড়ে। এজন্যই মহান আল্লাহ কুরআন কারীমে একই বিষয় বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে আলোচনা করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ কে নির্দেশ দিয়েছেন "স্মরণ করিয়ে দিতে"। অর্থাৎ জানা বিষয়ও স্মরণ করিয়ে দেওয়ার মধ্যে অনেক কল্যাণ রয়েছে।

উপরের বিষয়গুলির দিকে লক্ষ্য রেখেই এ খুতবা সংকলন তৈরি করা হয়েছে। প্রতিটি খুতবা বাংলা ও আরবী। বাংলায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বাংলা খুতবার মধ্যে কুরআনের আয়াত ও হাদীসের আরবী লেখা হয়েছে। মুহতারাম খতীব সাহেব ইচ্ছা করলে বাংলা আলোচনার মধ্যে আরবী বাক্যগুলি পাঠ করে এরপর অর্থ বলবেন। অথবা তিনি বাংলা আলোচনার সময় শুধু বাংলা অর্থ পাঠ করবেন। ইমাম সাহেব যদি আগেই একটু বিষয়টি পড়ে নেন তবে তার জন্য মুসল্লীদের অবস্থা অনুসারে প্রয়োজনীয় সংযোজন বিয়োজন করে উপস্থাপনা সম্ভব হবে। এছাড়া বিষয়বস্তুর সাথে খতীবের আন্তরিক সংযুক্তি মুসল্লীদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে। এজন্য প্রতি জুমুআর আগে আলোচ্য বিষয়টি ভালভাবে পড়ে নেওয়া প্রয়োজন।

যেহেতু মুসল্লীগণ আরবী বুঝেন না, সেজন্য আরবী খুতবা খুবই সংক্ষেপ করা হয়েছে। ফিকহের নির্দেশনা অনুসারে খুতবার ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত ও মুস্তাহাব বিষয়গুলি যেন আরবী খুতবার মধ্যে পরিপূর্ণরূপে আদায় হয় সে বিষয়টি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। প্রতিটি বাংলা খুতবা ৬ পৃষ্ঠা, যা হুবহু পাঠ করতে সর্বোচ্চ ত্রিশ মিনিট লাগতে পারে। প্রতিটি আরবী খুতবা আরবী বড় অক্ষরে প্রায় দু পৃষ্ঠা। এটি পাঠ করতে সর্বোচ্চ ৫ মিনিট সময় লাগবে। আরবী দ্বিতীয় খুতবাটিও একই আকারের এবং এটি পাঠ করতেও একই সময় লাগবে। সময়ের কমতি বা অন্য প্রয়োজনে খতীব সাহেব একটি খুতবার বিষয়বস্তু ভাগ করে দু জুমুআয় আলোচনা করতে পারবেন।

৩৫৪ দিনের চান্দ্র বৎসরের ৫০ বা ৫১টি শুক্রবার থাকে। সাধারনত প্রতি মাসে চারটি জুমুআ। আর যে কোনো দুই বা তিন মাসে ৫টি জুমুআ হবে। এজন্য প্রথমে প্রতি মাসে ৪টি জুমুআ ধরে ১২ মাসে ৪৮টি খুতবা সংকলন করা হয়েছে। এরপর অতিরিক্ত তিনটি খুতবা সংকলন করা হয়েছে। খতীব সাহেব পঞ্চম জুমুআয় এ বিষয়গুলি আলোচনা করবেন। তবে প্রয়োজনে আগে পিছে করে নেবেন। যেমন শাবানের ৪র্থ জুমুআয় রামাদান ও সিয়াম সম্পর্কে, রামাদানের ৪র্থ খুতবায় বিদায়ী জুমুআ সম্পর্কে এবং যুলকাদ মাসের ৪র্থ খুতবায় যুলহাজ্জ মাসের প্রথম তের দিন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। যদি শাবান, রামাদান বা যুলকাদ মাসে ৫টি জুমুআ হয় তাহলে চতুর্থ জুমুআয় অতিরক্তি একটি খুতবা আলোচনা করে ৪র্থ খুতবা হিসেবে সংকলিত বিষয়টি ৫ম জুমুআয় আলোচনা করবেন।

প্রত্যেক খুতবার বাংলা আলোচনার শুরুতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসগুলির বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোকপাতের ব্যবস্থা করা হয়েছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করার অর্থ এ সকল দিবস উদযাপন করা বা এগুলিকে বাৎসরিক ঈদে পরিণত করা নয়। মূলত উদযাপনের জন্য বা

উৎসব হিসেবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসগুলিকে নির্ধারণ করা হয় নি। বিভিন্ন জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গণসচেতনতা তৈরির জন্যই এ সকল দিবসকে নির্ধারণ করা হয়েছে। এ সকল বিষয়ের প্রায় সবই ইসলামের মূল শিক্ষার অংশ। এ সকল বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করা আমাদের ঈমানী দায়িত্ব ও "ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধের" একটি বিশেষ দিক। আর এরূপ গণসচেতনতা তৈরির জন্য মসজিদের মিম্বারের চেয়ে শক্তিশালী কেন্দ্র আর কিছুই নেই। এক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় যে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অধিকাংশ দিবস বিষয়ক বিস্তারিত আলোচনা বিভিন্ন মাসের নিয়মিত খুতবার মধ্যে করা হয়েছে। বাকি কিছু দিবস সম্পর্কে সংক্ষেপ আালোচনা এ গ্রন্থের শেষে পৃথকভাবে সংকলন করা হয়েছে।

আমরা জানি যে, জুমুআর খুতবাগুলি চান্দ্র মাস অনুসারে নির্ধরিত, কিন্তু দিবসগুলি সৌর পঞ্জিকা অনুসারে নির্ধারিত। ফলে খুতবার সাথে দিবগুলিকে নির্ধারিত করে রাখা সম্ভব নয়। এজন্যই পৃথকভাবে এ বিষয়ক তথ্যাদি সংকলন করা হয়েছে। খতীব সাহেবকে একটু কষ্ট করে প্রতি জুমুআর আগে প্রচলিত ইংরেজি তারিখ জেনে নিতে হবে। এরপর এ বইয়ের সূচীপত্র থেকে উক্ত তারিখের আগের বা পরের সপ্তাহের দিবসগুলি বিষয়ক আলোচনা থেকে খুতবার শুরুতে আলোচনা করবেন।

যে কোনো তথ্য গ্রহণের আগে তার নির্ভরযোগ্যতা (authenticity) যাচাই করা মুসলিম উম্মাহর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কুরআন ও হাদীসে বারংবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাচাই না করে কোনো কথাকে গ্রহণ না করতে। জাল বা অনির্ভরযোগ্য কথাকে হাদীস নামে বলার ভয়াবহ শাস্তি সম্পর্কে শতাধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সাহাবীগণ হাদীস নামে কিছু বলা হলে তা যাচাই না করে গ্রহণ করতেন না। পরবর্তী যুগের আলিমগণ সর্বদা সহীহ হাদীসের উপর নির্ভর করার বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এজন্য এ গ্রন্থে উল্লেখিত সকল তথ্যের তথ্যসূত্র প্রদানের চেষ্টা করেছি। বিশেষত হাদীসের ক্ষেত্রে সর্বাত্মক চেষ্টা করেছি কোনো যয়ীফ হাদীস উল্লেখ না করতে। কোনো কারণে কোনো যয়ীফ হাদীস উল্লেখ করলে তার দুর্বলতার বিষয়টি সুস্পষ্টত উল্লেখ করেছি। বইটি লিখতে শুরু করার প্রথম দিকে মনে করেছিলাম যে, শুধু কোন্ গ্রন্থে হাদীসটি রয়েছে তা উল্লেখ করব। পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে সকল তথ্যের তথ্যসূত্র পাদটীকায় উল্লেখ করার চেষ্টা করেছি। সময়ের অভাবে কিছু তথ্যের বিস্তারিত সূত্র উল্লেখ করা হয় নি।

মুসলিম উম্মাহর আলিম ও মুহাদ্দিসগণ গবেষণা ও সনদ বিশ্লেষণ করে ঐকমত্যে পৌঁছেছেন যে, সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের সকল হাদীসই সহীহ। কোনো হাদীসের তথ্যসূত্রে বুখারী বা মুসলিমের উল্লেখ করার অর্থই হলো যে হাদীসটি সহীহ বলে নিশ্চিত হওয়া। অন্য সকল গ্রন্থের হাদীস উল্লেখ করে তথ্যসূত্র প্রদান করার পর সংক্ষেপে লিখেছি: "হাদীসটি সহীহ" অথবা "হাদীসটি হাসান" বা অমুক অমুক মুহাদ্দিস হাদীসটিকে সহীহ বা হাসান বলেছেন। যয়ীফ হাদীসের ক্ষেত্রেও অনুরূপভাবে সংক্ষেপ তথ্যাদি উল্লেখ করেছি। হাদীসের সহীহ, হাসান, যয়ীফ বা বানোয়াট হওয়ার বিষয়ে মতামত প্রকাশের কোনো যোগ্যতা আমার নেই। এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্ভর করেছি পূর্ববর্তী মুহাদ্দিসগণের উপরে। তথ্য সূত্রে উল্লেখিত গ্রন্থগুলির মধ্যেই পাঠক এ বিষয়ক বিস্তারিত তথ্যাদি পাবেন।

তথ্যসূত্রের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, যে বইয়ের কোনো খণ্ড নেই সে বইয়ের ক্ষেত্রে শুধু পৃষ্ঠাসংখ্যা উল্লেখ করেছি। আর যে বইয়ের খণ্ড রয়েছে তার ক্ষেত্রে প্রথমে খণ্ড উল্লেখ করে তারপর অবলিক (oblique) বা বক্রদাগের পরে পৃষ্ঠা উল্লেখ করেছি। ২/২৫ অর্থ দ্বিতীয় খণ্ডের ২৫ পৃষ্ঠা। তথ্যসূত্রের গ্রন্থাবালির বিস্তারিত তথ্যাদি গ্রন্থের শেষে প্রদান করেছি।

বাংলা আলোচনায় কুরআনের আয়াত ও হাদীসগুলি হরকত প্রদান করা হয়েছে। আরবী খুতবা

পুরোপুরি হরকত প্রদান করা হয়েছে। কম্পিউটারে হরকত প্রদানের ক্ষেত্রে কিছু অসুবিধা হয়, যা কারো জন্য অস্পষ্টতা সৃষ্টি করতে পারে। যেমন লাম-আলিফের লামে হরকত প্রদান করলে তা কিছুটা বিকৃত হয়ে যায়। এজন্য লামের পরে আলিফ বা হামযা থাকলে অধিকাংশ সময় লামে হরকত দেওয়া হয় নি। খাড়া আলিফ, খাড়া যের বা উল্টা পেশ না থাকাতে সেগুলি ব্যবহার করা যায় নি। তাশদীদের সাথে যের থাকলে তা তাশদীদের নিচেই বসে। সাকিন বা জযমের জন্য আরবদের বর্তমান রীতি অনুসারে কম্পিউটারে শূন্য (০) চিহ্নটি ব্যবহার করা হয়। মুহতারাম খতীব সাহেব এগুলির দিকে লক্ষ্য রাখবেন।

জুমুআর খুতবার মধ্যে, পূর্বে বা পরে অনারব ভাষায় কোনো অনুবাদ বা ওয়ায করা যাবে কিনা সে বিষয়ে নানাবিধ বিতর্ক ও অস্পষ্টতা রয়েছে। বিষয়টি পরিস্কার না হলে আমাদের এ গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্যই ব্যাহত হবে। তাই এ ভূমিকার পরে পৃথকভাবে বিষয়টি আলোচনা করব।

আমার অযোগ্যতার কারণে অনেক ভুলভ্রান্তি থেকে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "পরস্পরে নসীহতই দ্বীন।" তাই একান্তভাবে আশা করব যে, কোনো পাঠক এ বইয়ে কোনো প্রকার ভাষাগত, তথ্যগত বা মতামতের ভুল দেখতে পেলে বা কোনো পরামর্শ থাকলে যেন অনুগ্রহ পূর্বক তা লেখককে বা প্রকাশককে জানান। আমরা আমাদের অপূর্ণতা সম্পর্কে সচেতন এবং ভুল সংশোধনে আগ্রহী। মহান আল্লাহ আপনাকে উত্তম পুরস্কার দান করবেন।

আগেই বলেছি, এ গ্রন্থ রচনায় আমার প্রেরণার উৎস ছিলেন ফুরফুরার পীর শাইখুল ইসলাম মাওলানা আবুল আনসার মুহাম্মাদ আব্দুল কাহ্হার সিদ্দীকী (রাহ)। আল্লাহ তাঁকে মাগফিরাত, রাহমাত ও আমাদের পক্ষ থেকে সর্বোত্তম প্রতিদান প্রদান করুন। তাঁর পুত্র ফুরফুরার বর্তমান পীর মাওলানা আবু বকর আব্দুল হাই মিশকাত সিদ্দীকী প্রায়ই আমাকে উৎসাহ ও পরামর্শ দিয়েছেন। আল্লাহ তাঁকে উত্তম পুরস্কার দান করুন ও তাঁকে হেফাযত করুন। ঝিনাইদহের সাবেক জেলা প্রশাসক জনাব মো. আবু সাইদ ফকীর এবং বর্তমান জেলা প্রশাসক জনাব এ. কে. এম. রফিকুল ইসলাম সাহেবের আন্ত রিক উৎসাহ ও সহযোগিতা না হলে এ বইটি যথাসময়ে প্রকাশ করা যেত না। মহান আল্লাহ তাঁদেরক সর্বোত্তম পুরস্কার দান করুন, তাঁদেরকে হিফাযত করুন এবং দুনিয়া ও আখিরাতের সামগ্রিক কল্যাণ, বরকত ও সফলতা দান করুন। বইটি লিখতে অন্য অনেকেই আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন ও সহযোগিতা করেছেন। বিশেষত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদের খতীব মুহাতারাম ভাই আ. স. ম. শুআইব আহমদ এবং স্নেহাস্পদ ছাত্র মু. আরিফ বিল্লাহ ও তাঁর বন্ধুরা বইটির প্রুফ দেখে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছে। আল্লাহ তাদেরকে সকলকেই উত্তম পুরস্কার দান করুন।

আমার মত একজন নগণ্য মানুষকে আল্লাহ খুতবা বিষয়ক এ বইটি লেখার তাওফীক দিয়েছেন বলে তাঁর মহান দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এর মধ্যে যা কিছু ভাল ও কল্যাণকর বিষয় রয়েছে তা সবই একমাত্র আল্লাহর রহমত ও তাওফীকের কারণে। আর যা কিছু ভুলভ্রান্তি রয়েছে সবই আমার অযোগ্যতা ও শয়তানের কারণে। আমি আল্লাহর দরবারে সকল ভুল ও অন্যায় থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। তাঁর মহান দরবারে দু'আ করি, তিনি দয়া করে এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করে একে আমার, আমার পিতামাতা, স্ত্রী-সন্তান, আত্মীয়-স্বজন, প্রিয়জন এবং পাঠক-পাঠিকাদের নাজাতের ওসীলা বানিয়ে দিন।

আল্লাহর মহান রাসূলের জন্য এবং তাঁর সাহাবী ও পরিজনদের জন্য সালাত ও সালাম। প্রথমে ও শেষে সর্বদা ও সর্বত্র সকল প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর নিমিত্ত।

আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর

সুন্নাতের আলোকে খুতবা ও মাতৃভাষা

১. পূর্বকথা

আমাদের দেশে অনেক মসজিদে আরবী খুতবার আগে বাংলায় আলোচনা করা হয়। কেউ বা আরবী খুতবার মধ্যেই বাংলায় আলোচনা করেন। কেউ খুতবার আগে পরে কোনোরূপ আলোচনা করেন না। খুতবার মধ্যে, পূর্বে বা পরে অনারব ভাষায় কোনো অনুবাদ বা ওয়ায করা যাবে কিনা এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। এ মতভেদের উদ্দেশ্য মহৎ, তা হলো সুন্নাতে নববীর পরিপূর্ণ অনুসরণ করে খুতবার ইবাদত পালন করা। এজন্য সুন্নাতের পরিচয়, খুতবার বিষয়ে সুন্নাতে নববী এবং সুন্নাতের আলোকে খুতবার আগে, পরে বা মধ্যে মাতৃভাষায় বয়ান বিষয়ে আলোচনা করেতে চাই। আল্লাহর তাওফীক প্রার্থনা করছি।

২. সুন্নাতের পরিচয়ঃ কর্ম ও বর্জনের সুন্নাত

ইসলামে দুটি বিষয় রয়েছে। প্রথমত ইবাদতের জন্য আল্লাহর নির্দেশ, যা আমরা কুরআন বা হাদীস থেকে জানতে পারি। দ্বিতীয়ত আল্লহর নির্দেশটি পালনের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তরীকা, পদ্ধতি, রীতি বা সুন্নাত। সুন্নাতে নববী বা "রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তরীকা"-ই মুসলিমের নাজাতের একমাত্র পথ। আমাদের ঈমানের মূল প্রতিপাদ্য হলো একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করতে হবে এবং সে ইবাদত হবে একমাত্র মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রদর্শিত ও শেখানো পথে। এজন্য মুসলিম উম্মাহ কখনোই কোনো ইবাদত পালনের ক্ষেত্রে সুন্নাতে নববী বা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তরীকা-পদ্ধতির বাইরে কিছু গ্রহণ করতে চান না।

সুন্নাতের আভিধানিক অর্থ ছবি, জীবন পদ্ধতি, কর্মধারা ইত্যাদি। ইসলামী শরীয়তে 'সুন্নাত' অর্থ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কথা, কর্ম, অনুমোদন বা এক কথায় তাঁর সামগ্রিক জীবনাদর্শ। সাধারণভাবে সুন্নাতের দুটি অর্থ প্রচলিত। এক অর্থে সুন্নাত হলো ফরয-ওয়াজিবের পরবর্তী পর্যায়ের ইবাদত। সুন্নাতের দ্বিতীয় অর্থ হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রীতি ও পদ্ধতি। হাদীসে 'সুন্নাত' শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। সুন্নাতের উভয় অর্থের বহুবিধ প্রয়োগ কুরআন, হাদীস, সাহাবী-তাবিয়ীগণের বক্তব্য ও ফিকহের উদ্ধৃতির আলোকে বিস্তারিত আলোচনা করেছি আমার লেখা "এহইয়াউস সুনানঃ সুন্নাতের পুনরুজ্জীবন ও বিদআতের বিসর্জন" নামক গ্রন্থটিতে। এখানে সংক্ষেপে আমরা বলতে পারি যে, কর্ম ও বর্জনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হুবহু অনুকরণই সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যে কর্ম যেভাবে যতটুকু করেছেন সে কর্ম সেভাবে ততটুকু করা এবং তিনি যে কাজ করেন নি-অর্থাৎ বর্জন করেছেন- তা না করাই সুন্নাত।

তিনি যা করেন নি তা খেলাফে সন্নাত বা সুন্নাতের ব্যতিক্রম। এরূপ কর্ম তিন প্রকারের। প্রথম প্রকার কর্ম তিনি যা করেন নি এবং করতে নিষেধ বা আপত্তি করেছেন। দ্বিতীয় প্রকারের কর্ম যা তিনি করতে নিষেধ না করলেও ইচ্ছাকৃতভাবে বর্জন করেছেন। অর্থাৎ যে প্রয়োজনে আমরা কাজটি করতে চাচ্ছি সে প্রয়োজন বা কাজটি করার সুযোগ তাঁর ছিল অথচ তিনি করেন নি। তৃতীয় প্রকারের কর্ম যা তিনি করতে আপত্তি বা নিষেধ করেন নি আবার তা করার সুযোগ বা প্রয়োজন না থাকায় তিনি তা করেন নি। প্রথম প্রকারের কর্ম সর্ববাস্থায় নিষিদ্ধ। দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকারের বর্জিত কর্ম শরীয়তের অন্যান্য দলীলের আলোকে জাগতিক বিষয়ে জায়েয হতে পারে, তবে কখনো ইবাদতের বা দীনের অংশ হতে পারে না।

সুন্নাতের ব্যতিক্রম কর্ম সর্বাবস্থায় বর্জনীয়। তবে তৃতীয় প্রকারের কর্ম একান্ত প্রয়োজনে ইবাদতের উপকরণ বা জাগতিক বিষয়ে গ্রহণ করা যেতে পারে। খুতবা বিষয়ক সকল মতভেদ মূল "বর্জনের সুন্নাত" কেন্দ্রিক। রাসূলুল্লাহ ﷺ খুতবার আগে, মধ্যে বা পরে অনারব ভাষায় ব্যাখ্যা, অনুবাদ বা আলোচনা-ওয়ায বর্জন করেছেন। এ বর্জন প্রথম, দ্বিতীয় না তৃতীয় পর্যায়ের এবং ভাষা খুতবার ইবাদাতের অংশ না ইবাদত পালনের উপকরণ তা নির্ধারণের মধ্যেই এ মতভেদের সমাধান নিহিত।

৩. ইবাদত বনাম মুআমালাত ও উপকরণ

ইসলাম সকল যুগের সকল জাতির সকল মানুষের বিশ্বজনীন ও সর্বজনীন ধর্ম। হাদীসে রাসূল ﷺ ও সাহাবীগণের জীবনপদ্ধতি থেকে আমরা দেখতে পাই যে, এতে দু'টি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছেঃ একদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে যেন যুগ, সমাজ, সামাজিক রুচি ও আচার আচরণের পরিবর্তনের ফলে ইসলামের ধর্মীয়

রূপে পরিবর্তন না আসে। হাজার হাজার বছর পরের ইসলাম ও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগের ইসলামের ধর্মীয় কর্মকাণ্ড ও আচার অনুষ্ঠান এক ও অভিন্ন থাকবে। তেমনি হাজার মাইলের ব্যবধানেও এর রূপের কোনো পরিবর্তন হবে না। এ জন্য ধর্মীয় বিষয়ে, ইবাদত বন্দেগির সকল পদ্ধতি, প্রকরণ ও রূপে সকল যুগের সকল মুসলমানকে 'সর্বোত্তম আদর্শ' রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগের মতোই থাকতে হবে। নিজেদের অভিরুচি, ভালোলাগা বা মন্দলাগার আলোকে ধর্মের মধ্যে নতুন কোনো রীতি প্রচলন করতে পারবে না।

অপর দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে যে, যুগ, সমাজ, আচার-আচরণ ইত্যাদির পরিবর্তনের কারণে ইসলামের আহকাম পালনে যেন কারো কোন অসুবিধা না হয়। সকল যুগের সকল দেশের মানুষেরা যেন সহজেই জীবন ধর্ম ইসলাম পালন করতে পারে। এজন্য ইবাদতের উপকরণ, স্থান, জাগতিক প্রয়োজন, সামাজিক আচার, শিষ্টাচার ইত্যাদির বিষয়ে বিশেষ প্রশস্ততা প্রদান করেছে। সাধারণ কিছু মূলনীতির মধ্যে থেকে সকল যুগের সকল দেশের মানুষেরা প্রয়োজন অনুসারে বিবর্তন পরিবর্তন পরিবর্ধনের সুযোগ পেয়েছেন। এ জন্য সকল মুসলিমের আকীদা, নামায, রোযা, হজ্ব, তিলাওয়াত, যিক্র, তাসবীহ, জানাযা, দোয়া ইত্যাদি সকল ইবাদত-মূলক কর্ম সকল দিক থেকে প্রথম যুগের মতোই হবে। তবে হজ্বের যানবাহন বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে, মসজিদের গঠন পদ্ধতি আবহাওয়া বা অন্যান্য প্রয়োজনে বিভিন্ন হতে পারে, কুরআন শিক্ষা পদ্ধতি মৌখিক, লিখিত বা ইলেকট্রনিক হতে পারে। এগুলির পদ্ধতির মধ্যে কেউ কোনো বিশেষ সাওয়াব আছে বলে মনে করেন না, সাওয়াব মূল ইবাদত পালনে। তেমনি খাওয়া দাওয়া, আবাস, ভাষা, চাষাবাদ ইত্যাদি ব্যাপারেও বিভিন্নতার ও বিবর্তনের সুযোগ রয়েছে।

খুতবার আগে, পরে বা মধ্যে মাতৃভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে আলিমদের মতভেদের উৎস হলো খুতবার মধ্যে ইবাদত ও উপকরণ নির্ণয় করা। ইবাদত অবশ্যই হুবহু সুন্নাতের অনুকরণে হতে হবে, তবে উপকরণের ক্ষেত্রে একান্ত জরুরী হলে ব্যতিক্রম করা যেতে পারে, যদি ব্যতিক্রম অন্য হাদীসে নিষিদ্ধ না হয়। এ বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে খুতবার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের সুন্নাত জানা প্রয়োজন।

৪. সুন্নাতের আলোকে জুমুআর খুতবা

জুমুআর সালাত ও খুতবার বিষয়ে আল্লাহর নির্দেশ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ

"হে ঈমানদারগণ, যখন জুমু'আর দিনে সালাতের জন্য আহ্বান করা হয়, তখন তোমরা আল্লাহর যিক্র-এর দিকে ধাবিত হও।"[১]

"যিক্র" অর্থ স্মরণ করা বা স্মরণ করানো। এখানে "আল্লাহর যিক্র" বলতে কি বুঝানো হয়েছে সে বিষয়ে কয়েকটি মত রয়েছে। কেউ বলেছেন এখানে যিকর বলতে জুমুআর সালাত বুঝানো হয়েছে, কেউ বলেছেন, যিকর বলতে জুমুআর খুতবা বুঝানো হয়েছে এবং কেউ বলেছেন, সালাত ও খুতবা উভয়কেই বুঝানো হয়েছে। আল্লামা কুরতুবী বলেন: 'আল্লাহর যিক্র অর্থ সালাত। সাঈদ ইবনু জুবাইর ও অন্যান্যরা বলেছেন: আল্লাহর যিক্র অর্থ খুত্বা ও ওয়ায।'[২] ইমাম তাবারী বলেন:

أما الذكر الذي أمر الله تبارك وتعالى بالسعي إليه عباده المؤمنين فإنه موعظة الإمام في خطبته.

...مجاهد ... سعيد بن المسيب ....إلى ذكر الله ... فهي موعظة الإمام

"মহান আল্লাহ যে যিক্রের দিকে ধাবিত হতে নির্দেশ দিয়েছেন তা হলো খুতবার মধ্যে।ইমামের ওয়ায...সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব ও মুজাহিদ বলেন, আল্লাহর যিকর হলো ইমামের ওয়ায।"[৩]

হানাফী মযহাবের অন্যতম ফকীহ ও মুফাসসির আল্লামা আবু বকর জাসসাস (৩৭০ হি) বলেন :

دَلَّ عَلَى أَنَّ هُنَاكَ ذِكْرًا وَاجِبًا يَجِبُ السَّعْيُ إِلَيْهِ وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: ذِكْرِ اللَّهِ: مَوْعِظَةُ الإِمَامِ

'এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, জুমুআর দিনে একটি যিক্র রয়েছে যার জন্য ধাবিত হওয়া

---

[১] সূরা জুমু'আ: ৯ আয়াত।
[২] তাফসীরে কুরতুবী ১৮/১০৭।
[৩] তাবারী, আত-তাফসীর ২৮/১০২।

ওয়াজিব, আর সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব বলেছেন যে, এ যিক্‌র হলো ইমামের ওয়ায।"[১]

প্রসিদ্ধ তাবিয়ী আতা ইবনু আবী রাবাহ রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের খুতবা সম্পর্কে বলেন:

إنما كانت الخطبة تذكيرا

"খুতবা তো ছিল শুধু "তাযকীর" অর্থাৎ যিকর বা স্মরণ করানো বা ওয়ায করা।"[২]

এ দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটিই সঠিক বলে প্রতীয়মান হয়। কারণ প্রথমত, কুরআন, হাদীস ও সাহাবীগণের পরিভাষায় বিশেষ করে ওয়ায-আলোচনাকে "যিক্‌র" বা আল্লাহর যিক্‌র বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সাহাবী-তাবেয়ীগণের যুগে ওয়ায নসীহতের মাজলিসকে যিক্‌রের মাজলিস বলা হতো।[৩]

দ্বিতীয়ত, রাসূলুল্লাহ ﷺ সুস্পষ্টভাবে যিকর বলতে খুতবা বুঝিয়েছেন। তিনি বলেন:

إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَقَفَتْ الْمَلائِكَةُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ يَكْتُبُونَ الأَوَّلَ فَالأَوَّلَ ... فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ طَوَوْا صُحُفَهُمْ وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ. وفي لفظ: فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتْ الْمَلائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ

"জুমুআর দিন হলে ফিরিশতাগণ মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে যান, কে আগে প্রবেশ করে তা একের পর এক লিখতে থাকেন .... আর যখন ইমাম বেরিয়ে আসেন তখন তারা তাদের কাগজগুলি গুটিয়ে ফেলেন এবং মনোযোগ দিয়ে যিক্‌র শুনতে থাকেন।"[৪]

এখানে যিকর বলতে খুতবা ও ওয়ায বুঝানো হয়েছে। জাবির ইবনু সামুরা (রা) বলেন:

كَانَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَتَانِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيُذَكِّرُ النَّاسَ

"রাসূলুল্লাহ ﷺ দুটি খুতবা দিতেন, এতদুভয়ের মাঝে বসতেন, তিনি কুরআন পাঠ করতেন এবং মানুষদেরকে যিক্‌র বা স্মরণ করাতেন অর্থাৎ ওয়ায করতেন।"[৫]

এখানেও "যিকর" করানো বলতে ওয়ায করা বা স্মরণ করানো বুঝানো হয়েছে। অন্যান্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ খুতবাকে ওয়ায বলে আখ্যায়িত করেছেন। এক হাদীসে তিনি বলেন:

مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ... وَلَمْ يَلْغُ عِنْدَ الْمَوْعِظَةِ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهُمَا

"যদি কেউ জুমুআর দিনে গোসল করে ... ওয়াযের সময় কথা না বলে, তবে দুই জুমুআর মধ্যবর্তী সময়ের জন্য পাপের মার্জনা করা হবে।...."[৬]

উপরের আয়াত ও হাদীসগুলির আলোকে একথা সুস্পষ্ট যে, জুমুআর দিনের মূল ফরয দায়িত্ব হলো আযানের সঙ্গে সঙ্গে 'আল্লাহর যিক্‌র"-এর দিকে ধাবিত হওয়া। আর আল্লাহর যিক্‌র বলতে এখানে "তাযকীর" বা ওয়ায আলোচনা ও খুতবা বুঝানো হয়েছে। এখানে ইমাম এবং মুসল্লীবৃন্দ সকলেরই ফরয দায়িত্ব "যিক্‌র"। ইমামের যিকর হলো "তাযকীর" অর্থাৎ যিকর করানো বা ওয়াযের মাধ্যমে আল্লাহর দীন, বিধান, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি সম্পর্কে মুসল্লীদের স্মরণ করানো। আর মুসল্লীদের যিকর হলো "তাযাক্কুর", অর্থাৎ ইমামের বক্তব্য থেকে আল্লাহর দীন, বিধান, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদির কথা স্মরণ করা। আর এ যিকর পরিপূর্ণভাবে পালনের জন্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসল্লীদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন আগে আগে মসজিদের গমন করতে, ইমামের নিকটবর্তী হয়ে বসতে এবং সম্পূর্ণ নীরবে মনোযোগের সাথে ইমামের আলোচনা শ্রবণ করতে। এ বিষয়ক অনেকগুলি হাদীস জুমাদাল উলা মাসের দ্বিতীয় খুতবায় জুমুআর দিন ও জুমআর সালাত প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি।

এ যিক্‌রে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত হৃদয়গ্রাহী ওয়ায পেশ করা। জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা) বলেন:

---

[১] আবু বকর জাসসাস, আহকামুল কুরআন ৩/৪৪৬।
[২] বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা ৩/২১৭।
[৩] দেখুন তাফসীরে তাবারী ৯/১৬৩, তাফসীরে ইবনু কাসীর ২/২৮২।
[৪] বুখারী, আস-সহীহ ১/৩০১, ৩১৪; মুসলিম আস-সহীহ ২/৮৫।
[৫] মুসলিম, আস-সহীহ ২/৫৮৯।
[৬] আবূ দাউদ, আস-সুনান ১/৯৫; ইবনু খুযাইমা, আস-সহীহ ৩/১৫৬; আলবানী, সহীহুত তারগীব ১/১৭৬। হাদীসটি হাসান।

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَعَلا صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ... وَيَقُولُ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ وَيَقْرُنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَيَقُولُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ

"রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন খুতবা দিতেন তখন তাঁর চক্ষুদ্বয় লাল হয়ে যেত, তাঁর কণ্ঠস্বর উঁচু হতো এবং তাঁর ক্রোধ কঠিন হতো। এমনকি মনে হত তিনি যেন আসন্ন শত্রুসেনার আক্রমনের সতর্ককারী। ...তিনি তাঁর মধ্যমা ও তর্জনী একত্রিত করে বলতেন আমি এবং কিয়ামত এরূপ একত্রিত হয়ে প্রেরিত হয়েছি। এবং তিনি বলতেন: সর্বোত্তম কথা আল্লাহর কিতাব এবং সর্বোত্তম রীতি-আদর্শ মুহাম্মাদের রীতি-আদর্শ। আর নব উদ্ভবিত বিষয়গুলিই সর্বনিকৃষ্ট এবং সকল বিদ'আতই বিভ্রান্তি।"[১]

জাবির ইবনু সামুরা (রা)-কে প্রশ্ন করা হয় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খুতবা কেমন ছিল? তিনি বলেন:

كَانَتْ قَصْدًا كَلامًا يَعِظُ بِهِ النَّاسَ وَيَقْرَأُ آيَاتٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى

"তাঁর খুতবা ছিল নাতিদীর্ঘ। কিছু কথা বলে মানুষদের ওয়ায করতেন এবং কুরআনের কিছু আয়াত পাঠ করতেন।"[২]

তাবিয়ী সিমাক ইবনু হারব বলেন, সাহাবী নুমান ইবনু বাশীর (রা) খুতবার মধ্যে বলেন,

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ يَقُولُ أَنْذَرْتُكُمْ النَّارَ أَنْذَرْتُكُمْ النَّارَ أَنْذَرْتُكُمْ النَّارَ حَتَّى لَوْ أَنَّ رَجُلا كَانَ بِالسُّوقِ لَسَمِعَهُ مِنْ مَقَامِي هَذَا قَالَ حَتَّى وَقَعَتْ خَمِيصَةٌ كَانَتْ عَلَى عَاتِقِهِ عِنْدَ رِجْلَيْهِ

"আমি শুনলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ খুতবায় বললেন: আমি তোমাদেরকে জাহান্নাম থেকে সতর্ক করছি! আমি তোমাদেরকে জাহান্নাম থেকে সতর্ক করছি! আমি তোমাদেরকে জাহান্নাম থেকে সতর্ক করছি।" তাঁর কণ্ঠস্বর এত উচ্চ ছিল যে, যদি কোনো ব্যক্তি বাজারে বসে থাকত তাহলেও আমার এখান থেকে বললে শুনতে পেত। এমনকি তাঁর কাঁধের উপর যে চাদরটি ছিল তা তাঁর পায়ের কাছে পড়ে যায়।"[৩]

অন্য হাদীসে আলী (রা) বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُنَا فَيُذَكِّرُنَا بِأَيَّامِ اللَّهِ حَتَّى نَعْرِفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ وَكَأَنَّهُ نَذِيرُ قَوْمٍ

রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে খুতবা দিতেন, তখন তিনি আমাদেরকে আল্লাহর দিবসগুলির যিকর করাতেন, অর্থাৎ ওয়াযের মাধ্যমে আল্লাহর পুরস্কার ও শাস্তির ঘটনাগুলি আমাদের স্মরণ করাতেন। এমনকি তাঁর মুবারক চেহারায় আমরা তা বুঝতে পারতাম। যেন তিনি আসন্ন শত্রু হামলা সম্পর্কে সতর্ক করছেন।"[৪]

উপরের হাদীসগুলি থেকে আমরা জানছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খুতবার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল তা ছিল নাতিদীর্ঘ এবং মূলত কুরআন ভিত্তিক। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সূরা পাঠ করে করে তিনি ওয়ায করতেন বলে আমরা হাদীস শরীফ থেকে জানতে পারি। সূরা কাফ ও আখিরাত বিষয়ক সূরাগুলি তিনি বেশি পাঠ করতেন বলে জানা যায়। মহিলা সাহাবী উম্মু হিশাম (রা) বলেন:

مَا أَخَذْتُ ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ إِلاَّ عَنْ لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقْرَؤُهَا كُلَّ يَوْمِ جُمُعَةٍ عَلَى الْمِنْبَرِ إِذَا خَطَبَ النَّاسَ

"আমি তো সূরা কাফ (কুরআনের ৫০ নং সূরা) শুধু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যবান থেকে শুনে শুনেই মুখস্থ করেছি; কারণ তিনি প্রতি জুমুআয় খুতবা দেওয়ার সময় মিম্বারের উপর এ সূরাটি পাঠ করতেন।"[৫]

---

[১] মুসলিম, আস-সহীহ ২/৫৯২।
[২] আহমদ, আল-মুসনাদ ৫/৯৯; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ১/৪২৩। হাকিম ও যাহাবী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।
[৩] আহমদ, আল-মুসনাদ ৪/২৬৮; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ১/৪২৩; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ২/১৮৮। হাদীসটি সহীহ।
[৪] হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ২/১৮৮। হাদীসটি সহীহ।
[৫] মুসলিম, আস-সহীহ ২/৫৯৫।

উবাই ইবনু কাব (রা) বলেন,

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَبَارَكَ وَهُوَ قَائِمٌ فَذَكَّرَنَا بِأَيَّامِ اللَّهِ

"জুমুআর দিন খুতবায় দাঁড়িয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ সূরা (তাবারাকা) পাঠ করলেন অতঃপর আমাদেরকে আল্লাহর দিবসসমূহের বিষয়ে স্মরণ করালেন বা ওয়ায করলেন।"[১]

পরবর্তীকালে খুলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবীগণ এভাবে প্রতি জুমুআয় কুরআনের আয়াত ও হাদীসের আলোকে বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন বিষয়ে মুসল্লীদেরকে সজাগ ও সতর্ক করতেন।[২]

খুতবার মধ্যে উপস্থিত মুসল্লীদের জন্য সাধারণ ওয়ায ছাড়াও ব্যক্তিগতভাবে কোনো কোনো মুসল্লীকে ডেকে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দেওয়াও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাতের অংশ। জাবির (রা) বলেন:

جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ أَصَلَّيْتَ يَا فُلَانُ قَالَ لَا قَالَ قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ

রাসূলুল্লাহ ﷺ জুমুআর দিনে খুতবা দিচ্ছিলেন, এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করল। তখন তিনি তাকে বলেন, হে অমুক, তুমি কি সালাত আদায় করেছ? লোকটি বলে: না। তিনি বলেন, তাহলে উঠে দু রাকাত সালাত আদায় করে নাও।"[৩] অন্য হাদীসে জাবির (রা) বলেন,

أَبْصَرَ النَّبِيُّ ﷺ ابْنَ مَسْعُودٍ خَارِجاً مِنَ الْمَسْجِدِ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ تَعَالَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ.

রাসূলুল্লাহ ﷺ খুতবা দেওয়ার সময় দেখেন যে, ইবনু মাসঊদ (রা) মসজিদের বাইরে বসে রয়েছেন। তিনি তখন বলেন, হে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ, এগিয়ে আসুন।"[৪]

তাবিয়ী কাইস ইবনু আবূ হাযিম বলেন, তাঁর পিতা আবূ হাযিম বলেন:

أَنَّهُ جَاءَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَامَ فِي الشَّمْسِ فَأَمَرَ بِهِ فَحُوِّلَ إِلَى الظِّلِّ

"রাসূলুল্লাহ ﷺ খুতবা দিচ্ছিলেন এমন সময় তিনি মসজিদে আগমন করেন। তখন তিনি রোদ্রেই দাঁড়িয়ে পড়েন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে নির্দেশ দেন ছায়ায় সরে যাওয়ার জন্য।"[৫]

আব্দুল্লাহ ইবনু বুসর (রা) বলেন,

جَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ وَآنَيْتَ

রাসূলুল্লাহ ﷺ খুতবা দিচ্ছিলেন, এমন সময় একব্যক্তি মানুষের ঘাড়ের উপর দিয়ে আসছিল। তখন তিনি তাকে বলেন: তুমি বসে পড়, তুমি তো দেরি করে এসেছ আবার মানুষকে কষ্ট দিচ্ছ।[৬]

অন্য হাদীসে বুরাইদা (রা) বলেন:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُنَا إِذْ جَاءَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ أَحْمَرَانِ يَمْشِيَانِ وَيَعْثُرَانِ فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمِنْبَرِ فَحَمَلَهُمَا وَوَضَعَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ صَدَقَ اللَّهُ: إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، فَنَظَرْتُ إِلَى هَذَيْنِ الصَّبِيَّيْنِ يَمْشِيَانِ وَيَعْثُرَانِ فَلَمْ أَصْبِرْ حَتَّى قَطَعْتُ حَدِيثِي وَرَفَعْتُهُمَا

"রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমারেদকে খুতবা দিচ্ছিলেন, এমতাবস্থায় হাসান ও হুসাইন (রা) আসলেন। তাদের গায়ে ছিল দুটি লাল জামা। শিশু দুজন টলমল করে হাঁটছিলেন এবং পড়ে যাচ্ছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মিম্বার থেকে নেমে তাদেরকে কোলে নেন এবং তাঁর সামনে বসান। এরপর তিনি বলেন: আল্লাহ সত্য বলেছেন: "তোমাদের সম্পদ ও সন্তান তোমাদের জন্য ফিতনা।" আমি এ দু শিশুর টলমল করে হাটা ও পড়ে যাওয়া দেখে ধৈর্য ধরতে

---

[১] ইবনু মাজাহ, আস-সুনান ১/৩৫২; বূসীরী, মিসবাহুয যুজাজাহ ১/১৩৪। হাদীসটির সনদ সহীহ।
[২] বুখারী, আস-সহীহ ১/৩৬৬; বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা ৩/২১১-২১৫।
[৩] বুখারী, আস-সহীহ ১/৩১৫।
[৪] বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা ৩/২০৬; আবূ দাউদ, আস-সুনান ১/২৮৬; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ১/৪২৩। হাদীসটিকে সহীহ।
[৫] আবূ দাউদ, আস-সুনান ৪/২৫৭; আহমদ, আল-মুসনাদ ৩/৪২৬; বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা ৩/২৩৬। হাদীসটি সহীহ।
[৬] আবূ দাউদ, আস-সুনান ১/২৯২; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ১/৪২৪; আলবানী, সহীহুত তারগীব ১/১৭৫। হাদীসটি সহীহ।

পারলাম না, এজন্য আমি আমার কথা বন্ধ করে এদেরকে তুলে আনলাম।"[১]

এরূপ আরো অনেক হাদীস থেকে আমরা দেখতে পাই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ খুতবা থামিয়ে ব্যক্তিগতভাবে বা সামষ্টিকভাবে মুসল্লীদেরকে অন্য প্রসঙ্গে কিছু বলে আবার খুতবা শুরু করতেন। পরবর্তী সময়ে খুলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবীগণও এরূপ করতেন। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) বলেন:

إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَيْنَمَا هُوَ قَائِمٌ فِي الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَنَادَاهُ عُمَرُ أَيَّةُ سَاعَةٍ هَذِهِ قَالَ إِنِّي شُغِلْتُ فَلَمْ أَنْقَلِبْ إِلَى أَهْلِي حَتَّى سَمِعْتُ التَّأْذِينَ فَلَمْ أَزِدْ أَنْ تَوَضَّأْتُ فَقَالَ وَالْوُضُوءُ أَيْضًا وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ.

একদিন উমার (রা) খুতবা দিচ্ছিলেন। এ সময়ে প্রথম অগ্রবর্তী মুহাজিরদের একজন মসজিদে প্রবেশ করেন। উমার (রা) খুতবা থামিয়ে বলেন, এ কোন্ সময় হলো? (এত দেরি হলো কেন?) আগন্তুক বলেন, কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম, আযান শুনে বাড়ি এসে ওযূ করেই চলে এসেছি। উমার (রা) বলেন: শুধু ওযূ করে? অথচ আপনি জানেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ জুমুআর দিনে গোসল করতে বলেছেন।[২]

এভাবে আমরা দেখছি যে, কুরআন ও সুন্নাতের আলোকে খুতবার মূল তিনটি বিষয় রয়েছে: (১) আযানের পরে দুটি খুতবা, (২) দুটি খুতবার মধ্যে উত্তেজনা ও আবেগ দিয়ে মুসল্লীদের অন্তরে প্রভাব ফেলার মত ও তাদের সংশোধন করার মত যিক্র ও তাযকীর বা ওয়ায আলোচনা এবং (৩) খুতবার ওয়ায-আলোচনা আরবীতে করা; কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীগণ তা আরবীতেই করেছেন।

৫. অনারব মুসলিমদের সমস্যা

আমরা অনারব দেশের মানুষেরা বর্তমানে খুতবার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত হুবহু অনুসরণ করার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি। আমরা আরবী না বুঝার কারণে ইমাম ও মুসল্লী কারোই 'যিকর" সুন্নাত মত আদায় হচ্ছে না। আরবী না জানার ফলে আমরা খুত্‌বা দিই না, বরং পড়ি। অর্থাৎ বই দেখে আবেগহীন সুরে খুত্‌বা পড়ি। অথচ এরূপ পড়া সুন্নাত নয়, বরং আবেগময় আরবী ওয়াযই সুন্নাত। এভাবে ইমাম সাহেবের 'যিকর" অর্থাৎ তাযকীর বা স্মরণ করানোর ও ওয়ায করার সুন্নাত আদায় হচ্ছে না। অপর দিকে আরবী না বুঝার ফলে মুসল্লীগণের যিক্র বা আল্লাহর আযাব, গযব, পুরস্কার ইত্যাদি স্মরণ করে হৃদয় নাড়ানো ও মন ঘোরানোর ইবাদত সুন্নাত মত আদায় হচ্ছে না।

এখন আমরা কী-ভাবে এর সমাধান করতে পারি? যদি আমরা আযানের পরে আরবীতে দুটি খুতবা প্রদান করি এবং এর আগে, পরে বা মধ্যে মাতৃভাষায় কোনো কিছুই না বলি তাহলে "আরবী দু খুতবার" সুন্নাত আদায় হলেও যিকর ও তাযকীরের মূল ইবাদত মোটেও আদায় হলো না। আবার যদি আমরা খুত্‌বার আগে, পরে বা মধ্যে মাতৃভাষায় খুত্‌বার অনুবাদ বা অন্য আলোচনা করি, তাহলেও আমরা সুন্নাত পদ্ধতির বাইরে চলে যাব। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীদের জুমুআর সালাত ও খুতবা আদায়ের পদ্ধতি ও আমাদের পদ্ধতি ভিন্ন হয়ে যাবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মসজিদের পদ্ধতি কি? মুসল্লীগণ আসছেন, প্রত্যেকে নিজ নিজ সুবিধা অনুযায়ী নফল-সুন্নাত নামায আদায় করছেন। ইমাম সাহেব মসজিদে প্রবেশ করার পরে আযান হলো। আরবীতে খুত্‌বা দেওয়া হলো। এরপর জামাতে নামায আদায়ের পরে সবাই নিজ নিজ সুবিধা মতো মসজিদে বা ঘরে গিয়ে সুন্নাত নামায আদায় করলেন। আর আমাদের পদ্ধতি কি হলো? মুসল্লীগণ এসেছেন বা আসছেন। এমন সময় ইমাম মাতৃভাষায় ওয়াজ শুরু করলেন। এরপর আযান হলো। আবার আরবীতে খুত্‌বা দেওয়া হলো। অথবা মুসল্লীগণ আসছেন ও নামায আদায় করছেন। আযান হলো। এরপর ইমাম আরবীর সাথে মাতৃভাষায় খুত্‌বা প্রদান করলেন। অথবা নামায শেষে মুসল্লীগণ বসে থাকলেন। ইমাম মাতৃভাষায় আলোচনা করলেন। তিনটি ক্ষেত্রেই আমাদের রীতি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নাতের বাইরে চলে গেল।

---

[১] তিরমিযী ৫/৬৫৮; আবূ দাউদ, ১/২৯০; নাসাঈ, ৩/১০৮, ১৯২; ইবনু মাজাহ, ২/১১৯০; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ১/৪২৪। হাদীসটি সহীহ।

[২] বুখারী, আস-সহীহ ১/৩০০, ৩১৫।

৬. প্রাণহীণ অবোধ্য আরবী খুতবা

এ ক্ষেত্রে অনারব দেশসমূহের আলিমগণ মূল ইবাদত ও উপকরণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে মতবিরোধ করেছেন। কেউ কেউ মনে করেছেন যে, খুতবার উদ্দেশ্য ও মূল ইবাদত হলো আরবী ভাষায় কিছু কথা বলা। কেউ বুঝুক অথবা না বুঝুক এতেই ইবাদতটির সুন্নাত পরিপূর্ণ আদায় হয়ে গেল। এরা জুমুআর দিনে খুতবার আগে, পরে বা মধ্যে অনারব ভাষায় কোনোরূপ কোনো ওয়ায বা যিকর-তাযকীর করেন না। বরং এরূপ করাকে অবৈধ, অন্যায়, সুন্নাতের ব্যতিক্রম, বিদ'আত বা মাকরূহ মনে করেন। তাঁদের উদ্দেশ্য মহৎ। তাঁরা সুন্নাতে নববীর হুবহু অনুকরণ করতে চান। তবে তাঁরা এ বিষয়ে আল্লাহর হুকুম ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত দুটিই ভুল বুঝেছেন।

৬. ১. খুতবার বিষয়ে আল্লাহর নির্দেশ: যিক্র বনাম তাযকীর ও ওয়ায

তাঁরা বলেন, জুমুআর খুতবায় আল্লাহর যিকরের অর্থ হলো আরবীতে আল্লাহর নাম নেওয়া বা শ্রবণ করা, অর্থ বুঝা বা না বুঝা গুরুত্বপূর্ণ নয়। যেমন সালাতের মধ্যে তিলাওয়াত এবং দুআ-যিকর্-এর ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শেখানো বাক্য উচ্চারণ করাই ইবাদত, সেগুলির অর্থ বুঝা জরুরী নয়।

বস্তুত কুরআন কারীমে "যিকর" বা "আল্লাহর যিকর" শব্দটি যত স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে সব স্থানের অর্থ যদি তারা একটিবার নযর দিতেন বা অন্তত এগুলির তাফসীরে সাহাবী-তাবিয়ীগণের মতামত পাঠ করতেন তাহলে এ ভুল থেকে তারা রক্ষা পেতেন। কুরআন ও হাদীসে "যিকর" শব্দটির অন্যতম অর্থ হলো "ওয়ায-উপদেশ" বা স্মরণ করানো। সাহাবী-তাবিয়ীগণও এ অর্থ বুঝতেন। আর জুমুআর দিনের যিকর অর্থ যে ওয়ায-আলোচনা তা আমরা উপরের হাদীসগুলি থেকে জেনেছি। আমাদের প্রাজ্ঞ ফকীহগণও এ কথাই বুঝেছেন। আল্লামা সারাখসী মাবসূত গ্রন্থে বলেন:

وَالْخُطْبَةُ كُلُّهَا وَعْظٌ وَأَمْرٌ بِمَعْرُوف

"খুতবা তো পুরোপুরিই ওয়ায ও ন্যায়ের আদেশ"[১] তিনি আরো বলেন:

وَيَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْخَطِيبَ بِوَجْهِهِ إِذَا أَخَذَ فِي الْخُطْبَةِ وَهَكَذَا نُقِلَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُهُ لِأَنَّ الْخَطِيبَ يَعِظُهُمْ وَلِهَذَا اسْتَقْبَلَهُمْ بِوَجْهِهِ وَتَرَكَ اسْتِقْبَالَ الْقِبْلَةِ فَيَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَسْتَقْبِلُوهُ بِوُجُوهِهِمْ لِيُظْهِرَ فَائِدَةَ الْوَعْظِ وَتَعْظِيمَ الذِّكْرِ كَمَا فِي غَيْرِ هَذَا مِنْ مَجَالِسِ الْوَعْظِ وَلَكِنَّ الرَّسْمَ الْآنَ أَنَّ الْقَوْمَ يَسْتَقْبِلُونَ الْقِبْلَةَ وَلَمْ يُؤْمَرُوا بِتَرْكِ هَذَا لِمَا يَلْحَقُهُمْ مِنْ الْحَرَجِ فِي تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ بَعْدَ فَرَاغِهِ لِكَثْرَةِ الزِّحَامِ إِذَا اسْتَقْبَلُوهُ بِوُجُوهِهِمْ فِي حَالَةِ الْخُطْبَةِ

"মুসল্লীর উচিত হলো খতীব যখন খুতবা শুরু করবেন তখন সে খতীবের দিকে মুখ করে বসবে। আবূ হানীফা (রা) এভাবে বসতেন বলে বর্ণিত হয়েছে। কারণ খতীব তো মুসল্লীদেরকে ওয়ায করেন, আর এজন্যই তিনি কিবলামুখী হওয়া পরিত্যাগ করে মুসল্লীদের দিকে মুখ করেন। কাজেই মুসল্লীদেরও উচিত হলো তার দিকে মুখ করে বসা; যেন ওয়াযের উপকার ও যিকরের তাযীম প্রকাশিত হয়। অন্য সকল ওয়াযের মাজলিসের ন্যায় খুতবার সময়ও এরূপ করা উচিত। তবে আজকাল রীতি হয়েছে যে, মুসল্লীগণ কিবলামুখী হয়েই বসে থাকেন। ইমামের দিকে মুখ করে বসে খুতবা শোনার পর সালাতের শুরুতে কাতার সোজা করতে গেলে প্রচণ্ড ভিড়ের কারণে তাদের অসুবিধা হয়। এ অসুবিধার দিকে তাকিয়েই তাদেরকে আর ইমামের দিকে মুখ করে বসতে নির্দেশ দেওয়া হয় না।"[২]

জুমুআর খুতবার সংজ্ঞায় আল্লামা কাসানী বলেন:

الخطبة في المتعارف اسم لما يشتمل على تحميد الله والثناء عليه، والصلاة على رسول الله- صلى الله عليه وسلم - والدعاء للمسلمين والوعظ والتذكير لهم.

"আল্লাহর প্রশংসা, তাঁর গুণবর্ণনা, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর সালাত, মুসলিমদের জন্য দুআ ও তাদের ওয়ায ও স্মরণ করানোর নামই হলো খুতবা।"[৩]

---

[১] সারাখসী, আল-মাবসূত ২/৩২৫। (শামিলা)

[২] সারাখসী, আল-মাবসূত ২/৩৩০। (শামিলা)

[৩] কাসানী, বাদাইউস সানাইয় ১/২৬২।

এভাবে আমরা দেখছি যে, কুরআন, সুন্নাহ ও ফিকহের আলোকে এখানে যিকর অর্থ তাযকীর বা ওয়ায।

কয়েকটি বিষয় তাঁদের এ ভুল বুঝাকে জোরদার করেছে। প্রথমত খুতবাকে নামাযের আভ্যন্তরীন কর্ম বলে দাবি করা। কোনো কোনো সাহাবী-তাবিয়ী বলেছেন যে, খুতবার কারণেই জুমুআর সালাত সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে বা জুমুআর দু রাকাত সালাতের পরিবর্তে খুতবা দুটি দেওয়া হয়েছে।[1] এ থেকে তাঁরা ভুল বুঝেছেন যে, এ দুটি খুতবা সালাতের আভ্যন্তরীন কর্ম। কাজেই সালাতের মধ্যে যা করা যায় না তা খুতবার মধ্যেও করা যাবে না। সালাতের মধ্যে যেহেতু মাতৃভাষা ব্যবহার করা যায় না, সেহেতু খুতবার মধ্যেও মাতৃভাষা ব্যবহার করা যায় না। হানাফী মাযহাবের ইমামগণ-সহ সকল মুহাক্কিক ফকীহ ও মুহাদ্দিস এ ধারণার প্রতিবাদ করেছেন। কারণ খুতবার কারণে সালাত সংক্ষিপ্ত করা বা দু রাকাতের পরিবর্তে খুতবা পাওয়া আর খুতবাকে সালাত বা সালাতের আভ্যন্তরীন কর্ম বলে গণ্য করা কখনোই এক নয়। এখানে সাহাবী-তাবিয়ীগণ খুতবার গুরুত্ব বুঝিয়েছেন যে, খুতবায় উপস্থিতি এত গুরুত্বপূর্ণ যে, এর জন্য সালাতকে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। তারা এ কথা বুঝান নি যে, খুতবাও সালাতের মত আদায় করতে হবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ও খুলাফায়ে রাশেদীন খুতবার মধ্যে ব্যক্তিগত কথাবার্তা বলতেন মর্মে যে হাদীসগুলি আমরা উপরে উল্লেখ করেছি সেগুলি উদ্ধৃত করে ইমাম ইবনু খুযাইমা (৩১১ হি) বলেন:

ففي هذه الأخبار كلها دلالة على أن الخطبة ليست بصلاة وأن للخاطب أن يتكلم في خطبته بالأمر والنهي وما ينوب المسلمين ويعلمهم من أمر دينهم.

"এ সকল হাদীস প্রমাণ করে যে, খুতবা সালাতের অংশ নয় এবং খতীব তার খুতবার মধ্যে আদেশ, নিষেধ ও মুসলমানদের তাৎক্ষনিক প্রয়োজনীয় বিষয়ে বা দীনের বিষয়ে কথা বলতে পারেন।"[2]

হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ইমাম ও ফকীহ আবু বাকর সারাখসী বলেন:

وَالأَصَحُّ أَنَّهَا لا تَقُومُ مَقَامَ شَطْرِ الصَّلاةِ فَإِنَّ الْخُطْبَةَ لا يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ فِي أَدَائِهَا وَلا يَقْطَعُهَا الْكَلامُ وَيُعْتَدُّ بِهَا وَإِنْ أَدَّاهَا وَهُوَ مُحْدِثٌ أَوْ جُنُبٌ

সঠিক মত হলো, খুতবা সালাতের অংশ নয় বা দু রাকাতের স্থলাভিষিক্ত নয়। কারণ খুতবায় কিবলামুখী হতে হয় না, কথাবার্তা বললে খুতবা নষ্ট হয় না, ওযূ ছাড়া বা গোসল ছাড়া খুতবা দিলেও তা আদায় হয়ে যায়।"[3]

বিষয়টি আলোচনা কালে ইমাম শাফিয়ীর মত খণ্ডন প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন:

لَيْسَتْ الْخُطْبَةُ نَظِيرَ الصَّلاةِ وَلا بِمَنْزِلَةِ شَطْرِهَا بِدَلِيلِ أَنَّهَا تُؤَدَّى غَيْرَ مُسْتَقْبِلٍ بِهَا الْقِبْلَةَ وَلا يُفْسِدُهَا الْكَلامُ وَتَأْوِيلُ الأَثَرِ أَنَّهَا فِي حُكْمِ الثَّوَابِ كَشَطْرِ الصَّلاةِ

"খুতবা সালাতের মতও নয়, সালাতের অর্ধেকের স্থলাভিষিক্তও নয়। তার প্রমাণ হলো, তা আদায় করতে কিবলামুখী হওয়া লাগে না এবং কথাবার্তা বলতে তা নষ্ট হয় না। এ বিষয়ে সাহাবী-তাবিয়ীদের বক্তব্যের অর্থ হলো খুতবার সাওয়াব সালাতের অর্ধেকের মত।"[4]

দ্বিতীয় যে বিষয়টি তাদের ভুল বুঝা জোরদার করেছে তা হলো কোনো কোনো আলিমের মত। কোনো কোনো ফকীহ বলেছেন যে, জুমুআর দিনে জুমুআর সালাতের আগে বা পরে কোনো আলোচনা-ওয়ায বিদআত বা মাকরুহ। এ সকল ফকীহের এ মতটি মূলত খুতবার ওয়ায মনোযোগ দিয়ে শ্রবণের সুন্নাত রক্ষা করা জন্য। তাঁরা আমাদের অনারব দেশের নতুন সমস্যার আলোকে এ কথা বলেন নি। বস্তুত কয়েক শত বৎসর পূর্ব পর্যন্ত অনারব মুসলিম দেশগুলিতেও ধার্মিক মুসলিমরা আরবী কিছু বুঝতেন। আরবী না বলতে পারলেও যে কোনো একটি মসজিদের অন্তত কিছু মুসল্লী আরবী বুঝতেন, যেমন বর্তমানে একজন বাঙালী সাধারণ শিক্ষিত মানুষ ইংরেজি বলতে না পারলেও কিছুটা বুঝেন, উর্দু-হিন্দি বলতে না পারলেও কিছুটা বুঝেন। এ সকল সমাজের

---

[1] বিস্তারিত দেখুন: আল্লামা যাফর আহমদ উসমানী, ইলাউস সুনান ৮/৫১-৫৫।
[2] ইবনু খুযাইমা, আস-সহীহ ২/২৫২-২৫৩।
[3] সারাখসী, মাবসূত, ২/৩১৩ (শামিলা)
[4] সারাখসী, মাবসূত, ২/৩২০ (শামিলা)

মসজিদের শুক্রবারে জুমার সালাতের আগে ওয়ায আলোচনা করার অর্থই হলো জুমুআর খুতবার গুরুত্ব কমে যাওয়া। এজন্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ জুমুআর সালাতের আগে ইলমের মাজলিস বসাতে নিষেধ করেছেন। এর অর্থ এ নয় যে, যে সমাজে একজন মুসল্লীয় খুতবার মর্ম বুঝতে পারছেন না, সেখানে খুতবার মর্ম বুঝাতে বা খুতবার তাযকীর ও যিকরের ইবাদত পরিপূর্ণ সুন্নাত পর্যায়ে আদায় করতে খুতবার আগে কিছু বলা যাবে না। খুতবার তাযকীরের বা ওয়াযের সুন্নাত পরিপূর্ণ আদায়ের সাথে সাথে এ সকল ফকীহের মত আক্ষরিকভাবে মানতে হলে আপনাকে খুতবার মধ্যে মাতৃভাষা ব্যবহার করতে হবে।

তৃতীয় যে বিষয়টি তাদের ভুল বুঝা জোরদার করেছে তা হলে ইমাম আবূ হানীফার (রাহ) একটি মত ভুল বুঝা। ইমাম আবূ হানীফার ছাত্র ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান শাইবানী বলেনঃ

قلت أرأيت الإمام إذا خطب الناس يوم الجمعة فقال الحمد لله أو قال سبحان الله أو قال لا إله إلا الله أو ذكر الله أيجزئه من الخطبة ولم يزد على هذا شيئا قال نعم يجزئه وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد لا يجزئه حتى يكون كلاما يسمى الخطبة

"আমি বললাম, বলুন তো, ইমাম খুতবা দেওয়ার সময় যদি "আলহামদু লিল্লাহ", "সুবহানাল্লাহ" বা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" বলে বা আল্লাহর যিকর করে তাতে কি খুতবা আদায় হবে। তিনি বলেনঃ হ্যাঁ, এতে খুতবা হয়ে যাবে। এ হলো আবূ হানীফার মত। আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মাদ বলেনঃ এতে খুতবা হবে না। "খুতবা" নামে অভিহিত করা যায় এরূপ কিছু কথাবার্তা না বলা পর্যন্ত খুতবা আদায় হবে না।"[১]

তাঁরা ইমাম আবূ হানীফার মতের ব্যাখ্যা করে বলেন, এতে বুঝা গেল, খুতবার উদ্দেশ্য ওয়ায নয়, বরং শুধু যিকর। এখানেও তাঁরা ইমাম আযমের মতের ভুল ব্যাখ্যা করেছেন। এখানে ইমাম আযমের কথার অর্থ হলো, শুধু আল-হামদুলিল্লাহ বা অনুরূপ বাক্য বললেও ন্যূনতম স্মরণ করা বা করানোর ফরয আদায় হলো। এখানে আমরা দেখছি যে, ইমামের ছাত্রদ্বয় তার সাথে মতভেদ করেছেন। অন্যান্য স্থানে তাঁর সকলে একমত হয়ে বলেছেন যে, দু খুতবার বদলে এক খুতবা দিলে, বসে খুতবা দিলে বা অনারব ভাষায় খুতবা দিলে তা "জায়েয" হবে। এখানে তাঁরা ন্যূনতম জায়েয বলেছেন, সুন্নাত নয়। সর্বোপরি, তিনি এখানে আলহামদু লিল্লাহ আরবীতে বলা জরুরী বলেন নি। তিনি বারংবার বলেছেন যে, সালাতের তাকবীরে তাহরীমায়, সালাতের মধ্যে দুআ-যিকরে, তাশাহ্হুদে, পশু জবাইয়ের সময়, খুতবার মধ্যে ও অন্যান্য ক্ষেত্রে আরবীর বদলে অন্য ভাষায় তরজমা করে আল্লাহর যিকর করলেও তা জায়েয হবে। নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহ ﷺ, সাহাবীগণ এ সকল ইবাদত আরবীতে পালন করেছেন। তবে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) এক্ষেত্রে ভাষাকে ইবাদতের অংশ নয়, বরং ইবাদতের উপকরণ বলে গণ্য করেছেন।

৬. ২. খুতবার বিষয়ে সুন্নাতের নির্দেশনাঃ আরবী ভাষা বনাম ওয়ায

যারা খুতবার পূর্বে, মধ্যে বা পরে অনারব ভাষায় ওয়ায-আলোচনা নিষেধ করেন তাদের মূল দাবি একটিই। তা হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীগণ কখনোই এরূপ করেন নি। তাঁরা কেউ কেউ অনারব ভাষা জানতেন। তাঁরা অনেক অনারব দেশে অনারব মুসলিমদের মধ্যে খুতবা দিয়েছেন, কিন্তু কখনোই অনারব ভাষা ব্যবহার করেন নি। অথবা খুতবার আগে অনারব ভাষায় খুতবার অনুবাদ করেন নি। কাজেই এরূপ করা সুন্নাতের ব্যতিক্রম, বিদআত ও মাকরূহ। তাঁরা আরো বলেন যে, ওয়ায, নসীহত ও বুঝানোর তো আরো অনেক সুযোগ রয়েছে, কাজেই খুতবাকে এ সকল ঝামেলা থেকে মুক্ত রাখা দরকার।

এখানে নিম্নের বিষয়গুলি লক্ষণীয়:

প্রথমত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণ কখনোই এরূপ কোনো দেশে গমন করেন নি বা এরূপ দেশে খুতবা দেন নি যেখানে কোনো মুসল্লীই আরবী বুঝতেন না। বস্তুত ইউরোপীয় উপনিবেশের পূর্বে কখনোই কোনো মুসলিম সমাজে আরবী বিহীন কোনো শিক্ষাব্যবস্থা ছিল না। এ কারণে প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত যে কোনো মুসলিম আরবী বলতে না পারলেও কিছুটা বুঝতেন। এজন্য যে কোনো মসজিদে মুসল্লীগণের মধ্যে অধিকাংশ বা অনেক মুসল্লী আরবী বুঝার মত থাকতেনই। সাহাবী-তাবিয়ীগণের যুগে যে কোনো দেশের যে কোনো মসজিদের মুসল্লীদের

[১] মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান, আল-মাবসূত ১/৩৫০-৩৫১। আরো দেখুনঃ আল-জামি আস-সাগীর, পৃ. ৮৮।

অধিকাংশই আরবী বুঝতেন এবং তাদের অধিকাংশই আরবী ছাড়া অন্য কোনো ভাষা জানতেন না। এক্ষেত্রে অনারব ভাষায় খুতবার প্রয়োজন বা যৌক্তিকতা থাকে না।

দ্বিতীয়ত, খুতবার ক্ষেত্রে অনারব ভাষা ব্যবহার করা যেমন সুন্নাতের খেলাফ, তেমনি দেখে খুতবা পাঠ করা, আবেগহীন খুতবা দেওয়া, মুসল্লীদের হৃদয় না নাড়িয়ে খুতবা দেওয়াও সুন্নাতের খেলাফ। রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনোই এরূপ খুতবা দেন নি। ভাষা ও প্রভাব দুটির সমন্বয়ই সর্বোত্তম। তবে যদি দুটির সমন্বয় সম্ভব না হয় তাহলে কোনটিকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে তা নির্ধারণ করতে হবে।

তৃতীয়ত, সুন্নাতে সাহাবার আলোকে ওয়াযই বেশি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত বলে মনে হয়। সাহাবীগণের সুন্নাত থেকে আমরা সালাতের কুরআন তিলাওয়াত বা দুআ-যিক্র ও খুতবার মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারি। কুরআন ও দুআ-যিকরের ক্ষেত্রে সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ব্যবহৃত ও শেখানো কথাগুলি হুবহু ব্যবহার করতেন। এক্ষেত্রে তারা এগুলির আরবী তরজমা বা সমার্থক অন্য কোনো আরবী শব্দ বা বাক্য ব্যবহার করতেন না। এভাবে পশু জবাইয়ের সময়, খাওয়ার সময় ও অন্য অনেক ক্ষেত্রে আল্লাহর যিকরের জন্য তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শেখানো কথাগুলি হুবহু বলতেন। সেগুলির তরজমা বলতেন না।

কিন্তু খুতবার বিষয়টি তা নয়। এখানে তাঁরা ভাষা বা শব্দকে "সুন্নাত" বলে গণ্য করেন নি। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর খুতবার মধ্যে যে কথাগুলি বলতেন খুলাফায়ে রাশেদীন বা সাহাবীগণ হুবহু সে কথাগুলি বলার বিষয়ে কখনোই কোনোরূপ গুরুত্বারোপ করেন নি, বরং তাঁরা তাঁর শিক্ষা নিজেদের ভাষায় রূপান্তরিত করে, অর্থাৎ আরবী বক্তব্যের আরবী তরজমা ও ব্যাখ্যা করে খুতবা দিতেন। এ থেকে আমরা নিশ্চিত হই যে, খুতবার ক্ষেত্রে শব্দ, বাক্য বা ভাষা মূল সুন্নাত নয়, মুসল্লীদেরকে বুঝানো ও তাদের হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করাই মূল সুন্নাত। লক্ষণীয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দুআ ও যিক্র-এর হুবহু বর্ণনায় শত শত হাদীস বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তাঁর খুতবার হুবহু বর্ণনায় বর্ণিত হাদীস খুবই কম। প্রায় সব হাদীসেই বলা হচ্ছে, তিনি কুরআন পাঠ করতেন এবং আমাদের ওয়ায করতেন। কারণ খুতবার ক্ষেত্রে ভাষা, শব্দ বা বাক্যকে তাঁরা গুরুত্ব দেন নি, অর্থকেই গুরুত্ব দিয়েছেন।

চতুর্থত, সাহাবীগণ ও পরবর্তী যুগের আলিমগণ মুসল্লীদের বুঝানোর জন্য পরবর্তীকালে আরবীর মধ্যে যে সকল তুর্কী, ফার্সী, ইংরেজী, ফরাসী ইত্যাদি অনারব শব্দ প্রবেশ করেছে সেগুলি ব্যবহার করতে কোনো আপত্তি করেন নি। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগের বিশুদ্ধ আরবীর পাশাপাশি এগুলি ব্যবহার করেছেন এবং সম্পূর্ণ অনারব ভাষার মত আঞ্চলিক আরবী ভাষাও ব্যবহার করেছেন।

পঞ্চমত, ওয়ায-নসীহতের আরো সুযোগ আছে বলে খুতবাকে ওয়ায-শূন্য করার অর্থ হলো মায়ের দুধের বিকল্প আছে বলে শিশুর মায়ের দুধ বন্ধ করে দেওয়া। ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় প্রতি সপ্তাহে ওয়ায, আলোচনা ও তাকওয়া সৃষ্টির প্রাকৃতিক, স্বাভাবিক, আল্লাহর নির্দেশিত ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রদর্শিত ব্যবস্থা হলো জুমুআর খুতবা। ওয়ায নসীহতের আরো অনেক ব্যবস্থা আছে ঠিক, কিন্তু সেগুলি খুতবার সম্পূরক হতে পারে, খুতবার বিকল্প হতে পারে না। একমাত্র খুতবা ছাড়া অন্য কোনো ওয়ায আলোচনার মাহফিল নিয়মিত সাপ্তাহিকভাবে চালূ রাখা প্রায় অসম্ভব, আর তা সম্ভব হলেও সকল মুসল্লীর নিয়মিত তাতে উপস্থিত হওয়া একেবারেই অসম্ভব। আর বাৎসরিক ও সাময়িক ওয়ায-নসীহতের উপকার সাময়িক ও সীমিত। প্রকৃত তাকওয়া গঠনে জুমুআর খুতবার বিকল্প তালাশ করার অর্থ হলো ফরয সালাতের পরিবর্তে শুধু নফল সালাতের মাধ্যমে সালাতের ইবাদত পালনের চেষ্টা করা।

৭. খুতবায় মাতৃভাষা ব্যবহারে ইমাম আবূ হানীফার (রাহ) মতামত

এ প্রসঙ্গে আমরা খুতবায় মাতৃভাষা ব্যবহার বিষয়ে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) ও তাঁর অনুসারী ফকীহগণের মতামত আলোচনা করতে চাই। খুতবায় মাতৃভাষা ব্যবহারের তিনটি পর্যায় রয়েছেঃ প্রথমত, কোনোরূপ আরবী বাক্য ব্যবহার না করে, দ্বিতীয় আযানের পরে কেবলমাত্র অনারব ভাষায় খুতবা দেওয়া। দ্বিতীয়ত, দ্বিতীয় আযানের পরে আরবীতে খুতবা দেওয়া এবং আরবীর মধ্যে কিছু অনারব শব্দ বা বাক্য ব্যবহার করা। তৃতীয়ত, দ্বিতীয় আযানের আগে খুতবার বিষয়বস্তু মাতৃভাষায় বুঝিয়ে দিয়ে এরপর আযানের পর আরবীতে খুতবা দেওয়া। প্রথম পর্যায় বা দ্বিতীয় আযানের পরে কোনোরূপ আরবী না বলে শুধু অনারব ভাষায় খুতবা দেওয়া ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) জায়েয বলেছেন। পরবর্তী অনেক হানাফী ফকীহ তা "মাকরূহ

পর্যায়ের জায়েয" বলে উল্লেখ করেছেন। ইমাম মুহাম্মাদ (রাহ) তাঁর মাবসূত গ্রন্থে বলেন:

قال أبو حنيفة إن افتتح الصلاة بالفارسية وقرأ بها وهو يحسن العربية أجزأه وقال أبو يوسف ومحمد لا يجزئه إلا أن يكون لا يحسن العربية". وقال أيضا: "قلت أرأيت رجلا قرأ بالفارسية في الصلاة وهو يحسن العربية قال تجزيه صلاته قلت وكذلك الدعاء قال نعم".

"আবূ হানীফা বলেন, আরবীতে ভাল পারঙ্গম হওয়া সত্ত্বেও যদি কেউ ফারসী ভাষায় (তাকবীরের ফার্সী অনুবাদ বলে) সালাত শুরু করে ও ফার্সীতে সালাতের মধ্যে কুরআন পাঠ করে তবে তার সালাত হয়ে যাবে। আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মাদ বলেন: তার সালাত হবে না, তবে যদি সে আরবীতে ভাল পারঙ্গম না হয় তাহলে সালাত হয়ে যাবে।" ... ইমাম মুহাম্মাদ বলেন: "আমি বললাম, বলুন তো, যদি কেউ আরবীতে ভাল পারঙ্গম হওয়া সত্ত্বেও ফারসীতে সালাতের মধ্যে কুরআন পাঠ করে তাহলে কি হবে? তিনি বলেন: তার সালাত আদায় হয়ে যাবে। আমি বললাম: দুআও কি অনুরূপ? তিনি বললেন: হ্যাঁ।"[১]

ইমাম আবূ ইউসূফ (রাহ) আবূ হানীফা (রাহ)-এর সূত্রে ইবনু মাসঊদ (রা) থেকে উদ্ধৃত করেছেন:

إن الخطأ في القرآن ليس أن تقول الغفور الرحيم العزيز الحكيم إنما الخطأ أن تقرأ آية الرحمة آية العذاب وآية العذاب آية الرحمة وان يزاد في كتاب الله ما ليس فيه.

"কুরআন তিলাওয়াতের সময় "আলগাফূরুর রাহীম- ক্ষমাশীল করুণাময়"-এর স্থলে "আল-আযীযুল হাকীম"- প্ররাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়" বললে তা তিলাওয়াতের ভুল বলে গণ্য নয়। তিলাওয়াতের ভুল হলো রহমতের আয়াতের স্থলে আযাবের আয়াত বা আযাবের আয়াতের স্থলে রহমতেরে আয়াত পাঠ করা, অথবা কুরআনে যা নেই তা তার মধ্যে সংযোজন করা।"[২]

ইবনু মাসঊদ (রা)-এর এ বক্তব্যই ইমাম আবূ হানীফা (রাহ)-এর মতের ভিত্তি। কারণ ইবনু মাসঊদ (রা) কুরআনের একটি শব্দের পরিবর্তে সমার্থক বা কাছাকাছি অর্থের অন্য শব্দ ব্যবহার জায়েয বলেছেন। এতে বুঝা যায় যে, কুরআনকে আরবী ভাষায় সমার্থক শব্দে অনুবাদ করা যায়। আর আরবী তরজমা আর অনারব তরজমার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।[৩] এ প্রসঙ্গে ইমাম সারাখসী বলেন:

ولو كبر بالفارسية جاز عند أبي حنيفة رحمه الله بناء على أصله أن المقصود هو الذكر وذلك حاصل بكل لسان ولا يجوز عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله إلا أن لا يحسن العربية. ... وكذلك الخلاف فيما إذا تشهد بالفارسية أو خطب الإمام يوم الجمعة بالفارسية .... ولو آمن بالفارسية كان مؤمنا وكذلك لو سمى عند الذبح بالفارسية أو لبى بالفارسية فكذلك إذا كبر وقرأ بالفارسية

"যদি সালাতের তাকবীরে তাহরীমা ফারসী ভাষায় বলে তাহলে আবূ হানীফা (রাহ)-এর মতে তা জায়েয হবে। কারণ তার মুলনীতি হলো, এখানে উদ্দেশ্য হলো "যিক্র" আর "যিকর" যে কোনো ভাষায় করলেই তা আদায় হবে। আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মাদের মতে আরবীতে পারঙ্গম না হলেই শুধু এভাবে (অনারব ভাষায় তাকবীরের অনুবাদ বলা) জায়েয হবে, নইলে তা জায়েয হবে না। সালাতের মধ্যে তাশাহ্হুদ বা "আত্তাহিয়্যাত" ফারসীতে পাঠ করা এবং জুমুআর খুতবা ফারসীতে দেওয়ার ক্ষেত্রেও একই মতভেদ (আবূ হানীফা (রাহ)-এর মতে সকলের জন্যই জায়েয, আর সঙ্গীদ্বয়ের মধে আরবীতে অক্ষমের জন্য জায়েয)।... যদি ফারসী ভাষায় ঈমান গ্রহণ করে (কালিমার অর্থ ফারসী ভাষায় বলে) তাহলে সে মুমিন বলে গণ্য হবে, অনুরূপভাবে যদি পশু জবাই করার সময় ফারসী ভাষায় আল্লাহর নাম নেয় অথবা হজ্জের তালবিয়ার ফারসীতে বলে তাহলে (সকলের মতেই) তা জায়েয হবে, কাজেই ফারসী ভাষায় তাকবীরে তাহরীমা বললেও তা

---

[১] মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান, আল-মাবসূত ১/১৫ ও ১/২৫২।
[২] আবূ ইউসূফ, কিতাবুল আসার, পৃ. ৪৪।
[৩] যাফর আহমদ উসমানী, ই'লাউস সুনান ৩/১৩২-১৩৩।

একইভাবে জায়েয হওয়াই যুক্তিযুক্ত।"[১]

আল্লামা আলাউদ্দীন কাসানী বলেন:

ولو افتتح الصلاة بالفارسية... يصير شارعا عند أبي حنيفة وعندهما لا يصير شارعا إلا إذا كان لا يحسن العربية ولو ذبح وسمى بالفارسية يجوز بالإجماع فأبو يوسف مر على أصله في مراعاة المنصوص عليه والمنصوص عليه لفظة التكبير بقوله وتحريمها التكبير وهي لا تحصل بالفارسية وفي باب الذبح المنصوص عليه هو مطلق الذكر بقوله فاذكروا اسم الله عليها صواف وذا يحصل بالفارسية"

"যদি ফার্সীতে সালাত শুরু করে তাহলে আবূ হানীফার মতে সালাতের শুরু বৈধ হবে, শিষ্যদ্বয়ের মতে তা হবে না, তবে যদি সে আরবীতে ভাল পারঙ্গম না হয় তাহলে হবে। আর যদি জবাইয়ের সময় ফার্সীতে আল্লাহর নাম নেয় তাহলে তাঁদের সকলের মতেই যে আরবী পারে তার জন্যও তা জায়েয হবে। ইমাম আবূ ইউসূফ উভয় বিষয়েই তাঁর মূলনীতি অনুসরণ করেছেন, আর তা হলো কুরআন-হাদীসের নির্দেশ আক্ষরিক পালন করা। তাকবীরে তাহরীমার ক্ষেত্রে আরবী জানা ব্যক্তির জন্য ফার্সীতে তাকবীর তিনি জায়েয বলেন নি তার কারণ এখানে "তাকবীর" বলতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর ফার্সী অনুবাদ বললে তাকবীর বলা হলো না। আর জবাইয়ের ক্ষেত্রে কুরআনের নির্দেশ হলো "যিক্র"। আল্লাহ্ বলেছেন: "সারিবদ্ধ পশুগুলির উপর আল্লাহর নামের যিক্র কর"[২], আর যিক্র তো ফারসী ভাষাতেও আদায় হয়।"[৩]

ফার্সী বলতে সকল অনারব ভাষা বুঝানো হয়েছে। অনারব ভাষার মধ্যে ফার্সীই তাদের সময়ে প্রচলিত ছিল এজন্য ফার্সীর কথা তারা বলেছেন। এ বিষয়ে হেদায়ার প্রণেতা আল্লামা মারগীনানী বলেন:

ويجوز بأي لسان كان سوى الفارسية، هو الصحيح

"ফার্সী ছাড়াও অন্য যে কোনো ভাষাতেই এরূপ বৈধতা আসবে। এই হলো সঠিক মত।"[৪]

এখানে উল্লেখ্য যে, যে মুসলিম আরবী পারেন না তার জন্য হাদীস শরীফে সালাতের মধ্যে সূরা ফাতিহা ও অন্যান্য সূরা পাঠ বা কুরআন পাঠের পরিবর্তে তাসবীহ-তাহলীল পাঠ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইমাম শাফিয়ী (রাহ) ও অন্যান্য ফকীহের মত হলো, আরবীতে অক্ষম ব্যক্তি সালাতের মধ্যে তাসবীহ তাহলীল যা পারে বলবে। সে যদি অনারব ভাষায় কুরআনের অনুবাদ সালাতের মধ্যে পাঠ করে তাহলে তার সালাত ভেঙ্গে যাবে। ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) তাঁর অনুসারীদের মতে সালাতের মধ্যে অনারব ভাষায় কুরআনের অনুবাদ পাঠ করলে সালাত নষ্ট হবে না। তবে যে আরবী পারে তার জন্য তরজমা পাঠে কুরআন পাঠের ফরয আদায় হবে না। আর যে ব্যক্তি আরবী পারে না তার এরূপ অনুবাদ পাঠে তার ফরয আদায় হবে। তবে উভয়ের কারোই সালাত বাতিল বা ভঙ্গ হবে না।[৫]

এখানে আরো উল্লেখ্য যে, পরবর্তী হানাফী ফকীহগণ উল্লেখ করেছেন যে, যদিও প্রসিদ্ধ সকল বর্ণনায় ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) আরবীতে পারঙ্গম হওয়া সত্ত্বেও সালাতের মধ্যে অনারব ভাষায় কুরআনের তরজমা পাঠ জায়েয বলেছেন, কিন্তু অন্যান্য বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, শুধু সালাতের মধ্যে কুরআন পাঠের ক্ষেত্রে তিনি তাঁর এ মত পরিত্যাগ করে তার ছাত্রদ্বয়ের মত গ্রহণ করেন এবং বলেন যে, আরবীতে পারঙ্গম না হলেই শুধু এরূপ করা জায়েয হবে। জুমুআর খুতবা, তাকবীরে তাহরীমা ও অন্যান্য সকল বিষয়ে তিনি পারঙ্গম ও অক্ষম সকলের জন্যই অনারব ভাষা ব্যবহার জায়েয বলেছেন।[৬]

---

[১] আবূ বাকর সারাখসী, আল-মাবসূত ১/৩৬-৩৭। আরো দেখুন: আলাউদ্দীন সমরকন্দী, তুহফাতুল ফুকাহা ১/১৩০; আলাউদ্দীন কাসানী, বাদাউস সানাইয় ১/১১২-১১৩।

[২] সূরা হজ্জ: ৩৬ আয়াত।

[৩] কাসানী, বাদাইউস সানাইয় ১/১৩১। আরো দেখুন: ৫/৪৮।

[৪] মারগীনানী, আল-হিদায়া ১/৪৮।

[৫] মারগীনানী, আল-হিদায়া ১/৪৮; আব্দুল হাই লাখনবী, আন-নাফিউল কাবীর, পৃ. ৭২-৭৩; ইবনু নুজাইম, আল-বাহরুর রাইক ১/৫৩৬।

[৬] মারগীনানী, আল-হিদায়া ১/৪৮; যাফর আহমদ উসমানী, ই'লাউস সুনান ৩/১৩২-১৩৩।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা দেখছি যে, হানাফী মাযহাবের সকল ইমামের ঐকমত্যে আরবীতে পারঙ্গম ও অক্ষম সকলের জন্যই জবাইয়ের সময়, হজ্জের তালবিয়ার সময় ও ঈমান গ্রহণের সময় কালিমা, যিকর বা দুআর আরবী না বলে তার অনুবাদ বলা জায়েয। আর ইমাম আবূ হানীফার মতে পারঙ্গম ও অক্ষম সকলের জন্যই সালাতের তাকবীরে তাহরীমা, তাশাহ্হুদ ও খুতবা অনারব ভাষায় বলা জায়েয। পরবর্তী ফকীহগণ উল্লেখ করেছেন যে, এ মতের উপরেই মাযহাবের ফাতওয়া।[১]

এখানে লক্ষণীয় যে, হানাফী মাযহাবের প্রাচীন গ্রন্থগুলিতে এভাবে পারঙ্গম ও অক্ষম সকলের জন্য অনারব ভাষায় তাকবীরে তাহরীমা, খুতবা, তাশাহ্হুদ, জবাইয়ের সময় আল্লাহর নাম নেওয়া, ঈমান আনা, হজ্জের তালবিয়া পড়া ইত্যাদি "জায়েয" বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে বাহ্যত বুঝা যায় যে, এগুলি সবই আপত্তি বিহীন ভাবে জায়েয বা কোনোরূপ মাকরুহ নয়। বিশেষত, ইমাম মুহাম্মাদের মাবসূত গ্রন্থে দেখা যায় যে, মাকরুহ পর্যায়ের জায়েয বুঝাতে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) সুস্পষ্ট কিছু বাক্য ব্যবহার করেন, যা এ ক্ষেত্রে তিনি করেন নি। কিন্তু পরবর্তী ফকীহগণ এ বিষয়ে তাঁদের মতামত সংযোজন করেছেন। আল্লামা উসমান ইবনু আলী যাইলায়ী (৭৪৩ হি) বলেনঃ

ولو شرع بالتسبيح أو التهليل أو بالفارسية صح... ولكن الأولى أن يشرع بالتكبير. وهل يكره الشروع بغيره أم لا؟ ذكر صاحب الذخيرة أنه يكره في الأصح. وقال السرخسي: الأصح أنه لا يكره"

"যদি তাসবীহ, তাহলীল বা ফার্সী ভাষায় তাহরীমা বলে সালাত শুরু করে তাহলে তা সহীহ হবে। তবে "আল্লাহু আকবার" বলা উত্তম। অন্যভাবে সালাত শুরু করা কি মাকরুহ হবে কি না? "যাখীরা"র লেখক বলেছেন, সঠিকতর মত হলো, এরূপ করা মাকরুহ হবে। আর সারাখসী বলেছেন, সঠিকতর মত হলো এরূপ করা মাকরুহ হবে না।"[২]

বস্তুত তাকবীরে তাহরীমা, তাশাহ্হুদ ইত্যাদি ক্ষেত্রে অনারব ভাষার ব্যবহার বা অনুবাদ বলা আরবীতে সক্ষম ব্যক্তির জন্য মাকরুহ হওয়াই যৌক্তিক। কারণ এ সকল ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বদা একটি নির্দিষ্ট বাক্য বা বাক্যমালা ব্যবহার করেছেন এবং করতে শিক্ষা দিয়েছেন। এর ব্যতিক্রম তিনি কখনোই করেন নি। সাহাবীগণও এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট বাক্য বা বাক্যমালাকেই ইবাদত বলে গণ্য করেছেন। তাঁরা কাছাকাছি অর্থের বা সমার্থক অন্য আরবী বাক্য এক্ষেত্রে ব্যবহার করেন নি। এ থেকে বুঝা যায় যে, এক্ষেত্রে নির্ধারিত বাক্য বা বাক্যমালা পাঠই সুন্নাত। আর সুন্নাতের ব্যতিক্রম নিষিদ্ধ না হলেও অপছন্দনীয় বা মাকরুহ। কিন্তু যিকর, তাযকীর বা খুতবার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ কোনো বাক্য বা বাক্যমালা শিক্ষা দেন নি। সাহাবীগণও এরূপ কোনো মাসনূন বাক্য বা বাক্যমালা বলার গুরুত্ব দেন নি। বরং তাঁরা কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য নিজের ভাষায় বলতেন, অর্থাৎ আরবী অনুবাদ বলতেন। এতে বুঝা যায় যে, এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোনো বাক্য বা বাক্যমালা পাঠ সুন্নাত নয়, বরং অর্থই মুল। কুরআন ও হাদীসের অর্থ বোধগম্য ভাষায় বলে ওয়ায ও যিকর বা তাযকীরই হলো সুন্নাত। এজন্য এক্ষেত্রে অনারব ভাষার ব্যবহার অনুত্তম হলেও মাকরুহ না হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। কোনো কোনো হানাফী ফকীহের বক্তব্য থেকে এরূপই বুঝা যায়। আল্লামা হাসান ইবনু আম্মার শুরনুবলালী (১০৬৯) বলেন:

"والرابع الخطبة ولو بالفارسية من قادر على العربية".

"জুমুআর সালাতের চতুর্থ শর্ত হলো খুতবা, যদি আরবীতে পারঙ্গম ব্যক্তি ফার্সীতে খুতবা দেয় তাহলেও চলবে।"[৩]

এজন্য মিসর, সিরিয়া, তুরস্ক ও মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশের হানাফী ফকীহগণ উল্লেখ করেন যে, হানাফী মাযহাব অনুসারে খুতবার মধ্যে আরবী ভাষার ব্যবহার মুসতাহাব বা উত্তম। মুসল্লীগণ আরব হোক আর অনারব হোক এবং খতীব আরবীতে পারঙ্গম হোন আর না হোন সর্বাবস্থায় অনারব ভাষায় খুতবা দেওয়া জায়েয।"[৪]

---

[১] ইবনু আবিদীন, হাশিয়াতু রাদ্দিল মুহতার ১/৪৮৩-৪৮৪।

[২] যাইলায়ী, উসমান ইবনু আলী, তাবয়ীনুল হাকাইক শারহু কানযিদ দাকাইক ১/১০৯।

[৩] শুরনুবলালী, মারাকিল ফালাহ,পৃ. ১৯১।

[৪] আব্দুর রাহমান আল-জাযীরী, আল-ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবায়া ১/৩৫৫; ড. ওয়াহবাহ যুহাইলী, আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া

তাদের মতানুসারে খুতবা সালত বহির্ভুত যিকর বা ওয়ায। অন্যান্য ওয়ায, ঈমানের সাক্ষ্য দেওয়া, আল্লাহর প্রশংসা করা যেমন আরবীতে করা উত্তম তবে অনারব ভাষায় করা মাকরুহ নয়, খুতবাও তেমনি একটি যিকর।

আল্লামা আব্দুল হাই লাখনবী একটি ফাতওয়ায় উল্লেখ করেছেন যে, আরবী ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় খুতবা দেওয়া জায়েয, তবে অনুত্তম বা "খেলাফে আফযাল"। এ থেকেও প্রতীয়মান হয় যে, খুতবায় আরবী ভাষার ব্যবহার মুস্তাহাব এবং অনারব ভাষার ব্যবহার অনুত্তম, মাকরুহ নয়। তিনি শাইখ আব্দুল হক্ক মুহাদ্দিস দেহলবী থেকেও অনুরূপ মত উদ্ধৃত করেছেন।[১]

পক্ষান্তরে অধিকাংশ ভারতীয় হানাফী ফকীহ উল্লেখ করেছেন যে, অনারব ভাষায় খুতবা দেওয়া জায়েয তবে মাকরুহ তাহরীমী।[২] তাঁরা এক্ষেত্রে খুতবাকে সালাতের আভ্যন্তরীন যিকর-দুআ হিসেবে গণ্য করে একে তাকবীরে তাহরীমা ও সালাতের মধ্যের দুআর বিধানের সাথে তুলনীয় বলে মনে করেছেন। আমরা দেখেছি যে, কোনো কোনো হানাফী ফকীহ অনারব ভাষায় তাকবীরে তাহরীমা মাকরুহ নয় বললেও অন্যান্য ফকীহ তা মাকরুহ বলেছেন। এছাড়া ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) সালাতের মধ্যে অনারব ভাষায় দুআ করা জায়েয বললেও কোনো কোনো হানাফী ফকীহ সালাতের মধ্যে অনারব ভাষায় দুআ মাকরুহ বলেছেন।[৩]

উপরের সকল মতামত মূলত জুমুআর দ্বিতীয় আযানের পরে কোনোরূপ আরবী বাক্য ব্যবহার না করে কেবলমাত্র অনারব ভাষায় খুতবা দেওয়ার বিষয়ে। এ হলো খুতবায় অনারব ভাষা ব্যবহারের প্রথম পর্যায়। দ্বিতীয় পর্যায় হলো আরবী খুতবার মধ্যে কিছু অনারব ভাষায় কিছু কথা বলা। উপরের আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, পূর্ণ খুতবাই যখন অনারব ভাষায় দেওয়া যায়, তাহলে আরবীর পাশাপাশি খুতবার কিছু অংশ অনারব ভাষায় বলায় কোনো অসুবিধা থাকতে পারে না। আমরা বলেছি যে, অধিকাংশ ভারতীয় হানাফী ফকীহ অনারব ভাষায় খুতবা দেওয়া মাকরুহ বলে গণ্য করেছেন। এজন্য তাঁরা আরবী খুতবার সাথে খুতবার কিছু অংশ, বা খুতবার ওয়ায ও তাযকীরের অংশ অনারব ভাষায় বলাও মাকরুহ বলে গণ্য করেছেন।

খুতবার মধ্যে মুসল্লীদের ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ বিষয়ক কথা সাধারণ মুসল্লীদের ভাষায় বললে তা মাকরুহ হবে না বলে হানাফী ফকীহগণ উল্লেখ করেছেন। আল্লামা কাসানী বলেন:

وَيُكْرَهُ لِلْخَطِيبِ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي حَالَةِ الْخُطْبَةِ وَلَوْ فَعَلَ لا تَفْسُدُ الْخُطْبَةُ ؛ لأَنَّهَا لَيْسَتْ بِصَلاةٍ فَلا يُفْسِدُهَا كَلامُ النَّاسِ لَكِنَّهُ يُكْرَهُ؛ لأَنَّهَا شُرِعَتْ مَنْظُومَةً ... إلا إِذَا كَانَ الْكَلامُ أَمْرًا بِالْمَعْرُوفِ فَلا يُكْرَهُ

"খতীবের জন্য খুতবার অবস্থায় কথাবার্তা বলা মাকরুহ। তবে এরূপ করলে খুতবা নষ্ট হবে না। কারণ খুতবা তো সালাত নয়, কাজেই মানুষের সাথে কথাবার্তা বললে তা নষ্ট হবে না। কিন্তু যেহেতু এতে খুতবার ধারাবাহিকতা নষ্ট করে সেজন্য মাকরুহ হবে। তবে যদি মানুষের সাথে কথাবার্তা ভাল কাজের আদেশ জাতীয় হয় তবে তা মাকরুহ হবে না।"[৪] ফাতাওয়া হিন্দিয়ার ভাষ্য নিম্নরূপ:

وَيُكْرَهُ لِلْخَطِيبِ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي حَالِ الْخُطْبَةِ إلا أَنْ يَكُونَ أَمْرًا بِمَعْرُوفٍ

"খতীবের জন্য খুতবার অবস্থায় কথাবার্তা বলা মাকরুহ, তবে যদি ভাল কাজের আদেশ হয় তবে তা মাকরুহ নয়।"[৫]

৮. খুতবায় মাতৃভাষা ব্যবহারে দুটি পদ্ধতি

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে, যে দেশের মুসল্লীদের কেউই বা অধিকাংশই আরবী মোটেও বুঝেন না তাদের বুঝার মত ও হৃদয় নাড়ানোর মত ওয়ায ছাড়া শুধু আরবী কয়েকটি বাক্য বললে বা পড়লে

আদিল্লাতুহু ২/২৮৪।

[১] আব্দুল হাই লাখনবী, মাজমূআহ ফাতাওয়া মাওলানা আবুল হাই, পৃ. ২২৪-২২৫।

[২] ফাতাওয়া দারুল উলূম ৫/৩৮, ৩৯, ৫২, ৬০-৬১, ৬৬, ৭৭, ৯০, ১২৮-১৩০।

[৩] ইবনু আবিদীন, হাশিয়াতু রাদ্দিল মুহতার ১/৪৮৪।

[৪] কাসানী, বাদাইউস সানাইয় ১/২৬৫।

[৫] আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যাহ ১/১৪৭।

খুতবার সুন্নাত কখনোই আদায় হবে না। সৌভাগ্যজনকভাবে মুসলিম উম্মাহর অধিকাংশ আলিমই বিষয়টির সাথে একমত। এজন্য সকল অনারব দেশের প্রায় সকল মসজিদে আমরা জুমুআর খুতবার ক্ষেত্রে দুটি চিত্র দেখতে পাই:

(১) দ্বিতীয় আযানের পরে প্রথম খুতবার মধ্যে আরবীতে আল্লাহর প্রশংসা, তাশাহ্হুদ, সালাত, সালাম, কুরআনের আয়াত পাঠ ও হাদীস পাঠ ও দুআ আরবীতে করা এবং ওয়ায, আদেশ নিষেধ মাতৃভাষায় করা।

(২) আযানের পূর্বে মাতৃভাষায় আলোচনা করা। এরপর আযানের পরে আরবীতে দুটি খুতবা দেওয়া।

তুরস্ক, আফ্রিকা, ইউরোপ, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও অন্যান্য অনারব দেশে প্রথম চিত্রটিই পাওয়া যায়। আর ভারতীয় উপমহাদেশে দ্বিতীয় পদ্ধতিটি বেশি, প্রথমটি কম।

আমরা আগেই বলেছি, এ বিষয়ক মতভেদ মূলত খুতবার মূল ইবাদত ও উপকরণ নির্ধারণের মতভেদ এবং বর্জনের পর্যায় নির্ধারণের মতভেদ। একটি উদাহরণ আবার বিবেচনা করুন। হজ্জের সময় তাওয়াফ করা ও আরাফাতে অবস্থান হজ্জের মূল ইবাদত। তাওয়াফকে হাদীসে সালাত বলা হয়েছে এবং সালাতের অধিকাংশ বিধান এক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং আরাফাতে অবস্থানই হজ্জের মূল ইবাদত বলে হাদীসে বলা হয়েছে। মুমিন চেষ্টা করেন এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হুবহু অনুকরণ করতে। তাওয়াফের শুরু, দৌড়ানো বা হাটার পদ্ধতি, যিক্র ও দুআ করা, দুআর স্থান ইত্যাদি সকল বিষয়ে এবং আরাফাতে রাওয়ানা দেওয়া, সালাত আদায়, অবস্থান, দুআ, দুআর অবস্থা, দুআর বাক্য, পদ্ধতি, আরাফাত থেকে রাওয়ানা দেওয়া ইত্যাদি সকল কিছুতেই সুন্নাতের হুবহু অনুকরণ কাম্য। তবে তাওয়াফের মধ্যে দুআ ও যিকরের ভাষা, আরাফাতে যাওয়ার বাহন, অবস্থানের তাবু বা ঘর, দুআ ও যিকরের ভাষা ইত্যাদির ক্ষেত্রে প্রয়োজনে ব্যতিক্রম করা যেতে পারে। যেমন সঠিক মাসনূন সময়ে আরাফাতে পৌঁছানোর জন্য আধুনিক যানবাহন ব্যবহার করা বা আরবীতে মাসনূন যিকর ও দুআর পাশাপাশি আবেগ, ক্রন্দন, মনোযোগ ও অনুধাবনের জন্য মাতৃভাষায় আরাফাতে বা তাওয়াফের মধ্যে তাওবা, ক্ষমা প্রার্থনা ও দুআ করা। বিশেষত যখন আমরা বুঝতে পারি যে, আধুনিক যানবাহন বা অনারবভাষা ব্যবহার করতে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেন নি। তাঁর সময়ে এর প্রয়োজন বা সুযোগ ছিল না বলেই তিনি তা বর্জন করেছেন।

যারা মনে করেন যে, জুম'আর খুত্বার মূল ইবাদত 'যিক্র' বা 'ওয়ায', অর্থাৎ মুসল্লীগণকে আল্লাহর কথা স্মরণ করানো, ভাষা উপকরণ মাত্র, তাঁরা প্রয়োজনে উপকরণের পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। তাঁরা প্রথম পদ্ধতিটি গ্রহণ করেছেন এবং মুসাল্লীদের বুঝানোর জন্য আরবী খুতবার মধ্যে প্রয়োজন অনুসারে অনারব ভাষা ব্যবহার করতে বলেছেন। এ পদ্ধতির বিরুদ্ধে অভিযোগ একটিই, তা হলো খুতবার মধ্যে অনারব ভাষা ব্যবহার করা, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণ কখনোই করেন নি। আমরা দেখেছি যে, এ অভিযোগটি তত জোরালো নয়। বিশেষত এরা বলেন যে, আমরা তো সুন্নাত অনুসারে আরবী হামদ, সানা, তাশাহ্হুদ, কুরআন পাঠ ইত্যাদি সবই করছি। শুধু ওয়াযের সুন্নাত ভালভাবে আদায়ের জন্য মাতৃভাষা ব্যবহার করছি।

অন্য অনেক আলিম খুত্বার মধ্যে আরবী ভাষা ব্যবহার ইবাদতের অংশ বলে মনে করেছেন। বিশেষত তারা মনে করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীগণ প্রয়োজন বা সুযোগ থাকা সত্ত্বেও খুতবায় অনারব ভাষা ব্যবহার করেন নি। এজন্য তাঁরা মূল খুত্বাকে আরবীতে রাখার পক্ষে। তবে আল্লাহর বিধিবিধান স্মরণ করানো, উপদেশ প্রদান ও গ্রহণের সুন্নাত আদায়ের জন্য তাঁরা আরবী খুত্বার আগে অতিরিক্ত অনুবাদ বা আলোচনা অনুমোদন করেছেন। এ পদ্ধতির বিরুদ্ধে নিম্নের অভিযোগগুলি উত্থাপন করা হয়:

(১) এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিয়মিত সুন্নাতের ব্যতিক্রম করা হয়। তিনি বা সাহাবীগণ কখনো আযানের আগে আলোচনা করেন নি।

(২) আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (র) বলেন:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى نَهَى عَنْ التَّحَلُّقِ قَبْلَ الصَّلاَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

"রাসূলুল্লাহ ﷺ জুমুআর দিনে সালাতের আগে গোলগোল হয়ে বৈঠক করতে নিষেধ করেছেন।"[১]

এ থেকে বুঝা যায় যে, জুমুআর দিনে সালাতের আগে ইলম বা আলোচনার মাজলিস করা নিষিদ্ধ।

---

[১] আবূ দাউদ, আস-সুনান ১/২৮৩; নাসাঈ, আস-সুনান ২/৪৭। হাদীসটি হাসান।

(৩) অনেক আলিম জুমুআর দিন সালাতের আগে ওয়ায আলোচনা নিষেধ করেছেন।

এ অভিযোগগুলি থেকে বাঁচার জন্য অনেকে জুমুআর দিনে জুমুআর ওয়াক্ত হওয়ার পরেও প্রথম আযান না দিয়ে আলোচনা করেন। এরপর প্রথম আযান দেন এরপর দ্বিতীয় আযান দিয়ে আরবী খুতবা বলেন। বস্তুত জুমুআর ওয়াক্ত হওয়ার পরেও আযান দেরী করাতে মাসআলা পরিবর্তন হয় না। এতে বরং একটি নতুন সমস্যা তৈরি হয়, তা হলো ওয়াক্ত হওয়ার পরেও দেরী করে আযান দেওয়ার রীতি।

প্রকৃত বিষয় হলো, খুতবার মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মূল সুন্নাত আবেগময় ওয়ায-এর সুন্নাত আদায়ের প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে এ তিনটি অভিযোগ মোটেও ধর্তব্য নয়। জুমুআর দিনে ইমামের আলোচনা ও ওয়ায ভালভাবে শোনার জন্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ ইমামের আলোচনার আগে অন্য কারো জন্য ইলমের হালকা করতে নিষেধ করেছেন। পরবর্তী যে সকল ফকীহ খুতবার আগে আলোচনা নিষেধ করেছেন তাদের উদ্দেশ্যও একই। ইমামের জন্য খুতবার বিষয়বস্তু বুঝাতে বা অন্য কোনো কথা বলতে মুক্তাদীদের সামনে দাঁড়াতে বা বসতে হাদীসে নিষেধ করা হয় নি।[১]

জুমুআর খুতবার আগে মাতৃভাষায় ওয়ায-আলোচনা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের সুন্নাতের ব্যতিক্রম। আবার মুক্তাদীদের কেউ বুঝে না এরূপ অবোধ্য আরবী খুতবা দেওয়াও নিঃসন্দেহে সুন্নাতের ব্যতিক্রম। আবার খুতবার মধ্যে অনারব ভাষা ব্যবহারও বাহ্যত সুন্নাতের ব্যতিক্রম। পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে আমরা নিশ্চিতরূপে বুঝতে পারি যে, কুরআন ও সুন্নাতের নির্দেশনা অনুসারে জুমুআর খুতবার মূল ইবাদত হলো "যিক্র" বা "ওয়ায"। এ ইবাদতটি মাসনূনভাবে পালন করতে আমাদেরকে দুটি বিকল্পের একটি গ্রহণ করতে হবে: মূল আরবী খুতবার মধ্যে মাতৃভাষা ব্যবহার করতে হবে, অথবা আরবী খুতবার পূর্বে মাতৃভাষায় ওয়ায করতে হবে। আমার কাছে প্রতীয়মান হয় যে, প্রথম পদ্ধতিটিই অপেক্ষাকৃত বেশি গ্রহণযোগ্য। তবে যেহেতু ভারতীয় উপমহাদেশের অধিকাংশ আলিম খুতবার মধ্যে অনারব ভাষা ব্যবহার করতে আপত্তি করেছেন সেহেতু আমি আমার এ গ্রন্থের খুতবাগুলি দ্বিতীয় পদ্ধতিতেই সাজিয়েছি। প্রথমে মাতৃভাষায় বিস্তারিত আলোচনা এবং আযানের পরে দুটি সংক্ষিপ্ত খুতবা।

মুহ্তারাম খতীব সাহেবের জন্য একটি সুখবর। আবূ উমামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

مَنْ غَدَا إِلى المَسْجِد لا يُرِيْدُ إِلاَّ أَنْ يَتَعلَم خَيْرًا أَوْ يُعلِّمَهُ كَانَ لَهُ كَأَجْرِ حَاجٌ تَامًّا حَجَّتَهُ

"যদি কোনো ব্যক্তি সকাল সকাল বা দ্বিপ্রহরের পূর্বে মসজিদে গমন করে, তার গমনের একমাত্র উদ্দেশ্য হয় কোনো ভাল কিছু শিক্ষা করা অথবা শিক্ষা দেওয়া, তবে সেই ব্যক্তি একটি পরিপূর্ণ হজ্জের সাওয়াব লাভ করবে।"[২]

এখানে "গুদওয়া" বলা হয়েছে। গুদওয়া অর্থ দ্বিপ্রহরের পূর্বে গমন করা। মূলত জুমুআর সালাতের জন্যই এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ জুমুআর খুতবার মাধ্যমে মুসল্লীদেরকে কিছু ভাল কথা শিক্ষা দেওয়ার খালিস নিয়্যাতে যদি ইমাম সাহেব মসজিদে গমন করেন এবং যদি ইমাম সাহেবের মুখ থেকে কিছু ভাল কথা শেখার জন্য মুসল্লী মসজিদের গমন করেন তবে তারা এ অভাবনীয় পুরস্কার লাভ করবেন। এ শিক্ষাদান ও শিক্ষালাভ যদি খুতবার মধ্যে হয় তাহলে তাহলে সোনায় সোহাগা। কিন্তু খুতবা প্রসঙ্গে মূল আরবী খুতবার আগে এরূপ শিক্ষাদান ও শিক্ষালাভ হলে তাতে এ সাওয়াব লাভ হবে না বা কম হবে বলে মনে করার কোনো ভিত্তি নেই। আমরা বিশ্বাস করি, যে কোনো ইমাম ও মুসল্লী খুতবার মধ্যে বা খুতবার পূর্বে এরূপ শিক্ষাদান বা শিক্ষালাভের খালিস উদ্দেশ্যে মসজিদে গেলে এ মহান সাওয়াব লাভ করবেন। এ মহান সাওয়াব অর্জনের জন্য উপাদান ও উপকরণ তাঁদের সামনে পেশ করতেই আমার এ গ্রন্থ। মহান আল্লাহর দরবারে পেশ করার মত কোনো নেক আমল আমার নেই। এ সামান্য খিদমতের কারণে আল্লাহ দয়া করে আমাকে ক্ষমা করবেন এবং সম্মানিত ইমাম, খতীব ও মুসল্লীগণ তাদের অনুপস্থিত এ ভাইয়ের জন্য দুআ করবেন এটিই আমার বড় আশা। আল্লাহ দয়া করে কবুল করুন। আমীন।

وصلى الله على نبيه محمد وآله وأصحابه آجمعين والحمد لله رب العالمين.

---

[১] আযীম আবাদী, আউনুল মাবুদ ৩/২৯৪; আবুল হাসান সিনদী, হাশিয়াতুস সিনদী আলান নাসাঈ ২/৪৭।

[২] মুনযিরী, আত-তারগীব ১/৫৯; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১২৩; আলবানী, সহীহুত তারগীব ১/২০। হাদীসটি হাসান।

খুতবাতুল হাজাত

ইবনু আব্বাস (রা) বলেন: দিমাদ নামে আযদ শানুআ গোত্রের এক ব্যক্তি মক্কায় আগমন করে। সে বাতাস লাগা, যাদু-টোনা, বদনযর ইত্যাদির ঝাড়ফুঁক করত। সে মক্কার অর্বাচীনদের বলতে শোনে যে, মুহাম্মাদ (ﷺ) পাগল। তখন সে বলে, আমি যদি এ লোকটিকে দেখতে পারতাম তাহলে হয়ত আল্লাহ আমার হাতে লোকটিকে সুস্থ করে তুলতেন। এরপর দিমাদ মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর সাথে সাক্ষাত করে। সে বলে, মুহাম্মাদ, আমি বদ-বাতাসের ঝাড়ফুঁক করি এবং আল্লাহ আমার হাতে যাকে ইচ্ছা তাকে সুস্থ করেন। আমি কি তোমার চিকিৎসা করব? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ

"নিশ্চয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আমরা তাঁর প্রশংসা করছি এবং তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করছি। আল্লাহ যাকে হিদায়াত করেন তাকে কেউ বিভ্রান্ত করতে পারে না। আর আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন তাকে কেউ হিদায়াত করতে পারে না। এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবূদ নেই। তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই, এবং মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও তাঁর রাসূল। অতঃপর।"

কথাগুলি শুনেই দিমাদ বলে, তুমি কথাগুলি আমাকে আবার শুনাও। এভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ কথাগুলি তাকে তিনবার শুনান। তখন সে বলে: আমি গণক, যাদুকর ও কবিদের কথা শুনেছি, কিন্তু কখনো তোমার এ কথাগুলির মত কথা শুনি নি। এগুলি সমূদ্রের গভীরে পৌঁছে গিয়েছে। এরপর সে বলে: তুমি তোমার হাত বাড়িয়ে দাও, আমি ইসলামের বাইয়াত গ্রহণ করব, একথা বলে সে ইসলাম গ্রহণ করে।[1]

আবূ মূসা আশআরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে খুতবাতুল হাজাত নিম্নরূপ শিক্ষা দিতেন:

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ [وَنَسْتَغْفِرُهُ] وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

"নিশ্চয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আমরা তাঁর প্রশংসা করছি এবং তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করছি এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমরা আমাদের নফসের অকল্যাণ থেকে এবং আমাদের খারাপ কর্মগুলি থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহ যাকে হিদায়াত করেন তাকে কেউ বিভ্রান্ত করতে পারে না। আর আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন তাকে কেউ হিদায়াত করতে পারে না। এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবূদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই, এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও তাঁর রাসূল।" তিনি বলতেন,

فإن شئت أن تصل خطبتك بآي من القرآن تقول ..... أما بعد ثم تكلم بحاجتك

"তুমি যদি তোমার খুতবার সাথে কুরআনের কয়েকটি আয়াত সংযুক্ত করতে চাও তাহলে বলবে: (সূরা আল ইমরানের ১০২ আয়াত, সূরা নিসার ১ আয়াত ও সূরা আহযাবের ৭০-৭১ আয়াত)। এরপর তুমি বলবে, "আম্মা বা'দু": অতঃপর, এরপর তুমি তোমার প্রয়োজন বলবে।"[2]

---

[1] মুসলিম, আস-সহীহ ২/৫৯৩।

[2] আবূ ইয়ালা, আল-মুসনাদ ১৩/১৮৫-১৮৭। হাদীসটির সনদ সহীহ।

ইবনু মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে সালাতের খুতবা ও হাজতের খুতবা শিক্ষা দেন। সালাতের খুতবা হলোঃ আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ....। আর হাজতের খুতবা নিম্নরূপ শিক্ষা দেন। অন্য বর্ণনায় ইবনু মাসউদ বলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বিবাহ ও অন্যান্য প্রয়োজনের জন্য বক্তব্য পেশের বা হাজতের খুতবা নিম্নরূপ শিক্ষা দেনঃ (ইন্নাল হাম্‌দা.... থেকে মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রাসূলুহু পর্যন্ত)। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ এরপর তুমি তোমার খুতবার সাথে কুরআনের তিনটি আয়াত সংযুক্ত করবে (পূর্বোক্ত আয়াতগুলি)।[১]

সহীহ হাদীসগুলিতে খুতবাতুল হাজাত এরূপই বর্ণিত হয়েছে। কোনো কোনো বর্ণনায় বাক্যগুলির মধ্যে সামান্য হেরফের রয়েছে। এ সকল হাদীস থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, সকল প্রকার বক্তব্য, খুতবা, দরস, আলোচনা বা ওয়াযের আগে এ কথাগুলি দিয়ে বক্তব্য শুরু করা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। বিভিন্ন হাদীস থেকে এ কথা সুস্পষ্ট যে, তিনি সকল বক্তব্যের আগে সর্বদা এ কথাগুলি দিয়ে বক্তব্য শুরু করতেন। সাহাবীদেরকেও এরূপ শিক্ষা দিয়েছেন। সালাতের মধ্যে তাশাহ্‌হূদ বা "আত্তায়্যিাতু"-র মতই এগুলি তিনি শিক্ষা দিয়েছেন। কাজেই আমাদের সকলেরই উচিত সাধ্যমত আমাদের সকল বক্তব্যের শুরতে এগুলি বলা। আরবী বাক্যগুলি মুখস্থ বলা সম্ভব না হলে অর্থ অন্তত বাংলায় বলা যেতে পারে। হাদীস থেকে স্পষ্ট যে, এটি নিয়মিত পালনের সুন্নাত। এ সুন্নাত পালন ও জীবন্ত করার মধ্যে সাওয়াব, বরকত ও অনেক ভাল প্রভাব রয়েছে।

উপরের হাদীসগুলি থেকে আমরা দেখি যে, এগুলির দুটি পর্যায় রয়েছে, প্রথম পর্যায় হলো আল্লাহর প্রশংসা, গুণবর্ণনা, সাহায্য ও আশ্রয় প্রার্থনা-মূলক বাক্যগুলির সাথে শাহাদাতাইন বলা। দ্বিতীয় পর্যায় হলো এরপর কুরআনের আয়াতগুলি বলা। সর্বদা দ্বিতীয় পর্যায়টি রক্ষা করতে না পারলেও ন্যূনতম প্রথম পর্যাটি রক্ষা করতে সর্বদা চেষ্ট করতে হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ

كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشَهُّدٌ فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ

"যে খুতবা বা বক্তব্য-ওয়াযের শুরুতে তাশাহ্‌হূদ নেই তা কর্তিত হস্তের ন্যায়।"[২]

এখানে তাশাহ্‌হূদ বলতে শুধু "শাহাদাতাইন" বুঝানো হয় নি, বরং হামদ, সানা ও তাশাহ্‌হূদের সম্মিলিতি সে পদ্ধতি রাসূলুল্লাহ ﷺ শিখিয়েছেন তাই এখানে উদ্দেশ্য। যেমন সালাতের মধ্যে তাশাহ্‌হূদ বলতে আল্লাহর প্রশংসা ও গুণবর্ণনা সহ শাহাদাতাইন বলার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শেখানো বাক্যগুলি বুঝানো হয়।

সাহাবী, তাবিয়ী ও পূর্ববর্তী যুগের আলিম ও বুজুর্গগণ তাদের সকল দরস, ওয়ায ও বক্তব্যের শুরুতে এ কথাগুলি বলতেন। আশা করি আমাদের আলিম, খতিব, ওয়ায়িয ও 'দায়ী'গণ এ সুন্নাতটি জীবিত করবেন এবং তাঁদের দরস, তাদরীস, ওয়ায, খুতবা ও সকল বক্তব্য এ মাসনূন বাক্যগুলি বলে শুরু করবেন। বিবাহ অনুষ্ঠান, দরস, ওয়ায বা বক্তব্যের শুরুতে এ মাসনূন খুতবাটি বলার মধ্যে সুন্নাত পালন ও জীবিত করার সাওয়াব ছাড়াও সুন্নাতের কারণে বিশেষ বরকত ও প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। আমাদের এ খুতবা সংকলনের প্রতিটি আরবী খুতবার শুরুতে এ মাসনূন বাক্যগুলি লেখা হয়েছে। বাংলা আলোচনার শুরুতে শুধু সংক্ষেপে "নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লী আলা রাসূলিহীল কারীম" লেখা হয়েছে। তবে মুহতারাম খতীবগণের প্রতি আমার অনুরোধ হলো, উপর্যুক্ত মাসনূন তাশাহ্‌হূদ বা খুতবাতুল হাজাতের প্রথম অংশটুকু অন্তত মুখস্থ করে নেবেন এবং প্রতি জুমুআর বাংলা আলোচনা এ মাসনূন বাক্যগুলি দিয়ে শুরু করবেন। আল্লাহ আমাদেরকে সুন্নাতের অনুসরণ ও জীবনদানের তাওফীক দিন। আমীন।

---

[১] ইবনু মাজাহ, আস-সুনান ১/৬০৯। আলবান, সহীহ সুনানি ইবন মাজাহ ২/১৩৪। হাদীসটি সহীহ।

[২] তিরমিযী, আস-সুনান ৩/৪১৪। হাদীসটি সহীহ।

মুহাররাম মাসের ১ম খুতবা: হিজরী নববর্ষ ও আশূরা

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লী আলা রাসূলিহীল কারীম। আম্মা বাদ,

সম্মানিত উপস্থিতি,

আজ ...... হিজরী সালের মুহার্রাম মাসের প্রথম খুতবা। আজকের খুতবায় আমরা হিজরী নববর্ষ ও আশূরা সম্পর্কে আলোচনা করব। কিন্তু তার আগে আমরা এ সপ্তাহের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসগুলির বিষয়ে সংক্ষেপ আলোকপাত করি।

হাযেরীন, আজ ইংরেজী ..... মাসের ..... তারিখ। এ সপ্তাহের দিবসগুলির মধ্যে রয়েছে ..... ।

....

মুহতারাম হাযেরীন, মুহার্রাম মাস ইসলামী পঞ্জিকার প্রথম মাস। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময়ে ও তার পূর্বে রোমান, পারসিয়ান ও অন্যান্য জাতির মধ্যে তাদের নিজস্ব ক্যালেন্ডার বা পঞ্জিকা প্রচলিত ছিল। আরবদের মধ্যে কোনো নির্ধারিত বর্ষ গণনা পদ্ধতি ছিল না। বিভিন্ন ঘটনার উপর নির্ভর করে তারিখ বলা হতো। যেমন, অমুক ঘটনার অত বৎসর পরে...। খলীফা উমারের (রা) খিলাফতের তৃতীয় বা চতুর্থ বৎসর আবূ মূসা আশআরী (রা) তাঁকে পত্র লিখে জানান যে, আপনার সরকারী ফরমানগুলিতে সন-তারিখ না থাকায় প্রশাসনিক জটিলতা দেখা দেয়; এজন্য একটি বর্ষপঞ্জি ব্যবহার প্রয়োজন। খলীফা উমার (রা) সাহাবীগণকে একত্রিত করে পরামর্শ চান। কেউ কেউ রোম বা পারস্যের পঞ্জিকা ব্যবহার করতে পরামর্শ দেন। কিন্তু অন্যরা তা অপছন্দ করেন এবং মুসলিমদের জন্য নিজস্ব পঞ্জিকার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। এ বিষয়ে কেউ কেউ পরামর্শ দেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মীলাদ বা জন্ম থেকে সাল গণনা শুরু করা হোক। কেউ কেউ তাঁর নুবুওয়াত থেকে, কেউ কেউ তাঁর হিজরত থেকে এবং কেউ কেউ তাঁর ওফাত থেকে বর্ষ গণনার পরামর্শ দেন। হযরত আলী (রা) হিজরত থেকে সাল গণনার পক্ষে জোরালো পরামর্শ দেন। খলীফা উমার (রা) এ মত সমর্থন করে বলেন যে, হিজরতই হক্ক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যের সূচনা করে; এজন্য আমাদের হিজরত থেকেই সাল গণনা শুরু করা উচিত। অবশেষে সাহাবীগণ হিজরত থেকে সাল গণনার বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

কোন্ মাস থেকে বর্ষ গণনা শুরু করতে হবে সে বিষয়ে পরামর্শ চাওয়া হয়। কেউ কেউ রবিউল আউয়াল মাসকে বৎসরের প্রথম মাস হিসেবে গ্রহণ করার পরামর্শ দেন; কারণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এ মাসেই হিজরত করে মদীনায় আগমন করেন। ১২ই রবিউল আউয়াল তিনি মদীনায় পৌছান। কেউ কেউ রামাদান থেকে বর্ষ শুরুর পরামর্শ দেন; কারণ রামাদান মাসে আল্লাহ কুরআন নাযিল করেছেন। সর্বশেষ তাঁরা মুহার্রাম মাস থেকে বর্ষ শুরুর বিষয়ে একমত হন; কারণ এ মাসটি ৪টি 'হারাম' বা সম্মানিত মাসের একটি। এছাড়া ইসলামের সর্বশেষ রুকন হজ্জ পালন করে মুসলিমগণ এ মাসেই দেশে ফিরেন। হজ্জ পালনকে বৎসরের সর্বশেষ গুরুত্বপূর্ণ কর্ম ধরে মুহার্রাম মাসকে নতুন বৎসরের শুরু বলে গণ্য করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তেকালের প্রায় ৬ বৎসর পরে ১৬ বা ১৭ হিজরী সাল থেকে সাহাবীগণের ঐকমত্যের ভিত্তিতে হিজরী সালগণনা শুরু হয়। যদিও হিজরত রবিউল আউয়াল মাসে সংঘটিত হয়, তবুও দুমাস এগিয়ে, সে বৎসরের মুহার্রাম থেকে বর্ষ গণনা শুরু হয়।[১]

প্রিয় হাযেরীন, অত্যন্ত দুঃখজন বিষয় যে, আমরা বাংলাদেশের অধিকাংশ মুসলিম আমাদের ধর্মীয় এ পঞ্জিকার বিষয়ে কোনোই খোজ রাখি না। এমনকি আজ কত হিজরী সাল তা অধিকাংশ ধার্মিক মুসলিম

---

[১] তাবারী, আত-তারীখ ২/৩-৪; ইবনুল জাওযী, আল-মনতাযিম ২/১।

বলতে পারবেন না। আমরা যে 'ইংরেজি সাল' ব্যবহার করি তা মোটেও 'ইংরেজি' নয়; বরং তা খৃস্টধর্মীয়। যীশুখৃস্টের প্রায় ১৬০০ বৎসর পরে ১৫৮২ খৃস্টাব্দে পোপ অষ্টম গ্রেগরী তৎকালে প্রচলিত প্রাচীন রোমান জুলিয়ান ক্যালেন্ডার (Julian calendar) সংশোধন করে যীশুখৃস্টের জন্মকে সাল গণনার শুরু ধরে এ পঞ্জিকা প্রচলন করেন, যা গ্রেগরীয়ান ক্যালেন্ডার (Gregorian calendar) ও খৃস্টীয়ান ক্যালেন্ডার (Christian calendar) নামে পরিচিত। যীশুখৃস্টকে প্রভু ও উপাস্য হিসেবে বিশ্বাসের ভিত্তিতে এতে বৎসরকে বলা হয় আন্নো ডোমিনি (*anno domini*) বা এ. ডি. (AD)। এর অর্থ আমাদের প্রভুর বৎসরে (in the year of our Lord)। শুধু জাগতিক প্রয়োজনেই নয়, জীবনের সকল কিছুই আমরা এ খৃস্টধর্মীয় পঞ্জিকা অনুসারে পালন করি। আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করুন ও সঠিক পথে পরিচালিত করুন।

মুহতারাম উপস্থিতি, ইসলামী পঞ্জিকা অনুসারে আমরা একটি নতুন বৎসর শুরু করেছি। নতুনের মধ্যে আমরা পরিবর্তনের আশা ও কামনা অনুভব করে আনন্দিত হই। তবে আমাদের বুঝতে হবে যে, মানুষের জীবনে প্রতিটি দিনই নবজীবন। মহান আল্লাহ বলেন:

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمًّى

"তিনিই রাত্রিকালে তোমাদের মৃত্যু ঘটান এবং দিনে তোমরা যা কর তিনি তা জানেন। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে দিনে পুনরায় জাগিয়ে তোলেন যাতে নির্দিষ্ট মেয়াদ পূর্ণ হয়।[1]

এজন্য রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, প্রতিদিন ভোরে মহান আল্লাহর দরবারে হৃদয় নিংড়ানো কৃতজ্ঞতা ও শুকরিয়া জানিয়ে, পরিবর্তনের আকুতি ও সফলতা ও বরকতের প্রার্থনা করে নতুন জীবনের শুরু করতে হবে। আর প্রতিদিন শয়নের সময় ক্ষমা ও রহমতের প্রার্থনা করে মহান আল্লাহর করুণাময় আয়ত্বে নিজের আত্মাকে সমর্পনের দুআ পাঠের সাথে ঘুমিয়ে পড়তে হবে।

হাযেরীন, আমরা অনেকে নববর্ষের শুভেচ্ছা বা শুভ কামনা জানাই। বস্তুত কামনা বা শুভেচ্ছা নয়, দুআ হলো ইসলামী রীতি। শুভেচ্ছা অর্থ আমাদের মনের ভাল ইচ্ছা। আর মানুষের কামনা বা ইচ্ছার মূল্য কী? মূল্য তো মহান আল্লাহর ইচ্ছার। এজন্য তাঁর দরবারে দুআ করতে হবে নতুন বছরের সফলতার জন্য। এছাড়া অন্তসারশূন্য ইচ্ছা বা কামনা কোনো পরিবর্তন আনে না; বরং পরিবর্তনের সুদৃঢ় সংকল্প, নতুন বছরকে নতুনভাবে গড়ার সুদৃঢ় ইচ্ছা ও কর্মই পরিবর্তন আনে। কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনা থেকে আমরা জানি যে, সৃষ্টির সেবা ও মানুষের উপকারই জাগতিক জীবনে মহান আল্লাহর রহমত ও বরকত লাভের অন্যতম উপায়। অনুরূপভাবে মানুষের ক্ষতি করা বা ব্যক্তি বা সমাজের অধিকার নষ্ট করা আল্লাহর গযব ও শাস্তি লাভের অন্যতম কারণ। আসুন আমরা সকলে মহান আল্লাহর নির্দেশ মত তাঁর ইবাদাত ও আনুগত্যের মাধ্যমে, মানুষের অধিকার আদায় ও ক্ষতি থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে নতুন বছরের সূচনা করি। মহান আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন।

সম্মানিত মুসল্লীবৃন্দ, মুহার্‌রাম মাস "হারাম" মাসগুলির অন্যতম। ইসলামী শরীয়তে যুলকাদ, যুলহাজ্জ, মুহার্‌রাম ও রজব- এ ৪টি মাসকে বিশেষ মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে। এগুলি 'হারাম' অর্থাৎ 'নিষিদ্ধ' বা 'সম্মানিত' মাস বলে পরিচিত। এ সকল মাসে সকল প্রকার পাপ ও অন্যায় থেকে বিরত থাকতে ও অধিক নেক আমল করতে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে কুরআন ও হাদীসে। এ ৪ মাসের মধ্যে মুহার্‌রাম মাসকে বিশেষভাবে মর্যাদা প্রদান করে একে 'আল্লাহর মাস' বলে আখ্যায়িত করেছেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)। হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, মুহার্‌রাম মাসের নফল রোযার সাওয়াব অন্য সকল নফল রোযার সাওয়াবের চেয়ে বেশি। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

---

[1] সূরা আনআম: ৬০ আয়াত।

أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ صِيَامُ شَهْرِ اللَّهِ الْمُحَرَّمِ

"রামাদানের পরে সবচেয়ে বেশি ফযীলতের সিয়াম হলো আল্লাহর মাস মুহার্‌রামের সিয়াম।"[১]

সম্মানিত হাযেরীন, মুহার্‌রাম মাসের ১০ তারিখকে 'আশূরা' বলা হয়। বিশেষভাবে এ দিনটির সিয়াম পালনের উৎসাহ ও নির্দেশনা দিয়েছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ। জাহিলী যুগে মক্কার মানুষেরা আশূরার দিন সিয়াম পালন করত এবং কাবা ঘরের গেলাফ পরিবর্তন করত। হিজরতের পূর্বে মক্কায় অবস্থান কালে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেও এ দিন সিয়াম পালন করতেন। মদীনায় হিজরতের পরে তিনি এ দিনে সিয়াম পালনের জন্য মুসলিমদেরকে নির্দেশ দেন। এ বিষয়ে ইবনু আব্বাস (রা) বলেন:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَوَجَدَ الْيَهُودَ صِيَامًا يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي تَصُومُونَهُ فَقَالُوا هَذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ أَنْجَى اللَّهُ فِيهِ مُوسَى وَقَوْمَهُ وَغَرَّقَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ فَصَامَهُ مُوسَى شُكْرًا فَنَحْنُ نَصُومُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ فَصَامَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ

"রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় এসে দেখেন যে, ইহূদীরা আশূরার দিনে সিয়াম পালন করে। তিনি তাদেরকে বলেন, এ দিনটির বিষয় কি যে তোমরা এ দিনে সিয়াম পালন কর? তারা বলেন, এটি একটি মহান দিন। এ দিনে আল্লাহ মূসা (আ) ও তার জাতিকে পরিত্রান দান করেন এবং ফিরআউন ও তার জাতিকে নিমজ্জিত করেন। এজন্য মূসা কৃতজ্ঞতা-স্বরূপ এ দিন সিয়াম পালন করেন। তাই আমরা এ দিন সিয়াম পালন করি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, মূসার (আ) বিষয়ে আমাদের অধিকার বেশি এরপর তিনি এ দিবস সিয়াম পালন করেন এবং সিয়াম পালন করতে নির্দেশ প্রদান করেন।"[২]

রামাদানের সিয়াম ফরয হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আশূরার সিয়াম ফরয ছিল। রামাদানের সিয়াম ফরয হওয়ার পর আশূরার সিয়াম মুস্তাহাব পর্যায়ের ঐচ্ছিক ইবাদাত বলে গণ্য করা হয়। তা পালন না করলে কোনো গোনাহ হবে না, তবে পালন করলে রয়েছে অফুরন্ত সাওয়াব। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ

"আমি আশা করি, আশূরার সিয়াম-এর কারণে আল্লাহ পূর্ববর্তী বৎসরের কাফ্‌ফারা করবেন।"[৩]

হাযেরীন, অন্য একটি কারণে 'আশূরা' মুসলিম উম্মাহর মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, তা হলো কারবালার ঘটনা। অনেকে 'আশূরা' বলতে কারবালার ঘটনাই বুঝেন, যদিও ইসলামী শরীয়তে আশূরার সিয়াম বা ফযীলতের সাথে কারবালার ঘটনার কোনো সম্পর্ক নেই। তবে ঐতিহাসিক ঘটনা হিসাবে কারবালার ঘটনা পর্যালোচনা করা আমাদের জন্য অতীব প্রয়োজন। উম্মাতের জন্য এ ঘটনা ছিল অত্যন্ত হৃদয় বিদারক বেদনাদায়ক ঘটনা। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাতের মাত্র ৫০ বৎসর পরে ৬১ হিজরী সালের মুহার্‌রাম মাসের ১০ তারিখ শুক্রবার ইরাকের কারবালা নামক স্থানে তাঁরই উম্মাতের কিছু মানুষের হাতে নির্মমভাবে শহীদ হন তাঁরই প্রিয়তম দৌহিত্র হযরত হুসাইন ইবনু আলী (রা)। এ ঘটনা মুসলিম উম্মাহর মধ্যে চিরস্থায়ী বিভক্তি ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে। অনেক মিথ্যা ও ভিত্তিহীন কাহিনী এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুসলিম উম্মার মধ্যে ছড়ানো হয়েছে। যেগুলির বিস্তারিত আলোচনা এ খুতবার

---

[১] মুসলিম, আস-সহীহ ২/৮৬১।

[২] বুখারী, আস-সহীহ, ২/৭০৪, ৪/১৭২২; মুসলিম, আস-সহীহ ২/৭৯৬।

[৩] মুসলিম, আস-সহীহ ২/৮১৮।

পরিসরে সম্ভব নয়। এখানে আমরা নির্ভরযোগ্য প্রাচীন ইতিহাসগ্রন্থের আলোকে ইমাম হুসাইনের শাহাদতের ঘটনা সংক্ষেপে আলোচনা করব। তার আগে আমরা এর প্রেক্ষাপট বুঝতে চেষ্টা করব।

সম্মানিত উপস্থিতি, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আগমনের সময় সমগ্র বিশ্বের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ছিল মূলত বংশতান্ত্রিক। রাষ্ট্রের মালিক রাজা। তার অন্যান্য সম্পদের মতই রাষ্ট্রের মালিকানাও লাভ করবে তার বংশধরেরা। রাজ্যের সকল সম্পদ-এর মত জনগণও রাজার মালিকানাধীন। রাজা নির্বাচন বা রাজ্যপরিচালনা বিষয়ে তাদের কোনো মতামত প্রকাশের সুযোগ বা অধিকার নেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বপ্রথম একটি আধুনিক জনগণতান্ত্রিক পরামর্শ-ভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। এ ব্যবস্থার দুটি বিশেষ দিক ছিল: (১) রাজা ও প্রজার সম্পর্ক মালিক ও অধীনস্থের নয়, বরং মালিক ও ম্যানেজারের। তবে মালিক রাজা নন। রাষ্ট্রের মালিক জনগণ। রাজা তাদের খলীফা বা প্রতিনিধি বা ম্যানেজার হিসেবে তা পরিচালনা করবেন। জনগণই তাকে মনোনিত করবেন এবং জনগণ তাকে সংশোধন বা অপসারন করবেন। (২) রাষ্ট্রপ্রধান নির্ধারণ করা একটি জাগতিক কর্ম এবং তা জনগণের কর্ম। জনগণের পরামর্শের ভিত্তিতে তা সম্পন্ন হবে। পরামর্শের ধরন নির্ধারিত নয়। যুগ, দেশ ও জাতির অবস্থা অনুসারে তা পরিবর্তিত হতে পারে।

এ ব্যবস্থার আওতায় রাসূলুল্লাহ ﷺ কাউকে মনোনিত না করে উম্মাতকে সরাসরি নির্বাচনের মুখোমুখি রেখে যান। আবূ বকর (রা) নেতৃবৃন্দের সাথে পরামর্শক্রমে উমারকে (রা) পরবর্তী শাসক হিসেবে মনোনয়ন দিয়ে যান। উমার (রা) ৬ জনের একটি কমিটিকে মনোনয়ন দেন, যারা জনগণের পরামর্শের ভিত্তিতে তাঁদের মধ্য থেকে উসমানকে (রা) মনোনয়ন দেন। উসমান (রা)-এর শাহাদতের পরে মদীনার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ পরামর্শের মাধ্যমে আলী (রা)-কে শাসক মনোনিত করেন। আলী (রা) তাঁর ইন্তেকালের পূর্বে তাঁর পুত্র হাসান (রা)-কে পরবর্তী শাসক হিসেবে মনোনয়ন দেন।

৪০ হিজরীর রামাদান মাসে আলীর (রা) ওফাতের পর হাসান (রা) খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। গৃহযুদ্ধ বন্ধ করার জন্য ৬ মাস পরে তিনি মুআবিয়ার (রা) পক্ষে খিলাফতের দায়িত্ব পরিত্যাগ করেন এবং মুআবিয়া (রা) সর্বসম্মতভাবে খলীফা হন। ২০ বৎসর সুষ্ঠ রাষ্ট্রপরিচালনার পর ৬০ হিজরী সালে তিনি ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুর পূর্বে রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃবৃন্দের পরামর্শক্রমে তিনি তাঁর পুত্র ইয়াযিদকে পরবর্তী শাসক হিসেবে মনোনয়ন দেন। তাঁর মৃত্যুর পরে ইয়াযিদ খিলাফতের দায়িত্ব দাবি করলে তৎকালীন মুসলিম রাষ্ট্রের অধিকাংশ এলাকার মানুষ তা মেনে নেন। পক্ষান্তরে মদীনার অনেক মানুষ, ইরাকের মানুষ এবং বিশেষত কুফার মানুষেরা তা মানতে অস্বীকার করেন।

কুফার মানুষেরা আলীর (রা) দ্বিতীয় পুত্র ইমাম হুসাইনকে (রা) খলীফা হিসেবে গ্রহণ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। এ সময়ে ইমাম হুসাইন (রা) মদীনায় অবস্থান করছিলেন। এরপর তিনি মদীনা থেকে মক্কায় আগমন করেন। কুফার লক্ষাধিক মানুষ তাঁকে খলীফা হিসাবে বাইয়াত করে পত্র প্রেরণ করে। তারা দাবি করে যে, সুন্নাত পুনরুজ্জীবিত করতে ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে অবিলম্বে তাঁর দায়িত্ব গ্রহণ করা প্রয়োজন। মদীনা ও মক্কায় অবস্থানরত সাহাবীগণ ও ইমাম হুসাইনের প্রিয়জনেরা তাকে কুফায় যেতে নিষেধ করেন। তাঁরা আশঙ্কা করছিলেন যে, ইয়াযিদের পক্ষ থেকে বাধা আসলে ইরাকবাসীরা হুসাইনের পিছন থেকে সরে যাবে। সবশেষে হুসাইন (রা) কুফা গমনের সিদ্ধান্ত নেন। তিনি তাঁর পরিবারের ১৯ জন সদস্যসহ প্রায় ৫০ জন সঙ্গী নিয়ে কুফায় রওয়ানা হন।

ইয়াযিদের নিকট এ খবর পৌঁছালে তিনি কুফার গভর্নর নু'মান ইবনু বাশীর (রা)-কে পদচ্যুত করে বসরার গভর্নর উবাইদুল্লাহ ইবনু যিয়াদকে কুফার দায়িত্ব প্রদান করেন। তিনি তাকে নির্দেশ দেন

অবিলম্বে কুফায় যেয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করতে এবং হুসাইন যেন কুফায় প্রবেশ করতে না পারেন সে ব্যবস্থা করতে। উবাইদুল্লাহ কুফায় পৌঁছে কঠোর হস্তে কুফাবাসীকে দমন করে। এরপর ৪ হাজার যোদ্ধার এক বাহিনী প্রেরণ করে হুসাইনকে (রা) প্রতিরোধ করতে। উবাইদুল্লাহর বাহিনী হুসাইনকে কারবালার প্রান্তরে অবরোধ করে। হুসাইন (রা) তাদেরকে বলেন, আমি তো যুদ্ধ করতে আসি নি। তোমরা আমাকে ডেকেছ বলেই আমি এসেছি। এখন তোমরা কুফাবাসীরাই তোমাদের বাইয়াত ও প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করেছ। তাহলে আমাদেরকে ছেড়ে দাও আমরা মদীনায় ফিরে যাই, অথবা সীমান্তে যেয়ে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি, অথবা সরাসরি ইয়াযিদের কাছে যেয়ে তার সাথে বুঝাপড়া করি।

উবাইদুল্লাহ প্রথমে প্রস্তাব মেনে নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু শিমার নামক তার এক সহচর বলে, যদি হুসাইনকে বাগে পেয়েও তুমি তাকে হত্যা না করে ছেড়ে দাও তবে তোমার পদোন্নতির সব সুযোগ শেষ হয়ে যাবে। তখন সে হুসাইন (রা)-এর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে এবং তাকে হত্যার নির্দেশ দেয়।

আশূরার দিন সকাল থেকে উবাইদুল্লাহর বাহিনী হুসাইনের সাথীদের উপর আক্রমন চালাতে থাকে। পার্শবর্তী নদী থেকে পানি গ্রহণে তারা তাঁদেরকে বাধা দেয়। তাদের আক্রমনে তাঁর পরিবারে দুগ্ধপোষ্য শিশু, কিশোর ও মহিলাসহ অনেকে নিহত হন। হুসাইন তাঁর পুরুষ সাথীদের নিয়ে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করতে থাকেন। পর্যায়ক্রমে তাঁর সাথীরা সকলেই নিহত হন। তিনি বীর বিক্রমে যুদ্ধ করতে থাকেন। এক পর্যায়ে সিনান নাখয়ী নামক এক ইয়াযিদ-সৈনিক তাকে আঘাত করলে তিনি মাটিতে পড়ে যান। তখন সিনান নিজে বা খাওলী নামক অন্য এক সৈন্য বা শিমার তাঁকে আঘাত করে তাঁর মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাকে শহীদ করে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদ হুসাইনের (রা) মস্তক ও তাঁর পরিবারের জীবিত সদস্যদেরকে দামেশকে ইয়াযিদের নিকট প্রেরণ করে। ইয়াযিদ বাহ্যিক দুঃখ প্রকাশ করে বলে, আমি তো হুসাইনকে কুফা প্রবেশে বাধা দিতে নির্দেশ দিয়েছিলাম, তাকে হত্যা করতে নির্দেশ দিই নি। এরপর সে হুসাইনের পরিবার পরিজনকে মদীনায় প্রেরণ করে।[১]

সম্মানিত মুসল্লীবৃন্দ, কারবালার এ নারকীয় ও হৃদয়বিদারক ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এখন সম্ভব নয়। এ ঘটনার মূল্যায়নে অনেক বিভ্রান্তি রয়েছে। বিশেষত ইসলামের বিশ্বজনীনতা অনুভবে অক্ষম এক শ্রেণীর মানুষ দাবি করেন যে, ইসলাম একটি বংশতান্ত্রিক রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রদান করেছে। এ ব্যবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরে শাসনক্ষমতার অধিকার তাঁর বংশধরদের বা আলী (রা) ও তাঁর বংশধরদের। এরা নিজদেরকে "শিয়া" বা আলীর অনুসারী বলে দাবি করেন। এরা হুসাইনের শাহাদাতের জন্য সাহাবীগণকে দায়ী করে, ঢালাওভাবে সাহাবীগণকে গালি দেয় এবং তাঁদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে। অন্য অনেকে ইয়াযিদের অন্যায়ের জন্য তার পিতা মুআবিয়া (রা)-কে দায়ী করেন এবং দাবি করেন যে, তিনি রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য ইয়াযিদকে মনোনয়ন দিয়েছিলেন।

এ সকল চিন্তা সবই প্রকৃত ইতিহাস এবং কুরআন ও সুন্নাহ সম্পর্কে অজ্ঞতার ফল। কারবালার ঘটনার জন্য কোনো সাহাবীই দায়ী নন। পক্ষান্তরে আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, ইসলামী ব্যবস্থায় পূর্ববর্তী শাসক কাউকে মনোনয়ন না দিয়ে বিষয়টি জনগণের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিতে পারেন। অথবা জনগণের পরামর্শ ও স্বীকৃতির ভিত্তিতে যোগ্য কাউকে মনোনয়ন দিতে পারেন। সবচেয়ে বেশি যোগ্য ব্যক্তিকে মনোনয়ন দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয় নি; কারণ সবচেয়ে যোগ্য নির্ণয়ে সমাজে অকারণ

---

[১] তাবারী, আত-তারীখ ৩/২৯৪-৩০৪; যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা ৩/২৪৫-৩২১।

সংঘাত তৈরি করে। ইসলামে জনগণের পরামর্শ ও স্বীকৃতিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পরামর্শ ও স্বীকৃতি থাকলে নিজ পুত্র বা বংশের কাউকে পরবর্তী শাসক হিসেবে মনোনয়ন দিতে কোনোভাবে নিষেধ করা হয় নি। মূলত বিষয়টি দেশ, কাল ও সমাজের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। মুআবিয়া (রা) ইসলামী ব্যবস্থার ব্যতিক্রম কিছুই করেন নি। ইয়াযিদের অন্যায়ের জন্য তিনি দায়ী নন।

হাযেরীন, অন্য অনেকে মনে করেন, ইমাম হুসাইন বংশতন্ত্র উৎখাতের জন্য অথবা এযিদের জালিম সরকার উৎখাতের জন্য কারবালায় যুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন। এরূপ চিন্তাও কুরআন, সুন্নাহ, সাহাবীগণের কর্মধারা ও কারবালার ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞানের অভাব প্রকাশ করে। বংশতন্ত্রের কারণে কেউই ইয়াযিদের বিরুদ্ধে আপত্তি করেন নি। যারা আপত্তি করেছিলেন তারা তার ব্যক্তিগত যোগ্যতার বিষয় ভেবে আপত্তি করেছিলেন। মুআবিয়া (রা)-এর ওফাতের মাধ্যমে রাষ্ট্রপ্রধানের পদ খালি হয়। মুআবিয়া (রা) জীবিত থাকতেই তার পুত্র ইয়াযিদের মনোনয়ন দেন। কিন্তু এরূপ মনোনয়ন কার্যকর হয় মনোনিত ব্যক্তির ক্ষমতাগ্রহণে নাগরিকদের স্বীকৃতির মাধ্যমে। এ সময়ে অনেকে ইয়াযিদকে মেনে নিয়েছেন। কিন্তু কুফাবাসীরা ইমাম হুসাইনকে রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে বাইয়াত করে তার নেতৃত্বে পরিপূর্ণ সুন্নাত প্রতিষ্ঠা ও অন্যায় দূর করার দাবি জানান। হুসাইন তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে কুফায় যাচ্ছিলেন। ইমাম হুসাইন এযিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বের হন নি। তিনি এ জন্য কোনো সেনাবাহিনীও তৈরি করেন নি। তিনি তার পরিবারের সদস্যদেরকে নিয়ে কুফায় গমন করছিলেন। কুফাবাসীদের বিশ্বাসঘাতকতা প্রকাশ পেলে তিনি মদীনায় ফিরে যাওয়ার প্রস্তাব দেন। কিন্তু ইয়াযিদের বাহিনী তাকে যুদ্ধ করতে বাধ্য করে। তিনি নিজের ও পরিবারের সম্ভ্রম ও অধিকার রক্ষায় যুদ্ধ করে শহীদ হন।

হাযেরীন, শীয়া সম্প্রদায়ের মানুষেরা কারবালার ঘটনার শোক প্রকাশের নামে প্রতি বৎসর আশূরার দিনে শোক, মাতম, তাযিয়া ইত্যাদির আয়োজন করে। এগুলি সবই ইসলাম বিরোধী কর্ম। আলী, ফাতিমা, হাসান, হুসাইন (রা)-সহ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরিবার বা আহলে বাইতকে মহব্বত করা আমাদের ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাদের কষ্টে আমরা ব্যথিত এবং তাদের যারা কষ্ট দিয়েছে তাদের প্রতি আমাদের ঘৃণা অপরিসীম। পাশাপাশি সাহাবীগণের মর্যাদা ও ভালবাসা কুরআন ও হাদীসের নির্দেশ অনুসারে আমাদের ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কাজেই নবী-বংশের ভালবাসার নামে শুধুমাত্র ধারণা বা ইতিহাসের ভিত্তিহীন কাহিনীর উপর নির্ভর করে সাহাবীগণ বা কোনো একজন সাহাবীর প্রতি বিরক্তি প্রকাশ আমাদের ঈমানের জন্য ধ্বংসাত্মক।

হাযেরীন, কারবালার ঘটনার মধ্যে আমাদের জন্য অনেক শিক্ষা রয়েছে। বিস্তারিত আলোচনা আর সম্ভব নয়। তবে আমরা বুঝতে পারি যে, দুনিয়ার সাময়িক জয় বা পরাজয় দিয়ে চূড়ান্ত ফলাফল বিচার করা যায় না। ইয়াযিদের বাহিনী কারবালায় ব্যাহিক বিজয় লাভ করলেও তারা মূলত পরাজিত হয়। হুসাইনের হত্যায় জড়িত প্রতিটি ব্যক্তি কয়েক বছরের মধ্যেই মুখতার সাকাফীর বাহিনীর হাতে নির্মমভাবে নিহত হয়। মাত্র ৪ বছরের মধ্যে ইয়াযিদ মৃত্যু বরণ করে এবং তার পুত্র মুআবিয়াও কয়েক দিনের মধ্যে মৃত্যু বরণ করেন। এরপর আর কোনোদিন তার বংশের কেউ শাসক হয় নি। দুনিয়ার জয়-পরাজয়, সফলতা-ব্যর্থতা, ক্ষমতা বা শক্তি দিয়ে মহান আল্লাহর কবুলিয়্যাত মাপা যায় না। সত্যকে আঁকড়ে ধরা এবং সত্যের পথে সকল বিপদ ও কষ্ট অকাতরে মেনে নেওয়াই মুমিনের দায়িত্ব। মহান আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর সন্তুষ্টির পথে চলার তাওফীক দান করুন। আমীন।

খুতবাতুল ইসলাম

জুমুআর খুতবা ও সমকালীন প্রসঙ্গ

খুতবা অংশ শুরু

প্রতিটি খুতবা ৮ পৃষ্ঠা

প্রথম ৬ পৃষ্ঠা বাংলা আলোচনা, দ্বিতীয় আযানের পূর্বে পাঠের জন্য

শেষের দু পৃষ্ঠা আরবী খুতবা, দ্বিতীয় আযানের পর মিম্বারে দাঁড়িয়ে পাঠের জন্য

সকল জুমুআর সানী খুতবা গ্রন্থের শেষে ৪৭৩-৪৭৪ পৃষ্ঠায়

বিস্তারিত জানতে ভূমিকা পড়ুন

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

أَمَّا بَعْدُ، فَيَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ

السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ صِيَامُ شَهْرِ اللَّهِ الْمُحَرَّمِ.

وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ

بَارَكَ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ فِيْ الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ. وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ. أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَـذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ، فَاسْتَغْفِرُوْهُ وَتُوْبُوْا إِلَيْهِ، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.

মুহার্‌রাম মাসের ২য় খুতবা: আরকানুল ঈমান ও তাওহীদ

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লী আলা রাসূলিহীল কারীম। আম্মা বাদ,

সম্মানিত উপস্থিতি, আজ ...... হিজরী সালের মুহার্‌রাম মাসের দ্বিতীয় খুতবা। আজকের খুতবায় আমরা আরকানুল ঈমান ও তাওহীদ সম্পর্কে আলোচনা করব। কিন্তু তার আগে আমরা এ সপ্তাহের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসগুলির বিষয়ে সংক্ষেপ আলোকপাত করি।

হাযেরীন, আজ ইংরেজী ..... মাসের ..... তারিখ। এ সপ্তাহের দিবসগুলির মধ্যে রয়েছে ..... ।

সম্মানিত উপস্থিতি, মহান আল্লাহ বলেন:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

"পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফেরানোর মধ্যে কোনো পূণ্য নেই। কিন্তু পুণ্য তার যে বিশ্বাস স্থাপন করেছে আল্লাহে, পরকালে, মালাকগণে (ফিরিশতাগণে), গ্রন্থসমূহে এবং নবীগণে, এবং ধন সম্পদের প্রতি মনের টান থাকা সত্ত্বেও আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন-অনাথ, অভাবগ্রস্ত, পথিক, সাহায্যপ্রার্থনাকারিগণকে এবং দাসমুক্তির জন্য অর্থ প্রদান করে, এবং সালাত কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে, প্রতিশ্রুতি দিলে তা পূর্ণ করে এবং অর্থ-সংকটে, দুঃখ ক্লেশে ও সংগ্রাম-সংকটে ধৈর্য ধারণ করে। এরাই প্রকৃত সত্যপরায়ণ এবং এরাই মুত্তাকী।"[১]

এখানে আল্লাহ জানিয়েছেন যে, শুধু আনুষ্ঠানিকতার নাম ইসলাম নয়, প্রাণহীন আনুষ্ঠানিকতায় কোনো পূণ্য নেই। ইসলাম বিশ্বাস ও কর্মের সমন্বয়। এখানে আল্লাহ মুমিনের বিশ্বাসের মৌলিক পাঁচটি বিষয় এবং তার মৌলিক কর্ম ও চরিত্রের বর্ণনা দান করেছেন। কুরআন কারীমে অন্যান্য স্থানে ঈমানের এ পাঁচটি রুকন ছাড়াও ৬ষ্ঠ রুকনের কথা বলা হয়েছে। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ

"ঈমান হলো এই যে, তুমি বিশ্বাস করবে আল্লাহে, তাঁর ফিরিশতাগণে, তাঁর গ্রন্থসমূহে, তাঁর রাসূলগণে এবং পরকালে, এবং বিশ্বাস করবে আল্লাহর পূর্ব নির্ধারণে (ভাগ্যে), তাঁর ভাল এবং মন্দে।"[২]

হাযেরীন, ঈমানের প্রথম রুকন হলো আল্লাহর প্রতি ঈমান। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

هَلْ تَدْرُونَ مَا الإِيمَانُ بِاللَّهِ ... شَهَادَةُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

"তোমরা কি জান যে, আল্লাহর প্রতি ঈমান কী?... এ কথা সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই তিনি একক তাঁর কোনো শরীক নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল।"[৩]

অন্য হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

---

[১] সূরা (২) বাকারা: ১৭৭ আয়াত।
[২] মুসলিম, আস-সহীহ ১/৩৫-৩৬।
[৩] বুখারী, আস-সহীহ ১/২৯, ৪৫, ৪/১৫৮৮, ৬/২৬৫২, ২৭৪৭; মুসলিম, আস-সহীহ ১/৪৭।

بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ- وفي رواية: أَنْ يُوَحَّدَ اللَّهَ- وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ- وفي رواية: وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ- وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَــوْمِ رَمَضَانَ، وفي رواية: صيام رمضان والحج

"ইসলামকে পাঁচটি বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, তা হলো: বিশ্বাসের সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই (অন্য বর্ণনায়: আল্লাহর তাওহীদে বিশ্বাস করা) এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও রাসুল, সালাত কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, রামাদান মাসের সিয়াম (রোযা) পালন করা, বাইতুল্লাহর হজ্জ আদায় করা।"[১]

হাযেরীন, এ সকল আয়াত ও হাদীস থেকে আমরা জানছি যে, আল্লাহর প্রতি ঈমানের অর্থ আল্লাহর তাওহীদে বা একত্বে বিশ্বাস করা। আর আল্লাহর একত্বে বিশ্বাসের অর্থ: আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই বলে বিশ্বাস করা। আমরা এখানে বিষয়টি আলোচনা করব।

তাওহীদ অর্থ 'এক করা', 'এক বানানো', 'একত্রিত করা', 'একত্বের ঘোষণা দেওয়া' বা 'একত্বে বিশ্বাস করা'। কুরআন কারীমের অগণিত বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারি যে, মহান আল্লাহকে এক মানা বা তাঁর একত্বের ঘোষণা দেওয়ার দুটি পর্যায় রয়েছে। প্রথমত রাব্ব বা প্রতিপালক হিসেবে আল্লাহকে এক মানা। একে আরবীতে 'তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ বলা হয়। দ্বিতীয়ত, ইলাহ বা মাবূদ হিসেবে আল্লাহকে এক মানা। একে আরবীতে তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ বলা হয়। আরবের কাফিরগণ প্রথম পর্যায়টি বিশ্বাস করত কিন্তু দ্বিতীয় পর্যায়টি অস্বীকার ও অবিশ্বাস করত। আল্লাহ বলেন:

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَمْ مَنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِــنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلا تَتَّقُونَ

"বল, আসমান এবং জমিন থেকে কে তোমাদেরকে রিযক দান করেন? কে দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তির মালিক? কে মৃত থেকে জীবিতকে নির্গত করেন এবং জীবিত থেকে মৃতকে নির্গত করেন? বিশ্ব পরিচালনা করেন কে? তারা উত্তরে বলবে: আল্লাহ। বল: তাহলে কেন তোমরা আল্লাহকে ভয় করছ না।"[২]

আল্লাহ জাল্লা জালালুহু আরো বলেন:

قُلْ لِمَنِ الأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلا تَذَكَّرُونَ. قُــلْ مَــنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلا تَتَّقُونَ. قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ.

"(কাফিরদেরকে) বল, তোমাদের যদি জ্ঞান থাকে তবে বল, এই পৃথিবী এবং এর মধ্যে যারা রয়েছে তারা কার? তারা বলবে: আল্লাহর। বল, তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না? বল, সপ্ত আকাশের রব্ব-প্রতিপালন ও মহান আরশের রব্ব-প্রতিপালক কে? তারা বলবে: আল্লাহ। বল, তবুও কি তোমরা সাবধান হবে না? বল, তোমরা যদি জান তবে বল, সকল কিছুর সার্বভৌমত্ব ও কর্তৃত্ব কার

[১] বুখারী, আস-সহীহ, ১/১২, ৪/১৬৪১; মুসলিম, আস-সহীহ ১/৪৫।
[২] সূরা (১০) ইউনূস: ৩১ আয়াত।

হাতে? যিনি ত্রাণের ক্ষমতা রাখেন, যার উপর ত্রাণ দাতা বা রক্ষাকর্তা নেই? তারা বলবেঃ আল্লাহ। বল, তবুও তোমরা কেমন করে বিভ্রান্ত হচ্ছ?"[১]

কুরআন কারীমে অনেক স্থানে বিষয়টি বারংবার বিভিন্নভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ সকল আয়াত থেকে আমরা জানতে পারি যে, কাফিরগণ বিশ্বাস করত যে, মহান আল্লাহই বিশ্বের সকল কিছুর একমাত্র স্রষ্টা, প্রতিপালক, বৃষ্টিদাতা, ফসলদাতা, রিয্কদাতা, একক সার্বভৌমত্ব ও সকল ক্ষমতার মালিক, মানুষের সকল শক্তি তাঁর নিয়ন্ত্রণে, তিনি অনিষ্ট চাইলে কেউ তা দূর করতে পারে না এবং তিনি কল্যাণ চাইলে কেউ তা রোধ করতে পারে না। এভাবে তারা রাব্ব বা প্রতিপালক হিসেবে আল্লাহর তাওহীদে বিশ্বাস করত। এ বিশ্বাসের ভিত্তিতে তারা আল্লাহর ইবাদাত করত এবং আল্লাহকে ইলাহ বা মাবূদ হিসেবে বিশ্বাস করত। তবে তারা আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ বা মা'বূদ হিসেবে মানতে অস্বীকার করত। বরং তারা দাবি করত যে, মহান আল্লাহর পাশাপাশি তাঁর খাস কিছু বান্দাও ইবাদাত পাওয়ার যোগ্য। মহান আল্লাহই তাদেরকে শরীক বানিয়েছেন, কিছু ক্ষমতা তাদেরকে দিয়েছেন, তাদের এবং তাদের ইবাদাত করলে তিনি খুশি হন এবং তাঁর নৈকট্য পাওয়া যায়। এদের সুপারিশ তিনি শুনেন। এরূপ বিশ্বাসের ভিত্তিতে তারা আল্লাহর ইবাদতের পাশাপাশি ফিরিশতাগণ, কোনো কোনো নবী-রাসূল, সত্য বা কল্পিত আল্লাহর প্রিয় বান্দা, তাঁদের মুর্তি, স্মৃতিবিজড়িত স্থান, দ্রব্য বা পাথরের ইবাদাত করত।

হাযেরীন, আল্লাহর রুবুবিয়্যাতের তাওহীদের অংশ হলো আল্লাহর নাম ও গুণাবলির তাওহীদ। অর্থাৎ দৃঢ়ভাবে এ বিশ্বাস করা যে, মহান আল্লাহ সকল পূর্ণতার গুণে গুণান্বিত। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বিভিন্ন হাদীসে আল্লাহর বিভিন্ন নাম ও বিশেষণের উল্লেখ করেছেন। এ সকল নাম ও বিশেষণের উপর দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হবে, সকল প্রকার বিকৃতি, অপব্যাখ্যা থেকে মুক্ত থাকতে হবে এবং বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহর কোনো কর্ম, গুণ বা বিশেষণ কোনো সৃষ্টজীবের কর্ম, গুণ বা বিশেষণের মত নয়, তুলনীয় নয় বা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেনঃ

وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"এবং আল্লাহরই নিমিত্ত উত্তম নামসমূহ, তোমরা তাঁকে সে সকল নামেই ডাকবে। যারা তাঁর নামসমূহ বিকৃত করে বা নামসমূহের বিষয়ে বক্রতা অবলম্বন করে তাদেরকে তোমরা বর্জন করবে। শীঘ্রই তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের ফল প্রদান করা হবে।"[২]

হাযেরীন, যেহেতু যুগে যুগে কাফিরগণ রব্ব হিসেবে আল্লাহর একত্ব স্বীকার করত, কিন্তু মাবূদ হিসেবে তার একত্ব অবিশ্বাস করত এজন্য তাওহীদের ব্যাখ্যায় কুরআন ও হাদীসে সর্বদা তাওহীদুল ইবাদাত অর্থাৎ ইলাহ বা মাবূদ হিসেবে আল্লাহর একত্বের সাক্ষ্য দেওয়ার কথাই বলা হয়েছে।

হাযেরীন, ইবাদাত শব্দটি আভিধানিকভাবে 'আবদ' বা 'দাস' শব্দ থেকে গৃহীত। দাসত্ব বলতে 'উবূদিয়্যাত' ও 'ইবাদাত' দুটি শব্দ ব্যবহৃত হয়। উবূদিয়্যাত ব্যবহৃত হয় লৌকিক বা জাগতিক দাসত্বের ক্ষেত্রে। আর 'ইবাদাত' বুঝানো হয় অলৌকিক, অজাগতিক বা অপার্থিব দাসত্বের ক্ষেত্রে। আরবী অভিধানের ভাষাই উবূদিয়্যাত হলো বিনয়-ভক্তি প্রকাশ করা। আর ইবাদাত হলো চূড়ান্ত বিনয়-ভক্তি, অসহায়ত্ব ও মুখাপেক্ষিত্ব প্রকাশ করা। শরীয়তের পরিভাষায় পরিপূর্ণ ভালবাসা, ভক্তি, বিনয় ও

---

[১] সূরা (২৩) মুমিনূনঃ ৮৪-৮৯ আয়াত।
[২] সূরা (৭) আরাফঃ ১৮০ আয়াত।

ভীতির সমন্বিত অবস্থাকে ইবাদাত বলা হয়। যাকে চূড়ান্ত কর্ম-ক্ষমতা ও দয়ার মালিক বলে বিশ্বাস করা হয়, শুধু তার উদ্দেশ্যেই এরূপ চূড়ান্ত ভক্তি প্রকাশ করা হয়।[১]

সকল যুগে সকল দেশের মানুষই জীবন, মৃত্যু ইত্যাদি অতিপরিচিত শব্দের মতই 'ইবাদাত', উপাসনা, worship, veneration ইত্যাদি শব্দের অর্থ স্বাভাবিকভাবেই বুঝে। মানুষ অন্য মানুষের দাস হতে পারে বা দাসত্ব করতে পারে, তবে সে অন্য যে কোনো সত্তার 'ইবাদাত' বা উপাসনা করে না। শুধু মাত্র যার মধ্যে অলৌকিক বা অপার্থিব ক্ষমতা আছে, ইচ্ছা করলেই মঙ্গল করার বা অমঙ্গল করার বা তা রোধ করার অলৌকিক শক্তি বা অতিপ্রাকৃতিক ক্ষমতা আছে বলে বিশ্বাস করে তারই 'ইবাদাত' করে।

হাযেরীন, আরবীতে "ইলাহাহ" শব্দটি "ইবাদাহ" শব্দের সমার্থক।[২] কুরআন কারীমের বিভিন্ন কিরাআত বা পাঠে "ইলাহাত" শব্দটি ইবাদাত শব্দের হুবহু সমার্থক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।[৩] ইলাহ শব্দের অর্থ মাবুদ বা ইবাদাত-কৃত বা উপাস্য। আরবীতে সকল পূজিত, উপাসনাকৃত বা অলৌকিকভাবে ভক্তিকৃত দ্রব্য, ব্যক্তি বা বস্তুকে ইলাহ বলা হয়। এজন্য সূর্যের আরেক নাম ছিল "ইলাহাহ"; কারণ আরবের কিছু মানুষ সূর্যের উপসনা করত।[৪] এভাবে আমরা দেখছি যে, আল্লাহর প্রতি ঈমানের অর্থ হলো, এ বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ ছাড়া ইবাদাত পাওয়ার যোগ্য আর কেউ নেই। তিনিই একমাত্র মাবূদ ও উপাস্য। তাঁর কোনো শরীক নেই। তিনি এক, একক ও অদ্বিতীয়।

হাযেরীন, তাওহীদের এ বিশ্বাসই মুক্তির ও সফলতার একমাত্র পথ। কুরআন কারীমে আমরা দেখি যে, সকল নবীই তাঁর জাতিকে একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করতে এবং অন্য সকল মাবূদের ইবাদাত পরিত্যাগ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। সকল নবীরই দাওয়াত ছিল:

يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ

"হে আমার জাতি, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো মা'বূদ নেই।"[৫]

মহান আল্লাহ কুরআন কারীমে সূরা আম্বিয়া ২৫ নং আয়াতে এরশাদ করেছেন:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا أَنَا فَاعْبُدُونِ

"আপনার আগে আমি যত রাসূলই প্রেরণ করেছি তাদের প্রত্যেকের কাছেই এই ওহী পাঠিয়েছি যে, আমি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই; অতএব আমারই ইবাদাত কর।"

সূরা নাহল ৩৬ নং আয়াতে মহান আল্লাহ এরশাদ করেছেন:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

আমি সকল জাতির কাছে রাসূল বা আমার বাণীবাহক পাঠিয়েছি, যেন তারা আল্লাহর ইবাদাত করে এবং তাগুতকে অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া যা কিছুর ইবাদাত করা হয় সবকিছুকে বর্জন করে।"

হাযেরীন, এভাবে পবিত্র কুরআনে অসংখ্য স্থানে আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু) এ কথা ঘোষণা করা হয়েছে, একমাত্র তাঁরই উপাসনা ইবাদাত করতে এবং অন্য কোন ব্যক্তি বা বস্তুর ইবাদাত-উপসনা সর্বতোভাবে বর্জন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

---

[১] রাগিব ইসপাহানী, আল-মুফরাদাত, পৃ. ৩১৯; ইবনু কাসীর, তাফসীর ১/২৬।

[২] ইবনু মানযূর, লিসানুল আরব ১৩/৪৬৮-৪৬৯; খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা, পৃ. ৭৯-১১৪।

[৩] সূরা আরাফ: ১২৭ আয়াত; তাবারী, তাফসীর (জামিউল বায়ান) ১/৫৪।

[৪] ইবনু ফারিস, মু'জামু মাকাইসিল্লুগাহ ১/১২৭; রাগিব ইসপাহানী, আল-মুফরাদাত, পৃ. ২১।

[৫] সূরা আ'রাফ: ৫৯, ৬৫, ৭৩, ৮৫ আয়াত, সূরা হূদ: ৫০, ৬১, ৮৪ আয়াত, সূরা মুমিনূন: ২৩, ৩২ আয়াত।

তাওহীদের এ বিশ্বাসই ইহকাল ও পরকালে সকল সফলতার চাবিকাঠি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ تُفْلِحُوا

"হে মানুষেরা, তোমরা বল: (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু) তাহলে তোমরা সফলকাম হবে।"[১]

এই বিশ্বাসই পরকালীন মুক্তি ও জান্নাতে প্রবেশের প্রথম শর্ত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

مَنْ شَهِدَ (وفي رواية قَالَ) أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ

"যে ব্যক্তি বলবে বা সাক্ষ্য দেবে যে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু: আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই" সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[২]

مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُوْلُ اللهِ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ

"যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেবে যে "আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল" আল্লাহর তার জন্য জাহান্নাম হারাম করবেন।"[৩]

এ বিশ্বাস শুধু মুখের কথা নয়। এ বিশ্বাস হলো পরিপূর্ণ জ্ঞান, সুদৃঢ় প্রত্যয়, সন্দেহাতীত বিশ্বাস, পরিপূর্ণ সমর্পণ,আনুগত্য ও কর্ম। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কয়েকটি হাদীস শুনুন:

مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ

"যে ব্যক্তি এই সুদৃঢ় প্রত্যয়ের জ্ঞান নিয়ে মৃত্যুবরণ করবে যে আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, সেই ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[৪]

أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ لا يَلْقَى اللَّهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٍّ فِيهِمَا إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, 'আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল', এ দুটি বিষয়ের ঈমানসহ সকল সন্দেহ ও দ্বিধা থেকে মুক্ত হয়ে যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[৫]

فَمَنْ لَقِيتَ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْحَائِطِ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ فَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ

"... যে ব্যক্তি তার অন্তরের সুদৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে এই সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দান করবে।"[৬]

فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের বিশুদ্ধ ইচ্ছা নিয়ে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" বলবে আল্লাহ তার জন্য জাহান্নামের আগুন নিষিদ্ধ করবেন।"[৭]

হাযেরীন, শিরকমুক্ত তাওহীদের বিশুদ্ধ বিশ্বাসই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শাফাআত লাভের একমাত্র

---

[১] ইবনু খুযাইমা, আস-সহীহ ১/৮২; ইবনু হিব্বান, আস-সহীহ ১৪/৫১৮; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৬/২১। হাদীসটি সহীহ।

[২] ইবনু হিব্বান, আস-সহীহ ১/৩৬৪, ৩৯২, হাকিম, আল-মুসতাদরাক ৪/২৭৯; আলবানী, সহীহুল জামি ২/১০৮৩। হাদীসটি সহীহ।

[৩] মুসলিম, আস-সহীহ ১/৫৭।

[৪] মুসলিম, আস-সহীহ ১/৫৫।

[৫] মুসলিম, আস-সহীহ ১/৫৫।

[৬] মুসলিম, আস-সহীহ ১/৬০।

[৭] বুখারী, আস-সহীহ ১/৩৯৭, ৫/২০৬৩, ৬/২৫৪২; মুসলিম, আস-সহীহ ১/৪৫৫।

শর্ত ও পথ। আবু হুরাইরা (রা) প্রশ্ন করেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল, সবচেয়ে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি কে যে কেয়ামতের দিন আপনার শাফাআত লাভে ধন্য হবে?" উত্তরে তিনি বলেনঃ

أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ

"সবচেয়ে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি যে আমার শাফায়াত লাভে ধন্য হবে সে ঐ ব্যক্তি তার অন্তরের বিশুদ্ধতম বিশ্বাস নিয়ে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" "আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই" এ কথা বলেছে।"[১]

হাযেরীন, তাওহীদের বিশ্বাসই সকল মানসিক ও আত্মিক পরাধীনতা থেকে মুক্তি দান করে। এ বিশ্বাস মানুষকে মানবীয় পূর্ণতার শিখরে তুলে দেয় এবং মানুষের মনে এনে দেয় পরিপূর্ণ প্রশান্তি। তাওহীদে বিশ্বাসী ও শিরকে লিপ্ত মানুষের আত্মিক ও মানসিক অবস্থার পার্থক্য বর্ণনা করে আল্লাহ বলেন:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلا رَجُلا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ

"আল্লাহ একটি দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন: এক ব্যক্তির প্রভু অনেক, যারা পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন এবং এক ব্যক্তির প্রভু কেবল একজন; এ দুইজনের অবস্থা কি সমান? প্রশংসা আল্লাহরই নিমিত্ত, কিন্তু এদের অধিকাংশই তা জানেন না।"[২]

এখানে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বোঝানো হয়েছে কিভাবে তাওহীদে বিশ্বাস একজন মানুষকে মানবীয় পূর্ণতার শিখরে তুলে দেয়। যারা মুশরিক, যারা বিশ্বাস করেন যে, বিভিন্ন মানুষ, দেব-দেবী, গাছ পাথর বা জিন পরী, ভুত প্রেত ইত্যাদির কোনো ঐশ্বরিক বা অলৌকিক ক্ষমতা আছে বা তারা অলৌকিক ইচ্ছার মালিক, ইচ্ছা করলেই মানুষের উপকার বা অপকার করতে পারে, তারা সর্বদা অস্থির চিত্ত, শংকাগ্রস্ত। তারা বিভিন্ন স্থানে ছুটে বেড়াচ্ছেন কল্যাণের আশায় বা বরলাভ করতে, অথবা অকল্যাণ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বা "অভিশাপ" কাটানোর জন্য। তাদের মনের অস্থিরতার শেষ নেই। তার অবস্থা ঠিক ঐ কর্মচারীর মত যাকে কয়েকজন পরস্পর বিরোধী মেজাজের কর্মকর্তার অধীনে কাজ করতে হয়, তাদের সবাইকে খুশি করতে গিয়ে বেচারার দুশ্চিন্তা ও ব্যস্ততার অন্ত থাকে না।

অপর পক্ষে যিনি তাওহীদে বিশ্বাসী তিনি এ সকল দুশ্চিন্তা ও অস্থিরতা থেকে মুক্ত। কারো সামনে তার মন নত হয়না। তিনি জানেন যে, তার সকল কল্যাণ-অকল্যাণ ভাল-মন্দ, উন্নতি-অবনতি সবকিছু একমাত্র আল্লাহর হাতে। তিনি জানেন, তার মালিক সর্বজ জ্ঞানী, পরম করুণাময়। তিনি তার প্রিয়তম, নিকটতম। তিনি তার মঙ্গল করবেনই, কারণ তিনি তাকে তার নিজের চেয়েও বেশী ভালবাসেন। আর তিনি না দিলে কেউই দিতে পারবে না। বান্দার একমাত্র দায়িত্ব হলো আল্লাহর নির্দেশিত পথে চলা, তার কছে প্রার্থনা করা। কাজেই হাসি-আনন্দে, ব্যাথা-বেদনায়, দুঃখে-কষ্টে সর্বদা তার মন একমাত্র আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত। আনন্দে তিনি তারই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন, বেদনায় তিনি তার একমাত্র নিকটতম ও প্রিয়তম প্রভুর কাছেই মনের আকুতি তুলে ধরেন। আস্থা ও প্রশান্তিতে তার মন ভরপুর। এই পূর্ণতা ও প্রশান্তির গভীরতা নির্ভর করে তাওহীদের বিশ্বাসের গভীরতার উপর।

মহান আল্লাহর দরবারে সকাতরে দোয়া করি, তিনি আমাদেরকে বিশুদ্ধ তাওহীদের ঈমান অর্জনের তাওফীক প্রদান করুন এবং আমাদের ঈমান ও আমল কবুল করুন। আমীন!

---

[১] বুখারী, আস-সহীহ ১/৪৯।
[২] সূরা যুমার: ২৯ আয়াত

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

أَمَّا بَعْدُ، فَيَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا

أَنَا فَاعْبُدُونِ. قَالَ اللهُ تَعَالَىَ: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ.

وَقَالَ تَعَالَى: ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُوْلُ اللهِ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ

بَارَكَ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ فِيْ الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ. وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ. أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ، فَاسْتَغْفِرُوْهُ وَتُوْبُوْا إِلَيْهِ، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.

মুহাররাম মাসের ৩য় খুতবাঃ ঈমান বির-রিসালাত

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লী আলা রাসূলিহীল কারীম। আম্মা বাদ,

সম্মানিত উপস্থিতি, আজ ...... হিজরী সালের মুহাররাম মাসের তৃতীয় খুতবা। আজকের খুতবায় আমরা রিসালাতের ঈমান সম্পর্কে আলোচনা করব। কিন্তু তার আগে আমরা এ সপ্তাহের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসগুলির বিষয়ে সংক্ষেপ আলোকপাত করি।

হাযেরীন, আজ ইংরেজী ..... মাসের ..... তারিখ। এ সপ্তাহের দিবসগুলির মধ্যে রয়েছে ..... ।

....

সম্মানিত উপস্থিতি, গত সপ্তাহের খুতবা থেকে আমরা জেনেছি যে, ঈমানের ৬টি রুকন রয়েছে, যার প্রথম রুকন আল্লাহর প্রতি ঈমান। আমরা আরো দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ "তোমরা কি জান যে, আল্লাহর প্রতি ঈমান কী?... এ কথা সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই তিনি একক তাঁর কোনো শরীক নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল।" অন্য হাদীসে আমরা দেখেছি যে, ইসলামের পাঁচটি রুকন প্রথম রুকন হলো এ সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও রাসুল। অন্য হাদীসে আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

مَا مِنْ عَبْدٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِلا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ

"যে কোনো বান্দা যদি সাক্ষ্য প্রদান করে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) তাঁর বান্দা ও রাসূল, তবে তাঁর জন্য আল্লাহ জাহান্নাম হারাম বা নিষিদ্ধ করে দেবেন।"[১]

আজকের খুতবায় আমরা মুহাম্মাদ ﷺ- কে আল্লাহর বান্দা ও রাসূল হিসেবে বিশ্বাসের বিভিন্ন দিক আলোচনা করব। মহান আল্লাহর দরবারে আমরা তাওফীক প্রার্থনা করছি।

হাযেরীন, এখানে দুটি বিষয়ের সাক্ষ্য দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছেঃ আবদুহু ও রাসূলুহূ। ইবাদাত শব্দ আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা জেনেছি যে, আব্দ অর্থ দাস, ক্রীতদাস বা চাকর। ফারসী ভাষায় বলা হয় বান্দা। বাংলায়ও এ ফার্সী শব্দটি প্রচলিত। আরবী ভাষায় সাধারণভাবে (আব্দ) বলতে সৃষ্টি বা মানুষ বুঝানো হয়, কারণ প্রতিটি মানুষই আল্লাহর দাস বা বান্দা।

আরবী 'রাসূল' (رَسُول) শব্দের আভিধানিক অর্থ প্রেরিত, দূত, বার্তাবাহক ইত্যাদি। ইসলামী পরিভাষায় রাসূল অর্থ আল্লাহর মনোনিত ও নির্বাচিত ব্যক্তি যাকে আল্লাহ ওহীর মাধ্যমে তাঁর বাণী ও নির্দেশনা প্রদান করেছেন এবং তা মানুষের কাছে প্রচারের নির্দেশ দিয়েছেন। কুরআন কারীমের অসংখ্য আয়াত ও অগণিত হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর রাসূল এবং নবী। একজন মানুষকে মুসলিম হতে হলে তাকে তাওহীদের বিশ্বাসের সাথে সাথে সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করতে হবে এবং সাক্ষ্য দিতে হবে যে, মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

হাযেরীন, এখানে প্রশ্ন হলো, মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে রাসূল বলে বিশ্বাস করার অর্থ কী? এর অর্থ হলো নিম্নের তিনটি বিষয় বিশ্বাস করাঃ (১) তাঁর নুবুওয়াতের বিশ্বাস, (২) তাঁর মর্যাদা ও ভালবাসায় বিশ্বাস, এবং (৩) তাঁর আনুগত্য ও অনুসরণে বিশ্বাস। আজ আমরা প্রথম বিষয়টি আলোচনা করতে চাই।

---

[১] মুসলিম, আস-সহীহ ১/৬১।

হাযেরীন, তাঁর নুবুওয়াত ও রিসালাতের বিশ্বাসের অর্থ হলো মহান আল্লাহ তাঁকে নবী ও রাসূলের দায়িত্ব ও পদমর্যাদা প্রদান করেছেন, তাঁর নুবুওয়াত সর্বজনীন, তাঁর মাধ্যমে নুবুওয়াতের সমাপ্তি ঘটেছে, তিনি নুবুওয়াতের দায়িত্ব পরিপুর্ণ ভাবে আদায় করেছেন, তিনি নুবুওয়াতের দায়িত্ব হিসেবে যা কিছু শিক্ষা দিয়েছেন সবই সন্দেহাতীতভাবে নির্ভুল।

এ সকল বিষয়ে কুরআন ও হাদীসে অগণিত নির্দেশনা রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا

"আমি তো তোমাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদ প্রদানকারী ও ভয়প্রদর্শনকারী হিসেবে প্রেরণ করেছি।"[১]

মহান আল্লাহ আরো বলেছেন:

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا

"বল: হে মানবজাতি, নিশ্চয় আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসূল"[২]

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেছেন:

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا

"তিনিই মহিমাময় যিনি তাঁর বান্দার উপরে ফুরকান নাযিল করেছেন, যেন তিনি সমস্ত সৃষ্টি জগতের জন্য ভয় প্রদর্শনকারী হন।"[৩]

অন্যত্র ঘোষণা করা হয়েছে:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

"নিশ্চয় আমি আপনাকে সমস্ত সৃষ্টি জগতের জন্য করুণা বা রহমত-স্বরূপ প্রেরণ করেছি।"[৪]

এখানে উল্লেখ্য যে, মুহাম্মাদ ﷺ-এর আগে কোনো নবী-রাসূলই বিশ্বজনীনতা বা সার্বজনীনতা দাবি করেন নি। খৃস্টান মিশনারীগণ খৃস্টানধর্মকে বিশ্বজনীন বলে দাবি করে সারা বিশ্বে প্রচার করেন। অথচ তাদের নিকট বিদ্যমান বাইবেলে বারংবার বলা হয়েছে যে, যীশুখৃস্ট সার্বজনীন নন, তিনি কেবলমাত্র বনী ইসরাঈলের জন্য প্রেরিত হয়েছেন। ইস্রায়েল সন্তানগণ ছাড়া অন্যদের নিকট তাঁর ধর্ম প্রচার করতে নিষেধ করেছেন। বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে যীশু খ্রীস্ট যখন তাঁর ১২ জন শিষ্যকে ধর্ম প্রচারে প্রেরণ করেন, তখন তিনি তাদেরকে বলেন: (Go not into the way of the Gentiles, and into any city of the Samaritans enter ye not: But go rather to the lost sheep of the house of Israel) "তোমরা পরজাতিগণের (অ-ইহূদীদের) পথে যাইও না, এবং শমরীয়দের কোনো নগরে প্রবেশ করিও না..."[৫] তিনি আরো বলেছেন: (I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel) "ইস্রায়েল কুলের হারান মেষ ছাড়া আর কাহারো নিকটে আমি প্রেরিত হই নাই।"[৬] এভাবে

[১] সূরা (৩৪) সাবা: ২৮ আয়াত।
[২] সূরা (৭) আ'রাফ: ১৫৮ আয়াত।
[৩] সূরা (২৫) ফুরকান: ১ আয়াত।
[৪] সূরা (২১) আনবিয়া: ১০৭ আয়াত।
[৫] মথি : ১০/৬।
[৬] মথি : ১৫/২৪।

তিনি অ-ইহূদী সকল জাতি ও শমরীয়দের মধ্যে খৃস্টধর্ম প্রচার করতে নিষেধ করলেন এবং তাঁর ধর্মকে শুধুমাত্র ইস্রায়েল সন্তান বা ইহূদীদের জন্য নির্দিষ্ট বলে ঘোষণা করলেন। প্রচলিত বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে আমরা জানতে পারি যে, ধর্ম ও দীক্ষা প্রদান তো দূরের কথা, অ-ইস্রায়েলীয়দেরকে যীশু সামান্য ঝাড়-ফূঁক দিতেও রাজি হন নি। বরং তাদেরক কুকুর বলে আখ্যায়িত করেছেন।[১]

পক্ষান্তরে কুরআন কারীম সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থীহণভাবে, বারংবার জানিয়েছে যে, মুহাম্মাদ ﷺ বিশ্বের সকল মানুষের জন্য, উপরন্তু সৃষ্টিজগতের জন্য প্রেরিত রাসূল। অগণিত হাদীসেও রাসূলুল্লাহ ﷺ বারংবার এ কথার ঘোষণা দিয়েছেন। এভাবে আমরা দেখছি যে, 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' বিশ্বাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে একজন মুসলিমকে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে যে, মুহাম্মাদ (ﷺ) বিশ্বের সকল দেশের সকল জাতির সব মানুষের জন্য আল্লাহর মনোনীত রাসূল। তাঁর আগমনের দ্বারা পূর্ববর্তী সকল ধর্ম রহিত হয়ে গিয়েছে। তাঁর রিসালাতে বিশ্বাস করা ছাড়া কোনো মানুষ মুক্তির দিশা পাবে না।

হাযেরীন, মুহাম্মাদ ﷺ-কে নাবী ও রাসূল হিসেবে বিশ্বাস করার অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো এ কথা বিশ্বাস করা যে, মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর মনোনীত সর্বশেষ নবী ও রাসূল, তাঁর পরে আর কোনো ওহী নাযিল হবে না এবং কোনো নবী বা রাসূল আসবেন না। বস্তুত পূর্ববর্তী সকল নবী-রাসূল তাঁদের পরে নবী-রাসূল আগমনের বিষয়ে তাদের উম্মাতকে সুস্পষ্টভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছেন। একমাত্র মুহাম্মাদ ﷺ-ই তাঁর পরে কোনো নবীর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করেন নি। উপরন্তু কুরআন ও হাদীসে দ্ব্যর্থহীনভাবে বারংবার ঘোষণা করা হয়েছে যে, তিনিই সর্বশেষ নবী। আল্লাহ্ বলেছেন:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

"মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যে কোনো পুরুষের পিতা নন, বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী। আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।"[২]

মুতাওয়াতির পর্যায়ে বর্ণিত অর্ধশতাধিক সহীহ হাদীসে খাতমুন নুবুওয়াত বা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মাধ্যমে নুবুওয়াতের পরিসমাপ্তির বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ: فُوا بِبَيْعَةِ الأَوَّلِ فَالأَوَّلِ أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ.

"ইস্রায়েল সন্তানগণকে (বনী ইসরাঈলকে) শাসন করতেন নবীগণ। যখনই কোনো নবী মৃত্যুবরণ করতেন তখন অন্য একজন নবী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতেন। আর আমার পরে কোনো নবী নেই, কিন্তু খলীফাগণ থাকবেন এবং তারা সংখ্যায় অনেক হবেন। উপস্থিত সাহাবীগণ বলেন: আপনি আমাদেরকে তাদের বিষয়ে কি নির্দেশ দিচ্ছেন। তিনি বলেন: ধারাবাহিকভাবে প্রথম ব্যক্তির পরে পরবর্তী ব্যক্তি এভাবে তাদের বাইয়াত বা আনুগত্যের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করবে এবং তাদেরকে তাদের প্রাপ্য (আনুগত্য) প্রদান করবে। আল্লাহ তাদেরকে তাদের অধীনস্থ জনগণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন।"[৩]

সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আলীকে (রা) বলেন:

---

[১] মথি: ১৫/২২-২৬।

[২] সূরা (৩৩) আহযাব: ৪০ আয়াত।

[৩] বুখারী, আস-সহীহ ৩/১২৭৩; মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৪৭১; ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ৬/৪৯৫, ৮/১১০, ১০/৫৭৭।

أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلاَّ أَنَّهُ لا نَبِيَّ بَعْدِي

"মূসার সাথে হারূনের মর্যাদা যেরূপ ছিল আমার সাথে তোমার মর্যাদা সেরূপ, ব্যতিক্রম এই যে, আমার পরে কোনো নবী নেই।"[১]

অন্য হাদীসে জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

مَثَلِي وَمَثَلُ الأَنْبِيَاءِ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى دَارًا فَأَتَمَّهَا وَأَكْمَلَهَا إِلا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَدْخُلُونَهَا وَيَتَعَجَّبُونَ مِنْهَا وَيَقُولُونَ لَوْلا مَوْضِعُ اللَّبِنَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَنَا مَوْضِعُ اللَّبِنَةِ جِئْتُ فَخَتَمْتُ الأَنْبِيَاءَ

"আমার ও অন্যান্য সকল নবীর উদাহরণ একজন ব্যক্তির ন্যায়, যিনি একটি বাড়ি তৈরি করেছেন এবং তাকে পূর্ণতা দান করেছেন, কিন্তু একটি ইটের স্থান অপূর্ণ রেখেছেন। মানুষেরা এ বাড়িতে প্রবেশ করতে লাগল এবং অবাক হতে লাগল। তারা বলতে লাগল, এই ইটের স্থানটি যদি অপূর্ণ না থাকত! রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমিই সেই ইটের স্থান, আমি এসে নবীগণের সমাপ্তি টেনেছি।"[২]

অন্য হাদীসে জুবাইর ইবনু মুতয়িম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

إِنَّ لِي أَسْمَاءً أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَنَا أَحْمَدُ وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِيَ الْكُفْرَ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمَيَّ وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ أَحَدٌ (نَبِيٌّ)

"আমার অনেক নাম আছে। আমি মুহাম্মাদ, এবং আমি আহমদ, এবং আমি 'মাহী' (উচ্ছেদকারী), আমার মাধ্যমে আল্লাহ কুফ্‌র উচ্ছেদ করবেন, এবং আমি 'হাশির' (একত্রিতকারী), আমার পদদ্বয়ের নিকটেই মানুষেরা কিয়ামতের দিন একত্রিত হবে, এবং আমি 'আকিব' (সর্বশেষ), যার পরে আর কোনো নবী নেই।"[৩]

অন্য হাদীসে আনাস ইবনু মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

إِنَّ الرِّسَالَةَ وَالنُّبُوَّةَ قَدْ انْقَطَعَتْ فَلا رَسُولَ بَعْدِي وَلا نَبِيَّ

"রিসালাত বা রাসূলের পদ এবং নুবুওয়াত বা নবীর পদ শেষ হয়ে গিয়েছে, কাজেই আমার পরে কোনো রাসূল নেই এবং কোনো নবীও নেই।"[৪]

এভাবে বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) অত্যন্ত পরিস্কারভাবে ঘোষণা করেছেন যে, তিনি আল্লাহর সর্বশেষ নবী ও রাসূল, তাঁর আগমনের সাথে সাথে নুবুওয়াত ও রিসালাতের সমাপ্তি ঘটেছে। তাঁর পরে আর কোনো নবী বা রাসূল আসবেন না। তিনি একথাও স্পষ্ট জানিয়েছেন যে, তাঁর পরে যদি কেউ নুবুওয়াতের দাবী করে তবে সে অবশ্যই একজন ঘোর মিথ্যাবাদী ভণ্ড। বিভিন্ন হাদীসে তিনি তাঁর উম্মতকে ভণ্ড নবীদের আবির্ভাবের সংবাদ দান করে তাদের থেকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। এক হাদীসে জাবির ইবনু সামুরাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

---

[১] বুখারী, আস-সহীহ ২/৯৬০, ৩/১৩৫৭, ৪/১৬০২; মুসলিম, আস-সহীহ ৪/১৮৭০।

[২] বুখারী, আস-সহীহ ৩/১৩০০; মুসলিম, আস-সহীহ ৪/১৭৯১।

[৩] বুখারী, আস-সহীহ ৩/১২৯৯, ৪/১৫৯২, ১৮৫৮; মুসলিম, আস-সহীহ ৪/১৮২৮।

[৪] তিরমিযী, আস-সুনান ৪/৫৩৩; আহমদ, আল-মুসনাদ ৩/২৬৭; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ৪/৪৩৩। হাদীসটি ইমাম মুসলিমের শর্তানুসারে সহীহ।

إِنَّ بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ كَذَّابِينَ فَاحْذَرُوهُمْ

"নিশ্চয় কিয়ামতের পূর্বেই অনেক ঘোর মিথ্যাবাদীর (ভণ্ড নবীর) আবির্ভাব ঘঠবে। তোমরা তাদের থেকে সাবধান থাকবে।"[১]

গবেষকগণ উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাধ্যমে নুবুওয়াতের সমাপ্তির বিষয়ে ৩৭ জন সাহাবী থেকে সহীহ্ সনদে ৬৫টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।[২] এভাবে আমরা দেখছি যে, কুরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশনার পাশাপাশি মুতাওয়াতির হাদীসের মাধ্যমে বিষয়টি সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত। বরং প্রকৃত বিষয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবুয়ত ও খাতমুন-নুবুওয়াত একইভাবে বর্ণিত ও প্রমাণিত। যারা তাঁর নুবুওয়াতের বিষয় বর্ণনা করেছেন তাঁরাই তাঁর খাতমুন নুবুওয়াতের বিষয়ও বর্ণনা করেছেন। সাহাবীগণ সর্বসম্মতভাবে নবুওয়তের দাবিদার এবং তাদের অনুসারীদেরকে ধর্মত্যাগী মুরতাদ বলে গণ্য করেছেন।

যদি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পরে কেউ নিজেকে নবী বলে দাবি করে বা কেউ এরূপ দাবিদারের কথা সত্য বলে মনে করে তবে সে নিঃসন্দেহে ভণ্ড ও মিথ্যাবাদী দাজ্জাল বা এরূপ ভণ্ডের অনুসারী। যদি কোনো মুসলিম নামধারী এরূপ দাবি করে বা এরূপ দাবিদারের কথা বিশ্বাস করে তবে সে ধর্মত্যাগী মুরতাদ বলে গণ্য হবে। উপরন্তু যদি কেউ বিশ্বাস করে যে মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর পরে কোনো নবী বা রাসূল এসেছেন, আসতে পারেন, আসার সম্ভাবনা আছে বা আসা অসম্ভব নয় তবে সে ব্যক্তিও অমুসলিম কাফির ও ধর্মত্যাগী মুরতাদ বলে গণ্য হবে, যদিও সে মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) -কে একজন নবী ও রাসূল বলে মানে, অথবা তাঁকে শ্রেষ্ঠ নবী বলে মানে, অথবা তাঁর শরীয়তের বিধান মেনে চলে। এই ব্যক্তি মূলত "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ"-য় বিশ্বাস করে নি। কারণ কুরআনের মাধ্যমে এবং অগণিত মুতাওয়াতির হাদীসের মাধ্যমে প্রমাণিত তাঁর দ্ব্যর্থহীন শিক্ষাকে অস্বীকার ও অমান্য করলে আর তাঁর নুবুওয়াতের স্বীকৃতি দেওয়ার অর্থ থাকে না।

এখানে উল্লেখ্য যে, ইসলামের সোনালী দিনগুলিতে নুবুওয়াতের দাবি করে কেউ ইসলামের ক্ষতিসাধন করতে পারে নি। কারণ এ বিষয়ে মুসলিম সমাজ ও রাষ্ট্রের সচেতনতা ছিল সুস্পষ্ট। কিন্তু গত কয়েক শতাব্দী যাবত অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। বিশেষত ইসলামের মৌলিক বিষয়াদি সম্পর্কে মুসলিমদের অজ্ঞতা এবং সাম্রাজ্যবাদী ও ঔপনিবেশিক শাসকগণের কূটকৌশলের কারণে এ সকল ভণ্ড মুসলিম সমাজের বিশেষ ক্ষতি সাধন করতে এবং অসংখ্য মুসলিমকে ধর্মচ্যুত করতে সক্ষম হয়েছে। এ সকল ভণ্ডের অন্যতম পাঞ্জাবের গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (১৮৪০-১৯০৮ খৃ)।

১৮৪০ সালে সে পাঞ্জাবের কাদিয়ান নাম স্থানে জন্মগ্রহণ করে। ১৮৭৭ সালের দিকে সে দাবি করে যে, খৃস্টান ও হিন্দুদের বিরুদ্ধে সে বিশাল একটি গ্রন্থ রচনা করবে। এ সময়ে খৃস্টান মিশনারী ও হিন্দু আর্য সমাজের মানুষের মুসলিমদের খুবই উত্যক্ত করছিল। গোলামের প্রচারণায় অনেকেই তার ভক্তে পরিণত হয়। এ সময়ে সে নিজেকে একজন আল্লাহর ওলী ও কাশফের অধিকারী বলে দাবি করে। এতে তার অনেক ভক্ত ও মুরিদ তৈরি হয়। ১৮৮৫ সালে (১৩০৩ হিজরীতে) সে নিজেকে শতাব্দীর মুজাদ্দিদ বলে দাবি করে। তার ভক্তদের অনেকেই সে দাবী মেনে নেয়। ১৮৯১ সালে সে দাবি করে যে, সে ইমাম মাহদী। এরপর সে দাবী করে যে, সে ঈসা মাসীহ। এরপর সে দাবি করে যে,

---

[১] মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৪৫৪, ৪/২২৩৯।

[২] মুতয়িব ইবনু মুকবিল আশ-শাস্‌সান, খাতমুন নুবুওয়াত, পৃ. ২২-২৩।

তার কাছে ইলহাম আসে এবং তাকে মুহাম্মাদী দীনকে সংস্কার করার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তখন সে বারবার বলত সে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অনুসারী এবং সে নবী নয়। সে যা কিছু বলে সবই ইলহামের মাধ্যমে সরাসরি রাসূলুল্লাহ ﷺ বা আল্লাহর নিকট থেকে জেনে বলে।

এ সময়ে তার মূল কর্ম ছিল: (১) নিজেকে ইলহাম, ইলকা ও কাশফপ্রাপ্ত ওলী ও শতাব্দীর মুজাদ্দিদ বলে দাবি করা, (২) বৃটিশ সরকারে পক্ষে কথা বলা এবং বৃটিশ বিরোধী সকল কর্মের জোরালো নিন্দা করা, (৩) তার মতের বাইরে সমাজের সকল আলিম-উলামার বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করা, (৪) নিজের অনুসারীদেরকে একমাত্র সঠিক মুসলিম বলে দাবি করা ও সাধারণ মুসলিম সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন একটি পৃথক দল তৈরি করা, (৫) বিভিন্নভাবে বহসের চ্যালেঞ্জ দিয়ে সাধারণ মুসলমানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। এরপর ক্রমান্বয়ে সে নুবুওয়াত দাবি করে। ১৯০১ সালে সে দাবী করে যে, সে একজন নবী এবং সে সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। ১৯০৮ সালে সে অভিশপ্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে।

এখানে উল্লেখ্য যে, গোলাম আহমদ ও তার মত ভণ্ড নবীরা সরাসরি নুবুওয়াত দাবি করে নি; কারণ তাহলে কোনো মুসলিমই তার দাবি গ্রহণ করবে না। বরং তারা প্রথমে বেলায়াত, কাশফ, ইলহাম, ইলকা, মুজাদ্দিদত্ব ইত্যাদি দাবি করে। এগুলি সবই ইসলামী পরিভাষা ও ইসলাম স্বীকৃত বিষয়। কিন্তু এগুলির অর্থ ও মর্ম না জানার কারণে অনেকেই এ সকল কথা দ্বারা বিভ্রান্ত হয়। এভাবে তারা যখন কিছু মানুষকে তাদের একান্ত ভক্ত হিসেবে পেয়ে যায়, তখন বিভিন্ন কৌশলে নুবুওয়াত দাবি করে। আর তার অনুসারী ভক্তরা বিভিন্ন অজুহাত ও ব্যাখ্যা দিয়ে তার দাবি মেনে নেয়।

হাযেরীন, ইসলামে কাশফ, ইলহাম, ইলকা ও সত্য স্বপ্ন রয়েছে। তবে এগুলি একান্তই আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া ব্যক্তিগত সম্মান, কারামত ও নিয়ামত মাত্র। এগুলি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা অন্য কোনো মানুষের জন্য দীন বুঝার বা দীনের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে প্রমাণ বা ভিত্তি নয়। যদি কেউ নিজেকে এরূপ কাশফ, ইলকা বা ইলহাম-ধারী বলে দাবি করেন বা এই দাবির ভিত্তিতে নিজের মতটির নির্ভুলতা, অভ্রান্ততা বা বিশেষত্ব দাবি করেন তবে তিনি ভণ্ড, প্রতারক মিথ্যাবাদী অথবা শয়তান কর্তৃক প্রতারিত।

যুগে যুগে মুসলিম সমাজে মুজাদ্দিদ বা সংস্কারক আসবেন বলে আবূ দাউদ সংকলিত একটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে কেউ কখনোই নিজেকে মুজাদ্দিদ দাবি করেন নি। আলিমদের কর্ম বিবেচনা করে সাধারণত তাঁদের মৃত্যুর অনেক পরে পরবর্তী যুগের আলিমগণ কাউকে কাউকে মুজাদ্দিদ বলে মনে করেছেন। এ-ই 'মনে করা' বা ধারণা করাও একান্তই ব্যক্তিগত ইজতিহাদ। কোন্ যুগে কে বা কারা মুজাদ্দিদ ছিলেন সে বিষয়ে আলিমদের অনেক মতভেদ রয়েছে। গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর পূর্বে কেউ কখনো নিজেকে মুজাদ্দিদ বলে দাবি করেন নি। যদি কেউ নিজেকে মুজাদ্দিদ বলে দাবি করে, অথবা তার অনুসারীগণ তার জীবদ্দশাতেই তাকে মুজাদ্দিদ বলে দাবি ও প্রচার করে আর তিনি তা সমর্থন করেন এবং তার এই 'পদমর্যাদা'-র কারণে তার মতের বিশেষত্ব, অভ্রান্ততা বা পবিত্রতা দাবি করেন তবে তিনিও অনুরূপভাবে মিথ্যাবাদী ভণ্ড প্রতারক বা শয়তান কর্তৃক প্রতারিত।

এগুলি সবই নুবুওয়াত দাবি করার বিভিন্ন পর্যায় ও পদক্ষেপ। এগুলির পরে কেউ যদি সরাসরি নুবুওয়াত দাবি করে তবে সে নিঃসন্দেহে প্রতারক ভণ্ড ও ধর্মত্যাগী মুরতাদ কাফির।[১]

মহান আল্লাহ শয়তানের ষড়যন্ত্র জাল থেকে মুসলিমগণকে হেফাযত করুন। আমিন।

---

[১] বিস্তারিত দেখুন: খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা, পৃ. ১১৫-২৪০।

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

أَمَّا بَعْدُ، فَيَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا

وَقَالَ تَعَالَى: مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الرِّسَالَةَ وَالنُّبُوَّةَ قَدْ انْقَطَعَتْ فَلَا رَسُولَ بَعْدِي وَلَا نَبِيَّ

وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ كَذَّابِينَ فَاحْذَرُوهُمْ

بَارَكَ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ فِيْ الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ. وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ. أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ، فَاسْتَغْفِرُوْهُ وَتُوْبُوْا إِلَيْهِ، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.

মুহার্‌রাম মাসের ৪র্থ খুতবাঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মর্যাদা ও ভালবাসা

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লী আলা রাসূলিহীল কারীম। আম্মা বাদ,

সম্মানিত উপস্থিতি, আজ মুহার্‌রাম মাসের ৪র্থ জুমুআ। আজকের খুতবায় আমরা রিসালাতের ঈমানের দ্বিতীয় বিষয়- রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মর্যাদা ও ভালবাসার বিষয় আলোচনা করব। কিন্তু তার আগে আমরা এ সপ্তাহের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসগুলির বিষয়ে সংক্ষেপ আলোকপাত করি।

হাযেরীন, আজ ইংরেজী ..... মাসের ..... তারিখ। এ সপ্তাহের দিবসগুলির মধ্যে রয়েছে ..... ।

হাযেরীন, রিসালাতের সাক্ষের অবিচ্ছেদ্য অংশ মুহাম্মাদ ﷺ-এর মর্যাদায় বিশ্বাস করা ও তাঁকে সম্মান করা। তিনি সর্ব কালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, মানবজাতির নেতা, নবী-রাসূলদের প্রধান। তিনি আল্লাহর প্রিয়তম বান্দা, তাঁর হাবীব, তাঁর সবচেয়ে সম্মানিত বান্দা, সর্বযুগের সকল মানুষের নেতা। অন্যান্য নবী-রাসূলের সাধারণ মর্যাদা সবই তিনি লাভ করেছেন। তিনি নিষ্পাপ, মনোনীত ও সকল কলুষতা থেকে মুক্ত ছিলেন। নবুয়ত প্রাপ্তির আগে ও নবুয়তের পরে সর্ব অবস্থায় আল্লাহ তাকে সকল পাপ, অন্যায় ও কালিমা থেকে রক্ষা করেছেন। এছাড়াও আল্লাহ তাঁকে বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন।

তাঁর মর্যাদার বিষয়ে কুরআন কারীমের কয়েকটি আয়াত শুনুন:

وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا.

"তোমার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তাদের একদল তোমাকে পথভ্রষ্ট করতে চাইত; কিন্তু তারা নিজেদেরকে ছাড়া আর কাউকে পথভ্রষ্ট করে না, এবং তোমার কোনোই ক্ষতি করতে পারে না। আল্লাহ তোমার প্রতি কিতাব এবং হিকমাত অবতীর্ণ করেছেন এবং তুমি যা জানতে না তা তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন, তোমার প্রতি আল্লাহর মহা-অনুগ্রহ রয়েছে।"[১]

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

"আমি তো তোমাকে রাসূল বানিয়েছি কেবল বিশ্ব জগতের জন্য রহমত-রূপে।"[২]

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

"আমি কি তোমার বক্ষ তোমার কল্যাণে প্রশস্ত করে দেই নি? আমি অপসারণ করেছি তোমার ভার, যা ছিল তোমার জন্য অতিশয় কষ্টদায়ক। এবং আমি তোমার খ্যাতিকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছি।"[৩]

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا

"হে নবী, আমি তোমাকে প্রেরণ করেছি, সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে এবং আল্লাহর অনুমতিক্রমে তার দিকে আহ্বানকারীরূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে।"[৪]

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلا

---

[১] সূরা (৪) নিসা: ১১৩ আয়াত।
[২] সূরা (২১) আম্বিয়া: ১০৭ আয়াত।
[৩] সূরা (৯৪) ইনশিরাহ: ১-৪ আয়াত।
[৪] সূরা (৩৩) আহযাব: ৪৫-৪৬ আয়াত।

"নিশ্চয় আমি তোমাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। যেন তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আন এবং তাঁকে (রাসূলকে) সাহায্যকর এবং সম্মান কর এবং সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর (আল্লাহর) পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।"[১]

সকল মানুষের ঊর্ধ্বে তাঁর সম্মান। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেছেন:

النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ

"মুমিনদের নিকট নবী তাদের নিজেদের চেয়েও ঘনিষ্টতর এবং তাঁর স্ত্রীগণ তাদের মাতা। আল্লাহর বিধান অনুসারে মুমিনগণ ও মুহাজিরগণ অপেক্ষা যারা আত্মীয় তারা পরস্পরের ঘনিষ্টতর।"[২]

কোনো ভাবে তার মনোকষ্টের কারণ হওয়া মুসলিমের জন্য নিষিদ্ধ করে মহান আল্লাহ বলেন:

وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا

"তোমাদের জন্য সংগত নয় যে, তোমরা আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দিবে অথবা তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর পত্নীদিগকে বিবাহ করবে। আল্লাহর নিকট তা ঘোরতর অপরাধ।"[৩]

বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর মর্যাদার কথা উম্মাতকে জানিয়েছেন। কয়েকটি হাদীস শুনুন:

أَنَا أَوَّلُ النَّاسِ خُرُوجًا إِذَا بُعِثُوا وَأَنَا خَطِيبُهُمْ إِذَا وَفَدُوا وَأَنَا مُبَشِّرُهُمْ إِذَا أَيِسُوا لِوَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَئِذٍ بِيَدِي وَأَنَا أَكْرَمُ وَلَدِ آدَمَ عَلَى رَبِّي وَلا فَخْرَ

"মানুষ যখন কিয়ামতের সময় পুনরুত্থিত হবে তখন আমিই সর্বপ্রথম বের হব, মানুষেরা যখন হাজিরা দেবে তখন আমিই তাদের পক্ষ থেকে বক্তব্য প্রদান করব, যখন তারা নিরাশ হয়ে যাবে তখন আমিই তাদের সুসংবাদ প্রদান করব এবং সেদিন আমার হাতেই থাকবে প্রশংসার ঝাণ্ডা। আদম সন্তানদের মধ্যে আমার প্রতিপালকের কাছে আমিই সবচেয়ে সম্মানিত, আর এতে কোনো অহংকার নেই।"[৪]

أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ

"কিয়ামদের দিন আমি আদম সন্তানদের নেতা, কবর ফুড়ে আমিই প্রথম পুনরুত্থিত হব, আমিই প্রথম শাফা'আতকারী এবং আমার শাফা'আতই প্রথম গ্রহণ করা হবে।"[৫]

أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا فَخْرَ وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ وَلا فَخْرَ وَمَا مِنْ نَبِيٍّ يَوْمَئِذٍ آدَمَ فَمَنْ سِوَاهُ إِلا تَحْتَ لِوَائِي وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الأَرْضُ وَلا فَخْرَ

"কিয়ামতের দিন আমি আদম সন্তানদের নেতা, এতে কোনো অহংকার নেই। আমার হাতেই প্রশংসার ঝাণ্ডা থাকবে, এতে কোনো অহংকার নেই। আদম থেকে শুরু করে যত নবী আছেন তারা সবাই আমার ঝাণ্ডার নীচে সমবেত হবেন। আমিই প্রথম মাটি ফুড়ে পুনরুত্থিত হব, এতে কোনো

[১] সূরা (৪৮) ফাতহ: ৮-৯ আয়াত।
[২] সূরা (৩৩) আহযাব: ৬ আয়াত।
[৩] সূরা (৩৩) আহযাব: ৫৩ আয়াত।
[৪] তিরমিযী, আস-সুনান ৫/৫৪৬। তিরমিযী বলেন: হাদীসটি হাসান গরীব।
[৫] মুসলিম, আস-সহীহ ৪/১৭৮২।

অহংকার নেই।[১]

হাযেরীন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মর্যাদার বিষয়ে আরো অনেক আয়াত ও হাদীস রয়েছে, যেগুলি আলোচনা করা আর সম্ভব হচ্ছে না। আমরা জানি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সম্মান ও মর্যাদা অবগত হওয়া মুমিনের ঈমানের অংশ ও মৌলিক বিষয়। সকল মুমিন যেন সহজেই জানতে পারে সেজন্য বিষয়টি আল্লাহ কুরআন কারীমে সহজভাবে সকলের বোধগম্য করেই বর্ণনা করেছেন। এছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ বিষয়টি তাঁর সাহাবীগণকে জানিয়েছেন। তাঁরাও মুমিনের ঈমানের বিশুদ্ধতার জন্য এভাবেই গুরুত্বের সাথে তা তাবিয়ীগণকে শিখিয়েছেন। এভাবে বিষয়গুলি অবশ্যই কুরআনে বা মুতাওয়াতির-মাশহূর সহীহ হাদীস সমূহে স্পষ্ট ও সর্বজনবোধগম্যভাবে বর্ণিত হয়েছে। মুসলিমের দায়িত্ব হলো, তাঁর ব্যাপারে কুরআন কারীমে বা সহীহ হাদীসে যা বলা হয়েছে তা সবকিছু পরিপূর্ণভাবে সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করা। নিজের থেকে কোনো কিছু বাড়িয়ে বলা ঠিক নয়। পূর্ববর্তী নবীগণের উম্মাত এরূপ বাড়াবাড়ি বা সীমালঙ্ঘনের কারণে বিভ্রান্ত হয়েছে বলে আমরা কুরআন ও হাদীস থেকে জানতে পারি। নবীগণের প্রতি অবিশ্বাস যেমন মানুষদেরকে ধ্বংস করেছে, তেমনি ধ্বংস করেছে নবীগণের প্রতি ভক্তিতে সীমালঙ্ঘন। এজন্য রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর উম্মাতকে এ বিষয়ে সতর্ক করে বলেছেন:

لا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ.

"খৃস্টানগণ যেরূপ ঈসা ইবনু মারিয়ামকে বাড়িয়ে প্রশংসা করেছে তোমরা সেভাবে আমার বাড়িয়ে প্রশংসা করবে না। আমি তো তাঁর বান্দা মাত্র। অতএব তোমরা বলবে: আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল।"[২]

আনাস ইবনু মালিক (রা) বলেন,

إِنَّ رَجُلا قَالَ يَا مُحَمَّدُ يَا سَيِّدَنَا وَابْنَ سَيِّدِنَا وَخَيْرَنَا وَابْنَ خَيْرِنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِتَقْوَاكُمْ وَلا يَسْتَهْوِيَنَّكُمْ الشَّيْطَانُ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَاللَّهِ مَا أُحِبُّ أَنْ تَرْفَعُونِي فَوْقَ مَنْزِلَتِي الَّتِي أَنْزَلَنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

"এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলে, হে মুহাম্মাদ, হে আমাদের নেতা (সাইয়েদ), আমাদের নেতার পুত্র, আমাদের মধ্যে সর্বত্তোম, আমাদের সর্বোত্তম ব্যক্তির পুত্র। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: হে মানুষেরা, তোমরা আল্লাহকে ভয় করে চল। শয়তান যেন তোমাদেরকে বিভ্রান্ত না করে। আমি আব্দুল্লাহর ছেলে মুহাম্মাদ, আমি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। আল্লাহর কসম, আমি ভালবাসি না যে, আল্লাহ আমাকে যে মর্যাদার আসনে বসিয়েছেন তোমরা আমাকে তার উর্ধ্বে ওঠাবে।"[৩]

অর্থাৎ শয়তান বিভিন্নভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চেষ্টা করে। নবী-রাসূলগণকে অস্বীকার করার মাধ্যমে অনেককে সে বিভ্রান্ত করে। আবার তাঁদের ভক্তি ও প্রশংসায় সীমা লঙ্ঘন করিয়েও শয়তান অনেককে বিভ্রান্ত করে। কাজেই সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। শয়তান অনেক সময় কুমন্ত্রণা দিতে পারে যে, নবী-রাসূলকে বেশি প্রশংসা করলে বা ভক্তি করলে তিনি হয়ত খুশি হবেন। এজন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করলেন যে, এরূপ ভক্তি বা প্রশংসায় তিনি খুশি হন না। বরং ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত

[১] তিরমিযী, আস-সুনান ৫/৩০৮, ৫৮৭। তিরমিযী বলেন: হাদীসটি সহীহ হাসান।
[২] বুখারী, আস-সহীহ ৩/১২৭১, ৬/২৫০৫; ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ৬/৪৭৮।
[৩] আহমদ, আল-মুসনাদ ৩/১৫৩, ২৪১, ২৪৯। হাদীসটির সনদ সহীহ।

বিশেষণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেই তিনি খুশি হন। এখানে লক্ষণীয় যে, উপর্যুক্ত হাদীসে বক্তা সাহাবী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিষয়ে যে বিশেষণগুলি ব্যবহার করেছেন সবই সত্য ও সেগুলি বলা ইসলামে কোনোভাবেই আপত্তিকর নয়। তবুও রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহ তাঁকে যে বিশেষ দুটি পদমর্যাদা প্রদান করেছেন তার বাইরে কিছু ব্যবহার করা অপছন্দ করছেন। বাহ্যত তিনি বাড়াবড়ির দরজা বন্দ করতে চেয়েছেন।

হাযেরীন, (মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ)-এ বিশ্বাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো যে, এ বিশ্বাস পোষণকারী অবশ্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সকল মানুষের উর্ধ্বে ভালবাসবেন। কয়েকটি হাদীস শুনুন:

فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ

"যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ, তোমাদের কেউ ততক্ষণ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে আমাকে তার পিতা ও সন্তান থেকে বেশি ভালবাসবে।"[১]

لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

"তোমাদের কেউ ততক্ষণ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে আমাকে তার পিতা, সন্তান ও সকল মানুষের চেয়ে বেশি ভালবাসবে।"[২]

একদিন উমার (রা) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি আমার কাছে আমার নিজের জীবন ছাড়া দুনিয়ার সবকিছুর চেয়ে বেশি প্রিয়। তখন তিনি বলেন,

لا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ فَإِنَّهُ الآنَ وَاللَّهِ لأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: الآنَ يَا عُمَرُ

"হলো না উমার, যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর কসম, অবশ্যই আমাকে তোমার নিজের জীবনের চেয়েও বেশি ভালবাসতে হবে। তখন উমার (রা) বলেনঃ আল্লাহর কসম, আপনি এখন আমার কাছে আমার জীবনের চেয়েও বেশি প্রিয়। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, হাঁ, উমর, এখন (তোমার ঈমান পূর্ণতা পেল)।"[৩]

হাযেরীন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ভালবাসা কোনো মুখের দাবির ব্যাপার নয়। তার নির্দেশিত পথে চলা, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলা, তার শরীয়াতকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করা, তিনি যা নিষেধ করেছেন তা থেকে দূরে থাকাই হলো তার মহব্বতের প্রকাশ। যে যত বেশী তার শরীয়তকে মেনে চলবেন এবং তার সুন্নাত মত জীবন যাপন করবেন, তার ভালবাসা তত বেশী গভীর হবে। সাহাবীগণ, তাবিয়ীগ, ইমামগণ এভাবে কর্ম ও অনুসরণের মাধ্যমেই তাকে ভালবেসেছেন।

হাযেরীন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণ, তাঁর পরিবার, তাঁর একনিষ্ঠ অনুসারীগণ এবং তাঁর সকল উম্মাতকে তাঁর কারণে সম্মান করা ও ভালবাসা তাঁরই ভালবাসার প্রকাশ। বিশেষত তাঁর সাহাবী ও আহলূ বাইতের বিষয়টি কুরআন ও হাদীসে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেনঃ

قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى

"বল, 'আমি এর বিনিময়ে তোমাদের নিকট থেকে আত্মীয়তার সৌহার্দ্য ব্যতীত অন্য কোনো

---

[১] বুখারী, আস-সহীহ ১/১৪।

[২] বুখারী, আস-সহীহ ১/১৪; মুসলিম, আস-সহীহ ১/৬৭।

[৩] সহীহ বুখারী ৬/২৪৪৫; ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ১১/৫২৩।

প্রতিদান চাই না।"[১] যাইদ ইবনু আরকাম (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন বক্তৃতায় বলেন:

أَمَّا بَعْدُ أَلا أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ رَسُولُ رَبِّي فَأُجِيبَ وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ ... ثُمَّ قَالَ وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي... ثلاثا.

"হে মানুষেরা, তোমরা মনোযোগ দিয়ে শোনো। আমি একজন মানুষ মাত্র। হয়ত শীঘ্রই আমার প্রভুর দূত এসে পড়বেন এবং আমি তার ডাকে সাড়া দিয়ে চলে যাব। আমি তোমাদের মধ্যে দুটি মহাগুরুত্বপূর্ণ বিষয় রেখে যাচ্ছি। প্রথমত আল্লাহর কিতাব, যার মধ্যে রয়েছে পথের দিশা ও আলো। তোমরা আল্লাহর কিতাবকে গ্রহণ করবে এবং দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে। .... এরপর তিনি বললেন : 'এবং আমার বাড়ির মানুষ বা পরিবার-পরিজন। আমি আমার পরিবার পরিজনের বিষয়ে তোমাদেরকে আল্লাহর কথা মনে রাখতে উপদেশ প্রদান করছি।' এ কথা তিনি তিনবার বলেন।"[২]

ইবনু আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

أَحِبُّوا اللَّهَ وَأَحِبُّونِي (بِحُبِّ اللَّهِ) وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي (بِحُبِّي)

"তোমরা আল্লাহকে ভালবাসবে এবং আল্লাহর ভালবাসায় আমাকে ভালবাসবে এবং আমার ভালবাসায় আমার বাড়ির মানুষদের (পরিবার, বংশধর ও আত্মীয়দের) ভালবাসবে।"[৩]

হাযেরীন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুবারাক সাহচার্য লাভের কারণে বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছেন সাহাবীগণ। প্রথম অগ্রবর্তী মুহাজির ও আনসারগণের জন্য আল্লাহ জান্নাত প্রস্তুত রেখেছেন এবং নিষ্ঠার সাথে তাঁদের অনুসরণ করাই অন্যদের জন্য জান্নাতের পথ বলে ঘোষণা দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন:

وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

"মুহাজির ও আনসারদিগের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করেছেন, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জান্নাত, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত, যেথায় তারা চিরস্থায়ী হবে। এ মহাসাফল্য।"[৪]

অগ্রবর্তীদের মর্যাদার পাশাপাশি অন্যত্র সকল সাহাবীর জান্নাতের সুসংবাদ দিয়ে আল্লাহ বলেন:

لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

"তোমাদের মধ্যে যারা (মক্কা) বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে এবং জিহাদ করেছে তারা এবং পরবর্তীরা সমান নয়; তারা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ তাদের চেয়ে যারা পরবর্তীকালে ব্যয় করেছে এবং জিহাদ

---

[১] সূরা (৪২) শূরা: ২৩ আয়াত।
[২] মুসলিম, আস-সহীহ ৪/১৮৭৩।
[৩] তিরমিযী, আস-সুনান ৫/৬৬৪; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ৩/১৬২। হাদীসটিকে তিরমিযী হাসান এবং হাকিম ও যাহাবী সহীহ বলেছেন।
[৪] সূরা (৯) তাওবা: ১০০ আয়াত।

করেছে। তবে আল্লাহ উভয়কে কল্যাণের (জান্নাতের) প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।"[১]

অন্যত্র আল্লাহ কুরআনে মুমিনগণকে তিনভাগে বিভক্ত করে উল্লেখ করেছেন। প্রথমে মুহাজির এবং আনসারগণের উল্লেখ করে তাঁদের প্রশংসা করেন। এরপর পরবর্তী মুমিনদের বিষয়ে বলেন:

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

"তাদের পরে যারা আগমন করল তারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের পূর্ববর্তী ভ্রাতাগণকে ক্ষমা কর এবং মুমিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে হিংসা বিদ্বেষ রেখ না। হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি তো দয়াদ্র, পরমদয়ালু।"[২]

এভাবে আমরা দেখছি যে, কুরআনের নির্দেশ অনুসারে পরবর্তী সকল প্রজন্মের মুমিনদের দায়িত্ব সকল আনসার ও মুজাহির সাহাবীর জন্য দু'আ করা এবং তাদেরকে অন্তর দিয়ে ভালবাসা। অন্তরে কোনো সাহাবীর প্রতি হিংসা, বিরাগ, বিরক্তি বা বিদ্বেষভাব ঈমানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

হাযেরীন, অগণিত হাদীসে সাহাবীগণের মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে এবং জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। এক হাদীসে উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

أَكْرِمُوْا أَصْحَابِيْ (فَإِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ)، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ يَظْهَرُ الْكَذِبُ.

"তোমরা আমার সাহাবীগণকে সম্মান করবে; কারণ তাঁরাই তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁদের পরে তাঁদের পরবর্তী যুগের মানুষেরা এবং এরপর তাঁদের পরবর্তী যুগের মানুষেরা। এরপর মিথ্যা প্রকাশিত হবে।"[৩]

আবূ হুরাইরা ও আবূ সাঈদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

لا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلا نَصِيفَهُ

"তোমরা আমার সাহাবীগণকে গালি দেবে না। কারণ তোমাদের কেউ যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ দান করে তবুও সে তাদের কারো এক মুদ্দ (প্রায় অর্ধ কেজি) বা তার অর্ধেক পরিমান দানের সমপর্যায়ে পৌঁছাতে পারবে না।"[৪]

হাযেরীন, আরো অনেক আয়াত ও হাদীসে সাহাবীদের মর্যাদা ও ভালবাসার নির্দেশ রয়েছে। কুরআন ও হাদীসের এ সকল নির্দেশনার আলোকে রিসালাতের বিশ্বাসের অংশ হিসেবে মুমিন বিশ্বাস করেন যে, মানব জাতির মধ্যে নবীগণের পরেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব। কোনো সাহাবীকেই কোনো মুমিন সামান্যতম অমর্যাদা, অবজ্ঞা বা ঘৃণা করতে পারেন না। তাঁদের কারো বিষয়েই কোনো অমর্যাদাকর কথা কোনো মুমিন কখনো বলেন না। কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট নির্দেশনার বিপরীতে অস্পষ্ট কথা, ইতিহাসের ভিত্তিহীন কাহিনী বা ইসলামের শত্রুদের অপপ্রচার ও মিথ্যাচরে কান দিতে পারেন না কোনো মুমিন।[৫] আল্লাহ আমাদের ঈমানকে হেফাযত করুন। আমিন।

---

[১] সূরা (৫৭) হাদীদ: ১০ আয়াত।

[২] সূরা (৫৯) হাশর: ১০ আয়াত।

[৩] নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা ৫/৩৮৭; আল-মাকদিসী, আল-আহাদীসুল মুখতারাহ ১/১৯৩, ২৬৬, ২৬৮; তাহাবী, শারহু মা'আনীল আসার ৪/১৫০; মা'মার ইবনু রাশিদ, আল-জামি ১১/৩৪১; আবদ ইবনু হুমাইদ, মুসনাদ, পৃ: ৩৭। হাদীসটির সনদ সহীহ।

[৪] বুখারী, আস-সহীহ ৩/১৩৪৩; মুসলিম, আস-সহীহ ৪/১৯৬৭।

[৫] বিস্তারিত দেখুন: খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা, পৃ. ১১৫-২৪০।

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

أَمَّا بَعْدُ، فَيَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ

بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا

وَقَالَ تَعَالَى: وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

بَارَكَ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ فِيْ الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ. وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ. أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ، فَاسْتَغْفِرُوْهُ وَتُوْبُوْا إِلَيْهِ، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.

সফর মাসের ১ম খুতবাঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আনুগত্য ও অনুকরণ

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লী আলা রাসূলিহীল কারীম। আম্মা বাদ,

সম্মানিত উপস্থিতি, আজ সফর মাসের প্রথম জুমুআ। আজকের খুতবায় আমরা রিসালাতের ঈমানের তৃতীয় বিষয় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আনুগত্য ও অনুসরণের বিষয়ে আলোচনা করব। কিন্তু তার আগে আমরা এ সপ্তাহের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসগুলির বিষয়ে সংক্ষেপ আলোকপাত করি।

হাযেরীন, আজ ইংরেজী ..... মাসের ..... তারিখ। এ সপ্তাহের দিবসগুলির মধ্যে রয়েছে ..... ।

মুহতারাম হাযেরীন, 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'- এ বিশ্বাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো তাঁর আনুগত্য বা ইতাআত ও অনুকরণ বা ইত্তিবায়ে বিশ্বাস করা। একথা বিশ্বাস করা যে, একমাত্র তাঁর আনুগত্য ও অনুকরণের মাধ্যমেই আল্লাহর সন্তুষ্টি ও মুক্তি পাওয়া সম্ভব। তাঁর আনুগত্য ও অনুকরণের বাইরে কোনোভাবেই আল্লাহর সন্তুষ্টি, মুক্তি বা সাওয়াব অর্জন সম্ভব নয়। মুমিনের দায়িত্ব হলো জীবনের সকল ক্ষেত্রে সার্বিকভাবে তার আনুগত্য করা। জীবনের সকল বিষয়ে, সকল ক্ষেত্রে মহানবীর শিক্ষা, বিধান ও নির্দেশ দ্বিধাহীন চিত্তে মেনে নেওয়া। সকল মানুষের কথা ও সকল মতের উর্দ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথাকে স্থান দেওয়া। কুরআন ও হাদীসে এ বিষয়ে বারংবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেনঃ

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

"আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের হুকুম মান্য কর- যদি ঈমানদার হয়ে থাক।"[১]

এভাবে কুরআনে বারংবার আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ﷺ) আনুগত্যকে ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং মুমিনের জাগতিক সফলতা ও পারলৌকিক মুক্তির শর্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। আর আল্লাহর আনুগত্য মূলত তাঁর রাসূলের (ﷺ) আনুগত্যের মাধ্যমেই সম্ভব। কারণ আল্লাহর আনুগত্য করতে হলে তাঁর আদেশ নিষেধ জানতে হবে। আর আল্লাহর আদেশ-নিষেধ একমাত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রাপ্ত ওহীর মাধ্যম ছাড়া কোনোভাবেই জানা সম্ভব নয়। এজন্য আল্লাহ বলেনঃ

مَنْ يُطِعْ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا

"যে ব্যক্তি রাসূলের হুকুম মান্য করল সে আল্লাহরই হুকুম মান্য করল। আর যে লোক বিমুখতা অবলম্বন করল, আমি আপনাকে, তাদের জন্য রক্ষণাবেক্ষণকারী নিযুক্ত করে পাঠাইনি।"[২]

সামাজিক, রাষ্ট্রীয় বা ধর্মীয় "উলূল আমর" বা 'আদেশের মালিক" নেতৃবৃন্দের আনুগত্য প্রয়োজনীয়। তবে এ বিষয়ে যে কোনো মতভেদ হলে তা রাসূলুল্লাহ ﷺ বা তাঁর শিক্ষার নিকট নিয়ে আসতে হবে বা কুরআন-সুন্নাহ অনুসারে নিষ্পত্তি করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেনঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَـــيْءٍ

فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ

"হে ঈমানদারগণ! আনুগত্য কর আল্লাহর, আনুগত্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা 'আদেশের মালিক' তাদের। তারপর যদি তোমরা কোনো বিষয়ে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়ে পড়, তাহলে তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি প্রত্যর্পণ কর, যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিবসের উপর বিশ্বাসী হয়ে থাক।"[৩]

---

[১] সূরা (৮) আনফালঃ ১আয়াত।
[২] সূরা (৪) নিসা : ৮০ আয়াত।
[৩] সূরা (৪) নিসাঃ ৫৯ আয়াত।

হাযেরীন, ইতা'আত বা আনুগত্যের পাশাপাশি মুমিনের দ্বিতীয় দায়িত্ব ইত্তিবা বা অনুকরণ। ইতা'আত বা আনুগত্য অর্থ আদেশ নিষেধ পালন করা। আর আদেশ-নিষেধের বাইরেও কর্মে ও বর্জনে অনুকরণকে আরবীতে 'ইত্তিবা' বলা হয়। 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' বিশ্বাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ ও দাবি হলো কর্মে ও বর্জনে হুবহু তাঁর অনুকরণ করা এবং জীবনের সকল পর্যায়ে কর্মে ও বর্জনে তাঁর অনুসরণ ও অনুকরণ করা। তিনি যা যেভাবে করেছেন তা করা এবং তিনি যা বর্জন করেছেন তা বর্জন করা। কর্মে ও বর্জনে তাঁর সুন্নাত বা জীবনাদর্শই মুসলিমের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ। মহান আল্লাহ বলেন:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

"নিশ্চয় তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে, যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে তাদের জন্য।"[১]

এ থেকে জানা যায় যে, যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে না শুধু তারাই তাঁর আদর্শ গ্রহণ করে না বা পূর্ণাঙ্গ মনে করে না। শুধু তাদের জন্যই অন্য কারো আদর্শের প্রয়োজন হয়। মুমিনদের জন্য তাঁর আদর্শই পরিপূর্ণ আদর্শ। আর হুবহু তাঁর আদর্শে জীবন পরিচালনাই ঈমানের আলামত।

তাঁর আদর্শের অনুসরণই আল্লাহর প্রেম, ক্ষমা ও মুক্তি লাভের একমাত্র পথ। আল্লাহ বলেন:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ

"বল, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, যাতে আল্লাহও তোমাদেরকে ভালবাসেন এবং তোমাদেরকে তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেন। আর আল্লাহ হলেন ক্ষমাকারী দয়ালু। বল, আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য প্রকাশ কর। বস্তুত যদি তারা বিমুখতা অবলম্বন করে, তাহলে আল্লাহ কাফিরদিগকে ভালবাসেন না।"[২]

হাযেরীন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুকরণের অন্যতম দিক হলো, তাঁর কর্ম ও বর্জনের ব্যতিক্রম কিছু না করা। মুমিন বিশ্বাস করেন যে, তিনি যা করেছেন তা বর্জন করে এবং তিনি যা করেন নি তা করে কোনোরূপ সাওয়াব বা বরকত লাভ করা যায় না। মহান আল্লাহ বলেন:

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"অতএব যারা তাঁর (রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর) আদেশের মুখালাফাত বা ব্যতিক্রম করে, তারা যেন সতর্ক হয়, তাদের উপর বিপর্যয় আপতিত হবে, অথবা কোনো কঠিন শাস্তি তাদের উপর আপতিত হবে।"[৩]

'মুখালাফাহ' অর্থ ব্যতিক্রম করা বা বিরোধিতা করা। 'খিলাফ' অর্থ ব্যতিক্রম, বিপরীত বা অসমঞ্জস। এ থেকে আমরা বুঝি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কর্ম, শিক্ষা বা আদর্শের ব্যতিক্রম বা তাঁর পথের ব্যতিক্রম চলা বা তাঁর শিক্ষার ব্যতিক্রম কিছু করাই ভয়ঙ্কর বিপদ ও ধ্বংসের কারণ।

সম্মানিত হাযেরীন, রাসূলুল্লাহ ﷺ অনেক হাদীসে তাঁর পথের বা আদর্শের বাইরে চলতে কঠিনভাবে নিষেধ করেছেন। তিনি যা করেন নি এরূপ কোনো কাজ করলে তাতে কোনো সাওয়াব হবে

---

[১] সূরা (৩৩) আহযাব: ২১ আয়াত।
[২] সূরা (৩) আল-ইমরান-৩১,৩২ আয়াত।
[৩] সূরা (২৪) নূর: ৬৩ আয়াত।

না এবং তা আল্লাহ্ প্রত্যাখ্যান করবেন বলে তিনি জানিয়েছেন। এক হাদীসে তিনি বলেছেন:

مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"আমাদের কর্ম যা নয় এমন কোনো কর্ম যদি কোনো মানুষ করে তাহলে তার কর্ম প্রত্যাখ্যাত হবে (আল্লাহ্র নিকট কবুল হবে না)।"[১]

বিভিন্ন হাদীসে এরূপ নব-উদ্ভাবিত কর্মকে তিনি বিদ'আত নামে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন:

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ

"তোমাদের উপর দায়িত্ব হলো আমার সুন্নত ও সুপথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত অনুসরণ করা। তোমরা দৃঢ়ভাবে তা আঁকড়ে ধরবে, কোনো প্রকারেই তার বাইরে যাবে না। আর তোমরা (আমার ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতের বাইরে) নতুন উদ্ভাবিত সকল বিষয় সর্বতোভাবে পরিহার করবে; কারণ সকল নতুন উদ্ভাবিত বিষয়ই বিদআত এবং সকল বিদআতই বিভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতা।"[২]

হাযেরীন, অনেক সময় আবেগী মুমিন আল্লাহর সন্তুষ্টি, বরকত ও সাওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে ভাল কাজ বেশি করে করতে চান। এ আবেগে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ যা করেছেন তা পালন করা ছাড়াও অতিরিক্ত আরো ভাল কাজ করতে চান। এভাবে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ যা করেন নি তা করে সাওয়াব লাভের আশা করেন। এ বিষয়ে উম্মাতকে সাবধান করেছেন। আনাস বিন মালেক (রা.) বলেন :

جَاءَ ثَلاثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا فَقَالُوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ. قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا. وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلا أُفْطِرُ. وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا. فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: "أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي".

"তিন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর স্ত্রীগণের নিকট যেয়ে তাঁর ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁরা তাঁর ইবাদত সম্পর্কে জানালেন। মনে হলো প্রশ্নকারীগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইবাদত কিছুটা কম ভাবলেন। তাঁরা বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে কি আমাদের তুলনা হতে পারে? আল্লাহ তাঁর পূর্ববর্তী ও পবরর্তী সকল গোনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন (তাঁর কোনো গোনাহ নেই, আর আমরা গোনাহগার উম্মত, আমাদের উচিৎ তাঁর চেয়েও বেশি ইবাদত করা)। তখন তাদের একজন বললেন: আমি সর্বদা সারা রাত জেগে (তাহাজ্জুদের) সালাত আদায় করব। অন্যজন বললেন: আমি সর্বদা সিয়াম পালন করব, কখনই রোযা ভাঙ্গব না। অন্যজন বললেন: আমি কখনো বিবাহ করব না, আজীবন নারী সংসর্গ পরিত্যাগ করব। রাসূলুল্লাহ ﷺ এদের কথা জানতে পেরে এদেরকে বলেন: তোমরা কি এ ধরনের কথা বলেছ? তোমরা জেনে রাখ! আমি তোমাদের সকলের চেয়ে আল্লাহকে বেশি ভয় করি, তাকওয়ার দিক থেকে আমি তোমাদের সবার উপরে অবস্থান করি। তা সত্ত্বেও আমি মাঝেমাঝে (নফল)

---

[১] মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৩৪৩; বুখারী, আস-সহীহ ২/৭৫৩, ৯৫৯, ৬/২৬২৮, ২৬৭৫।

[২] তিরমিযী, আস-সুনান ৫/৪৪; আবূ দাউদ, আস-সুনান ৪/২০০; ইবনু মাজাহ ১/১৫। তিরমিযী বলেন: হাদীসটি সহীহ হাসান।

সিয়াম পালন করি, আবার মাঝেমাঝে সিয়াম পরিত্যাগ করি। রাতে কিছু সময় তাহাজ্জুদ আদায় করি এবং কিছু সময় ঘুমাই। আমি বিবাহ করেছি- স্ত্রীদেরকে সময় প্রদান করি। যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত অপছন্দ করল তার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।"[১]

অন্য হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) বলেন,

أَرْسَلَ إِلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ لِي أَتَصُومُ النَّهَارَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَنَامُ وَأَمَسُّ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي ....ثُمَّ قَالَ ﷺ فَإِنَّ لِكُلِّ عَابِدٍ شِرَّةً وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةً فَإِمَّا إِلَى سُنَّةٍ وَإِمَّا إِلَى بِدْعَةٍ فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى سُنَّةٍ فَقَدِ اهْتَدَى وَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَقَدْ هَلَكَ.

"রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে ডেকে নিয়ে বলেন: তুমি কি প্রতিদিন সিয়াম পালন কর? আমি বললাম: হাঁ। তিনি বলেন: তুমি কি সারা রাত জেগে সালাত আদায় কর? আমি বললাম: হাঁ। তিনি বললেন: কিন্তু আমি তো সিয়াম পালন করি, আবার মাঝে মাঝে বাদ দিই, রাতে সালাত আদায় করি, আবার ঘুমাই, স্ত্রীদেরকে সময় প্রদান করি। আর যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে অপছন্দ করল আমার সাথে তার সম্পর্ক থাকবে না।... এরপর তিনি বলেন: প্রত্যেক আবেদের কর্মের উদ্দীপনার জোয়ার ভাটা আছে। ইবাদতের উদ্দীপনা কখনো তীব্র হয় আবার এই তীব্রতা এক সময় থেমে যায়, কখনো সুন্নাতের দিকে, কখনো বিদ'আতের দিকে। যার স্থিতি-প্রশান্তি সুন্নাতের প্রতি হবে সে হেদায়েত প্রাপ্ত হবে। আর যার স্থিতি-প্রশান্তি অন্য কিছুর দিকে হবে সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।"[২]

হাযেরীন, একটু চিন্তা করুন! এখানে এ সকল সাহাবী মূলত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রীতিকে অপছন্দ করেন নি। তাঁরা তাঁর রীতি জেনেছিলেন এবং মেনেও নিয়েছিলেন, তবে তাঁদের নিজেদের জন্য অতিরিক্ত কিছু সুন্নাতের ব্যতিক্রম নেক আমলের কথা চিন্তা করেছিলেন। আমরা জানি, সারারাত তাহাজ্জুদ আদায় করা নিষিদ্ধ নয়। হারাম দিবসগুলি বাদ দিয়ে সারা মাস সিয়াম পালনও নিষিদ্ধ নয়। অনুরূপভাবে কোনো পুরুষের প্রয়োজন না থাকলে বা অসুবিধা থাকলে অবিবাহিত থাকাও সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে তাঁদেরকে নিষেধ করেছেন। কারণ আল্লাহর নৈকট্য, বেলায়াত, সন্তুষ্টি বা সাওয়াবের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রীতির বাইরে বা অতিরিক্ত কোনো আমলের চিন্তা করাও মুমিনের উচিত নয়। এতে সুন্নাতকে অপূর্ণ মনে হতে পারে। সুন্নাতের অতিরিক্ত আমলের রীতি করলে মানুষের মনে এ ধারণা সৃষ্টি হতে পারে যে, কেবলমাত্র সুন্নাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে কর্ম করলে বোধহয় প্রয়োজনীয় বেলায়াত বা সাওয়াব অর্জন করা সম্ভব হবে না। যেমন, মনে হতে পারে তাহাজ্জুদ খুবই ভাল ইবাদত, কাজেই রাতে কিছু সময় ঘুমিয়ে নষ্ট করার চেয়ে সারারাত এই মহান ইবাদতে মাশগুল থাকাই উত্তম। রাতের অনেকখানি সময় ঘুমিয়ে নষ্ট করে কি লাভ? ইত্যাদি। এভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি কোনো অবজ্ঞা না আসলেও, অন্য যে ব্যক্তি অবিকল সুন্নাত অনুসারে রাতে কয়েকঘন্টা ঘুমাচ্ছেন এবং কয়েকঘন্টা তাহাজ্জুদ পড়ছেন তার প্রতি অবজ্ঞা আসতে পারে। আর একেই রাসূলুল্লাহ ﷺ 'তাঁর সুন্নাতকে অপছন্দ

---

[১] বুখারী, আস-সহীহ ৫/১৯৪৯।

[২] আহমাদ ইবনু হাম্বাল, মুসনাদ,নং ৬৪৪১, ৬৬৬৪, হাইসামী, মাওয়ারিদুয যামআন বি যাওয়াইদি ইবন হিব্বান ২/৩৯৪, নং ৬৫৩, ইবনু আবী আসেম, কিতাবুস সুন্নাত, পৃ: ২৭- ২৮, নং ৫১, আলবানী, সাহীহুত তারগীব ১/৯৮।

করা' বলে আখ্যায়িত করেছেন। যদি কেউ সাময়িক উদ্দীপনায় এরূপ অতিরিক্ত কিছু করে তবে তা মার্জনীয়, তবে যদি তার স্থিতি, রীতি ও অভ্যাস সুন্নাতের ব্যতিক্রম হয় তবে তা ধ্বংসাত্মক।

মুহতারাম হাযেরীন, সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হলো, মুমিন কেন সুন্নাতের অতিরিক্ত বা সুন্নাতের ব্যতিক্রম কাজ করবে? জান্নাতের জন্য তো সুন্নাতই যথেষ্ট। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

مَنْ أَكَلَ طَيِّبًا وَعَمِلَ فِي سُنَّةٍ وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ

"যে ব্যক্তি হালাল খাদ্য খেয়ে জীবনযাপন করবে, সুন্নাত অনুসারে আমল করবে এবং কোনো মানুষ তাঁর দ্বারা কষ্ট পাবে না, সে ব্যক্তি জান্নাতী হবে।"[১]

তাবেয়ী হাসান বসরী (রাহ.) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

عَمَلٌ قَلِيلٌ فِي سُنَّةٍ خَيْرٌ مِنْ عَمَلٍ كَثِيرٍ فِي بِدْعَةٍ وَمَنِ اسْتَنَّ بِي فَهُوَ مِنِّي وَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

"সুন্নাতের মধ্যে অল্প আমল করা বিদ'আতের মধ্যে অনেক আমল করার চেয়ে উত্তম। যে আমার সুন্নাত অনুসরণ করবে সে আমার উম্মত, আমার সাথে সম্পর্কিত। আর যে আমার সুন্নাত অপছন্দ করবে তার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।"[২]

সুন্নাত মোতাবেক অল্প আমলেই যদি বেশি আমলের চেয়ে বেশি সাওয়াব পাওয়া যায় তাহলে কেন মুমিন কষ্ট করে সুন্নাতের ব্যতিক্রম আমল করবে? অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامَ الصَّبْرِ، لِلْمُتَمَسِّكِ فِيهِنَّ يَوْمَئِذٍ بِمَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرُ خَمْسِينَ مِنْكُمْ

"তোমাদের সামনে রয়েছে ধৈর্যের সময়, এখন তোমরা যে কর্মের উপর আছ সে সময়ে যে ব্যক্তি অবিকল তোমাদের পদ্ধতি আকড়ে ধরে থাকবে, সে ব্যক্তি তোমাদের মধ্যকার পঞ্চাশ জন ব্যক্তির সমপরিমাণ সাওয়াব লাভ করবে।"[৩]

মুহতারাম হাযেরীন, একটু চিন্তা করুন! সুন্নাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারলে ৫০ জন সাহাবীর সমান সাওয়াব! তাহলে কেন সুন্নাতের বাইরে যাব? সর্বোপরি সুন্নাত পালন ও জীবিত করলে সবচেয়ে বড় মর্যাদা জান্নাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহচার্য পাওয়া যাবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

مَنْ أَحْيَا سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ

"যে আমার সুন্নাতকে (পালন ও প্রচারের মাধ্যমে) জীবিত করবে, সে আমাকেই ভালবাসবে। আর যে আমাকে ভালবাসবে, সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।"[৪]

হাযেরীন, আমরা অনেক সময় জায়েয, বিদআতে হাসানা, বিদআতে সাইয়েয়াহ ইত্যাদি নিয়ে

---

[১] সুনানে তিরমিযী, কিতাবু সিফাতিল কিয়ামাহ, নং ২৫২০। হাকিম নাইসাপূরী, আল-মুস্তাদরাক ৪/১১৭, ইবনে আবীদ দুনিয়া, কিতাবুস সামত ও আদাবুল লিসান, মাওসূআতু ইবনে আবীদ দুনিয়া ৫/৪৮। ইমাম তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করে হাদীসটির সনদে দুর্বলতা আছে বলে জানিয়েছেন। ইমাম হাকিম ও ইমাম যাহাবী হাদীসটিকে 'সহীহ' বলেছেন।

[২] আব্দুর রাজ্জাক সানআনী, আল-মুসান্নাফ ১১/২৯১, নং ২০৫৬৮। হাসান বসরী পর্যন্ত হাদীসটির সনদ মুরসালরূপে সহীহ। এ ছাড়া বিভিন্ন সনদের আলোকে মুত্তাসিল হিসাবে হাদীসটি গ্রহণ যোগ্য। দেখুন: শাতেবী, আল-ইতিসাম ১/১০৮।

[৩] মুহাম্মাদ ইবনু নাসর আল-মারওয়াযী, আস-সুন্নাহ, পৃ. ১৪; তাবারানী, আল-মু'জাম আল-কাবীর ১০/১৮২; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৭/২৮২; আলবানী, সাহীহাহ ১/৮৯২-৮৯৩।

[৪] সুনানে তিরমিযী, কিতাবুল ইলম, নং ২৬০২। তিনি হাদীসটিকে হাসান ও গরীব বলেছেন।

বিতর্ক করি। এগুলি ইলমী বিষয়, আলিমরা বিতর্ক করবেন। তবে মুমিনের জন্য নিরাপত্তা হলো সুন্নাতের মধ্যে থাকা। কর্মে ও বর্জনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হুবহু অনুসরণই সুন্নাত। যে কর্ম তিনি যেভাবে যতটুকু করেছেন তা ঠিক সেভাবে ততটুকু করাই সুন্নাত। যা তিনি করেন নি তা না করাই সুন্নাত। কর্মে ও বর্জনে অবিকল তাঁর অনুসরণই সুন্নাত। জায়েজ অর্থ তিনি যা করেন নি এবং করতে নিষেধও করেন নি এমন কর্ম, যা করলে গোনাহ হবে না। বিদ'আতে হাসানা অর্থ যে কাজ রাসূলুল্লাহ ﷺ বা সাহাবীগণ করেন নি বা যে পদ্ধতিতে করেন নি পরবর্তী যুগের মানুষেরা দলীলের ভিত্তিতে সে কর্ম বা রীতি উদ্ভাবন করেছেন। কেউ তা হাসানা বা ভাল বলেছেন এবং কেউ তা সাইয়েয়াহ বা খারাপ বলেছেন। তবে সর্বাবস্থায় বিদ'আত যতই হাসানা বা ভাল হোক তা সুন্নাত নয়। সুন্নাত হলে তো আর তাকে বিদ'আতে হাসানা বলা হতো না, সুন্নাতই বলা হতো। বাধ্য হলে বা জাগতিক প্রয়োজনে আমরা জায়েজ কাজ করতে পারি। সাওয়াব না হলেও গোনাহ তো হলো না। কিন্তু সাওয়াবের জন্য সুন্নাত বাদ দিয়ে জায়েজ বা বিদআতে হাসানার দরকার কী? যেখানে সুন্নাত পদ্ধতি আমল করলে পরিপূর্ণ সাওয়াব, অল্প আমল বেশি সাওয়াব, ৫০ জন সাহাবীর সমপরিমাণ সাওয়াব ও জান্নাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহচার্য, সেখানে সুন্নাত ছেড়ে জায়েয বা বিদ'আতে হাসানার মধ্যে যাওয়ার দরকার কী?

হাযেরীন, এজন্য মুমিনের দায়িত্ব হলো, সকল ইবাদতে সুন্নাতের অনুসরণ করা। এই হলো আমাদের ঈমানের দাবি। "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" অর্থ আমরা একমাত্র আল্লহরই ইবাদত করব। আর "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" অর্থ আল্লাহর ইবাদত আমরা একমাত্র মুহাম্মাদ ﷺ থেকেই শিখব। প্রতিটি ইবাদতই হুবহু তার পদ্ধতি ও রীতিতে পালন করতে হবে। যে কোনো ইবাদত বন্দেগির বিষয়ে বিতর্ক হলে যুক্তি তর্কের মধ্যে না গিয়ে একটি সহজ প্রশ্ন করতে হবে: এ ইবাদতটি রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণ কিভাবে পালন করেছেন। সহীহ হাদীসের আলোকে আমি তা জানতে চাই এবং আমি সেভাবেই পালন করতে চাই। জায়েয, বিদআতে হাসানাহ, বিদআতে সাইয়েয়াহ ইত্যাদি বিতর্কে আমি জড়াতে চাই না।

হাযেরীন, আমরা ব্যবসায়ী। আমাদের পুঁজি একটি মাত্র জীবন। এই জীবনে যা অর্জন করতে পারব তাই আমাদের সম্বল হবে। দেখে এসে ভুল শুধরে নিয়ে দ্বিতীয়বার আর বিনিয়োগ করতে পারব না। কী দরকার রিস্ক নেওয়ার? মনে করুন আপনার কাছে এক লক্ষ টাকা পুঁজি আছে। আপনার সামনে দুটি বিনিয়োগের খাত আছে। একটি খাতে লাভ নিশ্চিত। অপর খাতে কেউ বলছেন লাভ হবে; কেউ বলছেন লাভ না হলেও ক্ষতি হবে না, আর কেউ বলছেন ক্ষতি হবে। আপনি কোন্ খাতে বিনিয়োগ করবেন? নিশ্চয় যে খাতে লাভ সুনিশ্চিত। একান্ত বাধ্য না হলে তো আপনি কখনো ঝুকি নিয়ে বিনিয়োগ করবেন না। তাহলে আখেরাতের ক্ষেত্রে একান্ত বাধ্য না হলে ঝুকি নেব কেন ?

আসুন আমরা আমাদের আখেরাতের পুঁজি ও ব্যবসা বিবেচনা করি। কোনোরূপ হ্রাস বৃদ্ধি না করে কর্মে ও বর্জনে সুন্নাত পালন করলে যে লাভ হবে সে বিষয়ে কারো কোনো সন্দেহ বা বিতর্ক নেই। সুন্নাতের ব্যতিক্রম হলেই মতবিরোধ: কেউ বলছেন লাভ হবে, কেউ বলছেন ক্ষতি নেই, কেউ বলছেন ক্ষতি হবে। এখন আমরা কী করব? সাধ্যমতো সুন্নাতের মধ্যে থাকার চেষ্টা করব ? না কি সুযোগ পেলেই নতুন খাতে বিনিয়োগ করে ঝুকি নিয়ে দেখব?[১]

আল্লাহ আমাদেরকে সুন্নাতকে ভালবাসার, পালন করার ও জীবিত করার তাওফীক দিন, আমীন।

---

[১] সুন্নাতের পরিচয় ও গুরুত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে লেখকের লেখা "এহইয়াউস সুনান, সুন্নাতের পুনরুজ্জীবন ও বিদআতের বিসর্জন" বইটি পড়ুন।

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

أَمَّا بَعْدُ، فَيَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمْ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ

وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّـوْا فَإِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ

وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَـا وَعَـضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَـةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَكَلَ طَيِّبًا وَعَمِلَ فِي سُنَّةٍ وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

بَارَكَ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ فِيْ الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ. وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ. أَقُـوْلُ قَـوْلِيْ هَـذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُـلِّ ذَنْـبٍ، فَاسْتَغْفِرُوْهُ وَتُوْبُوْا إِلَيْهِ، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.

সফর মাসের ২য় খুতবা: ফিরিশতা, কিতাব ও রাসূলগণের ঈমান

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লী আলা রাসূলিহীল কারীম। আম্মা বাদ,

সম্মানিত উপস্থিতি, আজ সফর মাসের দ্বিতীয় জুমুআ। আজ আমরা ঈমানের তিনটি রুকন আলোচনা করব: ফিরিশতাগণের প্রতি ঈমান, কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান ও রাসূলগণের প্রতি ঈমান। তার আগে আমরা এ সপ্তাহের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসগুলির বিষয়ে সংক্ষেপ আলোকপাত করি।

হাযেরীন, আজ ইংরেজী ..... মাসের ..... তারিখ। এ সপ্তাহের দিবসগুলির মধ্যে রয়েছে ..... ।

....

হাযেরীন, ঈমানের দ্বিতীয় রুকন আল্লাহর ফিরিশতাগণে বিশ্বাস করা। আরবী "মালাক" অর্থ পত্র বা দূত। আরবী মালাককে ফার্সী ভাষায় ফিরিশতা বলা হয়েছে, যা বাংলাতেও ব্যবহার করা হয়। মুমিন বিশ্বাস করেন যে, মালাকগণ আল্লাহর বিশেষ সৃষ্টি। তাঁরা অদৃশ্য জগতের অংশ। তাঁদের সৃষ্টি, আকৃতি, প্রকৃতি, গুণাবালি, কর্ম ও দায়িত্ব সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে যা কিছু প্রমাণিত তা সবই মুমিন আক্ষরিক ও সরলভাবে বিশ্বাস করেন। মুমিন বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ অনেক মালাইকা সৃষ্টি করেছেন, যাঁরা আল্লাহর সম্মানিত সৃষ্টি। তাঁরা মানবীয় দুর্বলতা ও কামনা বাসনা থেকে মুক্ত। তারা সর্বদা আল্লাহর আনুগত্য করেন এবং আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করার কোনো অনুভূতি তাদের মধ্যে নেই।

কুরআন ও হাদীসের আলোকে আমরা জানতে পারি যে, মহান আল্লাহ অগণিত ফিরিশতা সৃষ্টি করেছেন, যারা সর্বদা আল্লাহর তাসবীহ-তাহলীল ও তাঁর দেওয়া দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত। বৃষ্টি, রিযক, মৃত্যু, মানুষের রক্ষণাবেক্ষণ, প্রহরা, মানুষের কর্ম লিপিবদ্ধ করা, মানুষের জন্য দু'আ করা, মানুষদেরকে ভাল কাজের প্রেরণা দেওয়া, আরশ বহন ইত্যাদি অগণিত দায়িত্বে তারা নিয়োজিত। এরা বিশ্বজগত পরিচালনায় আল্লাহর ইচ্ছা ও নির্দেশের বাস্তবায়ন করেন।[১]

হাযেরীন, ঈমানের তৃতীয় ও চতুর্থ রুকন হলো আল্লাহর কিতাবসমূহে এবং আল্লাহর রাসূলগণে বিশ্বাস করা। মুমিনকে সুদৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বিশ্বাস করতে হবে যে, মানব জাতির হেদায়াতের জন্য আল্লাহ যুগে যুগে নবী-রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন এবং তাদের কাছে ওহীর মাধ্যমে কিতাব প্রদান করেছেন।

হাযেরীন, মানুষের প্রতি আল্লাহর করুণা অসীম। তিনি মানুষকে বিবেক, বুদ্ধি ও উন্নত জ্ঞান দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। এরপরও মানুষদেরকে কল্যাণ ও মঙ্গলের পথ প্রদর্শনের জন্য তিনি যুগে যুগে বিভিন্ন সমাজের মধ্যে থেকে বিভিন্ন মানুষকে বেছে নিয়ে তাঁদের কাছে ওহীর মাধ্যমে মানুষের সঠিক পথের সন্ধান দান করেছেন। আল্লাহর মনোনীত এসকল মানুষকে ইসলামের পরিভাষায় নবী বা রাসূল বলা হয়। নবী অর্থ সংবাদপ্রাপ্ত বা সংবাদদাতা এবং রাসূল অর্থ দূত বা বার্তাবাহক। যাকে আল্লাহ ওহী প্রদান করেন তিনিই নবী বা সংবাদপ্রাপ্ত। আর যাকে আল্লাহ ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত নির্দেশাবলি মানুষের কাছে প্রচারের দায়িত্ব দেন তিনি নবী এবং রাসূল। এজন্য সকল রাসূলই নবী, তবে সকল নবী রাসূল নন।

মহান আল্লাহ সকল যুগে সকল সমাজেই নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। তিনি বলেন:

وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلا خَلا فِيهَا نَذِيرٌ

"প্রত্যেক জাতিতেই সর্তককারী প্রেরণ করা হয়েছে।"[২]

---

[১] ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ৬/৩১১-৩১৭; ইবনুল কাইয়িম, ইগাসাতুল লাহফান মিন মাসাইদিশ শায়তান ২/১২৫-১২৬।
[২] সূরা (৩৫) ফাতির: ২৪ আয়াত।

নবী-রাসূলদের সংখ্যার বিষয়ে কোনো প্রসিদ্ধ গ্রন্থে কোনো হাদীস পাওয়া যায় না। কোনো কোনো হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, নবীগণের সংখ্যা ১ লক্ষ ২৪ হাজার। অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে নবীগণের সংখ্যা ছিল ৮ হাজার। অন্য হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবীগণের সংখ্যা এক হাজার বা তার বেশি ছিল। একাধিক হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলগণের সংখ্যা ছিল ৩১৩ জন বা ৩১৫ জন। এ সকল হাদীসের অধিকাংশই দুর্বল সনদে বর্ণিত হয়েছে। সামগ্রিক বিচারে একাধিক সনদের কারণে কোনো কোনো মুহাদ্দিস হাদীসগুলিকে গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করেছেন।[১] মোল্লা আলী কারী বলেন: "বর্ণিত হয়েছে যে, নবীগণের সংখ্যা ১ লক্ষ ২৪ হাজার। কোনো কোনো বর্ণনায়: ২ লক্ষ ২৪ হাজার। তবে তাঁদের বিষয়ে কোনো সংখ্যা নির্ধারণ না করাই উত্তম.... বরং জরুরী এই যে, আল্লাহ যেভাবে বলেছেন সেভাবে সাধারণভাবে নবী-রাসূলগণের উপর ঈমান আনা ... ফিরিশতাগণের সংখ্যা, কিতাবসমূহের সংখ্যা, নবীগণের সংখ্যা, রাসূলগণের সংখ্যা ইত্যাদি বিষয়ে মনোনিবেশ না করা।"[২]

কুরআনে ২৫ জন নবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে: আদম, ইদরিস, নূহ, হুদ, সালিহ, ইবরাহীম, লূত, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব, ইউসূফ, আইয়ূব, শুয়াইব, মূসা, হারূন, ইউনূস, দাউদ, সুলাইমান, ইল্‌ইয়াস, ইল্‌ইয়াসা', যুলকিফল, যাকারিয়া, ইয়াহইয়া, ঈসা, মুহাম্মাদ (আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালাম)।[৩]

কুরআন কারীমে উল্লেখ করা হয়েছে যে, উযাইরকে ইহূদীগণ আল্লাহর পুত্র বলে দাবি করত।[৪] কিন্তু তাঁর নবুয়ত সম্পর্কে কিছু বলা হয় নি। আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

مَا أَدْرِيْ أَعُـزَيْـرٌ نَـبِـيٌّ هُـوَ أَمْ لاَ

"আমি জানি না যে, উযাইর নবী ছিলেন কি না।"[৫]

কুরআন কারীমে উল্লিখিত নবী-রাসূলগণকে আমরা নির্দিষ্টভাবে আল্লাহর মনোনীত নবী হিসেবে বিশ্বাস করি। এঁদের সবাইকে আমরা ভালবাসি ও শ্রদ্ধা করি। আমরা বিশ্বাস করি যে, তারা সবাই মা'সূম বা নিষ্পাপ ছিলেন এবং নিষ্কলুষ চরিত্রের পবিত্র মানুষ ছিলেন। তাঁরা আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁদের প্রতি প্রদত্ত দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে পালন করেছেন। তাঁরা সবাই আল্লাহর প্রিয় বান্দা ও নবী ছিলেন। এঁদের নবুয়ত বা রিসালত আমরা অস্বীকার করিনা। কেউ যদি এঁদের কারো নবুয়ত বা রিসালাত অস্বীকার করেন, অথবা এঁদের ঘৃনা বা অবমাননা করেন তিনি অবিশ্বাসী বা কাফির বলে গণ্য হবেন।

কুরআন-হাদীসে যাদেরকে নবী হিসেবে উল্লেখ করা হয় নি তাদের কাউকে আমরা নির্দিষ্টরূপে আল্লাহর মনোনীত নবী বলতে পারিনা। অন্য কোনো মানুষের সম্পর্কেই আমরা বলতে পারিনা যে, তিনি আল্লাহর নবী ছিলেন। তবে আমরা বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ যুগে যুগে আরো অনেক নবী রাসূল প্রেরণ করেছেন, যারা আল্লাহর মনোনীত প্রিয় পুত-পবিত্র, নিষ্পাপ, নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী বান্দা ছিলেন। তাঁরা তাঁদের প্রতি প্রদত্ত দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করেছেন। তাঁদের নাম বা বিবরণ আমরা জানিনা।

মহান আল্লাহ নবী-রাসূলদেরকে ওহীর মাধ্যমে 'কিতাব' প্রদান করেন, যেগুলি সন্দেহাতীতভাবে আল্লাহর বাণী, আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্য হেদায়াত, মানবজাতির পথনির্দেশক নূর। আল্লাহ বলেন:

---

[১] মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদীসিস সাহীহাহ ৬/৩৫৮-৩৬৯; খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, হাদীসের নামে জালিয়াতি ২২৫-২৪৫

[২] মোল্লা আলী কারী, শারহুল ফিকহিল আকবার, পৃ. ৯৯-১০১।

[৩] ইবনু কাসীর, তাফসীর ১/৫৮৬; কুরতুবী, তাফসীর, ৩/৩১;

[৪] সূরা ৯: তাওবা, আয়াত ৩০।

[৫] আবূ দাউদ, আস-সুনান ৪/২১৮; আযীম আবাদী, আউনুল মা'বূদ ১২/২৮০।

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ

"সকল মানুষ ছিল একই উম্মতভূক্ত। অত:পর আল্লাহ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে নবীগণকে প্রেরণ করেন এবং মানুষের মাঝে যে সকল বিষয়ে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল সে সকল বিষয়ে বিধান দানের জন্য তাদের সাথে সত্যসহ গ্রন্থ অবতীর্ণ করেন।"[১]

আমরা বিশ্বাস করি যে, নবীগণের প্রতি প্রদত্ত আল্লাহর সকল গ্রন্থই ছিল সত্য ও কল্যাণের পথের দিশারী। কিন্তু আমরা এ সকল গ্রন্থের অধিকাংশেরই কোনো নাম বা বিষয়বস্তু জানি না। আমরা কেবল আল্লাহর অপার করুণা, মানব জাতির হেদায়াতের জন্য গ্রন্থ নাযিলের ধারায় বিশ্বাস করি। কুরআন ও হাদীসে পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের মধ্য থেকে 'তাওরাত', 'যাবূর' ও 'ইনজীল'- এই তিনটি পুস্তকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ মূসা (আ), দাঊদ (আ) ও ঈসা (আ)-কে এ গ্রন্থত্রয় প্রদান করেন। এ সকল গ্রন্থে আল্লাহর হেদায়াত ও নূর ছিল। পরবর্তীকালে এ সকল ধর্মের অনুসারীগণ এ সকল গ্রন্থ বিকৃত করেছে। তাদের বিকৃতির তিনটি দিক বিশেষভাবে কুরআন কারীমে উল্লেখ করা হয়েছে: (১) তারা আল্লাহর কিছু কিতাব ভুলে গেছে, (২) কিছু কথা স্থানচ্যুত বা বিকৃত করেছে এবং (৩) কিছু কথা সংযোজন বা জালিয়াতি করে আল্লাহর কালাম বলে চালিয়েছে। এ বিষয়ে একস্থানে আল্লাহ বলেন:

يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ

"তারা শব্দগুলিকে স্বস্থান থেকে বিকৃত করে এবং তাদেরকে যা শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল তার এক অংশ ভুলে গিয়েছে।"[২]

অন্যত্র আল্লাহ বলেন:

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ

"সুতরাং দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা নিজ হাতে কিতাব রচনা করে এবং তুচ্ছ মূল্য প্রাপ্তির জন্য বলে, 'এ আল্লাহর নিকট হতে'। তাদের হাত যা রচনা করেছে তার জন্য দুর্ভোগ তাদের এবং যা তারা উপার্জন করে তার জন্য দুর্ভোগ তাদের।"[৩]

হাযেরীন, এ বিষয়ে কুরআনে আরো অনেক আয়াত রয়েছে। কুরআন নাযিলের সময় এবং পরবর্তী প্রায় হাজার বৎসর যাবত ইহূদী-খৃস্টানগণ দাবি করত যে, তাদের নিকট বিদ্যমান তাওরাত, যাবূর, ইনজীল ইত্যাদি গ্রন্থ সবই আক্ষরিকভাবে বিশুদ্ধ। এর মধ্যে কোনোরূপ বিকৃতি হয় নি। কিন্তু গত কয়েকশত বছরের গবেষণার মাধ্যমে ইহূদী খৃস্টানগণই প্রমাণ করেছেন যে, সত্যই তারা বাইবেলের অনেক পুস্তিকা হারিয়ে ফেলেছে, হাজার হাজার স্থানে পরিবর্তন বা বিয়োজনের মাধ্যমে বিকৃতি সাধন করা হয়েছে, অনেক কথা তারা নিজেরা লিখে এ সকল গ্রন্থের মধ্যে সংযোজন করেছে এবং অনেক জাল 'কিতাব' লিখে তারা 'আল্লাহর কিতাব' বলে চালিয়েছে। তাদের এ আবিষ্কার কুরআন কারীমের অলৌকিক সত্যতার আরেকটি

[১] সূরা (২) বাক্বারা: ২১৩ আয়াত।
[২] সূরা (৫) মায়িদা: ১৩ আয়াত। আরো দেখুন: সূরা মায়িদা ৪১ আয়াত।
[৩] সূরা (২) বাকারা ৭৯ আয়াত।

প্রমাণ। যে কোনো পাশ্চাত্য ইনসাইক্লোপিডীয়ায় বাইবেল বিষয়ক প্রবন্ধ বা এ বিষয়ে পাশ্চাত্য গবেষকদের বই পড়লেই আপনারা বিষয়টি জানতে পারবেন।

সম্মানিত মুসল্লীবৃন্দ, খৃস্টান গবেষকগণ বাইবেলের বিকৃতি একবাক্যে স্বীকার করলেও খৃস্টান মিশনারীগণ মুসলিম দেশগুলিতে এ সকল বিকৃত জাল গ্রন্থগুলিকে "ইঞ্জিল শরীফ", "তাওরাত শরীফ", "যাবূর শরীফ" ইত্যাদি নামে প্রচার করে সাধারণ মুসলিমদেরকে ধোঁকা দিতে চেষ্টা করছে। সরলপ্রাণ কোনো কোনো মুসলিম এগুলিকে প্রকৃত তাওরাত, ইঞ্জিল বা যাবূর মনে করে পড়ে বিভ্রান্ত হচ্ছে। এ বিষয়ে আমাদের সজাগ ও সতর্ক হওয়া দরকার।

হাযেরীন, মহাগ্রন্থ আল-কুরআন হলো আল্লাহর নাযিলকৃত আসমানী গ্রন্থসমূহের শেষ গ্রন্থ, যা তিনি তাঁর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর অবতীর্ণ করেন। বিশ্বের সকল যুগের সকল মানুষের মুক্তির দিশারী হিসেবে আল্লাহ এ গ্রন্থ নাযিল করেন। আল্লাহ বলেন:

كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ

"আমি এই কিতাব আপনার উপর নাযিল করেছি যেন আপনি মানবজাতিকে তাদের প্রতিপালকের নির্দেশে অন্ধকার থেকে আলোতে বের করে নিয়ে আসেন।"[১]

কুরআনের প্রতিটি অক্ষর, শব্দ ও বাক্য আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বয়স যখন ৪০ বৎসর তখন থেকে আল্লাহ তাঁর কাছে ওহীর মাধ্যমে কুরআন প্রেরণ করতে শুরু করেন। পরবর্তী ২৩ বৎসর যাবৎ বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজন মত কুরআনের বিভিন্ন সুরা ও আয়াত অবতীর্ণ করা হয়। ২৩ বৎসরে তা পরিপূর্ণরূপে অবতারিত হয়। আল্লাহর নিকট থেকে জিবরাঈল (আ) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে ওহী নিয়ে আসতেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তা পরিপূর্ণভাবে মুখস্থ করে নিতেন। এরপর তিনি তার সাহাবীদেরকে নির্দেশ দিতেন তা মুখস্থ করার জন্য এবং লিখে রাখার জন্য। এভাবে পরিপূর্ণ কুরআন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জীবদ্দশায় পৃথক পৃথক কাগজ, চামড়া, হাড় ইত্যাদিতে লিপিবদ্ধ করা হয় এবং অসংখ্য সাহাবী তা মুখস্থ করে নেন। তাঁর সময় থেকেই তিনি ও সাহাবীগণ সাধারণ সালাতে এবং বিশেষত রাত্রিতে তাহাজ্জুদের সালাতে নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত ও খতম করতেন, অনেক সাহাবীই ৩ থেকে ৭ রাত্রিতে তাহাজ্জুদের সালাতে কুরআন খতম করতেন। এছাড়া নিজের কাছে সংরক্ষিত লিখিত পাণ্ডুলিপি থেকে দেখে দেখে দিবসে ও রাত্রিতে তা পাঠ করা ছিল তাঁদের প্রিয়তম ইবাদত।

এভাবে মূলত মুমিনদের হৃদয়ে মুখস্থ রেখে ও নিয়মিত তাহাজ্জুদে খতমের মাধ্যমেই কুরআনকে অবিকল আক্ষরিকভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন আল্লাহ। এছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওফাতের পরের বৎসর খলীফা আবূ বাক্র (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সময়ে লিখিত পৃথক কাগজ, চামড়া, হাড় ইত্যাদি থেকে একত্রিত করে পুস্তকাকারে সংকলন করান। পরবর্তীকালে খলীফা উসমান (রা) তাঁর শাসনামলে নতুন মুসলিম প্রজন্মের মানুষদের বিশুদ্ধ কুরআন শিক্ষা ও মুখস্থ করণের সুবিধার্থে আবূ বাক্র (রা) কর্তৃক পুস্তকাকারে সংকলিত কুরআনটির বিভিন্ন অনুলিপি তৈরি করে বিভিন্ন এলাকায় প্রেরণ করেন।

এভাবে সকল মুসলিমের প্রাত্যহিক পাঠের প্রিয়তম ধর্মগ্রন্থ হিসেবে কুরআন কারীম পরিপূর্ণ ও অবিকৃতভাবে অগণিত মানুষের হৃদয়পটে এবং পুস্তকাকারে সংরক্ষিত হয়। যেভাবে তা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপর অবতারিত হয়েছে আজ পর্যন্ত ঠিক তেমনিভাবে অবিকৃত ও অপরিবর্তিতভাবে সংরক্ষিত রয়েছে এবং সকল যুগেই লক্ষ লক্ষ মুসলিম তা পরিপূর্ণ মুখস্থ করে রেখেছেন।

---

[১] সূরা ইব্রাহীম: ১ আয়াত।

হাযেরীন, এ কুরআন আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ মুজিযা বা অলৌকিক নিদর্শন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

مَا مِنْ الأَنْبِيَاءِ مِنْ نَبِيٍّ إلا قَدْ أُعْطِيَ مِنْ الآيَاتِ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"নবীগণের মধ্যে প্রত্যেক নবীই এমন আয়াত বা মুজিযা প্রাপ্ত হয়েছেন যে মুজিযার পরিমাণে মানুষেরা তাঁর উপর ঈমান এনেছে। আর আমাকে যে 'আয়াত' বা মুজিযা প্রদান করা হয়েছে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত ওহী, এজন্য আমি আশা করি যে, নবীগণের মধ্যে আমার অনুসারীদের সংখ্যাই হবে সবচেয়ে বেশি।"[১]

সম্মানিত মুসল্লীবৃন্দ, কুরআনের অলৌকিকত্বের অন্যতম দিক এর অলৌকিক ও অপার্থিব ভাষাশৈলী, প্রকাশভঙ্গি ও অর্থ। মানুষের হৃদয়কে আন্দোলিত করার প্রধান মাধ্যম হলো কথা। কথা যত সুন্দর হয় মানুষের হৃদয়ে তার প্রভাবও তত গভীর হয়। কুরআন কারীমে সকল বিষয়ে অর্থ, ভাব ও ভাষার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সাহিত্যমান রক্ষা করা হয়েছে। আর এই অপার্থিব ও অলৌকিক ভাষাশৈলী, প্রকাশভঙ্গি ও অর্থের আবহের সর্বোচ্চ মান রক্ষিত হয়েছে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সকল স্থানে একইভাবে। আরবের মানুষদের মধ্যে ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব ছিল খুবই বেশি। তারা উচ্চাঙ্গ সাহিত্য রচনায় ও সহিত্যের মূল্যায়নে ছিলেন অতি পারঙ্গম। আল্লাহ ভাষার যাদুকর কবি-সাহিত্যিক ও সাধারণ আরববাসীকে চ্যালেঞ্জ প্রদান করেন কুরআনের কোনো একটি ছোট সূরার সমপরিমাণ সূরা কুরআনের সাহিত্যমানে রচনা করার জন্য। বারংবার এ চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করা হয়েছে। একস্থানে আল্লাহ বলেন:

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

"তারা কি বলে, 'সে তা রচনা করেছে?' বল: 'তবে তোমরা এর অনুরূপ একটি সূরাই আনয়ন কর এবং আল্লাহ ব্যতীত অপর যাকে পার আহবান কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।"[২]

কাফিরগণ মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে প্রতিহত করতে তাদের জান-মাল কুরবানী করেছে, কিন্তু এই সহজ ছোট্ট চ্যালেঞ্জটি গ্রহণ করতে সক্ষম হয় নি।

হাযেরীন, আল-কুরআনের অলৌকিকত্ব চিরন্তন ও অনন্ত। প্রত্যেক যুগের মানুষেরা কুরআনের মধ্যে নতুন নতুন অলৌকিকত্বের সন্ধান লাভ করেছেন। বর্তমান যুগে বিজ্ঞানীগণ মানবদেহ, পৃথিবী, মহাকাশ ইত্যাদির বিষয়ে অনেক সত্য উদ্ঘাটন করেছেন। তাঁরা অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করছেন যে, কুরআনে এসকল বিষয়ে অনেক তথ্য রয়েছে যা নব আবিস্কৃত বৈজ্ঞানিক সত্যাদির সাথে শতভাগ সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাঁরা স্বীকার করছেন যে, কুরআনের অলৌকিকত্বের এটি একটি বড় প্রমাণ। খুতবার সংক্ষিপ্ত পরিসরে বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয়। দু একটি নমুনা দেখুন।

কানাডার টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর কীথ মূর (Keeth Moore) ভ্রূণতত্ব (embryology) বিষয়ে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ। এ বিষয়ে তাঁর লেখা বই (The Developing Human) আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেয়েছে এবং বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। ১৯৮১ সালে সৌদি আরবের দাম্মামে অনুষ্ঠিত ৭ম মেডিকেল কনফারেন্সে কুরআন কারীমে মাতৃগর্ভে মানবভ্রূনের বিবর্তন সম্পর্কে যে সকল আয়াত রয়েছে এগুলির অনুবাদ তাঁকে দেখানো হলে তিনি অবাক বিস্ময়ে বলেন:

---

[১] বুখারী, আস-সহীহ ৪/১৯০৫, ৬/২৬৫৪; মুসলিম, আস-সহীহ ১/১৩৪।
[২] সূরা : ১০ ইউনূস, ৩৮ আয়াত।

It has been a great pleasure for me to help clarify statements in the Qur'an about human development . It is clear to me that these statements must have come to Muhammad from God, or Allah, because almost all of this knowledge was not discovered until many centuries later. This proves to me that Muhammad must have been a messenger of God, or Allah".... I find no difficulty in accepting that the Quran is the Word of God."[1]

"আমার জন্য একটি আনন্দের বিষয় যে, মানবভ্রুণের বিবর্তন সম্পর্কে কুরআনের কয়েকটি বিবৃতি ব্যাখ্যার সুযোগ আমি পেয়েছি। আমার কাছে সুস্পষ্ট যে, নিঃসন্দেহে এ সকল বাণী মুহাম্মাদের (ﷺ) নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছিল। কারণ, এখানে যে তথ্য দেওয়া হয়েছে তার প্রায় কোনো কিছুই পরবর্তী কয়েক শতাব্দীর মধ্যে আবিষ্কৃত হয় নি। আমার নিকট এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মুহাম্মাদ (ﷺ) অবশ্যই আল্লাহর রাসূল ছিলেন। অনুরূপভাবে কুরআনকে আল্লাহর বাণী বলে স্বীকার করতেও আমার কোনো দ্বিধা নেই।"

ড. তেজাতাত তেজাসেন (Dr. Tejatat Tejasen) থাইল্যান্ডের চিয়াং মাই বিশ্ববিদ্যালয়ের এন্যাটমি বিভাগের চেয়ারম্যান এবং ফ্যাকাল্টি অব মেডিসিনের সাবেক ডীন। সৌদি আরবের রিয়াদে অনুষ্ঠিত অষ্টম মেডিক্যাল কনফারেন্সের মধ্যে উঠে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন:

In the last three years, I became interested in the Qur'an .... From my study and what I have learnd throughout the conference I beleive that everything that has been recorded in the Qur'an fourteen hundred years ago must be the truth, that can be proved by the scientific means. Since the Prophet Muhammad could neither read nor write, Muhammad must be a messenger who relayed this truth which was revealed to him as an enlightenment by the one who is eligible creator. This creator must be God or Allah. I think, this is the time to say La ilaha illa Allah- that is no god to worship except Allah- Muhammad rasoolu Allah, Muhammad is Messenger of Allah"[2]

"বিগত তিন বছর ধরে আমি কুরআনের বিষয়ে আগ্রহী হয়ে পড়েছি। আমার নিজের স্টাডি এবং এ কনফারেন্সে আমি যা জানলাম তা থেকে আমি এ বিশ্বাসে উপনীত হয়েছি যে, ১৪০০ বৎসর পূর্বে কুরআনে যা কিছু উল্লেখ করা হয়েছে তা সবই সত্য এবং বৈজ্ঞানিকভাবেই তা প্রমাণ করা যায়। যেহেতু নবী মুহাম্মাদ (ﷺ) নিরক্ষর ছিলেন, সেহেতু নিঃসন্দেহে তিনি একজন রাসূল ছিলেন, যিনি সর্বশক্তিমান আল্লাহর নিকট থেকে এ সকল বাণী প্রাপ্ত হয়েছিলেন। আমি মনে করি যে, এখনই আমার ঈমানের ঘোষণা দেওয়ার সময়। আমি ঘোষণা দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) তাঁর রাসূল।"

এরূপ অগণিত উদাহরণ রয়েছে। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক, সমাজবিদ ইত্যাদি বিভিন্ন পেশার অগণিত অমুসলিম বিশেষজ্ঞ কুরআন পাঠ করে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এভাবে আগত সকল যুগেই মানুষ কুরআনের মধ্যে নতুন নতুন অলৌকিকত্বের সন্ধান লাভ করবে। কেউ সেগুলি বিবেচনা করে হৃদয়কে আলোকিত করবেন। কেউ তা জেনেও অবহেলা করবেন বা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবেন। মহান আল্লাহ আমাদেরকে কুরআনের খাদেম বানিয়ে দিন। আমীন।

---

১ I. A. Ibrahim & others, A Brief Guide To Understanding Islam, p 10.
২ I. A. Ibrahim & others, A Brief Guide To Understanding Islam, p 31.

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

أَمَّا بَعْدُ، فَيَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ

وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ الأَنْبِيَاءِ مِنْ نَبِيٍّ إِلا قَدْ أُعْطِيَ مِنْ الآيَاتِ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

بَارَكَ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ فِيْ الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ، وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ. أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ، فَاسْتَغْفِرُوْهُ وَتُوْبُوْا إِلَيْهِ، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.

সফর মাসের ৩য় খুতবাঃ আখিরাত ও তাকদীরের ঈমান

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লী আলা রাসূলিহীল কারীম। আম্মা বাদ,

সম্মানিত উপস্থিতি, আজ সফর মাসের তৃতীয় জুমুআ। আজকের খুতবায় আমরা ঈমানের ৬টি রুকনের অবশিষ্ট দুটি রুকন আখিরাতের বিশ্বাস ও তাকদীরের বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা করব। কিন্তু তার আগে আমরা এ সপ্তাহের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসগুলির বিষয়ে সংক্ষেপ আলোকপাত করি।

হাযেরীন, আজ ইংরেজী ..... মাসের ..... তারিখ। এ সপ্তাহের দিবসগুলির মধ্যে রয়েছে ..... ।

....

সম্মানিত উপস্থিতি, ঈমানের ৫ম রুকন বা স্তম্ভ হলো আখিরাতের উপর ঈমান।

হাযেরীন, কুরআনের আলোকে আমরা দেখতে পাই যে, আল্লাহে বিশ্বাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো পরকালীন জীবনে বিশ্বাস করা। কুরআনে বারংবার আল্লাহর প্রতি ঈমানের সাথে আখিরাতের প্রতি ঈমানকে অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত করা হয়েছে। যেমন একস্থানে আল্লাহ বলেন,

مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ

"যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসে বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে তাদের জন্য পুরস্কার রয়েছে তাদের প্রতিপালকের নিকট। তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।"[১]

বস্তুত কুরআন কারীম পাঠ করলে যে কোনো পাঠক বুঝতে পারেন যে, দুটি বিষয়কে কুরআন কারীমে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছেঃ (১) আল্লাহর ইবাদতের একত্ব বা তাওহীদুল ইবাদাত এবং (২) আখিরাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব। কুরআন কারীমের এমন একটি পৃষ্ঠাও পাওয়া কষ্ট যে পৃষ্ঠাতে আখিরাতের কোনো না কোনো বর্ণনা নেই।

হাযেরীন, আল্লাহয় বিশ্বাসী ধার্মিক মানুষের কঠিনতম পদস্খলন ও বিভ্রান্তির দুটি পথঃ (১) শির্কে নিপতিত হওয়া এবং (২) আখিরাত সম্পর্কে অসচেতনতা। অনেক সময় বিশ্বাসী মানুষও পার্থিব বিষয়াদি নিয়ে অতি-ব্যস্ততা, অস্থিরতা, অসচেতনতা বা শয়তানী প্ররোচনার কারণে আখিরাত সম্পর্কে অসচেতন হয়ে পড়েন বা আখিরাতের জীবনকে অবজ্ঞা করতে থাকেন। এই ভয়ঙ্করতম পদস্খলন থেকে মুমিনকে রক্ষা করার জন্য সদা-সর্বদা আখিরাতের স্মরণ অতীব প্রয়োজনীয়। বাহ্যত তাওহীদুল ইবাদাত ও আখিরাতের বিষয়ে কুরআনের বিশেষ গুরুত্বপ্রদানের এ হলো একটি কারণ।

আখিরাত বলতে মৃত্যু পরবর্তী পর্যায় বুঝানো হয়। আখিরাতে ঈমানের অর্থ হলো, মৃত্যুর পরে কি ঘটবে সে বিষয়ে পবিত্র কুরআনে এবং সহীহ হাদীসে যা কিছু বর্ণনা আছে তা সন্দেহাতীতভাবে বিশ্বাস করা। যেমন কবরের প্রশ্ন, পুরস্কার ও শাস্তি, কিয়ামতের আলামত বা পূর্বাভাসসমূহ, কিয়ামত বা পুনরুত্থান, শেষ বিচার, আমলনামা প্রদান, আল্লাহর মীযান ও মানুষের কর্ম ওযন করা, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাউয, জাহান্নামের উপর সিরাত, শাফায়াত, জান্নাত, জাহান্নাম, জান্নাতের নিয়ামত, জাহান্নামের শাস্তি, আল্লাহর দর্শন ইত্যাদি। এ সকল বিষয় বিশ্বাস করা ঈমানের অন্যতম রুকন।

হাযেরীন, আখিরাতের যাত্রার প্রথম স্টেশন কবর। কবরস্থ হোক বা না হোক, মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামত ও হাশরের পূর্ব পর্যন্ত সময় হলো বরযখ ও কবরের অবস্থা। এ অবস্থায় মানুষ দুনিয়ার কর্মের

---

[১] সূরা (২) বাকারাঃ ৬২ আয়াত।

পুরস্কার বা শাস্তি ভোগ করবে বলে কুরআন ও হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। এক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন:

وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ

"কঠিন শাস্তি পরিবেষ্টন করল ফিরাউনের সম্প্রদায়কে। সকাল সন্ধ্যায় তাদেরকে উপস্থিত করা হয় আগুনের সামনে এবং যেদিন কিয়ামত ঘটবে সেদিন (বলা হবে:) ফিরাউনের সম্প্রদায়কে প্রবেশ করাও কঠিন শাস্তির মধ্যে।"[১]

এ থেকে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি যে, কিয়ামতের পূর্বেও কাফিরগণকে শাস্তি প্রদান করা হবে এবং আগুনের সামনে তাদের উপস্থিত করা হবে। অসংখ্য হাদীসে কবরের আযাব ও পুরস্কারের বিষয়ে বলা হয়েছে, যা থেকে জানা যায় যে, মৃতব্যক্তিকে কবরের রাখার পরে তার 'রূহ' তাকে ফেরত দেওয়া হবে এবং তাকে 'মুনকার ও নাকীর' নামক ফিরিশতাগণ প্রশ্ন করবেন তার প্রতিপালক, তার দীন ও তার নবী সম্পর্কে। মুমিন ব্যক্তি এ সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হবেন। মুনাফিক বা কাফির এ সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে অক্ষম হবে। পাপী ও অবিশ্বাসীদেরকে কবরে বিভিন্ন প্রকারের শাস্তি ভোগ করতে হবে। পক্ষান্তরে নেককার মুমিনগণ কবরে অবস্থানকালে শান্তি ও নিয়ামত ভোগ করবেন। এগুলি সবই আমাদের বিশ্বাস।

হাযেরীন, উসমান (রা)-এর খাদেম হানী বলেন: উসমান (রা) কোনো কবরের পাশে দাঁড়ালে কাঁদতেন এবং কাঁদতে কাঁদতে দাড়ি ভিজিয়ে ফেলতেন। তাঁকে বলা হয় যে, আপনি জান্নাত ও জাহান্নামের কথা আলোচনা করতে কাঁদেন না, অথচ কবর দেখলে কাঁদেন কেন? তিনি বলেন:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِ الآخِرَةِ فَإِنْ نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا رَأَيْتُ مَنْظَرًا قَطُّ إِلا الْقَبْرُ أَفْظَعُ مِنْهُ

"রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কবর আখিরাতের প্রথম ঘাটি। যে ব্যক্তি কবরে নাজাত পাবে পরবর্তী বিষয়গুলি তার জন্য সহজতর হবে। আর কবর থেকে যে রক্ষা পাবে না তার জন্য পরবর্তী অবস্থা আরো কঠিনতর হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেছেন: কবরের চেয়ে অধিক ভয়ঙ্কর দৃশ্য আমি কখনোই দেখিনি।"[২]

হাযেরীন, আমরা একটু চিন্তা করি! যুন্নুরাইন উসমান (রা), যাকে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন, তিনি কবর দেখলে কাঁদতেন! আর আমরা যাদের গোনাহের শেষ নেই তারা কি বেখেয়াল যে, একটিবারও কবরের চিন্তা হয় না! কত কবর দেখি, কিন্তু কান্না আসে না! সতর্ক হওয়ার সময় কি আসেনি! ভাইয়েরা, এখন না হলে আর কখন সতর্ক হব?

হাযেরীন, আখিরাতের ঈমানের একটি বিষয় কিয়ামতের আলামত। কিয়ামত অবশ্যই আসবে। তবে তার নির্ধারিত সময় মহান আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। কিয়ামতের কিছু পূর্বাভাস আল্লাহ জানিয়েছেন। এগুলিকে আশরাতুস সাআহ বা কিয়ামতের আলামত বলা হয়। কুরআন ও হাদীসে বিভিন্ন পূর্বভাস উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলি মুমিন সরল অন্তকরণে সহজভাবে বিশ্বাস করেন। কুরআন ও হাদীসের আলোকে আলিমগণ এগুলি মধ্যে কিছু বিষয়কে 'আলামাত সুগরা' অর্থাৎ "ক্ষুদ্রতর আলামত' বা 'সাধারণ আলামত' এবং কিছু বিষয়কে 'আলামাত কুবরা' অর্থাৎ 'বৃহত্তর আলামত' বা বিশেষ আলামত বলে উল্লেখ করেছেন।

---

[১] সূরা (৪০) গাফির/মুমিন: ৪৫-৪৬ আয়াত।
[২] তিরমিযী, আস-সুনান ৪/৫৫৩; ইবনু মাজাহ, আস-সুনান ২/১৪২৬। তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

আলামতে সুগরার মধ্যে অন্যতম সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর আগমন। বিভিন্ন হাদীসে কিয়ামতের আরো অনেক পূর্বাভাসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ সকল হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, কিয়ামতের পূর্বে আরব উপদ্বীপে নদনদী প্রবাহিত হবে এবং ক্ষেত-খামার ছড়িয়ে পড়বে। ইরাকের ফুরাত নদীর তলদেশ থেকে স্বর্ণ বা সম্পদ প্রকাশিত হবে, যে জন্য ভয়ঙ্কর যুদ্ধবিগ্রহ ছড়িয়ে পড়বে। সামগ্রিকভাবে মানুষের জাগতিক উন্নতি ঘটবে, অল্প সময়ে মানুষ অনেক সময়ের কাজ করবে, অর্থনৈতিক উন্নতি ব্যাপক হবে, অধিকাংশ মানুষ অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল ও স্বাবলম্বী হয়ে যাবে। তবে মানুষের বিশ্বাস ও ধার্মিকতা কমে যাবে, নৈতিক মূল্যবোধের ব্যাপক অবক্ষয় ঘটবে, পাপ, অনাচার ইত্যাদি ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করবে, মিথ্যা ও ভণ্ড নবীগণের আবির্ভাব ঘটবে, হত্যা, সন্ত্রাস, ও বৃহৎ পরিসরের যুদ্ধ হতে থাকবে। এ সকল আলামাত প্রকাশের এক পর্যায়ে বিশেষ বা বৃহৎ আলামতগুলি প্রকাশিত হবে।

কিয়ামতের বৃহৎ আলামতসমূহ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

إِنَّ السَّاعَةَ لا تَكُونُ حَتَّى تَكُونَ عَشْرُ آيَاتٍ خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَخَسْفٌ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَالدُّخَانُ وَالدَّجَّالُ وَدَابَّةُ الأَرْضِ وَيَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَطُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَنَارٌ تَخْرُجُ مِنْ قُعْرَةِ عَدَنٍ تَرْحَلُ النَّاسَ، وَنُزُولُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ...

"দশটি আয়াত বা নিদর্শন না ঘটা পর্যন্ত কিয়ামত হবে না: (১) পূর্ব দিকে ভূমিধ্বস বা প্রাকৃতিক বিপর্যয় (ভূপৃষ্ঠ যমীনের মধ্যে ডুবে যাওয়া), (২) পশ্চিমদিকে ভূমিধ্বস বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়, (৩) আরব উপদ্বীপে ভূমিধ্বস বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়, (৪) ধুম্র, (৫) দাজ্জাল, (৬) ভূমির প্রাণী, (৭) ইয়াজূজ-মাজূজ, (৮) পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়, (৯) এডেনের ভূগর্ভ থেকে অগ্নি নির্গত হয়ে মানুষদেরকে তাড়িয়ে নেওয়া এবং (১০) ঈসা ইবনু মরিয়াম (আ)-এর অবতরণ।"[১]

এ সকল আলামত সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ সহ অনেক সহীহ হাদীস বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে সংকলন করা হয়েছে, এগুলি সবই সর্বান্তকরণে সরলভাবে বিশ্বাস করা মুমিনের দায়িত্ব।

হাযেরীন, কিয়ামত অর্থ পুনরুত্থান। কিয়ামত বলতে বুঝানো হয় এ মহাবিশ্বের সামগ্রিক ধ্বংস, পুনসৃষ্টি, পুনরুত্থান, হাশরের মাঠে জমায়েত হওয়া, বিচার, কর্মের ওযন, শাফা'আত, ও জান্নাত-জাহান্নামের পুরস্কার ও শাস্তি। কুরআন ও হাদীসে এ বিষয়ে অগণিত বর্ণনা রয়েছে। কয়েকটি আয়াত শুনুন:

يَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

"যে দিন এ পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে অন্য পৃথিবী হবে এবং আকাশমন্ডলীও; এবং মানুষ উপস্থিত হবে আল্লাহ্র সম্মুখে- যিনি এক, পরাক্রমশালী । সে দিন তুমি অপরাধিগণকে দেখবে শৃঙ্খলিত অবস্থায়। তাদের জামা হবে আলকাতরার এবং অগ্নি আচ্ছন্ন করবে তাদের মুখমণ্ডল। এ এজন্য যে, আল্লাহ প্রত্যেককে কৃতকর্মের প্রতিফল দিবেন। আল্লাহ হিসাব গ্রহণে তৎপর।"[২]

[১] মুসলিম, আস-সহীহ ৪/২২২৫-২২২৬।
[২] সূরা (১৪) ইবরাহীম : ৪৮-৫১ আয়াত।

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ إِلا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ

"এবং শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে, ফলে যাদেরকে আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন তারা ব্যতীত আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সকলে মূর্ছিত হয়ে পড়বে । অতঃপর আবার শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে, তৎক্ষণাৎ তারা দন্ডায়মান হয়ে তাকাতে থাকবে।[১]

إِذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الإِنْسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

"পৃথিবী যখন আপন কম্পনে প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে, এবং পৃথিবী যখন তার ভার বের করে দিবে, মানুষ বলবে, 'এর কি হল?' সে দিন পৃথিবী তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে, কারণ তোমার প্রতিপালক তাকে আদেশ করিবেন, সে দিন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন দলে বের হবে, কারণ তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখান হবে; কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তাও দেখবে। কেউ অণু পরিমাণ অসৎ কর্ম করলে তাও দেখবে।[২]

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ

"সেদিন মানুষ পালিয়ে যাবে তার ভ্রাতা হতে, এবং তার মাতা ও তার পিতা হতে, এবং তার স্ত্রী ও তার সন্তান হতে। সেদিন তাদের প্রত্যেকেরই এমন গুরুতর অবস্থা থাকবে যা তাকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখবে। সেদিন কিছু চেহারা উজ্জল হবে। সহাস্য, প্রফুল্ল। আর কিছু কিছু চেহারার উপর থাকবে মলিনতা। কালিমা তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে। তারাই কাফির, পাপাচারী।"[৩]

হাযেরীন, কেউই সেদিন পাশে থাকবে না। সকল আপনজনই পালিয়ে যাবে। শুধু নিজের কর্ম নিয়ে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে। কাজেই এখন থেকে সাবধান হওয়া দরকার!

এভাবে কুরআন কারীমের সর্বত্র কিয়ামতের বিভিন্ন বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে। বান্দার কর্ম ওযন করার কথা কুরআন কারীমে বারংবার বলা হয়েছে। ফিরিশতাগণ, নবীগণ, নেককার বান্দাগণ, কুরআন, তাহাজ্জুদ, সিয়াম ও অন্যান্য নেক আমল আল্লাহর অনুমতিতে আল্লাহ যাদের বিষয়ে সন্তুষ্ট এরূপ পাপী মানুষদের জন্য শাফাআত করবে বলে কুরআন ও হাদীসে বলা হয়েছে।

অনেক হাদীসে হাউযে কাওসারের বিবরণ এসেছে। সাহল ইবনু সা'দ, আবু সাইদ খুদরী ও আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

إِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ مَنْ مَرَّ عَلَيَّ شَرِبَ وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، فَأَقُولُ: إِنَّهُمْ مِنِّي فَيُقَالُ إِنَّكَ لا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ (فِي

[১] সূরা (৩৯) যুমার: ৬৮ আয়াত।
[২] সূরা (৯৯) যিলযাল: ১-৮ আয়াত।
[৩] সূরা আবাসা: ৩৪-৪২ আয়াত।

رواية: إِنَّكَ لا تَدْرِي مَا عَمِلُوا بَعْدَكَ)، فَأَقُولُ سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِي.

"আমি আগে হাউযে গিয়ে তোমাদের জন্য অপেক্ষা করব। যে আমার কাছে যাবে সে (হাউয) থেকে পান করবে, আর যে পান করবে সে আর কখনো পিপাসার্ত হবে না। অনেক মানুষ আমার কাছে (হাউযে পানি পানের জন্য) আসবে, যাদেরকে আমি চিনতে পারব এবং তারাও আমাকে চিনতে পারবে, কিন্তু তাদেরকে আমার কাছে আসতে দেওয়া হবে না, বাধা দেওয়া হবে। আমি বলব: এরা তো আমারই উম্মত। তখন উত্তরে বলা হবে : আপনি জানেন না, এরা আপনার পরে কী-সব নব উদ্ভাবন করেছিল। (দ্বিতীয় বর্ণনায়: আপনার পরে তারা কী আমল করেছে তা আপনি জানেন না।) তখন আমি বলব: যারা আমার পরে পরিবর্তন করেছে তারা দূর হয়ে যাক! তারা দূর হয়ে যাক!!"[১]

হাযেরীন, সাবধান! রাসূলুল্লাহ ﷺ যা করেন নি সেরূপ নতুন কিছু তাঁর দীনের মধ্যে উদ্ভাবন করলে উম্মত হিসেবে পরিচিতি লাভ করার পরেও হাউযের পনি থেকে বিতাড়িত হতে হবে।

হাযেরীন, সবশেষে সকল মানুষ পুরস্কার বা শাস্তি হিসেবে জান্নাত বা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। কুরআন ও হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, মহান আল্লাহ জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি করে রেখেছেন। কুরআন ও হাদীসে অগণিত স্থানে জান্নাত ও জাহান্নামের নেয়ামত ও শাস্তির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। আজ এখানে সেগুলির আলোচনা সম্ভব হচ্ছে না। তবে একটি বিষয়ে দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। দুনিয়ার কষ্ট, বেদনা ও দুঃখ থেকে রক্ষা পেতে আমাদের কত আকুতি ও চেষ্টা। অথচ দুনিয়ার সকল কষ্টই ক্ষণস্থায়ী। আর জাহান্নামের কষ্ট চিরস্থায়ী ও কল্পনাতীত! যে কষ্টের কোনো তুলনা নেই এবং শেষ নেই। ভাইয়েরা, এ কষ্ট থেকে বাঁচতে একটু সচেষ্ট হতে হবে না?

হাযেরীন, দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী নেয়ামত ও আনন্দের জন্য আমরা কত লালায়িত! অথচ সব আনন্দই ক্ষনস্থায়ী এবং কোনো নেয়ামতই নির্ভেজাল ও কষ্টমুক্ত নয়। আর জান্নাতের সকল নেয়ামত চিরস্থায়ী, নির্ভেজাল ও কষ্টমুক্ত। আল্লাহ তো মুমিন বান্দাদের দেওয়ার জন্যই জান্নাত বানিয়েছেন। আমরা একটু আগ্রহ ও আবেগ করে সামান্য কষ্ট করলেই আল্লাহ হয়ত কবুল করে নেবেন। আসুন না আমরা একটু চেষ্টা করি ইসলামের নির্দেশনা পালন করে জান্নাতের পথে এগোই!

হাযেরীন, ঈমানের ৬ষ্ঠ রুকন হলো 'ঈমান বিল কাদার'। এর অর্থ এ কথা বিশ্বাস করা যে, মহান আল্লাহ অনাদি-অনন্ত অসীম জ্ঞানের অধিকারী। তিনি তাঁর অনাদি, অনন্ত, অসীম ও সর্বব্যাপী জ্ঞান 'কিতাবে মুবীন' (সুস্পষ্ট কিতাব) বা 'লাওহে মাহফুজে' (সংরক্ষিত পত্রে) লিখে রেখেছেন। লিখনের প্রকৃতি আমরা জানিনা। তিনি যা ইচ্ছা রেখে দেন এবং যা ইচ্ছা মুছে ফেলেন। রাখা ও মুছার ধরন আমাদের অজ্ঞাত। এ বিশ্বে যা কিছু সংঘটিত হয় সবই তাঁর জ্ঞান ও ইচ্ছা অনুসারেই হয়। তাঁর ইচ্ছাই চূড়ান্ত। তিনিই এ বিশ্বের সবকিছুর স্রষ্টা। মানুষের কর্মও তাঁরই সৃষ্টি। তিনি মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছা, বিচার শক্তি ও বিবেক প্রদান করেছেন। মানুষ তার নিজ ইচ্ছায় কর্ম করে এবং নিজ ইচ্ছা ও বিচারবুদ্ধি দিয়ে যে কর্ম সে করবে সে কর্মের ফল সে লাভ করবে। তবে তার কর্ম আল্লাহর জ্ঞান ও ইচ্ছা অনুসারে সংঘটিত হয়।

সম্ভবত একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি বুঝানো যায়। আল্লাহর নির্ধারণ হলো যে, বিষ মৃত্যু আনে। মানুষকে আল্লাহ বিবেক ও জ্ঞান দান করেছেন যে, বিষ মৃত্যু আনে। এরপরও কেউ বিষ পান করলে সে মৃত্যু বরণ করবে। তবে তা আল্লাহর ইচ্ছা ও জ্ঞান অনুসারে ঘটবে। আল্লাহ তাঁর অনন্ত জ্ঞানে জানেন যে, নির্দিষ্ট ব্যক্তি নির্দিষ্ট সময়ে স্বেচ্ছায় বা বাধ্য হয়ে বা না জেনে বিষ পান করবে। তিনি তাঁর এ

[১] বুখারী, আস-সহীহ ৫/২৪০৬, ৬/২৫৮৭; মুসলিম, আস-সহীহ ১/২১৮, ৪/১৭৯৩-১৭৯৫।

জ্ঞান 'কিতাব মুবীন'-এ লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি ইচ্ছা করলে ঐ ব্যক্তির ইচ্ছা শক্তি হরণ করে তাকে বিষপান থেকে বিরত রাখতে পারেন, তেমনি তিনি ইচ্ছা করলে বিষের ক্রিয়া নষ্ট করে বিষপানকারীকে মৃত্যু থেকে রক্ষা করতে পারেন। আল্লাহর জ্ঞান, লিখনি ও নির্ধারণ অনুসারে বিষপানকারীর মৃত্যু আসবে অথবা আসবে না। এবং বিষপানকারী বিষপানে তার ইচ্ছা, অনিচ্ছা ও কর্ম অনুসারে কর্মফল লাভ করবে।

হাযেরীন, ইসলামী তাক্বদীরে বিশ্বাস ও অনৈসলামিক ভাগ্যে বিশ্বাসকে অনেক সময় এক করে ফেলা হয়। অনেকে মনে করেন ভাগ্য অনুসারেই যখন সবকিছু হবে তখন কর্মের কি দরকার। যে অবিশ্বাসী তাক্বদীর নিয়ে বিবাদ করে, সে মূলত নিজেকে আল্লাহর কর্মের পরিদর্শক ও বিচারক নিয়োগ করেছে। সে বলতে চায়, কর্ম করা আমার দায়িত্ব নয়, আমার কাজ হলো আল্লাহর কাজের বিচার করা।

আর মুমিনের বিশ্বাস, আল্লাহর কর্মের বিচার করা মানুষের কর্ম নয়। তিনি কি জানেন, কি লিখেছেন, কি মুছেন আর কি রেখে দেন কিছুই মানুষকে জানাননি। কারণ, এসব জানা মানুষের কোনো কল্যাণে আসবেনা। এসব কিছুই তাঁর মহান রুবূবিয়্যাতের অংশ। মানুষের দায়িত্ব আল্লাহর রহমত ও করুণার উপরে আস্থা রেখে আল্লাহর নির্দেশ মত কর্ম করা, ফলাফলের জন্য উৎকণ্ঠিত না হওয়া। ইসলামের তাক্বদীরে বিশ্বাস মুসলিমকে কর্মমূখী করে তোলে, কখনই কর্মবিমূখ করেনা। তাক্বদীরে বিশ্বাসের ফলে মানুষ সকল হতাশা, অবসাদ ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পায়। মুসলিম জানে, তার দায়িত্ব কর্ম করা, ফলাফলের জন্য দুশ্চিন্তা বা উৎকণ্ঠা তার জীবনে অর্থহীন, কারণ ফলাফলে দায়িত্ব এমন এক সত্তার হাতে যিনি তাকে তার নিজের চেয়েও ভাল জানেন, ভালবাসেন, যিনি দয়াময়, যিনি কাউকে জুলুম করেন না। যিনি তাঁর বান্দাকে কর্মের চেয়ে বেশি পুরস্কার দিতে চান। তাই মুমিন উৎকণ্ঠা মুক্ত হয়ে কর্ম করেন।

তাক্বদীরের বিশ্বাস মুসলিমকে অহংকার, অতিউল্লাস ও হতাশা থেকে রক্ষা করে। তার জীবনে সফলতা বা নিয়ামত আসলে সে অহংকারী হয়ে উঠেনা। সে জানে আল্লাহর ইচ্ছায় ও রহমতেই সে সফলতা লাভ করেছে। তার হৃদয় কানায় কানায় ভরে ওঠে কৃতজ্ঞতায়। অপরদিকে মুমিন ব্যর্থতায় বা পরাজয়ে হতাশ হয় না। সে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহর ইচ্ছা ও জ্ঞান অনুযায়ী সে ফল পেয়েছে, নিশ্চয় এর মধ্যে কোনো কল্যাণ নিহিত রয়েছে। সে জানে যে, তার প্রচেষ্টা ও কর্মের জন্য সে অবশ্যই আল্লাহর কাছে পুরস্কার লাভ করবে। কাজেই সে হতাশ না হয়ে নিজের কর্মের ভুল দূর করে আল্লাহর নির্দেশ মত চেষ্টা করতে থাকে, ফলাফলের দায়িত্ব আল্লাহর উপর ছেড়ে দেয়।

তাক্বদীরে বিশ্বাসের ফল আমরা দেখতে পাই এ বিশ্বাস সর্বপ্রথম যাদের জীবনে এসেছিল তাঁদের জীবনে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের জীবনে। আমরা দেখেছি তাক্বদীরের উপর সবচেয়ে দৃঢ় প্রত্যয় ছিল মহানবী (ﷺ)-এর, আর তাই তিনি সবচেয়ে ছিলেন বেশি দৃঢ় প্রত্যয়ী কর্মবীর। তিনি তার সাধ্যমত কর্ম করেছেন, আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছেন তার করুণার জন্য, আর ফলাফলের ভার ছেড়ে দিয়েছেন তার প্রতিপালকের কাছে। ঠিক তেমনি অকুতোভয় দৃঢ়প্রত্যয়ী কর্মবীর ছিলেন তাঁর সাহাবীগণ, তাক্বদীরে বিশ্বাস তাদের সকল সংশয়, ভয়, দুশ্চিন্তা দূর করে বিশ্বজয়ে প্রেরণা জুগিয়েছে।

হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, তাকদীরে বিশ্বাস মানুষকে ভবিষ্যতের উৎকণ্ঠা ও অতীতের আফসোস থেকে রক্ষা করে। পরাজয় বা ব্যর্থতা নিয়ে আফসোস, কেন এরূপ করলাম বা করলাম না ইত্যাদি হা-হুতাশ থেকে রক্ষা করে। আর এরূপ তাকদীরে বিশ্বাসী শক্তিশালী হতাশা ও আফসোস মুক্ত মুমিনকে আল্লাহ ভালবাসেন। আল্লাহর আমাদের সবাইকে সঠিক ঈমান দান করুন। আমাদেরকে ঈমানের শক্তিতে, কর্মের শক্তিতে, দেহের শক্তিতে, জ্ঞানের শক্তিতে শক্তিশালী করে তাঁর প্রিয় শক্তিশালী মুমিন হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমিন।

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

أَمَّا بَعْدُ، فَيَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: إِذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ

الإِنْسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِ الآخِرَةِ فَإِنْ نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَا رَأَيْتُ مَنْظَرًا قَطُّ إِلا الْقَبْرُ أَفْظَعُ مِنْهُ

بَارَكَ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ فِيْ الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ. وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ. أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ، فَاسْتَغْفِرُوْهُ وَتُوْبُوْا إِلَيْهِ، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.

সফর মাসের ৪র্থ খুতবাঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অসুস্থতা ও ওফাত

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লী আলা রাসূলিহীল কারীম। আম্মা বাদ,

সম্মানিত উপস্থিতি, আজ ...... হিজরী সালের সফর মাসের চতুর্থ জুমুআ। আজকের খুতবায় আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাত-পূর্ব অসুস্থতা ও ওফাত বিষয়ে আলোচনা করব। কিন্তু তার আগে আমরা এ সপ্তাহের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসগুলির বিষয়ে সংক্ষেপ আলোকপাত করি।

হাযেরীন, আজ ইংরেজী ..... মাসের ..... তারিখ। এ সপ্তাহের দিবসগুলির মধ্যে রয়েছে ..... ।

হাযেরীন, ১০ হিজরী সালে (৬৩২ খৃ) রাসূলুল্লাহ ﷺ লক্ষাধিক সঙ্গীকে নিয়ে হজ্জ আদায় করেন, যা বিদায় হজ্জ নামে পরিচিত। হজ্জ থেকে ফেরার পরে ১১শ হিজরীর (৬৩২ খৃ) প্রথম দিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি জ্বর ও মাথা ব্যথায় আক্রান্ত হন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সফর বা রবিউল আউয়াল মাসের কত তারিখ থেকে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং কত তারিখে ইন্তিকাল করেন সে বিষয়ে হাদীস শরীফে কোনোরূপ উল্লেখ বা ইঙ্গিত নেই। বস্তুত, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবিয়ীগণ তারিখের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করতেন না। এজন্য তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনের অত্যন্ত ছোটখাট ঘটনাও গুরুত্বের সাথে বর্ণনা ও সংরক্ষণ করেছেন, কিন্তু এ সকল ঘটনার তারিখ কোনো হাদীসে উল্লেখ করেন নি। অগণিত হাদীসে তাঁর অসুস্থতা, অসুস্থতা- কালীন অবস্থা, কর্ম, উপদেশ, তাঁর ইন্তিকাল ইত্যাদির ঘটনা বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু কোথাও কোনো ভাবে কোনো দিন, তারিখ বা সময় বলা হয় নি। কবে তাঁর অসুস্থতা শুরু হয়, কতদিন অসুস্থ ছিলেন, কত তারিখে ইন্তিকাল করেন সে বিষয়ে কোনো হাদীসেই কিছু উল্লেখ করা হয় নি।

২য় হিজরী শতক থেকে তাবিয়ী ও তাবি-তাবিয়ী আলিমগণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর জীবনের ঘটনাবলি ঐতিহাসিকভাবে দিন তারিখ সহকারে সাজাতে চেষ্টা করেন। তখন থেকে মুসলিম আলিমগণ এ বিষয়ে বিভিন্ন মত পেশ করেছেন। তাঁর অসুস্থতার শুরু সম্পর্কে অনেক মত রয়েছে। কেউ বলেছেন সফর মাসের শেষ দিকে তাঁর অসুস্থতার শুরু। কেউ বলেছেন রবিউল আউয়াল মাসের শুরু থেকে তাঁর অসুস্থতার শুরু। দ্বিতীয় হিজরী শতকের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনু ইসহাক (১৫১ হি/৭৬৮ খৃ) বলেনঃ "রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যে অসুস্থতায় ইন্তিকাল করেন, সেই অসুস্থতার শুরু হয়েছিল সফর মাসের শেষে কয়েক রাত থাকতে, অথবা রবিউল আউয়াল মাসের শুরু থেকে।"[১]

কি বার থেকে তাঁর অসুস্থতার শুরু হয়েছিল, সে বিষয়েও মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন শনিবার, কেউ বলেছেন বুধবার এবং কেউ বলেছেন সোমবার তার অসুস্থতার শুরু হয়।[২] কদিন তিনি অসুস্থ ছিলেন সে বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন, ১০ দিন, কেউ বলেছেন, ১২ দিন, কেউ বলেছেন ১৩ দিন, কেউ বলেছেন, ১৪ দিন অসুস্থ থাকার পরে তিনি ইন্তিকাল করেন।[৩]

তাঁর ওফাতের তারিখ সম্পর্কেও অনুরূপ মতভেদ রয়েছে। বিভিন্ন সহীহ হাদীস থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সোমবার ইন্তিকাল করেন।[৪] কিন্তু এই সোমবারটি কোন্ মাসের কোন্ তারিখ ছিল তা কোনো হাদীসে বলা হয় নি। ইন্তিকালের তারিখ সম্পর্কে দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দীর তাবেয়ী ঐতিহাসিকগণ এবং পরবর্তী ঐতিহাসিকগণের ৪টি মত রয়েছেঃ ১লা রবিউল আউয়াল, ২রা রবিউল আউয়াল, ১২ই

---

[১] ইবনু হিশাম, আস-সীরাহ আন-নববিয়্যাহ ৪/২৮৯।

[২] কাসতালানী, আল-মাওয়াহিব আল-লাদুন্নিয়া ৩/৩৭৩; যারকানী, শারহুল মাওয়াহিব ১২/৮৩।

[৩] কাসতালানী, আল-মাওয়াহিব আল-লাদুন্নিয়া ৩/৩৭৩; যারকানী, শারহুল মাওয়াহিব ১২/৮৩।

[৪] বুখারী, আস-সহীহ ১/২৬২, ৪/১৬১৬; মুসলিম, আস-সহীহ ১/৩১৫; আবূ নুআইম ইসপাহানী, আল-মুসতাখরাজ আলা সাহীহ মুসলিম ২/৪৩-৪৪।

রবিউল আউয়াল ও ১৩ই রাবিউল আউয়াল।[১]

মুহতারাম হাযেরীন, বিদায় হজ্জের শেষে মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয়তম রাসূলের (ﷺ) উপর সূরা আন-নাসর নাযিল করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, এ সূরার মাধ্যমে মহান আল্লাহ আমার মিশনের পূর্ণতা ও সমাপ্তির কথা জানিয়েছেন এবং আমার মৃত্যু সংবাদ আমাকে জানিয়েছেন। মদীনায় ফেরার পর তিনি উঠতে, বসতে, মাজলিসে, সালাতের মধ্যে রুকুতে, সাজদায় ও সর্বাবস্থায় বেশি বেশি বলতে থাকেন:

سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

"মহাপবিত্রতা আপনারই এবং প্রশংসা সহ, আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি এবং তাওবা করছি।[২]

এ পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ বিদায় নিতে শুরু করেন। তিনি উহদের শহীদদের ও বাকী গোরস্তানের মৃতদের শেষ দুআ জানিয়ে বিদায় নেন। উকবা ইবনু আমির (রা) বলেন,

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ إِنِّي فَرَطٌ لَكُمْ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ وَإِنِّي وَاللَّهِ لأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الآنَ وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الأَرْضِ وفي رواية: مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الأَرْضِ وَالسَّمَاءِ، وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا

"নবী (ﷺ) একদিন বের হয়ে উহদের শহীদের উপর জানাযার সালাতের মত সালাত আদায় করলেন। এরপর তিনি মিম্বারের কাছে ফিরে আসলেন এবং বললেন: আমি তোমাদের আগে চলে যাচ্ছি এবং আমি তোমাদের জন্য সাক্ষী। আর আমি আমার হাউয এখন দেখতে পাচ্ছি। আমাকে পৃথিবীর ভাণ্ডারসমূহের চাবিগুলি, অন্য বর্ণনায়: আমাকে পৃথিবী ও আসমানের ভাণ্ডারসমূহের চাবিগুলি প্রদান করা হয়েছে এবং আল্লাহর কসম, আমি এ ভয় পাই না যে, আমার পরে তোমরা শিরক করবে, বরং ভয় পাই যে, তোমরা সেগুলি (ভাণ্ডারগুলি) নিয়ে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে।"[৩]

তিনি রাতের গভীরে তাঁর খাদেম আবূ মুআইহিবাকে নিয়ে বাকী গোরস্তানে যেয়ে মৃতদের জন্য দুআ করেন এবং আবূ মুআইহিবাকে বলেন,

يَا أَبَا مُوَيْهِبَةَ إِنَّ اللهَ خَيَّرَنِي أَنْ يُؤْتِيَنِي خَزَائِنَ الأَرْضِ وَالْخُلْدَ فِيهَا ثُمَّ الْجَنَّةَ وَبَيْنَ لِقَاءِ رَبِّي، فَقُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي فَخُذْ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ هذِهِ الأَرْضِ وَالْخُلْدَ فِيهَا ثُمَّ الْجَنَّةَ. قَالَ: كَلاَّ، يَا أَبَا مُوَيْهِبَةَ لَقَدْ اخْتَرْتُ لِقَاءَ رَبِّي عز وجل.

"আল্লাহ আমাকে এখতিয়ার দিয়েছেন যে, দুটি বিষয়ের একটি আমি বেছে নেব: (১) পৃথিবীর ভাণ্ডারসমূহ এবং পৃথিবীতে অনন্ত জীবন এবং এরপর জান্নাত, অথবা (২) আমার প্রতিপালকের সাক্ষাত এবং জান্নাত। তখন আমি বললাম, আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবানী হোন! তাহলে আপনি পৃথিবীর ভাণ্ডারসমূহ এবং পৃথিবীতে অনন্ত জীবন এবং এরপর জান্নাত বেছে নিন। তিনি বলেন, কখনোই না! আবূ মুহাইহিবা, আমি আমার প্রতিপালকের সাক্ষাত বেছে নিয়েছি।"[৪]

---

[১] ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ৮/১২৯।
[২] মুসলিম, আস-সহীহ ১/৩৫১; মুহাম্মাদ ইবনু ইউসুফ আশ-শামী, আস-সীরাহ আশ-শামিয়্যাহ ১২/২২৯-২৩১।
[৩] বুখারী, আস-সহীহ ১/৪৫১, ৪/১৪৯৮; মুসলিম, আস-সহীহ ৪/১৭৯৫; ইবনু হিব্বান, আস-সহীহ ৭/৪৭৪।
[৪] হাকিম, আল-মুসতাদরাক ৩/৫৭। হাদীসটি সহীহ।

হাযেরীন, এভাবেই তিনি বেছে নিলেন তাঁর প্রতিপালকের সাক্ষাত। বিদায়ের ঘন্টা বাজলো। অসুস্থ হয়ে পড়লেন তিনি। অসুস্থতা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকল। তিনি আয়েশা (রা)-এর গৃহে অবস্থান করতে লাগলেন। আয়েশা (রা) সূরা ফালাক, সূরা নাস এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শেখানো অন্যান্য সূরা ও দুআ পাঠ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুবারক হাতে ফুঁক দিয়ে সে হাত নিজে ধরে তাঁর গায়ে বুলিয়ে দিতেন।[১]

এ সময়ে তিনি বারংবার সাহাবীদেরকে নিয়ে বসে তাদেরকে বিভিন্ন ওসীয়ত-নসীহত করতেন। অসুস্থতা বৃদ্ধি পেলে তিনি মসজিদ-সংলগ্ন আয়েশা (রা)-র ঘরে অবস্থান করতে থাকেন। ওফাতের ৫ দিন আগে (রবিউল আউয়াল মাসের ৮ তারিখ) বৃহস্পতিবার[২] তিনি গোসল করেন এবং কিছুটা সুস্থ বোধ করেন। তখন তিনি মসজিদে গিয়ে মিম্বরে বসেন এবং সাহাবীদেরকে অন্তিম উপদেশ নসীহত দান করেন। এছাড়াও তিনি অসুস্থ অবস্থায় বারংবার বিভিন্ন বিষয়ে ওসীয়ত করেন। এ সকল ওসীয়তে তিনি তাওহীদ, সালাত ও বান্দার হক্ক সম্পর্কে সতর্ক করেন। আয়েশা (রা), আবূ হুরাইরা (রা) জুনদুব (রা), আবূ উবাইদাহ ইবনুল জার্‌রাহ (রা) প্রমুখ সাহাবী বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তেকালের ৫ দিন পূর্বে এবং সর্বশেষ ওসীয়তের বর্ণনায় বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

أَلا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ أَلا فَلا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ. ... لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسْجِدًا. ... يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا ... وَاعْلَمُوا أَنَّ شِرَارَ النَّاسِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ. ... لا تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيدًا وَلا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلاتَكُمْ تَبْلُغُنِي... اللَّهُمَّ لا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا يُعْبَدُ اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى قَوْمٍ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

"তোমরা মনোযোগ দিয়ে শোন! তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহের মানুষেরা তাদের নবীগণ ও ওলীগণের কবরকে মসজিদ (ইবাদতগাহ) বানিয়ে নিত। তোমরা সাবধান! তোমরা কখনো কবরকে মসজিদ বানিয়ে নেবে না, নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে নিষেধ করছি এই কাজ থেকে।" ...

"আল্লাহ লানত-অভিশাপ প্রদান করেন ইহুদী ও খৃস্টানদের উপর, তারা তাদের নবীগণের কবরকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছিল।" একথা বলে তিনি তাঁর উম্মতকে অনুরূপ কর্ম থেকে সাবধান করছিলেন। .... "তোমরা জেনে রাখ, নিশ্চয় সবচেয়ে খারাপ মানুষ তারাই যারা তাদের নবীদের কবর মসজিদ বানিয়ে নেয়।" ... "তোমরা আমার কবরকে ইদ (ইদগাহ বা নিয়মিত সমাবেশের স্থান) বানিও না, আর তোমাদের আবাসস্থলকে কবর বানিয়ে নিওনা। তোমরা যেখানেই থাক না কেন আমার উপর সালাত (দরূদ) পাঠ করবে, কারণ তোমাদের সালাত আমার কাছে পৌঁছে যাবে।" "হে আল্লাহ, আমার কবরকে পূজিত দ্রব্য বা পূজ্য-স্থানের মত বানিয়ে দিবেন না যার ইবাদত করা হবে, আল্লাহর ক্রোধ কঠিনতর হোক সে সকল মানুষের উপর যারা তাদের নবীগণের কবরগুলিকে মসজিদ বানায়।"[৩]

তাঁর অসুস্থতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। তিনি এ সময়ে বারবার বলছিলেন:

---

[১] বুখারী, আস-সহীহ ৪/১৯১৬; মাহদী রিযকুল্লাহ, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, পৃ. ৬৮৮।

[২] ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ৮/১৪২।

[৩] বিস্তারিত বর্ণনাগুলির জন্য দেখুন: বুখারী, আস-সহীহ ১/১৬৫, ১৬৮, ৪৪৬, ৪৬৮, ৩/১২৭৩, ৪/১৬১৪, ৪/১৬১৫, ৫/২১৯০; মুসলিম, আস-সহীহ ১/৩৭৫-৩৭৮; মালিক, আল-মুআত্তা ১/১৭২; আহমদ, আল-মুসনাদ ১/১৯৫, ২/২৪৬, ৩৭৬; ইবনু হাজার আসকালানী, ফাতহুল বারী ১/৫২৩-৫২৪, ৫৩১, ৩/২০০, ২০৮, ২৫৫।

الصَّلَاةَ (الصَّلَاةَ) وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

"সালাত! সালাতের বিষয়ে সাবধান! (কোনোরূপ অবহেলা করবে না) এবং তোমাদের দাস-দাসীদের (অধীনস্থগণের) বিষয়ে সাবধান! তাদের পানাহার, পোশাক-পরিচ্ছদে ত্রুটি করবে না, তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করবে। তাদের বিষয়ে আল্লাহকে ভয় করবে।" এভাবে তিনি বারবার বলতে থাকেন।"[১]

এভাবেই তিনি তাওহীদ, সালাত ও বান্দার হক্কের বিষয়ে আমাদেরকে বারংবার ওসীয়ত করলেন। যুগে যুগে যত শিরক হয়েছে তা সবই নবী, রাসূল ও বুজুর্গগণের কবর কেন্দ্রিক অতিভক্তির কারণে। এজন্য তিনি উম্মাতকে সাবধান করেছেন। আর আল্লাহ ও বান্দার মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পর্ক সালাত। আর মানুষের অধিকার আদায় করা আল্লাহর রহমত ও করুণা লাভের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। বিশেষত যারা দুর্বল, অসহায় ও অধীনস্থদের অধিকার আদায় করা যেমন শ্রেষ্ঠতম ইবাদত, তেমনি তাদের উপর জুলুম করাও কঠিনতম অপরাধ ও আল্লাহর গযব লাভের অন্যতম কারণ। এজন্যই তিনি উম্মাতকে বারবার এ দুটি বিষয়ে সাবধান করছিলেন।

এতদিন পর্যন্ত অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি নিয়মিত জামাতে সালাতের ইমামতি করছিলেন। বৃহস্পতিবার মাগরিবের সালাতেও তিনি ইমামতি করেন। এরপর তাঁর অসুস্থতা বৃদ্ধি পায়। তিনি মসজিদে যেতে সক্ষম হন না। তখন তিনি আবু বকর (রা)-কে ইমামতি করার নির্দেশ দেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের জন্য কৃচ্ছতা বেছে নিয়েছিলেন। মদীনায় তিনি ছিলেন রাষ্ট্রপতি। আল্লাহ তাঁকে সকল গনীমত ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ প্রদান করেছিলেন, যে খাত থেকে তিনি অনেক সম্পদ লাভ করতেন। কিন্তু কিছুই তিনি নিজের জন্য রাখতেন না। সাধারণত সবই তিনি দান করে দিতেন। কখনো বা স্ত্রী-পরিবারের কিছু খাদ্য রেখে বাকী সব দান করতেন। ওফাতের পূর্বে তাঁর ঘরে মাত্র কয়েকটি দীনার বা স্বর্ণমুদ্রা ছিল, যা তিনি ওফাতের আগের দিন দান করে দেন। ওফাতের পূর্বে তিনি তাঁর বর্মটি এক ইহূদীর নিকট বন্ধক রেখে ৬০ সা' বা প্রায় ২০০ কেজি যব নিয়েছিলেন। ওফাতের সময় বর্মটি ইহূদীর নিকটেই ছিল, তা ছাড়িয়ে আনতে পারেন নি তিনি। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ইন্তেকাল করেন তখন আমার বাড়িতে সামান্য একটু যব ছাড়া কোনো প্রাণীর খাওয়ার মত আর কিছুই ছিল না[২]।

হাযেরীন, সোমবার দিন ভোরে যখন মুসলিমগণ আবূ বাকরের (রা) পিছনে ফজরের সালাত আদায় করছিলেন তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে পর্দা তুলে সমবেত মুসল্লীদের দিকে তাকালেন। আনন্দে উদ্ভাসিত তাঁর মুখমণ্ডল। মুচকি হাসলেন তিনি। সাহাবীগণ তাঁকে দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে সালাত ভেঙ্গে দেওয়ার উপক্রম করলেন। তাঁরা ভেবেছিলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সুস্থ হয়ে গিয়েছেন, আবার তিনি তাঁদের সাথে সালাত আদায় শুরু করবেন। মুসল্লীদের কাতারে যাওয়ার জন্য আবূ বকর পিছাতে শুরু করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺতাঁদেরকে ইশারা করে বললেন, তোমরা স্বস্থানে থেকে সালাত আদায় করতে থাক। এরপর তিনি পর্দা নামিয়ে দিলেন।[৩]

সকালে ফাতেমা (রা) যখন তাঁকে দেখতে এলেন, তিনি তাঁর কানে কানে কিছু বললেন। এতে ফাতেমা (রা) কাঁদতে শুরু করলেন। এরপর আবার তিনি তাঁকে ডেকে নিয়ে কিছু বললেন। তখন ফাতেমা (রা) খুশি হয়ে উঠলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তেকালের পর ফাতেমা (রা)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা

---

[১] ইবনু মাযাহ, আস-সুনান ১/৫১৮; আলবানী, সহীহ সুনান ইবনি মাজাহ ১/২৭১; মুহাম্মাদ ইবনু ইউসূফ, আস-সীরাহ আসশামিয়্যাহ ১২/২৫৬।

[২] বুখারী, আস-সহীহ ৩/১১২৯, ৫/২৩৭০; মুসলিম, আস-সহীহ ৫/২২৮২; ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ১১/২৮০। মাহদী রিযকুল্লাহ, আস-সীরাহ আন-নাবাবিয়্যাহ, পৃ. ৬৯০-৬৯১।

[৩] বুখারী, আস-সহীহ ১/২৪০; মুসলিম, আস-সহীহ ১/৩১৫।

করা হলে তিনি বলেন, প্রথমে তিনি আমাকে বলেন যে, এ অসুস্থতাতেই তাঁর মৃত্যু হবে। এজন্য আমি কাঁদছিলাম। এরপর তিনি আমাকে বলেন যে, তাঁর পরিবারের মধ্য থেকে আমিই সর্বপ্রথম তাঁর সাথে মিলিত হব। এতে আমি আনন্দিত হই।[১] রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ ভবিষ্যদ্বাণীও আক্ষরিকভাবে বাস্তবায়িত হয়। তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর পরিবারের মধ্যে ফাতেমা (রা)-ই সর্বপ্রথম ইন্তেকাল করেন।

মুহতারাম হাযেরীন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জ্বরের প্রকোপ ছিল খুবই বেশি। সাধারণ মানুষের চেয়েও অনেক বেশি কষ্ট ও যন্ত্রণা ভোগ করছিলেন তিনি। কিন্তু আল্লাহর মহান পুরস্কারের আবেগে এ যন্ত্রণা ও কষ্ট প্রশান্তভাবে সহ্য করছিলেন তিনি। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) বলেন,

دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُوعَكُ فَمَسِسْتُهُ بِيَدِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَجَلْ إِنِّي أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ قَالَ فَقُلْتُ ذَلِكَ أَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَجَلْ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذًى مِنْ مَرَضٍ فَمَا سِوَاهُ إِلا حَطَّ اللَّهُ بِهِ سَيِّئَاتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا

"রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন অসুস্থ ছিলেন তখন আমি তাঁর নিকট যেয়ে তাঁকে আমার হাত দিয়ে স্পর্শ করে বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল, আপনি তো প্রচণ্ডভাবে অসুস্থ। তিনি বললেন, হ্যাঁ। তোমাদের দুজন মানুষের যে পরিমাণ জ্বর-যন্ত্রণা বা কষ্টভোগকরে আমি একাই সে পরিমাণ কষ্টভোগ করছি। আমি বললাম: তা কি এজন্য যে, আপনার জন্য দ্বিগুণ সাওয়াব রয়েছে? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ। অতঃপর তিনি বলেনঃ যে কোনো মুসলিম যদি কোনো অসুস্থতা বা অন্য কোনো কষ্টে আক্রান্ত হয় তবে আল্লাহ তদ্বারা তার পাপগুলি ঝরিয়ে দেন যেমন বৃক্ষ তার পাতা ঝরিয়ে দেয়।"[২]

অন্য হাদীসে আয়েশার (রা) বলেন:

مَاتَ النَّبِيُّ ﷺ وَإِنَّهُ لَبَيْنَ حَاقِنَتِي وَذَاقِنَتِي فَلا أَكْرَهُ شِدَّةَ الْمَوْتِ لِأَحَدٍ أَبَدًا بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ.

"রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার গলা ও বুকের মাঝে মৃত্যুবরণ করেন, আর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরে আমি কারো মৃত্যুর কাঠিন্য অপছন্দ করি না।"[৩]

অন্য বর্ণনায় তিনি বলেন: "এরপর কারো কম কষ্টের মৃত্যুকে আমি প্রশংসনীয় কিছু মনে করি না।"[৪]

দিপ্রহরের পূর্বে তিনি তাঁর স্ত্রী আয়েশার (রা) কোলে মাথা রেখে শুয়ে ছিলেন। আযেশা (রা) বলেন:

دَخَلَ عَلَيَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَبِيَدِهِ السِّوَاكُ وَأَنَا مُسْنِدَةٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَأَيْتُهُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَعَرَفْتُ أَنَّهُ يُحِبُّ السِّوَاكَ فَقُلْتُ آخُذُهُ لَكَ فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ أَنْ نَعَمْ فَتَنَاوَلْتُهُ فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ وَقُلْتُ أُلَيِّنُهُ لَكَ فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ أَنْ نَعَمْ فَلَيَّنْتُهُ فَأَمَرَّهُ وَبَيْنَ يَدَيْهِ رَكْوَةٌ أَوْ عُلْبَةٌ فِيهَا مَاءٌ فَجَعَلَ يُدْخِلُ يَدَيْهِ فِي الْمَاءِ فَيَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ يَقُولُ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ ثُمَّ نَصَبَ يَدَهُ فَجَعَلَ يَقُولُ فِي الرَّفِيقِ الأَعْلَى (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَاجْعَلْنِي مَعَ الرَّفِيقِ الأَعْلَى) حَتَّى قُبِضَ وَمَالَتْ يَدُهُ.

---

[১] বুখারী, আস-সহীহ ৫/২৩১৭; মুসলিম, আস-সহীহ ৪/১৯০৪।
[২] বুখারী, আস-সহীহ ৫/২১৩৮; ২১৩৯, ২১৪৩, ২১৪৫; মুসলিম, আস-সহীহ ৪/১৯৯১।
[৩] বুখারী, আস-সহীহ ৪/১৬১৩, ১৬১৫।
[৪] শামী, মুহাম্মাদ ইবনু ইউসূফ, আস-সীরাহ আস-শামীয়াহ ১২/২৪০।

"আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কোলে নিয়ে বসে ছিলাম, এমতাবস্থায় আমার ভাই আব্দুর রাহমান আসল। তার হাতে একটি মেসওয়াক ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ মেসওয়াকটির দিকে তাঁকচ্ছিলেন। আমি বুঝলাম যে তিনি মেসওয়াক করতে চাচ্ছেন। আমি বললাম, আমি কি মেসওয়াকটি আপনার জন্য নেব? তিনি ইশারা করে বললেন, হ্যাঁ। তখন আমি সেটি নিয়ে তাঁকে দিলাম। কিন্তু সেটি তাঁর জন্য শক্ত ছিল। আমি বললাম, আমি কি নরম করে দিব? তিনি মাথা নেড়ে সম্মতি দিলেন। তখন আমি তা নরম করে দিলাম এবং তিনি তা মুখে বুলালেন। তার সামনে একটি পাত্রে পানি ছিল। তিনি পানির মধ্যে দু হাত প্রবেশ করিয়ে আদ্র হস্তদ্বয় দ্বারা তাঁর কপাল মুছছিলেন এবং বলছিলেন: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মৃত্যুর অনেক যন্ত্রণা আছে। এরপর তিনি তাঁর হাত উঠিয়ে বলতে লাগলেন: সর্বোচ্চ সাথীদের মধ্যে। হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমাকে সর্বোচ্চ সাথীদের সঙ্গে রাখুন। এরূপ বলতে বলতে তিনি ইন্তেকাল করেন এবং তার হাতটি নেমে যায়।"[১] এ সময় তার বয়স ছিল ৬৩ বৎসর।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশনা অনুসারে আয়েশা (রা)-এর ঘরের মধ্যে যেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইন্তেকাল করেন সেখানেই তাঁকে দাফন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। পরদিন মঙ্গলবার (১৩ই রবিউল আউয়াল) উক্ত ঘরের মধ্যে তাঁকে গোসল করান হয় এবং কাফন পরান হয়। এরপর সাহাবীগণ তাঁর জানাযার নামায আদায় করেন। একক বৃহৎ জামাতে জানাযা হয় নি। সাহাবীগণ ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে উক্ত গৃহের মধ্যে প্রবেশ করে জানাযার সালাত আদায় করে বেরিয়ে যান। এভাবে মঙ্গলবার সারাদিন কেটে যায়। মঙ্গলবার দিনগত রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দাফন করা হয়।

আয়েশার (রা) এই বাড়িটির আয়তন ছিল কমবেশি ১৬ হাত*৮ হাত। অর্থাৎ ,তাঁর পুরো বাড়িটি ছিল ৩০০ বর্গফুটেরও কম জায়গা। উচ্চতা ছিল প্রায় ৪/৫ হাত। বাড়িটি দুই অংশে বিভক্ত ছিল। মসজিদ সংলগ্ন ৬/৭ হাত প্রশস্ত অংশটুকু বসার স্থান হিসেবে ব্যবহৃত হতো। পিছনের অংশটুকু (১০*৮ হাত) শয়ন ও অবস্থানের ঘর বা বেডরুম। এ ঘরের মধ্যে (১০ হাত লম্বা ও ৮ হাত চওড়া) রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দাফন করা হয়। দাফনের পরেও আয়েশা (রা.) সেখানে বসবাস করতেন। আর কোনো বসতবাড়ি তাঁর ছিল-না। পরবর্তী কালে আবূ বাকর (রা) ও উমার (রা)-কেও এই ঘরের মধ্যেই দাফন করা হয়। এই ঘরের মধ্যে কবরগুলির পাশেই আয়েশা (রা.) প্রায় ৫০ বৎসর জীবনযাপনের পর ৫৮ হিজরীতে মুয়াবিয়ার (রা.) শাসনামলে ইন্তেকাল করেন।[২]

মুহতারাম হাযেরীন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অসুস্থতা ও ওফাতের ঘটনাবলির মধ্যে আমাদের অনেক কিছু শিক্ষণীয় রয়েছে। এ সকল ঘটনা আমাদের হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে হবে এবং শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। মহান আল্লাহ আমাদেরকে পরিপূর্ণ তাওহীদ ও সুন্নাতের উপর জীবন ধারণ ও মৃত্যুবরণের তাওফীক দিন এবং মৃত্যুর পরে আমাদেরক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ঝাণ্ডার নিচে একত্রিত করুন, তাঁর মুবারাক হাতে হাউযে কাউসারের পানি আমাদের নসীব করুন এবং জান্নাতে আমাদেরকে একত্রিত করুন। আমীন।

---

[১] বুখারী, আস-সহীহ ৪/১৬১৬; মুসলিম, আস-সহীহ ৪/১৭২১।

[২] বিস্তারিত দেখুন, খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, এহইয়াউস সুনান, পৃ. ৩৭৪-৩৭৮।

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

أَمَّا بَعْدُ، فَيَاأَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ

وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلا وَإِنَّ مَــنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ أَلا فَلا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ.

بَارَكَ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ فِيْ الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ. وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ. أَقُــوْلُ قَــوْلِيْ هَــذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُــلِّ ذَنْــبٍ، فَاسْتَغْفِرُوْهُ وَتُوْبُوْا إِلَيْهِ، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.

রবিউল আউয়াল মাসের ১ম খুতবাঃ মীলাদুন্নবী ﷺ

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লী আলা রাসূলিহীল কারীম। আম্মা বাদ,

সম্মানিত উপস্থিতি, আজ ...... হিজরী সালের রবিউল আউয়াল মাসের প্রথম জুমুআ। আজ আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্ম বা মীলাদুন্নবী নিয়ে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ। কিন্তু তার আগে আমরা এ সপ্তাহের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসগুলির বিষয়ে সংক্ষেপ আলোকপাত করি।

হাযেরীন, আজ ইংরেজী ..... মাসের ..... তারিখ। এ সপ্তাহের দিবসগুলির মধ্যে রয়েছে ..... ।

....

মুহতারাম হাযেরীন, আজ আমরা সেই নবীর জন্ম ও জীবনীর সামান্য কিছু বিষয় আলোচনা করব, মানব জাতির সৃষ্টির শুরুতেই যার মর্যাদার কথা লিপিবদ্ধ হয়েছিল মহান রবের দরবারে। সহীহ হাদীসে ইরবাদ ইবনু সারিয়া (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি:

إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ (إِنِّي عِنْدَ اللهِ مَكْتُـوبٌ بِخَـاتَمِ النَّبِيِّـينَ) وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ وَسَأُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِ ذَلِكَ (بِأَوَّلِ ذَلِكَ) دَعْوَةِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ وَبِشَارَةِ عِيسَى قَوْمَهُ وَرُؤْيَا أُمِّي الَّتِي رَأَتْ (حِينَ وَضَعَتْنِي) أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهَا نُورٌ أَضَاءَتْ لَهُ قُصُورُ الشَّامِ وَكَذَلِكَ تَرَى أُمَّهَاتُ النَّبِيِّينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ

"যখন আদম তার কাদার মধ্যে লুটিয়ে রয়েছেন (তাঁর দেহ তৈরি করা হয়েছে কিন্তু রূহ প্রদান করা হয় নি) সেই অবস্থাতেই আমি আল্লাহর নিকট উম্মুল কিতাবে খাতামুন নাবিয়্যীন বা শেষ নবী রূপে লিখিত। আমি তোমাদেরকে এর শুরু বা ব্যাখ্যা সম্পর্কে জানাব। তা হলো আমার পিতা ইবরাহীমের (আ) দোয়া, ঈসার (আ) সুসংবাদ এবং আমার আম্মার দর্শন। তিনি যখন আমাকে জন্মদান করেন তখন দেখেন যে, তাঁর মধ্য থেকে একটি নূর (জ্যোতি) নির্গত হলো যার আলোয় তাঁর জন্য সিরিয়ার প্রাসাদগুলি আলোকিত হয়ে গেল।"[১]

অন্য হাদীসে আবূ হুরাইরা (রা) বলেন,

قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى وَجَبَتْ لَكَ النُّبُوَّةُ قَالَ وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ

"তাঁরা (সাহাবীগণ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, কখন আপনার জন্য নবুয়ত স্থিরকৃত হয়? তিনি বলেন: যখন আদম দেহ ও রূহের মধ্যে ছিলেন তখন।"[২]

হাজার হাজার বছর ধরে নবী-রাসূলগণ ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন এবং বিশ্বাসী মানুষেরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেছেন তাঁর আগমনের। এ সকল ভবিষ্যদ্বাণীর বিস্তারিত আলোচনা খুতবার স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়। শুধু ইহূদী ও খৃস্টান সম্প্রদায়ের নিকট বিদ্যমান 'বাইবেল' থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি প্রদান করব। পাশ্চাত্যের সকল বাইবেল গবেষক একমত যে, ইহূদী-খৃস্টানগণ বিভিন্নভাবে তাওরাত, যাবূর ও ইঞ্জিলের মধ্যে বিকৃতি, পরিবর্তন, সংযোজন ও বিয়োজন করেছেন। তাঁরা মুহাম্মাদ ﷺ বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণীগুলি

[১] ইবনু হিব্বান, আস-সহীহ ১৪/৩১৩; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ২/৬৫৬; আহমদ, আল-মুসনাদ ৪/১২৭, ১২৮; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৮/২২৩।

[২] তিরমিযী, আস-সুনান ৫/৫৮৫। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান, সহীহ গরীব বলেছেন।

বিকৃত করেছেন। তারপরও অনেক ভবিষ্যদ্বাণী রয়ে গিয়েছে, যা তারা পুরো বিকৃত করতে পারে নি। যেমন বাইবেলের তাওরাত নামে কথিত অংশের প্রথম পুস্তক Genesis বা "আদিপুস্তকের" ১৭ অধ্যায়ের ২০ আয়াতে আল্লাহ্ ইবরাহীম (আ)-কে প্রতিশ্রুতি দেন যে, ইসমাঈলের বংশ থেকে একটি মহান জাতি (a great nation) তৈরি করবেন। এরপর তাওরাতের ৫ম পুস্তক Deuteromony বা "দ্বিতীয় বিবরণ" নামক গ্রন্থের ১৮ অধ্যায়ের ১৮ আয়াতে লিখিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ মূসা (আ)-কে বলেন: I will raise them up a Prophet from among their brethren, like unto thee, and will put my words in his mouth; and he shall speak unto them all that I shall command him. "আমি উহাদের জন্য উহাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে- অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের ভ্রাতৃগণ বনী ইসমাঈলের মধ্য থেকে- তোমার সদৃশ এক ভাববাদী- রাসূল উৎপন্ন করিব, ও তাঁহার মুখে আমার বাক্য দিব; আর আমি তাঁহাকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিব, তাহা তিনি উহাদিগকে বলিবেন।"

দ্বিতীয় বিবরণের ৩৩ অধ্যায়ের ২ আয়াতে বলা হয়েছে: The LORD came from Sinai, and rose up from Seir unto them; he shined forth from mount Paran, and he came with ten thousands of saints: from his right hand went a fiery law for them. অর্থাৎ "সদাপ্রভু সীনয় হইতে আসিলেন, সেয়ীর হইতে তাহাদের প্রতি উদিত হইলেন; পারণ পর্বত হইতে আপন তেজ প্রকাশ করিলেন, দশ সহস্র পবিত্রের সহিত[১] আসিলেন; তাহাদের জন্য তাঁহার দক্ষিণ হস্তে অগ্নিময় ব্যবস্থা ছিল।"

আররের মক্কাকে পারান বলা হতো। বাইবেলে বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইসমাঈল (আ) পারান প্রান্তরে বসতি স্থাপন করেন। এখানে সীনয় হতে আগমন বলতে মূসা (আ)-এর আগমন, সেয়ীর হতে উদিত হওয়া বলতে ঈসা (আ)-এর আগমন ও পারান হতে তেজ প্রকাশ বলতে মুহাম্মাদ ﷺ-এর আগমন বুঝানো হয়েছে। আর তিনি মক্কা বিজয়ের সময় দশ হাজার পবিত্রকে সাথে নিয়ে এসেছিলেন এবং মানবতার জন্য অগ্নিময় বিধান কুরআন দিয়ে গিয়েছেন।

ইসমাঈল (আ)-এর পুত্র কেদাররে নামানুসারে বাইবেলে বিভিন্নস্থানে আরবরদেরকে কেদার-বংশীয় বলা হয়েছে। বাইবেলের পুরাতন নিয়মের একটি পুস্তক যিশাইয় নবীর পুস্তক। এ পুস্তকের ২১ অধ্যায়ে ১৩-১৭ আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হিজরত, পথিমধ্যে তিহামার উম্মু মা'বাদের নিকট থেকে পানি ও দুগ্ধ গ্রহণ ও এক বছরের মধ্যে বদর যুদ্ধে কুরাইশদের পরাজয়ের বিষয়ে বলা হয়েছে: "আরর দেশের উপরে দায়িত্ব। হে দদানীয় পথিক দলসমূহ, তোমরা আরবে বনের মধ্যে রাত্রি যাপন করিবে। তোমরা তৃষিতের কাছে জল আন; হে টেমা-দেশবাসীরা, তোমরা অন্ন লইয়া পলাতকদের সহিত সাক্ষাৎ কর। কেননা তাহারা খড়্গের সম্মুখ হইতে, নিষ্কোষিত খড়্গের, আকর্ষিত ধনুর ও ভারী যুদ্ধের সম্মুখ হইতে পলায়ন করিল। বস্তুতঃ প্রভু আমাকে এই কথা কহিলেন, বেতনজীবীর বৎসরের ন্যায় আর এক বৎসর কাল মধ্যে কেদরের সমস্ত প্রতাপ লুপ্ত হইবে; আর কেদর-বংশীয় বীরগণের মধ্যে অল্প ধনুর্ধর মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে।"

প্রচলিত বাইবেলে আমরা দেখি যে, ঈসা (আ) বারংবার পারাক্লীটস বা প্রশংসিত ব্যক্তি (মুহাম্মাদ), শাফায়াতকারী, সাহায্যকারী সত্যের আত্মা বা 'আল-আমীন'-এর আগমনের কথা জানাচ্ছেন। খৃস্টান পাদরিগণ এগুলির বিভিন্ন ভুল ব্যাখ্যা করে খৃস্টানদেরকে বিভ্রান্ত করে। সুস্পষ্টতই এখানে মুহাম্মাদ ﷺ-এর আগমনের কথা বলা হয়েছে। বাইবেলের ইঞ্জিল শরীফ বলে কথিত অংশে যোহনের

---

[১] বাংলা বাইবেলে 'নিকট হইতে' লেখা হয়েছে। তবে ইংরেজি অথোরাইযড ভার্সনের ভাষ্য অনুসারে 'সহিত' হওয়া বাঞ্ছনীয়।

লেখা ইঞ্জিলের ১৬ অধ্যায়ের ৭, ১২-১৩ আয়াতে বলা হয়েছে: Nevertheless I tell you the truth; It is expedient for you that I go away: for if I go not away, the Comforter (Paracletos)/ (Periclytos) will not come unto you; but if I depart, I will send him unto you. ... I have yet many things to say unto you, but ye cannot bear them now. Howbeit when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth: for he shall not speak of himself; but whatsoever he shall hear *that* shall he speak: and he will shew you things to come. "তথাপি আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি, আমার যাওয়া তোমাদের পক্ষে ভাল, কারণ আমি না গেলে, সেই ফারাক্লীত: Paracletos: সুপারিশকারী বা Periclytos প্রশংসিত ব্যক্তি তোমাদের নিকটে আসিবেন না; কিন্তু আমি যদি যাই, তবে তোমাদের নিকটে তাঁহাকে পাঠাইয়া দিব। ... তোমাদিগকে বলিবার আমার আরও অনেক কথা আছে, কিন্তু তোমরা এখন সেই সকল সহ্য করিতে পার না। পরন্তু তিনি, সত্যের আত্মা (আস-সাদেক, আল-আমীন) যখন আসিবেন, তখন পথ দেখাইয়া তোমাদিগকে সমস্ত সত্যে লইয়া যাইবেন; কারণ তিনি আপনা হইতে কিছু বলিবেন না, কিন্তু যাহা যাহা শুনেন, তাহাই বলিবেন, এবং আগামী ঘটনাও তোমাদিগকে জানাইবেন।"

এরূপ অনেক স্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী বাইবেলের মধ্যে রয়েছে। রেভারেন্ড প্রফেসর ডেভিড বেঞ্জামিন আরমেনীয়ার একজন বিশপ ছিলেন। তিনি খৃস্টধর্মের উপরে সর্বোচ্চ লেখাপড়া করেন এবং গ্রীক, ল্যাটিন, সিরিয়ান, আরামাইক, হিব্রু, কালডীয়ান ইত্যাদি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। ১৯০০ সালের দিকে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁর রচিত অনেকগুলি মূল্যবান পুস্তকের একটি Muhammad in the Bibble। এ পুস্তকে তিনি এ জাতীয় অনেক ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়া মুসল্লীদেরকে বিশেষ করে আল্লামা রাহমাতুল্লাহ কিরানবী লিখিত 'ইযহারুল হক্ক' গ্রন্থটি পাঠ করতে অনুরোধ করছি। বইটির বাংলা অনুবাদ ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে।

হাযেরীন, মানবতার অপেক্ষার পালা শেষ হলো, মহান আল্লাহর মহান নবীর আগমনের সময় হলো। ইবরাহীম (আ)-এর দোয়ার বাস্তবায়নে ইসমাঈল (আ)-এর বংশে আরবে শ্রেষ্ঠতম কুরাইশ বংশে রাসূলুল্লাহ ﷺ জন্মগ্রহণ করেন। সহীহ হাদীস থেকে জানা যায় যে, তিনি সোমবার জন্মগ্রহণ করেন। আবু কাতাদা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সোমবার দিন রোযা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। তিনি বলেন :

ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ وَيَوْمٌ بُعِثْتُ أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ

"এই দিনে আমি জন্মগ্রহণ করেছি এবং এই দিনেই আমি নবুয়্যত পেয়েছি।"[১]

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন :

وُلِدَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَاسْتُنْبِئَ يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَتُوُفِّيَ يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَخَرَجَ مُهَاجِرًا مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَقَدِمَ الْمَدِينَةَ يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَرَفَعَ الْحَجَرَ الأَسْوَدَ يَوْمَ الاثْنَيْنِ"

"রাসূলুল্লাহ ﷺ সোমবারে জন্মগ্রহণ করেন, সোমবারে নবুয়্যত লাভ করেন, সোমবারে ইন্তেকাল করেন, সোমবারে মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনার পথে রওয়ান করেন, সোমবারে মদীনা পৌছান এবং সোমবারেই তিনি হাজরে আসওয়াদ উত্তোলন করেন।"[২]

---

[১] সহীহ মুসলিম ২/৮১৯।
[২] মুসনাদে আহমাদ ৪/১৭২-১৭৩, নং ২৫০৬।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্মের সাল সম্পর্কে কায়স ইবনু মাখরামা (রা.) বলেন :

وُلِدْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْفِيلِ. وَسَأَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ قُبَاثَ بْنَ أَشْيَمَ أَخَا بَنِي يَعْمَرَ بْنِ لَيْثٍ أَأَنْتَ أَكْبَرُ أَمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكْبَرُ مِنِّي وَأَنَا أَقْدَمُ مِنْهُ فِي الْمِيلَادِ وُلِدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْفِيلِ.

"আমি ও রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'জনেই 'হাতির বছরে' জন্মগ্রহণ করেছি। উসমান ইবনু আফফান (রা.) কুবাস ইবনু আশইয়ামকে (রা) প্রশ্ন করেন : আপনি বড় না রাসূলুল্লাহ ﷺ বড়? তিনি উত্তরে বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার থেকে বড়, আর আমি তাঁর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ 'হাতীর বছরে' জন্মগ্রহণ করেন।"[১] হাতীর বছর অর্থাৎ যে বৎসর আবরাহা হাতি নিয়ে কাবা ঘর ধ্বংসের জন্য মক্কা শরীফ আক্রমণ করেছিল। ঐতিহাসিকদের মতে এ বছর ৫৭০ বা ৫৭১ খ্রিষ্টাব্দ ছিল।[২]

হাযেরীন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন মাসের কত তারিখে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সে সম্পর্কে হাদীসে নববী থেকে কিছুই জানা যায় না। সাহাবীগণের মাঝেও এ বিষয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট মত প্রচলিত ছিল না। একারণে পরবর্তী যুগের আলিম ও ঐতিহাসিকগণ তাঁর জন্মতারিখ সম্পর্কে অনেক মতভেদ করেছেন। ইবনু হিশাম, ইবনু সা'দ, ইবনু কাসীর, কাসতালানী ও অন্যান্য ঐতিহাসিক ও সীরাত লিখক এ বিষয়ে ১২টিরও বেশি মতামত উল্লেখ করেছেন। জন্ম মাসের বিষয়ে আটটি মত পাওয়া যায়। কেউ বলেছেন মুহার্‌রাম, কেউ বলেছেন সফর, কেউ বলেছেন রবিউল আউয়াল, কেউ বলেছেন রবিউস সানী, কেউ বলেছেন রজব এবং কেউ বলেছেন রামাদান মাসে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। যারা রবিউল আউয়াল মাসকে তাঁর জন্ম মাস বলেছেন তারাও তারিখ নিয়ে অনেক মতভেদ করেছেন। কেউ বলেছেন তিনি এ মাসে ২ তারিখে, কেউ বলেছেন ৮ তারিখে, কেউ বলেছেন ১০ তারিখে, কেউ বলেছেন ১২ তারিখে, কেউ বলেছেন ১৭ তারিখে এবং কেউ বলেছেন ২২ তারিখে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। প্রত্যেক মতের পক্ষেই কোনো কোনো সাহাবী বা তাবিয়ী থেকে মতামত বর্ণনা করা হয়েছে।[৩]

তাঁর জন্মের কয়েক মাস পূর্বেই তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দুল মুত্তালিব ইন্তেকাল করেন। জন্মের পর তাঁর মাতা তাঁর নাম রাখেন আহমদ। আর তাঁর দাদা তাঁর নাম রাখেন মুহাম্মাদ। মুহাম্মাদ নামেই তিনি অধিক পরিচিত ছিলেন। আবূ মূসা আশআরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে তাঁর নামগুলি বলতেন। তিনি বলতেন:

أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَحْمَدُ وَالْمُقَفِّي وَالْحَاشِرُ وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ وَنَبِيُّ الرَّحْمَةِ

"আমি মুহাম্মাদ, আমি আহমাদ, আমি আল-মুকাফ্‌ফী (সর্বশেষ), আমি আল-হাশির (জমায়েতকারী), আমি নাবিইউত তাওবা (তাওবার নবী) এবং আমি নাবিইউর রাহমাত (রহমতের নবী)।"[৪]

হাযেরীন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্ম নিঃসন্দেহে উম্মাতের জন্য মহা আনন্দের বিষয়। তবে এ আনন্দ

---

[১] তিরমিযী, আল-জামিয়, প্রাগুক্ত ৫/৫৫০, নং ৩৬১৯। ইমাম তিরমিযী বলেছেন: হাদীসটি হাসান গরীব।

[২] আকরাম যিয়া আর-উমারী, আস-সীরাতুন নাবাবীয়্যাহ আস-সহীহা ১/৯৬-৯৮, মাহদী রেজকুল্লাহ, আস-সীরাতুন নাবাবীয়াহ, ১০৯-১১০ পৃ।

[৩] ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা ১/১০০-১০১, ইবনু কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ২/২১৫, আল-কাসতালানী, আহমদ বিন মুহাম্মাদ, আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যা ১/৭৪-৭৫, আল-যারকানী, শরহুল মাওয়াহিব আল-লাদুন্নিয়্যা ১/২৪৫-২৪৮, ইবনু রাজাব, লাতায়েফুল মায়ারেফ ১/১৫০; ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, এহইয়াউস সুনান, ৫১৯-৫২১ পৃষ্ঠা।

[৪] মুসলিম, আস-সহীহ ৪/১৮২৮এ

প্রকাশ যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের সুন্নাত অনুসারে হয় তাহলে তাতে সাওয়াব হবে।

আমরা যে কোনো "জায়েয" পদ্ধতিতে "জায়েয" খাবার খেতে পারি, তাতে আমরা খাবারের মজা, আনন্দ ও পুষ্টি লাভ করব; তবে সুন্নাত পদ্ধতিতে সুন্নাত খাবার খেলে মজা, আনন্দ ও পুষ্টি ছাড়াও আমরা অতিরিক্ত 'সাওয়াব' লাভ করব। আমারা যে কোনো "জায়েয" পোশাক যে কোনো "জায়েয" পদ্ধতিতে পরিধান করতে পারি, এতে আমাদের সতর ঢাকা ও সৌন্দর্য অর্জন হবে; তবে সুন্নাত পদ্ধতিতে সুন্নাত পোশাক পরিধান করলে আমরা সতর ঢাকা ও সৌন্দর্যের সাথে সাথে সাওয়াব ও বরকত অর্জন করব। অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মীলাদ বা জন্মে আমাদের আনন্দ রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের সুন্নাত অনুসারে করতে পারলে আমরা এতে অফুরন্ত সাওয়াব ও বরকত লাভ করতে পারব।

সফর মাসের প্রথম খুতবায় আমরা সুন্নাতের গুরুত্ব আমরা জেনেছি। আমরা দেখেছি যে, সুন্নাত অর্থ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হুবহু অনুকরণ। তিনি যে ইবাদতটি যেভাবে পালন করেছেন তা সেভাবে পালন করাই তাঁর সুন্নাত। বিভিন্ন সহীহ হাদীসের আলোকে আমরা দেখেছি যে, সুন্নাত ভালবাসলে ও সুন্নাত জীবিত করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে জান্নাতে অবস্থানের নিয়ামত লাভ করা যাবে। ফিতনার সময়ে সাহাবীগণের সুন্নাত অবিকল অনুসরণ করলে ৫০ জন সাহাবীর সমপরিমাণ সাওয়াব পাওয়া যায়। কাজেই আমরা যদি মীলাদুন্নবী (ﷺ)-এর আনন্দ অবিকল রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীগণের পদ্ধতিতে করতে পারি তাহলে আনন্দ প্রকাশের সাথে সাথে আমরা এরূপ অফুরন্ত সাওয়াব লাভ করতে পারব। তাহলে আমরা কেন সুন্নাত পদ্ধতি বাদ দিয়ে নিজেদের ইচ্ছামত পদ্ধতিতে মীলাদুন্নবী (ﷺ) পালন করব? সুন্নাত পদ্ধতিতে সাওয়াব কম হয় মনে করে? না সুন্নাত পদ্ধতি বর্তমানে অচল মনে করে? এতে তো সুন্নাত অবজ্ঞা করার গোনাহ হয়ে যাবে।

হাযেরীন, মীলাদ পালনের সুন্নাত পদ্ধতি হলো প্রতি সোমবার সিয়াম পালনের মাধ্যমে আল্লাহর দবরারে শুকরিয়া জানানো। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে আমাদের এ পদ্ধতি শিখিয়েছেন। এ ছাড়া আমরা দেখেছি যে, মূসা (আ) ও পরবর্তীকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ আশূরার দিন সিয়াম পালন করেছেন। এ থেকে আমরা বুঝি যে, বড় নেয়ামত ও বিজয়ে আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ক্ষেত্রে নবীগণের সুন্নাত হলো সিয়াম পালন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মীলাদ বা জন্মে আনন্দ প্রকাশের দ্বিতীয় সুন্নাত পদ্ধতি হলো সর্বদা তাঁর উপর দরুদ ও সালাম পাঠ করা। তিনি আমাদের জন্য যা করেছেন আমরা জীবন বিলিয়ে দিলেও তাঁর সামান্যতম প্রতিদান দিতে পারব না, কারণ আমরা হয়ত আমাদের পার্থিব সংক্ষিপ্ত জীবনটা বিলিয়ে দিলাম, কিন্তু তিনি তো আমাদের পার্থিব ও পারলৌকিক অনন্ত জীবনের সফলতার পথ দেখাতে তাঁর মহান জীবনকে উৎসর্গ করেছেন। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি আমাদের নূন্যতম দায়িত্ব যে আমরা সর্বদা তাঁর জন্য সালাত ও সালাম পাঠ করব। আল্লাহর যিক্র ও সালাত সালামের জন্য ওযু করা শর্ত নয়, তবে তা উত্তম। বসে, শুয়ে, দাঁড়িয়ে, হাঁটতে হাঁটতে, ওযুসহ বা ওয-ছাড়া সর্বাবস্থায় সালাত-সালাম পাঠ করতে হবে। বিভিন্ন সহীহ হাদীস থেকে জানা যায় যে, একবার সালাত পাঠ করলে বান্দা নিম্নের সাত প্রকার পুরস্কার লাভ করে: একবার দরুদ পাঠ করলে (১) মহান আল্লাহ দরুদ পাঠকারীর দশটি গোনাহ ক্ষমা করেন, (২) দশটি সাওয়াব দান করেন, (৩) দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি করেন, (৪) দশটি রহমত দান করেন, (৫) ফিরিশতাগণ তার জন্য দু'আ করতে থাকেন, (৬) ফিরিশতাগণ পাঠকারীর নাম ও তার পিতার নামসহ তার সালাত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র রাওযায় পৌছে দেন, (৭) তিনি নিজে এবার সালাত পাঠকারীর জন্য ১০ বার দুআ করেন। বেশি বেশি সালাত পাঠকারীর জন্য রয়েছে অতিরিক্ত দুটি পুরস্কার: প্রথমত আল্লাহ তার

সমস্যা ও দুশ্চিন্তা মিটিয়ে দিবেন এবং দ্বিতীয়ত: রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শাফায়াত তাঁর পাওনা হবে।

সালাতের সাথে সাথে সালাম পাঠ করতে হবে। তাঁর উপর সালাম পাঠ করলে, স্বয়ং আল্লাহ সালাম পাঠকারীকে সালাম প্রদান করেন, সালাম রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রাওযা মুবারাকায় ফিরিশতাগণ পৌঁছে দেন এবং তিনি সালামের উত্তর প্রদান করেন।[১]

মীলাদে মুসতাফায় আনন্দ প্রকাশের ক্ষেত্রে সাহাবীগণের অন্যতম সুন্নাত হলো, সর্বদা তাঁর সীরাত-শামাইল আলোচনা করা। সাহাবীগণ, তাবিয়ীগণ, তাবি-তাবিয়ীগণ বা আমাদের ইমামগণ কেউ কখনো ১২ই রবিউল আউয়াল বা অন্য কোনো দিনে মীলাদ উপলক্ষে আনন্দ, উৎসব বা সমাবেশ করেন নি। তাঁরা সদা সর্বদা সুযোগ মত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনী, জন্ম, সীরাত, সুন্নাত, আখলাক, নির্দেশ এগুলি আলোচনা করতেন। আমাদেরও উচিত সর্বদা সুযোগ মত এরূপ আলোচনার মাজলিসের আয়োজন করা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আগমনে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অন্যতম দিক হলো তাঁর মহান শিক্ষা ও পবিত্রতম চরিত্রের কথা বিশ্ববাসীকে জানানো। ইসলামের সত্য ও সরলতা যে কোনো মানুষকে মুগ্ধ করে এবং সাধারণভাবে মানুষ সহজেই ইসলাম গ্রহণ করে। এভাবে অতি দ্রুত ইসলাম বিভিন্ন মানব সমাজে বিস্তার লাভ করেছে। ইসলামের এ অগ্রযাত্রায় বিক্ষুদ্ধ হয়ে সকল যুগেই অন্ধকারের পূজারীরা মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে। অতীতের মত বর্তমান যুগেও পাশ্চাত্যের ধর্মগুরু ও পণ্ডিতগণ ইসলামের বিরুদ্ধে ও বিশেষত ইসলামের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিরুদ্ধে অগণিত মিথ্যাচারের মাধ্যমে তাঁকে কলঙ্কিত করতে অপচেষ্টা করছে। মুহাম্মাদ ﷺ জিহাদ করেছেন ও জিহাদ অনুমোদন করেছেন বলে তারা তাঁকে সন্ত্রাসী বলে চিত্রিত করছে। অথচ তাদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেলে নারী-পুরুষ ও শিশু-কিশোর নির্বিশেষে নির্বিচারে অপরধর্মের মানুষদের হত্যা করতে এবং তাদের উপাসনালয় ভেঙ্গে ফেলতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অনুরূপভাবে যারা ইহূদী-খৃস্টান নয় বাইবেলে তাদেরকে কুকুর ও শূকর নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রচলিত বিকৃত বাইবেলের বর্বর জিহাদকে মানবিক রূপদান করেছেন, সন্ত্রাস ও সংঘাতের পথ রুদ্ধ করেছেন এবং জাতিধর্ম ও লিঙ্গবর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের সাম্য ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন। আজ আমাদের দায়িত্ব হলো তাঁর মহান শিক্ষা বিশ্বের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া। বড় দুঃখজনক বিষয় হলো, হাজার বছর বাংলার মুসলিমদের পাশে বাস করল সাওতাল, গারো, চাকমা ও অন্যান্য উপজাতির মানুষেরা, কিন্তু আমরা তাদেরকে মুহাম্মাদ ﷺ-এর পরিচয় তাদের কাছে তুলে ধরলাম না বা তাঁকে চিনতে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করলাম না। অথচ খৃস্টান মিশনারীগণ হাজার হাজার মাইল দূর থেকে এসে তাদের নবী ঈসা মাসীহর কথা তাদেরকে শোনালো এবং তাদেরকে খৃস্টান বানিয়ে নিল। আমাদের একটু ভেবে দেখা দরকার।

হাযেরীন, আমাদের দুর্ভাগ্য যে, বৎসরের প্রায় প্রতিদিন আমরা সাধারণত বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে, মানুষদের মুখ থেকে, বই বা পত্রপত্রিকা পড়ে সারাদিন অনেক কিছু শুনি, পড়ি, দেখি এবং বলি, কিন্তু এর মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ থাকেন না। আমরা তাঁর বিষয়ে খুব কমই পড়ি, বলি, দেখি বা শুনি। এরূপ অবহেলা ও দূরত্বের সাথে যদি আমরা মাঝে মধ্যে মীলাদ করে আমাদের ভালবাসা প্রকাশ করি তবে তা ভণ্ডামি ছাড়া আর কিছুই হবে না। সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হলো, আমাদের নিজেদের "মীলাদ" অর্জন করা। হাযেরীন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি ঈমান এনে, তাঁর শরীয়ত মোতাবেক জীবন গঠন করে, তাঁর সুন্নাতের পরিপূর্ণ অনুসরণ করে, সদা সর্বদা তাঁর উপর দরুদ সালাম পাঠ করে, সাধ্যমত বেশি বেশি তাঁর জীবনী ও হাদীস পাঠ করে ও শ্রবণ করে নিজেদের জন্য নতুন জীবনের নতুন জন্ম লাভ করা। এই তো হলো সর্বোচ্চ সফলতা। আল্লাহ আমাদের সকলকে তাওফীক প্রদান করুন। আমীন।

---

[১] বিস্তারিত দেখুন, ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, রাহে বেলায়াত, পৃষ্ঠা ১৪৮-১৬৬।

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

أَمَّا بَعْدُ، فَيَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ، قَالَ اللهُ تَعَالَىَ: وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ

مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَـذَا سِـحْرٌ مُبِينٌ

وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ

بَارَكَ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ فِيْ الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ. وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ. أَقُـوْلُ قَـوْلِيْ هَـذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُـلِّ ذَنْـبٍ، فَاسْتَغْفِرُوْهُ وَتُوْبُوْا إِلَيْهِ، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.

রবিউল আউআল মাসের ২য় খুতবাঃ কুফর ও তাকফীর

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লী আলা রাসূলিহীল কারীম। আম্মা বাদ,

সম্মানিত উপস্থিতি, আজ রবিউল আউয়াল মাসের ২য় জুমুআ। আজকের খুতবায় আমরা কুফর বা অবিশ্বাস বিষয়ে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ। কিন্তু তার আগে আমরা এ সপ্তাহের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসগুলির বিষয়ে সংক্ষেপ আলোকপাত করি।

হাযেরীন, আজ ইংরেজী ..... মাসের ..... তারিখ। এ সপ্তাহের দিবসগুলির মধ্যে রয়েছে ..... ।

....

সম্মানিত মুসল্লীবৃন্দ, গত কয়েক খুতবায় আমরা ঈমান সম্পর্কে জানতে পেরেছি। ঈমান বা বিশ্বাসের বিপরীত 'অবিশ্বাস'। কুরআন ও হাদীসের বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারি যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঈমান থেকেই কুফরী জন্মেছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঈমানের নামেই কুফরী প্রচারিত হয়েছে। ইহূদী, খৃস্টান ও আরবের মুশরিকগণ মূলত আসমানী কিতাব বা ওহী এবং আল্লাহর মনোনীত নবী-রাসূলদের অনুসারী ছিলেন। কিন্তু বিভিন্ন কারণে তারা সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হন এবং কুফরীতে লিপ্ত হন। এজন্য ঈমানদারদের অত্যন্ত সতর্ক থাকা দরকার এবং এ বিষয়ে ভাল জ্ঞান অর্জন করা দরকার।

হাযেরীন, কুরআন ও হাদীসের আলোকে অবিশ্বাসের প্রকাশ তিন প্রকারঃ (১) কুফর, (২) শিরক ও (৩) নিফাক। 'কুফর' শব্দের অর্থ আবৃত করা, অবিশ্বাস করা বা অস্বীকার করা। আমরা ইতোপূর্বে ঈমানের যে বিষয়গুলি জেনেছি সেগুলির কোনো একটি অবিশ্বাস, সন্দেহ বা দ্বিধা করাই কুফর। রব্ব হিসেবে আল্লাহর একত্ব, মা'বুদ হিসেবে আল্লাহর একত্ব, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সত্যবাদিতা, নিষ্কলুষ চরিত্র, নিষ্পাপ ব্যক্তিত্ব, তাঁর নুবুওয়াতের বিশ্বজনীনতা, নুবুওয়াতের সমাপ্তি, তাঁর আনুগত্য অনুকরণের বাধ্যবাধকতা, তাঁর শিক্ষার বিশুদ্ধতা, পূর্ণতা, অন্যান্য নবী রাসূলের নবুবওয়াত বা নিষ্পাপত্ব, আখিরাত বিষয়ক প্রমাণিত কোনো বিষয়, তাকদীরের বিষয়ে প্রমাণিত কোনো বিষয় বা ঈমানের যে কোনো প্রমাণিত বিষয় অস্বীকার, অবিশ্বাস, দ্বিধা বা সন্দেহ করলে তা কুফরী বলে গণ্য হবে।

হাযেরীন, অনুরূপভাবে মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে কোনো বিষয়ে তাঁর সমতুল্য বা সমকক্ষ বা তাঁর সাথে তুলনীয় বলে বিশ্বাস করার মাধ্যমে আল্লাহর একত্ব ও অতুলনীয়ত্ব অস্বীকার করাও কুফর। তবে এ পর্যায়ের কুফরকে ইসলামী পরিভাষায় শির্ক বলা হয়।

হাযেরীন, কুরআন বা সুন্নাত দ্বারা ব্যাখ্যাতীতভাবে প্রমাণিত কোনো বিধান অবিশ্বাস বা অস্বীকার করা কুফ্‌রী। সালাত, যাকাত, সিয়াম ইত্যাদির ফরয হওয়া অস্বীকার করা, ব্যভিচার, চুরি, হত্যা ইত্যাদির হারাম হওয়া অস্বীকার করা, সালাতের তাহারাত, রাক'আত, সময়, সাজদা, রুকু ইত্যাদির পদ্ধতি অস্বীকার বা ব্যতিক্রম করা এ পর্যায়ের কুফ্‌র। তবে অজ্ঞতার কারণে অস্বীকার করলে তা ওযর বলে গণ্য হতে পারে। কোনো ইজতিহাদী বা ইখতিলাফী বিষয় অস্বীকার করলে তা কুফ্‌র বলে গণ্য হবে না।

হাযেরীন, কোনো প্রকার কুফ্‌রে সন্তুষ্ট থাকা কুফ্‌র। অনুরূপভাবে ইসলামের প্রতি অসন্তুষ্ট থাকাও কুফ্‌র। যেমন আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অপছন্দ করা, ইসলামের বিধান বলে সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত কোনো কিছু প্রতি বিরক্তি বা ঘৃণা পোষণ করা, ইসলামের কোনো নির্দেশ বা শিক্ষা অচল, সেকেলে বা অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করা কুফর। অনুরূপভাবে আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করা বৈধ মনে করা কুফ্‌র। যদি কেউ আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করা পাপ ও অন্যায় জেনেও প্রবৃত্তি বা শয়তানের প্ররোচনায় বা

জাগতিক কোনো স্বার্থে আল্লাহর বিধান অমান্য করে, আল্লাহর বিধানের বিপরীতে চলে, চালায় বা বিধান দেয় সে পাপী বলে গণ্য। কিন্তু কেউ যদি মনে করে 'মারিফাত' হাসিল হয়ে যাওয়ার কারণে কোনো ব্যক্তির জন্য আল্লাহর বিধান বা শরীয়তের ব্যতিক্রম করা বৈধ, অথবা মনে করে যে, যুগের প্রেক্ষাপটে ইসলামের অমুক বিধানটি মানা জরুরী নয় বা কুরআনের অমুক নির্দেশনাটি আর কার্যকর নয়, অথবা কুরআনের নির্দেশনার বিপরীত চলা, চলানো বা বিধান দেওয়াতে কোনো অসুবিধা নেই তবে সে ব্যক্তি কাফির বলে গণ্য। তিনি যদি ইসলামের কিছু বিধান পালন করেন তবুও তিনি কাফির বলে গণ্য হবেন। কারণ আল্লাহর কোনো একটি নির্দেশ অপছন্দ করা কুফর। মহান আল্লাহ বলেন:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ

"যারা কুফরী করেছে তাদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ এবং তিনি তাদের কর্ম ব্যর্থ করে দিবেন। তা এজন্য যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তারা তা অপছন্দ করে। সুতরাং আল্লাহ তাদের কর্ম নিষ্ফল করে দিবেন।"[১] অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন:

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

"আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না তারাই কাফির।"[২]

অনুরূপভাবে ইসলামের কোনো প্রমাণিত বিষয় নিয়ে হাসি-তামাশা বা উপহাস করা অথবা যারা এরূপ করে তাদের সাথে অবস্থান করা বা তাদের সাথে আন্তরিক সম্পর্ক রাখা। মহান আল্লাহ বলেন:

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

"তুমি যখন দেখ, তারা আমার আয়াত সম্বন্ধে উপহাসমূলক আলোচনায় মগ্ন হয় তখন তুমি দূরে সরে পড়বে, যে পর্যন্ত না তারা অন্য প্রসংগে প্রবৃত্ত হয়। এবং শয়তান যদি তোমাকে ভ্রমে ফেলে তবে স্মরণ হওয়ার পরে জালিম সম্প্রদায়ের সাথে বসবে না।"[৩]

অমুসলিম বা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত কাফির, নাস্তিক, মুরতাদ কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সাথে আন্তরিক ভালবাসার সম্পর্ক রাখাও কুফরী। তবে এদের সাথে সামাজিক, রাষ্ট্রীয় বা ডিপ্লোম্যাটিক সম্পর্ক রাখা যাবে। কুরআনে বিষয়টি বারংবার বলা হয়েছে। এক আয়াতে আল্লাহ বলেন:

لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً

"মুমিনগণ যেন মুমিনগণ ব্যতীত কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যে কেউ এরূপ করবে তার সাথে আল্লাহর কোনো সম্পর্ক থাকবে না। তবে ব্যতিক্রম, যদি তোমরা তাদের নিকট হতে আত্মরক্ষার জন্য সতর্কতা অবলম্বন কর।"[৪]

---

[১] সূরা (৪৭) মুহাম্মাদ: ৮-৯ আয়াত।
[২] সূরা (৫) মায়িদা: ৪৪ আয়াত।
[৩] সূরা (৬) আন'আম: ৬৮ আয়াত।
[৪] সূরা (৩) আল-ইমরান: ২৮ আয়াত।

হাযেরীন, যে ব্যক্তি কোনো রাজনৈতিক দলের অনুসারী, তার দল বা দলের নেতাকে যারা নিন্দা করে তাদের সাথে এ ব্যক্তি কখানোই আন্তারিক বন্ধুত্ব গড়তে পারে না। সামাজিকভাবে মিশলেও মনের মধ্যে দূরত্ব থাকবেই। আপনার দীন কি রাজনৈতিক মতাদর্শের চেয়ে বড় নয়? যে ব্যক্তি আপনার মহান রব্বকে, তাঁর মহান রাসূলকে বা তাঁর প্রমাণিত কোনো শিক্ষাকে অস্বীকার বা উপহাস করছে তার প্রতি যদি আপনার মনের বিরাগ ও কষ্ট না থাকে তাহলে বুঝতে হবে আপনি তার কুফরীতে সুন্তুষ্ট আছেন। আপনার রবের বা নবীর অবমাননায় আপনার কোনো কষ্ট হয় না। এরপরও কি আপনি নিজেকে মুমিন বলবেন?

হাযেরীন, ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম অনুসরণ করে কেউ মুক্তিলাভ করতে, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে বা আখেরাতে জান্নাত লাভ করতে পারে বলে মনে করা কুফরী। আল্লাহ্ বলেন:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلاَمُ

"ইসলাম আল্লাহর নিকট একমাত্র দীন।"[১]

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الأَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

"কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো দীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনো কবুল করা হবে না এবং সে হবে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।"[২]

হাযেরীন, ইসলামই সর্বপ্রথম সকল ধর্মের অনুসারীদের শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থানের স্বীকৃতি দিয়েছে। ইহূদী-খৃস্টানদের বাইবেলে অন্য ধর্মের অনুসারীদের নির্বিচারে হত্যা করতে, প্রতারণামূলকভাবে দাওয়াত দিয়ে এনে হত্যা করতে ও তাদের উপাসনালয়গুলি ভেঙ্গে ফেলতে। অন্যান্য জাতিদেরকে কুকুর, শূকর ইত্যাদি নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং অকথ্যভাষায় গালি দেওয়া হয়েছে।[৩] হিন্দু ধর্মে অন্য ধর্মের অনুসারীদের যবন, ম্লেচ্ছ ইত্যাদি নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তাদেরকে অস্পৃশ্য বানানো হয়েছে। এমনকি তাদের ছায়া পর্যন্ত মাড়ানো নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

পক্ষান্তরে ইসলামে অন্য সকল ধর্মের অনুসারীদের সাথে ভাল ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাদেরকে বা তাদের উপাস্যদেরকে গালি দিতে নিষেধ করা হয়েছে। তাদের সাথে সম্মানজনক ভাষায় কথা বলতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাদের সকল সামাজিক ও নাগরিক অধিকার আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সকল যুগে মুসলিম দেশগুলিতে অমুসলিম নাগরিগণ সর্বোচ্চ অধিকার ও শান্তির সাথে বসবাস করেছেন। মধ্যযুগে এবং আধুনিক যুগে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত ইউরোপে খৃস্টান রাষ্ট্রগুলিতে ইহূদীদের উপর সর্বদা জুলুম করা হয়েছে। আইন করে তাদের সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। ইউরোপে একমাত্র মুসলিম স্পেনে এবং মুসলিম তুরস্কে ইহূদীরা পরিপূর্ণ নাগরিক অধিকার সহ বাস করেছেন। জুইশ এনসাইক্লোপিডীয়া ও অন্যান্য সকল বিশ্বকোষ ও ইতিহাসগ্রন্থে এ সকল তথ্য রয়েছে।

হাযেরীন, কিন্তু অবস্থানের স্বীকৃতি এক বিষয় আর ধর্ম বিশ্বাসকে সঠিক বলে মেনে নেওয়া অন্য বিষয়। ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্মবিশ্বাস অনুসরণ করে মুক্তি পাওয়া যাবে বা সকল ধর্মই ঠিক বলে বিশ্বাস করার অর্থই কুফরীকে সঠিক বলে বিশ্বাস করা ও কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াতকে অস্বীকার করা।

---

[১] সূরা (৩) আল-ইমরান: ১৯ আয়াত।

[২] সূলা (৩) আল-ইমরান: ৮৫ আয়াত।

[৩] বাইবেল, গীতসংহিতা ১৪৯/৬-৯, দ্বিতীয় বিবরণ ২০/১৩-১৬; যাত্রা পুস্তক ২২/২০, ২৩/২৩-২৪, ৩৪/১২-১৪, ১ শমূয়েল ২৭/৮-৯, ২ শমূয়েল ১২/২৯-৩১, ১ রাজাবলি ১৪/৮, ১৮/৪০, ২ রাজাবলি ১০/১৮-২৮, মথি ৭/৬, ১৫/২২-২৬।

হাযেরীন, কুফরের একটি প্রকার হলো কুফরুন নিফাক বা মুনাফিকীর কুফরী। আরবীতে 'নিফাক' শব্দের অর্থ কপটতা (hypocrisy)। শব্দটির মূল অর্থ খরচ করা, চালু করা, গোপন করা, অস্পষ্ট করা ইত্যাদি।[১] নিফাকে লিপ্ত মানুষকে 'মুনাফিক' বলা হয়। ইসলামী পরিভাষায় নিফাক দুই প্রকারঃ (১) বিশ্বাসের নিফাক ও (২) কর্মের নিফাক। অন্তরের মধ্যে অবিশ্বাস গোপন রেখে মুখে বিশ্বাসের প্রকাশকে বিশ্বাসের নিফাক বা নিফাক ই'তিকাদী বলা হয়। এরূপ নিফাক কুফরেরই একটি প্রকার; কারণ এরূপ নিফাকে লিপ্ত ব্যক্তির অন্তরে অন্যান্য কাফিরের মতই অবিশ্বাস বিদ্যমান, যদিও সে জাগতিক স্বার্থে মুখে ঈমানের দাবি করে। অথবা প্রথমে দেখাদেখি ঈমান এনেছে, কিন্তু পরে অন্তরে দ্বিধা ও অবিশ্বাস ঢুকেছে, কিন্তু জাগতিক স্বার্থে নিজেকে মুমিন বলে দাবি করে। এদের বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেনঃ

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ

"তা এ জন্য যে, তারা ঈমান আনার পর কুফরী করেছে, ফলে তাদের হৃদয়ে মোহর করে দেওয়া হয়েছে, পরিণামে তারা বোধশক্তি হরিয়ে ফেলেছে।"[২]

হাযেরীন, দ্বিতীয় পর্যায়ের নিফাক হলো, কর্মের নিফাক। অর্থাৎ এরূপ কর্ম শুধু মুনাফিকরাই করে বা তাদের জন্যই শোভা পায়। এরূপ কর্মের বর্ণনায় এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ

أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ

"চারটি বিষয় যার মধ্যে বিদ্যমান থাকবে সে নির্ভেজাল মুনাফিক। আর যার মধ্যে এগুলির মধ্য থেকে কোনো একটি স্বভাব বিদ্যমান থাকবে তার মধ্যে নিফাক বা কপটতার একটি দিক বিদ্যমান থাকবে, যতক্ষণ না সে তা পরিত্যাগ করেঃ (১) যখন তার কাছে কিছু আমানত রাখা হয় সে তা খিয়ানত করে, (২) যখন সে কথা বলে তখন মিথ্যা বলে, (৩) যখন সে চুক্তি বা প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হয় তখন তা ভঙ্গ করে এবং (৪) যখন সে ঝগড়া করে তখন সে অশ্লীল কথা বলে।"[৩]

হাযেরীন, কুফরের অন্যতম দিক হলো শিরক, অর্থাৎ কাউকে কোনো বিষয়ে আল্লাহর সমকক্ষ বা শরীক সাব্যস্ত করে আল্লাহর রুবুবিয়্যাতের বা ইবাদতের একত্ব অস্বীকার বা অবিশ্বাস করা। হাযেরীন কুরআন ও হাদীসে বারংবার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে যে, কুফর ও শিরক হলো সবচেয়ে ভয়ঙ্কর পাপ। অন্যান্য ভয়ঙ্কর মহাপাপের সাথে কুফর-শিরকের মহাপাপের চারটি পার্থক্য রয়েছেঃ

প্রথমত, কুফর-শিরক হলো ভয়ঙ্করতম মহাপাপ। কুরআন-হাদীসে বিষয়টি বারংবার বলা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, অন্য সকল পাপ আল্লাহ তাওবার কারণে, অথবা তাওবা ছাড়াই নেক আমলের বরকতে বা বিশেষ দয়া করে ক্ষমা করতে পারেন, কিন্তু শিরকের পাপ তিনি কখনোই ক্ষমা করেন না। কুফর-শিরক পরিত্যাগ করে বিশুদ্ধ ঈমান গ্রহণ ছাড়া এর ক্ষমা নেই। মহান আল্লাহ বলেনঃ

إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا

---

[১] ইবনু ফারিস, মু'জামু মাকাঈসিল লুগাহ ৫/৪৫৪-৪৫৫।

[২] সূরা (৬৩) মুনাফিকূনঃ ৩ আয়াত।

[৩] বুখারী, আস-সহীহ ১/২১, ৩/১১৬০; মুসলিম, আস-সহীহ ১/৭৮।

"আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। তা ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। এবং যে কেউ আল্লার সাথে শরীক করে সে এক মহাপাপ করে।"[১]

তৃতীয়ত, শিরক-কুফরের কারণে মানুষের সকল নেক-আমল বিনষ্ট হয়ে যায়। আল্লাহ বলেন:

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

"তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই ওহী করা হয়েছে যে, 'তুমি আল্লাহর শরীক স্থির করলে তোমার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং তুমি হবে ক্ষতিগ্রস্ত'।"[২] আল্লাহ আরো বলেন:

وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

"কেউ ঈমানের সাথে কুফরী করলে তার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"[৩]

চতুর্থত অন্য সকল মহাপাপে লিপ্ত ব্যক্তি বিনা তাওবায় মারা গেলেও তার জান্নাতে যাওয়ার আশা থাকে। জাহান্নামে শাস্তি ভোগের পরে, অথবা আল্লাহর বিশেষ করুণায় বা কারো শাফাআতে ক্ষমালাভের মাধ্যমে শাস্তি ছাড়াই সে ব্যক্তির জান্নাতে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু কুফর-শিরকে লিপ্ত ব্যক্তির জন্য এরূপ কোনো আশা নেই। কেউ তার জন্য সুপারিশও করবেন না। আল্লাহ বলেন:

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

"কেউ আল্লাহর শরীক করলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত নিষিদ্ধ করবেন ও তার আবাস জাহান্নাম; জালিমদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই।"[৪]

আবূ যার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, মহান আল্লাহ বলেছেন:

مَنْ لَقِيَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطِيئَةً لا يُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَقِيتُهُ بِمِثْلِهَا مَغْفِرَةً

"যে ব্যক্তি আমার সাথে কোনো কিছুকে শরীক না করে পৃথিবী পরিমাণ পাপ-সহ আমার সাথে সাক্ষাত করবে আমি সমপরিমাণ ক্ষমা-সহ তার সাথে সাক্ষাত করব।"[৫]

হাযেরীন, কোনো কর্মকে কুফ্র, শিরক, বা নিফাক বলা আর কোনো ব্যক্তিকে কাফির, মুশরিক বা মুনাফিক বলা কখনোই এক বিষয় নয়। যে ব্যক্তি নিজেকে মুমিন বা মুসলিম বলে দাবি করছেন তাকে কাফির বলা ভয়ঙ্কর বিষয়। কারণ, ঈমানের দাবিদারকে কাফির বলার বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উম্মাতকে সতর্ক করেছেন। ইবনু উমার (রা), আবূ হুরাইরা (রা), আবূ যার (রা), আবূ সাঈদ (রা) সহ ৮/১০ জন সাহাবী থেকে বিভিন্ন সনদে বর্ণিত প্রায় মুতাওয়াতির পর্যায়ের হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

إِذَا كَفَّرَ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا (إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَإِلا رَجَعَتْ عَلَيْهِ)

"যদি কোনো ব্যক্তি তার ভাইকে কাফির বলে, তবে এ কথা দু জনের একজনরে উপর প্রযোজ্য হবে। যদি তার ভাই সত্যিই কাফির না হয় তবে যে তাকে কাফির বলল তার উপরেই কুফরী প্রযোজ্য হবে।"[৬]

হাযেরীন, কোনো মুসলিমকে কাফির অথবা কাফিরের চেয়েও খারাপ ইত্যাদি বলার ব্যাপারে

---

[১] সূরা (৪) নিসা: ৪৮ আয়াত।
[২] সূরা (৩৯) যুমার: ৬৫ আয়াত।
[৩] সূরা (৫) মায়িদা: ৫ আয়াত।
[৪] সূরা (৫) মায়িদা: ৭২ আয়াত।
[৫] মুসলিম, আস-সহীহ ৪/২০৬৮।
[৬] বুখারী, আস-সহীহ ৫/২২৬৩-২২৬৪; মুসলিম, আস-সহীহ ১/৭৯। বিস্তারিত দেখুন: কুরআন সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা ৫১৭-৫২২।

আমাদের খুবই সতর্ক হতে হবে। আমরা অনেক সময় ব্যাখ্যা করে কাফির বলি। যেমন বলি, অমুক ব্যক্তি অমুক কাজ করেছে বা অমুক কথা বলেছে বা অমুক মতাদর্শে বিশ্বাস করেছে কাজেই সে কাফির; কারণ উক্ত কথা দ্বারা মূলত অমুক অর্থ বুঝা যায় যা কুফরী বলে গণ্য...। হাযেরীন, ব্যাখ্যা করে কাফির নয়, ব্যাখ্যা করে মুসলিম বলতে উদগ্রীব হতে হবে। যথাসম্ভব চেষ্টা করতে হবে মুসলিম বলে দাবিদার ব্যক্তির কথা বা মতের একটি ওজর বা ব্যাখ্যা করে তাকে মুসলিম বলে গ্রহণ করা। মুমিনের দায়িত্ব হলো, মুমিন নিজের ঈমানের বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক থাকবেন। সকল কুফর, শিরক, পাপ ও ইসলাম বিরোধী চিন্তাচেতনা থেকে সতর্কতার সাথে আত্মরক্ষা করবেন। কিন্তু অন্যের ঈমানের দাবি গ্রহণ করার বিষয়ে বাহ্যিক দাবির উপর নির্ভর করবেন। কোনো ঈমানের দাবিদারকেই কাফির না বলার জন্য সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করবেন। ভুল করে কোনো মু'মিনকে কাফির বলে মনে করার চেয়ে ভুল করে কোনো কাফির-মুশরিককে মুসলিম মনে করা অনেক অনেক ভাল ও নিরাপদ। প্রথম ক্ষেত্রে কঠিন পাপ ও নিজের ঈমান নষ্ট হওয়ার ভয় রয়েছে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কোনোরূপ পাপ বা ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

হাযেরীন, ঈমান ও কুফর মূলত বিশ্বাস ও অন্তরের বিষয়, যা কথা, সাক্ষ্য বা স্বীকারোক্তির মাধ্যমে জানা যায়। কর্ম ঈমান বা কুফরের আলামত। এজন্য শুধু বাহ্যিক কর্ম দেখে কাউকে কাফির বা মুমিন বলা যায় না, বরং তার কর্মের পিছনের বিশ্বাস সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে। একটি উদাহরণ আমরা আলোচনা করতে পারি। কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব বা আল্লাহর নির্দেশের ব্যতিক্রম চলা, চলানো, বিধান দেওয়া বা বিচার করা থেকে মুমিন সর্বতোভাবে আত্মরক্ষা করবেন। কিন্তু কোনো মুসলিম যদি এরূপ কিছু করেন তবে তাকে কাফির বলবেন না। বরং তার জন্য একটি ওজর চিন্তা করবেন। হয়ত না জেনে, জাগতিক স্বার্থে বা অন্য কোনো কারণে সে এরূপ করছে, সে পাপ করছে, তবে কুফরী করছে না। বিশেষ প্রয়োজন হলে তাকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন। তিনি হয়ত বলবেন: আমি উক্ত ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর কুফরীকে ঘৃণা করি, অথবা আল্লাহর বিধানের বিপরীত চলা, চলানো বা বিধান দেওয়া হারাম বলেই আমি জানি, তবে অমুক কারণে আমি এরূপ করেছি। এরূপ বললে তার কথা মেনে নিতে হবে এবং তাকে পাপে লিপ্ত মুসলিম বলে গণ্য করতে হবে। অথবা তিনি হয়ত বলতে পারেন, উক্ত ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে আমি ভাল মনে করি, অথবা সকল ধর্মই ঠিক, আমার ধর্ম আমি পালন করি, তার ধর্মের বা বিশ্বাসের প্রতি আমার কোনো আপত্তি নেই, অথবা ইসলামের অমুক বা তমুক বিধান বর্তমান যুগে পালনীয় নয়, এজন্যই আমি এরূপ করেছি। এরূপ বললে তিনি কুফরীতে লিপ্ত বলে গণ্য হবেন। তবে এক্ষেত্রে তাকে কাফির বলার আগে এরূপ বিশ্বাস যে কুফরী তা কুরআন ও হাদীসের আলোকে মহব্বতের সাথে তাকে বুঝাতে হবে।

হাযেরীন, অনেক সময় আমরা আধুনিক রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক মতাদর্শের কারণে মুসলিমকে কাফির বলে ফেলি। এ বিষয়েও অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে। উক্ত রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক মতাদর্শের মধ্যে হয়ত কুফরী থাকতে পারে। কিন্তু ঈমানের দাবিদার মুসলিম ব্যক্তি জেনেশুনে উক্ত কুফরীতে বিশ্বাস করছেন না বলেই আমাদের মনে করতে হবে। তার জন্য ওজর চিন্তা করতে হবে। প্রয়োজনে তার কাছে ব্যাখ্যা চাওয়া যেতে পারে। তিনি তার কর্মের ব্যাখ্যা যা দিবেন সেটিই চূড়ান্ত বলে ধরতে হবে। ব্যাখ্যা করে কাফির বা মুশরিক বলার প্রবণতা ভয়ঙ্কর। কুরআন-সুন্নাহের আলোকে ব্যক্তির কর্মকে 'পাপ', 'কুফর' বা শিরক বলা সহজ বিষয়, কিন্তু ব্যক্তিকে কাফির বলার মত ভয়ঙ্কর ঝুকি মুমিন সর্বদা পরিহার করবেন।

আল্লাহ আমাদের ঈমানকে সকল কুফর, শিরক ও নিফাক থেকে মুক্ত রাখুন। আমীন।

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

أَمَّا بَعْدُ، فَيَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلامُ.

وَقَالَ: وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الأخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ.

وَقَالَ: وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَفَّرَ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا. إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَإِلا رَجَعَتْ عَلَيْهِ

بَارَكَ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ فِيْ الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ. وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ. أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ، فَاسْتَغْفِرُوْهُ وَتُوْبُوْا إِلَيْهِ، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.

রবিউল আউআল মাসের ৩য় খুতবা: শিরকের পরিচয় ও কারণ

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লী আলা রাসূলিহীল কারীম। আম্মা বাদ,

সম্মানিত উপস্থিতি, আজ সফর মাসের ৩য় জুমুআ। আজকের খুতবায় আমরা শিরক বিষয়ে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ। কিন্তু তার আগে আমরা এ সপ্তাহের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসগুলির বিষয়ে সংক্ষেপ আলোকপাত করি।

হাযেরীন, আজ ইংরেজী ..... মাসের ..... তারিখ। এ সপ্তাহের দিবসগুলির মধ্যে রয়েছে ..... ।

....

সম্মানিত মুসল্লীবৃন্দ, বিগত খুতবায় আমরা কুফর সম্পর্কে আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি যে, কুফরের একটি প্রকার হলো শিরক। আজ আমরা শিরক বিষয়ে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ।

শির্ক অর্থ অংশীদার হওয়া, অংশীদার করা বা সহযোগী বানানো। কুরআনের ভাষায় শিরক হলো কাউকে আল্লাহর সমতূল্য, সমকক্ষ বা তুলনীয় বলে মনে করা। মহান আল্লাহ বলেন:

فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

অতএব তোমরা জেনেশুনে কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ বানাবে না।"[১]

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) বলেন,

سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيُّ الذَّنْبِ عِنْدَ اللَّهِ أَكْبَرُ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ

"আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করলাম, আল্লাহর নিকট সবচেয়ে কঠিন পাপ কী? তিনি বলেন: সবচেয়ে কঠিন পাপ এই যে, তুমি আল্লাহর সমকক্ষ বানাবে অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।"[২]

হাযেরীন, আল্লাহর কোনো ক্ষমতায়, গুণে বা ইবাদতে অন্য কাউকে অংশীদার করাই শিরক। বিশ্ব সৃষ্টি, পরিচালনা, জীবনদান, মৃত্যুদান, বৃষ্টিদান, অলৌকিক সাহায্য, কল্যাণ, অকল্যাণ ইত্যাদি সকল ক্ষমতা আল্লাহর। অন্য কারো এরূপ কোনো ক্ষমতা বা অধিকার আছে বলে বিশ্বাস করা শিরক। অনুরূপভাবে আল্লাহর মহান গুণাবলীর মধ্যে রয়েছে তিনি সর্বশক্তিমান, সর্বদ্রষ্টা, সর্বশ্রোতা, অদৃশ্য জ্ঞানের মালিক। অন্য কারো এরূপ গুণ আছে বলে মনে করা শিরক। অনুরূপভাবে সাজদা, দোয়া, মানত, জবাই, তাওয়াক্কুল, ভরসা, নির্ভরতা, অলৌকিক ভয়, আশা ইত্যাদি সকল ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্য। অন্য কারো জন্য এগুলি করা অর্থ এগুলিতে তাকে আল্লাহর অংশীদার বানানো।

হাযেরীন, এখানে আমাদের মনে হতে পারে, আমরা তো মুসলিম, আমাদের তো শির্ক এর কোনো ভয় নেই। বেঈমানগণ শিরক বা কুফ্রীতে লিপ্ত। মুমিন তো শির্ক থেকে মুক্ত। কিন্তু কুরআন কারীমে বলা হয়েছে যে, অধিকাংশ ঈমানদারই শিরক-এর মধ্যে লিপ্ত। আল্লাহ বলেন:

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلاَّ وَهُمْ مُشْرِكُونَ

"অধিকাংশ মানুষ আল্লাহর উপর ঈমান আনয়ন করে এবং সেই অবস্থায় তারা শির্কে লিপ্ত থাকে।"[৩]

হাযেরীন, কুফরীর অন্যতম প্রকাশ শিরক। সাধারণত যুগে যুগে কাফিরগণ আল্লাহর অস্তিত্ব, তাঁর

---

[১] সূরা (২) বাকারা: ২২ আয়াত।

[২] বুখারী, আস-সহীহ ৪/১৬২৬, ৫/২২৩৬, ৬/২৪৯৭, ২৭৩৯; মুসলিম, আস-সহীহ ১/৯০-৯১।

[৩] সূরা ইউসূফ ১০৬ আয়াত।

গুণাবলি, রুবূবিয়্যাত বা প্রতিপলকত্ব, মা'বুদিয়্যাত বা উপাস্যত্ব অস্বীকার করে কুফরী করে নি, বরং এগুলিতে তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক করেই কুফরী করেছে। ইহূদী, খৃস্টান আরবের কাফিরগণ ও অন্যান্য অনেক জাতি নবী, রাসূল ও আসমানী কিতাব পাওয়ার পরেও আল্লাহর উপর ঈমান থাকা সত্ত্বেও শিরক করেছে। আমরা দেখেছি যে, মক্কার কাফিররা এবং কুরআনে বর্ণিত অন্যান্য কাফির জাতি আল্লাহকে একমাত্র স্রষ্টা ও সর্বশক্তিমান প্রতিপালক হিসাবে বিশ্বাস করা সত্ত্বেও শিরক-এ লিপ্ত হতো এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর ইবাদত করতো। এজন্য শিরক-এর কারণ এবং প্রকার ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করা আমাদের জন্য অতীব জরুরী, যেন আমরা শিরক থেকে আত্মরক্ষা করতে পারি।

প্রিয় হাযেরীন, ইহূদী, খৃস্টান ও মুশরিকগণ ফিরিশতাগণ, বিভিন্ন নবী এবং সত্যিকার ওলী বা কাল্পনিক ওলীদের ভক্তির নামে ইবাদত করত। এদের ইবাদতের পিছনে তাদের দুটি যুক্তি ছিল। প্রথমত এরা আল্লাহর প্রিয়, কাজেই এদের ডাকলে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায়। দ্বিতীয়ত: এরা আল্লাহর কাছে সুপারিশ করে বিপদ কাটিয়েদেন প্রয়োজন মেটান। এজন্য তারা এদের মূর্তি বানিয়ে, বা এদের কবরের কাছে বা এদের স্মৃতি বিজড়িত স্থান, গাছ, পাথর ইত্যাদির কাছে এসে এদের কাছে প্রার্থনা করত, এদের নামে মানত করত, এদের নামে পশু জবাই করত, এদের নামে ফসল উৎসর্গ করত, এদেরকে সাজদা করত। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ বলেছেন:

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ

"আর যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য আউলিয়া (অভিভাবক বা বন্ধু) গ্রহন করেছে তারা বলে, আমরা তো এদের শুধু এজন্যই ইবাদাত করি যে এরা আমাদেরকে আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌছে দেবে। তারা যে বিষয়ে মতবিরোধে লিপ্ত রয়েছে আল্লাহ তার ফয়সালা করে দেবেন। যে মিথ্যাবাদী কাফির আল্লাহ তাকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।"[১] অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন:

এভাবে আমরা দেখছি যে, আল্লাহর অবাধ্যতার উদ্দেশ্যে নয়, বরং আল্লাহর নৈকট্য, সন্তুষ্টি ও দয়া লাভের আশাতেই তারা আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য উপাস্যের ইবাদত করত। অন্যত্র আল্লাহ বলেন:

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلا فِي الأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

"তারা আল্লাহ্ ব্যতীত যাদের ইবাদত করে তারা তাদের কোনো ক্ষতিও করতে পারে না উপকারও করতে পারে না। তারা বলে এরা আল্লাহর কাছে আমাদের সুপারিশকারী (শাফায়াতকারী)। বল, তোমরা কি আল্লাহকে এমন কিছু জানাচ্ছ যা তিনি জানেন না আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর মধ্যে? সুবহানাল্লাহ! তিনি সুমহান, সুপবিত্র এবং তোমাদের শিরক থেকে তিনি উর্ধ্বে।"[২]

হাযেরীন, এখানেও আমরা দেখছি যে, আল্লাহর অবাধ্যতার উদ্দেশ্যে নয়, এদের সুপারিশ-এর মাধ্যমে আল্লাহর রহমত লাভের উদ্দেশ্যে তারা এসকল উপাস্যের ইবাদত করত। তারা স্বীকার করত যে, সকল ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর। তারপরও তারা মনে করত যে, আল্লাহর এ সকল মাহবূব বান্দাকে

---

[১] সূরা (৩৯) যুমার:৩ আয়াত।
[২] সূরা (১০) ইউনুস: ১৮ আয়াত।

আল্লাহ কিছু ক্ষমতা দিয়েছেন। এদের বন্দনা না করে সরাসরি আল্লাহর বন্দনা করলে বা এদের ভক্তি-পূজা করা যাবে না বললে এরা বদদোয়া করে ধ্বংস করে দেবেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন:

أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ

"আল্লাহ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন? অথচ তারা তোমাকে আল্লাহর পরিবর্তে যারা তাদের ভয় দেখায়। আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন তার জন্য কোনো পথ-প্রদর্শক নেই। এবং আল্লাহ যাকে হিদায়াত করেন তার জন্য কোনো পথভ্রষ্টকারী নেই। আল্লাহ কি পরাক্রমশালী, দণ্ডবিধায়ক নন? তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন? তারা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ।' তুমি বল, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, আল্লাহ আমার অনিষ্ট চাইলে তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তারা কি সে অনিষ্ট দূর করতে পারবে? অথবা তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করতে চাইলে তারা কি সে অনুগ্রহ রোধ করতে পারবে? বল, 'আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।' নির্ভরকারিগণ আল্লাহর উপরেই নির্ভর করে।"[১]

এখানে আমরা দেখছি যে, কাফিররা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ভয় দেখাচ্ছে যে, তিনি যদি তাদের মা'বূদদের -জিবরাঈল, ইসরাফীল, ইবরাহীম, ইসমাঈল, মূসা, ঈসা, ওয়াদ্দ, ইয়াগূস, লাত, মানাত ইত্যাদি উপাস্যদের- বাদ দিয়ে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করার কথা বলেন তবে এরা তাঁর ক্ষতি করবে। আবার তারা একথাও স্বীকার করছে যে, চূড়ান্ত ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহরই, আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে কিছু করার ক্ষমতা এদের নেই। তারা ভাবত যে, আল্লাহর ইচ্ছাই চূড়ান্ত, তবে আল্লাহ ইচ্ছা করে এবং দয়া করে এদেরকে যে ক্ষমতা দিয়ে রেখেছেন তাতে তিনি সাধারণত বাধা দেন না।

এদের বিভ্রান্তির দুটি কারণ কুরআন থেকে জানা যায়। প্রথমত শয়তানের প্রতারণা। আল্লাহ বলেন:

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ

"যেদিন তিনি এদেরকে সকলকে একত্রিত করবেন এবং ফিরিশতাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন, 'এরা কি তোমাদেরকেই ইবাদত করত?' ফিরিশতারা বলবে, 'তুমি পবিত্র, মহান! আমাদের সম্পর্ক তোমারই সাথে, তাদের সাথে নয়। তারা তো ইবাদত করত জিন্নদের এবং এদের অধিকাংশই ছিল তাদের প্রতি বিশ্বাসী।"[২]

কুরআনে এ অর্থে আরো আয়াত রয়েছে। এ সকল আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, জিন্ন শয়তানগণ এ সকল উপাস্যের বেশ ধরে এদের নিকট প্রকাশিত হতো, এদেরকে স্বপ্ন, কাশফ, অলৌকিক দর্শন ইত্যাদির মাধ্যমে অনুপ্রাণিত করত, বিভিন্ন অলৌকিক কার্য করিয়ে দিত। এভাবে এ সকল মুশরিক মনে করত যে, তারা ফিরিশতাদেরই ইবাদত করছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা শয়তানের ইবাদত করত।

হাযেরীন, শিরকের আরেকটি কারণ ছিল বিভ্রান্ত ধর্মগুরুদের অন্ধ অনুকরণ। আল্লাহ বলেন:

---

[১] সূরা (৩৯) যুমার: ৩৬-৩৮ আয়াত।

[২] সূরা (৩৪) সাবা: ৪০-৪১ আয়াত।

• قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ

"বল, হে কিতাবীগণ, তোমরা তোমাদের দীনের বিষয়ে বাড়াবাড়ি করো না এবং যে সম্প্রদায় ইতোপূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছে ও অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে এবং সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে তাদের মনগড়া মত ও খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না।"[১]

এ সকল পথভ্রষ্ট মানুষদের মনগড়া মতের মূল বৈশিষ্ট্য ছিল দুটি: প্রথমত আল্লাহর কালামের অপব্যাখ্যা করা এবং দ্বিতীয়ত, বানোয়াট মিথ্যা কথার মাধ্যমে নিজেদের মত প্রতিষ্ঠা করা। এদের অন্যতম উদাহরণ প্রচলিত ত্রিত্ববাদী খৃস্টধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ইহূদী পৌল। তিনি ঈসা (আ)-এর মর্যাদা বৃদ্ধি ও ভক্তির নামে তাওরাত, যাবূর ও ইঞ্জিলের বক্তব্যের অপব্যাখ্যা করে এবং ইঞ্জিলের নামে জাল ও মিথ্যা কথা বলে খৃস্টধর্ম বিকৃত করেন। তিনি নিজে সগৌরবে স্বীকার করেছেন যে, তিনি মিথ্যা বলেন। তিনি বলেনঃ "For if the truth of God hath more abounded through my lie unto his glory; why yet am I also judged as a sinner? কিন্তু আমার মিথ্যায় যদি ঈশ্বরের সত্য তাঁহার গৌরবার্থে উপচিয়া পড়ে, তবে আমিও বা এখন পাপী বলিয়া আর বিচারিত হইতেছি কেন?"[২]।

হাযেরীন, মুসলিম উম্মাহর মধ্যে শিরক প্রচারের ক্ষেত্রেও ইহূদী ষড়যন্ত্র ছিল মূল। আব্দুল্লাহ ইবনু সাবা নামক ইহূদী নিজেকে মুসলিম দাবি করে মক্কা-মদীনা থেকে দূববর্তী ইরাক, মিসর ইত্যাদি এলাকায় নও মুসলিমদের মধ্যে নবী-বংশের ভালবাসা, ভক্তি ও মর্যাদার নামে শিরকী বিশ্বাস প্রচার করতে থাকে। মুসলিম উম্মাহর সকল শিরক-এর উৎস আব্দুল্লাহ ইবনু সাবা এবং তার প্রচারিত শীয়া মতবাদ। দ্বাদশ ইমাম পন্থী শীয়া এবং বিশেষ করে বাতিনী শীয়া. কারামিতা, নুসাইরিয়্যাহ, দুরুয ইত্যাদি সম্প্রদায় অগণিত শিরক-কুফর মুসলিম সমাজে ছাড়িয়েছে। বিশেষত ইসলামের প্রথম তিন শতাব্দী গত হওয়ার পরে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে এ সকল বিভ্রান্ত দল রাষ্টীয় ক্ষমতা দখল করতে সক্ষম হয়। বাগদাদে মূল কেন্দ্রে বনূ বুওয়াইহিয়া শীয়াগণ ক্ষমতা দখল করে। কারামাতিয়্যা, বাতিনীয়া, হাশাশিয়া, ফাতিমীয়া বিভিন্ন শীয়া সম্প্রদায় মিসর, তিউনিসিয়া, মরক্কো, ইয়ামান, কূফা, বসরা, নজদ, খুরাসান, ভারত, বাংলা ইত্যাদি অঞ্চলে রাষ্ট ক্ষমতা দখল করে তাদের প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। এরা সাধারণ সরলপ্রাণ 'সুন্নী' মুসলিম, সূফী, দরবেশ ও ইলম-হীন নেককার মানুষদের মধ্যেও এদের শিরক প্রসার করতে সক্ষম হয়। মুসলিম উম্মাহর সকল শিরকের উৎস মূলত এখানেই।

পৌলের মত এরাও ব্যাখ্যা ও মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে। কুরআন ও হাদীসের অপব্যাখ্যা এবং তার পাশাপাশি অগণিত মিথ্যা গল্প-কাহিনী রটনা করে এরা সমাজে শিরক ছড়িয়ে দেয়।

হাযেরীন, এভাবে আমরা দেখেছি যে, বিভিন্ন তাওহীদ-পন্থী উম্মাত ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে শিরকে লিপ্ত হয়েছে। কুরআন ও হাদীসের বর্ণনা থেকে আমরা দেখতে পাই যে, কিছু সঠিক বিশ্বাসের বিকৃতির মাধ্যমেই শিরকের উৎপত্তি। আমরা এখানে বিশেষ করে দুটি বিষয় উল্লেখ করতে পারি।

প্রথমত, মুজিজা ও কারামতের বিষয়। নবীগণের মু'জিজা, ওলীদের কারামত এবং তাদের দোয়া কবুল হওয়ার বিষয় সকল ধর্মে স্বীকৃত ও প্রসিদ্ধ। মুজিজা-কারামতকে নবী বা ওলীদের ক্ষমতা ও

---

[১] সূরা (৫) মায়িদাঃ ৭৭ আয়াত।
[২] রোমান ৩/৭।

অধিকার ভেবে তারা শিরক করেছে। খৃস্টানগণ দাবি করেছে, ঈসা (আ) মৃতকে জীবিত করতেন, আর মৃতকে জীবিত তো আল্লাহ ছাড়া কেউ করতে পারেন না, কাজেই এতে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর ক্ষমতা ভাণ্ডার বা কিছু ক্ষমতা ঈসা (আ)-কে দিয়েছেন। এখন আমরা তার কাছেই সাহায্য, দয়া, হায়াত, সম্পদ ইত্যাদি চাইব। সরাসরি আল্লাহর কাছে চাইলে আল্লাহও বিরক্ত হবেন এবং ঈসা (আ)-এর সাথেও বেয়াদবী হবে। অন্য সকল মুশরিক সম্প্রদায়ও এরূপ দাবি করত।

দ্বিতীয়ত, দোয়া, শাফা'আত ও দায়িত্বের বিষয়। ফিরিশতা, নবী ও ওলীরা শাফায়াত করবেন বলে আসমানী ধর্মগুলিতে বলা হয়েছে। দোয়া ও শাফা'আতকে তাদের ক্ষমতা ভেবে তারা শিরক করেছে। এছাড়া আল্লাহ ফিরিশতাগণকে বিভিন্ন দায়িত্ব প্রদান করেছেন, যেমন মৃত্যুর ফিরিশতা, বৃষ্টির ফিরিশতা ইত্যাদি। এদের কোনো ক্ষমতা নেই। একান্তই আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে এরা দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু মুশরিকগণ এদের দায়িত্বকে ক্ষমতা মনে করে এদের কাছে প্রার্থনা করে শিরক করেছে।

কুরআন কারীমে বিভিন্নভাবে এ সকল বিভ্রান্তি অপনোদন করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বারংবার বলেছেন যে, মুজিযা-কারামত বা অলৌকিক কর্ম কোনো নবী-ওলীর ক্ষমতা নয়। একান্তই আল্লাহর ক্ষমতা ও অধিকার। আল্লাহর ইচ্ছা ও অনুমতিতেই শুধু নবীগণ মুজিযা দেখাতে পারেন। আল্লাহ বলেন:

وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ

"কোনো রাসূলের জন্য সম্ভব ছিল না যে, তিনি কোনো মুজিজা বা অলৌকিক বিষয় নিয়ে আসবেন আল্লাহর অনুমতি ছাড়া।"[১] কুরআন কারীমের অনেক স্থানে বিষয়টি বলা হয়েছে।

শাফাআত, দুআ ও দায়িত্বের বিষয়ে আল্লাহ তা'লা কুরআন কারীমে বারংবার জানিয়েছেন যে, আল্লাহ কাউকে কোনো ক্ষমতা দেন নি। কল্যাণ-অকল্যাণের ক্ষমতা কারো নেই। মহান আল্লাহ বলেন:

قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

"বল, তোমরা কি আল্লাহ ছাড়া এমন কারো ইবাদত করছ যে তোমাদের জন্য কোনো প্রকারের ক্ষতির মালিক নয় এবং কোনো প্রকার উপকারেরও মালিক নয়? আর আল্লাহ সর্ব-শ্রোতা এবং সর্ব-জ্ঞানী।[২]

আল্লাহ আরো জানিয়েছেন যে, শাফাআতের মালিকানা আল্লাহ। বান্দারা শুধু তাঁর অনুমতিক্রমে তিনি যার উপর সন্তুষ্ট তার জন্য শাফাআত করবেন। এ বিষয়ক কয়েকটি আয়াত শুনুন:

لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلا شَفِيعٌ

"তিনি ব্যতীত তাদের কোনো অভিভাবক নেই এবং কোনো সুপারিশকারী নেই।"[৩]

قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا

"বল, সকল শাফাআত-সুপারিশ আল্লাহরই ইখতিয়ারে, তাঁরই মালিকানা। "[৪]

وَلا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ

"যাকে অনুমতি দেয়া হয় সে ব্যতীত আল্লাহর নিকট কারো সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না।"[১]

---

[১] সূরা গাফির: ৭৮ আয়াত
[২] সূরা মায়েদ: ৭৬ আয়ত
[৩] সূরা (৬) আন'আম: ৫১ আয়াত।
[৪] সূরা (৩৯) যুমার: ৪৪ আয়াত।

وَلا يَشْفَعُونَ إِلا لِمَنِ ارْتَضَى

"তিনি যাদের প্রতি সন্তুষ্ট তাদের ছাড়া আর কারো জন্য তারা সুপারিশ করে না।"[২]

وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى

"আকাশে কত ফিরিশ্‌তা রয়েছে! তাদের কোনো সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না যতক্ষণ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা এবং যার প্রতি সন্তুষ্ট তাকে অনুমতি না দেন।"[৩]

হাযেরীন, বিভিন্ন মিথ্যা গল্প, কাহিনী, ব্যাখ্যা ইত্যাদির ভিত্তিতে শিরকের যে দর্শন তারা তৈরি করেছিল তার মূল হলো মহান আল্লাহকে মানুষের মত কল্পনা করা। এরা আল্লাহকে দুনিয়ার রাজাবাদশাহর মত কল্পনা করত। পৃথিবীর একজন সাধারণ শাসক প্রসাশকের কাছে সরাসরি যাওয়া যায় না; তাহলে রাজাধিরাজ মহান আল্লাহর কাছে কিভাবে সরাসরি যাওয়া যায়। অবশ্যই আল্লাহর মাহবূব বান্দাদের মাধ্যমে যেতে হবে। তাদের ভক্তি অর্চনা করে খুশি করলেই আল্লাহকে পাওয়া যাবে। তারা দাবি করত, একজন মহারাজ তার প্রিয় দাসদেরকে তার রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় কিছু ছোটখাট দায়িত্ব পালনের জন্য প্রেরণ করেন এবং পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এসকল ছোটখাট বিষয় নিজেদের ইচ্ছামত পরিচালনা করার ক্ষমতা তাদেরকে প্রদান করেন। মহারাজ তার প্রজাগণের খুটিনাটি বিষয় নিজে পরিচালনা করেন না, বরং অধীনস্থ প্রশাসক ও কর্মকর্তাদেরকে এ সকল বিষয় পরিচালনার দায়িত্ব দেন। এ সকল কর্মকর্তার অধীনে যারা কর্ম করেন বা তাদের সাথে সুসম্পর্ক রাখেন তাদের বিষয়ে এ সকল কর্মকর্তার সুপারিশ তিনি গ্রহণ করেন। সকল রাজার মহারাজা রাজাধিরাজ মহান আল্লাহও অনুরূপভাবে তাঁর কিছু নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাকে এরূপ ঐশ্বরিক ক্ষমতা দান করেছেন।

কুরআনে অগণিত স্থানে মুশরিকদের এ সকল বিভ্রান্তির অপনোদন করা হয়েছে। আমরা পরবর্তী খুতবায় কিছু বিষয় আলোচনা করব ইনশা আল্লাহ। সর্বোচ্চ বিভ্রান্তি হলো মহান আল্লাহকে মানুষের মত বলে কল্পনা করা। একজন মানুষ মহারাজা তার সেনাপতি, খাদেম, সামন্ত শাসক বা কর্মকর্তাদের সহযোগিতার মুখাপেক্ষী, তিনি নিজে সবকিছু দেখতে, শুনতে বা জানতে পারেন না। তিনি অনেক সময় নিজের ইচ্ছা না থাকলেও তাদের সুপারিশ গ্রহণ করেন, অথবা মূল বিষয়ে তিনি কিছুই জানেন না, তাই সংশ্লিষ্ট অফিসারের সুপারিশের ভিত্তিতেই তাকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়, সব কিছু নিজে জানা ও বিচার করা তো তার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু আল্লাহ সবকিছু জানেন, শুনেন, দেখেন, তিনি প্রতিটি বান্দার নিকটবর্তী ও প্রিয়জন। মহান আল্লাহকে এরূপ মানুষ মহারাজার সাথে তুলনা করার অর্থ তার রুবূবিয়্যাতের সাথে কুফরী করা ও তাঁর বিষয়ে 'কু-ধারণা' পোষণ করা। আল্লাহ বলেনঃ

فَلا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ

"সুতরাং আল্লাহর জন্য কোনো তুলনা-উদাহরণ স্থাপন করো না। আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না।"[৪]

মহান আল্লাহ আমাদের ঈমানকে সকল প্রকার শিরক ও বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা করুন। আমীন।

---

[১] সূরা (৩৪) সাবা: ২৩ আয়াত।
[২] সূরা (২১) আম্বিয়া: ২৮ আয়াত।
[৩] সূরা (৫৩) নাজম: ২৬ আয়াত।
[৪] সূরা (১৬) নাহল: ৭৪ আয়াত।

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

أَمَّا بَعْدُ، فَيَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ

زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّـــهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الذَّنْبِ عِنْدَ اللَّهِ أَكْبَرُ قَـــالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ

بَارَكَ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ فِيْ الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ. وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ. أَقُــوْلُ قَــوْلِيْ هَـذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُــلِّ ذَنْــبٍ، فَاسْتَغْفِرُوْهُ وَتُوْبُوْا إِلَيْهِ، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.

রবিউল আউয়াল মাসের ৪র্থ খুতবাঃ শিরকের প্রকারভেদ

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লী আলা রাসূলিহীল কারীম। আম্মা বাদ,

সম্মানিত উপস্থিতি, আজ ...... হিজরী সালের রবিউল আউয়াল মাসের ৪র্থ জুমুআ। আজ আমরা শিরকের প্রকারভেদ নিয়ে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ। কিন্তু তার আগে আমরা এ সপ্তাহের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসগুলির বিষয়ে সংক্ষেপ আলোকপাত করি।

হাযেরীন, আজ ইংরেজী ..... মাসের ..... তারিখ। এ সপ্তাহের দিবসগুলির মধ্যে রয়েছে ..... ।

মুহতারাম হাযেরীন, কুরআন ও হাদীসে বর্ণনা থেকে আমরা দেখি যে, মুশরিকগণের শিরকী বিশ্বাস ও কর্মের অন্যতম ছিল আল্লাহর ক্ষমতায় শিরক। মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ জাগতিক উপকরণাদি ছাড়া নিজের ইচ্ছায় অলৌকিকভাবে কারো মঙ্গল-অমঙ্গল করতে পারে, জীবন, মৃত্যু, সচ্ছলতা, অসচ্ছলতা, সুস্থতা, অসুস্থতা, রিয্ক ইত্যাদি বিষয়ে কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করতে পারে বলে বিশ্বাস করা হলো আল্লাহর রুবূবিয়্যাতের শিরক। বিভ্রান্ত খৃস্টানগণ ঈসা (আ)-এর বিষয়ে এরূপ বিশ্বাস পোষণ করে। আরবের মুশরিকগণও তাদের উপাস্যদের বিষয়ে এরূপ বিশ্বাস পোষণ করত। তারা মহান আল্লাহকে একমাত্র সর্বশক্তিমান প্রতিপালক হিসেবে বিশ্বাস করত। তবে তারা মনে করত যে, আল্লাহ তার মাহবূব বান্দাদেরকে দয়া করে কিছ অলৌকিক ক্ষমতা দিয়েছেন। এ ক্ষমতাবলে তারা বিশ্বের পরিচালনায় বা মানুষের ভালমন্দে প্রভাব রাখতে পারেন। মূলত মুজিযা, কারামত, ফিরিশতাগণের দায়িত্ব, দুআ কবুল ইত্যাদিকে তারা তাদের দলিল হিসেবে গ্রহণ করত। এ বিশ্বাসের ভিত্তিতে আরবের মুশরিকগণ হজ্জ-উমরার তালবিয়ায় বলতঃ

لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ إِلا شَرِيكًا هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ

"লাব্বাইকা, আপনার কোনো শরীক নেই, তবে আপনি নিজে যাকে আপনার শরীক বানিয়েছেন সে ছাড়া। এরূপ শরীকও আপনারই মালিকানাধীন। সে ও তার সকল কর্তৃত্ব ও রাজত্ব আপনারই অধীন।"[১]

কুরআনে বিভিন্ন আয়াতে বারংবার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ কাউকে কোনোরূপ অলৌকিক বা ঐশ্বরিক ক্ষমতা, মালিকানা বা অংশীদারিত্ব দেন নি। দুএকটি আয়াত উল্লেখ করছিঃ

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلا فِي الأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ

"বল, 'তোমরা আহ্বান কর তাদেরকে যাদেরকে তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে (ইলাহ) মনে করতে, তারা আকাশ-মণ্ডলী এবং পৃথিবীতে অণুপরিমাণ কিছুর মালিক নয় এবং এতদুভয়ে তাদের কোনো অংশও নেই এবং তাদের কেউ মহান আল্লাহর সহায়কও নয়।"[২]

এ বিষয়টি সকল মুশরিকের সকল উপাস্যের বিষয়েই প্রযোজ্য। মুর্তি, প্রতিমা, তারকা, ফিরিশতাগণ, নবীগণ, ওলীগণ, জিন্নগণ বা অন্য যাদেরই ইবাদত করত মুশরিকগণ সকলের ক্ষেত্রেই একই উত্তর প্রযোজ্য। তাঁরা কেউই আসমানের বা যমিনের সামান্যতম মালিকানা রাখেন না, আসমান-যমিনের কোথাও তাদের কোনো অংশীদারিত্ব নেই এবং মহান আল্লাহ তাদের কারো সহযোগিতার প্রত্যাশী নন, কেউ তাকে কোনোরূপে সহযোগিতা করেন না। আল্লাহ আরো বলেনঃ

---

[১] মুসলিম, আস-সহীহ ২/৮৪৩; তাবারী, তাফসীর ১৩/৭৮-৭৯।

[২] সূরা (৩৪) সাবাঃ ২২ আয়াত।

مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

"আল্লাহ মানুষের প্রতি কোনো অনুগ্রহ অবারিত করলে কেউ তা নিবারণ করতে পারে না এবং তিনি কিছু নিরুদ্ধ করতে চাইলে তা উন্মুক্ত করার মতও কেউ নেই। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"[১]

এ বিষয়ে আরো অনেক আয়াত আমরা পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলিতে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ।

হাযেরীন, শিরকের একটি প্রকার হলো আল্লাহর ইলমে শরীক করা। আল্লাহর রুবূবিয়্যাতের অন্যতম দিক তাঁর অনন্ত-অসীম অতুলনীয় ও সামগ্রিক ইলম বা জ্ঞান। তাঁর অন্যতম সিফাত হলো 'আলিমুল গাইব'। আরবের মুশরিকরা বিশ্বাস করত যে, গণকগণ গাইব জানেন। খৃস্টানগণ বিশ্বাস করত যে, ঈসা (আ) আল্লাহর সকল ইলুম গাইবের জ্ঞান রাখেন। কুরআনে বারংবার এরূপ শিরকের প্রতিবাদ করা হয়েছে। বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, গাইবের জ্ঞানই আল্লাহ ছাড়া কারো নেই। একস্থানে আল্লাহ বলেন:

قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلا اللَّهُ

"বল, আল্লাহ ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে কেউই গাইব বিষয়ের জ্ঞান রাখে না।"[২]

মহান আল্লাহ ওহীর মাধ্যমে গাইবের জ্ঞান তাঁর নবী-রাসূলদের প্রদান করেন। কিন্তু এ জ্ঞান গাইবের সামগ্রিক জ্ঞান নয়। এজন্য কিয়ামতের দিন সকল রাসূল একত্রে বলবেন যে, তাদের কোনো গাইবের ইলম নেই, মহান আল্লাহই একমাত্র আলিমুল গাইব। আল্লাহ বলেন:

يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلامُ الْغُيُوبِ

"যে দিন আল্লাহ রাসূলদেরকে একত্র করবেন এবং বলবেন, তোমারা কী উত্তর পেয়েছিলে? তারা বলবে, আমাদের তো কোনো জ্ঞান নেই, তুমিই তো অদৃশ্য সম্মন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত।"[৩]

কুরআনে বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ তাঁর প্রিয়তম রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-কে নির্দেশ দিয়েছেন মানুষদের জানিয়ে দিতে যে, তাঁর নিকট গাইবী ক্ষমতা বা ইলম নেই। এক আয়াতে আল্লাহ বলেন:

قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلا ضَرًّا إِلا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

"বল, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত আমার নিজের কোনো মঙ্গল বা অমঙ্গল করার ক্ষমতাও আমার নেই। আমি যদি গাইব (গোপন জ্ঞান) জানতাম তাহলে প্রভূত কল্যাণই লাভ করতাম, আর কোনো অমঙ্গল আমাকে স্পর্শ করতে পারতো না। আমি তো কেবলমাত্র ভয়প্রদর্শনকারী এবং সুসংবাদদাতা বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য।"[৪]

হাযেরীন, দুর্ভাগ্যজনকভাবে মুসলিম উম্মাহর মধ্যেও কেউ কেউ নবী-ওলীগণের বিষয়ে এরূপ ক্ষমতা ও ইলম বিষয়ক শিরকে নিপতিত হয়। মূলত শীয়া সম্প্রদায়ের অপপ্রচার, মিথ্যাচার ও অপব্যাখ্যাই এগুলি ছড়িয়েছে। শীয়ারা দাবি করেন যে, তাদের ইমামগণ বিশ্বপরিচালনার গায়েবী ক্ষমতার ও ইলমের অধিকারী। আল্লাহর রুবূবিয়্যাতের ক্ষমতা মূলত তাদের হাতে। আর ইমামদের জন্য এরূপ ক্ষমতা দাবি

[১] সূরা (৩৫) ফাতির: ২ আয়াত।
[২] সূরা (২৭) নামল: ৬৫ আয়াত।
[৩] সূরা (৫) মায়িদা: ১০৯ আয়াত।
[৪] সূরা (৭) আ'রাফ: ১৮৮ আয়াত।

করতে হলে তো রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বাদ দেওয়া যায় না। এজন্য তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিষয়েও এরূপ দাবি করে। আমরা দেখেছি যে, মহান আল্লাহ বারংবার জানিয়েছেন যে, গাইবের জ্ঞান তিনি ছাড়া কেউ জানে না। এর বিপরীতে কুরআন-হাদীসে কোথাও সুস্পষ্টত বলেন নি যে, তিনি গাইবের জ্ঞান রাসূলুল্লাহ ﷺ বা তাঁর বংশের ইমামদেরকে দিয়েছেন। কিন্তু শীয়ারা ইমামগণ ও ওলীগণের নামে অনেক উদ্ভট কল্পকাহিনী বর্ণনা করেছে যেগুলিই মূলত তাদের দলীল। শীয়াদের প্রভাবে সুন্নী সমাজেও এরূপ বিশ্বাস প্রসার লাভ করেছে। মোল্লা আলী কারী বলেন: "জেনে রাখ, নবীগণ (আ) অদৃশ্য বা গাইবী বিষয়াদির বিষয়ে আল্লাহ কখনো কখনো যা জানিয়েছেন তা ছাড়া কিছুই জানতেন না। হানাফী মাযহাবের আলিমগণ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ গাইব জানতেন বলে আকীদা পোষণ করা কুফরী।"[১]

হাযেরীন, মুশরিকদের আরেক প্রকার শিরক গাইরুল্লাহকে ডাকা বা গাইবী সাহায্য চাওয়া। কুরআনে বারংবার আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকতে নিষেধ করা হয়েছে এবং একমাত্র আল্লাহকে ডাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গাইরুল্লাহকে ডাকার অসারতা প্রমাণ করে একস্থানে আল্লাহ বলেন:

قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ
فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْهُ بَلْ إِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلا غُرُورًا

"বল, তোমরা আল্লাহর সাথে শরীক বানিয়ে আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তাদের বিষয়ে ভেবে দেখেছ কি? তারা পৃথিবীতে কিছু সৃষ্টি করে থাকলে তা আমাকে দেখাও, অথবা আকাশমণ্ডলীতে তাদের কোনো অংশ আছে কি? না কি আমি তাদেরকে কোনো কিতাব দিয়েছি (ওহীর জ্ঞান দান করেছি) যার প্রমাণের উপর তারা নির্ভর করে? বস্তুত জালিমরা একে অপরকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে।"[২]

হাযেরীন, কুরআনের যুক্তি সুস্পষ্ট। বিবেক ও যুক্তির দাবি এই যে, যিনি স্রষ্টা তিনিই মাবুদ এবং একমাত্র তাকেই ডাকতে হবে। তারপরও তিনি যদি ওহীর মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে বলে দেন যে, আমার ইবাদতের প্রয়োজন নেই, বা আমার কাছে সরাসরি চেয় না, আমাকে সরাসরি ডেক না, বরং অমুক বা তমুককে ডাক, তবে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকার বৈধতা প্রমাণিত হতো। কিন্তু কখনোই মুশরিকগণ এরূপ কোনো প্রমাণ দেখাতে পারে নি। সকল আসমানী কিতাবহে আল্লাহ বলেছেন যে, একমাত্র আমাকেই ডাকবে এবং আমি ছাড়া কেউই বিপদ দিতে বা কাটাতে পারে না।

উপরের আয়াতে সবশেষে তাদের শিরকের প্রকৃত অবস্থা আল্লাহ জানিয়েছেন। বস্তুত মুশরিকগণ একে অপরকে তাদের মিথ্যা কল্পনা-প্রসূত প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। আল্লাহর অমুক কথার ব্যাখ্যা, অমুক যুক্তি বা অমুক ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, এদের ডাকলে আল্লাহ খুশি হন, এরা তোমাদের ত্রাণ করবে, আখিরাতে মুক্তি দেবে, "অমুক ব্যক্তি বিপদে পড়ে অমুক বাবা, মা বা সেন্টকে ডেকেছিল, অমনি সে তাকে উদ্ধার করে দিয়েছে" ইত্যাদি কাল্পনিক মিথ্যা প্রতিশ্রুতিই তাদের একমাত্র সম্বল।

হাযেরীন, মুসলিম সমাজেও অনেকে অনুরূপ মিথ্যা কাহিনী, জনশ্রুতি ইত্যাদির উপর নির্ভর করে বিপদে আপদে জীবিত বা মৃত পীর-ওলীগণকে ডাকে এবং তাদের কাছে গাইবী সাহায্য চায়। অথচ আল্লাহর কাছে আমরা প্রতিদিন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হচ্ছি যে, তাঁর কাছে ছাড়া আর কারো কাছে সাহায্য চাব না:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

---

[১] মোল্লা আলী কারী: শারহুল ফিকহিল আকবার, পৃ. ২৫৩।

[২] সূরা (৩৫) ফাতির: ৪০ আয়াত।

"আমরা শুধু তোমরই ইবাদত করি, শুধু তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।"[১]

হাযেরীন, আল্লাহর প্রিয় বান্দাদেরকে ভালবাসতে হবে, তাঁদের জন্য দুআ করতে হবে, জীবিতদের সাহচার্য গ্রহণ করতে হবে, দুআ চাওয়া যাবে, মৃতদের যিয়ারত করে তাদেরকে সালাম দিতে হবে এবং দুআ করতে হবে। কিন্তু তাদের কোনো অলৌকিক সাহায্য করার ক্ষমতা আছে, অথবা তারা দূর থেকে ডাকলে শুনতে পান বলে বিশ্বাস করা যেমন শিরক, তেমনি তাদেরকে এভাবে ডাকাও শিরক। অনেক সময় আমরা কারামতের কাহিনী শুনে বিভ্রান্ত হই। অমুক বুজুর্গের একজন খাদেম সমূদ্রে বা জঙ্গলে বিপদে পড়লে তিনি তাকে সাহায্য করেন। এ কথা শুনে আমরা মনে করি অমুক বুজুর্গ বা সকল বুজুর্গ এরূপ ক্ষমতা রাখেন। হাযেরীন, এ সকল গল্প অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভিত্তিহীন। কখনো শয়তান মানুষকে শিরকের মধ্যে নিপতিত করতে বুজুর্গদের আকৃতি ধরে বিভ্রান্ত করে। কখনো বা সত্যই আল্লাহ কোনো বুজুর্গকে কারামত দিয়েছিলেন। আমরা দেখেছি যে, মুজিযা কারামতকে ক্ষমতা মনে করেই পূর্ববর্তী উম্মাতেরা শিরক করেছিল এবং আল্লাহ বারংবার বলেছেন যে, মুজিযা-কারামত নবী-ওলীদের ক্ষমতা নয়, একান্তই আল্লাহর ইচ্ছাধীন।

একটি উদাহরণ দেখুন। খলীফা উমার (রা) একদিন মদীনার মসজিদে নববীতে খুতবা দানকালে চিৎকার করে বলেন, ইয়া সারিয়া, আল-জাবাল, 'হে সারিয়া, পাহাড়!' ঐ সময়ে সারিয়া ইবনু যুনাইম একটি সেনাবাহিনী নিয়ে ইরাকে যুদ্ধরত ছিলেন। তিনি প্রায় পরাজিত হয়ে যাচ্ছিলেন। সে সময়ে উমার (রা)-এর এ চিৎকার তিনি শুনতে পান। তখন তিনি পাহাড়ের আশ্রয় নিয়ে পাহাড়কে পিছনে রেখে শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করেন এবং বিজয় লাভ করেন।[২] এর কয়েকমাস পর ২৩ হিজরীর জিলহাজ্জ মাসের ২৬ তারিখ উমার (রা) মসজিদে নববীতে ফজরের সালাতে ইমামতি করতে শুরু করেন। এমতাবস্থায় আবু লুলুআ নামক এক কাফির ক্রীতদাস পিছন থেকে একটি ছুরি দিয়ে তাকে বারংবার আঘাত করে। উমার (রা) আঘাতের ফলে অচেতন হয়ে পড়ে যান। চেতনা ফেরার পরে তিনি প্রশ্ন করেন, আমাকে কে আঘাত করল? তাকে বলা হয় কাফির আবু লুলুআ। তিনি বলেন, আল-হামদু লিল্লাহ, কোনো ঈমানের দাবীদারের হাতে আমার মৃত্যু নির্ধারণ করেন নি। তিনদিন পরে তিনি ইন্তেকাল করেন।[৩]

যে উমার (রা) শতশত মাইল দূরের যুদ্ধের ময়দানের অবস্থা জানতে পারলেন, তিনিই কয়েক হাতের মধ্যে অবস্থানরত শত্রুর কথা জানতে পারলেন না। এতে বুঝা গেল যে, কারামত কারো স্থায়ী ক্ষমতা নয়। কারামত অর্থ আল্লাহ বিশেষ মুহূর্তে তাকে সম্মান করে একটি অলৌকিক কর্ম দিয়েছিলেন। এর অর্থ এ নয় যে, তিনি সর্বদা এরূপ ক্ষমতার অধিকারী বা ইচ্ছা করলেই এরূপ করতে পারেন।

হাযেরীন, ইহূদী-খৃস্টানদের এক প্রকার শিরক ছিল আলিম ও বুজুর্গগণের অতিভক্তি ও অতি আনুগত্য করা। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন:

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لا إِلَهَ إِلا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

"তারা আল্লাহ ব্যতীত তাদের পণ্ডিতগণকে এবং সংসার-বিরাগীগণকে রব্ব-প্রতিপালক রূপে গ্রহণ করেছে, এবং মরিয়ম তনয় মাসীহকেও। কিন্তু তারা শুধু এক ইলাহের ইবাদত করার জন্য আদিষ্ট

---

[১] সূরা (১) ফাতিহা: ৪ আয়াত।
[২] ইসাবাহ /৩৬, তাহযীবুল আসমা ২/৩৩০, তারিখ ইবন কাসীর ৫/২১০
[৩] তারিখ ইবন কাসীর ৫/২১৭-২১৮

হয়েছিল। তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তারা যা শরিক করে তা থেকে তিনি কত পবিত্র!"[১]

ইহূদী-খৃস্টানগণ দুভাবে আলিম ও ওলীগণকে 'রাব্ব' বানাতো। প্রথমত তারা বিশ্বাস করত যে, আলিম ও বুজুর্গগণ অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। বিশেষত মৃত্যুর পরে তারা অলৌকিক কল্যাণ, অকল্যাণ ও বিশ্ব পরিচালনার ক্ষমতা লাভ করেন। এজন্য তারা তাদের মুর্তি বা কবরে মানত, নযর বা ভেট প্রদান করত, তাদের কবরের নিকট ইবাদতগাহ তৈরি করত এবং তাদের স্মৃতি বিজড়িত স্থান থেকে 'বরকত' লাভের জন্য সচেষ্ট থাকত। ইতিহাস ও হাদীস থেকে এ সকল বিষয় জানা যায়।

দ্বিতীয়ত, তারা পোপ-পাদরিগণ ও সাধুদের 'ইসমাত' বা অভ্রান্ততায় (infallibility) বিশ্বাস করত। তারা বিশ্বাস করত ও করে যে, পবিত্র আত্মার প্রেরণায় তারা কাশফ, ইলহাম ও ইলমু লাদুন্নী লাভ করেন। সেগুলির আলোকে তারা ধর্মের যে বিধান প্রদান করেন তাই চূড়ান্ত। তাদের সিদ্ধান্ত ভুল হতে পারে না। সাধারণ মানুষদের জন্য ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়ন বা ধর্মীয় বিধান জানা সম্ভব নয়। 'বাইবেলে' কি আছে বা নেই তা বড় কথা নয়। পোপ বা ধর্মগুরুগণ কি ব্যাখ্যা বা নির্দেশ দিলেন তাই বড় কথা।

হাযেরীন, আলিম, উলামা, পীর ও ওলীগণের শ্রদ্ধা ও আনুগত্য করতে হবে। কিন্তু তাঁদেরকে কখনোই আল্লাহর স্থানে বা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্থানে বসানো যাবে না।

হাযেরীন, আল্লাহ ছাড়া কারো উপর তাওয়াক্কুল করা শিরক। তাওয়াক্কুল অর্থ কাউকে উকিলরূপে গ্রহণ করা এবং তার উপর নির্ভর করা। এরূপ মনে করা যে, অমুক আমার দিকে দৃষ্টি রেখেছেন, বিপদে আপদে আমাকে তরাবেন। এভাবে কারো উপর তাওয়াক্কুল করা বা তার নাম নিয়ে যাত্রা বা কর্ম শুরু করা শিরক। কুরআন কারীমে আল্লাহ বারংবার বলেছেন যে, একমাত্র আল্লাহর উপরেই তাওয়াক্কুল করতে হবে এবং উকিল হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। একস্থানে আল্লাহ বলেন:

وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

"তোমরা যদি মুমিন হও তবে কেবলমাত্র আল্লাহর উপরেই তাওয়াক্কুল কর।"[২]

হাযেরীন, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে নযর, মানত, উৎসর্গ বা জবাই করা শিরক। যারা কবরে-মাযারে মানত বা জবাই করেন তাদের অনেকে মনে করেন যে, আমরা তো একমাত্র আল্লাহর নাম নিয়েই জবাই করছি এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যেই মানত করছি, কেবলমাত্র পশুটাকে ওলীর মাযারে এনে জবাই করছি, যেন তিনি সাওয়াব পান। এখানে প্রশ্ন হলো, যদি একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই মানত বা জবাই করা হয় তাহলে পৃথিবীর যে কোনো স্থানে জবাই করেই তো নিয়্যাত করা যেত যে, আল্লাহ এ সাদকার সাওয়াবটি অমুককে পৌঁছে দিন, এত কষ্ট করে পশুটি মাযারে নিয়ে যাওয়া হলো কেন? স্পষ্টতই এর কারণ হলো এ মানতের মাধ্যমে আল্লাহ এবং মৃত বুজুর্গ উভয়েরই সন্তুষ্টি লাভ করা। এভাবে আল্লাহর সাথে মানতের ইবাদতে অন্যকে শরীক করা হয়। আল্লাহ বলেন:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ،

"বল, নিশ্চয় আমার সালাত, আমার উৎসর্গ, আমার জীবন, আমার মৃত্যু আল্লাহরই নিমিত্ত।"[৩]

হাযেরীন, আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সাজদা করা শিরক। মুশরিকগণ চাঁদ, সূর্য, প্রতিমা ইত্যাদির

---

[১] সূরা তাওবা, ৩১ আয়াত।
[২] সূরা মায়িদা: ২৩ আয়াত।
[৩] সূরা (৬) আনআম ঃ ১৬২-১৬৩ আয়াত।

জন্য সাজদা করত। একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্যকে সাজদা করতে নিষেধ করে আল্লাহ বলেন:

لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

"তোমরা সূর্যকে সাজদা করো না, চন্দ্রকেও নয়, সাজদা কর আল্লাহকে, যিনি এগুলি সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা তাঁরই ইবাদত কর।"[১]

পারস্য ও রোমের মানুষের রাজা, বাদশাহ আলিম ও বুজুর্গদেরকে সম্মান করে সাজদা করত। সাহাবীরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এভাবে সম্মানমূলক সাজদা করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। তিনি কঠিনভাবে নিষেধ করেন এবং বলেন আল্লাহ ছাড়া কাউকে সাজদা করা কোনোভাবে বৈধ নয়।[২]

হাযেরীন, নবী, ওলী ও ফিরিশতাদেরকে ভালবাসা ও মর্যাদা প্রদান করা মুমিনের দায়িত্ব। আবার এক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি হলে তা শিরকে পরিণত হয়। শিরক থেকে বাঁচার অন্যতম উপায় হলো, সুন্নাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা। সাহাবীগণ যেভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ও অন্যান্য নবী-ওলীদের ভক্তি করেছেন সেভাবেই আমাদেরকে বুজর্গদেরকে ভক্তি করতে হবে। সুন্নাতের বাইরে গেলেই বিপদ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যারা তাঁর ও তাঁর সাহাবীগণের মত ও কর্মের উপর থাকবে তাঁরাই নাজাত পাবে। তিনি শিক্ষা দিয়েছেন, নবী-ওলীদের ভালবাসতে ও সম্মান করতে। কিন্তু বিপদে আপদে কখনোই তাদের কাছে সাহায্য চান নি বা চাইতে শিক্ষা দেন নি। বরং সর্বদা সকল পরিস্থিতিতে একমাত্র আল্লাহকে ডাকতে ও তাঁর সাহায্য চাইতে শিক্ষা দিয়েছেন। সাহাবী-তাবিয়ীগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ কে সর্বোচ্চ ভক্তি করেছেন, ভালবেসেছেন, তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর কাছে দুআ চেয়েছেন। তাঁর ইন্তেকালের পরে তাঁর রাওযা শরীফ যিয়ারত করেছেন, সালাম দিয়েছেন, কিন্তু তাঁর কাছে দুআ চান নি বা বলেন নি যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি রাওযা থেকে আমাদের জন্য দুআ করুন। এমনকি আল্লাহর কাছে দুআ চাওয়ার জন্যও তাঁরা রাওযা শরীফে সমবেত হন নি। কখনোই তাঁকে বা তাঁর কবরকে সাজদা করেন নি, তাঁর নামে মানত করেন নি, বিপদে আপদে রাওযার পাশে দাঁড়িয়ে বা দূর থেকে তাকে ডাকেন নি বা বিপদ কাটিয়ে দেওয়ার আবদার করেন নি।

হাযেরীন, কোনো বার, তিথি, গ্রহ, রাশি, তারিখ, মাস, পাখী, পশু, দিক, দ্রব্য ইত্যাদি অশুভ বা অযাত্রা বলে বিশ্বাস করা, অষ্টধাতুর মাদুলি ইত্যাদিতে বিশ্বাস করা শিরক। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

الطِّيَرَةُ شِرْكٌ الطِّيَرَةُ شِرْكٌ الطِّيَرَةُ شِرْكٌ

"অশুভ বা অযাত্রা বিশ্বাস করা বা নির্ণয়ের চেষ্টা করা শির্ক, অশুভ বা অযাত্রা বিশ্বাস করা বা নির্ণয়ের চেষ্টা করা শির্ক, অশুভ বা অযাত্রা বিশ্বাস করা বা নির্ণয়ের চেষ্টা করা শির্ক।[৩]

শয়তান চায় মুমিনকে চিরস্থায়ী জাহান্নামী করতে। এজন্য শয়তানের সবচয়ে বড় অস্ত্র শিরক। আমরা দেখেছি যে, সকল পাপের ক্ষমা আছে, সকল পাপীরই জান্নাতের আশা আছে, কিন্তু ব্যতিক্রম হলো শিরক। শিরকে লিপ্ত ব্যক্তি ক্ষমারও আশা নেই জান্নাতেরও আশা নেই। হাযেরীন, সব হারানো যায়, কিন্তু ঈমান হারানো যায় না। ঈমান বাঁচাতে আমাদের প্রত্যেককে বেশি বেশি কুরআন কারীম বুঝে পড়তে হবে। সহীহ হাদীসের গ্রন্থগুলি বারংবার বুঝে বুঝে পড়তে হবে। আরবী না বুঝলে অনুবাদ পড়তে হবে। এভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের সুন্নাত সহীহভাব জানতে হবে এবং সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকতে হবে। মহান আল্লাহ আমাদের ঈমান হিফাযত করুন। আমীন।

---

[১] সূরা (৪১) ফুস্সিলাত: ৩৭ আয়াত।

[২] বিস্তারিত দেখুন: খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, কুরআন সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা, পৃষ্ঠা: ৩৫৩-৫২২।

[৩] তিরমিযী, ৪/১৬০; ইবনু হিব্বান, আস-সহীহ ১৩/৪৯১; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ১/৬৪; তিরমিযী, ইবনু হিব্বান, হাকিম হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِه وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِه وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

أَمَّا بَعْدُ، فَيَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ، قَالَ اللهُ تَعَالَىَ: قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلا ضَرًّا إِلا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ

كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَقُولُونَ لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ قَالَ فَيَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيْلَكُمْ قَدْ قَدْ فَيَقُولُونَ إِلاَّ شَرِيكًا هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ يَقُولُونَ هَذَا وَهُمْ يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ

بَارَكَ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ فِيْ الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ. وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ. أَقُولُ قَولِيْ هَذا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ، فَاسْتَغْفِرُوْهُ وَتُوْبُوْا إِلَيْهِ، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.

রবিউস সানী মাসের ১ম খুতবাঃ ইলম, শিক্ষা ও স্বাক্ষরতা

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লী আলা রাসূলিহীল কারীম। আম্মা বাদ,

সম্মানিত উপস্থিতি, আজ ...... হিজরী সালের রবিউস সানী মাসের প্রথম জুমুআ। আজ আমরা ইলম, শিক্ষা ও স্বাক্ষরতা নিয়ে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ। কিন্তু তার আগে আমরা এ সপ্তাহের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসগুলির বিষয়ে সংক্ষেপ আলোকপাত করি।

হাযেরীন, আজ ইংরেজী ..... মাসের ..... তারিখ। এ সপ্তাহের দিবসগুলির মধ্যে রয়েছে ..... ।

সম্মানিত উপস্থিতি, ইসলামে স্বাক্ষরতা, শিক্ষা ও জ্ঞানার্জনের উপরে সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং একে সকল মুমিন নরনারীর জন্য ব্যক্তিগতভাবে ফরয করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

"ইলম সন্ধান করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয।"[১]

আলিমদের প্রশংসায় আল্লাহ বলেনঃ

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ. وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ

"তুমি কি দেখ না আল্লাহ আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং আমি তা দ্বারা বিবিত্র বর্ণের ফলমূল উদ্‌গত করি? পাহাড়ের মধ্যে আছে বিচিত্র বর্ণের পথ- শুভ্র, লাল ও নিকষ কাল। এভাবে রং বেরং-এর মানুষ, জন্তু ও গৃহপালিত প্রাণী। আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী তারাই আল্লাহকে ভয় করে।"[২]

এ আয়াতে আলিমদের প্রশংসা করা হয়েছে যে, তাঁরাই আল্লাহকে ভয় করেন। এছাড়া আমরা দেখতে পাই যে, এখানে সৃষ্টির বৈচিত্র ও সৃষ্টিতত্ত্বের সাথে জ্ঞানকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এ থেকে জানা যায় যে, প্রকৃতি বিজ্ঞান-সহ জ্ঞানের সকল শাখাই ইসলামের দৃষ্টিতে প্রশংসনীয় জ্ঞান বা ইসলামী জ্ঞান।

কুরআনের এরূপ আয়াত ও বিভিন্ন হাদীসের আলোকে আলিমগণ উল্লেখ করেছেন যে, মানুষের কল্যাণকর সকল শিক্ষাই ইসলামী শিক্ষা। ভাষা, সাহিত্য, চিকিৎসা, রসায়ন, জীববিজ্ঞান, গণিত, ভুগোল ও জ্ঞান বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখাই জ্ঞানার্জন ও শিক্ষালাভ ইসলামের নির্দেশ। সকল বিষয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিশেষজ্ঞ তৈরি করা মুসলিম সমাজের জন্য ফরয কিফাইয়া দায়িত্ব। মুমিনের উপর ফযর আইন বা ব্যক্তিগত ফরয ইবাদত হলো নিজের ঈমান ও ইসলামকে সংরক্ষণ করার ও প্রয়োজনীয় সকল ইবাদত ও লেনদেন ইসলাম-সম্মতভাবে আদায় করার জন্য আবশ্যকীয় "শরয়ী" জ্ঞান অর্জন করা। এরপর মুমিন তার নিজের ও সমাজের চাহিদা অনুসারে জ্ঞানের যে কোনো শাখায় পারদর্শিতা অর্জন করবেন।

হাযেরীন, অক্ষরজ্ঞান ছাড়াও শ্রবণ ও দর্শনের মাধ্যমেও জ্ঞানার্জন করা যায়। তবে স্বাভাবিকভাবে জ্ঞান অর্জনের জন্য অক্ষরজ্ঞান বা স্বাক্ষরতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে। এজন্য 'কলম' বা অক্ষরজ্ঞানকে জ্ঞানের মূল বাহন হিসেবে ঘোষণা দিয়ে আল্লাহ বলেনঃ

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ

---

[১] ইবনু মাজাহ, আস-সুনান ১/৮১; আলবানীঃ সহীহু সুনানি ইবন মাজাহ ১/২৯৬। হাদীসটি সহীহ।

[২] সূরা ফাতিরঃ ২৭-২৮ আয়াত।

"পড় তোমার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে লটকে থাকা বস্তু থেকে। পাঠ কর, আর তোমার প্রতিপালক মহা-মহিমান্বিত। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন।"[১]

রাসুলুল্লাহ (ﷺ) স্বাক্ষরতা ও শিক্ষার অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন। বদরের যুদ্ধে কিছু কাফির যোদ্ধা বন্দী হন, যারা লেখাপড়া জানতেন। স্বাক্ষরতার হার বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) নির্দিষ্ট সংখ্যক মুসলিম শিশু-কিশোরের লেখাপড়া শেখানোর বিনিময়ে তাদেরকে মুক্তি প্রদানের ব্যবস্থা করেন।[২]

হাযেরীন, উপরের আয়াত থেকে আমরা দেখছি যে, শিক্ষা গ্রহণের মূলনীতি হবে 'প্রতিপালকের নামে'। অর্থাৎ জ্ঞানের সকল শাখার জ্ঞানই মহান স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস ও সৃষ্টির কল্যাণের জন্য হতে হবে। আধুনিক শিক্ষাবিদ ও মনোবিজ্ঞানিগণ একমত যে, শিক্ষিত মানুষের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধ ও বিশ্বাস সঞ্জীবিত করতে না পারলে কখনোই দুর্নীতি, স্বার্থপরতা ও হানাহানিমুক্ত সমাজ গঠন করা সম্ভব নয়। এজন্য জ্ঞানের সকল শাখার মধ্যে ধর্মীয় শাখায় পারদর্শিতা অর্জনকে ইসলামে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এ জ্ঞান মানুষকে যেমন বিশ্বাস ও কর্মে পূর্ণতা দেয়, তেমনি সমাজের মানুষের মধ্যে বিশ্বাস, কর্ম, সততা ও মানবমুখিতা সৃষ্টির যোগ্যতা প্রদান করে। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

"আল্লাহ যার মঙ্গলের ইচ্ছা করেন তাকেই দীনের সঠিক জ্ঞান ও বুঝ প্রদান করেন।"[৩]

হাযেরীন, দীনের সঠিক জ্ঞান অর্জন বা ইলম শিক্ষা মুমিনের উপর প্রথম ফরয। আল্লাহ বলেন:

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ

"অতএব তুমি জান (জ্ঞান অর্জন কর) যে আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবূদ নেই।"[৪]

এ আয়াত থেকে আমরা জানতে পারছি যে, ঈমানের আগে ইলম ফরয। কিভাবে ঈমান আনতে হবে এবং কিভাবে ঈমান বিশুদ্ধ হবে তা প্রথমে আমাদেরকে জানতে হবে। অনুরূপভাবে সকল কর্মের সফলতা ও কবুলিয়্যত নির্ভর করে সে বিষয়ে বিশুদ্ধ জ্ঞানের উপর। এজন্য প্রত্যেক মুসলিমের জন্য দীনের প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করা ফরয। প্রাতিষ্ঠানিক ইলম শিক্ষা সম্ভব না হলেও ব্যক্তিগত পড়ালেখা ও শোনার মাধ্যমে এ ফরয আদায় করতে হবে। ইলম শিক্ষা করলে আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরয ইবাদত পালনের সাওয়াব ও মর্যাদা লাভ করব। শুধু তাই নয়, ঈমানের পরে ইলমই হলো আল্লাহর নিকট মর্যাদা বৃদ্ধির প্রথম উপায়। আল্লাহ জানিয়েছেন যে, ঈমান এবং 'ইলম'-এর দ্বারাই আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন:

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে ইলম বা জ্ঞান প্রদান করা হয়েছে তাদের মর্যাদা আল্লাহ বাড়িয়ে দিবেন। তোমরা কি কর্ম কর তা আল্লাহ সম্যক অবগত আছেন।"[৫]

হাযেরীন, অন্যান্য ইবাদতের চেয়ে ইলম শিক্ষার সাওয়াব ও মর্যাদা বেশি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

فَضْلُ الْعِلْمِ خَيْرٌ مِنْ فَضْلِ الْعِبَادَةِ

"ইবাদতের ফযীলতের চেয়ে ইলমের ফযীলত অধিক উত্তম।"[৬]

---

[১] সূরা আলাক: ১-৪ আয়াত।
[২] ইমাম আহমদ, আল-মুসনাদ ৪/৪৭; ড. মাহদী রিযকুল্লাহ, আস-সীরাহ আন-নববিয়্যাহ, পৃ. ৩৫৯। হাদীসটির সনদ সহীহ।
[৩] বুখারী, আস-সহীহ ১/৩৭; মুসলিম, আস-সহীহ ২/৭১৮-৭১৯।
[৪] সূরা মুহাম্মাদ: ১৯ আয়াত।
[৫] সূরা মুজাদালা: ১১ আয়াত।
[৬] হাকিম, আল-মুসতাদরাক ১/১৭১; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১২০; আলবানী, সহীহুত তারগীব ১/১৬। হাদীসটি সহীহ।

হাযেরীন, ইলম শিক্ষা করার জন্য পথে চলা, হাঁটা, কষ্ট করা ইত্যাদিও ইবাদত। এগুলির মর্যাদা আল্লাহর কাছে অত্যন্ত বেশি। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانِ فِي الْمَاءِ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ إِنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ إِنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلا دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ

"যদি কেউ ইলম শিক্ষার মানসে কোনো পথে চলে, তবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন। ফিরিশতাগণ ইলম শিক্ষার্থীর এই কর্মের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করে তার জন্য তাদের পাখনাগুলি বিছিয়ে দেন। আলিমের জন্য আসমান এবং জমিনের সকলেই ক্ষমা প্রার্থনা করে। এমনকি পানির মধ্যে মাছও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। তারকাররাজির উপরে চাঁদের যেমন মর্যাদা, ইবাদত-বন্দেগিতে লিপ্ত 'আবিদের' উপরে 'আলিমের' মর্যাদা তেমনই। আলিমরাই হচ্ছেন নবীদের উত্তরাধিকারী। নবীরা (আ) কোনো টাকা-পয়সা দীনার-দিরহাম উত্তরাধিকার রেখে যান নি। তাঁরা শুধু ইলম-এর উত্তরাধিকার রেখে যান। কাজেই যে ব্যক্তি ইলম গ্রহণ করল, সে নবীদের উত্তরাধিকার থেকে একটি বড় অংশ গ্রহণ করল।"[১]

হাযেরীন, আমরা হয়ত মনে করতে পারি যে, এই মহান মর্যাদা বোধহয় শুধু মাদ্রাসায় যারা পড়েন অথবা যারা প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে ইলম শিক্ষা করেন তাদের জন্যই। প্রকৃত বিষয় তা নয়। যে কোনো বয়সের যে কোনো মুমিন ওয়াজ মাহফিলে, মসজিদে, খুতবার আলোচনায়, আলেমের নিকট প্রশ্ন করে, বই পড়ে বা যে কোনো ভাবে ইলম শিক্ষা করতে গেলেই এই মর্যাদা ও সাওয়াব লাভ করবেন।

ইলম শিক্ষার উদ্দেশ্যে মসজিদে গমন করলে, কোনো আলিমের নিকট গমন করলেও একইরূপ সাওয়াব ও মর্যাদা পাওয়া যাবে বলে বিভিন্ন হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেন:

مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ لاَ يُرِيدُ إِلاَّ أَنْ يَتَعَلَّمَ خَيْرًا أَوْ يُعَلِّمَهُ كَانَ لَهُ كَأَجْرِ حَاجٍّ تَامًّا حَجَّتُهُ

"যদি কোনো ব্যক্তি সকাল সকাল বা দ্বিপ্রহরের পূর্বে মসজিদে গমন করে, তার গমনের একমাত্র উদ্দেশ্য হয় (ইমামের খুতবা থেকে) কোনো ভাল কিছু শিক্ষা করা অথবা শিক্ষা দেওয়া, তবে সেই ব্যক্তি একটি পরিপূর্ণ হজ্জের সাওয়াব লাভ করবে।"[২] অন্য হাদীসে তিনি বলেন:

مَنْ جَاءَ مَسْجِدِي هَذَا لَمْ يَأْتِهِ إِلا لِخَيْرٍ يَتَعَلَّمُهُ أَوْ يُعَلِّمُهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

"যে ব্যক্তি আমার মসজিদে আগমন করবে, তার একমাত্র উদ্দেশ্য হবে কোনো ভাল বিষয় শিক্ষা করা বা শিক্ষা দেওয়া, সেই ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীগণের মর্যাদা লাভ করবেন।"[৩]

অন্য হাদীসে তিনি সাহাবী হযরত আবূ যার (রা) কে বলেন:

يَا أَبَا ذَرٍّ لأَنْ تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تُصَلِّيَ مِائَةَ رَكْعَةٍ وَلأَنْ تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ بَابًا مِنَ الْعِلْمِ عُمِلَ بِهِ أَوْ لَمْ يُعْمَلْ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تُصَلِّيَ أَلْفَ رَكْعَةٍ

---

[১] বুখারী, আস-সহীহ ১/৩৭; মুসলিম, আস-সহীহ ৪/২০৭৪; তিরমিযী, আস-সুনান ৫/২৮, ৪৮; ইবনু মাজাহ, আস-সুনান ১/৮১-৮২। হাদীসটি হাসান।
[২] মুনযিরী, আত-তারগীব ১/৫৯; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১২৩; আলবানী, সহীহুত তারগীব ১/২০। হাদীসটি হাসান।
[৩] ইবনু মাজাহ, আস-সুনান ১/৮২; আলবানী, সহীহুত তারগীব ১/২০। হাদীসটি সহীহ।

"তুমি যদি যেয়ে কুরআনের একটি আয়াত শিক্ষা কর, তবে তা তোমার জন্য ১০০ রাক'আত নফল সালাত আদায় করার থেকেও উত্তম। আর যদি তুমি ইলমের একটি অধ্যায় শিক্ষা কর- আমল কৃত অথবা আমলকৃত নয়- তবে তা তোমার জন্য ১০০০ রাক'আত সালাত আদায় থেকেও উত্তম।"[১]

হাযেরীন, আমরা দেখেছি যে, মহান আল্লাহ ঈমানের পরে ইলমকে মর্যাদার মূল উৎস বলেছেন। হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, সকল সৃষ্টি আলিমদের ও শিক্ষকদের জন্য দুআ করে। সকল মুমিনের দায়িত্ব আলিমদের ও শিক্ষকদের সম্মান করা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

لَيْسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ لَمْ يُجِلَّ كَبِيرَنَا وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ

"যে ব্যক্তি বড়দের সম্মান করে না, ছোটদের স্নেহ করে না এবং আলেমদের বা জ্ঞানীদের মর্যাদা-অধিকার বোঝে না সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।"[২]

হাযেরীন, আমরা দুনিয়াতে যত নেক আমল করি সেগুলির সাথে ইলম শিক্ষার নেক আমলের দুইটি বিশেষ পার্থক্য আছে। প্রথমত, অন্যকে শিখালে ইলম-এর সাওয়াব চক্রবৃদ্ধিহারে বৃদ্ধি পায় এবং দ্বিতীয়ত, ইলমের সাওয়াব মৃত্যুর পরেও অব্যাহত থাকে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

مَنْ عَلَّمَ عِلْمًا فَلَهُ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهِ لا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الْعَامِلِ

"যদি কেউ কোনো ইলম শিক্ষা দেয়, তবে সেই শিক্ষা অনুসারে যত মানুষ কর্ম করবে সকলের সমপরিমাণ সাওয়াব ঐ ব্যক্তি লাভ করবে, কিন্তু এতে তাদের সাওয়াবের কোনো ঘাটতি হবে না।"[৩]

আমাদের সকল নেক আমল মৃত্যুর সাথে সাথে বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু ইলমের সাওয়াব মৃত্যুর পরেও অব্যাহত থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلا مِنْ ثَلاثَةٍ إِلا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

"যখন কোনো আদম-সন্তান মৃত্যুবরণ করে তখন তার সকল কর্ম বন্ধ হয়ে যায়। শুধু তিনটি কর্মের সাওয়াব সে অব্যাহতভাবে পেতে থাকে: প্রবাহমান দান (সাদাকায়ে জারিয়া), উপকারী ইলম এবং নেককার সন্তান যে তার জন্য দোয়া করতে থাকে।[৪]

হাযেরীন, নিজেদের জন্য প্রয়োজনীয় দীনী ইলম শিক্ষা করা যেমন ফরয আইন, তেমনি প্রত্যেক পিতামাতার উপর ফরয আইন নিজের সন্তানদেরকে প্রয়োজনীয় দীনী ইলম শিক্ষা দেওয়া। এজন্য সর্বোত্তম পন্থা হলো নিজের সন্তানকে 'আলিম' বানানো। হাযেরীন, দুনিয়াতে আমরা অনেক সময় গৌরব করে বলি যে, আমি শিক্ষিত না হলেও আমার ৫টি সন্তানই এম.এ. পাস। কিয়ামতের দিন এরূপ আমাদের অনেকেই গৌরব করবেন, আমি আলিম হতে পারি নি, তবে আমার ৫টি সন্তানই আলিম। ভাইয়েরা, দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী গৌরবের চেয়ে আখিরাতের চিরস্থায়ী গৌরব কি বড় নয়?

বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের সময় একটি মিথ্য প্রচারণা আমাদের সমাজে ছড়ানো হয় যে, দীনী ইলম ফকীরী বিদ্যা বা মাদ্রাসায় পড়লে জাগতিক উন্নতি হয় না। এর চেয়ে মিথ্যা প্রপাগাণ্ডা আর কিছুই হতে পারে না। স্কুল কলেজে যারা ভর্তি হয় তাদের বৃহৎ অংশ উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে না। যারা পারে

---

[১] ইবনু মাজাহ, আস-সুনান ১/৭৯; মুনযিরী, আত-তারগীব ১/৫৪, ২/২৩২। মুনযিরী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।
[২] আহমদ, আল-মুসনাদ ৫/৩২৩; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ১/২১১; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১২৭, ৮/১৪। হাদীসটি হাসান।
[৩] ইবনু মাজাহ, আস-সুনান ১/৮৮; আলবানী, সহীহুত তারগীব ১/১৯। হাদীসটি হাসান।
[৪] মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১২৫৫।

তাদেরও অনেকেই বেকার থাকে বা ভাল চাকরী পায় না। পাশাপাশি সমাজে হাজার হাজার আলিম প্রফেসর, ডাক্তার, আইনজীবী, উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, মুহাদ্দিস, শিক্ষক অত্যন্ত সম্মান ও শান্তির সাথে বসবাস করছেন। মেধা, যোগ্যতা ও সামগ্রিক পরিবেশের উপরে ব্যক্তির জাগতিক উন্নতি নির্ভর করবে। মেধা ও যোগ্যতা থাকলে মাদ্রাসা বা স্কুল যেখানেই পড়ুক সে সম্মানজনক স্থানে পৌঁছাবে। তবে সবচেয়ে বড় কথা দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী সামান্য উন্নতির লোভে আপনি আলিমের পিতা হওয়ার ও নেক সন্তানের দুআ পাওয়া এত বড় সুযোগ ছেড়ে দেবেন? আপনার সন্তানকে জাহান্নামে দেওয়ার ও নিজে জাহান্নামে যাওয়ার রিস্ক নিবেন?

হাযেরীন, সাধারণ শিক্ষা মোটেও নিষিদ্ধ নয়, তবে দীনী ইলম শিক্ষার মধ্যে আপনার ও আপনার সন্তানের অধিক মর্যাদা ও নাজাতের নিশ্চয়তা রয়েছে। আর যদি সন্তানকে সাধারণ শিক্ষায় পড়াতে চান তবে অবশ্যই তাদেরকে প্রয়োজনীয় দীনী ইলম প্রথমে শিখাতে হবে। এটা আপনার জন্য ফরয আইন। প্রথমে কয়েক ক্লাস মাদ্রাসায় পড়িয়ে অথব মক্তবে পড়িয়ে তাদেরকে প্রয়োজনীয় দীনী ইলম শিক্ষা দিন। অনেক সময় আমরা বাড়িতে প্রাইভেট টিউটর রেখে কুরআন তিলাওয়াত ও দীনী ইলম শিক্ষা দিতে চেষ্টা করি। তবে গুরুত্বের কমতি, পাঠ গ্রহণে সঙ্গীর অভাব, স্কুলের পাঠের চাপ ইত্যাদি কারণে সাধারণত এরূপ প্রাইভেট শিক্ষকের কাছ থেকে শিখে সন্তানদের মধ্যে দীনী শিক্ষা বা দীনী আমল কোনোটাই বিকাশ পায় না। এজন্য সন্তানদেরকে অন্তত কিছু ক্লাস মাদ্রাসায় বা মক্তবে পড়িয়ে এরপর সাধারণ শিক্ষায় পাঠান। অন্ত ত যেন তারা প্রকৃত মুসলিম হিসেবে বাঁচতে পারে, নেককার সন্তান হিসেবে আপনার জন্য দুআ করতে পারে এবং আখিরাতে আবার একত্রে আপনার সাথে জান্নাতে যেতে পারে। আপনার অবহেলার কারণে যদি আপনার সন্তান বেনামাযি বা পাপী হয় তবে তাদের সারাজীবনের গোনাহের দায়ভার আপনার উপর থাকবে। আপনি নিজে নেককার হলেও এরূপ সন্তানের পাপের জন্য আপনাকে তার সাথে জাহান্নামে যেতে হবে। শুধু আখিরাতই নয়, ভাইয়েরা, সন্তানদেরকে প্রয়োজনীয় দীনী ইলম না শিখালে দুনিয়াতেই তারা পিতামাতার হক্ক ও আদব রক্ষা করে না। আদরের সন্তান শেষ জীবনে প্রচণ্ড কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

হাযেরীন, ইসলামী ইলমের মূল উৎস হলো কুরআন ও হাদীস। এজন্য প্রত্যেক মুসলিমের দায়িত্ব হলো, কুরআন কারীম পাঠ করা এবং তার অর্থ অনুধাবন করা। কুরআন কারীম সকল মুসলিমের সার্বক্ষণিক পাঠের জন্য। আর বুঝে পড়াকেই মূলত পাঠ বলা হয়। এছাড়া মহান আল্লাহ কুরআনে বারংবার কুরআন কারীম বুঝে পড়তে এবং তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আরবী না বুঝলে নির্ভরযোগ্য আলিমদের মুখ থেকে বা এরূপ নির্ভরযোগ্য প্রসিদ্ধ আলিমদের লেখা অনুবাদ পড়ে অন্তত কুরআনের অর্থ বুঝার চেষ্টা করুন। তাফসীর পড়তে না পারলেও অন্তত প্রতি বৎসর একবার কুরআন কারীম অর্থ-সহ পড়ে শেষ করুন। দেখবেন, জীবন পাল্টে গেছে, কুরআনের নূর হৃদয়ে এসেছে।

হাযেরীন, কুরআন পাঠের পাশাপাশি প্রত্যেক মুসলিমকেই যথাসাধ্য বেশিবেশি সহীহ হাদীসের গ্রন্থ পাঠ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত জানতে ও মানতে হবে। আল্লাহর রহমতে সিহাহ সিত্তা-সহ নির্ভরযোগ্য হাদীসের গ্রন্থগুলি বাংলায় অনূদিত হয়েছে। যদি বৃহৎ গ্রন্থগুলি কিনতে না পারেন, তবে অন্তত ইমাম নববীর লেখা 'রিয়াদুস সালিহীন' গ্রন্থটির অনুবাদ কিনে নিয়মিত পাঠ করুন। যিনি হাদীস পড়েন তিনি মূলত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহচার্যে থাকেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহচার্য থেকে নিজেকে মাহরূম করবেন না।

হাযেরীন, কুরআন-হাদীসের অর্থানুবাদ পড়ে কখনোই নিজেকে বড় আলিম মনে করবেন না বা আলিমদের ভুল ধরতে যাবেন না। আমরা কুরআন-হাদীসের অনুবাদ পাঠ করব নিজেদের ঈমান-আমল পরিশুদ্ধ করতে এবং সামান্য হলেও কুরআন ও হাদীসের নূর গ্রহণ করতে। এগুলো পড়লেই ইসলামের

সবকিছু জানা হয় না। এগুলি অবশ্যই পড়তে হবে। পাশাপাশি নির্ভরযোগ্য বিশেষজ্ঞ আলিমদের মুখ ও লেখা থেকেও শিখতে হবে। যে সকল আলিম কুরআন ও সহীহ হাদীস নির্ভর ওয়ায করেন বা বই লিখেন তাদের থেকে শিক্ষা লাভ করতে হবে। যারা পরবর্তী যামানার গল্প-কাহিনী বা অলৌকিক কিচ্ছা অথবা জাল হাদীস নির্ভর ওয়ায করেন বা বইপত্র লিখেন তাদের থেকে দূরে থাকতে হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

سَيَكُونُ فِيْ آخِرِ الزَّمَانِ أُنَاسٌ مِنْ أُمَّتِي يُحَدِّثُونَكُمْ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلاَ آبَاؤُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ.

"শেষ যুগে আমার উম্মাতের কিছু মানুষ তোমাদেরকে এমন সব হাদীস বলবে যা তোমরা বা তোমাদের পিতা-পিতামহগণ কখনো শুননি। খবরদার! তোমরা তাদের থেকে সাবধান থাকবে।"[১]

হাযেরীন, কোনো আলিমের বই পড়ে বা ওয়ায শুনে কোনো হাদীসের বিষয়ে দ্বিধা বা আপত্তি হলে ঝগড়া-বিতর্ক না করে হাদীসটি কোন্ হাদীসের গ্রন্থে সংকলিত এবং তার সনদটি সহীহ কিনা তা জানতে চেষ্টা করুন। সহীহ সনদ পাওয়া গেলে মেনে নিন। না পাওয়া গেলে বাদ দিন। আত্মমর্যাদার নামে ঝগাড়া করে গোনাহগার হবেন না। ফকীহগণ বলেছেন যে, কোনো হাদীস বলার সময় হাদীসটি সনদসহ কোন্ গ্রন্থে সংকলিত অন্তত তা বলতে হবে। এরূপ না বলে হাদীস বলা তারা না জায়েয বলেছেন।

হাযেরীন, মুসলিম উম্মাহর ফিরকাবাজি, কোন্দল, কুসংস্কার, শিরক, বিদআত ইত্যাদির মূল কারণ জাল হাদীস। ইসলামের প্রথম যুগ থেকেই ইসলামের শত্রুগণ, শীয়াগণ, দুর্বল ঈমান ওয়ায়েযগণ ও অনুরূপ অনেক মানুষ নিজেদের স্বার্থ বা মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য হাদীসের নামে জাল কথা প্রচার করেছে। সাহাবীগণ এবং পরবর্তী আলিমগণ এজন্য সনদ ছাড়া কোনো হাদীস গ্রহণ করতেন না। সনদে যাদের নাম বলা হয় তাদের সকল বর্ণনা একত্রিত করে কোর্টের উকিল ও বিচারকদের মত ক্রস পরীক্ষা করে এদের জালিয়াতি ধরেছেন। তাঁরা জাল হাদীস ও সহীহ হাদীস পৃথক করেছেন। এজন্য মুহাদ্দিগণের নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রাপ্ত সহীহ হাদীসের উপর নির্ভর করতে হবে। আলিমগণ বারংবার বলেছেন যে, অন্তত হাদীসের কোন্ প্রসিদ্ধ গ্রন্থে হাদীসটি আছে তা না জেনে কোনো হাদীস বলা বা গ্রহণ করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ.

"একজন মানুষের পাপী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনবে তাই বর্ণনা করবে।"[২]

কোনো হাদীস সম্পর্কে জাল বলে সন্দেহ হলে মুহাদ্দিসদের নিরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত তা আর বলা যাবে না। কারণ এতে জাল হাদীস প্রচারে সহযোগিতা হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

مَنْ حَدَّثَ عَنِّيْ حَدِيْثًا وَهُوَ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِيْنِ.

"যে ব্যক্তি আমার নামে কোনো হাদীস বলবে এবং তার মনে সন্দেহ হবে যে, হাদীসটি মিথ্যা, সেও একজন মিথ্যাবাদী।"[৩] আর হাদীসের নামে মিথ্যা বলার সুনিশ্চিত শাস্তি জাহান্নাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

مَنْ يَقُلْ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ (مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ) فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ

"আমি যা বলিনি সে কথা যে আমার নামে বলবে (আমার নামে মিথ্যা বলবে) তার আবাসস্থল জাহান্নাম।"[৪] আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর কিতাব ও তাঁর রাসূলের (ﷺ) সুন্নাত আঁকড়ে থাকার তাওফীক দিন। আমীন।

---

[১] মুসলিম, আস-সহীহ ১/১২।
[২] মুসলিম, আস-সহীহ ১/১০।
[৩] মুসলিম, আস-সহীহ ১/৯।
[৪] বুখারী, আস-সহীহ ১/৫২।

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

أَمَّا بَعْدُ، فَيَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ

الأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ

وَقَالَ: يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يَقُلْ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ

بَارَكَ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ فِيْ الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ. وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ. أَقُولُ قَوْلِيْ هَذا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ، فَاسْتَغْفِرُوْهُ وَتُوْبُوْا إِلَيْهِ، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.

রবিউস সানী মাসের ২য় খুতবা: পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লী আলা রাসূলিহীল কারীম। আম্মা বাদ,

সম্মানিত উপস্থিতি, আজ ...... হিজরী সালের রবিউস সানী মাসের দ্বিতীয় জুমুআ। আজ আমরা পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা নিয়ে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ। কিন্তু তার আগে আমরা এ সপ্তাহের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসগুলির বিষয়ে সংক্ষেপ আলোকপাত করি।

হাযেরীন, আজ ইংরেজী ..... মাসের ..... তারিখ। এ সপ্তাহের দিবসগুলির মধ্যে রয়েছে ..... ।

সম্মানিত উপস্থিতি, ইসলাম পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার ধর্ম। মানুষের প্রাকৃতিক পবিত্রতা অর্জনের ক্ষেত্রেও ইসলামের সুস্পষ্ট বিধিবিধান রয়েছে। বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ গোঁফ কর্তন করা, দাড়ি বড় করা, মিসওয়াক করা বা দাঁত ও মুখ পরিষ্কার করা, নাকের মধ্যে পানি দিয়ে নাক পরিস্কার করা, নখ কর্তন করা, দেহের অঙ্গসন্ধিগুলি ধৌত করা, বগলের নিচের চুল পরিষ্কার করা, নাভির নিচের চুল মুণ্ডন করা, পানি ব্যবহার করে শৌচকার্য করা, কুলি করা, খাতনা করা ইত্যাদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতামূলক কর্মগুলিকে ফিত্‌রাত বা মানবীয় প্রকৃতি নির্দেশিত ইসলামের জরুরী কর্ম বলে উল্লেখ করেছেন। সামগ্রিকভাবে দেহ, পোশাক, বাড়িঘর সবকিছু পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র রাখতে বিভিন্নভাবে নির্দেশ দিয়েছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ। দেহে বা পোশাকে অপরিচ্ছন্ন কাউকে দেখলে আপত্তি করতেন। এক হাদীসে তিনি বলেন:

نَظِّفُوا أُرَاهُ قَالَ أَفْنِيَتَكُمْ وَلا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ، تَجْمَعُ الأَكْبَاءَ فِيْ دُوْرِهَا

"তোমরা তোমাদের বাড়ির আঙ্গিনা-সর্বদিক পরিচ্ছন্ন রাখবে, ইহুদিদের অনুকরণ করবে না, ইহুদিরা তাদের বাড়ির আঙ্গিনা পরিষ্কার করে না। তারা বাড়িতে আবর্জনা জমা করে রাখে।"[১]

হাযেরীন, দুঃখজনক হলো ইহূদীরা আজ পরিচ্ছন্ন আর মুমিনের বাড়িঘর আঙ্গিনা সবই নোংরা।

হাযেরীন, পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার অন্যতম দিক মল-মূত্র ত্যাগ। এ বিষয়ে ইসলামের বিশেষ নির্দেশনা রয়েছে। মল-মুত্র ত্যাগের অন্যতম আদব হলো, অন্যের দৃষ্টি থেকে সতর আবৃত রাখা। এজন্য সর্বদা চেষ্টা করতে হবে সেনেটারী পায়খানা বা স্বাস্থ্যসম্মতভাবে তৈরি 'পায়খানা'র মধ্যে মলমুত্র ত্যাগ করা। যদি একান্ত বাধ্য হয়ে ফাঁকা স্থানে ইসতিনজা করার প্রয়োজন পড়ে তবে অবশ্যই লোক চক্ষুর আড়ালে বসতে হবে। মলমুত্র পরিত্যাগের সময় নিজ সতর অন্যকে দেখতে দেওয়া কঠিন হারাম ও অভিশাপের কারণ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

وَمَنْ أَتَى الْغَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ

যে ব্যক্তি মলত্যাগের জন্য গমন করবে, সে যেন নিজেকে আড়াল করে।[২]

সাধারণ মানুষের অসুবিধা হতে পারে এরূপ স্থানে মলমুত্র ত্যাগ করা নিষেধ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

اتَّقُوا الْمَلاعِنَ الثَّلاثَ قِيلَ مَا الْمَلاعِنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَنْ يَقْعُدَ أَحَدُكُمْ فِي ظِلٍّ يُسْتَظَلُّ فِيهِ أَوْ فِي طَرِيقٍ أَوْ فِي نَقْعِ مَاءٍ (أو الْمَوَارِدِ)

তোমরা তিনটি অভিশাপের স্থান বর্জন করে চলবে। তখন বলা হলো: হে আল্লাহর রাসূল, অভিশাপের স্থানগুলি কি? তিনি বলেন: মানুষ ছায়াগ্রহণ করে এরূপ ছায়াময় স্থানে অথবা রাস্তায় অথবা জলাধার বা

---

[১] তিরমিযী, আস-সুনান ৫/১১১; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ১/২৮৬; আলবানী, জিলবাবুল মারআহ, পৃ: ১৯৭-১৯৮। হাদীসটির সনদ সহীহ।
[২] আবূ দাউদ, আস-সুনান ১/৯; বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা ১/৯৪।

জলাশয়ের মধ্যে বা পানির ঘাটে মলমূত্র ত্যাগ করতে করতে বসা।[১]

মলমূত্র ত্যাগের সময় কিবলার দিকে মুখ করা বা পিছন দেওয়া নিষিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلا تَسْتَدْبِرُوهَا

তোমরা মলত্যাগ বা মুত্রত্যাগের জন্য গমন করলে কিবলা সামনে রাখবে না বা পিছনে রাখবে না।[২]

হাযেরীন, সেনিটারী 'পায়খানা'-য় মল-মূত্র ত্যাগ করলে তা ভালভাবে পরিষ্কার করা প্রয়োজন। কোনো পাত্রে, পটিতে, প্যানের মধ্যে পেশাব জমা থাকলে সেই বাড়িতে ফিরিশতা প্রবেশ করেন না বলে হাদীস শরীফে বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

لاَ يُنْقَعُ بَوْلٌ فِيْ طَسْتٍ فِيْ الْبَيْتِ فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لاَ تَدْخُلُ بَيْتاً فِيْهِ بَوْلٌ مُنْتَقَعٌ

বাড়ির মধ্যে কোনো পাত্রে যেন পেশাব জমা না থাকে। কারণ যে বাড়িতে কোনো পেশাব জমে আছে সেই বাড়িতে ফিরিশতারা প্রবেশ করেন না।[৩]

দেহ ও পোশাক পেশাবের ছিটা থেকে পবিত্র রাখা মুমিনের অন্যতম দায়িত্ব। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

عَامَّةُ عَذَابِ الْقَبْرِ فِيْ الْبَوْلِ فَاسْتَنْزِهُوْا مِنَ الْبَوْلِ

"কবরের আযাব অধিকাংশ ক্ষেত্রে পেশাবের কারণেই হয়। কাজেই তোমরা তোমরা পেশাব থেকে পবিত্র থাকবে।"[৪]

ইবনু আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) দুটি কবরের পার্শ দিয়ে গমন করার সময় বলেন:

إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ

"এ দুই কবরবাসীকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। কোনো কঠিন বা বৃহৎ বিষয়ে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না। তাদের একজন পেশাব থেকে সাবধান থাকতো না। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি কুটনামি করত বা একজনের কথা আরেকজনকে বলে পারস্পরিক সম্প্রীতি নষ্ট করত।"[৫]

হাযেরীন, অধিকতর পবিত্রতা নিশ্চিত করতে মলমূত্র ত্যাগের পর পানি ব্যবহারের পূর্বে ঢিলা-কুলুখ বা টিস্যু ব্যবহার করে আগে ময়লা স্থান পরিস্কার করা প্রয়োজন। এছাড়া পেশাব শেষে উঠে দাঁড়ালেই যাতে দুই/এক ফোঁটা পেশাব কাপড়ে বা দেহে না পড়ে এজন্য পেশাবের পরে বসা অবস্থাতেই পুরুষাঙ্গ তিনবার টান দিয়ে এরপর পানি ঢেলে ধুয়ে ফেলা উচিত। দুর্বল সনদের একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْتُرْ ذَكَرَهُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ (وفي رواية زاد) فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُ

"তোমাদের কেউ পেশাব করলে সে যেন তার পুরুষাঙ্গ তিনবার টান দেয়। এভাবে তিনবার টান দেওয়াই তার জন্য যথেষ্ট বলে গণ্য হবে।"[৬]

হাযেরীন, মুমিনের উচিত সকল অবস্থায় আল্লাহর নেয়ামতের স্মরণ করা, দোয়া করা ও কৃতজ্ঞতা জানানো। 'পায়খানা' বা শৌচাগারে প্রবেশের পূর্বে ও সেখান থেকে বের হওয়ার পরে দোয়া পাঠের নিয়ম শিক্ষা দিয়েছেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)। মল-মুত্র ত্যাগের স্থানে প্রবেশের পূর্বে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন:

---

[১] আবূ দাউদ, আস-সুনান ১/৭; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ১/২০৪; আলবানী, সহীহুত তারগীব ১/৩৫। হাদীসটি হাসান।

[২] বুখারী, আস-সহীহ ১/১৫৪; মুসলিম, আস-সহীহ ১/২২৪।

[৩] হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ১/২০৪। হাসীসটির সনদ হাসান।

[৪] হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ১/২০৭; আলবানী, সহীহুত তারগীব ১/৩৮। হাদীসটি সহীহ।

[৫] বুখারী, আস-সহীহ ১/৮৮; মুসলিম, আস-সহীহ ১/২৪০।

[৬] ইবনু মাজাহ, আস-সুনান ১/১১৮; আহমদ, আল-মুসনাদ ৪/৩৪৭। বিস্তারিত দেখুন: এহইয়াউস সুনান, ৪৫১-৪৫৫ পৃষ্ঠা।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

হে আল্লাহ, আমি অপবিত্র কর্ম বা পুরুষ ও নারী অপবিত্রদের (শয়তানদের) থেকে আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি।[১] অন্য হাদীসে আয়িশা (রা) বলেন,

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ قَالَ غُفْرَانَكَ

"রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন শৌচাগার বা মলমুত্রত্যাগের স্থান থেকে বের হতে তখন বলতেন: "গুফরা-নাকা", অর্থাৎ "আপনার ক্ষমা প্রার্থনা করছি"।[২]

হাযেরীন, শৌচাগারে প্রবেশের সময় জুতা সেন্ডেল বা পাদুকা পায়ে রাখা পরিচ্ছন্নতার জন্য প্রয়োজনীয়। এছাড়া মাথা আবৃত রাখাও আদব। যয়ীফ সনদে বর্ণিত একটি হাদীসে রয়েছে:

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْمِرْفَقَ لَبِسَ حِذَاءَهُ وَغَطَّى رَأْسَهُ

রাসূলুল্লাহ ﷺ শৌচাগারে প্রবেশ করতে চাইলে তাঁর জুতা পরিধান করতেন এবং মাথা আবৃত করতেন।[৩]

সহীহ সনদে আবু বাকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে গেলে এভাবে মাথা আবৃত করে যেতেন।[৪]

হাযেরীন, ইসলামী পবিত্রতার অন্যতম বিষয় ওযূ ও গোসল। কাপড়ে, দেহে বা কোনো স্থানে ময়লা বা নাপাকি লাগলে তা পানির মাধ্যমে ধুয়ে পাক করতে হয়। আর মল-মুত্র ত্যাগ, বায়ু ত্যাগ, ঘুম বা রক্তপাত ইত্যাদি মাধ্যমে ওযু নষ্ট হলে ওযুর মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করতে হয়। এইরূপ পবিত্রতা ছাড়া কোনো সালাত বা নামায আল্লাহ কবুল করেন না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

لا تُقْبَلُ صَلاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ

অবৈধভাবে উপার্জিত সম্পদের দান কবুল হয় না এবং ওযু ছাড়া সালাত কবুল হয় না।[৫]

অন্য হাদীসে তিনি বলেন:

لا تُقْبَلُ صَلاةُ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

"যখন তোমাদের কেউ বায়ু ত্যাগ ইত্যাদির মাধ্যমে ওযু নষ্ট করে ফেলে তখন পুনরায় ওযু না করা পর্যন্ত তার সালাত কবুল করা হবে না।"[৬]

হাযেরীন, ওযূ শুধু নামাযের শর্তই নয়। ওযূ নিজেই একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। হাদীসে ওযূ গোসল ও পাক পবিত্র হওয়াকে ঈমানের অর্ধাংশ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمَانِ.

"পবিত্রতা ঈমানের অর্ধাংশ।"[৭]

---

[১] বুখারী, আস-সহীহ ১/৬৬; মুসলিম, আস-সহীহ ১/২৮৩-২৮৪।

[২] তিরমিযী, আস-সুনান ১/১২; ইবনু হিব্বান, আস-সহীহ ৪/২৯১। হাদীসটি হাসান।

[৩] ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা ১/৩৮৩; বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা ১/৯৬; ইবনু হাজার আসকালানী, তাকরীবুত তাহযীব, পৃ. ১৫১; আব্দুর রাউফ মুনাবী, ফাইযুল কাদীর ৫/১২৮; আলবানী, যায়ীফুল জামি', পৃ. ৬৩৭।

[৪] ইবনুল মুবারাক, আয-যুহদ, পৃ: ১০৭; আবূ বকর কুরাশী, মাকারিমুল আখলাক, পৃ: ৪০; বাইহাকী, শু'আবুল ঈমান ৬/১৪২; আবূ নুআইম ইসপাহানী, হিলইয়াতুল আউলিয়া ১/৩৪; দারাকুতনী, আল-ইলাল ১/১৮৬।

[৫] বুখারী, আস-সহীহ ২/৫১১; মুসলিম, আস-সহীহ ১/২০৪।

[৬] বুখারী, আস-সহীহ ৬/২৫৫১; মুসলিম, আস-সহীহ ১/২০৪।

[৭] মুসলিম, আস-সহীহ ১/২০৩।

এই ইবাদতের জন্য মহান পুরস্কার ও বিশেষ সাওয়াব রয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ

"যে ব্যক্তি ওযু করবে এবং সুন্দররূপে ওযু করবে তার পাপ-অন্যায়গুলি তার দেহ থেকে বেরিয়ে যাবে, এমনকি তার নখগুলির নিচে থেকেও বেরিয়ে যাবে।"[১] অন্য হাদীসে তিনি বলেন;

أَلا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلاةِ بَعْدَ الصَّلاةِ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ

"যদ্বারা আল্লাহ পাপরাশী ক্ষমা করেন এবং পুন্য বৃদ্ধি করেন তা কি তোমাদেরকে জানিয়ে দেব না? সাহাবীগণ বলেন: হে আল্লাহর রাসূল, অবশ্যই জানাবেন। তিনি বলেন: কষ্ট সত্ত্বেও পূর্ণরূপে ওযু করা, মসজিদের দিকে বেশি বেশি পদক্ষেপ এবং এক সালাতের পরে অন্য সালাতের জন্য অপেক্ষা করা। আর এটিই জিহাদের প্রহরা।"[২] অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

إِذَا تَطَهَّرَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ يَرْعَى الصَّلاةَ كَتَبَ لَهُ كَاتِبُهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الْمَسْجِدِ عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَالْقَاعِدُ يَرْعَى الصَّلاةَ كَالْقَانِتِ وَيُكْتَبُ مِنَ الْمُصَلِّينَ مِنْ حِينِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِ

"যখন কোনো মানুষ পবিত্র হয়ে বা ওযু করে মসজিদে আগমন করে তখন তার আমল লেখক মসজিদের দিকে তার প্রতি পদক্ষেপের জন্য দশটি সাওয়াব লিখেন। যে ব্যক্তি মসজিদে বলে সালাতের অপেক্ষা করে তার সালাতে রত থাকার সাওয়াব হয়। বাড়ি থেকে বের হয়ে বাড়ি ফেরা পর্যন্ত পুরো সময় তার জন্য সালাত আদায়ের সাওয়াব লেখা হয়।"[৩]

হাযেরীন, ওযুর নিয়ম আমরা মোটামুটি সবাই জানি। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা নিস্প্রয়োজন। তবে সতর্কতার সাথে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, ওযূর প্রতিটি অঙ্গ ভালভাবে পানি দ্বারা ধোয়া হয়েছে। যদি কোনো অঙ্গের কোনো স্থান শুকনো থাকে তবে ওযূ হবে না, ফলে নামাযও হবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ একব্যক্তিকে দেখেন যে, সে পায়ের গোড়ালী দুইটি ধৌত করে নি। তখন তিনি বলেন:

وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ

"গোড়ালীগুলির জন্য জাহান্নামের শাস্তির ভয়াবহ পরিণতি অপেক্ষা করছে।"[৪]

হাযেরীন, ওযূর অঙ্গগুলি ভালভাবে ধোয়ার বিষয়ে সতর্কতার অর্থ এই নয় যে, আমরা পানির অপচয় করব। পানির অপচয় করা অথবা তিনবারের বেশি কোনো অঙ্গ ধোয়া আপত্তিকর। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) অল্প পানি দিয়েই পূর্ণরূপে ওযূ করতেন। আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ

"রাসূলুল্লাহ ﷺ ওযু করতেন এক মুদ্দ (প্রায় ১ লিটার) পানি দিয়ে এবং গোসল করতেন এক সা' (প্রায় ৪ লিটার) থেকে পাঁচ মুদ্দ (প্রায় ৫ লিটার) পানি দিয়ে।"[৫]

---

[১] মুসলিম, আস-সহীহ ১/২১৬।
[২] মুসলিম, আস-সহীহ ১/২১৯।
[৩] আহমদ, আল-মুসনাদ ৪/১৫৭; আলবানী, সহীহুত তারগীব ১/৭২। হাদীসটি সহীহ।
[৪] বুখারী, আস-সহীহ ১/৩৩, ৪৮, ৭২; মুসলিম, আস-সহীহ ১/২১৩-২১৪।
[৫] মুসলিম, আস-সহীহ ১/২৫৮।

হাযেরীন, ইসলামে সব সময় মেসওয়াক ব্যবহার করতে এবং দাঁত ও মুখের অভ্যন্তর পরিষ্কার রাখতে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। বিশেষত ওযূর সময়ে দাত ও মুখ পরিষ্কার করতে বিশেষভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ

দাঁত পরিস্কার করা মুখের পবিত্রতা আনয়ন করে এবং প্রতিপালকের সন্তুষ্টি আনয়ন করে।[১]

لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ (وفي رواية: عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ)

"যদি আমি আমার উম্মতের জন্য কষ্টসাধ্য হবে বলে মনে না করতাম তাহলে তাদেরকে প্রত্যেক ওযুর সাথে মিসওয়াক করার জন্য নির্দেশ প্রদান করতাম।" অন্য বর্ণনায় আমি তাদেরকে প্রত্যেক সালাতের সময় ওযুর সাথে মেসওয়াকের নির্দেশ প্রদান করতাম।"[২]

হাযেরীন, চেষ্টা করতে হবে, নিম বা অনুরূপ গাছের কাঁচা ডালের মেসওয়াক ব্যবহার করা। না হলে টুথ ব্রাশ ও পেস্ট ব্যবহার করতে হবে। মূল ইবাদত হলো মুখ পরিষ্কার করা ও দুর্গন্ধ দূর করা।

হাযেরীন, হাদীস শরীফে ওযূর পরে দোয়া পাঠের উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺবলেন:

مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ أَوْ فَيُسْبِغُ الْوَضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ إِلا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ (يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ)

"যদি কেউ পরিপূর্ণরূপে ওযু করে এবং এরপর বলে: আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) তাঁর দাস ও প্রেরিত দূত, তাহলে তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজাই খুলে দেওয়া হবে। (সে যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা জান্নাতে প্রবেশ করবে।)"[৩]

প্রত্যেক ওযূর পরে সে ওযূ দ্বারা কিছু নফল সালাত আদায় করা খুবই ভাল। আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺএকদিন ফজরের সালাতের সময় বলেন: বেলাল, তুমি ইসলাম গ্রহণের পরে তোমার মতে সবচেয়ে বড় নেক আমল কোন্‌টি করেছ, যে আমলের জন্য সবচেয়ে বেশি সাওয়াব তুমি আশা কর; কারণ আমি গত রাতে জান্নাতে আমার আগে আগে তোমার পাদুকার শব্দ শুনেছি। তখন বেলাল বলেন:

مَا عَمِلْتُ عَمَلا فِي الإِسْلامِ أَرْجَى عِنْدِي مَنْفَعَةً مِنْ أَنِّي لا أَتَطَهَّرُ طُهُورًا تَامًّا فِي سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ وَلا نَهَارٍ إِلا صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُورِ مَا كَتَبَ اللَّهُ لِي أَنْ أُصَلِّيَ

"আমি ইসলামে যত কর্ম করেছি সেগুলির মধ্যে যে কর্মটির ফায়দা ও সাওয়াব বেশি আশা করি তা হলো, আমি দিনে বা রাতে যখনই ওযূ করি তখনই সেই ওযূতে আমাকে আল্লাহ যতটুকু তাওফীক প্রদান করেন তদনুসারে কিছু নফল সালাত আদায় করি।"[৪] অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

مَنْ تَوَضَّأَ مِثْلَ هَذَا الْوُضُوءِ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ قَالَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تَغْتَرُّوا .

যে ব্যক্তি আমার ওযুর মত ওযূ করবে, এরপর মসজিদে গমন করে সেখানে দুই রাক'আত সালাত

---

[১] ইবনু মাজাহ, আস-সুনান ১/১০৬; ইবনু খুযাইমা, আস-সহীহ ১/৭০; আলবানী, সহীহুত তারগীব ১/৫০। হাদীসটি সহীহ।
[২] মুসলিম, আস-সহীহ ১/২২০; ইবনু খুযাইমা, আস-সহীহ ১/৭৩; ইবনু হিব্বান, আস-সহীহ ৪/৩৯৯।
[৩] মুসলিম, আস-সহীহ ১/২০৯।
[৪] বুখারী, আস-সহীহ ১/৩৮৬, ৬/২৭৩৯; মুসলিম, আস-সহীহ ৪/১৯১০।

আদায় করবে, অতঃপর মসজিদে বসবে, তার পূর্ববর্তী পাপ ক্ষমা করা হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন: তবে তোমরা ধোঁকায় পড়ো না। (অর্থাৎ ক্ষমার কথা শুনে ইচ্ছাকৃতভাবে পাপে লিপ্ত হবে না। মুমিন সর্বদা পাপমুক্ত থাকার চেষ্টা করবে। তা সত্ত্বেও ছোটখাট সাধারণ পাপ-অন্যায় হয়ে যাবে, যেগুলি এসকল কর্মের মাধ্যমে আল্লাহ ক্ষমা করবেন।)[১]

হাযেরীন, ওযূর মূল উদ্দেশ্য সালাত আদায়, কুরআন তিলাওয়াত ইত্যাদি। এ ছাড়াও সর্বদা ওযূ অবস্থায় থাকা ভাল। বিশেষত ঘুমানোর আগে অযূ করে অযূ অবস্থায় ঘুমানো উত্তম। বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ওযূ অবস্থায় ঘুমানোর নির্দেশ দিয়েছেন। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَبِيتُ عَلَى طُهْرٍ ثُمَّ يَتَعَارُّ مِنَ اللَّيْلِ فَيَذْكُرُ اللهَ وَيَسْأَلُ اللهَ خَيْراً مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ إِلاَّ آتَاهُ اللهُ إِيَّاهُ، وفي رواية: مَنْ بَاتَ طَاهِراً عَلَى ذِكْرِ اللهِ

"যদি কোনো মুসলিম ওযূ অবস্থায় (অন্য বর্ণনায়: ওযূ অবস্থায় আল্লাহর যিক্‌র করতে করতে) ঘুমিয়ে পড়ে, এরপর রাত্রে কোনো সময়ে তার ঘুম ভেঙ্গে যায় এবং সে সে সময়ে আল্লাহর যিকর করে এবং আল্লাহর কাছে কিছু চায় তবে আল্লাহ তাকে তা প্রদান করবেন।[২] অন্য হাদীসে তিনি বলেন,

طَهِّرُوا هَذِهِ الأَجْسَادَ طَهَّرَكُمُ اللهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَبِيتُ طَاهِراً إِلاَّ بَاتَ مَعَهُ فِيْ شِعَارِهِ مَلَكٌ لاَ يَنْقَلِبُ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ إِلاَّ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِكَ فَإِنَّهُ بَاتَ طَاهِراً

"তোমরা এই দেহগুলিকে পবিত্র রাখবে। যদি কেউ ওযূ অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়ে তবে তার সাথে তার বিছানায় একজন ফিরিশতা শুয়ে থাকবেন। রাত্রে যখনই যে নড়াচড়া করবে তখনই ঐ ফিরিশতা আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন, হে আল্লাহ, আপনার বান্দা ওযূ অবস্থায় শুয়েছেন, আপনি তাকে ক্ষমা করে দিন।[৩]

হযরত বারা ইবনুল আযিব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেন, "যখন তুমি বিছানায় যাবে তখন সালাতের ওযুর মতো ওযু করবে। এরপর ডান কাতে শুয়ে বলবে :

اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لا مَلْجَا وَلا مَنْجَا مِنْكَ إِلا إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ

"হে আল্লাহ, আমি সমর্পণ করলাম আমাকে আপনার নিকট, দায়িত্বার্পণ করলাম আপনাকে আমার যাবতীয় কর্মের, আমার পৃষ্ঠকে আপনার আশ্রয়ে সমর্পিত করলাম, আপনার প্রতি আশা ও ভয়ের সাথে। আপনার নিকট থেকে আপনি ছাড়া কোনো আশ্রয়স্থল নেই ও কোনো মুক্তির স্থান নেই। আমি ঈমান এনেছি আপনি যে কিতাব নাযিল করেছেন তার উপর এবং আপনি যে নবী (ﷺ) প্রেরণ করেছেন তার উপর।"

এই বাক্যগুলি তোমার শেষ কথা হবে (এর পরে আর কোনো কথাবার্তা বলবে না)। যে ব্যক্তি এই দু'আ পাঠের পরে সেই রাত্রিতে মৃত্যুবরণ করবে সেই ব্যক্তি ফিতরাতের উপরে (নিষ্পাপভাবে) মৃত্যু বরণ করবে। আর যদি বেঁচে থাকে তাহলে কল্যাণময় দিবস শুরু করবে।"[৪]

মহান আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক প্রদান করুন। আমীন!!

---

[১] বুখারী, আস-সহীহ ৫/২৩৬৩।

[২] হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ১/২২৩। হাদীসটি হাসান।

[৩] হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ১/২২৬, ১০/১২৮। হাদীসটি হাসান।

[৪] সহীহ বুখারী ১/৯৭, নং ২৪৪, ৫/২৩২৬, নং ৫৯৫২, ৫/২৩২৭, নং ৫৯৫৬, সহীহ মুসলিম ৪/২০৮২, নং ২৭১০।

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

أَمَّا بَعْدُ فَيَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ

وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا تُقْبَلُ صَلاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ

بَارَكَ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ فِيْ الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ. وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ. أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ، فَاسْتَغْفِرُوْهُ وَتُوْبُوْا إِلَيْهِ، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.

রবিউস সানী মাসের ৩য় খুতবা: সালাতের গুরুত্ব ও ফযীলত

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লী আলা রাসূলিহিল কারীম। আম্মা বাদ,

সম্মানিত উপস্থিতি, আজ ...... হিজরী সালের রবিউস সানী মাসের ৩য় জুমুআ। আজ আমরা সালাতের গুরুত্ব ও ফযীলত নিয়ে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ। কিন্তু তার আগে আমরা এ সপ্তাহের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসগুলির বিষয়ে সংক্ষেপ আলোকপাত করি।

হাযেরীন, আজ ইংরেজী ..... মাসের ..... তারিখ। এ সপ্তাহের দিবসগুলির মধ্যে রয়েছে ..... ।

হাযেরীন, ঈমানের পরে মুমিন নর ও নারীর উপরে সবচেয়ে বড় ফরয ইবাদত হলো, পাঁচ ওয়াক্ত ফরয সালাত সময়মত আদায় করা। আরবী ভাষায় সালাত অর্থ প্রার্থনা। ইসলামের পরিভাষায় সালাত অর্থ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর শেখানো নির্ধারিত পদ্ধতিতে রুকু সাজদার মাধ্যমে আল্লাহর যিক্‌র ও দোয়া করা। কুরআন ও হাদীসে এর চেয়ে বেশি গুরুত্ব আর কোনো ইবাদতকে দেওয়া হয় নি। কুরআনে প্রায় ৮০ স্থানে আল্লাহ সালাতের নির্দেশ দিয়েছেন। অসংখ্য হাদীসে সালাতের গুরুত্ব বোঝান হয়েছে।

হাযেরীন, আমরা ইতোপূর্বে তাওহীদের আলোচনায় দেখেছি যে, সালাত বা নামায হলো ইসলামের দ্বিতীয় রুকন। সালাত এমন একটি ফরয ইবাদত যার কোনো বিকল্প নেই। ইসলামে সকল বিধান সহজ করে দেওয়া হয়েছে। একজন অসুস্থ মানুষ রোযা কাযা করতে পারেন এবং পরে রাখতে পারেন। একেবারে অক্ষম মানুষ ফিদইয়া- কাফ্ফারা দিতে পারেন। কিন্তু সালাতের ক্ষেত্রে সেই বিধান নেই। সালাতকে অন্যভাবে সহজ করা হয়েছে। তা হলো মুমিন যেভাবে পারেন তা আদায় করবেন। সম্ভব হলে পূর্ণ নিয়মানুসারে। না হলে দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে, দৌড়াতে দৌড়াতে, যানবাহনে আরোহণ রত অবস্থায়, পোশাক পরিধান করে, উলঙ্গ হয়ে... যে ভাবে সম্ভব মুমিন তাঁর প্রভুর দরবারে হাযিরা দেবেন। কোনো সূরা, কিরাআত বা দোয়া না জানা থাকলে শুধুমাত্র আল্লাহু আকবার বলে বলে বা তাসবীহ-তাহলীল-এর মাধ্যমে সালাত আদায় করতে হবে। কোনো অবস্থাতেই সময় মত হাযিরা দেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। একজন মুমিনের যতক্ষণ হুশ রয়েছে, ততক্ষণ তার দায়িত্ব হলো সময় মত সালাত আদায় করা। আল্লাহ বলেন:

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

"তোমরা সালাতের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষত মধ্যবর্তী সালাতের, এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে তোমরা বিনীতভাবে দাঁড়াবে। যদি তোমরা আশংকিত থাক তবে পদচারী অথবা আরোহী অবস্থায়, আর যখন নিরাপদ বোধ করবে তখন আল্লাহর যিক্‌র কর (অর্থাৎ সালাত আদায় কর) যেভাবে তিনি তোমাদের শিক্ষা দিয়েছেন, যা তোমরা জানতে না।"[১]

হাযেরীন, সালাতকে আমরা দায়িত্ব মনে করি। আসলে সালাত দায়িত্ব নয়, সুযোগ। আল্লাহ আমাদের সুযোগ দিয়েছেন, দিনের মধ্যে পাঁচবার তাঁর সাথে কথা বলে, মনের সকল আবেগ তাঁকে জানিয়ে, তাঁর রহমত, বরকত লাভ করে আমরা ধন্য হব। সালাতই সকল সফলতার চাবিকাঠি। আল্লাহ বলেন:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ

"মুমিনগণ সফলকাম হয়েছেন, যারা অত্যন্ত বিনয় ও মনোযোগিতার সাথে সালাত আদায় করেন।"[২]

---

[১] সূরা বাকারা: ২৩৮-২৩৯ আয়াত।

[২] সূরা মুমিনূন: ১-২ আয়াত।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى

"সেই ব্যক্তিই সাফল্য অর্জন করতে পারে, যে নিজেকে পবিত্র করে এবং নিজ প্রভুর নাম স্মরণ করে সালাত আদায় করে।"[১]

হাযেরীন, সালাত হলো, মানুষের পরিপূর্ণ মানুষ হওয়ার একমাত্র পথ। সালাতই মানুষকে পরিশীলিত করে এবং মানবতার পূর্ণতার শিখরে তুলে দেয়। সালাতের মাধ্যমে মুমিন আল্লাহর স্মরণ ও আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে মানসিক দৃঢ়তা ও ভারসাম্য অর্জন করেন এবং মানবীয় দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারেন। কুরআন কারীমে এরশাদ করা হয়েছে:

إِنَّ الإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ دَائِمُونَ

"নিশ্চয় মানুষ সৃষ্টিগতভাবেই অস্থিরচিত্ত ও ধৈর্যহারা। বিপদে পড়লে সে অধৈর্য ও হতাশ হয়ে পড়ে। আর কল্যাণ বা সম্পদ লাভ করলে সে কৃপণ হয়ে পড়ে। একমাত্র ব্যতিক্রম সালাত আদায়কারীগণ (তারা এ মানবীয় দুর্বলতার উর্ধ্বে উঠতে পারেন।) যারা সর্বদা (নিয়মিতভাবে) সালাত আদায় করেন।"[২]

হাযেরীন, সালাত গোনাহ মার্জনার অন্যতম উপায়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهَرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا مَا تَقُولُ ذَلِكَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ قَالُوا لا يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا قَالَ فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا

"যদি তোমাদের কারো বাড়ির দরজায় একটি নদী থাকে, যেখানে সে প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে, তবে তার দেহে কি ধুলি ময়লা কিছু অবশিষ্ট থাকবে? সাহাবীগণ বলেন: না। তার ধুলিময়লা কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। তিনি বলেন: পাঁচ ওয়াক্ত সালাতও অনুরূপ। এগুলির মাধ্যমে আল্লাহ পাপরাশি ক্ষমা করেন।"[৩]

হাযেরীন, নামায বা সালাত হলো মুমিন ও কাফিরের মধ্যে মাপকাঠি। সালাত ত্যাগ করলে মানুষ কাফিরদের দলভুক্ত হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلاَةِ

"একজন মানুষ ও কুফরী-শিরকের মধ্যে রয়েছে নামায ত্যাগ করা।"[৪]

অন্য হাদীসে তিনি বলেন:

مَنْ تَرَكَ الصَّلاَةَ فَقَدْ كَفَرَ

"যে ব্যক্তি নামায ছেড়ে দিল সে কাফির হয়ে গেল।"[৫]

কুরআন ও হাদীসের শিক্ষার আলোকে একথা নিশ্চিত যে, নামায মুসলিমের মূল পরিচয়। নামায ছাড়া মুসলিমের অস্তিত্ব কল্পনাতীত। নামায পরিত্যাগকারী কখনোই মুসলিম বলে গণ্য হতে পারেন না।

---

[১] সূরা আ'লা: ১৪-১৫ আয়াত।
[২] সূরা মাআরিজ: ১৯-২২ আয়াত।
[৩] বুখারী, আস-সহীহ ১/১৯৭; মুসলিম, আস-সহীহ ১/৪৬২।
[৪] মুসলিম, আস-সহীহ ১/৮৮।
[৫] ইবনু হিব্বান, আস-সহীহ ৪/৩২৩; আলবানী, সহীহুত তারগীব ১/১৩৭, ১৩৯। হাদীসটি হাসান।

হাযেরীন, সালাত কাযা করাকে "কুফরী" গোনাহ বলে উল্লেখ করা হয়েছে হাদীসে। এজন্য এক ওয়াক্ত সালাত ত্যাগ করা দিনরাত শূকরের গোশত ভক্ষণ করা, মদপান করা, রক্তপান করা ইত্যাদি সকল ভয়ঙ্কর গোনাহের চেয়েও বেশী গোনাহ। যে ব্যক্তি মনে করেন যে, নামায না পড়লেও ভাল মুসলমান থাকা যায় সে ব্যক্তি সন্দেহাতীতভাবে কাফির; কারণ তিনি নামাযের ফরযিয়্যত মানেন না। আর যিনি সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করেন যে, নামায কাযা করলে কঠিনতম গোনাহ হয়, এরপরও ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো নামায পরিত্যাগ করেন তাকে মুসলমান বলে গণ্য করা যাবে কিনা সে বিষয়ে ফকীহদের মতভেদ আছে। সাহাবী-তাবেয়ীগণের যুগে এই প্রকারের মানুষকেও কাফির বা অমুসলিম বলে গণ্য করা হত। সহীহ হাদীসে তাবিয়ী আব্দুল্লাহ ইবনু শাকীক বলেন

كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ لا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلاةِ

"মুহাম্মাদ (ﷺ)-সাহাবীগণ সালাত ছাড়া অন্য কোনো কর্ম ত্যাগ করাকে কুফ্‌রী মনে করতেন না।"[১]

চার ইমামের মধ্যে ইমাম আহমদ এ মত পোষণ করেন। এ মতে মুসলিম কোন পাপকে পাপ জেনে পাপে লিপ্ত হলে কাফির বলে গণ্য হবে না। একমাত্র ব্যতিক্রম নামায ত্যাগ করা। যদি কেউ নামায ত্যাগ করাকে কঠিনতম পাপ জেনেও এক ওয়াক্ত ফরয নামায ইচ্ছা পূর্বক ত্যাগ করে তবে সে মুরতাদ বলে গণ্য হবেন। ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফিয়ী প্রমুখ ইমাম বলেন যে, এই দ্বিতীয় ব্যক্তিকে সরাসরি কাফির বলা যাবে না, তবে তাকে নামায ত্যাগ্যের শাস্তি স্বরূপ জেল ও মৃত্যুদণ্ড প্রদান করতে হবে।

ফরয সালাত কাযা করার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

لاَ تَتْرُكْ صَلاَةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّداً فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّداً فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ (ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ)

"ইচ্ছাপূর্বক এক ওয়াক্ত ফরয সালাতও পরিত্যাগ করবে না। কারণ যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক এক ওয়াক্ত ফরয সালাত পরিত্যাগ করবে, সে আল্লাহর যিম্মা ও তাঁর রাসূলের (ﷺ) যিম্মা থেকে বহিস্কৃত হবে।"[২]

হাযেরীন, এর চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কী হতে পারে? নাম কাটা যাওয়ার পরে তো আর উম্মাত হিসেবে কোনো দাবিই থাকে না। ক্ষমা বা শাফাআত লাভের আশাও থাকে না। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আরো বলেন:

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلاَتُهُ فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ فَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلَ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ

"কেয়ামতের দিন বান্দাকে সর্বপ্রথম তার সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। সালাত টিকলে তার অন্য সকল আমল টিকে যাবে। আর সালাতই যদি নষ্ট হয় তবে সে নিরাশ ও ধ্বংসগ্রস্ত হবে। যদি তার ফরয থেকে কিছু কম পড়ে তবে আল্লাহ বলবেন, দেখ আমার বান্দার কোনো নফল আছে কিনা, তখন তার নফল সালাত দিয়ে ফরযে ত্রুটিবিচ্যুতি পূরণ করা হবে। অতপর তার সকল আমল এরূপ হবে।"[৩]

হাযেরীন, পাঁচ ওয়াক্ত ফরয সালাত অবশ্যই মসজিদে যেয়ে জামাতে আদায় করতে হবে। হানাফী মাযহাবের পুরুষে জন্য পাঁচ ওয়াক্ত ফরয সালাত জামাতের সাথে আদায় করা ওয়াজিব। হানাফী মাযহাবের প্রাচীন গ্রন্থে জামাতে নামাযকে ওয়াজিবই লিখা হয়েছে। পরবর্তী কোনো কোনো গ্রন্থে সুন্নাত লিখা হলেও

[১] তিরমিযী, আস-সুনান ৫/১৪; আলবানী, সহীহুত তারগীব ১/১৩৭।
[২] হাকিম, আল-মুসতাদরাক ৪/৪৪; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ১/২৯৫; আলবানী, সহীহুত তারগীব ১/১৩৮-১৩৯। হাদীসটি সহীহ।
[৩] তিরমিযী, আস-সুনান ২/২৬৯; আলবানী, সহীহুত তারগীব ১/৯০।

সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তা ওয়াজিবের পর্যায়ের। অন্যান্য মাযহাবে জামাতে নামায ফরয হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। মুসলিম উম্মাহর সকল ইমাম ও ফকীহ একমত যে, ওযর ছাড়া যদি কেউ জামাতে সালাত আদায় না করে একাকি সালাত আদায় করেন তবে তিনি গোনাহগার হবেন। তবে তার সালাত জায়েয হবে কিনা বা আদায় হবে কিনা সে বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। হাদীস শরীফ থেকে বুঝা যায় যে জামাতে সালাত আদায় করা অত্যন্ত বড় নেক কর্ম। পক্ষান্তরে জামাত পরিত্যাগ করে একাকি সালাত আদায় করা অত্যন্ত কঠিন কবীরা গোনাহ। যে গোনাহের জন্য স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ বাড়িঘর পুড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং সাহাবীগণ কখনোই কঠিন ওযর ছাড়া জামা'আত ত্যাগ করেননি। জামা'আতে অনুপস্থিত থাকাকে তাঁরা নিশ্চিত মুনাফিকের পরিচয় বলে জানতেন। ইবনু মাসঊদ (রা) বলেন,

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ ﷺ سُنَنَ الْهُدَى وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ إِلاَّ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا حَسَنَةً وَيَرْفَعُهُ بِهَا دَرَجَةً وَيَحُطُّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلاَّ مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ.

"যার পছন্দ হয় যে, সে আগামীকাল মুসলিম হয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে সে যেন এ সকল সালাতগুলি সদাসর্বদা নিয়মিত সেখানে আদায় করে যেখানে এগুলির জন্য আযান দেওয়া হয়। কারণ আল্লাহ তোমাদের নবীর (ﷺ) জন্য কিছু হেদায়েতের সুন্নাতের (রীতির) বিধান প্রদান করেছেন। আর এ সকল সালাতগুলি নিয়মিত জামাতে আদায় করা হেদায়েতের সুন্নাতের অন্যতম। যদি তোমরা তোমাদের বাড়িতে সালাত আদায় কর, যেরূপ এই পশ্চাতপদ ব্যক্তি নিজ বাড়িতে সালাত আদায় করে, তাহলে তোমরা তোমাদের নবীর (ﷺ) সুন্নাত পরিত্যাগ করবে। আর যদি তোমরা তোমাদের নবী ﷺ-এর সুন্নাত পরিত্যাগ কর তাহলে তোমরা বিভ্রান্ত হয়ে যাবে। যখনই কোনো ব্যক্তি সুন্দর রূপে ওযু বা গোসল করে পবিত্র হয় এবং এরপর সে এ সকল মসজিদের যে কোনো একটি মসজিদের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে তখন আল্লাহ তার ফেলা প্রতিটি পদক্ষেপের বিনিময়ে তার জন্য একটি পুণ্য লিখেন, তাকে একটি মর্যাদা বাড়িয়ে দেন এবং তার একটি পাপ ক্ষমা করে দেন। আমরা আমাদেরকে দেখেছি যে, শুধুমাত্র যে মুনাফিকের মুনাফিকী সুপরিচিত সে ছাড়া কেউই জামা'আত থেকে পিছে পড়ত না। অনেক মানুষকে দুই ব্যক্তির কাঁধের উপর ভর করে টেনে এনে সালাতের কাতারে দাঁড় করানো হতো।[১]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ (فَلَمْ يُجِبْ) فَلا صَلاةَ لَهُ إِلاَّ مِنْ عُذْرٍ

"যে ব্যক্তি নামাযের আহ্বান (আযান) শুনতে পেল কিন্তু আহ্বানে সাড়া দিয়ে জামাতে এলো না, তার নামাযই হবে না। তবে যদি ওযর (ভয় বা অসুস্থতা) থাকে তাহলে হতে পারে।"[২]

---

[১] মুসলিম, আস-সহীহ ১/৪৫৩।
[২] তিরমিযী, আস-সুনান ১/৪২২; ইবনু মাজাহ, আস-সুনান ১/২৬০; আলবানী, সহীহুত তারগীব ১/১০২। হাদীসটি সহীহ।

হাযেরীন, জামাতে নামায ত্যাগ করা যেমন ভয়ঙ্কর অপরাধ ও গোনাহের কাজ, তেমনি জামাতে নামায আদায় অপরিমেয় সাওয়াব ও বরকতের কাজ। ইবনু উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

একাকী সালাতের চেয়ে জামা'আতে সালাতের মর্যাদা ২৭ গুণ বেশি।[১]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি ফজরের সালাত জামাতে আদায় করবে সে আল্লাহর যিম্মায় থাকবে। ইশার সালাত জামাতে আদায় করলে অর্ধেক রাত তাহাজ্জুদের সাওয়াব হবে। আর ফজরের সালাত জামাতে আদায় করলে পুরো রাত তাহাজ্জুদের সাওয়াব হবে। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

مَنْ صَلَّى لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الأُولَى كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَتَانِ بَرَاءَةٌ مِـنَ النَّـارِ وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ

"যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য চল্লিশ দিন প্রথম তাকবীরসহ পরিপূর্ণ নামায জামাতে আদায় করবে, তার জন্য আল্লাহ দুইটি মুক্তি লিখে দিবেন: জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও মুনাফিকী থেকে মুক্তি।"[২]

হাযেরীন, ফরয সালাত যেমনশ্রেষ্ঠতম ইবাদত, তেমনি নফল সালাতও সর্বশ্রেষ্ঠ নফল ইবাদত এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের অন্যতম উপায়। আমরা অনেক সময় 'নফল' নামাযে অবহেলা করি। নফলের গুরুত্বও প্রদান করতে চাই না। ফরয বাদ দিয়ে শুধু নফল ইবাদত করা বকধার্মিকতা। আবার নফল বাদ দিয়ে শুধু ফরয ইবাদত পালন করাও দীন সম্পর্কে বড় অবহেলা। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের জীবনে আমরা দেখতে পাই সকল প্রকার নফল ইবাদতের প্রতি সীমাহীন গুরুত্ব ও আগ্রহ। নফল সালাত, নফল সিয়াম, নফল তিলাওয়াত, নফল যিক্‌র, নফল দান ইত্যাদির জন্য তাঁরা ছিলেন সদা উদগ্রীব ও ব্যস্ত। অনেকে বলেন, অমুক ব্যক্তি এত নফল ইবাদত করে, কিন্তু ফরয পালন করছে না, কাজেই নফল করে কি হবে? এ ধরণের কথা আত্মপ্রবঞ্চনা মাত্র। কেউ যদি ইচ্ছাপূর্বক ফরয বাদ দিয়ে শুধু নফল নিয়ে থাকে তাহলে সে অপরাধী। কিন্তু তার অপরাধের জন্য কি আমরা উল্টা আরেকটি অপরাধ করব? এছাড়া কেউ যদি ফরয ও নফল ইবাদত পালনের চেষ্ট করে কিন্তু ফরযের মধ্যে কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি হয় তাহলে নফল দিয়ে তা আল্লাহ পূরণ করবেন। সর্বোপরি ফরয ইবাদত পালনের সাথে সাথে সর্বদা নফল ইবাদত পালন করাই রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের সুন্নাত। এছাড়া আল্লাহর কাছে অধিকতর নৈকট্য, পুরস্কার, মর্যাদা ও সম্মান অর্জনের মাধ্যমই হলো ফরযের পাশাপাশি নফল ইবাদত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ

"আমার নৈকট্যের জন্য বান্দা যত কাজ করে তন্মধ্যে সবচেয়ে আমি বেশি ভালবাসি যে কাজ আমি ফরয করেছি। (ফরয পালনই আমার নৈকট্যে অর্জনের জন্য সবচেয়ে প্রিয় কাজ)। এরপর বান্দা যখন সর্বদা নফল ইবাদত পালনের মাধ্যমে আমার বেলায়তের পথে অগ্রসর হতে থাকে তখন আমি তাকে ভালবাসি।"[৩]

নফল ইবাদতগুলির মধ্যে নফল সালাত অন্যতম। এ বিষয়ে সাহাবীগণের আগ্রহ ছিল সবচেয়ে বেশি। এক সাহাবী প্রশ্ন করেন, আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় কর্ম কী? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

---

[১] বুখারী, আস-সহীহ ১/২৩১-২৩২; মুসলিম, আস-সহীহ ১/৪৫০।
[২] তিরমিযী, আস-সুনান ২/৭; আলবানী, সহীহুত তারগীব ১/৯৮। হাদীসটি হাসান।
[৩] সহীহ বুখারী, কিতাবুর রিকাক, নং ৬৫০২।

عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ لِلَّهِ فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً

"তুমি আল্লাহর জন্য বেশি বেশি সাজদা করবে (বেশি বেশি নফল সালাত আদায় করবে); কারণ তুমি যখনই আল্লাহর জন্য একটি সাজদা কর, তখনই তার বিনিময়ে আল্লাহ তোমার একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করেন এবং তোমার একটি পাপ মোচন করেন।"[১]

রাবীয়া ইবনু কা'ব নামক এক যুবক সাহাবী রাসূলুল্লাহ (ﷺ) -এর নিকট আবেদন করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে এক জান্নাতে থাকতে চান বা জান্নাতে তাঁর সাহচর্য চান। তিনি বলেন:

فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ

"তাহলে বেশি বেশি সাজদা করে (নফল সালাত আদায় করে) তুমি আমাকে তোমার বিষয়ে সাহায্য কর।"[২]

সাধারণভাবে নফল সালাত ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে বিশেষ সালাতের বিশেষ মর্যাদা বা ফযীলতের কথাও সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এগুলির মধ্যে অন্যতম হলো রাতে তাহাজ্জুদ বা কিয়ামুল্লাইল এবং সূর্যোদয়ের পরে দ্বিপ্রহরের আগে যোহা বা চাশতের নামায। ইসলামের অন্যতম নফল ইবাদত কিয়ামুল্লাইল। প্রথম রাতে বা শেষ রাতে, ঘুমানোর আগে বা ঘুম থেকে উঠে অন্তত কিছু নফল সালাত আদায় করা মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। একটু ঘুমিয়ে উঠে 'তাহাজ্জুদ'-রূপে আদায় করলে তার সাওয়াব ও মর্যাদা বেশি। কুরআনে বারংবার কিয়ামুল্লাইল ও তাহাজ্জুদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অগণিত হাদীসে এ বিষয়ে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনার দিকে দৃষ্টি দিলে আমরা নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারি যে, রাতের একাকী মুহূর্তে কিছু সময় সালাত, আল্লাহর যিক্‌র, তার সাথে মুনাজাত এবং তাঁরই (আল্লাহর) ইবাদতে ব্যয় করা মুমিনের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আয়েশা (রা) বলেন:

لا تَدَعْ قِيَامَ اللَّيْلِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ لا يَدَعُهُ وَكَانَ إِذَا مَرِضَ أَوْ كَسِلَ صَلَّى قَاعِدًا

"কখনো রাতের কিয়াম (তাহাজ্জুদ) ত্যাগ করবে না; কারণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কখনো তাহাজ্জুদ ত্যাগ করতেন না। যদি অসুস্থ থাকতেন অথবা ক্লান্তি বোধ করতেন তবে তিনি বসে তা আদায় করতেন।"[৩]

চাশতের বা সালাতুযযোহার বিষয়ে অনেক সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ (وفي رواية: سُبْحَةَ الضُّحَى) كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ ... تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ

"যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামা'আতে আদায় করে বসে বসে আল্লাহর যিকির করবে সূর্যোদয় পর্যন্ত, এরপর দু রাক'আত যোহা বা চাশতের নামায আদায় করবে, সে একটি হজ্ব ও একটি ওমরার সাওয়াব অর্জন করবে: পরিপূর্ণ, পরিপূর্ণ, পরিপূর্ণ (হজ্ব ও ওমরার সাওয়াব অর্জন করবে।)"[৪]

এছাড়া ওযুর পরেই দু রাকআত তাহিয়্যাতুল ওযূ, মসজিদে প্রবেশ করে বসার পূর্বে অন্তত দু রাক'আত দুখুলুল মাসজিদ বা তাহিয়্যাতুল মাসজিদ সালাত নিয়মিত আদায় করার বিশেষ নির্দেশ ও ফযীলত বিভিন্ন সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। মহান আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর সন্তুষ্টির পথে চলার তাওফীক প্রদান করুন। আমীন।

---

[১] মুসলিম, আস-সহীহ ১/৩৫৩।
[২] মুসলিম, আস-সহীহ ১/৩৫৩।
[৩] আবূ দাউদ, আস-সুনান ২/৩২; আলবানী, সহীহুত তারগীব ১/১৫৩। হাদীসটি সহীহ।
[৪] তিরমিযী, আস-সুনান ২/৪৮১; আলবানী, সহীহুত তারগীব ১/১১১। হাদীসটি হাসান।

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

أَمَّا بَعْدُ فَيَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَإِنْ

خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فَقَدْ كَفَرَ

وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ فَلا صَلَاةَ لَهُ إِلاَّ مِنْ عُذْرٍ

بَارَكَ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ فِيْ الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ. وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ. أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ، فَاسْتَغْفِرُوْهُ وَتُوْبُوْا إِلَيْهِ، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.

রবিউস সানী মাসের ৪র্থ খুতবা: সালাতের আহকাম ও ভুলভ্রান্তি

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লী আলা রাসূলিহীল কারীম। আম্মা বাদ,

সম্মানিত উপস্থিতি, আজ ...... হিজরী সালের রবিউস সানী মাসের ৪র্থ জুমুআ। আজ আমরা সালাতের আহকাম ও ভুলভ্রান্তি নিয়ে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ। কিন্তু তার আগে আমরা এ সপ্তাহের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসগুলির বিষয়ে সংক্ষেপ আলোকপাত করি।

হাযেরীন, আজ ইংরেজী ..... মাসের ..... তারিখ। এ সপ্তাহের দিবসগুলির মধ্যে রয়েছে ..... ।

হাযেরীন, সালাতের অনেক আহকাম রয়েছে, যেগুলি বিস্তারিতভাবে আমাদেরক শিখতে হবে। আজকের খুতবায় আমরা সালাতের অল্প কিছু বিধান আলোচনা করব যেগুলি অনেক নিয়মিত মুসল্লীয় ভুল করেন। কারণ সালাত আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় ইবাদত। আমরা প্রতিদিন, ১৭ রাক'আত ফরয সালাত, ১২ রাক'আত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা সালাত, তিন রাক'আত বিতর মোট ৩২ রাকআত সালাত ছাড়াও আরো অন্তত ১০/১২ রাকআত সালাত আদায় করি। যদি প্রত্যেক রাক'আতে আমরা কিছু ভুল করি তবে মোট ভুলের পরিমাণ অনেক বেশি হয়ে যায়। আর এ সকল ভুলের ফলে সাওয়াব কমতে পারে, গোনাহ হতে পারে, এমনকি সালাত নষ্টও হতে পারে। এ সকল আহকামের অন্যতম হলো সালাতের মনোযোগ, একাগ্রতা ও বিনয়। সালাতের মূল উদ্দেশ্য 'আল্লাহর যিক্‌র'। আল্লাহ বলেছেন:

وَأَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي

"আমার যিক্‌র বা স্মরণের জন্য সালাত প্রতিষ্ঠা কর।"[১]

সালাতের মধ্যে কখন কোন্ কথা বলে আল্লাহর যিক্‌র করতে হবে তা রাসূলুল্লাহ ﷺ শিখিয়েছেন। মুমিনের কাজ হলো মনোযোগের সাথে অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে এগুলি বলে যিক্‌র করা। আল্লাহ বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা যা বল তা বুঝতে পারছ, এরূপ অবস্থা না হওয়া পর্যন্ত নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা সালাতের নিকটবর্তী হয়ো না।"[২]

হাযেরীন, বড় পরিতাপের বিষয় যে, আমরা অনেকেই নেশাগ্রস্তের মতই না বুঝে সালাত আদায় করি। পুরো সালাতে কি বলেছি কিছুই মনে করতে পারি না বা খেয়াল করি না।

সালাতের মধ্যে অমানোযোগী থাকা মুনাফিকদের অভ্যাস ও রীতি। আল্লাহ বলেন:

وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاَةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلاَّ قَلِيلا

"আর মুনাফিকরা যখন সালাতে দাঁড়ায় তখন তারা আলসেমীর সাথে দাঁড়ায়। তারা মানুষদেরকে দেখায় এবং খুব কমই আল্লাহর যিক্‌র করে।"[৩]

হাযেরীন, আমরা জানি, আমরা যে অবস্থায় থাকি না কেন, যেভাবেই নামায আদায় করি না কেন, যে যিকির বা কিরাআতই পাঠ করি না কেন, নামাযের মধ্যে পঠিত দোয়া, যিকির বা কিরাআতের অর্থের দিকে মন দিয়ে অন্তরের আবেগ দিয়ে নামায আদায়ের চেষ্টা করতে পারি। মনোযোগ নষ্ট হলে আবারো মনোযোগ ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু দুঃখজনক বিষয় হলো, আমরা নামাযের

---

[১] সূরা তাহা: ১৪ আয়াত।
[২] সূরা নিসা: ৪৩ আয়াত।
[৩] সূরা নিসা: ১৪২ আয়াত।

অন্যান্য প্রয়োজনীয়, অল্পপ্রয়োজনীয়, অপ্রয়োজনীয় অনেক বিষয়ে অতি সচেতন হলেও মনোযোগ, আবেগ ও ভক্তির বিষয়ে কোন আগ্রহ দেখাই না। আরো দু:খজনক বিষয় হলো, অনেক ধার্মিক মুসলিম দ্রুত নামায আদায়ের জন্য অস্থির হয়ে পড়েন। ধীর ও শান্তভাবে পরিপূর্ণ আবেগ ও মনোযোগ সহকারে নামায আদায় করাই আল্লাহর নির্দেশ। আল্লাহ বলেন:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ

"মুমিনগণ সফলকাম হয়েছেন, যারা অত্যন্ত বিনয়ের সাথে সালাত আদায় করেন।"[১]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও সাহাবীগণ সর্বদা অত্যন্ত বিনয়ের সাাথে, ধীরে ধীরে সালাত আদায় করতেন। দ্রুত বা ব্যস্ততার সাথে সালাত আদায়ের কঠিন নিন্দা করা হয়েছে হাদীস শরীফে। সাহাবীগণ সর্বদা ব্যস্ত থাকতেন সালাতের মধ্যে মনোযোগ রক্ষা করার জন্য। মনোযোগের অসুবিধা হলে তাঁরা অস্থির হয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে প্রশ্ন করতেন। উসমান ইবনু আবীল আস (রা) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, শয়তান আমার ও আমার নামাযের মধ্যে বাধ সাধে এবং আমার কিরাআত এলোমেলো করে দেয়। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: ঐ শয়তানের নাম : খিনযিব। যখন এরূপ অনুভব করবে তখন (আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম) বলে তোমার বাম দিকে থুথু ফেলবে। তিনবার করবে। উসমান (রা.) বলেন : আমি এরূপ করলাম, ফলে আল্লাহ উক্ত শয়তানকে আমার থেকে দূর করে দিলেন।[২]

হাযেরীন, সালাতের একটি বড় ফরয হলো সতর আবৃত করা। পুরুষের জন্য নাভী থেকে হাটুর নিম্ন পর্যন্ত আবৃত রাখা ফরয। এর মধ্য থেকে কোনো অংশ অনাবৃত হলে বা টাইট পোশাকের কারণে অনাবৃতের মত হলে সালাত নষ্ট হয়ে যাবে। যদি অল্প সময়ের জন্যও তা অনাবৃত হয় তবুও সালাত নষ্ট হয়ে যাবে। প্যান্ট-গেঞ্জি বা প্যান্ট-শার্ট পরে রুকু করলে অনেকেরই কোমরের কাছে অনাবৃত হয়ে সালাত নষ্ট হয়ে যায়। মহিলাদের জন্য মাথার চুল সহ সমস্ত শরীর সালাতের মধ্যে আবৃত করে রাখা ফরয। শুধু মুখমণ্ডল ও কব্জি পর্যন্ত দুই হাত বাদে পুরো শরীর আবৃত করতে হবে। কেউ দেখুক অথবা না দেখুক, সালাতের মধ্যে যদি কোন মহিলার কান, চুল, মাথা, গলা, কাঁধ, পেট, পায়ের নলা ইত্যাদি অনাবৃত হয়ে যায় তাহলে সালাত নষ্ট হয়ে যাবে। সাধারণভাবে শাড়ী মুসলিম মহিলার জন্য অসুবিধাজনক পোষাক। ঢিলেঢালা পুরো হাতা সেলোয়ার-কামিজ বা ম্যাক্সি মুসলিম মহিলার জন্য উত্তম ও আদর্শ পোশাক। সর্বাবস্থায় সাধারণ পোশাকের উপর অতিরিক্ত বড় চাদর দিয়ে ভালভাবে নিজেকে আবৃত করে সালাত আদায় করতে হবে। মাথার চুল, কান গলা ইত্যাদি ভালভাবে আবৃত রাখার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

হাযেরীন, সালাতে দাঁড়ানোর সময় সামনে আড়াল বা সুতরা রেখে দাঁড়ানো হাদীসের নির্দেশ। দেয়াল, খুঁটি, পিলার বা যে কোন কিছুকে সামনে আড়াল হিসাবে রাখুন। না হলে অন্তত একহাত বা আধাহাত লম্বা সরু কোন লাঠি, কাঠ ইত্যাদি সামনে রাখলেও সুতরার সুন্নাত আদায় হবে। সুতরার যথাসম্ভব কাছে দাঁড়াতে হবে, যেন সাজদা করলে সুতরার নিকটে হয়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সুতরার তিনহাতের মধ্যে দাঁড়াতেন। তিনি বলেন:

لاَ تُصَلِّ إِلاَّ إِلَى سُتْرَةٍ وَلاَ تَدَعْ أَحَداً يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْكَ فَإِنْ أَبَى فَلْتُقَاتِلْهُ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِيْنَ

"আড়াল বা সুতরা ছাড়া সালাত আদায় করবে না, আর কাউকে তোমার সামনে দিয়ে (সুতরার

[১] সূরা মুমিনূন: ১-২ আয়াত ।

[২] সহীহ মুসলিম ৪/১৭২৮, নং ২২০৩।

ভিতর দিয়ে) যেতে দিবে না। যদি সে জোর করে তাহলে তার সঙ্গে মারামারি করবে, কারণ তার সাথে শয়তান রয়েছে।"[১]

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْهَا

"যখন তোমাদের কেউ সালাত আদায় করবে সে যেন সুতরা বা আড়াল সামনে রেখে সালাত আদায় করে এবং সুতরার নিকটবর্তী হয়ে দাঁড়ায়।"[২]

জামাতে মুক্তাদির জন্য পৃথক সুতরা লাগে না। ইমামের সুতরাই যথেষ্ট। তবে জামাতে সালাতের আগে ও পরে সুন্নাত-নফল সালাত আদায়ের সময় বা বাড়িতে, মসজিদে, মাঠে যে কোনো স্থানে আমাদের এই সুন্নাতে নববী পালনের চেষ্টা করতে হবে। অনেকেই জামাতে সালাতের আগে ও পরে মসজিদের মধ্যে সুতরা ছাড়া সালাতে দাঁড়িয়ে অন্যান্য মুসল্লীর অসুবিধার সৃষ্টি করেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর এই নির্দেশটি পালন করলে আমরা সাওয়াব পাব, গোনাহ থেকে বাঁচতে পারব ও অন্যদেরও বাঁচাতে পারব।

হাযেরীন, সালাতের মধ্যে ধীরে ধীরে শান্তভাবে প্রত্যেক আয়াতে থেমে থেমে সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা পাঠ করা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মু সালামাহকে (রা.) রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কিরাআত পদ্ধতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। তিনি বলেন :

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ كَانَ يَقْطَعُ قِرَاءَتَهُ آيَةً آيَةً، (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)، ثُمَّ يَقِفُ، (ثُمَّ يَقُولُ) (الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) ثُمَّ يَقِفُ (ثُمَّ يَقُولُ): مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ....

"রাসূলুল্লাহ (ﷺ) প্রত্যেক আয়াতে থেমে থেকে কুরআন পাঠ কতেন। তিনি পড়তেন: 'আল-হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন'। এরপর থামতেন। এরপর বলতেন: 'আর-রাহমানির রাহীম'। এরপর থামতেন। এরপর বলতেন: মালিকি ইয়াওমিদ্দীন'। এরপর থামতেন। এভাবেই শেষ পর্যন্ত।[৩]

হাফসা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কিরাআত পদ্ধতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন: "তোমরা তাঁর মতো তিলাওয়াত করতে পারবে না।" প্রশ্নকারীরা তবুও একটু শোনাতে অনুরোধ করেন। তখন তিনি খুব ধীরে ধীরে তিলাওয়াত করেন।[৪] আনাস (রা)-কে রাসূলুল্লাহর (ﷺ) তিলাওয়াত পদ্ধতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। তিনি বলেন : (كانت مدا) "তাঁর কিরাআত ছিল টেনে টেনে।"[৫]

হাযেরীন, শান্তভাবে রুকু ও সাজদা করা সালাতের অন্যতম ফরয ও ওয়াজিব দায়িত্ব। শান্তভাবে রুকুতে যেতে থাকতে হবে। রুকু থেকে উঠে শান্তভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। শান্তভাবে সাজদায় যেয়ে থাকতে হবে। দুই সাজদার মাঝে পরিপূর্ণ শান্তভাবে বসতে হবে। তা না হলে সালাত নষ্ট হয়ে যাবে। একব্যক্তিকে তাড়াহুড়ো করে সালাত আদায় করতে দেখে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকে বলেন:

ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ

"তুমি যেয়ে আবার সালাত আদায় কর, তোমার সালাত হয় নি।"[৬]

---

[১] ইবনু খুযাইমা, আস-সহীহ ২/৯; ইবনু হিব্বান, আস-সহীহ ৬/১২৬, ১৩৩; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ১/৩৮১। হাদীসটি সহীহ।
[২] আবূ দাউদ, আস-সুনান ১/১৮৫-১৮৬; নাসাঈ, আস-সুনান ২/৬২; আলবানী, সাহীহাহ ৩/৪৬০। হাদীসটি সহীহ।
[৩] তিরমিযী, আস-সুনান ৫/১৮২, ১৮৫; আবূ দাউদ, আস-সুনান ৪/৩৭; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ২/২৫৩। হাদীসটি সহীহ।
[৪] মুসনাদে আহমদ ৬/২৮৮, মাজমাউয যাওয়াইদ ২/১০৮।
[৫] সহীহ বুখারী ৪/১৯২৫, নং ৪৭৫৯।
[৬] বুখারী, আস-সহীহ ১/২৬৩; মুসলিম, আস-সহীহ ১/২৯৮।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এক ব্যক্তিকে দেখেন যে, সে তাড়াহুড়ো করে রুকু-সাজদা করছে। তিনি বলেন:

لَوْ مَاتَ عَلَى حَالِهِ هَذِهِ مَاتَ عَلَى غَيْرِ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ.

"যদি এ লোকটি এইরূপ অবস্থায় মারা যায় তবে সে মুহাম্মাদের (ﷺ) ধর্মের বাইরে মৃত্যু বরণ করবে।"[১]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন: "মানুষদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট চোর ঐ ব্যক্তি যে নিজের সালাতে চুরি করে। সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, কিভাবে মানুষ নিজের সালাত চুরি করে? তিনি বলেন,

لاَ يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلاَ سُجُودَهَا

"সালাতের রুকু ও সাজাদ পুর্ণ করে না।"[২]

রুকুর মধ্যে পিঠ ধনুকের মত বাকা নয়, বরং তীরের মত সোজা রাখাই রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নির্দেশ ও কর্ম। তিনি সালাতের পদ্ধতি শিক্ষা দিয়ে বলেন:

وَإِذَا رَكَعْتَ فَضَعْ رَاحَتَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ وَامْدُدْ ظَهْرَكَ

"যখন তুমি রুকু করবে তখন তোমার দুই হাত দুই হাটুর উপর রাখবে এবং তোমার পিঠ সোজা লম্বা করে দেবে।[৩]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন রুকু করতেন তখন দুই হাত হাঁটুর উপর দৃঢ়ভাবে রাখতেন (বুখারী, মুসলিম), হাতের আঙ্গুল ফাঁক করে রাখতেন (হাকিম, তায়ালিসী), মনে হত তিনি হাঁটু আঁকড়ে ধরে রেখেছেন। (বুখারী, আবূ দাউদ) তিনি তাঁর দুই বাহু ও কনুউকে দেহ থেকে সরিয়ে রাখতেন (তিরমিযী, ইবনু খুযাইমা), এ অবস্থায় তিনি তাঁর পিঠ লম্বা করে দিতেন এবং পিঠ, কোমর ও মাথা এমনভাবে সোজা ও সমান্তরাল করতেন যে, এ সময়ে তাঁর পিঠের উপর পানি ঢেলে দিলে তা গড়িয়ে পড়ত না। (বাইহাকী, তাবারানী, ইবনু মাজাহ) ইবনু আব্বাস (রা) বলেন:

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا رَكَعَ اسْتَوَى فَلَوْ صُبَّ عَلَى ظَهْرِهِ الْمَاءُ لاسْتَقَرَّ

"যখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) রুকু করতেন তখন তাঁর পিঠ পুরোপুরি সোজা করে দিতেন। এমনকি যদি তার পিঠের উপর পানি ঢালা হতো তবে পানি থেমে থাকত।"[৪]

হাযেরীন, সাজদা হলো সালাতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় ইবাদত সাজদা। বান্দা সাজদার মাধ্যমে আল্লাহর সবচেয়ে নৈকট্য লাভ করে। কাজেই সে অনুভূতি নিয়েই সাজদা করতে হবে। ইবনু আব্বাস (রা) বলেন:

أُمِرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ وَلا يَكُفَّ شَعَرًا وَلا ثَوْبًا الْجَبْهَةِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ

"নবী (ﷺ) নির্দেশ দিয়েছেন ৭টি অঙ্গের উপর সাজদা করার নির্দেশ দিয়েছেন: মুখমণ্ডল, দুই হাত, দুই হাঁটু ও দুই পা। তিনি আরো নির্দেশ দিয়েছেন যে, মুসল্লী তার চুল বা কাপড় গোটাবে না।"[৫]

মুমিন যতক্ষণ সাজদায় থাকবে ততক্ষণ এ সাতটি অঙ্গ মাটিতে লেগে থাকবে। মুখমণ্ডল বলতে

---

[১] হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ২/১২১। হাদীসটির সনদ হাসান।
[২] হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ২/১২০-১২১। হাদীসটি সহীহ।
[৩] আবূ দাউদ, আস-সুনান ১/২২৭; ইবনু হিব্বান, আস-সহীহ ৫/২০৬; আলবানী, সহীহুত তারগীব ২/১৭। হাদীসটি হাসান।
[৪] হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ২/১২৩। হাদীসটির সনদ সহীহ।
[৫] বুখারী, আস-সহীহ ১/২৮০।

কপাল ও নাক উভয়কে বুঝানো হয়েছে। যতক্ষণ কপাল মাটিতে থাকবে ততক্ষণ নাকও মাটিতে থাকবে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ يُصِيْبُ أَنْفُهُ مِنَ الأَرْضِ مَا يُصِيْبُ الْجَبِيْنُ

"কপাল যেভাবে মাটিতে থাকতে ঠিক সেভাবে যার নাক মাটিতে না থাকবে তার সালাত হবে না।"[১]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর দুই হাত দুই কান বরাবর মাটিতে বা দুই কাঁধ বরাবর মাটিতে রাখতেন। তিনি হাতের আঙ্গুলগুলি মিলিয়ে কিবলামুখি করে রাখতেন। তিনি তাঁর দুই বাহু ও কনুই মাটি থেকে উপরে রাখতেন। কনুই দুটি দেহের বাইরে বের করে দূরে সরিয়ে রাখতেন। সাজদা অবস্থায় তাঁর হাত ও পেট এমনভাবে উচু ও ফাঁকা থাকত যে, কোনো মেশ শাবক ইচ্ছা করলে সেখান দিয়ে যাতায়াত করতে পারত। তিনি তাঁর দুই পায়ের আঙ্গুলগুলি কিবলামুখি করতেন। দুই পা খাড়া রেখে দুই পায়ের গোড়ালি একত্রে মিলিয়ে রাখতেন। দুই সাজদার মাঝে ও তাশাহহুদে বসার সময় বাম পা বিছিয়ে দিতেন এবং ডান পা খাড়া রাখতেন। ডান পায়ের আঙুলগুলি কিবলামুখি করে রাখতেন। এভাবে তিনি আবেগের সাথে দীর্ঘ সময় সাজদায় থাকতেন। সাজদা রত অবস্থায় ও দুই সাজদার মাঝে বসা অবস্থায় পরিপূর্ণ শান্ত হতে ও তাড়াহুড়ো না করতে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন। দুই সাজদার মাঝের বৈঠকে পরিপূর্ণ শান্তভাবে না বসলে তার সালাত হবে না বলে তিনি জানিয়েছেন।

হাযেরীন, জামাতে সালাতের অনেক আদব রয়েছে। মুমিনের উচিত আযানের আগেই ওযূ করে মসজিদে যেয়ে সালাতের জন্য অপেক্ষা করা। এইরূপ অপেক্ষা আল্লাহর নিকট অন্যতম জিহাদ ও অত্যন্ত বড় নেককর্ম। যদি জামাতে বেরোতে দেরি হয়, তবে ব্যস্ত ভাবে বা দৌড়ে যাওয়া নিষিদ্ধ। প্রশান্ত মনে গাম্ভির্যের সাথে স্বাভাবিক গতিতে যেতে হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺবলেন:

إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلاَةُ فَلا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ وَأْتُوهَا تَمْشُونَ عَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ (وَالوَقَارُ) فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا ... فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلاَةِ فَهُوَ فِيْ صَلاَةٍ

"যদি সালাতের ইকামত হয়ে যায় তবে তাড়াহুড়ো করে মসজিদে যাবে না। শান্তভাবে এবং গাম্ভির্যের সাথে যাবে। যতটুকু নামায ইমামের সাথে পাবে তা আদায় করবে, বাকিটা পরে নিজে আদায় করবে। কারণ তোমাদের কেউ যখন সালাতের উদ্দেশ্যে বের হয় তখন সে সালাত আদায়েই রত থাকে।[২]

অন্য হাদীসে তিনি বলেন:

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا أَعْطَاهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ صَلاَّهَا وَحَضَرَهَا لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْئًا

"যদি কেউ সুন্দর ও পূর্ণরূপে ওযূ করে (মসজিদে) গমন করে, এবং তথায় দেখে যে, মানুষেরা সালাত আদায় করে ফেলেছে, তবে তাকে আল্লাহ জামাতে উপস্থিত হয়ে যারা সালাত আদায় করেছে তাদের সাওয়াব প্রদান করবেন, কিন্তু এতে মুসল্লীদের সাওয়াব কমবে না।[৩]

প্রথম কাতারে সালাত আদায়ের জন্য রয়েছে বিশেষ সাওয়াব ও মর্যাদা। ইরবাদ (রা) বলেন:

---

[১] বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা ২/১০৪; আলবানী, সিফাতুস সালাত, পৃ. ১৪২। হাদীসটি সহীহ।
[২] বুখারী, আস-সহীহ ১/৩০৮; মুসলিম, আস-সহীহ ১/৪২০-৪২১।
[৩] আবূ দাঊদ, আস-সুনান ১/১৫৪; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ১/৩২৭; আলবানী, সহীহুত তারগীব ১/৯৬-৯৮। হাদীসটি সহীহ।

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَسْتَغْفِرُ لِلصَّفِّ الْمُقَدَّمِ ثَلاثًا وَلِلثَّانِي مَرَّةً

"রাসূলুল্লাহ (ﷺ) প্রথম কাতারের জন্য তিনবার করে ক্ষমা প্রার্থনা করতেন এবং দ্বিতীয় কাতারের জন্য একবার।"[১] অন্য হাদীসে আবূ উমামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الأَوَّلِ

"প্রথম কাতারের জন্য আল্লাহ রহমত প্রদান করেন এবং ফিরিশতাগণ দোয়া করেন।"[২]
সামনের কাতারে স্থান রেখে পিছনের কাতারে দাঁড়ালে মুসল্লীকে শাস্তি পেতে হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

لا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ عَنْ الصَّفِّ الأَوَّلِ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمْ اللَّهُ فِي النَّارِ

"কিছু মানুষ নিয়মিত কাতারে পিছিয়ে পড়তে থাকবে, শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাদেরকে জাহান্নামের মধ্যে পিছিয়ে দিবেন।"[৩]

জামাতে সালাতের কাতার সোজা করা, কাতারের মাঝের ফাঁক পূরণ করা, গায়ে গা লাগিয়ে ও কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

سَوُّوا صُفُوفَكُمْ وَحَاذُوا بَيْنَ مَنَاكِبِكُمْ وَلِينُوا فِي أَيْدِي إِخْوَانِكُمْ (وَسِّطُوا الإِمَامَ) وَسُدُّوا الْخَلَلَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ بَيْنَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْحَذَفِ، وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ

"তোমরা তোমাদের কাতারগুলি সোজা কর, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াও, তোমাদের ভাইদের হাতে নরম হয়ে যাও, ইমামকে মধ্যস্থানে রেখে কাতার দাও এবং কাতারের মাঝের ফাঁক পূরণ কর। কারণ শয়তান মেশ শাবকের ন্যায় তোমাদের মধ্যে প্রবেশ করে। যে ব্যক্তি কাতার মিলিয়ে দেবে বা সংযুক্ত করবে আল্লাহ তাকে মিলিয়ে দেবেন। আর যে ব্যক্তি কাতার বিচ্ছিন্ন করবে বা ভাঙ্গবে আল্লাহ তাকে ভাঙ্গবেন।[৪]

আনাস (রা) বলেন, "সালাতের ইকামত হয়ে যাওয়ার পরে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের দিকে ফিরে বলেন

أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي، وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ وَرُكْبَتَهُ بِرُكْبَةِ صَاحِبِهِ وَكَعْبَهُ بِكَعْبِهِ

"তোমরা তোমাদের কাতারগুলি সোজা কর; কারণ আমি আমার পিছন দিকেও তোমাদেরকে দেখতে পাই। তখন আমরা একে অপরের কাঁধের সাথে কাঁধ, পায়ের সাথে পা, হাঁটুর সাথে হাঁটু ও টাখনুর সাথে টাখনু লাগিয়ে দাঁড়াতাম।"[৫]

وَاللَّهِ لَتُقِيمُنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ

"আল্লাহর কসম, তোমরা কাতারগুলি সোজা কর। নইলে আল্লাহ তোমাদের অন্তরের মধ্যে বৈপরীত্য ও বিরোধ সৃষ্টি করে দিবেন।[৬] মহান আল্লাহ সবাইকে সঠিক ভাবে পরিপূর্ণ সুন্নাত মোতাবেক সালাত আদায়ের তাওফীক দিন। আমীন।

---

[১] ইবনু মাজাহ, আস-সুনান ১/৩১৮; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ১/৩৩৪, ৩৩৭; আলবানী, সহীহুত তারগীব ১/১১৮। হাদীসটি সহীহ।
[২] নাসাঈ, আস-সুনান ২/১৩; ইবনু মাজাহ, আস-সুনান ১/৩১৮; আলবানী, সহীহুত তারগীব ১/১১৮। হাদীসটি সহীহ।
[৩] আবূ দাউদ, আস-সুনান ১/১৮১; আলবানী, সহীহুত তারগীব ১/১২৩।
[৪] আবূ দাউদ, আস-সুনান ১/১৭৮, ১৮২; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ২/৯১, ৯৩; আলবানী, সহীহুত তারগীব ১/১১৮-১১৯। হাদীসটি সহীহ।
[৫] বুখারী, আস-সহীহ ১/২৫৪; আবূ দাউদ, আস-সুনান ১/১৭৮।
[৬] আবূ দাউদ, আস-সুনান ১/১৭৮; সহীহুত তারগীব ১/১২৩। হাদীসটি সহীহ।

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

أَمَّا بَعْدُ، فَيَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا

مَا تَقُولُونَ

وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَوُّوا صُفُوفَكُمْ وَحَاذُوا بَيْنَ مَنَاكِبِكُمْ وَلِينُوا فِي أَيْدِي إِخْوَانِكُمْ وَسِّطُوا الإِمَامَ وَسُدُّوا الْخَلَلَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ بَيْنَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْحَذَفِ، وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ

بَارَكَ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ فِيْ الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ. وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ. أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ، فَاسْتَغْفِرُوْهُ وَتُوْبُوْا إِلَيْهِ، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.

জুমাদাল উলা মাসের ১ম খুতবাঃ আযান, ইকামত ও মসজিদ

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লী আলা রাসূলিহীল কারীম। আম্মা বাদ,

সম্মানিত উপস্থিতি, আজ জুমাদাল উলা মাসের প্রথম জুমাআ। আজকের খুতবায় আমরা আযান ও মসজিদ সম্পর্কে আলোচনা করব। কিন্তু তার আগে আমরা এ সপ্তাহের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসগুলির বিষয়ে সংক্ষেপ আলোকপাত করি।

হাযেরীন, আজ ইংরেজী ..... মাসের ..... তারিখ। এ সপ্তাহের দিবসগুলির মধ্যে রয়েছে ..... ।

হাযেরীন, সালাতের অন্যতম বিষয় হলো আযান এবং মসজিদ। আযান দেওয়া অত্যন্ত ফযীলতের কর্ম। আযানের সাওয়াব ও মর্যাদা বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلا أَنْ يَسْتَهِمُوا لاسْتَهَمُوا عَلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا

যদি মানুষেরা জানত যে, আযানে এবং প্রথম সারিতে কী আছে এবং এরপর এজন্য লটারী করা ছাড়া কোনো উপায় না থাকত তাহলে তারা এ বিষয়ে লটারী করত। আর যদি তারা জানত যে, ওয়াক্তের আগে বা ওয়াক্তের শুরুতে সালাতের জন্য গমনের মধ্যে কী আছে তাহলে তারা এজন্য প্রতিযোগিতা করত। আর যদি তারা জানত যে, ইশার ও ফজরের সালাতের মধ্যে কী আছে তাহলে তারা হামাগুড়ি দিয়ে হলেও এই দুই সালাতে উপস্থিত হত।[১] অন্য হাদীসে তিনি বলেন:

يَغْفِرُ اللَّهُ لِلْمُؤَذِّنِ مُنْتَهَى أَذَانِهِ وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ سَمِعَ صَوْتَهُ

আল্লাহ মুআয্যিনের আযানের সর্বশেষ সীমা পর্যন্ত তাকে ক্ষমা করে দেন এবং আদ্র ও শুষ্ক (প্রাণী ও জড়) যা কিছু তার আযানের শব্দ শোনে সবাই তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।[২]

হাযেরীন, আমরা সবাই তো আর মুআযযিন হতে পারব না। কিন্তু আমাদের জন্যও আযানের সাথে সাথে অগণিত সাওয়াব ও মর্যাদার ব্যবস্থা রয়েছে। মুআয্যিন যা যা বলেন সেগুলি অন্তরের মহব্বত ও ভক্তি সহকারে দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে বলতে হবে। আমরা সাধারণত একে আযানের জবাব দেওয়া বলি। মুয়াযযিন আযানের মধ্যে যা যা বলবেন মুমিন শ্রোতাও তাই বলবেন। এ বিষয়ে হাদীসে কয়েকটি সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

إِذَا سَمِعْتُمْ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ

"যখন তোমরা মুয়াযযিনকে আযান দিতে শুনবে, তখন মুয়াযযিন যেরূপ বলে তদ্রূপ বলবে।"[৩]

অন্য হাদীসে হযরত আবু হুরাইরা বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে ছিলাম। তখন বিলাল দাঁড়িয়ে আযান দিলেন। বেলাল আযান শেষ করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন :

مَنْ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ هَذَا يَقِينًا (مِنْ قَلْبِه) دَخَلَ الْجَنَّةَ

"এ ব্যক্তি (মুয়াযযিন) যা বলল, তা যদি কেউ অন্তর থেকে দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে বলে তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[৪]

---

[১] বুখারী, আস-সহীহ ১/২২২-২২৩; মুসলিম, আস-সহীহ ১/৩২৫, ৪৫১।

[২] আহমদ, আল-মুসনাদ ২/১৩৬; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৩২৫; আলবানী, সহীহুত তারগীব ১/৫৭। হাদীসটি সহীহ।

[৩] বুখারী, আস-সহীহ ১/২২১; মুসলিম, আস-সহীহ ১/২৮৮।

[৪] আহমদ, আল-মুসনাদ ২/৩৫২; আলবানী, সহীহুত তারগীব ১/৬২। হাদীসটি সহীহ।

অন্য হাদীসে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, মুআযযিনের হাইয়া আলাস সালাহ ও হাইয়া আলাল ফালাহ বলার সময় শ্রোতা 'লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' বলবেন।[১]

হাযেরীন, আযান শেষ হলে দরূদ পাঠ ও ওসীলার দুআ পাঠ করতে নির্দেশ দিয়েছেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)। 'ওসীলা' শব্দের অর্থ হলো – নৈকট্য। জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তর যা আল্লাহর আরশের সবচেয়ে নিকটবর্তী তাকে 'ওসীলা' বলা হয়। এই স্থানটি আল্লাহর একজন বান্দার জন্যই নির্ধারিত, তিনি হলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ। আব্দুল্লাহ বিন আমর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لا تَنْبَغِي إِلا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ

"যখন তোমরা মুয়াযযিনকে (আযান দিতে) শুনবে তখন সে যা যা বলবে তোমরাও তা বলবে, এরপর তোমরা আমার উপর সালাত (দরূদ) পাঠ করবে ; কারণ যে আমার উপর সালাত পাঠ করবে আল্লাহ তাঁকে একটি সালাতের বিনিময়ে ১০ বার সালাত (রহমত, মর্যাদা, বরকত) প্রদান করবেন। এরপর তোমরা আমার জন্য আল্লাহর কাছে ওসীলা প্রার্থনা করবে; ওসীলা হলো জান্নাতের এমন একটি মর্যাদার স্থান যা শুধুমাত্র আল্লাহর একজন বান্দাই লাভ করবেন, আমি আশা করি আমিই তা লাভ করব। যে ব্যক্তি আমার জন্য 'ওসীলা' প্রার্থনা করবে তাঁর জন্য শাফায়াত প্রাপ্য হবে।"[২]

ওসীলা চাওয়ার পদ্ধতিও তিনি শিক্ষা দিয়েছেন। জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"মুয়াযযিনের আযান শুনে যে ব্যক্তি বলবে, (হে আল্লাহ, এই পরিপূর্ণ আহ্বান এবং আগত সালাতের মালিক, আপনি প্রদান করুন মুহাম্মাদকে (ﷺ) ওসীলা এবং মহা মর্যাদা এবং তাঁকে উঠান সম্মানিত অবস্থানে, যা আপনি তাঁকে ওয়াদা করেছেন) তাঁর জন্য কেয়ামতের দিন আমার শাফা'আত পাওনা হয়ে যাবে।"[৩]

হাযেরীন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জন্য 'ওসীলা' চাওয়ার পরে তিনি আমাদেরকে নিজেদের দুনিয়া ও আখেরাতের প্রয়োজনের জন্য দোয়া করতে শিখিয়েছেন। দোয়া কবুলের অন্যতম সময় হলো আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়, এ সময়ের দুআ আল্লাহ ফেরত দেন না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

لا يُرَدُّ الدُّعَاءُ (وفي رواية: الدَّعْوَةُ) بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ، فَادْعُوا

"আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ের দোয়া ফেরত দেওয়া হয় না। অতএব, তোমরা এই সময়ে দুআ করবে।"[৪]

অন্য হাদীসে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা.) বলেন, একব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল, মুয়াযযিনগণ তো আমাদের চেয়ে বেশি মর্যাদা অর্জন করে নিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

---

[১] মুসলিম, আস-সহীহ ১/২৮৯।
[২] মুসলিম, আস-সহীহ ২/২৮৮।
[৩] বুখারী, আস-সহীহ ১/২২২, ৪/১৭৪৯।
[৪] তিরমিযী, আস-সুনান ১/৫১৫-৫১৬; আবূ দাউদ, আস-সুনান ১/১৪৪; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৩৩৪। হাদীসটি হাসান সহীহ।

قُلْ كَمَا يَقُولُونَ فَإِذَا انْتَهَيْتَ فَسَلْ تُعْطَهْ

"মুয়াযযিনগণ যা বলে তুমি তা বল। যখন (আযানের জবাব দেওয়া) শেষ করবে, তখন আল্লাহর কাছে চাইবে বা দোয়া করবে। এই সময়ে তুমি যা চাইবে তোমাকে তা দেওয়া হবে।"[১]

হাযেরীন, আযান-এর জওয়াব দিতে হয় দুই ভাবে। মুখে ও কর্মে। কর্মের জওয়াবই হলো আসল। আযানের জওয়াবে মসজিদে যেয়ে সালাত আদায় করতে হবে। হাদীস শরীফে এসেছে, একজন অন্ধ ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বাড়িতে সালাত আদায়ের অনুমতি চেয়ে বলেন: হে আল্লাহর রাসূল, আমার কোনো পরিচালক নেই যে আমাকে হাত ধরে মসজিদে নিয়ে আসবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেন: তুমি কি সালাতের আহ্বান (আযান) শুনতে পাও? লোকটি বলে: হ্যাঁ। তিনি বলেন: (فَأَجِبْ); তাহলে তুমি আযানে জওয়াব দেবে। অর্থাৎ (আযানের ডাকে সাড়া দিয়ে জামাতে উপস্থিত হবে)।[২]

হাযেরীন, মসজিদ আল্লাহর প্রিয়তম স্থান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

أَحَبُّ الْبِلادِ إِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُهَا وَأَبْغَضُ الْبِلادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا.

আল্লাহর নিকট সকল স্থানের মধ্যে মসজিদগুলি সবচেয়ে প্রিয় এবং আল্লাহর নিকট সকল স্থানের মধ্যে বাজারগুলি সবচেয়ে ঘৃণিত।[৩]

মসজিদ তৈরি করা বা তৈরিতে অংশ গ্রহণ করা অত্যন্ত বড় নেক আমল। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

مَنْ بَنَى مَسْجِدًا يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে একটি মসজিদ তৈরি করবে, আল্লাহ জান্নাতে তার জন্য একটি বাড়ি তৈরি করবেন।[৪]

মসজিদগুলিকে পরিচ্ছন্ন ও সুগন্ধময় করে রাখতে হবে। আয়েশা (রা) বলেন,

أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّورِ وَأَنْ تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبَ

রাসূলুল্লাহ ﷺ আবাসিক বাড়িঘরের মধ্যে (আবাসিক এলাকায়) মসজিদ তৈরি করতে, মসজিদগুলিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে এবং সেগুলিকে সুগন্ধময় করতে নির্দেশ দিয়েছেন।[৫]

হাযেরীন, মসজিদ ইবাদতের জন্য। মসজিদ বানিয়ে সেখানে বেশি বেশি ইবাদত করার মধ্যেই নাজাত। যদি মসজিদ বানিয়ে গৌরব-অহংকার করা হয় তবে তা ধ্বংসের কারণ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ

"মানুষ মসজিদ নিয়ে পরস্পরে গৌরব-অহঙ্কার না করা পর্যন্ত কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে না।"[৬]

হাযেরীন, আজকাল আমরা প্রায় সকলেই মসজিদ নিয়ে এরূপ পাপে লিপ্ত। মসজিদের চাকচিক্য বাড়াতে বা কিছু টাকাপয়সা পাওয়ার উদ্দেশ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা সমাজের বেনামাযী, সুদখোর, ঘুষখোর, নেশাখোর ফাসেকদেরকে মসজিদ কমিটির দায়িত্বশীল বানিয়ে দিই। এরূপ মানুষদের পিছনে ধর্ণা দিই। এরূপ মানুষদেরকেও অবশ্যই দীনের পথে দাওয়াত দিতে হবে, মসজিদে আসতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

---

[১] আবূ দাউদ, আস-সুনান ১/১৪৪; আলবানী, সহীহুত তারগীব ১/৬২। হাদীসটি সহীহ।
[২] মুসলিম, আস-সহীহ ১/৪৫২।
[৩] মুসলিম, আস-সহীহ ১/৪৬৪।
[৪] বুখারী, আস-সহীহ ১/১৭২; মুসলিম, আস-সহীহ ১/৩৭৮, ৪/২২৮৭।
[৫] তিরমিযী, আস-সুনান ২/৪৮৯-৪৯০; আবু দাউদ, আস-সুনান ১/১২৪; ইবনু মাজাহ, আস-সুনান ১/২৪৯-২৫০; আলবানী, সাহীহাহ ৬/২২৩।
[৬] আবূ দাউদ, আস-সুনান ১/১২৩; নাসাঈ, আস-সুনান ২/৩২; আলবানী, সহীহ আবী দাউদ ১/৪৪৯। হাদীসটি সহীহ।

তবে আমরা দাওয়াত দিতে তাদের কাছে যাই না, ববং করুণা নিতে যাই এবং তাদের পাপকে প্রশ্রয় দিই। আমরা প্রকারান্তে তাদেরকে বুঝাই যে, তারা মসজিদে কিছু সাহায্য করলে তাদের এ সকল পাপাচার প্লাস-মাইনাস হয়ে মাফ হয়ে যাবে! অথচ মসজিদ আবাদকারীদের পরিচয় দিয়ে আল্লাহ বলেন:

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

আল্লাহর মাসজিদগুলি তো প্রতিষ্ঠা-রক্ষণাবেক্ষণ করে তো একমাত্র তারাই যারা আল্লাহ ও আখিরাতের উপর বিশ্বাসী, সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করে না। আশা করা যায় যে তারা হিদায়াত-প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"[১]

হাযেরীন, কী হবে মসজিদের চাকচিক্য দিয়ে, আপনার মহান নবীর মহান মসজিদ ছিল একেবারেই কুড়ে ঘরের মত। বৃষ্টি হলে পানিকাঁদায় ভরে যেত। সালাতের পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গায়ে-কপালে কাদা লেগে থাকত। হালাল মালের দীনদার মানুষদের তত্ত্বাবধানে নির্মিত মসজিদে নেককার আলিম ইমামের পিছনে সালাত আদায়ই হলো মূল কথা। যদি এর মধ্য দিয়ে মসজিদকে ইবাদতের জন্য আরামদায়ক করা যায় তবে ভাল। শুধু চাকচিক্যের পিছে ছুটা যাবে না।

হাযেরীন মসজিদের পবিত্রতা রক্ষা করা অত্যন্ত জরুরী। মসজিদের মধ্যে একেবারে বাচ্চাশিশুদের ঢোকানো, ঝগড়াবিবাদ করা, বেচাকেনা করা, হারানো দ্রব্য সন্ধান করা বা এই জাতীয় কথাবার্তা কাজকর্ম করা নিষিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ فِيهِ ضَالَّةً فَقُولُوا لَا رَدَّ اللَّهُ عَلَيْكَ ... فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا

তোমরা যদি দেখ যে, কেউ মসজিদের মধ্যে ক্রয় বা বিক্রয় করছে তাহলে তোমরা বলবে: আল্লাহ যেন তোমার ব্যবসায়ে লাভ না দেন। আর যদি তোমরা দেখ যে কেউ মসজিদের মধ্যে হারানো কিছু খোঁজ করছে তাহলে তোমরা বলবে: তোমরা হারান বস্তু যেন আল্লাহ তোমাকে ফেরত না দেন। কারণ মসজিদগুলিকে এই সকল কাজের জন্য বানানো হয়নি।[২]

একটি যয়ীফ সনদের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ وَخُصُومَاتِكُمْ وَحُدُودَكُمْ، وَشِرَاءَكُمْ وَبَيْعَكُمْ، وَجَمِّرُوهَا يَوْمَ جُمَعِكُمْ، وَاجْعَلُوا عَلَى أَبْوَابِهَا مَطَاهِرَكُمْ

তোমরা তোমাদের মসজিদগুলিকে বিমুক্ত রাখবে তোমাদের শিশুদের থেকে, তোমাদের ঝগড়া বিবাদ থেকে, শরীয়ত নির্ধারিত মৃত্যুদণ্ড ও অন্যান্য শাস্তি কার্যকর করা থেকে, তোমাদের ক্রয় ও বিক্রয় থেকে। তোমরা তোমাদের মসজিদগুলিকে শুক্রবারে আগর-সুগন্ধি জ্বালিয়ে সুগন্ধময় করবে। আর মসজিদের প্রবেশ পথের নিকট ওযুখানা তৈরি করবে।[৩]

মসজিদ যেমন সুগন্ধ করে রাখতে হবে, তেমনি সুগন্ধ দেহ ও মন নিয়ে তথায় যেতে হবে। দুর্গন্ধময় দেহ বা পোশাক নিয়ে মসজিদে যাওয়া বা মুসল্লীদের কষ্ট দেওয়া নিষিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

---

[১] সূরা তাওবা: ১৮ আয়াত।

[২] মুসলিম, আস-সহীহ ১/৩৯৭; তিরমিযী, আস-সুনান ৩/৬১০।

[৩] হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ২/২৫-২৬; আলবানী, যায়ীফুত তারগীব ১/৪৭। হাদীসটির সনদ অত্যন্ত দুর্বল।

مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ ... الْبَصَلَ وَالثُّومَ وَالْكُرَّاثَ ... فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا. حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهَا

যে ব্যক্তি এ দুর্গন্ধময় বৃক্ষ -রসুন, পিয়াজ বা সাদা পিয়াজ জাতীয় তরকারী (leek)- থেকে ভক্ষণ করবে সে যেন আমাদের মসজিদের নিকট আগমন না করে, যতক্ষণ না তার গন্ধ দূর হয়।[১]

আমরা জানি ধুমপায়ীদের দেহ থেকে যে দুর্গন্ধ বের হয় তা পিয়াজ রসুনের দুর্গন্ধের চেয়ে অনেক বেশি কষ্টকর। বিশেষত অধুমপায়ীদের জন্য। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত করুন।

হাযেরীন, মসজিদের অধিকার হলো, মসজিদে প্রবেশ করে বসার আগে অন্তত কিছু নামায আদায় করা। মসজিদে প্রবেশ করে কোনো প্রকার সালাত আদায় না করে বসে পড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাতের খেলাফ। মসজিদে প্রবেশ করে অন্তত দু রাক'আত নফল সালাত আদায় করা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশ এবং তাঁর আচরিত সুন্নাত। তিনি মসজিদে প্রবেশ করে ফরয নামাযে জামাতে দাঁড়াতেন বা খুতবায় দাঁড়াতেন। না হলে অন্তত দুই রাক'আত সালাত আদায় না করে বসতেন না। তাঁর বাড়ির দরজা ছিল মসজিদের মধ্য দিয়ে। সফর থেকে বাড়ি আসলে প্রথমে মসজিদে ঢুকে দুই রাক'আত সালাত আদায় করে মসজিদে বসতেন। এরপর তিনি বাড়িতে প্রবেশ করতেন।[২] আবূ কাতাদা (রা) বলেন,

دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ النَّاسِ قَالَ فَجَلَسْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَجْلِسَ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتُكَ جَالِسًا وَالنَّاسُ جُلُوسٌ قَالَ فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ

আমি মসজিদে ঢুকে দেখি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মানুষদের মাঝে বসে আছেন। তখন আমি বসে পড়লাম। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে বললেন, তুমি দুই রাক'আত সালাত আদায না করে বসলে কেন? আমি বললাম, আমি দেখলাম যে, আপনিও বসে রয়েছেন এবং সকল মানুষই বসে আছে, তাই (আপনার মাজলিসের আদব ও বরকত লাভ ও আপনার কথা শোনার আগ্রহে আমি বসে পড়েছি)। তিনি বলেন, তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করবে তখন সে যেন দু রাক'আত সালাত আদায় না করে না বসে।"[৩]

হাযেরীন, এ দু রাকআত সালাতকে "দুখুলুল মাসজিদ" বা "তাহিয়্যাতুলি মাসজিদ" বলা হয়। দুখুল অর্থ প্রবেশ করা। আর তাহিয়্যা অর্থ সালাম। মসজিদে প্রবেশ করলে মসজিদের একটি "সালাম" বা তাহিয়্যা পাওনা হয়ে যায়, আর তা হলো বসার আগে কিছু সালাত আদায় করা। আমাদের দেশে "দুখুলুল মাসজিদ" বা "তাহিয়্যাতুল মাসজিদ" শুধু জুমুআর দিন আদায় করা হয়। আবার অনেকে মসজিদে ঢুকে প্রথমে বসে পড়েন। এরপর উঠে "তাহিয়্যাতুল মাসজিদ" আদায় করেন। এর অবস্থা হলো কোনো মাজলিসে যেয়ে বসে কিছু সময় গল্প করার পর তাদেরকে সালাম দেওয়া।

হাযেরীন, তাহিয়্যাতুল মাসজিদের উদ্দেশ্য হলো মসজিদে প্রবেশ করে বসার আগেই কিছু সালাত আদায় করা। মসজিদে প্রবেশ করে বসার আগে সরাসরি জামাতে দাঁড়িয়ে গেলেও তাহিয়্যাতুল মসজিদের সুন্নাত আদায় হবে। বসার আগে সুন্নাতে মুআক্কাদা বা সুন্নাতে যায়েদা সালাত আদায় শুরু করলেও তাহিয়্যাতুল মাসজিদের মূল সুন্নাত আদায় হবে। নইলে, মাকরুহ ওয়াক্ত না হলে, অন্তত দুই রাক'আত তাহিয়্যাতুল মসজিদ সুন্নাত নামায আদায় করতে হবে। কোনো নামায না পড়ে মসজিদে

---

[১] বুখারী, আস-সহীহ ১/২৯২-২৯৩; মুসলিম , আস-সহীহ ১/৩৯৩-৩৯৫।
[২] বুখারী, আস-সহীহ ১/১৭০, ৪/১৬০৪; মুসলিম, আস-সহীহ ৪/২১২৩।
[৩] বুখারী, আস-সহীহ ১/১৭০, ৩৯১; মুসলিম, আস-সহীহ ১/৪৯৫।

বসে গেলে এই সুন্নাত পালনের সাওয়াব থেকে আমরা বঞ্চিত হব।

হাযেরীন, মসজিদই মুমিনদের আস্তানা। মসজিদে যাতায়াত ঈমানের প্রমাণ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالإِيمَانِ

"যখন তোমরা কাউকে দেখবে যে, সে নিয়মিত মসজিদে যায়, তখন তোমরা তার ঈমানের সাক্ষ্য দিবে।"[১]

হাযেরীন, মসজিদকে নিজের সবচেয়ে প্রিয়তম স্থান হিসেবে ভালবাসতে হবে। মুমিনের মন এমন হবে যে, মসজিদে আসলেই সবচেয়ে বেশি শান্তি ও আনন্দ অনুভব হয়। কর্মস্থলে, বন্ধুদের মধ্যে বা পরিবারের মধ্যে থেকেও মনটা উদগ্রীব থাকবে মসজিদে যাওয়ার জন্য। এরূপ মন অর্জন করতে পারলে তার জন্য রয়েছে মহা-সুসংবাদ, আল্লাহর আরশের ছায়া। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لا ظِلَّ إِلا ظِلُّهُ.... وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ

সাত প্রকারের মানুষকে আল্লাহ তাঁর ছায়ায় স্থান দান করবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ছাড়া অন্য কোনো ছায়া থাকবে না। .... এবং ঐ ব্যক্তি যার হৃদয় মসজিদসমূহের সাথে সম্পৃক্ত।[২]

হাযেরীন, মুমিনের হৃদয় মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে। মানুষ সারাদিন কর্মব্যস্ত থাকে, কিন্তু তার মন পড়ে থাকে তার বাড়িতে। বাড়িতে আপনজনদের মাঝে আসলে তার মন পরিতৃপ্ত হয়। মুমিনেরও অবস্থা এমনই। কর্মব্যস্ততার মধ্যে বা পরিবারের মধ্যেও তার মনটা পড়ে থাকে মসজিদে, কানটা থাকে আযানের দিকে, চোখ ঘড়ির দিকে। মসজিদে আসলে তার মনটা পরিতৃপ্তি পায়।

অন্য হাদীসে আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

مَا تَوَطَّنَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ الْمَسَاجِدَ لِلصَّلاةِ وَالذِّكْرِ إِلاَّ تَبَشْبَشَ اللَّهُ لَهُ كَمَا يَتَبَشْبَشُ أَهْلُ الْغَائِبِ بِغَائِبِهِمْ إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِمْ

"যদি কোনো মানুষ সালাত ও যিক্‌রের জন্য মসজিদকে নিজের বাড়ি বানিয়ে নেয়, সে ব্যক্তি যখন মসজিদে আগমন করে তখন আল্লাহ ঠিক সেভাবে হাসিমুখে তার অভ্যর্থনা করেন, যেমন কোনো পরিবারের কেউ প্রবাস থেকে ফিরলে তার পরিবারের মানুষেরা হাসিমুখে তার অভ্যর্থনা করে।"[৩]

অন্য হাদীসে আবূ দারদা (রা), রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

الْمَسْجِدُ بَيْتُ كُلِّ تَقِيٍّ وَتَكَفَّلَ اللهُ لِمَنْ كَانَ الْمَسْجِدُ بَيْتَهُ بِالرَّوْحِ وَالرَّحْمَةِ وَالْجَوَازِ عَلَى الصِّرَاطِ إِلَى رِضْوَانِ اللهِ إِلَى الْجَنَّةِ

"মসজিদ হলো সকল নেককার মুত্তাকী মানুষের বাড়ি। যে ব্যক্তি মসজিদকে নিজের বাড়ি বানিয়ে নেবে আল্লাহ তার জন্য দায়িত্ব নিয়েছেন যে, তাকে প্রশান্তি, রহমত দান করবেন এবং পুলসিরাত অতিক্রম করিয়ে তাঁর সন্তুষ্টি ও জান্নাতে নিয়ে যাবেন।"[৪]

মহান আল্লাহ আমাদের অন্তরগুলিকে মসজিদমুখী করে দিন এবং মসজিদকে আমাদের বাড়ি বানিয়ে দিন। আমীন।

---

[১] তিরমিযী, আস-সুনান ৫/২৭৭। হাদীসটি হাসান।
[২] বুখারী, আস-সহীহ ১/২৩৪, ২/৫১৭, ৫/২৩৭৭, ৬/২৪৯৬; মুসলিম, আস-সহীহ ২/৭১৫।
[৩] ইবনু মাজাহ, আস-সুনান ১/২৬২; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ১/৩৩২; আলবানী, সহীহুত তারগীব ১/৭৮। হাদীসটি সহীহ।
[৪] হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ২/২২। হাদীসটি হাসান।

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

أَمَّا بَعْدُ، فَيَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ

الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحَبُّ الْبِلادِ إِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُهَا وَأَبْغَضُ الْبِلادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا.

وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا رَأَيْتُمْ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالإِيمَانِ

بَارَكَ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ فِيْ الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ. وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ. أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ، فَاسْتَغْفِرُوْهُ وَتُوْبُوْا إِلَيْهِ، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.

জুমাদাল উলা মাসের ২য় খুতবা: জুমুআর দিন ও জুমুআর সালাত

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লী আলা রাসূলিহীল কারীম। আম্মা বাদ,

সম্মানিত উপস্থিতি, আজ জুমাদাল উলা মাসের দ্বিতীয় জুমুআ। আজকের খুতবায় আমরা জুমুআর দিন ও জুমুআর সালাত সম্পর্কে আলোচনা করব। কিন্তু তার আগে আমরা এ সপ্তাহের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসগুলির বিষয়ে সংক্ষেপ আলোকপাত করি।

হাযেরীন, আজ ইংরেজী ..... মাসের ..... তারিখ। এ সপ্তাহের দিবসগুলির মধ্যে রয়েছে ..... ।

....

হাযেরীন, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন উম্মাতে মুহাম্মাদীকে 'জুমু'আর দিবসের নেয়ামত দান করেছেন। সৃষ্টির শুরু থেকেই এই দিনটি সবচেয়ে সম্মানিত। কিন্তু পূর্ববর্তী উম্মাতগণ এই দিনটি লাভ করতে পারে নি। এই দিনটির মর্যাদায় অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। কয়েকটি হাদীস শুনুন:

خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا

"সূর্যের নিচে সর্বশ্রেষ্ঠ দিন হলো জুমুআর দিন। এই দিনেই আদমকে আল্লাহ সৃষ্টি করেন, এই দিনেই তাকে জান্নাতে প্রবেশ করান এবং এই দিনেই তাকে জান্নাত থেকে বের করা হয়।"[১]

إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَيِّدُ الأَيَّامِ وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ فِيهِ خَمْسُ خِلالٍ خَلَقَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ وَأَهْبَطَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ إِلَى الأَرْضِ وَفِيهِ تَوَفَّى اللَّهُ آدَمَ وَفِيهِ سَاعَةٌ لا يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا الْعَبْدُ شَيْئًا إِلا أَعْطَاهُ مَا لَمْ يَسْأَلْ حَرَامًا وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ مَا مِنْ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَلا سَمَاءٍ وَلا أَرْضٍ وَلا رِيَاحٍ وَلا جِبَالٍ وَلا بَحْرٍ إِلا وَهُنَّ يُشْفِقْنَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

"সকল দিবসের নেতা ও আল্লাহর নিকট সবচেয়ে মর্যাদাময় দিন হলো জুমুআর দিন। এই দিনটি আল্লাহর নিকট ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের দিনের চেয়েও অধিক মর্যাদাময়। এই দিনের পাঁচটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এই দিনে আল্লাহ আদমকে সৃষ্টি করেন। এই দিনেই তাকে পৃথিবীতে অবতরণ করান। এই দিনেই আল্লাহ আদমকে মৃত্যু দান করেন। এই দিনে এমন একটি সময় আছে যে সময়ে বান্দা আল্লাহর নিকট যা চাইবে আল্লাহ তাকে তাই দিবেন, যদি না সে কোনো হারাম বস্তু চায়। এই দিনেই কেয়ামত সংঘটিত হবে। সকল নৈকট্যপ্রাপ্ত ফিরিশতা, আকাশ, যমিন, বাতাস, পাহাড়, সমুদ্র প্রত্যেকেই শুক্রবারে সন্ত্রস্থ হয়ে পড়ে।[২]

إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ... فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلاةِ فِيهِ فَإِنَّ صَلاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرِمْتَ- أَيْ بَلِيتَ- فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى الأَرْضِ أَجْسَادَ الأَنْبِيَاءِ: أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلام

"তোমাদের দিনগুলির মধ্যে সর্বোত্তম দিন হলো শুক্রবার।... কাজেই, এ দিনে তোমরা আমার উপর বেশি করে দরুদ পাঠ করবে, কারণ তোমাদের দরুদ আমার কাছে পেশ করা হয়।" সাহাবীগণ বলেন : "হে আল্লাহর রাসূল, আপনি তো (কবরের মাটিতে) বিলুপ্ত হয়ে যাবেন, মিশে যাবেন, কী-ভাবে তখন আমাদের দরুদ আপনার নিকট পেশ করা হবে? তিনি বলেন: আমাদের দেহ, নবীদের দেহ ভক্ষণ

---

[১] মুসলিম, আস-সহীহ ২/৫৮৫।

[২] ইবনু মাজাহ, আস-সুনান ১/৩৪৪; বুসীরী, মিসবাহুয যুজাজাহ ১/১২৯; আলবানী, সহীহ সুনানি ইবনি মাজাহ ৩/৮৪। হাদীসটি হাসান।

করা মহান আল্লাহ মাটির জন্য নিষিদ্ধ করেছেন।[১]

হাযেরীন, এই মহান দিনের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্ম হলো জুমু'আর সালাত আদায় করা। আল্লাহ বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"হে ঈমানদারগণ, যখন জুমু'আর দিনে সালাতের জন্য আহ্বান করা হবে, তখন তোমরা আল্লাহর যিক্‌র-এর দিকে ধাবিত হবে এবং ব্যবসা বাণিজ্য পরিত্যাগ করবে। এটিই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে পার।"[২]

সম্মানিত মুসল্লীবৃন্দ, জুমু'আর সালাত আদায় করা মুমিনের অন্যতম ফরয ইবাদত। ইচ্ছাপূর্বক জুমু'আর সালাত ত্যাগ করে এর পরিবর্তে যোহরের সালাত আদায় করাও কঠিন গোনাহের কাজ ও ভয়ঙ্কর শাস্তিযোগ্য অপরাধ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ/مُنَافِقِينَ

"জুমু'আর সালাত পরিত্যাগের অভ্যাস মানুষদের অবশ্যই ছাড়তে হবে। তা না হলে আল্লাহ তাদের অন্তরের উপর মোহর মেরে দিবেন এবং এরপর তারা গাফিল বা মুনাফিকে পরিণত হবে।"[৩]

জুমুআর সালাত সুন্দর রূপে আদায় করার মধ্যে রয়েছে অফুরন্ত পুরস্কার। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا

"যদি কেউ সুন্দর রূপে ওযূ করে, এরপর জুমুআর সালাতে উপস্থিত হয় এবং নীরবে মনোযোগের সাথে (ইমামের খুতবা বা বক্তৃতা) শ্রবণ করে, তবে সে জুমুআ থেকে পরবর্তী জুমুআ পর্যন্ত ৭ দিন এবং অতিরিক্ত ৩ দিনের মধ্যে কৃত তার সকল (সগীরা) গোনাহ ক্ষমা করা হবে। আর যদি কেউ (ইমামের খুতবার সময়) কাঁকর স্পর্শ করে তবে সে জুমুআর সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে।"[৪]

হাযেরীন, জুমুআর সালাতে গমনকারী জিহাদে গমনের সাওয়াব লাভ করবেন। তাবে-তাবেয়ী এযিদ ইবনু আবূ মরিয়ম বলেন, আমি একদিন হেটে হেটে জুমুআর সালাতে যাচ্ছিলাম। এমতাবস্থায় তাবিয়ী আবায়া ইবনু রিফাআহ আমার কাছে এসে বলেন: আপনি সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আপনার এ পদক্ষেপগুলি আল্লাহর রাস্তায়। আমি সাহাবী আবূ আবস (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

مَنْ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ/ فَهُمَا حَرَامٌ عَلَى النَّارِ

"যদি কারো পদদ্বয় আল্লাহর রাস্তায় ধুলিধসরিত হয় তবে সেই পদদ্বয় জাহান্নামের জন্য হারাম হয়ে যায়।"[৫]

হাযেরীন, জুমুআর সালাতে যাওয়ার জন্য অনেক আদব শিক্ষা দিয়েছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ। এগুলির মধ্যে রয়েছে জুম'আর দিনে গোসল করা, সুগন্ধি মাখা এবং সবচেয়ে ভাল পোশাক পরিধান করা, হেঁটে যাওয়া, সকাল সকাল মসজিদে উপস্থিত হওয়া, মসজিদে প্রবেশ করে কিছু সুন্নাত-নফল সালাত আদায়

---

[১] আবূ দাউদ, আস-সুনান ১/২৭৫, ২/৮৮; নাসাঈ, আস-সুনান ৩/৯১; ইবনু মাজাহ, আস-সুনান ১/৩৪৫; সহীহুত তারগীব ১/১৭০। হাদীসটি সহীহ।

[২] সূরা জুমু'আ: ৯ আয়াত।

[৩] মুসলিম, আস-সহীহ ২/৫৯১।

[৪] মুসলিম, আস-সহীহ ২/৫৮৮।

[৫] বুখারী, আস-সহীহ ১/৩০৮, ৩/১০৩৫; তিরমিযী, আস-সুনান ৪/১৭০।

করা, মসজিদের মধ্যে আগেই উপস্থিত কোনো মুসল্লীকে কষ্ট না দেওয়া, কারো ঘাঁড়ের উপর দিয়ে না যাওয়া, দুইজনের মাঝে ঠেলে বসে না পড়া, ইমামের নিকটবর্তী হয়ে বসা, নীরবে মনোযোগের সাথে ইমামের বক্তৃতা শ্রবণ করা ইত্যাদি। এ বিষয়ে কয়েকটি হাদীস শুনুন:

إِنَّ هَذَا يَوْمُ عِيدٍ جَعَلَهُ اللَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ فَمَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ وَإِنْ كَانَ طِيبٌ فَلْيَمَسَّ مِنْهُ وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ

"এই দিনটি (শুক্রবার) ঈদের দিন। আল্লাহ তা'লা মুসলমানদের জন্য এই দিনটিকে (সাপ্তাহিক) ঈদের দিন বানিয়েছেন। কাজেই যে জুমুআয় আগমন করবে, সে যেন গোসল করে। আর যদি তার কাছে কোনো সুগন্ধি থাকে তবে সে যেন তা মাখে। আর তোমরা অবশ্যই মেসওয়াক ব্যবহার করবে।[1]

مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى يَأْتِيَ الْمَسْجِدَ فَيَرْكَعَ إِنْ بَدَا لَهُ وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا (فَلَمْ يَتَخَطَّ أَعْنَاقَ النَّاسِ، وَلَمْ يَلْغُ وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ) ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ حَتَّى يُصَلِّيَ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى

"যদি কেউ জুমুআর দিনে গোসল করে, তার কাছে কোনো সুগন্ধি থাকলে তা মাখে, তার সবচেয়ে ভাল পোশক থেকে পরিধান করে, এরপর মসজিদে গমন করে এবং মসজিদে যেযে তার সাধ্যমত (সুন্নাত নফল) সালাত আদায় করে, কাউকে কষ্ট দেয় না, কারো ঘাড়ের উপর দিয়ে যায় না, দুজনের মাঝে সরিয়ে জায়গা করে না, এরপর নীরবে খুতবা শুনে এবং সালাত আদায় করে, তবে তার এই জুমুআ থেকে পরবর্তী জুমুআ পর্যন্ত পাপের মার্জনা হবে।[2]

مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ ثُمَّ بَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ وَدَنَا مِنَ الإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا

"যদি কেউ জুমআর দিনে উত্তমরূপে গোসল করে, সকাল সকাল মসজিদে গমন করে, বাহনে আরোহন না করে হেটে যায়, ইমামের নিকটবর্তী হয়, মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করে এবং কোনো কথা না বলে তবে তার প্রত্যেক পদক্ষেপে এক বৎসরের নফল সিয়াম ও তাহাজ্জুদের সাওয়াব লাভ করবে।[3]

مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتْ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ

"যদি কেউ জুমাআর দিনে নাপাকীর গোসলের ন্যায় গোসল করে এবং প্রথম প্রহরেই মসজিদে রাওয়ানা দেয় তবে সে একটি উট কুরবানী দানের তুল্য সাওয়াব লাভ করবে। আর যে ব্যক্তি দ্বিতীয় প্রহরে গমন করল সে যেন একটি গরু কুরবানী দিল। আর যে ব্যক্তি তৃতীয় পর্যায়ে গমন করল সে যেন একটি শিং ওয়ালা সুন্দর ভেড়া কুরবানী দিল। আর যে চতুর্থ পর্যায়ে গমন করল সে যেন একটি মুরগী দান করল। আর যে পঞ্চম পর্যায়ে গমন করল সে যেন একটি ডিম দান করল। আর যখন ইমাম বেরিয়ে আসেন তখন

[1] ইবনু মাজাহ, আস-সুনান ১/৩৪৯; আলবানী, সহীহুত তারগীব ১/১৭২। হাদীসটি হাসান।

[2] আবূ দাউদ, আস-সুনান ১/৯৪; ইবনু মাজাহ, আস-সুনান ১/৩৪৯; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ২/১৭১, ১৭৫। হাদীসটি সহীহ।

[3] আবূ দাউদ, আস-সুনান ১/৯৫; নাসাঈ, আস-সুনান ৩/৯৫, ৯৭, ইবনু মাজাহ, আস-সুনান ১/৩৪৬; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ১/৪১৮; আলবানী, সহীহুত তারগীব ১/১৬৮। হাদীসটি সহীহ।

ফিরিশতাগণ তাদের (এই বিশেষ সাওয়াবের দফতর বন্ধ করে) ইমামের আলোচনা শুনতে থাকেন।"[১]

হাযেরীন, মুসল্লীগণ যেন মনোযোগ দিয়ে খুতবা শুনেন এবং অন্যদেরকে শুনতে দেন সেজন্য খুতবা চলাকানীন সময়ে সামান্যতম কথা বলা নিষিদ্ধ ও হারাম করা হয়েছে। এমনকি কাউকে চুপ করতে নির্দেশ দেওয়াও নিষিদ্ধ। উপরন্তু হাত দিয়ে কিছু নাড়াচাড়া করা, কাঁকর সরান ইত্যাদিও নিষেধ করা হয়েছে। এরূপ করলে জুমুআর সাওয়াব থাকবে না। যে ব্যক্তি পরিপূর্ণ মনোযোগ ও নীরবতার সাথে খুতবা শুনবে সে জুমুআর সাওয়াব ছাড়াও অতিরিক্ত ক্ষমা ও পুরস্কার লাভ করবে বলে বিভিন্ন হাদীসে বলা হয়েছে। বস্তুত, জুমআর সালাতের অন্যতম ইবাদত হলো ইমামের খুতবা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করা। খুতবার উদ্দেশ্য হলো প্রতি সপ্তাহে মুসল্লীদেরকে প্রয়োজনীওও নসীহত ও দিক নির্দেশনা প্রদান করা। আরবীতে খুতবা অর্থ বক্তৃতা। রাসূলুল্লাহ ﷺ খুতবাকে "ওয়ায" বলে আখ্যায়িত করে বলেন:

مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَسَّ مِنْ طِيبِ امْرَأَتِهِ إِنْ كَانَ لَهَا وَلَبِسَ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ ثُمَّ لَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ وَلَمْ يَلْغُ عِنْدَ الْمَوْعِظَةِ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهُمَا وَمَنْ لَغَا وَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ كَانَتْ لَهُ ظُهْرًا

"যদি কেউ জুমুআর দিনে গোসল করে, তার স্ত্রীর নিকট সুগন্ধি থাকলে তা মাখে, ভাল পোশাক পরিধান করে, মানুষের ঘাড়ের উপর দিয়ে না যায় এবং ওয়াযের সময় কথা না বলে, তবে দুই জুমুআর মধ্যবর্তী সময়ের জন্য পাপের মার্জনা করা হবে। আর যদি কেউ কথা বলে এবং মানুষের ঘাড়ের উপর দিয়ে যায় তবে তার জুমুয়া যোহরে পরিণত হবে (জুমুআর কোনো ফযীলত বা সাওয়াব সে পাবে না।)"[২]

হাযেরীন, খুতবা ভালভাবে শ্রবণ ও হৃদয়ঙ্গম করার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসল্লীদেরকে ইমামের নিকটবর্তী হয়ে বসতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন:

احْضُرُوا الذِّكْرَ (الْجُمُعَةَ) وَادْنُوا مِنَ الإِمَامِ فَإِنَّ الرَّجُلَ لا يَزَالُ يَتَبَاعَدُ حَتَّى يُؤَخَّرَ فِي الْجَنَّةِ وَإِنْ دَخَلَهَا

"তোমরা জুমুআর খুতবায় উপস্থিত হবে এবং ইমামের নিকটবর্তী হবে। কারণ মানুষ নিয়মিত দূরে বসতে থাকলে সে জান্নাতে প্রবেশ করলেও তাকে জান্নাতে দূবরর্তী ও পশ্চাদপদ রাখা হবে।"[৩]

হাযেরীন, খুতবা মনদিয়ে শোনার জন্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ বারংবার নির্দেশ দিয়েছেন সকাল সকাল মসজিদে যেতে। এ অর্থের কয়েকটি হাদীস আমরা দেখেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ সাধারণত সূর্য মধ্যগগণ থেকে ঢলে পড়ার সাথে সাথেই জুমুআর সালাতের খুতবা শুরু করতেন।[৪] এজন্য বারংবার জুমুআর দিনে (غدوة) বা বেলা গড়ার পূর্বেই মসজিদে যেতে বলেছেন। ইলমের ফযীলত আলোচনায় দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যদি কোনো ব্যক্তি ভাল কিছু কথা শেখার বা শেখানোর উদ্দেশ্যে দ্বিপ্রহরের পূর্বেই মসজিদে গমন করে, তবে সে ব্যক্তি একটি পরিপূর্ণ হজ্জের সাওয়াব লাভ করবে।" অন্য হাদীসে আমরা দেখেছি যে, ইমামের আলোচনা শুরুর পূর্ব পর্যন্ত ফিরিশতাগণ বিশেষ সাওয়াব লিখতে থাকেন।

হাযেরীন, খুতবার উদ্দেশ্য ওয়ায এবং মুসল্লীদের মনে পরিবর্তন আনয়ন করা। এজন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত হলো, খতীব তার খুতবার বক্তব্যের সাথে নিজের আবেগ প্রকাশ করবেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন খুতবা দিতেন তখন তাঁর চক্ষুদ্বয় লাল হয়ে যেত, কণ্ঠস্বর উচ্চ হতো, বিষয়বস্তুর সাথে তার কঠিন আবেগ বা ক্রোধ প্রকাশ পেত। তিনি খুতবার শুরুতে আল্লাহর প্রশংসা ও শাহাদাতাইনের পরে কুরআন

---

[১] বুখারী, আস-সহীহ ১/৩০১; মুসলিম, আস-সহীহ ২/৫৮২।

[২] আবূ দাউদ, আস-সুনান ১/৯৫; ইবনু খুযাইমা, আস-সহীহ ৩/১৫৬; আলবানী, সহীহুত তারগীব ১/১৭৬। হাদীসটি হাসান।

[৩] আবূ দাউদ, আস-সুনান ১/২৮৯; আলবানী, সহীহুত তারগীব ১/১৭৪; সহীহু সুনানি আবী দাউদ ৩/১০৮। হাদীসটি হাসান।

[৪] বুখারী, আস-সহীহ ১/৩০৭।

ও সুন্নাত আঁকড়ে ধরতে এবং বিদ'আত পরিহার করতে নির্দেশ দিতেন। অধিকাংশ সময় তিনি খুতবার মধ্যে কুর্আন কারীমের বিভিন্ন সূরা পাঠ করে ওয়ায করতেন। দুনিয়ার ক্ষণস্থায়িত্ব চিন্তা করতে এবং মনগুলিকে আখিরাতমুখি করার জন্য নসীহত করতেন।[১]

সমবেত মুসল্লীদেরকে নসীহত করা ছাড়াও খুতবা চলাকালীন সময়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসল্লীদের মধ্যে কারো সাথে প্রয়োজনীয় কথা বলতেন ও ব্যক্তিগত আদেশ নিষেধ প্রদান করতেন। একদিন খুতবা চলাকালীন সময়ে একজনকে মুসল্লীদের ঘাড়ের উপর দিয়ে সামনে আসতে দেখে তাকে বলে, তুমি বসে পড়, তুমি তো মানুষদেরকে কষ্ট দিচ্ছ। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদকে মসজিদের দরজার কাছে বসে দেখে তিনি খুতবা থামিয়ে তাকে ডেকে বলে, তুমি সামনে এস। খুলাফায়ে রাশেদীনও প্রয়োজনে এরূপ করতেন। একদিন উমার (রা) খুতবা দিচ্ছিলেন। এ সময়ে উসমান (রা) মসজিদে প্রবেশ করেন। উমার (রা) খুতবা থামিয়ে বলেন, এ কোন্ সময় হলো? (এত দেরি হলো কেন?) উসমান (রা) বলেন, কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। আযান শুনেই বাড়ি এসে ওযূ করেই চলে এসেছি। উমার (রা) বলেন: শুধু ওযূ করে? অথচ আপনি জানেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ জুমুআর দিনে গোসল করতে বলেছেন।[২]

হাযেরীন, জুমুআর দিনে দুআ কবুলের একটি বিশেষ মুহূর্ত রয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا خَيْرًا إِلا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ قَالَ وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيفَةٌ

"জুমুআর দিনের মধ্যে একটি সময় আছে কোনো মুসলিম যদি সে সময়ে আল্লাহর নিকট কিছু প্রার্থনা করে তবে আল্লাহ তাকে তা প্রদান করেন। তিনি বলেন: তা খুবই সংক্ষিপ্ত সময়।"[৩]

এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, ইমাম খুতবা দেওয়ার জন্য মিম্বারে বসা থেকে জুমুআর সালাতে শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ের মধ্যে মুহূর্তটি থাকে।[৪] অন্যান্য বর্ণনায় দেখা যায় যে, জুমুআর দিন আসরের পরে সূর্যাস্তের পূর্বে এ মুহূর্তটি থাকে।[৫] রাসূলুল্লাহ ﷺ খুতবার মধ্যে মাঝে মাঝে দুআ করতেন।

হাযেরীন, জুমুআর দিনের এত ফযীলত দেখে মনের আবেগে ইচ্ছামত ইবাদত বন্দেগী করা যাবে না; বরং সুন্নাতের নির্দেশনার আলোকে ইবাদত করতে হবে। জুমুআর ফযীলতের দিকে লক্ষ্য রেখে কেউ হয়ত এ দিনে রোযা রাখার বা জুমুআর রাতে খাস করে তাহাজ্জুদ পড়ার বা একটু বেশি করে পড়ার রীতি করতে পারেন। কিন্তু এরূপ করতে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন:

لا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي وَلا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الأَيَّامِ

....لا يَصُمْ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ أَوْ يَصُومَ بَعْدَهُ

"তোমরা জুমুআর রাতকে সালাতের জন্য খাস করবে না এবং জুমুআর দিনকে সিয়ামের জন্য খাস করো না ... আগে বা পরে রোযা না রেখে শুধু জুমুআর দিনে তোমাদের কেউ রোযা রাখবে না।"[৬]

হাযেরীন, এদিনের সুন্নাত সম্মত বিশেষ আমলের মধ্যে রয়েছে বেশি বেশি দরূদ শরীফ পাঠ করা। এ বিষয়ে একটি হাদীস আমরা শুনেছি। অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ আমল জুমুআর দিনে ও রাতে সূরা কাহফ তেলাওয়াত করা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

---

[১] বুখারী, আস-সহীহ ৩/১১৮০, ৩/১১৯১, ৪/১৮২১; মুসলিম, আস-সহীহ ২/৫৮৯-৫৯৫; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ১/৪২৩।
[২] বুখারী, আস-সহীহ ১/৩০০, ৩১৫; আবূ দাউদ, আস-সুনান ১/২৫৭, ২৮৬, ২৯২: বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা ৩/২০৬, ২৩৬,
[৩] বুখারী, আস-সহীহ ১/৩১৬; মুসলিম, আস-সহীহ ২/৫৮৩-৫৮৪।
[৪] মুসলিম, ২/৫৮৪।
[৫] খাতীব তাবরীযী, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ, মিশকাতুল মাসাবীহ, তাহকীকুল আলবানী ১/৪২৮-৪২৯।
[৬] মুসলিম, আস-সহীহ ২/৮০১।

مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِيْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ.

"যদি কেউ জুমুআর দিনে সূরা কাহ্ফ পাঠ করে তবে তা তার দুই জুমুআর মধ্যবর্তী সময়কে নূরে উদ্ভাসিত করে দেয়।"[১]

হাযেরীন, খাস করে জুমুআর দিনে সিয়াম পালনে আপত্তি থাকলেও আগের বা পরের দিনের সাথে মিলিয়ে বা নিয়মিত তারিখে পড়ে গেলে জুমুআর দিনে সিয়াম পালন করা যায়। এছাড়া এর সাথে অন্যান্য মানবসেবামূলক নেক কর্ম করতে উৎসাহ দিয়েছেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)। তিনি বলেন:

خَمْسٌ مَنْ عَمِلَهُنَّ فِيْ يَوْمٍ كَتَبَهُ اللهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْ عَادَ مَرِيْضاً وَشَهِدَ جَنَازَةً وَصَامَ يَوْماً وَرَاحَ إِلَى الْجُمُعَةِ وَأَعْتَقَ رَقَبَةً

"যদি কেউ একদিনে পাঁচটি কর্ম করে তবে তাকে আল্লাহ জান্নাতবাসী হিসেবে লিপিবদ্ধ করেন: অসুস্থ মানুষকে দেখতে যাওয়া, মৃত ব্যক্তির জানাযায় শরীক হওয়া, দিবসে সিয়াম পালন করা, জুমুআয় গমন করা এবং দাস মুক্ত করা।"[২]

হাযেরীন, এগুলি সবই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নেক আমল। সহীহ হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, যে কোনো অসুস্থ মানুষকে এক নযর দেখতে গেলে ৭০ হাজার ফিরিশতা তার জন্য সারা দিনরাত দুআ করবেন, কারো জানাযায় শরীক হলে একটি পাহাড় পরিমাণ সাওয়াব এবং দাফন পর্যন্ত থাকলে দুটি পাহাড় পরিমান সওয়াব লাভ হবে। সমাজ থেকে দাসপ্রথা উচ্ছেদের জন্য ইসলামে ক্রীতদাস মুক্ত করাকে অন্যতম ইবাদত বলে গণ্য করা হয়। বর্তমানে আইনগতভাবে দাসপ্রথা উচ্ছেদ হলেও অনেক ক্ষেত্রেই শ্রমিকগণ দাসদের মতই আচরণ পান। তাদের অর্থনৈতিক বিমুক্তির জন্য অর্থ ব্যয়ও অনুরূপ ইবাদত। আর সিয়াম ও জুমুআর সাওয়াব আমরা জানি। আর যদি এ কর্মগুলি একত্রে একদিনে করা যায় তবে তাঁর জন্য জান্নাতের মহা সুসংবাদ। অন্য হাদীসে আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ صَائِمًا قَالَ أَبُو بَكْرٍ ﷺ أَنَا قَالَ فَمَنْ تَبِعَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ جَنَازَةً قَالَ أَبُو بَكْرٍ ﷺ أَنَا قَالَ فَمَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مِسْكِينًا قَالَ أَبُو بَكْرٍ ﷺ أَنَا قَالَ فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيضًا قَالَ أَبُو بَكْرٍ ﷺ أَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا اجْتَمَعْنَ فِي امْرِئٍ إِلا دَخَلَ الْجَنَّةَ

"তোমাদের মধ্যে আজ কে সিয়ামরত ছিলে? আবু বকর (রা) বলেন: আমি। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) প্রশ্ন করেন: তোমাদের মধ্যে কে আজ কোনো জানাযায় শরীক হয়েছ? আবু বকর (রা) বলেন: আমি। তিনি প্রশ্ন করেন: তোমাদের মধ্যে কে আজ দরিদ্রকে খাদ্য প্রদান করেছ ? আবু বকর (রা) বলেন: আমি। তিনি আবার প্রশ্ন করেন: আজ তোমাদের কে অসুস্থ কোনো মানুষকে দেখতে গিয়েছ ? আবু বকর বলেন: আমি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : এই কর্মগুলি যদি কোনো মানুষের মধ্যে একত্রিত হয় তাহলে সেই ব্যক্তি অবশ্যই জান্নাতী হবেন।"[৩]

আল্লাহ এ সকল কাজকে আমাদের নিয়মিত অভ্যাস বানিয়ে দিন। আমীন।

---

[১] হাকিম, আল-মুসতাদরাক ২/৩৯৯; যিয়া মাকদিসী, আল-মুখতারাহ ২/৫০-৫১; আলবানী, সহীহুত তারগীব ১/১৮০। হাদীসটি সহীহ।
[২] ইবনু হিব্বান, আস-সহীহ ৭/৬; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ২/১৬৯; আলবানী, সহীহুত তারগীব ১/১৬৭। হাদীসটি সহীহ।
[৩] সহীহ মুসলিম ২/৭১৩, নং ১০২৮।

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

أَمَّا بَعْدُ، فَيَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى

ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَسَّ مِنْ طِيبِ امْرَأَتِه إِنْ كَانَ لَهَا وَلَبِسَ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ ثُمَّ لَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ وَلَمْ يَلْغُ عِنْدَ الْمَوْعِظَةِ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهُمَا وَمَنْ لَغَا وَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ كَانَتْ لَهُ ظُهْرًا

بَارَكَ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ فِيْ الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ. وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ. أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ، فَاسْتَغْفِرُوْهُ وَتُوْبُوْا إِلَيْهِ، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.

জুমাদাল উলা মাসের ৩য় খুতবাঃ মৃত্যু, জানাযা ও দুআ

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লী আলা রাসূলিহীল কারীম। আম্মা বাদ,

সম্মানিত উপস্থিতি, আজ জুমাদাল উলা মাসের তৃতীয় জুমুআ। আজ আমরা মৃত্যু, জানাযা ও প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ। কিন্তু তার আগে আমরা এ সপ্তাহের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসগুলির বিষয়ে সংক্ষেপ আলোকপাত করি। হাযেরীন, আজ ইংরেজী ..... মাসের ..... তারিখ। এ সপ্তাহের দিবসগুলির মধ্যে রয়েছে .... ।

হাযেরীন, মৃত্যুই প্রতিটি জীবনের অমোঘ পরিণতি। নিজের মৃত্যু আমরা চাই না, উপরন্তু মৃত্যুর কথা চিন্তাও করতে চাই না। আপনজনদের মৃত্যুতে ব্যথিত হই। কিন্তু শত আপত্তি, বেদনা আর অনিচছা সত্ত্বেও মৃত্যুই জীবনের সবচেয়ে বড় সত্য। আরো বড় সত্য হলো কখন মরব তা আমরা কেউই জানি না। সবচেয়ে বড় কথা হলো যে জীবনের জন্য আমরা এত লালায়িত সে জীবনটি মৃত্যু পরবর্তী জীবনের তুলনায় কিছুই নয়। এজন্য জীবনের বাস্তবতাকে মেনে নিযে মৃত্যুর প্রস্তুতি নেওয়া দরকার। যে আগন্তুককে কোনোভাবে ফেরানো যাবে না, তাকে অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত থাকাই তো বুদ্ধিমানের কাজ। আর তার অভ্যর্থনার জন্য সবচেয়ে ভাল বিষয় হলো তার আগমনের কথা বারংবার স্মরণ করা। দুনিয়াতে আল্লাহ পাঠিয়েছেন, যে কয়দিন তিনি বাঁচিয়ে রাখবেন ভালভাবে বেঁচে থাকার চেষ্টা করতে হবে, দুনিয়ার সফলতার চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু কখনোই তা আখিরাত নষ্ট করে নয়। চলে যেহেতু যেতেই হবে, কি হবে আর অকারণ বিবাদ করে। যতটুকু পারা যায় নিরিবিলি ভালবেসে যায়। অন্তত গোনাহটা কম হবে। অন্তত মানুষ মরার পরে একবার হলেও দুআ করবে।

হাযেরীন, অসুখে ধৈর্য ধরতে হবে। কারণ সকল অসুস্থতা ও কষ্ট মুমিনের জন্য সাওয়াব বয়ে আনে। মুখে স্বাভাবিক বেদনা বা কষ্ট প্রকাশে অসুবিধা নেই। তবে অসুস্থতার জন্য আল্লাহকে বা ভাগ্যকে দোষ দেওয়া, আপত্তিকর কথা বলা অবশ্যই পরিহার করতে হবে। এতে কখনোই বিপদ কাটে না, শুধু শুধু গোনাহ হয়। কোনো কষ্টেই মৃত্যু কামনা করা যাবে না। জীবনটা আল্লাহর দেয়া সবচেয়ে বড় নেয়ামত। একে নষ্ট করা বা আত্মহত্যা করা তো দূরের কথা, শত কষ্টেও মৃত্যু কামনা করা যাবে না। এ কামনা মৃত্যুকে এগিয়ে আনে না, কষ্ট কমায় না, কিন্তু মুমিনের সাওয়াব নষ্ট করে ও গোনাহ অর্জন করায়। আব্বাস (রা) অসুস্থ হয়ে মৃত্যু কামনা করেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, চাচা, মৃত্যু কামনা করবেন না। আপনি যদি নেককার হন তবে জীবন বাড়লে নেকি বাড়বে। আর যদি বদকার হন তবে জীবন বাড়লে তাওবার সুযোগ বাড়বে। কাজেই কোনো অবস্থাতেই মৃত্যু কামনা করবেন না।[১] অন্য হাদীসে তিনি বলেছেন যে, একান্তই বাধ্য হলে কেউ বলতে পারে, হে আল্লাহ, যতক্ষণ আমার জন্য জীবন কল্যাণকর ততক্ষণ আমাকে জীবিত রাখুন। আর যখন আমার জন্য মৃত্যু অধিকতর কল্যাণকর হয় তখন আমাকে মৃত্যু দিন।[২]

হাযেরীন, সকল মুমিনেরই উচিত মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকা। মানুষের পাওনা থাকলে আদায় করে দেওয়া বা আদায়ের ব্যবস্থা রাখা ও ওসিয়্যত করা। একটি বিশেষ ওসিয়ত সকল মুমিনেরই করা উচিত, তা হলো, তাকে যেন পরিপূর্ণ সুন্নাত পদ্ধতিতে দাফন করা হয়। প্রথম হিজরী শতকের শেষ দিকে যখন নও মুসলিমদের কারণে পূর্ববর্তী বা পার্শবর্তী ধর্মের রীতির প্রভাবে জানাযা, কবর ইত্যাদি বিষয়ে কিছু কিছু ব্যতিক্রম দেখা দিতে লাগল, তখন সাহাবী-তাবিয়ীগণ এরূপ ওসিয়্যত করতেন।

---

[১] হাকিম, আল-মুসতাদরাক ১/৪৮৯।

[২] বুখারী, আস-সহীহ ৫/২১৪৬, ২৩৩৭; মুসলিম ৪/২০৬৪।

হাযেরীন, মানুষের আখিরাতের সফলতা নির্ভর করে তার কর্মের উপর। কাজেই শুধু মৃত্যুকালীন অবস্থা দেখে তাকে ভাল বা মন্দ বলা যায় না। তবে কোনো কোনো মৃত্যুকে ভাল মৃত্যু বলা যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যার জীবনের সর্বশেষ কথা হবে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" সে ব্যক্তি এক সময় না এক সময়- শাস্তিভোগের পরে হলেও- জান্নাতে প্রবেশ করবে।[১] অন্য হাদীসে তিনি বলেন, মুমিনের মৃত্যু হয় কপালের ঘামের মধ্য দিয়ে।[২] অন্য হাদীসে তিনি বলেন: "কোনো মুসলিম শুক্রবারের দিবসে বা রাত্রে মৃত্যুবরণ করলে আল্লাহ তাকে কবরের শাস্তি থেকে রক্ষা করেন।"[৩] অর্থাৎ তার কর্মের হিসাব ও পুরস্কার বা শস্তি কিয়ামতের দিন হবে, তবে কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত কবরের শাস্তি থেকে সে রক্ষা পাবে।

হাযেরীন, শাহাদত বা শহীদী মৃত্যুর মর্যাদার কথা আমরা সকলেই জানি। বিভিন্ন সহীহ হাদীসে নিম্নরূপ মৃত্যুকে শাহাদাত বা শহীদী মৃত্যু বলা হয়েছে: (১) প্লেগ বা মহামারীতে মৃত্যু, (২) পেটের পীড়ায় মৃত্যু, (৩) পানিতে ডুবে, ধ্বংসস্তুপে বা বাড়িঘর ধ্বসে মৃত্যু, (৪) সন্তান প্রসবের অসুস্থতায় মৃত্যু, (৫) অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু, (৬) বক্ষোগ্রহ (pleurisy) বা বক্ষব্যধিতে মৃত্যু, (৭) যক্ষারোগে মৃত্যু, (৮) নিজের জীবন, পরিবার পরিজন, সম্ভ্রম বা সম্পদ রক্ষার্থে মৃত্যু। এ সকল হাদীসের আলোকে আমরা বুঝতে পারি যে, সকল দুরারোগ্য ব্যাধির কারণে মৃত্যু, অস্বাভাবিক বা কষ্টকর মৃত্য, নিজের অধিকার রক্ষার জন্য মৃত্যু এবং মাজলূম হয়ে নিহত হওয়া শাহাদাত বলে গণ্য।[৪]

মৃত্যুপথযাত্রী অসুস্থ ব্যক্তিকে বা মৃত ব্যক্তিকে দেখতে গেলে তার জন্য ও তার পরিজনদের জন্য ভাল দুআ করতে হবে। এ সময়ের দুআয় ফিরিশতাগণ আমীন বলেন বলে সহীহ হাদীসে বলা হয়েছে।[৫]

মৃত্যুপথযাত্রী অসুস্থ মানুষকে কালিমা বা শাহাদাতাইনের তালকীন করতে হবে, অর্থাৎ তাকে কালিমা পাঠের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে। কারো মৃত্যু হলে উপস্থিত ব্যক্তিদের জন্য সুন্নাত নির্দেশিত দায়িত্ব হলো, তার চক্ষুদ্বয় বন্ধ করে দেওয়া, তার জন্য ও তার পরিজনদের জন্য দুআ করা, একটি বড় কাপড়ে তার পুরো দেহ আবৃত করা এবং তাকে দ্রুত দাফনের ব্যবস্থা করা।

হাযেরীণ, বিভিন্ন হাদীস থেকে আমরা জনি যে, মৃতকে দাফনের পূর্বেই দ্রুত তার ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্য প্রয়োজনে তার সকল সম্পদ ব্যয় করতে হবে। কারণ তার ঋণ পরিশোধের আগে উত্তরাধিকার বণ্টন হয় না। যদি ঋণ পরিশোধ করার মত সম্পদ তার না থাকে তবে রাষ্ট্রের দায়িত্ব থাকে তা পরিশোধ করার। যদি এরূপ কোনো রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা না থাকে তবে কেউ দয়া করে তার পক্ষ থেকে ঋণ পরিশোধ করলেও হবে। হাদীস শরীফে বারংবার বলা হয়েছে যে, মৃতের ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত আবদ্ধ থাকে এবং ঋণ পরিশোধ করা না হলে তাকে জাহান্নামে দেওয়া হয়।

হাযেরীন, মৃত্যু সবসময়ই বেদনা বয়ে আনে জীবিতদের জন্য। তবে বেদনার প্রকাশকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শিক্ষা হলো, মৃতের আত্মীয়-স্বজনরা তিনদিন পর্যন্ত স্বাভাবিক শোক প্রকাশ করতে পারেন। এ সময়ে স্বাভাবিক নীরব ক্রন্দন, ব্যাথার প্রকাশ ও পোশাক পরিচ্ছদের অপারিপাট্য থাকতে পারে। তিন দিনের পর আর বাহ্যিক শোক বা ক্রন্দন থাকবে না। আর চিৎকার করে ক্রন্দন, হাহুতাশ, বিলাপ, বুক বা গাল চাপড়ানো, চুল ছেড়া বা মাথা মুণ্ডন করা ইত্যাদি সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ।

মৃতের স্বজনদের এ শোকের সময়ে অন্যান্য মুসলিমের দায়িত্ব তাদেরকে সান্তনা দেওয়া ও দুআ

---

[১] আবূ দাউদ, আস-সুনান ৩/১৯০; ইবনু হিব্বান, আস-সহীহ ৭/২৭২; আলবানী, আহকামুল জানাইয, পৃষ্ঠা ১০। হাদীসটি সহীহ।

[২] তিরমিযী, আস-সুনান ৩/৩১০; নাসাঈ, আস-সুনান ৪/৫-৬; ইবনু মাজাহ ১/৪৬৭; আহমদ, আল-মুসনাদ ৫/৩৫০, ৩৫৭, ৩৬০। হাদীসটি হাসান।

[৩] তিরমিযী, আস-সুনান ৩/৩৮৬; আহমদ, আল-মুসনাদ ২/১৬৯; আলবানী, আহকামুল জানাইয, পৃ. ৩৫। হাদীসটি সহীহ।

[৪] বিস্তারিত দেখুন, মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী, আহকামুল জানাইয, পৃ. ৩৪-৪৩।

[৫] মুসলিম, আস-সহহি ২/৬৩৩-৬৩৪।

করা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: যদি কেউ তার মুমিন ভাইকে কোনো বিপদ মুসিবতে সান্তনা দেয় তবে আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিন মহামূল্যবান সবুজ রাজপোশাক পরাবেন।"[১]

হাযেরীন, বিভিন্ন হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, কারো মৃত্যুর পরে যদি তার নিকটতম প্রতিবেশী এবং তার সম্পর্কে অবগত মানুষেরা যদি তার দীনদারী বা পাপাচার সম্পর্কে স্বতস্ফূর্তভাবে প্রশংসা বা নিন্দা করে তবে তা আল্লাহর নিকট কবুল হয়। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, একব্যক্তির মৃত্যুর পরে মানুষেরা তার ধার্মিকতার প্রশংসা করতে থাকেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "পাওনা হয়ে গেল"। অন্য এক ব্যক্তির মৃত্যুর পরে বিভিন্ন মানুষ তার ধার্মিকতার নিন্দা করেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: "পাওনা হয়ে গেল"। এ কথার মর্ম সম্পর্কে সাহাবীরা প্রশ্ন করলে তিনি বলেন: মুমিনগণ দুনিয়াতে আল্লাহর সাক্ষী, কাজেই তারা যাকে ভাল বলল তার জন্য জান্নাত পাওনা হলো। আর তারা যাকে খারাপ বলল তার জন্য জাহান্নাম পাওনা হলো।[২] অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَشْهَدُ لَهُ أَرْبَعَةُ أَهْلِ أَبْيَاتٍ مِنْ جِيرَانِهِ الأَدْنَيْنَ أَنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ مِنْهُ إِلاَّ خَيْراً، إِلاَّ قَالَ اللهُ تعالى وتبارك: قَدْ قَبِلْتُ فِيهِ عِلْمَكُمْ فِيهِ وَغَفَرْتُ لَهُ مَا لا تَعْلَمُونَ

যদি কোনো মুসলিমের মৃত্যুর পরে তার নিকটতম প্রতিবেশীদের মধ্য থেকে ৪ ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, তারা তার সম্পর্কে ভাল ছাড়া খারাপ কিছুই জানে না, তাহলে মহান আল্লাহ বলেন, তোমরা তার বিষয়ে যা জান তার পক্ষে আমি তা কবুল করে নিলাম, এবং তার বিষয়ে তোমরা যা জান না তার সে সকল অপরাধ আমি ক্ষমা করে দিলাম।"[৩]

আমাদের দেশে অনেক সময় মৃতদেহ সামনে রেখে সালাতুল জানাযার আগে সমবেতদেরকে প্রশ্ন করা হয়, লোকটি কেমন ছিল? সমবেত মানুষের বলেন, লোকটি ভাল ছিল। এ প্রক্রিয়াটি সুন্নাত বিরোধী কর্ম ও একেবারেই আত্মপ্রবঞ্চনা মাত্র। রাসূলুল্লাহ ﷺ বা সাহাবীগণ কেউ কখনোই এভাবে মুসল্লীদেরকে প্রশ্ন করেন নি। হাদীসে স্বতস্ফূর্ত প্রশংসার মূল্যায়ন করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন হাদীস থেকে সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, প্রশংসা বা নিন্দা দীনদারী বিষয়ক হতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা হাদীস শরীফে বারংবার বিষয়টিকে সাক্ষ্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আর মুমিন আল্লাহর কাছে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে পারেন না। যার বিষয়ে মুমিন অন্তর থেকে জানেন যে, লোকটি বদকার ছিল তার বিষয়ে কি মুমিন সাক্ষ্য দিতে পারেন যে, সে নেককার ছিল? আর এরূপ সাক্ষ্য দিয়ে কি আল্লাহকে প্রতারণা করা যাবে? এজন্য মূল বিষয় হলো মুমিন এমন জীবন যাপন করবেন যে, তার নিকটবর্তীরা তার বিষয়ে ভাল ছাড়া মন্দ জানবেন না, তার দীনদারি ও সদাচারণের কারণে তাদের মুখ থেকে স্বতস্ফূর্তভাবে তার দীনদারির প্রশংসা প্রকাশিত হবে। আর এরূপ সাক্ষ্যের ফলেই আল্লাহ তার গোপন গোনাহগুলি ক্ষমা করবেন এবং তাকে জান্নাত দিবেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ অনেক হাদীসে সালাতুল জানাযায় অংশ নেওয়া ও মৃতের অনুগমন করার গুরুত্ব ও মর্যাদা বর্ণনা করেছেন। ইতোপূর্বে আমরা শুক্রবারে বা সিয়ামরত অবস্থায় সালাতুল জানাযায় শরীক হওয়ার ফযীলত জেনেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেন:

مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ

"যদি কেউ সালাতুল জানাযায় শরীক হয় তবে সে এক কীরাত সাওয়াব লাভ করবে। আর যদি

---

[১] বিস্তারিত দেখুন, মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী, আহকামুল জানাইয, পৃ. ১৬৩।

[২] বুখারী, আস-সহীহ ১/৪৬০, ২/৯৩৪; মুসলিম, আস-সহীহ ২/৬৫৫; আলবানী, আহকামুল জানাইয, পৃ. ৪৪।

[৩] হাকিম, আল-মুসতাদরাক ১/৫৩৪; আহমদ, আল-মুসনাদ ২/৪০৮, ৩/২৪২; আলবানী, আহকামুল জানাইয, পৃ. ৪৫। হাদীসটি সহীহ।

কেউ দাফন শেষ হওয়া পর্যন্ত জানাযার সাথে গমন করে ও উপস্থিত থাকে তবে সে দু কীরাত সাওয়া লাভ করবে। আর একটি কীরাত হলো বিশাল পর্বত পরিমাণ।"[১]

হাযেরীন, জানাযা বহন ও সাথে গমনের সময় সম্পূর্ণ নীরবতা পালন করাই সুন্নাত। এ সময়ে সশব্দে কালিমা পড়া, যিক্র করা, কথা বলা, ক্যাসেট বাজানো ইত্যাদি সবই সুন্নাত বিরুদ্ধ বিদ'আত ও মাকরুহ কর্ম। হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ইমাম আল্লামা কাসানী বাদাইউস সানাইয় কিতাবে লিখেছেন: "জানাযার অনুসরণের সময় নীরবতাকে স্থায়ী করবে বা পরিপূর্ণ নীরবতা পালন করবে। এ সময়ে সশব্দে যিক্র করা মাকরূহ। কারণ হযরত কাইস ইবনু উবাদাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণ তিন সময়ে শব্দ করা মাকরূহ জানতেন: যুদ্ধের সময়, জানাযার সময় ও যিক্রের সময়। এছাড়া এতে ইহুদী নাসারাদের অনুকরণ করা হয়, কাজেই তা মাকরূহ হবে।"[২]

হাযেরীন, কবর পাকা করার রীতি অনেক পুরাতন। প্রাচীনকাল থেকে মানুষের মৃত স্বজনের স্মৃতি রক্ষার্থে কবর পাকা করত, এমনকি পিরামিড তৈরি করত। আরব দেশেও এরূপ প্রচলন ছিল বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ করতে কঠিনভাবে নিষেধ করেছেন। এক হাদীসে জাবির (রা) বলেন:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ

"রাসুলুল্লাহ ﷺ কবর চুনকাম করতে, কবরের উপর বসতে এবং কবরের উপর ইমারত বা ঘর বানাতে নিষেধ করেছেন।[৩] এ অর্থে আরো অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যেগুলি থেকে জানা যায় ৫টি বিষয় রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন: কবর চুনকাম করা, কবরের উপরে বসা, কবর বাঁধানো বা কবরের উপরে ঘর জাতীয় কিছু তৈরি করা, কবরের উপরে লেখা এবং অতিরিক্ত মাটি এনে কবর উঁচু করা।[৪]

শুধু কবর পাকা করা নিষেধই নয়, উপরন্তু পাকা কবর ভেঙ্গে ফেলতে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন।[৫] এ সকল হাদীসে বিপরীতে একটি হাদীসেও তিনি কবর পাকা করার অনুমতি দেন নি। কখনোই তিনি বা সাহাবীগণ কারো কবর পাকা করেন নি। চার ইমাম একে মাকরূহ বা হারাম বলেছেন। হানাফী মাযহাবের অন্যতম ইমাম, ইমাম মুহাম্মাদ (রাহ) বলেন: "আমাদের মত হলো, কবর খুড়তে যে মাটি বেরিয়েছে তা ছাড়া অন্য মাটি এনে কবর উঁচু করা যাবে না। কবরের মাটি দিয়েই শুধু এতটুকু উঁচু করতে হবে যেন কবর বলে চেনা যায়, কেউ তা পদদলিত না করে। কবরকে চুনকাম করা বা কাদা দিয়ে লেপে দেওয়া মাকরুহ। অনুরূপভাবে কবরের নিকট মসজিদ তৈরি করা বা কোনো পতাকা, চিহ্ন, স্তম্ভ বা স্মৃতিচিহ্ন তৈরি করাও মাকরুহ। কবরের উপরে কিছু লিখাও মাকরুহ। ইট দিয়ে কবরের উপরে ঘর বানানো বা কবরের মধ্যে ইট দিয়ে পাকা করা সবই মাকরুহ। তবে (কবরের উপরে) পানি ছিটিয়ে দেওয়াকে আমরা না-জায়েয মনে করি না। এই হলো আবূ হানীফা (রাহ)-এর মত।"[৬]

মাকরূহ অর্থই মাকরূহ তাহরীমী বা হারাম পর্যায়ের মাকরূহ, যাতে গোনাহ হবে। হাযেরীন, টাকা পয়সা খরচ করে গোনাহ কামাই করার কোনো অর্থ হয়? কবর পাকা না করে টাকাগুলি দান করলে মাইয়েত সাওয়াব পেতেন। আর কবর পাকা করলে আপনি গোনাহ পাবেন এবং তারা কিছুই পাবেন না।

হাযেরীন, কবর যিয়ারত করা সুন্নাত সম্মত নেক আমল। সুন্নাতের আলোকে যিয়ারতের উদ্দেশ্য

---

[১] বুখারী, আস-সহীহ ১/৪৪৫; মুসলিম, আস-সহীহ ২/৬৫২-৬৫৩।
[২] কাসানী, বাদাইউস সানাই'য় ১/৩১০।
[৩] সহীহ মুসলিম, কিতাবুল জানাইয, নং ১৬১০।
[৪] আবু দাউদ, নং ৩২৩৫, ৩২২৬, তিরমিযী, ১০৫২, ইবনুল আসীর, জামিউল উসূল ১১/১৪৫-১৪৬।
[৫] সহীহ মুসলিম, কিতাবুল জানায়েজ, নং ৯৬৯।
[৬] [৬] মুহাম্মাদ ইবনে হাসান আশ-শাইবানী, কিতাবুল আসার ২/১৮২-১৯০।

দুটি : (১) আখেরাতের স্মরণ ও (২) মৃতব্যক্তিকে সালাম প্রদান ও তাঁর জন্য দোয়া করা। যিয়ারতের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ কবরবাসীদেরকে সালাম প্রদান করতেন এবং খুবই সংক্ষেপে দোয়া করতেন।

السَّلاَمُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلاحِقُونَ

"মুসলমান ও মুমিন অধিবাসীদের উপর সালাম। আমাদের মধ্য থেকে যারা অগ্রবর্তী (আগে চলে গিয়েছেন) এবং যারা পরবর্তী (যারা এখনো জীবিত রয়েছেন, পরে মৃত্যুবরণ করবেন) সবাইকে আল্লাহ রহমত করেন। আমরাও আল্লাহর মর্জিতে আপনাদের কাছে পৌঁছে যাব।"[১] অন্যান্য সকল হাদীসে কবর যিয়ারতের জন্য এই দোয়াই উল্লেখ করা হয়েছে, সামান্য দুই একটি শব্দের কম-বেশি আছে।

হাযেরীন, প্রিয়জনদের মৃত্যুর পরেও মনের আকুতি থাকে তাদের জন্য কিছু করার বা দেওয়ার। এক্ষেত্রে সন্তানদের মূল দায়িত্ব হলো নিজেরা ইসলাম পালন করা ও বেশি বেশি নেক আমল করা। কারণ সন্তানগণ যে নেক আমলই করুক না কেন তার পূর্ণ সাওয়াব পিতামাতা লাভ করবেন, এতে সন্তানদের সাওয়াব কমবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, সন্তান তার পিতামাতারই উপার্জন।[২] এ জন্য সন্তানের নেক আমলও পিতামাতার উপার্জন বলে গণ্য। বিভিন্ন হাদীস থেকে বিষয়টি জানা যায়।

নিজেদের নেক আমলের পাশাপাশি আরো কিছু কর্ম করার নির্দেশনা হাদীস থেকে পাওয়া যায়। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আগমন করে বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার পিতামাতার মৃত্যুর পর তাদের খেদমতের জন্য আমি কী করতে পারি? তনি বলেন:

الصَّلاَةُ عَلَيْهِمَا وَالاسْتِغْفَارُ لَهُمَا وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لا تُوصَلُ إِلا بِهِمَا وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا

"তাদের জন্য দুআ করা, ক্ষমা প্রার্থনা করা, তদের চুক্তি ও ওয়াদা বাস্তবায়িত করা, তাদের মাধ্যমে প্রাপ্ত রক্তসম্পর্কের আত্মীয়দের আত্মীয়তা রক্ষা করা এবং তাদের বন্ধুদের সম্মান করা।"[৩]

সাহাবী সাদ ইবনু উবাদা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলেন, আমার আম্মার মৃত্যুর সময় আমি কাছে ছিলাম না। এখন আমি যদি দান করি তাহলে কি তিনি সাওয়াব পাবেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: হ্যাঁ। তখন তিনি তার একটি খেজুরের বড় বাগান অথবা একটি পানির কূপ ওয়াকফ দান করেন।[৪]

এভাবে বিভিন্ন হাদীসে মৃতের জন্য দুআ ও দানের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। কুরআন খতম, কালিমা খতম ইত্যাদির কোনো নির্দেশনা কোনো সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয় নি। কোনো কোনো আলিম বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যেহেতু দুআ ও দানের নির্দেশ দিয়েছেন, এগুলির বাইরে যাওয়া অনর্থক। অনেক আলিম বলেছেন যে, যেহেতু দুআ বা দানের সাওয়াব আল্লাহ মৃতকে দেবেন, কাজেই কুরআন বা কালিমা খতমের সাওয়াবও দিতে পারেন, অসুবিধা কী? যদি মৃতের সন্তান বা আপনজনের মৃতকে সাওয়াব দেওয়ার উদ্দেশ্যে কুরআন খতম করেন তবে হয়ত আল্লাহ সে সাওয়াব মৃতকে পৌঁছে দিতেও পারেন। যারা কুরআন পড়তে পারেন না তারা দান ও দুআ করবেন। খতমের জন্য অনুষ্ঠান একেবারেই সুন্নাত বিরোধী কর্ম।

হাযেরীন, দুআ বা দানের জন্য আনুষ্ঠানিকতা ও সময় নির্ধারণও সুন্নাত বিরোধী কর্ম। দুআ মানে

---

[১] সহীহ মুসলিম, কিতাবুল জানাইজ, নং ৯৭৪।

[২] তিরমিযী, আস-সুনান ৩/৬৩৯; আবূ দাউদ, আস-সুনান ৩/২৮৯; নাসাঈ, আস-সুনান ৭/২৪১; ইবনু মাজাহ ২/৭৬৮-৭৬৯। হাদীসটি সহীহ।

[৩] আবূ দাউদ, আস-সুনান ৪/৩৩৬; ইবনু মাজাহ ২/১২০৮; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ৪/১৭১। হাকিম ও যাহাবী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[৪] বুখারী, আস-সহীহ ১/৪৬৭, ৩/১০১৫; মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১২৫৪; আবূ দাউদ ২/১৩০, ৩/১১৬; আলবানী, আহকামুল জানাইয, পৃ. ১৭২।

কখনোই দুআর অনুষ্ঠান নয় বা ৩ দিন, ৭ দিন, ৪০ দিন, জন্মদিন, মৃত্যুদিন ইত্যাদি নির্ধারণ করে দুআ করাও নয়। দুআ অর্থ সন্তান বা আপনজন সর্বদা সুযোগমত সালাতের সময়, নিজের জন্য দুআ করার সময়, অথবা সাধারণভাবে যে কোনো সময় চলতে ফিরতে, বসে, শুয়ে যখনই মনে পড়বে পিতামাতা ও অন্যান্য মৃতদের জন্য আল্লাহর কাছে মাগফিরাত ও রহমত চাওয়া। বিভিন্ন হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, এরূপ দুআ কবুল হলে এর বিনিময়ে আল্লাহ মৃত ব্যক্তির আমলনামায় সাওয়াব লিখে দেন। আপনি যখনই আন্তরিকতা নিয়ে বলবেন "আল্লাহ আমার আম্মাকে মাফ করুন এবং রহমত করুন" অথবা বলবেন "রাব্বির হামহুমা কামা রাব্বাইয়ানী সাগীরা" সঙ্গে সঙ্গে আপনার আম্মার আমল নামায় সাওয়াব লিখা হবে। আর দুআ করার ইবাদত পালনের কারণে আপনার আমল নামায় সাওয়াব লিখা হবে।

আমরা অনেক সময় মনে করি, আমরা গোনাহগার, আমাদের দুআ তো হবে না, দশজন নেককার মানুষ ডেকে এনে তাদেরকে দিয়ে দুআ করাতে হবে। এগুলি সবই ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতার ফল। নেককার মানুষদের সম্মান করা, দাওয়াত করা, খাওয়ানো, হাদিয়া দেওয়া ইত্যাদি সবই গুরুত্বপূর্ণ নেক আমল। সুযোগ ও সাধ্য মত মুমিন এগুলি করবেন। তবে মৃতের দোয়া জন্য দাওয়াত, অনুষ্ঠান, জমায়েত ইত্যাদি সবই সুন্নাত বিরোধী কর্ম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বা সাহাবীগণ কখনো এরূপ করেন নি। আর তাঁদের হুবহু অনুকরণ করাই নাজাতের পথ ও সাওয়াবের নিশ্চয়তা।

হাযেরীন, মৃতের জন্য দানের ক্ষেত্রে সুন্নাত পদ্ধতি হলো ওয়াকফ দান বা স্থায়ী দান। মসজিদ, মাদ্রাসা, ইয়াতিমখানা বা যে কোনো জনকল্যাণমুলক প্রতিষ্ঠানে জমি, ঘর, ঘরের অংশ, ফ্যান, বই-পুস্তক ইত্যাদি স্থায়ীরূপে দান করাই সর্বোত্তম দান। আমরা অনেক সময় দেশীয় লোকাচারের উপর নির্ভর করে অন্ন দান বা কুলখানির ব্যবস্থা করি। দানের এ পদ্ধতি সুন্নাতের ব্যতিক্রম। আমরা হয়ত এর পক্ষে অনেক যুক্তি দিতে পারি। সাহাবীরা খেজুর বাগান বা কূপ দান করেছেন, আমরা বিরিয়ানী দান করলে অসুবিধা কী? কিন্তু মুমিনের প্রশ্ন তো অসুবিধা নিয়ে নয়, মুমিনের প্রশ্ন হলো সাওয়াব বেশি হবে কিসে? আমরা যদি সুন্নাত মত চলতে পারি তাহলে অসুবিধা কী? অগণিত হাদীসে বলা হয়েছে যে, সুন্নাতের ব্যতিক্রম আমল আল্লাহ কবুল করবেন না বা সাওয়াব দেবেন না। তাহলে আমরা কেন সুন্নাতের ব্যতিক্রম করব?

হাযেরীন, আমরা সুবিধা অসুবিধা একটু বিচার করি। আমরা যদি একলক্ষ টাকা খরচ করে চল্লিশা বা কুলখানি করি তাহলে সুন্নাতের ব্যতিক্রম হওয়ার কারণে সাওয়াব না হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। তদুপরি এ সকল অনুষ্ঠানে লৌকিকতা, দলাদলি ইত্যাদি ঘটে থাকে এবং যাদেরকে খাওয়ালে পাপ হয় এমন লোকদেরও খাওয়াতে হয়। এ সকল কারণে সাওয়াব হলেও তা কম হওয়াই স্বাভাবিক। সর্বোপরি কিছু সাওয়াব হলে একদিনই হলো, পরদিন আর এরূপ সাওয়াব হবে না। আর যদি আমরা একলক্ষ টাকা খরচ করে সাহাবীদের পদ্ধতিতে মসজিদে, মাদ্রাসায় বা জনকল্যাণমূলক কাজে কিছু জমি, সম্পদ বা টাকা স্থায়ী দান করি বা মাদ্রাসা বা মসজিদে একটি নলকূপ, অথবা গ্রামের কৃষকদের সেচের জন্য বা জনসাধারণের পানির জন্য একটি ডিপটিউবয়েল স্থায়ীভাবে ওয়াকফ করি তাহলে সুন্নাত পদ্ধতি অনুসরণের ফলে সাওয়াবের নিশ্চয়তা রয়েছে। এছাড়া আমরা জানি যে, সুন্নাত মোতাবেক আমল করলে সাওয়াব বেশি এবং ৫০ জন সাহাবীর সমান সাওয়াব পাওয়া যায়। কাজেই আমরা একলক্ষ টাকা থেকে অনেক বেশি সাওয়াব আশা করতে পারি। সর্বোপরি এই একলক্ষ টাকার সাওয়াব আপনার পিতামাতা বা আপনজনের আমলনামায় প্রতিদিন নতুন করে জমা হতে থাকবে, আপনাকে নতুন করে দান করতে হবে না। মহান আল্লাহ দয়া করে আমাদের অন্তরগুলিকে সুন্নাতের মধ্যে পরিতৃপ্ত বানিয়ে দিন। আমীন।

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

أَمَّا بَعْدُ، فَيَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ

زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ

وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ

وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ

بَارَكَ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ فِيْ الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ. وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ. أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ، فَاسْتَغْفِرُوْهُ وَتُوْبُوْا إِلَيْهِ، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.

জুমাদাল উলা মাসের ৪র্থ খুতবাঃ পোশাক ও পর্দা

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লী আলা রাসূলিহীল কারীম। আম্মা বাদ,

সম্মানিত উপস্থিতি, আজ জুমাদাল উলা মাসের চতুর্থ জুমুআ। আজ আমরা পোশাক ও পর্দা বিষয়ে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ। কিন্তু তার আগে আমরা এ সপ্তাহের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসগুলির বিষয়ে সংক্ষেপ আলোকপাত করি। হাযেরীন, আজ ইংরেজী ..... মাসের ..... তারিখ। এ সপ্তাহের দিবসগুলির মধ্যে রয়েছে .... ।

হাযেরীন, পোশাক-পরিচ্ছদ মানুষের জীবনের অবিচ্ছেদ্য ও সার্বক্ষণিক বিষয়। প্রতিদিন প্রতিনিয়ত মানবদেহকে আবৃত করে রাখে তার পোশাক। পোশাকের মধ্যে যেমন মানুষের ব্যক্তিতের ও রুচির ছাপ ফুটে ওঠে তেমনি পোশাকও মানুষের আভ্যন্তরীন গুণাবলি, ব্যক্তিত্ব ও রুচির উপর প্রভাব বিস্তার করে। পোশাককে মানব সভ্যতার মূল বৈশিষ্ট্য ও আল্লাহর অন্যতম নিয়ামত হিসেবে উল্লেখ করে আল্লাহ বলেন:

يَابَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَــاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ.

"হে আদম সন্তানগণ, তোমাদের লজ্জাস্থান ঢাকবার ও বেশভুষার জন্য আমি তোমাদেরকে পোশাক-পরিচ্ছদ দিয়েছি এবং তাকওয়ার (আত্মরক্ষার) পরিচ্ছদই সর্বোৎকৃষ্ট। তা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।"[১]

ইসলামে পোশাক ব্যবহারের জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে। সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান নীতির কথাটি এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, তা হলো, 'লজ্জাস্থান' বা দেহের গোপন অংশসমূহ (private parts) আবৃত করা। এটিই পোশাকের মূল উদ্দেশ্য। ইসলামী শরীয়তে পুরুষের জন্য নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত স্থান গুপ্তাঙ্গ বা লজ্জাস্থান। দেহের এ অংশটুকু স্ত্রী ছাড়া অন্য মানুষের দৃষ্টি থেকে আবৃত করে রাখা ফরয।

নারীর গুপ্তাঙ্গ আবৃতব্য লজ্জাস্থানের ৪ টি পর্যায় রয়েছে। প্রথম পর্যায়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোন পর্দা নেই, নেই কোন পোষাকের বিধান। দ্বিতীয় পর্যায়ে একজন মুসলিম মহিলার জন্য অন্য মুসলিম মহিলার সামনে নাভী থেকে হাটু পর্যন্ত আবৃত করে রাখা ফরয়। তৃতীয় পর্যায়ে চিরতরে বিবাহ নিষিদ্ধ রক্ত সম্পর্কের নিকটতম পুরুষ "মাহরাম" আত্মীয়দের মুসলিম নারী নিজের শরীর আবৃত করে থাকবেন, তবে মুখ, মাথা, গলা, বাজু, পা অনাবৃত রেখে তাদের সামনে যেতে পারেন।

মুসলিম মেয়েদের পোশাকের চতুর্থ ও সাধারণ পর্যায় হলো অন্যান্য পুরুষদের সামনে। নিকটতম "মাহরাম" আত্মীয় ছাড়া সকল আত্মীয় ও অনাত্মীয় পুরুষের সামনে মেয়েরা তাদের শরীর পুরোপুরি আবৃত করে রাখবেন। এ বিষয়ে সূরা নূর-এর ৩১ আয়াতে আল্লাহ বলেন:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَــاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَــوَاتِهِنَّ أَوْ نِــسَائِهِنَّ أَوْ مَــا مَلَكَــتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّــسَاءِ وَلا

---
[১] সূরা আ'রাফ (৭): আয়াত ২৬।

يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

"মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং লজ্জাস্থানের হিফাজত করে, এই তাদের জন্য অধিকতর পবিত্র। তারা যা করে আল্লাহ সে বিষয়ে অবহিত। এবং মুমিন নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। তারা যেন (স্বভাবতই) যা প্রকাশিত তা ব্যতীত তাদের সৌন্দর্য-অলঙ্কার প্রদর্শন না করে। তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন তারা মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে। তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুস্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, আপন নারীগণ, তাদের মালিকানাধীন দাসী, পুরুষদের মধ্যে যৌন-কামনা রহিত পুরুষ এবং নারীদিগের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ব্যতীত অন্য কারো কাছে তাদের সৌন্দর্য-অলঙ্কার প্রকাশ না করে। তারা যেন তাদের গোপন অলঙ্কার প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না করে। হে মুমিনগণ, তোমরা সকলে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারবে।[১]

এ সকল আয়াত এবং এ বিষয়ক অসংখ্য হাদীসের ভিত্তিতে মুসলিম উম্মাহ একমত যে, মাহরাম ছাড়া সকল আত্মীয় ও অনাত্মীয় পুরুষের সামনে মুমিন নারীর পুরো দেহ আবৃত করে রাখা ফরয। শুধু মুখমণ্ডল ও কবজি পর্যন্ত দু হাতের বিষয়ে ফকীহগণের মতভেদ রয়েছে। কোনো কোনো ফকীহ বলেছেন, মুখমণ্ডল আবৃত রাখা উত্তম, তবে অনাবৃত রাখা বৈধ। অন্যান্য ফকীহ বলেছেন, চক্ষু উন্মুক্ত রেখে মুখমণ্ডল আবৃত রাখা ফরয। এই মতবিরোধ শুধুমাত্র মুখ ও হাতের বিষয়ে। মাথার চুল থেকে পা পর্যন্ত শরীরের বাকী অংশ আবৃত করা যে মেয়েদের জন্য ফরয সে বিষয়ে মুসলিম উম্মাহ একমত। কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট নির্দেশে ও মুসলিম উম্মাহর ঐকমত্যের আলোকে তাছাড়া আমরা বুঝতে পারছি যে, গাইর মাহরাম সকল আত্মীয় ও অনাত্মীয় পুরুষের সামনে মাথা, মাথার চুল, গলা, কান, ঘাড়, কনুই কোমর ইত্যাদি সহ নিজের দেহ পুরোপুরি ঢেকে রাখা প্রতিটি মুসলিম নারীর জন্য ফরয।

হাযেরীন, কুরআন ও হাদীসের এ সকল সুস্পষ্ট নির্দেশ সম্পর্কে মুসলমানদের অজ্ঞতা এত কঠিন পর্যায়ে দিয়েছে যে, অনেকে মনে করেন যে, পর্দা নিজের কাছে বা নিজের মনে, পর্দার জন্য বিশেষ কোন বিধান বা বিশেষ কোন পোষাক নেই। এ বিষয়ে আলেম বা প্রচারকদের মতামতকে তাঁরা ধর্মান্ধতা বা বাড়াবাড়ি বলে মনে করেন। কেউ বা মনে করেন যে, পর্দা করা ভাল, তবে বেপর্দা চলাফেরা কঠিক কোন অপরাধ নয়। এসকল ধারণা আল্লাহর কুরআনকে অস্বীকার ও অবিশ্বাস করা ছাড়া কিছুই নয়।

হাযেরীন, পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ আমাদেরকে ধ্বংসের পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। বেহায়াপনা ও অশ্লীলতার কারণে পাশ্চাত্যের মানুষেরা ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের প্রশান্তি হারিয়েছে। সর্বোপরি একারণে পাশ্চাত্যে পারিবারিক কাঠামো ভেঙ্গে গিয়েছে। লক্ষলক্ষ নারী-পুরুষ বিবাহ না করে পশুর মত জীবন যাপন করছে। নতুন প্রজন্মের জন্ম প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছে। শতাব্দীর মধ্যে পাশ্চাত্যের White race বা সাদা জাতি বিলীন হওয়ার পথে। আর এর একমাত্র কারণ নারী স্বাধীনতার নামে বেহায়াপনার প্রসার।

নারী স্বাধীনতার নামে মুসলিম মহিলাদেরকে সেই পথে ডাকা হচ্ছে। সর্বত্র একটি দৃশ্য আমাদের নযরে পড়ে। পুরুষ মাথা থেকে পা পর্যন্ত আবৃত করে পোশাক পরেছেন। তার পাশে মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন শরীরের অধিকাংশ স্থান অনাবৃত করে। শালীন পোশাক যদি স্বাধীনতার পরিপন্থী হয় তাহলে এই পুরুষটি কি স্বাধীনতা বিহীন? তিনি কি তার পাশের মহিলার অধীন?? একজন পুরুষ যদি তার পুরো শরীর আবৃত করেও স্বাধীনতা ও ভদ্রতা রক্ষা করতে পারেন তাহলে মহিলা কেন পারবেন না? একজন মহিলার দেহ অনাবৃত করলে তার কি কোনো দৈহিক, মানসিক বা সামাজিক কোনো লাভ আছে? একমাত্র বেহায়া

[১] সূরা নূর: ৩০-৩১ আয়াত।

পুরুষদের কুদৃষ্টির পরিতৃপ্তি দান ছাড়া এর আর কোনো উদ্দেশ্য আছে কি? এ সকল বেহায়া পশু চরিত্রের পুরুষেরাই বিভিন্ন অজুহাতে মেয়েদেরকে নগ্ন করে তাদের নারীত্ব ও শালীনতা নষ্ট করতে চায়।

হাযেরীন, কুরআন ও হাদীসের আলোকে আমরা বুঝি যে, একজন মুসলিম নারীর জন্য মাথার চুল, কান, গলা হাত, বাজু বা দেহের যে কোনো অঙ্গ অনাবৃত রেখে বাইরে যাওয়া বা ঘরের মধ্যেও গাইর মাহরাম আত্মীয়দের সামনে এভাবে যাওয়া ব্যভিচার, মদ্যপান ও অন্যান্য কঠিন হারাম কর্মগুলির মতই কঠিন হারাম কর্ম। মুসলিম মহিলার জন্য এগুলি আবৃত করা যেমন ফরয, তাকে শরীয়তের মধ্যে পরিচালিত করা তার স্বামী বা পিতার জন্যও অনুরূপ ফরয আইন। আমরা সমাজে এমন অনেক দীনদার মানুষ দেখতে পাই, যিনি নিজে দাড়ি রেখেছেন এবং টুপি পরিধান করেন, অথচ তার স্ত্রী বা কন্যা মাথা, চুল বা দেহের অন্যান্য অংশ অনাবৃত করে চলেন। দাড়ি রাখা ওয়াজিব, টুপি পরা সুন্নাত, কিন্তু স্ত্রী ও কন্যার মাথায় কাপড় পরানো ও তাদেরকে পর্দা মানানো ফরয। আর ফরয বাদ দিয়ে ওয়াজিব, সুন্নাত বা নফল পালনের অর্থই হলো নগ্ন হয়ে পাগড়ী পরা। আমরা অনেকেই এরূপ উদ্ভট ধার্মিকতায় লিপ্ত।

হাযেরীন, সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হলো, কেন আমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ অমান্য করব? শালীন পোষাকে শরীর আবৃত করার কারণে কোন মুসলিম মহিলার জাগতিক কোন স্বার্থের ক্ষতি হয় না, তার কোন কর্ম বা প্রয়োজন ব্যাহত হয় না বা তার সামাজিক বা পারিবারিক কোন মর্যাদার ক্ষতি হয় না। বরং তিনি অতিরিক্ত সম্মান ভোগ করার সাথে সাথে আল্লাহর অফুরন্ত দয়া, কল্যাণ ও বরকত লাভে সক্ষম হন। সূরা আহযাবের ৫৯ আয়াতে আল্লাহ এরশাদ করেছেন,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا.

"হে নবী, আপনি আপনার স্ত্রীগণকে, কন্যাগণকে ও মুমিনদের নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের জিলবাবের (চাদরের) কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়, এতে তাদেরকে চেনা সহজতর হবে, ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল করুণাময়।"

এ আয়াতে আল্লাহ পর্দার নির্দেশনার সাথে সাথে পর্দার কারণও উল্লেখ করছেন। পর্দানশীন মেয়েকে ভদ্র ও শালীন বলে চেনা যায় এবং সাধারণভাবে বখাটে বা অসৎ ছেলেরা এদের উত্তক্ত্য করে না। আমাদের সমাজে এবং যে কোনো সমাজে অগণিত ধর্ষণ, অত্যাচার ও এসিডের ঘটনার দিকে তাকালেও আমরা দেখতে পাই, যে সকল মেয়ে পর্দার মধ্যে বেড়ে উঠেন সাধারণতঃ তাঁরা মাস্তানদের বাজে কথা, এসিড নিক্ষেপ, ধর্ষণ ইত্যাদি অত্যাচার থেকে বেঁচে থাকেন। সাধারণত সবচেয়ে কঠিন হৃদয় বখাটেও কোন পর্দানিশীন মেয়েকে উত্তক্ত্য করতে দ্বিধা করে। তার কঠিন হৃদয়ের এক নিভৃতকোনে পর্দানিশীন মেয়েদের প্রতি একটুখানি সম্ভ্রমবোধ থাকে।

হাযেরীন, পুরুষদের সুন্নাতী পোশাক সম্পর্কে আমরা অনেকেই সচেতন। তবে মেয়েদের সুন্নাতী পোশাক সম্পর্কে আমরা খুবই বেখেয়াল। শাড়ী মূলত ভারতীয় পোশাক। বাংলার বাইরে ভারতের মুসলিম মহিলারাও শাড়ি পরেন না এবং শাড়িকে হিন্দু পোশাক বলে গণ্য করেন। সর্বাবস্থায় শাড়ী পরিধান করে মুসলিম মহিলা কোনোভাবে নিজের ফরয পর্দা রক্ষা করতে পারেন না। মহিলা সাহাবীগণ ও উম্মুল মুমিনীনগণ সর্বদা ঘরের মধ্যেও তিনটি পোশাক পরিধান করতেন: (১) ফুল হাতা পায়ের পাতা আবৃত করা ম্যাক্সি বা কামিস (২) ইযার বা সায়া এবং (৩) বড় চাদরের মত ওড়না। বাইরে বেরোলে এগুলির উপরে বড় চাদর বা জিলবাব পরতেন। এগুলিই মুসলিম মহিলার সুন্নাতী পোশাক।

এরূপ পোশাক পরিধান করলে মুসলিম মহিলারা সহজেই পোশাকের ফরয আদায় করতে পারেন।

হাযেরীন, ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান, অস্ট্রেলিয়া ইত্যাদি পাশ্চাত্য দেশে হাজার হাজার অমুসলিম যুবতী ইসলাম গ্রহণ করে বোরকা বা স্কার্ফ পরিধান করে পুরো দেহ আবৃত করে চলা ফেরা করেন। তারা সকলেই বলছেন, ইসলামী পোশাকই নারী প্রকৃতির সাথে সুসমঞ্জস। বেহায়াপনার মধ্যে রয়েছে মানসিক অস্থিরতা ও অশান্তি। ইসলামী পর্দার মধ্যে নারী যে মানসিক তৃপ্তি, প্রশান্তি ও আনন্দ তারা লাভ করেছেন তা অতুলনীয়।

হাযেরীন, ইসলামী হিজাব বা পর্দা অর্থ অবরোধ নয়। মুসলিম মহিলার রাসূলুল্লাহ ﷺ ও খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগ থেকেই ইসলামী পোশাক ও শালীনতা সহ ধর্মীয়, পারিবারিক, অর্থনৈতিক, ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেছেন। ইসলামী পর্দা একটি ব্যাপক ব্যবস্থা। পবিত্র সামাজিক পরিবেশে সুন্দর আন্তরিক স্নেহ-মমতা-ভালবাসাপূর্ণ পরিবার গঠনে ইসলামের বিভিন্ন বিধানাবলী সমষ্টিকেই মূলত এককথায় হিজাব বা "পর্দা-ব্যবস্থা" বলা হয়। এর বিভিন্ন দিক রয়েছে, যেমন: ১. সমাজে অশ্লীলতার প্রসার ঘটতে পারে এরূপ সকল কথা বা কর্ম থেকে বিরত থাকা, ২. অশ্লীলতার প্রচার বা প্রসার মূলক কাজে লিপ্তদেরকে শাস্তি প্রদান, ৩. সন্তানদেরকে পবিত্রতা ও সততার উপর প্রতিপালন করা এবং অশ্লীলতার প্ররোচক বা অহেতুক সুড়সুড়ি মূলক সকল কর্ম, কথা বা দৃশ্য থেকে তাদেরকে দূরে রাখা, ৪. কারো আবাসগৃহে বা বাড়ীতে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি গ্রহণের ব্যবস্থা এবং বিনা অনুমতিতে প্রবেশের নিষেধাজ্ঞা, ৫. নারী ও পুরষের শালীনতাপূর্ণ পোষাক পরিধান করা, ৬. নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা বন্ধ করা, ৭. সঠিক সময়ে প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়েদেরকে বিবাহ দেওয়া, ৮. দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিশ্বস্ততা ও আন্তরিকতা বজায় রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

এ সকল বিষয়ে পবিত্র কুরআনে এবং হাদীস শরীফে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। বিশেষ করে কুরআন কারীমের সূরা নূর-এ পর্দার বিষয়গুলি আলোচিত হয়েছে। আমি উপস্থিত মুসল্লীদেরকে অনুরোধ করর কুরআন কারীমের এক বা একাধিক তাফসীরের আলোকে সূরা নূর অধ্যয়ন করার জন্য। আজকের খুতবার স্বল্প পরিসরে আমরা পোশাকের অন্যান্য কিছু আহকাম আলোচনা করেই শেষ করব।

হাযেরীন, ইসলামী পোশাকের অন্যতম দিক হলো পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্য। বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ মুমিনদেরকে পোশাক পরিচ্ছদ পরিচ্ছন্ন রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন: "আল্লাহ সুন্দর, তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন।"[১] জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ (রা) বলেন:

أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَأَى رَجُلًا شَعِثًا قَدْ تَفَرَّقَ شَعْرُهُ فَقَالَ أَمَا كَانَ يَجِدُ هَذَا مَا يُسَكِّنُ بِهِ شَعْرَهُ وَرَأَى رَجُلًا آخَرَ وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ وَسِخَةٌ فَقَالَ أَمَا كَانَ هَذَا يَجِدُ مَاءً يَغْسِلُ بِهِ ثَوْبَهُ

"রাসূলুল্লাহ ﷺ(একদিন) আমাদের নিকট আগমন করেন। তিনি একব্যক্তিকে দেখলেন যে, তার মাথার চুলগুলি ময়লা, উস্কোখুস্কো ও এলোমেলো। তিনি বললেন: এই ব্যক্তির কি কিছুই জোটে না যা দিয়ে সে তার চুলগুলি পরিপাটি করবে? তিনি আরেকজনকে দেখেন যার পরিধানে ছিল ময়লা পোশাক। তিনি বলেন এই ব্যক্তি কি একটু পানিও পায় না যা দিয়ে তার পোশাক ধুয়ে পরিষ্কার করবে?"[২]

হাযেরীন, সৌন্দর্য ও পরিচ্ছন্নতার মুসলিমের পোশাকে বিনয় ও সরলতা থাকতে হবে। বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মাতকে পোশাকের মধ্যে অহঙ্কার বর্জন এবং সরলতা ও বিনয় রক্ষা করতে

---

[১] মুসলিম, আস-সহীহ ১/৯৩।

[২] আবূ দাউদ, আস-সুনান ৪/৫১; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ৪/২০৬; হাইসামী, মাওয়ারিদুয যামআন ৪/৪৩১। হাদীসটি সহীহ।

নির্দেশ দিয়েছেন। এ সকল হাদীসে বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয়। তবে এ ক্ষেত্রে একটি বিশেষ বিষয় আলোচনা খুবই প্রয়োজন। কারণ অনেক ধার্মিক মুসলিম বিষয়টি অবহেলা করেন। বিষয়টি হলো পায়ের গোড়ালি আবৃত করে পোশাক পরিধান করা। প্রায় ৩০ টি সহীহ্ হাদীসে পুরুষের পোশাককে পায়ের গোড়ালির উপরের উচু হাড় বা 'টাখনু'র উপরে রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ সকল হাদীস পাঠ করলে যে কোনো মুমিন নিশ্চিত হবেন যে, হাঁটু আবৃত করা যেমন ফরয, তেমনি ফরয হলো টাখনু অনাবৃত রাখা। রাসূলুল্লাহ ﷺ মেয়েদের পোশাক টাখনু আবৃত করে পরিধান করতে বলেছেন। আর পুরুষদের পোশাক টাখনু অনাবৃত করে পরতে নির্দেশ দিয়েছেন। আমরা ঠিক এর উল্টা করি। মেয়েদের খারাপ দেখায় না, কিন্তু ছেলেরা এরূপ করলে "খারাপ" দেখায়! ইন্না লিল্লাহি... !!!

আমরা অনেক সময় দু একটি হাদীস পড়ে বলি যে, অহঙ্কার করে টাখনু আবৃত করলে গোনাহ হবে, অহঙ্কার ছাড়া করলে দোষ নেই। অথচ প্রায় ৩০ জন সাহাবী থেকে বর্ণিত মুতাওয়াতির পর্যায়ের হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বারংবার বলেছেন যে, টাখনুর নিম্নে পোশাক নামানোই নিষিদ্ধ এবং এর শাস্তি জাহান্নাম। অহঙ্কার থাকলে তা আরো কঠিনতর অপরাধ। এ সকল হাদীসের এক হাদীসে তিনি বলেন:

إِزْرَةُ الْمُسْلِمِ إِلَى نِصفِ السَّاقِ وَلا حَرَجَ أَوْ لا جُنَاحَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّارِ. مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ

"মুসলিমের পোশাক তার পায়ের নলার মাঝামাঝি পর্যন্ত থাকবে। সেখান থেকে টাখনু পর্যন্ত (নামালে) কোনো অপরাধ হবে না। টাখনুর নিচে যা থাকবে তা জাহান্নাতে থাকবে। যে ব্যক্তি অহংকার করে তার ইযার টেনে নিয়ে চলবে আল্লাহ্ তার দিকে দৃষ্টিপাত করবেন না।"[১]

এ হাদীস এবং সমার্থক হাদীসগুলি থেকে আমরা জানতে পারি যে, টাখনু আবৃত করে পোশাক পরিধান করা সর্বাবস্থায় জাহান্নামে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। আর তার সাথে যদি অহঙ্কার-অহমিকা সংযুক্ত হয় তবে তা কঠিনতর অপরাধ। এ ব্যক্তি আল্লাহর ক্ষমা বা রহমতের দৃষ্টি থেকেও বঞ্চিত হবে।

অনেক সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো সাহাবীর পোশাক টাখনুর নিচে নামানো দেখলে তার পিছে পিছে অনেক দূর দৌড়ে যেয়ে তাকে কাপড় উঠিয়ে পরতে বলেছেন। অনেক সাহাবী তার পায়ের বৈকল্যের জন্য কাপড় নামিয়ে পরতেন। অনেকেই বলেছেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার এ সাধারণ লুঙ্গিটির মধ্যে তো কোনো অহঙ্কার নেই। সকল ক্ষেত্রেই রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে কাপড় উচু করে পরতে নির্দেশ দিয়েছেন। আমাদের যেমন কাপড় উচু করে পরতে "খারাপ লাগে", তৎকালীন সময়েও "খারাপ লাগত"। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা আমার মত নিসফ সাক বা গোড়ালির অর্ধ হাত উপরে কাপড় পরবে। যদি একান্তই খারাপ লাগে তাহলে টাখনু পর্যন্ত নামাতে পার। কোনো অবস্থাতেই টাখনুর নিম্নে পোশাক নামাতে পারবে না। আবু বাকর (রা) বলেছিলেন, আমি কাপড় উচু করেই পরি, কিন্তু বেখেয়ালে অনেক সময় লুঙ্গির একটি পার্শ নেমে যায়। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন যে, বেখেয়াল নেমে যাওয়ায় অসুবিধা নেই; এরূপ একপার্শ নেমে যাওয়া কোনো ফ্যাশন-অহঙ্কার নয়। ইচ্ছা করে পাজামা বা প্যান্টের ঝুল টাখুনুর নিচে দিয়ে বানানো, বা ইচ্ছা করে লুঙ্গি এভাবে পরা সর্বাবস্থায় হারাম বলে এ সকল হাদীস থেকে নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয়। এছাড়া এভাবে পোশাক পরে সালাত আদায় করলে তা কবুল হবে না বলে হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে।[২]

---

[১] আবূ দাউদ, আস-সুনান ৪/৫৯; আলবানী, সহীহুল জামি' ১/২২০। হাদীসটি সহীহ।
[২] বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, কুরআন সুন্নাহর আলোকে পোশাক, পর্দা ও দেহসজ্জা ২৭-৪৫ পৃষ্ঠা।

হাযেরীন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ছবি বা ধর্মীয় প্রতীক সম্বলিত পোশাক পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। এ ছাড়া তিনি নারী ও পুরুষের পোশাকের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। যে মেয়ে পুরুষের পোশাক বা পুরুষালি স্টাইলে পোশাক পরে এবং যে পুরষ নারীর পোশাক বা মেয়েলি স্টাইলে পোশাক পরে তারা মালাউন বা অভিশপ্ত ও আল্লাহর রহমত থেকে বিতাড়িত বলে তিনি বারংবার বলেছেন।

হাযেরীন, বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ মুমিনদেরকে পোশাকের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন। পোশাক পরিচ্ছদ, পরিধান স্টাইল, জুতা ব্যবহার, আসবাবপত্র ব্যবহার, এমনকি পোশাকের রঙ-এর ক্ষেত্রেও অমুসলিমদের অনুকরণ করতে নিষেধ করেছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং সাহাবীগণ।

সর্বোপরি হাদীস শরীফে পোশাকের ক্ষেত্রেও রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের অনুকরণের বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। সাহাবীগণ পোশাকের কাটিং, হাতার দৈর্ঘ, পরিধান পদ্ধতি, রঙ, বোতামের ব্যবহার ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হুবহু অনুকরণ করতে সদা সচেষ্ট থাকতেন। আমরা অনেক সময় বলি যে, অমুক পোশাক পরলে তো আর গোনাহ নেই। আসলে 'গোনাহ হবে কিনা' চিন্তা না করে 'সাওয়াব হবে কি না' বা 'কত বেশি সাওয়াব হবে' তা চিন্তা করা উচিত। যে পোশাক রাসূলুল্লাহ ﷺপরেছেন বা পরতে উৎসাহ দিয়েছেন তা পরিধান করলে তাঁর হুবহু অনুকরণের সাওয়াব আমরা অর্জন করব। পোশাক দেহের সাথে সর্বক্ষণ থাকে, ফলে সার্বক্ষণিক সুন্নাত পালনের অনুভূতি মনের মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মহব্বত, নেক আমলের আগ্রহ ও পাপ থেকে দূরে থাকার প্রেরণা দেয়।

আর এ সাওয়াব, মহব্বত ও বরকত অর্জন করতে আমাদেরকে অযূ, গোসল, তাসবীহ, যিক্‌র, সময়ব্যয়, অর্থব্যয় ইত্যাদি কোনো অতিরিক্ত কষ্ট করতে হচ্ছে না। কোনো না কোনো পোশাক তো আমাকে পরতেই হবে। কাজেই আমি কেন এ সুযোগ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করব? কিসের মোহে? কি লাভ হবে আমার দুনিয়া বা আখিরাতে? পাশ্চাত্যের সংস্কৃতিতে বিমুগ্ধ হয়ে গিয়েছি বলে তাদের অনুকরণ ছাড়তে পারছি না বলে? দুনিয়ায় আমরা অনেক যুক্তি দেখিয়ে সুন্নাত এড়িয়ে যেতে পারব, কিন্তু আখিরাতে কিসে আমাদের অধিক লাভ হবে তা কি চিন্তা করা দরকার না?

শিশু কিশোরদের ইসলামী আদব ও মূল্যবোধের মধ্যে লালন পালন করা পিতামাতার দায়িত্ব। ইসলামে যা কিছু নিষিদ্ধ বা হারাম তা থেকে তাদেরকে দূরে রাখা পিতামাতার দায়িত্ব। নিষিদ্ধ বা অপছন্দনীয় খাদ্য, পানীয়, পোশাক, কথাবার্তা ইত্যাদি থেকে তাদেরকে দূরে রাখা পিতামাতার দায়িত্ব, যেন তারা এগুলিকে অপছন্দ করে এবং এগুলির প্রতি কখনো আকর্ষণ অনুভব না করে। এজন্য বড়দের জন্য যে পোশাক নিষিদ্ধ ছোটদের জন্য সে পোশাক পরানো পিতামাতার জন্য নিষিদ্ধ। অনেক ধার্মিক পিতামাতও তাঁদের ছেলেমেয়েদেরকে ইসলামী মূল্যবোধের পরিপন্থী পোশাক পরিয়ে থাকেন। যেমন আঁটসাঁট পোশাক, অমুসলিম মহিলা বা পুরুষদের পোশাক, সতর আবৃত করে না এমন পোশাক, ছবি অঙ্কিত পোশাক ইত্যাদি তাঁরা তাঁদের ছেলেমেয়েদের পরান। তারা ভাবেন, এরা তো ছোট মানুষ, এদের তো কোনো পাপ নেই। হাযেরীন, ওদের পাপ নেই, তবে আপনার পাপ আছে। বিশেষ করে পাপীদের পোশাকের প্রতি ক্রমান্বয়ে তাদের মনে মহব্বত জন্মে, এবং এরূপ পোশাকধারীদের পাপের প্রতি মনের ঘৃণা চলে যায়। ফলে বড় হয়েও তারা এগুলি থেকে বের হতে পারে না। আর তাদের সকল পাপের সমপরিমান পাপ আপনার আমলনামায় জমা হবে।[১]

আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর সন্তুষ্টি ও দুনিয়া-আখিরাতের সফলতার পথে পরিচালিত করুন। আমীন।

---

[১] পোশাক সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে লেখকের লেখা "কুরআন-সুন্নাহর আলোকে পোশাক পর্দা ও দেহসজ্জা" নামক বইটি পড়ুন।

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَـهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

أَمَّا بَعْدُ، فَيَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ، قَالَ اللهُ تَعَالىَ: يَابَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ

التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ.

وَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا.

وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِزْرَةُ الْمُسْلِمِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ وَلا حَرَجَ أَوْ لا جُنَاحَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّارِ. مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ

بَارَكَ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ فِيْ الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ. وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ. أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ، فَاسْتَغْفِرُوْهُ وَتُوْبُوْا إِلَيْهِ، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.

জুমাদাস সানিয়া মাসের ১ম খুতবাঃ হালাল ও হারাম উপার্জন

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লী আলা রাসূলিহীল কারীম। আম্মা বাদ,

সম্মানিত উপস্থিতি, আজ জুমাদাস সানিয়া মাসের প্রথম জুমুআ। আজ আমরা হালাল ও হারাম উপার্জনের বিষয়ে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ। কিন্তু তার আগে আমরা এ সপ্তাহের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসগুলির বিষয়ে সংক্ষেপ আলোকপাত করি। হাযেরীন, আজ ইংরেজী ..... মাসের ..... তারিখ। এ সপ্তাহের দিবসগুলির মধ্যে রয়েছে .... ।

হাযেরীন, বৈধ ও হালাল উপার্জনের উপর নির্ভর করা এবং অবৈধ ও হারাম উপার্জন বর্জন করা মুসলিমের জন্য অন্যতম ফরয ইবাদত। শুধু তাই নয়, এর উপর নির্ভর করে তার অন্যান্য ফরয ও নফল ইবাদত আল্লাহর নিকট কবুল হওয়া বা না হওয়া। বিষয়টির গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন না হওয়ার কারণে অনেক মুসলিম এ বিষয়ে কঠিন বিভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত। অনেক ধার্মিক মানুষ রয়েছেন যারা সুন্নাত, মুস্তাহাব ইত্যাদির বিষয়ে অনেক সচেতন হলেও হারাম উপার্জনের বিষয়ে মোটেও সচেতন নন। কুরআন-হাদীসের দৃষ্টিতে এটি বক-ধার্মিকতা ছাড়া কিছুই নয়। আল্লাহ বলেনঃ

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

"হে রাসূলগণ, তোমরা পবিত্র বস্তু হতে আহার কর এবং সৎকর্ম কর। তোমরা যা কর সে বিষয়ে আমি অবহিত।"[১]

এখানে আমরা দেখছি যে, পবিত্র বস্তু হতে আহার করা সৎকর্ম করার পূর্ব শর্ত। সম্মানিত হাযেরীন, বৈধ ও অবৈধতার দুইটি প্রকার রয়েছে। এক প্রকার খাদ্য স্থায়ী ভাবে অবৈধ। যেমন শুকরের মাংস, মদ, প্রবাহিত রক্ত, মৃত জীবের মাংস ইত্যাদি। এই প্রকারের অবৈধ খাদ্য বাধ্য হলে ভক্ষণ করা যাবে বলে কুরআন কারীমে বিভিন্ন স্থানে বলা হয়েছে। দ্বিতীয় প্রকারের অবৈধ খাদ্য উপার্জন সংক্রান্ত। সূদ, জুয়া, ঘুষ, ডাকাতি, যুলুম, যৌতুক, অবৈধ মজুদদারি, অবৈধ ব্যবসা, চাঁদাবাজি, ওজনে-পরিমাপে কম দেওয়া, ভেজাল দেওয়া, প্রতারণা বা মিথ্যার মাধ্যমে ক্রয়বিক্রয় করা, চাকুরিতে চুক্তিমত দায়িত্ব পালন না করে বেতন নেওয়া, সরকারের বা জনগণের সম্পদ অবৈধভাবে ভোগ করা ইত্যাদি এ জাতীয় অবৈধ খাদ্য। কুরআন-হাদীসে এ প্রকারের অবৈধ খাদ্য কোনো কারণে বা প্রয়োজনে বৈধ হবে বলে বলা হয়নি।

প্রিয় ভাইয়েরা, অবৈধ উপার্জন থেকে আত্মরক্ষার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেনঃ

وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অপরের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না এবং মানুষের ধন-সম্পদ জেনে শুনে অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করার জন্য তা বিচারকগণের নিকট পেশ করো না।"[২]

সূরা নিসার ২৯ আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

"হে মু'মিনগণ, তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অপরের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না; তবে তোমাদের পরস্পর রাযী হয়ে ব্যবসা করা বৈধ।"

---

[১] সূরা মুমিনূন ৫১ আয়াত।

[২] সূরা বাকারা ১৮৮ আয়াত।

মুহতারাম হাযেরীন, এভাবে আমরা দেখছি যে, অন্যের ধন-সম্পদ বৈধ ইসলাম সম্মত ব্যবসায়িক লেনদেনের মাধ্যম ছাড়া গ্রহণ করাই অবৈধ। যে কোনো ভাবে অন্যের অধিকার নষ্ট করা অবৈধ। কুরআন ও হাদীসে বিশেষ কয়েক প্রকার অবৈধ উপার্জনের বিষয়ে বিশেষভাবে সতর্ক করা হয়েছে। যেমন উপরের একটি আয়াতে বৈধ ব্যবসায়িক লেনদেন ছাড়া অন্যের সম্পদ গ্রহণ নিষেধ করা হয়েছে। যৌতুক, চাঁদাবাজি ইত্যাদি সকল যুলুম এর অন্তর্ভুক্ত। যৌতুকও অন্যান্য প্রকারের চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাসকর্মের মত অন্যের সম্পদ জোর করে বা চাপ দিয়ে গ্রহণ করা। বিবাহের ইসলাম সম্মত লেনদেন হলো কনে বা কনে-পক্ষ পাত্র বা পাত্রপক্ষকে কিছুই দেবেন না। শুধুমাত্র কনেই পাত্রের ঘরে আসবে। আর পাত্রপক্ষ কনেকে মোহরানা প্রদান করবেন। বিবাহ উপলক্ষে ওলীমার দায়িত্ব পাত্রের। এর বাইরে কোনো প্রকারের দাবি দাওয়া অবৈধ। এমনকি কনের পিতার ইচ্ছা ও আগ্রহের অতিরিক্ত 'বরযাত্রী'র মেহমানদারী করতে তাকে বাধ্য করাও বৈধ নয়। আল্লাহ আমাদেরক হারাম থেকে রক্ষা করুন।

প্রিয় ভাইয়েরা, উপরের অন্য আয়াতে আইনের ফাঁকফোকর দিয়ে অন্যের সম্পদ গ্রাস করার ভয়াবহ পরিণতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ

"যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথ বা অবৈধভাবে কোনো মুসলিমের অধিকার ছিনিয়ে নিবে আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব করবেন এবং জান্নাত তার জন্য নিষিদ্ধ করবেন।" এক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, হে আল্লাহর রাসূল, যদি সামান্য কোনো দ্রব্য হয়? তিনি বললেন, "আরাক গাছের একটি কর্তিত ডালও যদি এভাবে গ্রহণ করে তাহলে এই শাস্তি।"[১] অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ ظُلْمًا (بِغَيْرِ حَقِّهِ) فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ

"যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে বা যুলুম করে এক বিঘত পরিমান যমিন গ্রহণ করবে কেয়ামতের দিন তাকে সপ্ত পৃথিবী সহ সেই যমিন তার গলায় বেড়ি বানিয়ে দেওয়া হবে।"[২]

অন্যান্য আয়াত ও হাদীসে বিশেষত এতিম, সমাজের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বা দুর্বল শ্রেণীর সম্পদ এভাবে গ্রাস করার নিষেধাজ্ঞা ও কঠিন শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

"নিশ্চয় যারা এতিমদের সম্পদ যুলুমকরে ভক্ষণ করে তারা নিঃসন্দেহে তাদের উদরে অগ্নি ভক্ষণ করে এবং তারা অচিরেই জ্বলন্ত আগুনে জ্বলবে।"[৩] রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

أَلا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا أَوْ انْتَقَصَهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"যদি কেউ কোনো অমুসলিম নাগরিক বা প্রবাসীকে যুলুম করে, তাকে অপমান করে, তাকে তার সাধ্যাতীত দায়িত্ব প্রদান করে বা তার ইচ্ছা ও আগ্রহ ছাড়া তার নিকট থেকে কোনো কিছু গ্রহণ করে তাহলে কেয়ামতের দিন আমি তার বিপক্ষে বাদী হব।"[৪]

---

[১] মুসলিম, আস-সহীহ ১/১২২।
[২] বুখারী, আস-সহীহ ৩/১১৬৮; মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১২৩০-১২৩১।
[৩] সূরা নিসা ১০ আয়াত।
[৪] আবূ দাউদ, আস-সুনান ৩/১৭০; আলবানী, সহীহুত তারগীব ৩/৮৯। হাদীসটি হাসান।

মুহতারাম হাযেরীন, কুরআন ও হাদীসে বিশেষভাবে নিষিদ্ধ অবৈধ লেনদেনের মধ্যে অন্যতম হলো, ওযনে বা মাপে কম দেওয়া, ভেজাল দেওয়া, ধোঁকা দেওয়া, ফাঁকি দেওয়া, সরকার বা জনগণের সম্পদ গ্রহণ করা, সূদ গ্রহণ বা প্রদান, ঘুষ গ্রহণ বা প্রদান ইত্যাদি। ওযনে বা মাপে কম দেওয়া বা ভেজাল দেওয়ার নিষেধাজ্ঞায় এত বেশি আয়াত ও হাদীস রয়েছে যে, সেগুলি একত্রে উল্লেখ করার জন্য একটি পৃথক পুস্তকের প্রয়োজন। সূরা মুতাফ্ফিফীন এর ১ম আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে,

وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ

"ওআইল জাহান্নামের ভয়াবহ পরিণাম তাদের জন্য যারা মাপে-পরিমাপে কম দেয়।"

এভাবে কুরআন কারীমে বারংবার পূর্ণরূপে ওযন, মাপ ও পরিমাপ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং সকল প্রকারের ফাঁকি, কমতি বা কমপ্রদানের কঠিন নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করা হয়েছে। এরূপ করলে পৃথিবীতে কঠিন গযব ও আখিরাতে কঠিন শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَئُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ

"যখন কোন সম্প্রদায়ের মানুষেরা মাপে-ওজনে বা পরিমাপে কম বা ভেজাল দিতে থাকে, তখন তারা দুর্ভিক্ষ, জীবনযাত্রার কাঠিন্য ও প্রশাসনের বা ক্ষমতাশীলদের অত্যাচারের শিকার হয়।"[১]

মুহতারাম হাযেরীন, অন্য যে বিষয়টি হাদীস শরীফে বিশেষভাবে নিষেধ করা হয়েছে তা হলো ফাঁকি, ধোঁকা প্রবঞ্চনা বা ভেজাল দেওয়া। আরবীতে একে (غـشّ) বলা হয়। প্রস্তুতকারক সংস্থা বা দেশের নাম পরিবর্তন করা, (ingredients) বা উপাদান-উপকরণ হিসেবে পণ্যের লেবেলে যা লেখা তার অন্যথা করা ইত্যাদিও এই 'গিশ্শ'-এর অন্তর্ভুক্ত। যে কোনো প্রকারে ধোঁকা দেওয়া বা প্রকৃত অবস্থা গোপন করার নামই গিশ্শ। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ গিশ্শ বা প্রবঞ্চনা থেকে নিষেধ করেছেন। এক হাদীসে আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

যে ব্যক্তি আমাদেরকে ফাঁকি বা ধোঁকা দিবে আমাদের সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই।"[২]

প্রিয় হাযেরীন, অন্যের সম্পদ অবৈধভাবে গ্রহণ ও প্রবঞ্চনা উভয়ের একত্রিত একটি রূপ হলো, চাকুরিজীবির জন্য কর্মেফাঁকি দিয়ে পুরো বেতন গ্রহণ করা। সরকারী বা বেসরকারী যে কোনো কর্মস্থলে কর্মদাতার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি, কর্মে অবহেলা ইত্যাদি সবই এই পর্যায়ের।

কুরআন ও হাদীসে নিষিদ্ধ একটি বিষয় হলো গুলূল (غلــول)। সকল প্রকার অবৈধ উপার্জনকেই গুলূল বলা হয়। তবে বিশেষভাবে সরকারী বা জনগণের সম্পদ কোনো নেতা, কর্মকর্তা, কর্মচারী বা নাগরিক কতৃক দখল, গ্রাস বা ভক্ষণ করাকে গুলূল বলা হয়। পাপী ছাড়া কোনো নবী-রাসূল বা কোনো সৎ মানুষের জন্য এভাবে সরকারী বা অন্যের ধন সম্পদ গোপন করে গ্রাস করা সম্ভব নয়। আল্লাহ বলেন:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ

"কোনো নবীর পক্ষে অসম্ভব যে তিনি অবৈধভাবে কিছু গোপন করে গ্রাস করবেন। এবং কেউ অবৈধভাবে কিছু গোপন করে তাহলে কেয়ামতের দিন সে তা নিয়ে আসবে। অতঃপর প্রত্যেককে যা যে অর্জন করেছে তা পূর্ণ মাত্রায় দেওয়া হবে। তাদের প্রতি কোনো জুলুম করা হবে না।"[৩]

---

[১] ইবনু মাজাহ, আস-সুনান ২/১৩৩২; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ৪/৫৮৩। হাকিম ও যাহাবী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।
[২] মুসলিম, আস-সহীহ ১/৯৯।
[৩] সূরা আল ইমরান: ১৬১ আয়াত।

সম্মানিত উপস্থিতি, অবৈধ উপার্জনের অন্যতম পদ্ধতি ঘুষ। যে ব্যক্তি কোনো কর্মের জন্য বেতন, সম্মানী বা ভাতা গ্রহণ করেন, সেই কাজের জন্য 'সেবা গ্রহণকারী', সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা অন্য কারো থেকে কোনো প্রকার হাদীয়া, বখশিশ বা বদলা নেওয়াই ঘুষ। এ ছাড়া নেতা, কর্মকর্তা, কর্মচারী, বিচারক প্রমুখকে তাদের কৃপাদৃষ্টি আকৃষ্ট করার জন্য যে হাদিয়া প্রদান করা হয় তাও ঘুষ বলে হাদীস শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) বলেন,

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي

"ঘুষ গ্রহিতা ও ঘুষদাতাকে লানত অভিশাপ করেছেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)।"[১]

হাযেরীন, অবৈধ উপার্জনের অন্যতম হলো রিবা বা সুদ। ঋণ হিসাবে প্রদত্ত অর্থের উপরে সময়ের বিনিময়ে অর্থ গ্রহণই ইসলামী শরীয়তে সুদ। এছাড়া একই জাতীয় দ্রব্যের লেনদেনে কমবেশি করাও ইসলামে সুদ বলে গণ্য। কুরআন ও হাদীসে অত্যন্ত কঠিনভাবে সুদ নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং এর কঠিন শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা বাকারাহ-এর ২৭৫-২৭৯ আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে,

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ .... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

"যারা সুদ খায় তারা সেই ব্যক্তির মত দাঁড়াবে যাকে শয়তান স্পর্শ করে পাগল করে। তা এজন্য যে, 'তারা বলে, ব্যবসা তো সুদের মত।' অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে বৈধ করেছেন এবং সুদকে অবৈধ করেছেন। যার নিকট তার প্রতিপালকের উপদেশ এসেছে এবং সে বিরত হয়েছে, তবে অতীতে যা হয়েছে তা তারই এবং তার বিষয় আল্লাহর এখতিয়ারে। আর যারা (এই নিষেধাজ্ঞার পরে) পুনরায় (সুদের কারবার) আরম্ভ করবে তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ কোনো অকৃতজ্ঞ পাপীকে ভালবাসেন না। .... হে মু'মিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যা বাকি আছে তা ছেড়ে দাও, যদি তোমরা মু'মিন হও। যদি তোমরা তা না ছাড় তবে জেনে রাখ যে, ইহা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ।"

বিভিন্ন হাদীসে সুদের পাপের ভয়াবহতা ও ঘৃণ্যতা বুঝাতে বিভিন্ন উদাহরণ উল্লেখ করা হয়েছে। বিভিন্ন হাদীসে সুদকে ব্যভিচারের চেয়ে জঘন্যতর ও ভয়ঙ্করতর পাপ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

হাযেরীন, হারাম উপার্জনের অন্যতম ভয়াবহ দিক হলো, হারামের পাপ ছাড়াও এর কারণে অন্যান্য ইবাদত কবুল হয় না। বিভিন্ন হাদীসে বারংবার তা বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لا يَقْبَلُ إِلا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ ... ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ

[১] তিরমিযী, আস-সুনান ৩/৬২২। তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।

"হে মানুষেরা, নিশ্চয় আল্লাহ পবিত্র। তিনি পবিত্র (বৈধ) ছাড়া কোনো কিছুই কবুল করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনগণকে সেই নির্দেশ দিয়েছেন যে নির্দেশ তিনি নবী ও রাসূলগণকে দিয়েছেন ... এরপর তিনি একজন মানুষের কথা উল্লেখ করেন, যে ব্যক্তি (হজ্ব, উমরা ইত্যাদি পালনের জন্য, আল্লাহর পথে) দীর্ঘ সফরে রত থাকে, ধূলি ধূসরিত দেহ ও এলোমেলো চুল, তার হাত দু'টি আকাশের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে সে দোয়া করতে থাকে, হে পভু! হে প্রভু !! কিন্তু তার খাদ্য হারাম, তার পোশাক হারাম, তার পানীয় হারাম এবং হারাম উপার্জনের জীবিকাতেই তার রক্তমাংশ গড়ে উঠেছে। তার দোয়া কিভাবে কবুল হবে! "[১]

অন্য হাদীসে তিনি বলেন:

وَلا يَصْعَدُ إِلَى اللَّهِ إِلاَّ الطَّيِّبُ

"বৈধ জীবিকার ইবাদত ছাড়া কোনো প্রকার ইবাদত আল্লাহর নিকট উঠানো হয় না।"[২]

তিনি আরো বলেন:

لا تُقْبَلُ صَلاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ

"ওযু-গোসল ছাড়া কোনো নামায কবুল হয় না, আর অবৈধ সম্পদের কোনো দান কবুল হয় না।"[৩]

মুহতারাম হাযেরীন, অবৈধ উপার্জনে আল্লাহ বরকত দেন না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

مَنْ يَأْخُذْ مَالا بِحَقِّهِ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ وَمَنْ يَأْخُذْ مَالا بِغَيْرِ حَقِّهِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الَّذِي يَأْكُلُ وَلا يَشْبَعُ

"যে ব্যক্তি বৈধ পন্থায় ধনসম্পদ গ্রহণ করে তার সম্পদে বরকত দেওয়া হয়। আর যে ব্যক্তি অবৈধভাবে কোনো সম্পদ গ্রহণ করে তার উদাহরণ হলো সে ব্যক্তির মত যে খায় অথচ পরিতৃপ্ত হয় না।"[৪]

হাযেরীন, বিভিন্ন হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, কোনো পাপ দিয়ে অন্য পাপ মোচন করা যায় না। এজন্য অবৈধ উপার্জন থেকে ব্যয় করলে আল্লাহ বরকত দেন না। উত্তরাধিকারীদের জন্য তা রেখে গেলে তা তার নিজের জাহান্নামের পাথেয় হয়। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ

مَنْ جَمَعَ مَالاً حَرَاماً ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ وَكَانَ إِصْرُهُ عَلَيْهِ

"যে ব্যক্তি অবৈধভাবে সম্পদ সঞ্চয় করে এরপর তা দান করবে, সে এই দানের জন্য কোনো সাওয়াব পাবে না এবং তার পাপ তাতে ভোগ করতে হবে।"[৫]

ইবনু আব্বাস (রা) কে প্রশ্ন করা হয়, 'একব্যক্তি একটি প্রশাসনিক দায়িত্বে ছিল। তখন সে যুলুম করে ও অবৈধভাবে ধনসম্পদ উপার্জন করে। পরে সে তাওবা করে এবং সেই সম্পদ দিয়ে হজ্জ করে, দান করে এবং বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করে।' তখন ইবন আব্বাস বলেন, 'হারাম বা পাপ কখনো পাপমোচন করে না। বরং হালাল টাকা থেকে ব্যয় করলে পাপ মোচন হয়।'[৬]

ইবনু উমার (রা) কে বসরার এক গভর্ণর প্রশ্ন করেন, আমরা যে এত জনহিতকর কাজ করি এর জন্য কি কোনো সাওয়াব পাব না? তিনি উত্তরে বলেন, আপনি কি জানেন না যে, কোনো পাপ কখনো কোনো পাপমোচন করতে পারে না? আপনাদের এইরূপ দান-খয়রাতের উদাহরণ হলো, এক ব্যক্তি এক

---

[১] মুসলিম, আস-সহীহ ২/৭০৩।
[২] বুখারী, আস-সহীহ ২/৫১১, ৬/২৭০২; মুসলিম, আস-সহীহ ২/৭০২।
[৩] বুখারী, আস-সহীহ ১/৬৩; মুসলিম, আস-সহীহ ১/২০৪।
[৪] মুসলিম, আস-সহীহ ২/৭২৭।
[৫] ইবনু হিব্বান, আস-সহীহ ৮/১১, ১৫৩; হাইসামী, মাওয়ারিদুয যামআন ৩/১৯, ১৩৩। হাদীসটির সনদ শক্তিশালী।
[৬] ইবনু রাজাব, জামিউল উলূম, ১২৭ পৃ

হাজীর বাহন উটটি চুরি করে তাতে চড়ে জিহাদে শরীক হয়েছে, তার এই ইবাদত কি কবুল হতে পারে?"[১]

হাযেরীন, শয়তান অনেক সময় মুমিনকে হারাম উপার্জনের ভয়াবহ পাপের দিকে প্ররোচিত করার জন্য তার মনে ওয়াসওয়াসা দিতে পারে যে, সুদ, ঘুষ, যৌতুক, চাঁদাবাজি, ভেজাল, ফাঁকি, কর্মেফাঁকি, খিয়ানত ইত্যাদি হারাম কর্মের পাপ যিকির, নামায, তাহাজ্জুদ, তাওবা, দাওয়াত, জিহাদ ইত্যাদি ইবাদতের মাধ্যমে মাফ হয়ে যাবে। অথবা এভাবে উপার্জিত হারাম সম্পদের কিছু অংশ হজ্জ, উমরা, মসজিদ, মাদ্রাসা, এতিম, বিধবা, দরিদ্র ইত্যাদি খাতে ব্যয় করলে পাপমোচন হয়ে যাবে। এই চিন্তা যে কত ভয়াবহ তা আমরা উপরের হাদীসগুলির দিকে দৃষ্টি দিলেই বুঝতে পারি। শয়তান এইপ্রকারের প্ররোচনার মাধ্যমে মুমিনকে ত্রিবিধ ক্ষতির মধ্যে নিপতিত করছে। প্রথমত, তিনি এ সকল কঠিন মানুষের অধিকার জড়িত হারাম ও কবীরা গোনাহে লিপ্ত হচ্ছেন। দ্বিতীয়ত, তার নামায, তাহাজ্জুদ, দোয়া, হজ্জ, দান ইত্যাদি ইবাদত আল্লাহর দরবারে গৃহীত হচ্ছে না এবং তিনি পরিশ্রম করেও সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন, কারণ তিনি আল্লাহর নির্দেশিত পথে পরিশ্রম না করে শয়তানের প্রবঞ্চনার ভিত্তিতে পরিশ্রম করছেন। তৃতীয় ও আরো মারাত্মক বিষয় হলো, হারাম ধনসম্পদ দান করে আল্লাহর নিকট সাওয়াব আশা করলে তাতে মুমিনের ঈমান নষ্ট হয়ে যাওয়ার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে।

হাযেরীন, আমাদের মনে প্রশ্ন উঠতে পারে, তাহলে যে ব্যক্তি প্রথম জীবনে হারাম ধনসম্পদ উপার্জন করেছেন, তার কি তাওবার ও মুক্তির কোনো উপায় নেই? হাযেরীন, কুরআন-হাদীস থেকে জানা যায়, যে সকল পাপে আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করা ছাড়াও মানুষের পাওনা বা হক্ক নষ্ট হয় সে সকল পাপ থেকে আন্ত রিকতার সাথে অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করলে আল্লাহ তাঁর বিধান অবমাননার দিকটি ক্ষমা করতে পারেন। কিন্তু যার অধিকার নষ্ট হয়েছে বা ক্ষতি হয়েছে তার কাছ থেকে ক্ষমা লাভ ছাড়া তার বিষয়টি আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। এজন্য তাদের সম্পদ ফেরত দিয়ে বা যে কোনোভাবে তাদের থেকে ক্ষমা নিতে হবে।

আমরা জানি যে, বিষয়টি অত্যন্ত কঠিন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই পাপে লিপ্ত ব্যক্তি অগণিত মানুষের ওজন কম দিয়েছেন, ঘুষ নিয়েছেন, সরকারের বা জনগণের সম্পদ গ্রাস করেছেন, কর্মে ফাঁকি দিয়েছেন। এখন তিনি কিভাবে তাদেরকে চিনবেন বা সম্পদ ফেরত দিবেন। এক্ষেত্রে তিনি চারিটি কাজ করতে পারেন: (১) সকল প্রকার অবৈধ উপার্জন সম্পূর্ণরূপে বর্জন করবেন, (২) অবৈধভাবে উপার্জিত সম্পূর্ণ অর্থ-সম্পদ মাযলূম বা যাদের থেকে অবৈধভাবে নিয়েছেন তাদের পক্ষ থেকে আল্লাহর পথে ব্যয় ও দান করবেন। এতে কখনোই তিনি নিজের কোনো পুণ্যের আশা করবেন না। তবে হয়ত আল্লাহ দয়া করে এর সাওয়াব মাযলূমদেরকে প্রদান করবেন এবং তাকে পাপমুক্ত করবেন। (৩) আল্লাহর কাছে বেশিবেশি ক্ষমা চাইবেন (৪) বেশি বেশি নেক কর্ম করবেন। হয়ত এগুলির মাধ্যমে আল্লাহর কেয়ামতের দিন তার ক্ষমার একটি ব্যবস্থা করতেও পারেন। সর্বাবস্থায় অন্যান্য হারামের চেয়ে উপার্জনের হারাম বেশি ভয়াবহ। অন্যান্য পাপের ক্ষমা লাভ সহজ, কিন্তু বান্দার হক্ক বা হারাম উপার্জনের ক্ষমা লাভ কঠিন। এজন্য মুমিন সর্বদা এই জাতীয় হারাম বর্জনের জন্য সচেষ্ট থাকবেন।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে হারাম উপার্জন বর্জনের তাওফীক প্রদান করুন। আমীন!!

---

[১] ইবনু রাজাব হাম্বালী, জামিউল উলূম, ১২৭ পৃ।

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

أَمَّا بَعْدُ، فَيَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ، قَالَ اللهُ تَعَالَي: يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ

عَلِيمٌ

وَقَالَ: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا تُقْبَلُ صَلاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ

بَارَكَ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ فِيْ الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ. وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ. أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ، فَاسْتَغْفِرُوْهُ وَتُوْبُوْا إِلَيْهِ، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.

জুমাদাস সানিয়া মাসের ২য় খুতবা: বান্দার হক ও মানবাধিকার

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লী আলা রাসূলিহীল কারীম। আম্মা বাদ,

সম্মানিত উপস্থিতি, আজ জুমাদাস সানিয়া মাসের দ্বিতীয় জুমুআ। আজ আমরা বান্দার হক ও মানবাধিকার বিষয়ে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ। কিন্তু তার আগে আমরা এ সপ্তাহের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসগুলির বিষয়ে সংক্ষেপ আলোকপাত করি। হাযেরীন, আজ ইংরেজী ..... মাসের ..... তারিখ। এ সপ্তাহের দিবসগুলির মধ্যে রয়েছে .... ।

হাযেরীন, আল্লাহ যা কিছু বিধানাবলী প্রদান করেছেন তা তাঁর নিজের জন্য নয়, সবই মানুষের কল্যাণের জন্য। এ সকল বিধান দুই প্রকার। প্রথম প্রকার বিধান মানুষের ব্যক্তিগত কল্যাণ ও উন্নতির জন্য। যেমন,- নামায, রোযা, হজ্ব, যিক্‌র ইত্যাদি নির্দেশিত কর্মে অবহেলা করা অথবা ব্যভিচার, মদপান ইত্যাদি নিষিদ্ধ কর্মে লিপ্ত হওয়া। এগুলি লঙ্ঘন করলে আল্লাহর হুকুম অমান্য করা হয়। এগুলিকে হক্কুল্লাহ বা আল্লাহর অধিকার বলা হয়। দ্বিতীয় প্রকার বিধান অন্যান্য সৃষ্টি বা অন্যান্য মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য। এগুলি লঙ্ঘন করলে আল্লাহর বিধান অমান্য করা ছাড়াও আশেপাশের কোনো সৃষ্টি বা মানুষের ক্ষতি হয়। এগুলিকে হক্কুল ইবাদ বা বা সৃষ্টিজগতের অধিকার বলা হয়। অর্থাৎ এগুলিতে আল্লাহর হক্ক ছাড়াও বান্দার হক্ক জড়িত। কারো প্রাপ্য না দেওয়া, কাউকে গালি, গীবত ইত্যাদির মাধ্যমে কষ্ট দেওয়া, কারো সম্পদ, অর্থ, সম্মান বা জীবনের কোনো প্রকার ক্ষতি সাধন করা। ফাঁকি, ধোকা, সূদ, ঘুষ, জুলুম, খুন, ধর্ষণ সবই এই জাতীয় পাপ। কেউ যদি অন্য কাউকে কোনো ব্যক্তিগত পাপে প্ররোচিত করে, যেমন নামায ত্যাগ, মদপান ইত্যাদি কর্মে অন্য কাউকে প্ররোচিত করে তাহলে তাও এই প্রকারের পাপে পরিণত হবে। এছাড়া আল্লাহ ও তাঁর মহান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমাজের প্রতিটি মানুষের প্রতি অন্য মানুষের কিছু দায়িত্ব নির্ধারিত করেছেন। স্বামীর প্রতি দায়িত্ব, স্ত্রীর প্রতি দায়িত্ব, পিতামাতার প্রতি দায়িত্ব, সন্তানের প্রতি দায়িত্ব, প্রতিবেশীর প্রতি দায়িত্ব, কর্মদাতার দায়িত্ব, কর্মচারীর দায়িত্ব, সহকর্মীর দায়িত্ব, দরিদ্রের প্রতি দায়িত্ব, অসহায়ের প্রতি দায়িত্ব, বিধবা ও এতিমদের প্রতি দায়িত্ব, পালিত পশুর প্রতি দায়িত্ব ও অন্যান সকল দায়িত্ব। এগুলি পূর্ণভাবে পালন না করলে তা হক্কুল ইবাদ বা সৃষ্টির অধিকার নষ্টের পাপ হবে।

প্রথম প্রকারের পাপের জন্য আল্লাহ ক্ষমা প্রার্থনা করলে আল্লাহ তা ক্ষমা করবেন বলে কুরআন ও হাদীসে বারংবার সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। অপরদিকে দ্বিতীয় প্রকারের পাপের মধ্যে দুইটি দিক রয়েছে : **প্রথমত,** আল্লাহর বিধানের অবমাননা এবং **দ্বিতীয়ত,** আল্লাহর কোনো সৃষ্টির অধিকার নষ্ট করা। এ সকল পাপ থেকে বান্দা যখন আন্তরিকতার সাথে অনুতপ্ত হয়ে ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করে তখন আল্লাহ তাঁর বিধান অবমাননার দিকটি ক্ষমা করতে পারেন। কিন্তু চূড়ান্ত বিচার দিনের মহান ন্যায়বিচারক তাঁর কোনো সৃষ্টির প্রাপ্য ক্ষমা করেন না। তার পাওনা তিনি বুঝে নেবেন ও তাকে বুঝে দেবেন। এজন্য এই জাতীয় পাপের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ, যাদের অধিকার নষ্ট বা সংকুচিত হয়েছে তাদের নিকট থেকে অধিকার বুঝিয়ে দিয়ে ক্ষমা না নিলে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না।

এজন্য কুরআন ও হাদীসে বান্দার হক্কের বিষয়ে অত্যন্ত বেশি গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। আমাদের চারিপার্শে অবস্থানরত আল্লাহর অন্যান্য সৃষ্টিকে কুরআন-হাদীসের আলোকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করতে পারি (১) সাধারণভাবে সকল সৃষ্টির অধিকার, (২) সকল মানুষের অধিকার, (৩) সকল মুসলিমের অধিকার ও (৪) দায়িত্বাধীনদের ও পরিবারের সদস্যদের অধিকার।

হাযেরীন, সকল প্রাণী ও সৃষ্টির প্রতি মুমিনের দায়িত্ব হলো কষ্টপ্রদান ও ক্ষতি থেকে বিরত থাকা। বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ এ বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেছেন। দুটি সহীহ হাদীস শুনুন:

مَا مِنْ إِنْسَانٍ يَقْتُلُ عُصْفُوْرًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا - يَذْبَحُهَا فَيَأْكُلُهَا- إِلاَّ سَأَلَهُ اللهُ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"যদি কোনো মানুষ একটি চড়ুই পাখী বা তার চেয়ে বড় কিছু না-হক্ক ভাবে- অর্থাৎ জবাই করে খাওয়ার জন্য ছাড়া- হত্যা করে তবে তাকে কিয়ামতের দিন আল্লাহ এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করবেন।"[১]

دَخَلَتْ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ

"একটি বিড়ালের কারণে একজন মহিলা জাহান্নামে যায়। সে বিড়ালটিকে বেঁধে রেখেছিল, অথচ তাকে খাদ্য দেয় নি। আবার বাইরের পোকামাকড় খাওয়ার জন্য তাকে ছেড়েও দেয় নি।"[২]

হাযেরীন, ইসলামই সর্বপ্রথম জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষকে সমান বলে ঘোষণা করেছে এবং মুমিনগণকে নির্দেশ দিয়েছে সকলের অধিকার বুঝে দিতে। বিশেষত প্রতিবেশী, সহকর্মী, এতিম, শ্রমিক, ক্রেতা বা অনুরূপ যারা আপনার চারিপার্শে থাকে তাদের প্রতি অন্যায় হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। এজন্য কুরআন-হাদীসে এদের বিষয়ে বেশি বলা হয়েছে। জাতিধর্ম নির্বিশেষে এদের সকলের প্রতি মুমিনের দয়িত্ব হলো (১) সবার সাথে সাধ্যমত ভাল ব্যবহার করতে হবে এবং সাধ্যমত উপকার করতে হবে (২) কোনোভাবে কারো প্রাপ্য বা পাওনা নষ্ট করা যাবে না বা কম দেওয়া যাবে না, (৩) কোনোভাবে কাউকে কষ্ট দেওয়া যাবে না বা ক্ষতি করা যাবে না এবং (৪) সকলের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে হবে। কুরআনে এ বিষয়ক অনেক নির্দেশ রয়েছে। কয়েকটি আয়াত শুনুন:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا

"তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর ও তার সাথে কোনো শরীক করো না। এবং পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন, এতিম, অভাবগ্রস্ত, নিকট প্রতিবেশী, দূর-প্রতিবেশী, সাথী-সহকর্মী, পথচারী এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের সাথে সদ্ব্যবহার কর। নিশ্চয় আল্লাহ দাম্ভিক ও আত্মগরবীকে পছন্দ করেন না।"[৩]

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

বল, এস, তোমাদের রব তোমাদের জন্য যা নিষিদ্ধ করেছেন তা তোমাদেরকে পড়ে শুনাই। তা এই যে, তোমরা তার সাথে কোনো কিছুকে শরীক করবে না, পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে, দারিদ্রের জন্য তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, আমিই তোমাদের ও তাদের রিযক প্রদান করি, প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য কোনো প্রকার অশ্লীলতার কাছেও যাবে না, আল্লাহ যে প্রাণকে সম্মানিত-নিষিদ্ধ

---

[১] হাকিম, আল-মুসতাদরাক ৪/২৬১; আলবানী, সহীহুত তারগীব ১/২৬৫, ২/২৭৫। হাদীসটি হাসান।
[২] বুখারী, আস-সহীহ ২/৮৩৪, ৩/১২০৫, ১২৮৪; মুসলিম, আস-সহীহ ২/৬২২, ৪/১৭৬০, ২০২২, ২১১০।
[৩] সূরা নিসা: ৩৬ আয়াত।

করেছেন তাকে আইনগত কারণ ছাড়া হত্যা করবে না। তোমাদেরকে তিনি এরূপ নির্দেশ দিলেন, যেন তোমরা অনুধাবন কর। এতিমের সম্পদের কাছেও যাবে না, কেবলমাত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত তার রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন ছাড়া, এবং পরিমাপ ও ওযন ন্যায়ভাবে পুরোপুরি দিবে, আমি কাউকে তার সাধ্যাতীত ভার অর্পন করি না, যখন তোমরা কথা বলবে, তখন ন্যায় ও ইনসাফের সাথে কথা বলবে, তা যদি স্বজনের বিষয়েও হয়, এবং আল্লাহকে প্রদত্ত অঙ্গীকার পূর্ণ করবে। আল্লাহ তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিলেন, যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ করতে পার।"[১]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا

"হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ জন্য ন্যায় সাক্ষ্য দানে অবিচল থাকবে, কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ-শত্রুতা তোমাদেরকে যেন কখনো সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে।"[২]

এ আয়াতে ও অন্যান্য আয়াতে আল্লাহ সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন যে, মুসলিমদের শত্রু কাফিরগণের ক্ষেত্রেও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে হবে। বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলিম সমাজে বসবাসরত অমুসলিম সংখ্যালঘুদের অধিকার সংরক্ষণের নির্দেশ দিয়েছেন। পূর্ববর্তী খুতবায় হারাম উপার্জন প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, অমুসলিম নাগরিককে কোনোভাবে কষ্ট দিলে বা জুলুম করলে তিনি স্বয়ং তার বিপক্ষে বাদী হবেন। অন্য হাদীসে তিনি বলেন:

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا

"যদি কেউ কোনো অমুসলিম নাগরিক বা আগন্তুককে হত্যা করে তবে সে জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না, যদিও জান্নাতের সুগন্ধ চল্লিশ বৎসরের দূরত্ব থেকে পাওয়া যায়।"[৩]

ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে কোনো মানুষকে কষ্ট না দেওয়া জান্নাত লাভের অন্যতম শর্ত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

مَنْ أَكَلَ طَيِّبًا وَعَمِلَ فِي سُنَّةٍ وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ

"যে ব্যক্তি হালাল খাদ্য খেয়ে জীবনযাপন করবে, সুন্নাত অনুসারে আমল করবে এবং কোনো মানুষ তাঁর দ্বারা কষ্ট পাবে না, সে ব্যক্তি জান্নাতী হবে।"[৪]

হাযেরীন, কুরআনের পাশাপাশি হাদীসেও ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল প্রতিবেশী-সহকর্মীর বা পার্শবর্তী মানুষদের অধিকার আদায়ের বিষয়ে বারংবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কয়েকটি হাদীস শুনুন:

وَاللَّهِ لا يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لا يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لا يُؤْمِنُ قِيلَ وَمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الَّذِي لا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَايِقَهُ

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহর কসম সে মুমিন নয়, আল্লাহর কসম সে মুমিন নয়, আল্লাহর কসম সে মুমিন নয়! সাহাবীগণ বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, সে ব্যক্তি কে? তিনি বলেন, যার প্রতিবেশী-পার্শবর্তী মানুষ তার কষ্ট থেকে রেহাই পায় না।"[৫]

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ (مَنْ بَاتَ شَبْعَانَ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ وَهُوَ يَعْلَمُ بِهِ)

"যে ব্যক্তি পরিতৃপ্ত-ভরপেট থাকে অথচ তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে সে মুমিন নয়। অন্য হাদীসে: "যে

---

[১] সূরা আনআম: ১৫১-১৫২ আয়াত।

[২] সূরা মায়িদা: ৮ আয়াত।

[৩] বুখারী, আস-সহীহ ৬/২৫৩৩।

[৪] তিরমিযী, আস-সুনান ৪/৬৬৯; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ৪/১১৭। তিরমিযী সনদের দুর্বলার কথা উল্লেখ করেছেন। হাকিম ও যাহাবী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[৫] বুখারী, আস-সহীহ ৫/২২৪০; মুসলিম, আস-সহীহ ১/৬৮।

পরিতৃপ্ত হয়ে রাত্রিযাপন করে, অথচ তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে এবং সে তা জানে সে মুমিন নয়।"[১]

আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, একব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলে, অমুক মহিলা খুব বেশি সালাত ও সিয়াম পালন করে এবং দান করে, কিন্তু সে তার মুখ দ্বারা তার প্রতিবেশিনীদেরকে কষ্ট দেয়। তিনি বলেন, মহিলাটি জাহান্নামী। আরেক মহিলা সম্পর্কে বলা হয় যে, তার নফল ইবাদত- সালাত, সিয়াম, দান ইত্যাদি সামান্য, তবে সে তার মুখ দিয়ে প্রতিবেশিনীদেরকে কষ্ট দেয় না। তখন তিনি বলেন, এ মহিলা জান্নাতী।"[২]

হাযেরীন, সমাজের দুর্বল মানুষদের অধিকার হরণে প্ররোচিত হয় মানুষ; কারণ এদের অধিকার হরণ করে সহজেই পার পাওয়া যায়। আর এজন্যই কুরআন ও হাদীসে এ ধরনের মানুষদের অধিকার রক্ষার বিষয়ে বিশেষ তাকিদ দেওয়া হয়েছে এবং এদের কল্যাণ ও সেবা করার অভাবনীয় পুরস্কারের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এদের মধ্যে অন্যতম এতিম বা পিতৃহীন অনাথ। কুরআন ও হাদীসে এদেরকে কষ্ট দেওয়ার বা এদের সম্পদের কোনোরূপ অপব্যবহার বা তসরূপ করার কঠিন শাস্তির কথা বারংবার বলা হয়েছে। পূর্ববর্তী আয়াতগুলি আমরা বিষয়টি দেখেছি। অন্যত্র আল্লাহ বলেন:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

"যারা অন্যায়ভাবে এতিমদের সম্পদ ভক্ষণ করে তারা তাদের উদরে অগ্নি ভক্ষণ করে এবং তারা জাহান্নামের জ্বলন্ত আগুনে জ্বলবে"[৩]

হাযেরীন, এতিমরা সবচেয়ে বেশি অত্যাচারিত হয় তাদের অভিভাবক আত্মীয়দের দ্বারা। পিতার মৃত্যুর পরে তারা ভাই, চাচা বা অনুরূপ আত্মীয়দের দায়িত্বাধীনে চলে যায়। এ সকল আত্মীয় অনেক সময় তাদের সম্পদ পুরোপুরি বুঝে দেন না। কখনো বা ভাল জমি নিজে রেখে কমাটা তাকে দেয়। অথবা এতিমের সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করার বিনিময়ে এতিমের খরচপত্রের পরে উদ্বৃত্ত তার সম্পত্তির উপার্জন সবই তিনি নিজে ভোগ করেন। বিশেষত পিতার মৃত্যুর পরে বড় ভাই সাধারণত ছোট ভাইবোনদের সম্পতি এজমালীভাবে ভোগ করেন। তিনি ভাইবোনদের খাওয়া, পরা ও লেখাপড়ার ব্যবস্থা করেন। তবে সকল সম্পত্তির উপার্জন নিজের ইচ্ছামত খরচ করেন বা নিজের নামে নতুন সম্পত্তি করেন। বোনদের সম্পত্তি তো কখনোই দেন না। বড় হলে বাপের রেখে যাওয়া সম্পত্তির অংশ ভাইদের প্রদান করেন, কিন্তু এতদিন এজমালী সম্পত্তির উপার্জন থেকে তাদের কিছুই দেন না। এগুলি সবই ইসলামের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ। মানুষের মৃত্যুর পরেই সম্পত্তি তার উত্তরাধিকারীদের সম্পত্তিতে পরিণত হয়। পিতার মৃত্যুর পর সম্পত্তি শরীয়তের বণ্টন মোতাবেক ভাইবোনদের মালিকানা হয়ে যায়। শুধু জমাজমি বা মাঠের সম্পত্তিই নয়। মৃতের সকল স্থাবর, অস্থাবর, বসতবাড়ী, ব্যবসা বাণিজ্য, ব্যাংক-বীমা ও অন্য সকল প্রকার সম্পত্তিই উত্তরাধিকারদের মধ্যে শরীয়ত মত বণ্টিত হবে। বণ্টনের পরে এজমালী ভাবে চাষাবাদ, বসবাস বা ব্যাবসা করা যেতে পারে। তবে প্রত্যেকের হক্ক পরিচ্ছন্ন থাকবে। বড় ভাই নিজের অংশের সম্পত্তি দিয়ে নিজের ব্যয়ভার চালাবেন। অন্যান্য এতিম ভাইবোনদের সম্পত্তি তাদের ম্যানেজার হিসেবে দেখাশোনা করবেন। একান্ত বাধ্য হলে তিনি ভাইবোনদের সম্পত্তির উপার্জন থেকে ম্যানেজার হিসাবে নিজের বেতন-ভাতা নিতে পারেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হলে ভাই বোন সকলকে তাদের সম্পদ পুরোপুরি বুঝে দিতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন:

وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

---

[১] হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৮/১৬৭; আলবানী, সহীহুত তারগীব ২/৩৪৫। হাদীসটি সহীহ।

[২] হাকিম, আল-মুসতাদরাক ৪/১৮৩-১৮৪; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৮/১৬৯; আলবানী, সহীহুত তারগীব ২/৩৪৫। হাদীসটি সহীহ।

[৩] সূরা নিসা: ১০ আয়াত।

"এতিমদেরকে তাদের ধন-সম্পদ সমর্পন করবে এবং ভালর সাথে মন্দ বদল করবে না। তোমারেদ সম্পদের সাথে তাদের সম্পদ মিশিয়ে তাদের সম্পদ গ্রাস করবে না। নিশ্চয় তা মহাপাপ।"[১]

وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا

"বিবাহযোগ্য বা বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তোমরা এতিমদের যাচাই করবে এবং তাদের মধ্যে ভালমন্দ বিচারের জ্ঞান দেখলে তাদের সম্পদ তাদেরকে ফিরিয়ে দেবে। তারা বড় হয়ে যাবে ভেবে তাড়াহুড়ো করে অন্যায়ভাবে তাদের সম্পদ খেয়ো না। যে (অভিভাবক) অভাবমুক্ত সে যেন (এতিমদের সম্পদ থেকে কিছুমাত্র গ্রহণ করা থেকে) নিবৃত থাকে। আর যে (অভিভাবক) বিত্তহীন-অভাবী সে যেন সঙ্গত পরিমাণে ভক্ষণ করে। তোমরা যখন তাদেরকে তাদের সম্পদ সমর্পন করবে তখন সাক্ষী রেখ। হিসাব গ্রহণে আল্লাহই যথেষ্ট।"[২]

এতিমদের বিষয়ে আরো অনেক নির্দেশনা কুরআন ও হাদীসে রয়েছে। তাদের প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবনীয় সাওয়াবের বিষয় আমরা খিদমতে খালক বিষয়ক খুতবায় আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ।

হাযেরীন, সকল মানুষের সার্বজনীন অধিকারের পাশাপাশি মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক অতিরিক্ত কিছু অধিকার রয়েছে। এগুলির অন্যতম হলো আন্তরিক ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্ব। আল্লাহ বলেন:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ

"মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই; অতএব তোমাদের ভ্রাতগণের মধ্যে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা কর।"[৩]

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

"মুমিন পুরুষগণ ও মুমিন নারীগণ একে অপরের বন্ধু"[৪]

মুমিনদের মধ্যে পারস্পকি ভ্রাতৃত্বের দায়িত্ব ও অধিকার ব্যাখ্যা করে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

لا تَحَاسَدُوا وَلا تَنَاجَشُوا وَلا تَبَاغَضُوا وَلا تَدَابَرُوا وَلا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لا يَظْلِمُهُ وَلا يَخْذُلُهُ وَلا يَحْقِرُهُ .... بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ

"তোমরা পরস্পরে হিংসা করবে না, দালালি করে দামবৃদ্ধি করবে না, পরস্পরে বিদ্বেষ পোষণ করবে না, পরস্পর শত্রুতা ও বিচ্ছিনতায় লিপ্ত হয়ো না, একজনের ক্রয়বিক্রয় প্রক্রিয় চলমানকালে অন্যজন ক্রয়বিক্রয় বা দামাদামি করবে না, আল্লাহর বান্দারা, তোমরা সবাই পরস্পরে ভাই হয়ে যাও। একজন মুসলিম অন্য মুসলিমের ভাই। সে তাকে অত্যাচার করে না, তাকে বিপদে একা ছেড়ে দেয় না, তাকে অবজ্ঞা করে না। একজন মানুষের জন্য কঠিনতম অন্যায় যে, সে তার মুসলিম ভাইকে অবজ্ঞা অবমাননা করবে। একজন মুসলিমের জন্য অন্য মুসলিমের প্রাণ, সম্পদ ও সম্মান সবই হারাম।"[৫]

---

[১] সূরা নিসা: ২ আয়াত।
[২] সূরা নিসা: ৬ আয়াত।
[৩] সূরা আল-হুজুরাত: ১০ আয়াত।
[৪] সূরা তাওবা: ৭১ আয়াত।
[৫] বুখারী, আস-সহীহ ৫/২২৫৩, ২২৫৬; মুসলিম, আস-সহীহ ৪/১৯৮৩-১৯৮৬।

অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: "ততক্ষণ তোমরা কেউ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না নিজের জন্য যা পছন্দ করবে অন্য মুসলিম ভাইয়ের জন্যও তা-ই পছন্দ করবে।"[১]

তিনি আরো বলেন:

لا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا

"তোমরা মুমিন না হওয়া পর্যন্ত জান্নাতে যাবে না এবং পরস্পরে একে অপরকে না ভালবাসলে মুমিন হতে পারবে না।"[২]

অন্যান্য হাদীসে তিনি বলেছেন যে, একজন মুসলিমের কাছে অন্য মুসলিমের ওয়াজিব পাওনা ৬ টি: দেখা হলে সালাম দেওয়া বা সালাম দিলে জাওয়াব দেওয়া, দাওয়াত দিলে কবুল করা, পরামর্শ চাইলে পরামর্শ দেওয়া, হাঁচি দিয়ে 'আলহামদুলিল্লাহ' বললে জাওয়াবে "ইয়ারহামুকাল্লাহ" বা "আল্লাহ তোমাকে রহম করুন" বলা, অসুস্থ হলে দেখতে যাওয়া এবং মৃত্যু হলে তার জানাযার শরীক হওয়া।[৩]

হাযেরীন, এগুলি সবই আপনার মুসলিম ভাইয়ের অধিকার। আল্লাহ বা তাঁর রাসূল ﷺ মোটেও বলেন নি যে, পূর্ণ মুমিনগণ, নিষ্পাপ মুমিনগণ, সহীহ আকীদার মুমিনগণ বা নির্দিষ্ট দলের মুমিনগণ পরস্পর ভাই এবং তাদের মধ্যে এসকল অধিকার সীমাবদ্ধ। বরং যতক্ষণ একজন মানুষকে ন্যূনতম মুসলিম বলে গণ্য করা যাবে ততক্ষণ এগুলি সবই তার পাওনা ও অধিকার। রাজনৈতিক মতাদর্শ, বিদ'আত, বিভ্রান্তি, বা অন্য কোনো কারণে আপনি আপনার মুসলিম ভাইয়ের প্রতি হিংসা, বিদ্বেষ, শত্রুতা, অবজ্ঞা ইত্যাদি পোষণ করেন তবে আপনি বান্দার হক্ক নষ্টের কঠিনতম পাপে পাপী হবেন। বিভ্রান্তি বা পাপের প্রতি আপত্তি বা ঘৃণা থাকবে। দীনদার বা আপনার মতানুসারে সহীহ আকীদার মুসলিমের প্রতি আপনার ভালবাসা, বন্ধুত্ব বা ভ্রাতৃত্ব বেশি থাকতে পারে। কিন্তু পাপী বা আপনার মতানুসারে বাতিল আকীদার ব্যক্তিকে যতক্ষণ আপনি নিশ্চিতরূপে কাফির বলতে না পারছেন ততক্ষণ তাকে আপনি ভ্রাতৃত্বের ন্যূনতম অধিকার দিতে বাধ্য। যদি পাপ, বিদআত বা বিভ্রান্তির কারণে আপনি মুসলিমের সাথে বিদ্বেষ বা শত্রুতা পোষণ করেন তবে বুঝা যাবে যে, আপনি ঈমানের চেয়ে পাপের বা আপনার নিজের মতামতের গুরুত্ব বেশি দেন। একজন মুমিন কখনোই তা করতে পারে না।

হাযেরীন, যদি ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় আপনার দ্বারা কোনা মানুষের অধিকার নষ্ট হয়ে থাকে তবে দুনিয়াতেই তার থেকে যে কোনোভাবে ক্ষমা নেওয়ার ব্যবস্থা করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لا يَكُونَ دِينَارٌ وَلا دِرْهَمٌ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ

"যদি কেউ (গীবত-অপবাদ করে) কারো মর্যাদা-সম্মান নষ্ট করে বা অন্য কোনোভাবে কারো প্রতি জুলুম করে থাকে তবে সে যেন কিয়ামতের আগে আজই তার থেকে মুক্তি নিয়ে নেয়; কারণ সে দিন কোনো টাকাপয়সা থাকবে না। যদি তার নেক আমল থাকে তবে তার জুলুমের পরিমাণ অনুসারে নেক আমল নিয়ে নেওয়া হবে। আর যদি তার নেক আমল না থাকে তার সাথীর পাপ নিয়ে তার কাঁধে চাপানো হবে।"[৪]

মহান আল্লাহ আমাদেরকে নাজাত ও তাঁর সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত করুন। আমীন।

---

[১] বুখারী, আস-সহীহ ১/১৪; মুসলিম, আস-সহীহ ১/৬৭-৬৮।

[২] মুসলিম, আস-সহীহ ১/৭৪

[৩] বুখারী, আস-সহীহ ১/৪১৮; মুসলিম, আস-সহীহ ৪/১৭০৪-১৭০৫।

[৪] বুখারী, আস-সহীহ ২/৮৬৫, ৫/২৩৯৪।

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

أَمَّا بَعْدُ، فَيَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى

وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا

وَقَالَ: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا

بَارَكَ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ فِيْ الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ. وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ. أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ، فَاسْتَغْفِرُوْهُ وَتُوْبُوْا إِلَيْهِ، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.

জুমাদাস সানিয়া মাসের ৩য় খুতবাঃ পিতামাতার অধিকার

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লী আলা রাসূলিহীল কারীম। আম্মা বাদ,

সম্মানিত উপস্থিতি, আজ জুমাদাস সানিয়া মাসের ৩য় জুমুআ। আজ আমরা পিতামাতার অধিকার ও সন্তানের কর্তব্য বিষয়ে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ। কিন্তু তার আগে আমরা এ সপ্তাহের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসগুলির বিষয়ে সংক্ষেপ আলোকপাত করি। হাযেরীন, আজ ইংরেজী ..... মাসের ..... তারিখ। এ সপ্তাহের দিবসগুলির মধ্যে রয়েছে .... ।

সম্মানিত উপস্থিতি, আধুনিক সভ্যতায় ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও স্ত্রী-সন্তানকেন্দ্রিক জীবনে পিতামাতার প্রতি মানুষের অবহেলা সীমাহীন। অথচ এ পৃথিবীতে প্রতিটি মানুষ মহান স্রষ্টার পরে তার অস্তিত্বের জন্য তার পিতামাতার নিকট ঋণী। এই ঋণ অপরিশোধ্য। কুরআন ও হাদীসের আলোকে পিতামাতার আনুগত্য ও খেদমত অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফরয আইন ইবাদত। কুরআনে আল্লাহ বারংবার তাঁর নিজের ইবাদত করার নির্দেশ দেওয়ার পরেই পিতামাতার প্রতি দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। হক্কুল ইবাদত বিষয়ক পূর্ববর্তী খুতবায় কয়েকটি আয়াতে আমরা তা দেখেছি। অন্যত্র আল্লাহ বলেনঃ

وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُورًا

"এবং তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া আর কারো ইবাদত করবে না এবং পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। পিতামাতা উভয়ে বা তাঁদের একজন যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হন তাহলে তাঁদেরকে "উফ" বলবে না, (তাঁদের প্রতি সামান্যতম বিরক্তি প্রকাশ করবে না) তাঁদেরকে ধমক দেবে না এবং তাদের সাথে সম্মানজনক বিনম্র কথা বলবে। মমতাবশে তাঁদের জন্য নম্রতার পক্ষপুট অবনমিত করে রাখবে এবং বলবেঃ হে আমার প্রভু, আপনি তাঁদেরকে দয়া করুন যেমনভাবে তাঁরা শৈশবে আমাকে প্রতিপালন করেছেন। তোমাদের অন্তরে কি আছে তা তোমাদের রাব্ব ভাল জানেন। তোমরা যদি সৎকর্মশীল হও তবে তিনি আল্লাহমুখিদের ক্ষমাকারী।[১]

হাযেরীন, কুরআন কারীম থেকে আমরা দেখি যে, পিতামাতার আনুগত্য, তাদের খিদমত ও তাঁদের জন্য দুআর ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ আদর্শ ছিলেন নবী-রাসূলগণ। বিভিন্ন নবীর ক্ষেত্রে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাঁরা পিতামাতার অনুগত ছিলেন, তাদের সেবা করতেন এবং তাদের জন্য দুআ করতেন। পিতার আনুগত্যের অতুলনীয় আদর্শ স্থাপন করেছেন ইসমাঈল (আ)। যখন তাঁর পিতা ইবরাহীম (আ) তাকে জানালেন যে, তিনি স্বপ্নে তাকে কুরবানী করার নির্দেশ পেয়েছেন, তখন তিনি অবিচল চিত্তে পিতার সিদ্ধান্ত মেনে নেন। সূরা আস-সাফফাত-এর ১০২ আয়াতের বর্ণনাঃ

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ

"যখন সেই ছেলে (ইসমাঈল) তার পিতার (ইবরাহীমের) সাথে কাজ করবার মত বয়সে উপনীত হলো তখন ইবরাহীম বললেন : বৎস, আমি স্বপ্নে দেখি যে, আমি তোমাকে জবাই করছি, এখন তোমার

[১] সূরা বনী ঈসরাঈলঃ ২৩-২৪ আয়াত।

অভিমত কি বল? সে বলল : হে আমার পিতা, আপনাকে যে আদেশ দেওয়া হয়েছে তা আপনি করুন। আল্লাহ ইচ্ছা করলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন।"

হাযেরীন, পিতামতার আনুগত্য ও সেবার অর্থ হলো আল্লাহর নির্দেশের বিরোধী নয় তাদের এমন সকল নির্দেশ মান্য করা এবং সাধ্যমত তাদের সেবা-যত্ন করা। বার্ধক্যজনিত কারণে, মানবীয় দুর্বলতায় বা কারো প্ররোচনায় পিতামাতা সন্তানের সাথে দুর্ব্যবহার করেত পারেন। এক্ষেত্রে সন্তানের উপর ফরয হলো ধৈর্য ধরা এবং তাদের সাথে বিনয়ের সাথে সর্বোত্তম আচরণ করা। তাদের দুর্ব্যবহার, বোকামী বা অন্যায়ের জন্য তাদের সাথে দুর্ববহার করা তো দূরের কথা "উফ" বলে বিরক্তিও প্রকাশ করা নিষিদ্ধ। বিনয় ও আদবের সাথে তাদের ভুল ধরে দেওয়া যেতে পারে। তারা যতই দুর্ব্যবহার করুন না কেন তাদের সাথে সাধ্যমত বিনয় প্রকাশ করতে হবে, ভাল ব্যবহার করতে হবে এবং সেবা করতে হবে। মুমিনের যথাসাধ্য আন্তরিক চেষ্টার পরেও কোনো কারণে পিতামাতা বিরক্ত থাকলে সেজন্য দুশ্চিন্তা নিষ্প্রয়োজন। কারণ মুমিনের অন্তরে কি আছে তা আল্লাহ জানেন। মুমিন যদি সাধ্যমত চেষ্টা করেন এবং ইচ্ছা করে ত্রুটি না করেন তবে অনিচ্ছাকৃত ভুল আল্লাহ ক্ষমা করবেন।

পিতামাতার নির্দেশে বা প্রয়োজনে নফল-মুস্তাহাব ইবাদত ছেড়ে দিয়ে তাদের খিদমত করতে হবে। তবে তারা যদি ফরয-ওয়াজিব ইবাদত ত্যাগ করতে বলেন, বা হারাম বা মাকরূহ তাহরীমী পাপের নির্দেশ দেন তবে তা পালন করা যাবে না। যেমন পিতামাতার প্রয়োজন হলে তাহাজ্জুদ, চাশত, নফল নামায, নফল রোযা ও অন্যান্য নফল ইবাদত বাদ দিয়ে তাদের খেদমত করতে হবে। আর যদি তারা নামায কাযা করতে, যাকাত না দিতে, দাড়ি কাটতে, বেপর্দা চলতে, সিনেমা দেখতে, কারো ক্ষতি করতে, কারো হক্ক নষ্ট করতে বা অনুরূপ কোনো হারাম কাজের নির্দেশ দেন তবে তা মান্য করা যাবে না। কিন্তু এ সকল নির্দেশের জন্য তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করা যাবে না বা তাদের খেদমত ও আনুগত্যে অবহেলা করা যাবে না। সূরা লুকমান-এর ১৪ আয়াতে আল্লাহ বলেন:

وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا

"এবং আমি মানুষকে তার পিতামাতার প্রতি সদাচারণের নির্দেশ দিয়েছি। জননী সন্তানকে কষ্টের উপর কষ্ট বরণ করে গর্ভে ধারণ করেন এবং তার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বৎসরে। অতএব আমার প্রতি এবং তোমার পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। প্রত্যাবর্তন তো আমারই কাছে। যদি তোমার পিতামাতা তোমাকে পীড়াপীড়ি করে যে, তুমি আমার সাথে শিরক করবে, যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তাহলে তুমি তাদের কথা মানবে না, তবে পৃথিবীতে তাঁদের সাথে সদাচারণের সাথে জীবন কাটাবে।"

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, বনী ইসরাঈলের মধ্যে জুরাইজ নামে একজন আবিদ ছিলেন। তিনি মাঠের মধ্যে একটি খানকায় আল্লাহর ইবাদত বন্দেগি করতেন। একদিন তার আম্মা এসে বাইরে থেকে ডাকেন, জুরাইজ, আমি তোমার মা, তুমি কথা বল। ঘটনাচক্রে জুরাইজ তখন নামায পড়ছিলেন। তিনি মনে মনে বলেন, আল্লাহ, একদিকে মা আরেক দিকে সালাত, আমি কি করি? এরপর তিনি সালাতকেই বেছে নিলেন, মায়ের ডাকে সাড়া দিলেন না। এ ভাবে তিন বার তার মা তাকে ডাকেন এবং তিনবারই তিনি দ্বিধা করার পর সালাত শেষ করার সিদ্ধান্ত নেন। তখন তার মা বলেন, আল্লাহ আমি জুরাইজকে ডাকলাম, অথচ সে সাড়া দিল না, আল্লাহ তুমি তাকে ব্যভিচারিনীর মুখ না দেখিয়ে মৃত্যু দিও না- রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যদি মা পাপে জড়ানো বা এর চেয়ে কোনো কঠিন দুআ করত তবে তাও কবুল

হতো-। ঘটনাচক্রে একজন রাখাল জুরাইজের খানকায় থাকত। গ্রামের একজন মহিলা মাঠে বের হলে উক্ত রাখাল তার সাথে ব্যভিচার করে এবং মেয়েটি গর্ভবতী হয় এবং একটি শিশু প্রসব করে। গ্রামবাসী তাকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে সে বলে, উক্ত খানকাওয়ালা এর জন্য দায়ী। তখন গ্রামবাসী তার খানকা আক্রমন করে ভেঙ্গে ফেলে। অবস্থা দেখে জুরাইজ দু রাকাত সালাত আদায় করে আল্লাহর কাছে কাঁদাকাটা করে শিশুর কাছে এসে তার মাথায় হাত দিয়ে প্রশ্ন করেন, তোমার পিতা কে? শিশু বলে, অমুক রাখাল। দুগ্ধপোষ্য শিশুর মুখে কথা শুনে গ্রামবাসী জুরাইজের বুজুর্গি বুঝতে পারে ও অনুতপ্ত হয়।"[১]

হাযেরীন, জুরাইজ যদি আলিম হতেন তাহলে বুঝতেন যে, নামায চালিয়ে যাওয়ার চেয়ে মায়ের ডাকে সাড়া দেওয়া অনেক বেশি জরুরী ছিল। তার ভাগ্য ভাল যে, মা শুধু ব্যভিচারিণীর মুখ দেখার দুআ করেছিলেন। যদি আরো কঠিন দুআ করতেন তাহলে হয়ত আর বাঁচার উপায় থাকত না।

হাযেরীন, আমরা অনেক সময় ফযীলত, ফাইদা, গুরুত্ব ইত্যাদির বিষয়ে বিভ্রান্তিতে পড়ি এবং ফরয আইন, ফরয কিফায়া ও নফল-মুস্তাহাবের পার্থক্য বুঝতে পারি না। যেমন জিহাদ, দাওয়াত, তাবলীগ, উচ্চতর ইলম অর্জন, হাক্কানী পীরের সাহচার্য, দীন প্রতিষ্ঠার কর্ম ইত্যাদির ফযীলতে বিমুগ্ধ হয়ে এগুলির জন্য পিতামাতা, স্বামীস্ত্রী বা সন্তানদের প্রতি ফরয আইন দায়িত্বে অবহেলা করি। অনেক সময় কারো পিতামাত যদি জিহাদ, দাওয়াত, দীন প্রতিষ্ঠা, ইলম শিক্ষা ইত্যাদি কাজে অংশ নিতে নিষেধ করেন তাহলে তাদের নির্দেশ তো মান্য করেনই না, উপরন্তু তাদের অবাধ্যতা ও বেয়াদবি করার পর্যায়ে চলে যান। দীন পালনের আবেগের সাথে ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা মিশ্রিত হয়ে এরূপ হয়। এ সকল ইবাদত অধিকাংশই ফরয কিফায়া এবং ব্যক্তির জন্য নফল। আর পিতামাতার খেদমত ফরয আইন ইবাদত। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস (রা) বলেন:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاسْتَأْذَنَهُ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ أَحَيٌّ وَالِدَاكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ

"একব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে জিহাদে অংশগ্রহণের অনুমতি প্রার্থনা করে। তিনি বলেন: তোমার পিতামাতা কি জীবিত আছেন? সে বলে : হ্যাঁ। তখন তিনি বলেন : তোমার পিতামাতাকে নিয়ে তুমি জিহাদ কর।"[২]

أَقْبَلَ رَجُلٌ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ أَبْتَغِي الأَجْرَ مِنَ اللَّهِ قَالَ فَهَلْ مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَدٌ حَيٌّ قَالَ نَعَمْ بَلْ كِلاهُمَا قَالَ فَتَبْتَغِي الأَجْرَ مِنَ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَارْجِعْ إِلَى وَالِدَيْكَ فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا

একব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আগমন করে বলে: আমি হিজরত ও জিহাদ করার জন্য আপনার হাতে বাইয়ত গ্রহণ করতে এসেছি। আমি এভাবে আল্লাহর নিকট থেকে পুরস্কার চাই। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: তোমার পিতামাতার মধ্যে কেউ কি জীবিত আছেন? সে বলে : হ্যাঁ, তাঁরা উভয়েই জীবিত আছেন। তখন তিনি বলেন: তুমি কি আল্লাহর নিকট পুরস্কার চাও? লোকটি বলে: হ্যাঁ। তিনি বলেন: তাহলে তুমি তোমার পিতামাতার কাছে ফিরে যাও এবং তাঁদের খেদমতে জীবন কাটাও।"[৩]

হাযেরীন, হিজরত ফরয আইন ছিল। জিহাদও অনেক সময় ফরয আইন হতো। কিন্তু তারপরও এগুলির উর্ধ্বে পিতামাতার খেদমত। কারণ এগুলি কখনো ফরয আইন হলেও ওযর-এর কারণে বাদ দেওয়ার বিধান রয়েছে। কিন্তু পিতামাতার খেদমতের ক্ষেত্রে তা নেই। তালহা ইবনু মুআবিয়া (রা) বলেন:

---

[১] বুখারী, ২/৮৭৮, ৪/১২৮৬; মুসলিম, আস-সহীহ ৪/১৯৭৬, ১৯৭৭।
[২] বুখারী, আস-সহীহ ৩/১০৯৪; মুসলিম, আস-সহীহ ৪/১৯৭৫।
[৩] মুসলিম, আস-সহীহ ৪/১৯৭৫।

أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّيْ أُرِيْدُ الْجِهَادَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ قَالَ أُمُّكَ حَيَّةٌ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: الْزَمْ رِجْلَهَا فَثَمَّ الْجَنَّةُ

"আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আগমন করে বলি : হে আল্লাহর রাসূল : আমি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে চাই। তিনি বলেন: তোমার আম্মা কি জীবিত আছেন? আমি বললাম: হ্যাঁ। তখন তিনি বলেন, তাঁর পা আঁকাড়ে পড়ে থাক, কারণ সেখানেই জান্নাত রয়েছে।"[১]

অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, একব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আগমন করে বলে, আমি হিজরতের বাইয়াত করতে আপনার নিকট এসেছি এবং আমার আগমনের সময় আমার পিতামাতা কাঁদছিলেন, তারপরও আমি চলে এসেছি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

ارْجِعْ عَلَيْهِمَا فَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا

"যেমন কাঁদিয়ে এসেছ, এবার তাদের কাছে ফিরে যেয়ে তেমনি তাদেরকে হাসাও।"[২]

হাযেরীন, আনুগত্যে ও খিদমাতের পিতামাতা উভয়েরই অধিকার। এরমধ্যেও মায়ের অধিকার পিতার চেয়ে বেশি। একব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আগমন করে এবং বলে : হে আল্লাহর রাসূল, আমার সদ্ব্যবহার ও খেদমত পাওয়ার সবচেয়ে বেশি অধিকার কোন মানুষের? তিনি বলেন : তোমার আম্মা তোমার সদ্ব্যবহার ও খেদমত পাওয়ার সবচেয়ে বেশি হকদার। ঐ ব্যক্তি বলে : এরপর কে? তিনি বলেন: এরপর তোমরা আম্মা। ঐ ব্যক্তি বলে : এরপর কে? তিনি বলেন : এরপর তোমরা আম্মা। ঐ ব্যক্তি বলে : এরপর কে? তিনি বলেন : এরপর তোমরা আব্বা।"[৩]

হাযেরীন, পিতামাতার খেদমতের একটি বিশেষ দিক তাদের জন্য অর্থ ব্যয় করা। আল্লাহ বলেন:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ

"কি ব্যয় করবে সে বিষয়ে তারা আপনাকে প্রশ্ন করছে। আপনি বলুন : তোমরা কল্যাণকর যা কিছু ব্যয় করবে তা পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন অনাথগণ, দরিদ্রগণ ও মুসাফিরের জন্য।"[৪]

এভাবে আমরা দেখছি যে, মুমিনের ব্যয়ের প্রথম খাতই পিতামাতা। উপরন্তু পিতামাতার অধিকার আছে সন্তানের সম্পদে। নিজেদের ভরণপোষনের অর্থ তারা সন্তানের সম্পদ থেকে দাবি করে বা জোর করে নিতে পারেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ (فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلَادِكُمْ)

"নিজের উপার্জন থেকে আহার করাই পবিত্রতম আহার, আর মানুষের সন্তান তার নিজের উপার্জন। কাজেই তোমরা তোমাদের সন্তানদের উপার্জন থেকে ভক্ষণ করবে।"[৫]

হাযেরীন, পিতামাতার আনুগত্য ও ইবাদত যেমন সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত, এর পুরস্কারও মহান। পিতামাতর খেদমতকে নামাযের পরেই সর্বোত্তম নেক আমল বলে ঘোষণা করে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ

---

[১] হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৮/১৩৮; যিয়া মাকদিসী, আল-মুখতারাহ ৮/১৫০; আলবানী, সহীহুত তারগীব ২/৩২৭। হাদীসটি সহীহ।

[২] আবূ দাউদ, আস-সুনান ৩/১৭; ইবনু মাজাহ, আস-সুনান ২/৯৩০; আলবানী,সহীহুত তারগীব ২/৩২৬। হাদীসটি সহীহ।

[৩] বুখারী, আস-সহীহ ৫/২২২৭; মুসলিম, আস-সহীহ ৪/১৯৭৪।

[৪] সূরা বাকারা: ২১৫ আয়াত।

[৫] আবূ দাউদ ৩/২৮৮; নাসাঈ, ৭/২৪০-২৪১; ইবনু মাজাহ ২/৭২৩; আলবানী, সহীহ সুনানি আবী দাউদ ৮/২৮,২৯, নং ৩৫২৮, ৩৫২৯।

"সর্বশ্রেষ্ঠ নেককর্ম হলো সঠিক সময়ে সালাত আদায় করা এবং পিতামাতার খেদমত করা।"[১]

অন্যান্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

رِضَا الرَّبِّ فِيْ رِضَا الْوَالِدَيْنِ، وَسَخَطُهُ فِيْ سَخَطِهِمَا

"পিতামাতার সন্তুষ্টির মধ্যেই আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং পিতামাতার অসন্তুষ্টির মধ্যেই আল্লাহর অসন্তুষ্টি।"[২]

الْجَنَّةُ تَحْتَ أَرْجُلِهِمَا (أي الوالدين)

"পিতামাতার পায়ের নীচে জান্নাত।"[৩]

হাযেরীন, পিতামাতা আমাদের ইহকালীন জীবনের উৎস। এ জীবনের জন্য আমরা তাদের কাছে চিরঋণী। আবার তারাই আমাদের আখিরাতের জীবনের উৎস। তাদের খেদমতই জান্নাতের সুনিশ্চিত পথ। পিতামাতার খেদমতের সুযোগ পেয়েও যে হারাল তার মত হতভাগা আর নেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

رَغِمَ أَنْفُهُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا ثُمَّ لَمْ يَدْخُلْ الْجَنَّةَ

"হতভাগা সে, হতাভাগা সে, হতভাগা সে, যে ব্যক্তি তার পিতামাতাকে উভয়কে বা একজনকে বৃদ্ধ অবস্থায় পেল এরপরও (তাদের খেদমতের মাধ্যমে) জান্নাতে প্রবেশ করতে পারল না।[৪]

প্রিয় ভাইয়েরা, পিতামাতার খেদমত ও তাঁদের সাথে সর্বোত্তম আচরণ যেমন আল্লাহর সন্তুষ্টি, রহমত ও জান্নাত লাভের অন্যতম উপায়, তেমনি তাঁদের সাথে দুর্ব্যবহার করা, কোনোভাবে তাঁদের কষ্ট দেওয়া বা তাঁদের খেদমতে অবহেলা করা আল্লাহর অসন্তুষ্টি, গযব, লা'নত ও জাহান্নাম লাভের অন্যতম উপায়। বিভিন্ন হাদীসে বারংবার ঘোষণা করা হয়েছে যে, পিতামাতার অবাধ্যতা বা কোনোভাবে তাঁদের মনে কষ্ট দেওয়া হারাম ও জঘণ্যতম কবীরা গুনাহ। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ وَوَأْدَ الْبَنَاتِ وَمَنَعَ وَهَاتِ

"নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর পিতামাতার অবাধ্য হওয়া, কন্যাশিশুদেরকে জীবন্ত কবর দেওয়া, কারো প্রাপ্য অধিকার আদায়ে বিরত থাকা ও জোর পূর্বক কারো কিছু গ্রহণ করা হারাম করে দিয়েছেন।"[৫]

শিরকের পরে ভয়ঙ্করতম মহাপাপ হলো পিতামাতার অবাধ্যতা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

الْكَبَائِرُ :الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ ثُمَّ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ.

"কঠিনতম কবীরা গোনাহ আল্লাহর সাথে শিরক করা, এরপর পিতামাতার অবাধ্য হওয়া।"[৬]

অন্য হাদীসে তিনি বলেন:

ثَلاثَةٌ لا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ وَالدَّيُّوثُ

"তিন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের দিকে তাকাবেন না: পিতামাতার অবাধ্য, পুরুষের পোশাক বা সাজগোজ পরিধানকারী মহিলা এবং দাইউস যে তার পরিবারের সদস্যদের অশ্লীলতা মেনে নেয়।"[৭]

---

[১] বুখারী, আস-সহীহ ১/১৯৭, ৬/২৭৪০; মুসলিম, আস-সহীহ ১/৮৯-৯০।

[২] তিরমিযী, আস-সুনান ৪/৩১০; আলবানী, সহীহুত তারগীব ২/৩৩১। হাদীসটি হাসান।

[৩] তাবারানী, আল-মু'জামুল কাবীর ২/২৮৯; আলবানী, সহীহুত তারগীব ২/৩২৭। হাদীসটি সহীহ।

[৪] মুসলিম, আস-সহীহ ৪/১৯৭৮।

[৫] বুখারী, আস-সহীহ ২/৮৪৮, ৫/২২২৯, ৬/২৬৫৯; মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৩৪১।

[৬] বুখারী, আস-সহীহ ৫/২২২৯, ৬/২৫৩৫।

[৭] নাসাঈ, আস-সুনান ৫/৮০; আলবানী, সহীহুত তারগীব ২/২২৮, ২৯৮, ৩৩৩। হাদীসটি সহীহ।

হাযেরীন, ভয়ঙ্করতম কীবরা গোনাহ হলো পিতামাতাকে গালি দেওয়া।রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

مَلْعُونٌ مَنْ سَبَّ أَبَاهُ مَلْعُونٌ مَنْ سَبَّ أُمَّهُ مَلْعُونٌ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ مَلْعُونٌ مَنْ غَيَّرَ تُخُومَ الأَرْضِ مَلْعُونٌ مَنْ كَمَّهَ أَعْمَى عَنْ الطَّرِيقِ مَلْعُونٌ مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ مَلْعُونٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ

"অভিশপ্ত মালউন যে তার পিতাকে গালি দেয়, অভিশপ্ত মালউন যে তার মাতাকে গালি দেয়, অভিশপ্ত মালউন যে আল্লাহ ছাড়া কারো জন্য জবাই করে, অভিশপ্ত মালউন যে জমিজমার আইল পরিবর্তন করে, অভিশপ্ত মালউন যে কোনো অন্ধ ব্যক্তিকে বিপথে পরিচালিত করে, অভিশপ্ত মালউন যে কোনো প্রাণীতে উপগত হয়, অভিশপ্ত মালউন যে সমকামিতায় লিপ্ত হয়।[১]

হাযেরীন, কাউকে যখন "অমুকের বাচ্চা" বলে গালি দেওয়া হয়, তখন সেও "অমুকের বাচ্চা" বলে গালি দেয়। এরূপ করাও কঠিন কবীরা গোনাহ। একদিকে অন্যের পিতা বা মাতাকে গালি দেওয়া হলো, অপরদিকে এরূপ গালির কারণে নিজের পিতা বা মাতা গালি খেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

مِنْ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ نَعَمْ يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ

কবীরা গোনাগুলির একটি হলো মানুষ তার পিতামাতাকে গালি দিবে। তখন সাহাবীগণ প্রশ্ন করেন, হে আল্লাহর রাসূল, কোনো মানুষ কি তার পিতামাতাকে গালি দেয়? তিনি বলেন : হ্যাঁ, কোনো ব্যক্তি যখন অন্য ব্যক্তির পিতাকে গালি দেয় তখন সেই ব্যক্তি প্রথম গালিদাতার পিতাকে গালি দেয়। অনুরূপভাবে যখন সে কারো মাতাকে গালি দেয় তখন দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তির মাতাকে গালি দেয়।[২]

হাযেরীন, পিতামাতার মৃত্যুর পরেও তাঁদের অধাকার থেকে যায়। একব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে প্রশ্ন করে, হে আল্লাহর রাসূল, আমার পিতামাতার ইন্তেকালের পরে তাদের খেদমতের আর কিছু বাকি আছে কি যা করে আমি তাঁদের সেবা করতে পারি। তিনি বলেন,

نَعَمْ خِصَالٌ أَرْبَعَةٌ الصَّلاَةُ عَلَيْهِمَا وَالاسْتِغْفَارُ لَهُمَا وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لَا تُوصَلُ إِلَّا بِهِمَا فَهُوَ الَّذِي بَقِيَ عَلَيْكَ مِنْ بِرِّهِمَا بَعْدَ مَوْتِهِمَا.

"হ্যাঁ, চারিটি কর্ম। ১. তাঁদের উভয়ের জন্য দোয়া করা ও ক্ষমা চাওয়া, ২. তাঁদের ওয়াদা ও চুক্তিগুলি কার্যকার করা, ৩. তাঁদের বন্ধুদেরকে সম্মান করা এবং ৪. তাঁদের মাধ্যমে যে রক্ত সম্পর্কীয় আত্নীয়স্বজনদেরকে পেয়েছ তাঁদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা। তাঁদের মৃত্যুর পরে তাঁদের খেদমতের এই কাজগুলিই তোমার দায়িত্বে অবশিষ্ট রয়েছে।"[৩]

মহান আল্লাহ আমাদেরকে পিতামাতার সঠিক খেদমত-এর তাওফীক প্রদান করুন।

---

[১] হাকিম, আল-মুসতাদরাক ৪/৩৯৬; আহমদ, আল-মুসনাদ ১/২১৭, ৩১৭; আলবানী, সহীহুল জামি ২/১২৪। হাদীসটি সহীহ।

[২] মুসলিম, আস-সহীহ ১/৯২।

[৩] আবূ দাউদ, আস-সুনান ৪/৩৩৬; ইবনু মাজাহ, আস-সুনান ২/১২০৮; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ৪/১৭১। হাকিম ও যাহাবী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। আলবানী হাদীসটির সনদে দুর্বলতা আছে বলে উল্লেখ করেছেন। যয়ীফুত তারগীব ২/৭৪।

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

أَمَّا بَعْدُ، فَيَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ، قَالَ اللهُ تَعَالَىَ: وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ

الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُورًا

وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْضَلُ الأَعْمَالِ الصَّلاةُ لِوَقْتِهَا وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ

بَارَكَ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ فِيْ الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ. وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ. أَقُولُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ، فَاسْتَغْفِرُوْهُ وَتُوْبُوْا إِلَيْهِ، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.

জুমাদাস সানিয়া মাসের ৪র্থ খুতবাঃ সন্তানের অধিকার

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লী আলা রাসূলিহীল কারীম। আম্মা বাদ,

সম্মানিত উপস্থিতি, আজ জুমাদাস সানিয়া মাসের ৪র্থ জুমুআ। আজ আমরা সন্তানের অধিকার ও সন্তানের প্রতি পিতামাতার কর্তব্য বিষয়ে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ। কিন্তু তার আগে আমরা এ সপ্তাহের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসগুলির বিষয়ে সংক্ষেপ আলোকপাত করি। হাযেরীন, আজ ইংরেজী ..... মাসের ..... তারিখ। এ সপ্তাহের দিবসগুলির মধ্যে রয়েছে .... ।

হাযেরীন, পৃথিবীর জীবনে মানুষের প্রিয়তম বস্তু ও হৃদয়ের অন্যতম আনন্দ হলো সন্তান-সন্তুতি। শুধু তাই নয় আখেরাতের জীবনেরও সাথী ও আনন্দ। কুরআন কারীমে একাধিক স্থানে ঘোষণা করা হয়েছে যে, জান্নাতে মুমিনগণ তাদের সন্তানদের সাহচার্য উপভোগ করবেন। একস্থানে আল্লাহ বলেনঃ

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ

"এবং যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের সন্তান-সন্ততি যারা ঈমানের বিষয়ে তাদের অনুগামি হয়েছে, তাদের সাথে মিলিত করব তাদের সন্তান-সন্ততিকে এবং তাদের কর্মফল কিছু মাত্র হ্রাস করব না।"[১]

প্রিয় ভাইয়েরা, সন্তানদেকে দুনিয়া ও আখিরাতে সত্যিকারের আনন্দের উৎস বানাতে আমাদের অনেক দায়িত্ব রয়েছে। দায়িত্বের অবহেলার কারণে সন্তান আনন্দের পরিবর্তে চিরস্থায়ী পরিতাপের কারণ হতে পারে। এজন্য কুরআন-হাদীসে সন্তানদের প্রতি পিতামাতার কর্তব্য ও দায়িত্ব বিশেষরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম দায়িত্ব হলো সন্তানের জন্য যোগ্য পিতা ও মাতা বাছাই করা। শুধুমাত্র পাত্র বা পাত্রীর ব্যক্তিগত আনন্দ, তৃপ্তি ও জাগতিক সুবিধাদির দিকে দৃষ্টি না দিয়ে আগত প্রজন্মের কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখে বিবাহের পাত্রপাত্রীর নির্ধারণ করতে হবে। এজন্য হাদীস শরীফে উভয় পক্ষকে সততা, ধার্মিকতা ও নৈতিক দৃঢ়তার দিকে লক্ষ্য রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সন্তানের প্রতি পিতামাতার প্রাথমিক দায়িত্বগুলির অন্যতম হলো, জন্মের সময় তার কানে আযান দেওয়া, তার সুন্দর নাম রাখা, মুখে মিষ্টি বা খাদ্য ছোয়ান, আকীকা করা, খাতনা করা ইত্যাদি। নবজাতকের কানে যেন সর্বপ্রথম আল্লাহর নাম ও তাঁর মহত্ব ও একত্বই সর্বপ্রথম প্রবেশ করে এজন্য জন্মের পরেই তার কানে আযান দেওয়ার কথা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। সাহাবী আবু রাফি' বলেন,

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلَاةِ

"আমি দেখলাম যে, ফাতেমা (রা) যখন হাসানকে জন্ম দিলেন তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ হাসানের কানে নামাযের আযানের মত আযান প্রদান করলেন।"[২] বর্তমানে হাসপাতাল, ক্লিনিক বা মাতৃসদনে অনেকেই এ মূল্যবান সুন্নাত পালনে অবহেলা করছেন। পিতা বা অভিভাবকদের এ বিষয়ে খুবই সচেতন হওয়া দরকার। এছাড়া ক্লিনিক-হাসপাতালের কতৃপক্ষকেও এ বিষয়ে সঠিক ব্যবস্থা রাখতে হবে।

সম্মানিত উপস্থিতি, আমাদের দেশে সন্তানদের 'ভাত মুখে' দেওয়ার রেওয়াজ প্রচলিত আছে। রেওয়াজটি ইসলামী নয়। তবে হাদীস শরীফে কাছাকাছি একটি রীতি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। আরবীতে একে 'তাহনীক' বলা হয়। নবজাতক শিশুকে জন্মের কয়েকদিনের মধ্যে কোনো নেককার বুজুর্গের নিকট নিয়ে তাঁর মুখের মধ্যে খেজুর, মধু বা অনুরূপ কোনো খাদ্যদ্রব্য ছোয়ানকে তাহনীক বলা হয়।

---

[১] সূরা তূর-এর ২১ আয়াতে

[২] তিরমিযী, আস-সুনান ৪/৯৭; আবূ দাউদ, আস-সুনান ৪/৩২৮; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ৩/১৯৭। হাদীসটি সহীহ। একটি অত্যন্ত দুর্বল সনদের হাদীসে ডান কানে আযানের পরে বাম কানে ইকামত দেওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৪/৫৯। হাইসামী বলেছেন যে, হাদীসটির বর্ণনাকারী অত্যন্ত দুর্বল বা জালিয়াত পর্যায়ের।

সাহাবীগণ এভাবে তাঁদের নবজাতক শিশুদের তাহনীক করাতেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এনে।[১]

প্রিয় হাযেরীন, সন্তানের প্রতি পিতামাতার অন্যতম দায়িত্ব হলো তার জন্য একটি সুন্দর ভাল অর্থবোধক নাম রাখা। জন্মের পরেই তাহনীক বা গালে মিষ্টি ছোয়ানোর সময়েই কারো কারো নাম রেখেছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ। অন্যান্য হাদীসে জন্মের সপ্তম দিনে নাম রাখার কথা বলা হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় যে বিষয়টি লক্ষ্যণীয় তা হলো নামের সৌন্দর্য ও অর্থ।

বিভিন্ন হাদীসের আলোকে আমরা দেখতে পাই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ শিশুদের নাম রাখার জন্য সুন্দর বা সঠিক অর্থবহ নাম, আল্লাহর নামের দাসত্ব বোধক নাম, নবীগণের নাম ইত্যাদি পছন্দ করতেন। 'আব্দুল্লাহ' এবং 'আব্দুর রাহমান' নাম দুটি আল্লাহর নিকট প্রিয়তম বলে তিনি বলেছেন। আর যে সব নামের অর্থ ব্যক্তির নেককারত্ব দাবী করে, বা ব্যক্তির তাকওয়া বুঝায়, যে সকল নামের অর্থ খারাপ বা কঠিন এরূপ নাম রাখতে তিনি অপছন্দ করতেন। অনেক সময় তিনি এই ধরনের নাম পরিবর্তন করে দিতেন।[২]

প্রিয় উপস্থিতি, আমাদের বাংলাদেশী সমাজে একটি অত্যন্ত আপত্তিকর অভ্যাস হলো নাম বিকৃত করা। দুইভাবে আমরা তা করি। প্রথমত, নামকে বিকৃত করা। যেমন হাসান-কে হাসান্যা, বা হাসু বলা। দ্বিতীয়ত, আল্লাহর দাসত্ব বোধক নামগুলিকে আল্লাহর নামে ডাকা। আব্দুর রহমান, আব্দুর রায্যাক, ইত্যাদি অগণিত নাম আমরা 'আব্দুল' ফেলে শুধুম রহমান, রায্যাক, ইত্যাদি নামে ডেকে থাকি। এ বিকৃতি বেশি মারাত্মক, কঠিন গোনাহ এবং অনেক ক্ষেত্রে ঈমানের পরিপন্থী। আব্দুল্লাহ বা আল্লাহর দাসকে 'আল্লাহ' ডাকার বা 'রহমানের দাসকে' 'রহমান' বলে ডাকার চেয়ে ঘোরতর অন্যায় আর কি হতে পারে!? আমাদের অবশ্যই এই অভ্যাস পরিত্যাগ করতে হবে।

হাযেরীন, সন্তানের প্রতি পিতামাতার পরবর্তী দায়িত্ব হলো আকীকা। জন্মের ৭ম দিনে নবজাতকের শরীরের ময়লা পরিস্কার করা, চুল কাটা, চুলের ওযনের সমপরিমান রৌপ্য দান করা এবং তার পক্ষ থেকে একটি মেষ বা ছাগল আকীকা হিসাবে জবাই করার নির্দেশ হাদীস শরীফে দেওয়া হয়েছে। আরবের মানুষেরা কন্যাসন্তানের জন্য কোনো আকীকা দিত না। এজন্য কোনো কোনো হাদীসে মেয়ের জন্য অন্তত একটি ও ছেলের জন্য দুইটি ছাগল বা মেষ আকীকা প্রদানের কথা বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে হাসান ও হুসাইনের জন্য একটি করে ছাগী আকীকা দিয়েছেন। তিনি বলেন:

مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ، عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ

"যদি কারো সন্তান জন্মগ্রহণ করে তাহলে সে চাইলে তার সন্তানের পক্ষ থেকে পশু জবাই করবে। পুত্র শিশুর পক্ষ থেকে দুইটি সমান ছাগল-মেষ এবং কন্যা সন্তানের পক্ষ থেকে একটি।[৩]

ইবনু আব্বাস (রা) বলেন,

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَقَّ عَنْ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا (عَنِ الْحَسَنِ كَبْشاً وَعَنِ الْحُسَيْنِ كَبْشاً)

"রাসূলুল্লাহ ﷺ হাসানের পক্ষ থেকে একটি ও হুসাইনের পক্ষ থেকে একটি মেষ আকীকা দেন।"[৪]

আকীকা হিসাবে ভেড়া, দুম্বা বা ছাগল জবাই করার কথাই হাদীসে বলা হয়েছে। আনাস (রা) নিজের সন্তানদের পক্ষ থেকে উট আকীকা প্রদান করতেন বলে বর্ণিত হয়েছে। (তাবারানী) আয়েশা (রা)-এর এক ভাতিজার জন্মের পর একজন তাঁকে উট আকীকা দিতে পরামর্শ দেন। তখন তিনি বলেন

مَعَاذَ اللهِ، وَلَكِنْ مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ

---

[১] বুখারী, আস-সহীহ ৩/১৪২২, ৫/২০৮১, ২১৫৯; মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৬৮৯-১৬৯১।
[২] মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৬৮৬-১৬৮৮; মুনযিরী, আত-তারগীব ৩/১১১-১১৪।
[৩] তিরমিযী, আস-সুনান ৪/৯৬-১০১; আবূ দাউদ, আস-সুনান ৩/১০৫-১০৭। হাদীসটি সহীহ।
[৪] তিরমিযী ৪/৯৭; আবূ দাউদ ৩/১০৭; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৪/৫৭-৫৯। আলবানী, সহীহু আবী দাউদ ৬/৩৪১; হাদীসটি সহীহ।

"নাঊযু বিল্লাহ! তা করব কেন! বরং রাসূলুল্লাহ ﷺ যা বলেছেন তা করব: দুটি সমান মেষ।"[১]

আকীকার পশু জবাইয়ের সময় (اللهم منك ولك، هذه عقيقة فلان، بسم الله، الله أكبر) (হে আল্লাহ, আপনার পক্ষ থেকে এবং আপনারই জন্য। অমুকের আকীকা। বিসমিল্লাহ, আল্লাহু আকবার) বলার কথা কোনো কোনো হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। আকীকার গোশত কুরবানীর গোশতের ন্যায় পরিবারের সদস্যগণ সহ ধনী দরিদ্য সকলেই খেতে পারেন। হাদীস শরীফে ৭ম দিনে আকীকা প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী যুগে অনেক ফকীহ ৭ দিনের পরেও আকীকা দেওয়া যাবে বলে মত প্রকাশ করেছেন। বিষয়টি নফল এবং এতে প্রশস্ততা রয়েছে। তবে সুন্নাতের হুবহু অনুকরণ অনুসরণ উত্তম।

প্রিয় হাযেরীন, সন্তনের প্রতি মুসলিম পিতামাতার অন্যতম দায়িত্ব তাকে যথাসময়ে খাত্না করানো। হাদীস শরীফে জন্মের সপ্তম দিনেই খাতনা করানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও জন্মের ৭ম দিনের মধ্যে খাতনা করানো উত্তম। তবে পরে খাতনা করানো নিষিদ্ধ নয়। খাতনা উপলক্ষে অনুষ্ঠানাদি করার কোনো নির্দেশ বা অনুমতি হাদীস শরীফে দেখা যায় না। জাবির (রা) বলেন,

إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَخَتَنَهُمَا لِسَبْعَةِ أَيَّامٍ

"রাসূলুল্লাহ ﷺ হাসান ও হুসাইনের জন্য তাঁদের আকীকা করেন এবং তাদের খাতনা করান তাদের জন্মের ৭ম দিনে।"[২] ইবনু আব্বাস (রা) বলেন,

سَبْعَةٌ مِنَ السُّنَّةِ فِيْ الصَّبِيِّ يَوْمَ السَّابِعِ يُسَمَّى وَيُخْتَنُ

"শিশুর জন্মের ৭ম দিনে ৭টি বিষয় সুন্নাত, তার অন্যতম হলো তার নাম রাখা ও খাতনা করানো।"[৩]

হাযেরীন, মাতার উপর দায়িত্ব হলো দু বছর সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়ানো। পিতার দায়িত্ব মাতার জন্য এরূপ দুগ্ধদানের যথাযোগ্য ব্যবস্থা করা। মাস বয়স থেকেই শিশুকে অন্যান্য খাদ্য গ্রহণে অভ্যস্থ করতে হবে। যেন দুবছরের মধ্যে তাকে বুকের দুধ খাওয়ানো বন্ধ করা যায়। আল্লাহ বলেন:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু বছর বুকের দুধ খাওয়াবে, যে দুধ পান করানোর সময়টি পূর্ণ করতে চায়। আর পিতার উপর দায়িত্ব হলো যথাবিধি তাদের ভরণপোষণ করা।"[৪]

হাযেরীন, সন্তানকে দৈহিক, আত্মিক, মানসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী, স্বাবলম্বী ও সম্মানিতরূপে গড়ে তোলা পিতামাতার মূল দায়িত্ব। প্রথম যে বিষয়টি সন্তানদের মধ্যে গড়ে তুলতে হবে তা হলো সততা ও ধার্মিকতা। তারা ইসলামের সঠিক বিশ্বাস, কর্ম ও আচরণ শিখবে এবং পালন করবে। স্বার্থপরতা, ধোঁকাবাজি, মুনাফিকী, বক-ধার্মিকতা, সৃষ্টির অকল্যাণ ইত্যাদি যে সকল বিষয় আল্লাহ নিষেধ করেছেন তা তারা ঘৃণা করবে এবং বর্জন করবে। নামায, রোযা, যাকাত, যিকির, সৃষ্টির সেবা, সৎকাজে আদেশ, অসৎকাজে নিষেধ ইত্যাদি সকল দায়িত্ব তারা আগ্রহভরে পালন করবে। সন্তানদেরকে এই পর্যায়ে তৈরি করা পিতা ও মাতার উপর অন্যতম ফরয আইন। এই ফরয দায়িত্বে অবহেলা করে যদি কেউ ফরযে কেফায়া বা নফল দায়িত্ব পালনে ব্যস্ত হন তাহলে তা বক-ধার্মিকতায় পর্যবসিত হবে। আল্লাহ বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

---

[১] বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরবা ৯/৩০১।
[২] হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৪/৫৯। বাইহাকী, শুআবুল ঈমান ৬/৩৯৪; আস-সুনানুল কুবরা ৮/৩২৪। সনদ মোটামুটি গ্রহণযোগ্য।
[৩] হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৪/৫৯। সনদ সহীহ।
[৪] সূরা বাকারা: ২৩৩ আয়াত।

"হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা নিজদেরকে এবং পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর।"[১]

হাযেরীন, আমরা অনেক সময় ব্যক্তিগত রাগ বা জাগতিক ক্ষতির কারণে সন্তানদের শাসন করি। অথচ ধর্মীয় ও নৈতিক আচরণের ক্রটিগুলি তত গুরুত্ব দিয়ে দেখি না। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ আমাদেরকে এর উল্টো আচরণ শিক্ষা দিয়েছেন। জাগতিক বিষয়াদির ক্ষতি, কষ্ট বা ব্যক্তিগত রাগ তাঁরা সহ্য করেছেন। কিন্তু দ্বীনী বিষয়ে অবহেলা তাঁরা শাসন করেছেন। কারণ জাগতিক ক্ষতি কাটিয়ে উঠা খুবই সহজ। পক্ষান্তরে নৈতিক ও ধর্মীয় অধঃপতন যুবক-কিশোরদের দুনিয়া ও আখেরাতে চিরতরে ধ্বংস করে দিতে পারে। আনাস ইবনু মালিক (রা) বলেন,

وَاللَّهِ لَقَدْ خَدَمْتُهُ تِسْعَ سِنِينَ مَا عَلِمْتُهُ قَالَ لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ لِمَ فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا أَوْ لِشَيْءٍ تَرَكْتُهُ هَلاَّ فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا

"আল্লাহর শপথ, আমি নয়টি বছর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমত করেছি। এই দীর্ঘ সময়ে আমি কোনো দিক দেখিনি যে, আমি কোনো কাজ করে ফেললে তিনি আমাকে জবাবদিহী করে বলেছেন, কেন অমুক অমুক কাজ করলে? অথবা আমি তাঁর নির্দেশিত কোনো কাজ না করলে তিনি আমাকে জবাবদিহী করে বলেছেন, কেন অমুক অমুক কাজ করলে না?"[২]

কিন্তু ধর্মীয় ও নৈতিক বিষয়ে শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে তিনি কঠোর হতে বলেছেন। তিনি বলেছেন,

مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

"তোমাদের সন্তানদের বয়স ৭ হলে তাদেরকে নামায আদায়ের জন্য নির্দেশ দিবে। এবং দশ বছর বয়সে তাদেরকে নামাযের জন্য মারধর করবে এবং তাদের বিছানা পৃথক করে দেবে।"[৩]

প্রিয় ভাইয়েরা, সন্তানকে সৎ ও ধার্মিকরূপে গড়ে তুলতে পারা একদিকে নিজের উপর অর্পিত ফরয দায়িত্ব পালন, অপরদিকে তা দুনিয়া ও আখেরাতের পরম সাফল্য। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلا مِنْ ثَلاثَةٍ إِلا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

"যখন মানুষ মৃত্যুবরণ করে তখন তার সকল কর্ম বন্ধ হয়ে যায়। শুধুমাত্র তিনটি ছাড়া: প্রবাহমান দান, কল্যাণকার জ্ঞান এবং নেককার সন্তান যে তার জন্য দোয়া করে।[৪]

إِنَّ الرَّجُلَ لَتُرْفَعُ دَرَجَتُهُ فِي الْجَنَّةِ فَيَقُولُ أَنَّى هَذَا فَيُقَالُ بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ

"জান্নাতে কোনো কোনো ব্যক্তির মর্যাদা বৃদ্ধি করা হবে। তখন সে বলবে : কিভাবে আমার মর্যাদা বৃদ্ধি পেল? তখন তাকে বলা হবে, তোমার জন্য তোমার সন্তানের ক্ষমা প্রার্থনার ফলে।"[৫]

হাযেরীন, বিভিন্ন হাদীসে আমরা দেখি যে, সন্তানদের আচরণ লক্ষ্য করা এবং তাদেরকে স্নেহের সাথে সঠিক আচরণ শিক্ষা দেওয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রীতি। এক হাদীসে উমার ইবনু আবু সালামাহ (রা) বলেন, "আমি কিশোর বয়সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গৃহে লালিত পালিত হয়েছি, খাওয়ার সময় আমি হাত

---

[১] সূরা তাহরীম: ৬ আয়াত।
[২] মুসলিম, আস-সহীহ ৪/১৮০৫।
[৩] আবূ দাউদ, আস-সুনান ১/১৩৩; আলবানী, সহীহ ওয়া যয়ীফ আবী দাউদ ১/৪৯৫। হাদীসটি সহীহ।
[৪] মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১২৫৫।
[৫] ইবনু মাজাহ ২/১২০৭; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/২১০; বূসীরী, মিসবাহুয যুজাজা ৪/৯৮; আলবানী, সাহীহাহ ৪/১৭২। হাদীসটি সহীহ।

বাড়িয়ে খাঞ্চার বিভিন্ন স্থান থেকে খাদ্য গ্রহণ করতাম। তিনি আমাকে বলেন, 'হে কিশোর, তুমি আল্লাহর নাম নাও, ডান হাত দিয়ে খাও এবং খাঞ্চার মধ্যে তোমার নিকটবর্তী স্থান থেকে খাদ্য গ্রহণ কর।' উমার বলেন, তখন থেকে আমি সর্বদা এভাবেই খাদ্য গ্রহণ করে থাকি।"[১]

মুহতারাম হাযেরীন, সন্তান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে অন্যতম বিষয় হলো, তাদেরকে "শক্তিশালী" রূপে গড়তে হবে। ঈমানের শক্তি, মনের শক্তি, দেহের শক্তি সকল দিক থেকেই তারা শক্তিশালী হয়ে গড়ে উঠবে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ

"শক্তিশালী মুমিন আল্লাহর নিকট দুর্বল মুমিনের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর ও প্রিয়তর।"[২]

সন্তানদের দৈহিক ও মানসিক বিকাশ ও শক্তি অর্জনের জন্য তাদের শরীরচর্চামূলক খেলাধুলা করাতে ইসলামে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। বিশেষত তীর নিক্ষেপ, ঘোড়ার পিঠে আরোহণ, সাঁতার ইত্যাদি খেলাধুলা বিশেষভাবে উৎসাহ দিয়েছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণ। আয়েশা (রা) বলেন, হাবশীগণ লাঠি-বল্লম ইত্যাদি নিয়ে খেলা করছিল। উমার (রা) তাদেরকে আপত্তি করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, উমার, তুমি ওদের খেলতে দাও। এরপর তিনি ক্রীড়ারতদেরকে বলেন:

الْعَبُوْا (خُذُوا) يا بني أرفدة لتَعْلَمَ يَهُودُ أَنَّ فِي دِينِنَا فُسْحَةً إِنِّي أُرْسِلْتُ بِحَنِيفِيَّةٍ سَمْحَةٍ

হে হাবশীগণ, তোমরা খেল, যেন ইহূদী নাসারারা জানতে পারে যে, আমাদের দ্বীনের মধ্যে প্রশস্ততা আছে। আমি প্রশস্ত দ্বীনে হানীফ সহ প্রেরিত হয়েছি।"[৩]

অন্য হাদীসে সাহাবী উকবা ইবনু আমির বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

وَارْمُوا وَارْكَبُوا وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا

"তোমরা নিক্ষেপ কর এবং আরোহণ কর। আরোহন করার চেয়ে নিক্ষেপ করা আমার নিকট বেশি প্রিয়।"[৪]

এ সকল হাদীস থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, নিক্ষেপ, আরোহণ, সাঁতার এবং এই জাতীয় সকল প্রকার ব্যায়াম, খেলাধুলা, প্রতিযোগিতা বা শরীরচর্চা ইসলামে নির্দেশিত। কিশোর-যুবকদের জন্য এই জাতীয় খেলাধুলার ব্যবস্থা করা আমাদের পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব।

সম্মানিত উপস্থিতি, সন্তানদের অর্থনৈতিক শক্তি ও সচ্ছলতার বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ

"তুমি তোমার উত্তরাধিকারীদেরকে সচ্ছল রেখে যাবে সেটাই উত্তম, তাদেরকে মানুষের দয়ার মুখাপেক্ষী রেখে যাওয়ার চেয়ে।"[৫]

সম্মানিত উপস্থিতি, সবচেয়ে বড় বিষয় হলো আত্মিক ও মানসিক দিক থেকে সন্তানদের শক্তিশালীরূপে গড়ে তোলা। দৈহিক শক্তি প্রয়োজনীয়। তবে মানসিক শক্তি ও স্থিতি আরো বেশি প্রয়োজনীয়। মনই মানুষের নিয়ন্ত্রক। আজকাল পাশ্চাত্যের বিপথগামী সমাজগুলির মত আমাদের

---

[১] বুখারী, আস-সহীহ ৫/২০৫৬; মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৫৯৯।

[২] মুসলিম, আস-সহীহ ৪/২০৫২।

[৩] আহমদ, আল-মুসনাদ ৬/১১৬, ২৩৩; হুমাইদী, আল-মুসনাদ ১/১২৩; ইবনু হাজার আসকালানী, তাগলীকুত তা'লীক ২/৪৩; আলবানী, সাহীহাহ ৪/৩২৮, ৬/৪২৩। হাদীসটি সহীহ। মূল হাদীস দেখুন: বুখারী, আস-সহীহ ১/৩২৩, ৩৩৫; মুসলিম, আস-সহীহ ২/৬০৯।

[৪] তিরমিযী, আস-সুনান ২/১৭৪; আবূ দাউদ, আস-সুনান ৩/১৩; নাসাঈ, আস-সুনান ৬/২২২; ইবনু মাজাহ আস-সুনান ২/৯৪০। হাদীসটি সহীহ।

[৫] বুখারী, আস-সহীহ ১/৪৩৫; মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১২৫১।

মুসলিম সমাজের পিতামাতা সন্তানদের মানসিক বিকাশের দিকে লক্ষ্য দেন না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পিতামাতা নিজেদের কর্ম, বন্ধুত্ব ও সামাজিকতা নিয়ে এত ব্যস্ত থাকেন যে, সন্তানদেরকে সময় দিতে পারেন না। অথচ পিতামাতার সময় ও বন্ধুত্বের সবচেয়ে বেশি হকদার সন্তানগণ। প্রতিদিন তাদেরকে কিছু সময় দেওয়া, তাদের মনের কথা ও সমস্যাগুলি জানা, তাদের সাথে নিয়মিত কিছু সময় ইসলাম সম্মত চিত্ত- বিনোদন ও খেলাধুলায় সময় কাটানো পিতামাতার দায়িত্ব। কুরআন ও হাদীসে বারংবার দয়া, মমতা, ক্ষমা ইত্যাদির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্য সকলের চেয়ে এগুলির সবচেয়ে বেশি পাওনাদার সন্তানগণ। এছাড়া সন্তান ও পরিবারের সদস্যদের জন্য স্নেহ, মমতা, দয়া ও সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণের নির্দেশ বিশেষভাবে দেওয়া হয়েছে। স্বামীস্ত্রীর পারস্পরিক মমতা, বিনম্রতা, ক্ষমা ইত্যাদি সন্তানদেরকে প্রভাবিত করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ আয়েশা (রা)-কে বলেন,

يَا عَائِشَةُ ارْفُقِي فَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ بِأَهْلِ بَيْتٍ خَيْرًا دَلَّهُمْ عَلَى بَابِ الرِّفْقِ

"হে আয়েশা, তুমি বিনম্র ও বন্ধুভাবাপন্ন (kind, friendly, courteous, nice) হও। কারণ আল্লাহ যদি কোনো পরিবারের কল্যাণ চান তাহলে তাদেরকে বিনম্রতা ও বন্ধুভাবাপন্নতা দান করেন।"[১]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে শিশু কিশোরদের অত্যন্ত ভালবাসতেন এবং স্নেহ করতেন। তার কাছে খেজুর ইত্যাদি হাদীয়া আসলে তিনি দোয়া করতেন এবং তার নিকট অবস্থানকারীদের মধ্যে সবচেয়ে যে ছোট তাকে প্রথমে তা প্রদান করতেন। (আল-আদাবুল মুফরাদ, বুখারী)। তাঁর কাছে শিশু কিশোরকে আনা হলে তাকে কোলে নিতেন, আদর করতেন এবং মাথায় হাত বুলাতেন। (আল-আদাবুল মুফরাদ, বুখারী) তিনি তাঁর নাতিদেরকে নিয়ে খেলতেন, ঘোড়া হতেন এবং তাদেরকে অনেক সময় দিতেন। (হাকিম। সহীহ।) হযরত আনাস ইবনু মালিক (রা) বলেন,

مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَرْحَمَ بِالْعِيَالِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"সন্তানসন্ততি ও পরিবারের সদস্যদের প্রতি স্নেহ, দয়া ও মমতা করার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেয়ে বেশি কাউকে আমি দেখিনি।"[২]

হাযেরীন, মমতা, হাদিয়া, উপঢৌকন ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে সকল সন্তানের মধ্যে সমতা বজায় রাখতে হবে। কোনো সন্তানকে অন্যদের থেকে পৃথকভাবে অতিরিক্ত স্নেহ করা, অথবা পুত্রদের বেশি স্নেহ ও কন্যাদের কম স্নেহ কঠিনভাবে নিষেধ করা হয়েছে। নোমান ইবনু বাশীর (রা) বলেন, "তাঁর পিতা তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) -এর নিকট এসে বলেন, আমি আমার এই ছেলেকে একটি খাদেম দান করেছি। তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, তোমার সকল সন্তানকেই কি তুমি এরূপ দান করেছ? তিনি বলেন, না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, এটি ফিরিয়ে নাও।"[৩]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ

"তোমাদের সন্তানদের মধ্যে সমতা বজায় রাখবে।"[৪]

মহান আল্লাহ আমাদেরকে সঠিকরূপে সন্তান প্রতিপালনের তাওফীক প্রদান করুন। আমীন!!

---

[১] আহমদ, ৬/১০৪, ১১২; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৮/১৯; আলবানী, সহীহুত তারগীব ৩/১১।

[২] মুসলিম, আস-সহীহ ৪/১৮০৮।

[৩] বুখারী, আস-সহীহ ২/৯১৩; মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১২৪১-১২৪২।

[৪] বুখারী, আস-সহীহ ২/৯১৩; আবূ দাউদ, আস-সুনান ৩/২৯৩।

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

أَمَّا بَعْدُ، فَيَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا

أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ

قَالَ اللهُ تَعَالىَ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرُوا أَوْلادَكُمْ بِالصَّلاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

بَارَكَ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ فِيْ الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ. وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ. أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ، فَاسْتَغْفِرُوْهُ وَتُوْبُوْا إِلَيْهِ، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.

রজব মাসের ১ম খুতবা: ইসলামে নারীর অধিকার

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লী আলা রাসূলিহীল কারীম। আম্মা বাদ,

সম্মানিত উপস্থিতি, আজ রজব মাসের প্রথম জুমুআ। আজ আমরা ইসলামে নারীর অধিকার বিষয়ে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ। কিন্তু তার আগে আমরা এ সপ্তাহের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসগুলির বিষয়ে সংক্ষেপ আলোকপাত করি। হাযেরীন, আজ ইংরেজী ..... মাসের ..... তারিখ। এ সপ্তাহের দিবসগুলির মধ্যে রয়েছে .... ।

মুহতারাম হাযেরীন, বিশ্বের ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আগমনের পূর্বে নারীর অধিকারের বিষয়ে কোনো সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। সভ্যতার দাবিদার ইহূদী-খৃস্টান ধর্মের ধর্মগ্রন্থ বাইবেলে আমরা দেখি যে, পিতা, সন্তান বা স্বামীর সম্পত্তিতে নারীর কোনো অধিকার দেওয়া হয় নি, কেবলমাত্র পিতার যদি কোনো পুত্র সন্তান না থাকে তবে তার সম্পত্তি কন্যারা লাভ করবে। কিন্তু সেক্ষেত্রে এ সকল কন্যা পিতার বংশের বাইরে কাউকে বিবাহ করতে পারবে না, কারণ এতে এক বংশের সম্পত্তি অন্য বংশে চলে যাবে!!

শুধু তাই নয়, নারীর নিজের পক্ষ থেকে সম্পদ অর্জনেরও কোনো অধিকার ছিল না। ১০০ বৎসর আগেও ইহূদী ও খৃস্টান জগতের আইন ছিল যে বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীর সম্পত্তি স্বামীর মালিকানায় চলে যাবে এবং স্বামী নিজের ইচ্ছামত তা ব্যবহার বা বিক্রয় করতে পারবে। ঊনবিংশ শতক থেকে বিবাহিত নারীদের স্বতন্ত্রভাবে সম্পদ অর্জনের অধিকার দিয়ে আইন তৈরি করা হয় ১৮৪৮ খৃস্টাব্দে নিউ ইয়র্ক স্টেটে the Married Women's Property Act পাস করা হয়, যাতে সর্বপ্রথম স্বীকার করা হয় যে, নারীদেরও স্বতন্ত্র আইনগত সত্তা বা পরিচয় আছে (This was the first law that clearly established the idea that a married woman had an independent legal identity.)। অনুরূপভাবে কর্মের ক্ষেত্রে, চাকুরীর ক্ষেত্রে, সম্পত্তি অর্জনের ক্ষেত্রে, উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে, বিবাহ করা বা না করার ক্ষেত্রে, রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও নেতৃত্ব গ্রহণের ক্ষেত্রে ও অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে নারীদের বলতে গেলে কোনো অধিকারই ছিল না। কোনো কোনো ধর্মে তো স্বামীর মৃত্যুর পরে স্ত্রীর বেঁচে থাকার অধিকারও ছিল না। বরং স্বামীর সাথে চিতায় জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ হয়ে আত্মাহুতি দেওয়াই ছিল তাদের নিয়তি।

বস্তুত গত ঊনবিংশ শতক থেকে নারীদের অধিকারের বিষয়ে জোরালো দাবিদাওয়া ও আন্দোলন শুরু হয় এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এ বিষয়ে বিভিন্ন রকমের আইনকানুন তৈরি হয়। যেহেতু কিছুই ছিল না, সেহেতু অনেক কিছু দাবি করা হয় এবং মানবীয় জ্ঞানবুদ্ধি ও বিবেচনার মাধ্যমে নারীদেরকে পুরুষের সমান অধিকার দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু মানবীয় জ্ঞানবুদ্ধি ও স্বার্থচিন্তার সীমাবদ্ধতার কারণে অনেক সমস্যা তৈরি করা হয় যা আমরা পরবর্তীতে আলোচনার চেষ্টা করব, ইনশা আল্লাহ।

সম্মানিত উপস্থিতি, নারী ও পুরুষ উভয়েই মহান আল্লাহর সৃষ্টি। নারী ও পুরুষের মধ্যে কিছু "বৈষম্য" বা "পার্থক্য" দিয়েই তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আর এ "বৈষম্য" বা "পার্থক্য"-ই মানব সভ্যতার টিকে থাকার মূল ভিত্তি। নারী ও পুরুষের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মানুষ পৃথিবীতে আগমন করে। নবাগত শিশুদেরকে পরিপূর্ণ স্নেহ ও মমতা দিয়ে লালন করা এবং তার মধ্যে মানবীয় মূল্যবোধগুলি বিকশিত করা ভবিষ্যৎ মানব সভ্যতার প্রতি বর্তমান নারী ও পুরুষের প্রধান দায়িত্ব। আর এ দায়িত্বের পরিপূর্ণ পালনের জন্য নারী ও পুরুষের মধ্যে প্রকৃতিগতভাবে কিছু বৈষম্য বা পার্থক্য তৈরি করা হয়েছে, যেগুলির বিলোপ সাধন করলে মানব সভ্যতা ধ্বংস হতে বাধ্য। ইসলামের মূলনীতি হলো,

প্রাকৃতিক এ বৈষম্যকে পুঁজি করে যেন নারীদেরকে তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার থেকে বঞ্চিত করা না হয় এবং বৈষম্য দূরীকরণ বা সমতা প্রতিষ্ঠার নামে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিনষ্ট করা না হয়। এজন্য ইসলামে নারী ও পুরুষের অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মূল দায়িত্ব ও প্রাকৃতিক এ বৈষম্যের দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। ফলে নারী হিসেবে তাকে অধিকার বঞ্চিত করা হয় নি, বৈষম্য করা হয় নি বা অবহেলা করা হয় নি। পক্ষান্তরে সমান অধিকারের নামে তাকে পুরুষের মত সমান দায়িত্ব দিয়ে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট করা হয় নি। আল্লাহ বলেন:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

"আল্লাহ যা দিয়ে তোমাদের কাউকে কারো উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন তোমরা তার লালসা করো না। পুরুষ যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ এবং নারী যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ। আর তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ প্রার্থনা কর। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।"[১]

কেন পুরুষ হলাম না, নারী জন্মই পাপ! কেন নারী হলাম না! নারীদের কত সুবিধা!! ইত্যাদি অমানবিক ও অযৌক্তিক কথা ব্যক্তি ও সমাজের জীবনে হতাশা, বিভেদ ও কষ্ট বৃদ্ধি করা ছাড়া কোনোই কাজে লাগে না। নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকল মানুষের দায়িত্ব নিজের প্রাকৃতিক সীমাবদ্ধতা ও সুযোগের মধ্যে থেকে দয়িত্ব পালন করা ও অধিকার বুঝে নেওয়া এবং আরো উন্নতি, শান্তি, বরকত ও তাওফীকের জন্য আল্লাহর অনুগ্রহ প্রার্থনা করা।

নারী এবং পুরুষ কেউই পৃথিবীতে শুধু নিজের জন্য বাঁচতে আসেনি, বরং পারিবারিক কাঠামোর মধ্যে থেকে পৃথিবীকে ভবিষ্যতের জন্য সমৃদ্ধ করা তাদের অন্যতম দায়িত্ব। এজন্য সাধারণভাবে নারী অর্থ কন্যা, স্ত্রী অথবা মাতা এবং পুরুষ অর্থ পুত্র, স্বামী অথবা পিতা। কন্যা, স্ত্রী এবং মাতা হিসেবে নারীর অধিকার সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব পৃথক খৃতবায়, ইনশা আল্লাহ। এ খুতবায় আমরা সাধারণভাবে নারীর অধিকারের বিষয়ে আলোচনা করব।

হাযেরীন, প্রথম অধিকার ধর্মীয় অধিকার। ধর্মপালন মানুষের জন্মগত অধিকার। সকল মানুষেরই অধিকার আছে ধর্ম পালন, আল্লাহর স্মরণ, প্রার্থনা ইত্যাদির মাধ্যমে তার অশান্ত হৃদয় শান্ত করার ও আত্মিক প্রশান্তি, পরিতৃপ্তি ও আখিরাতের পুরস্কার অর্জন করার। অনেক ধর্মে জাতি, বংশ, বর্ণ বা লিঙ্গের কারণে অনেক মানুষকে এ জন্মগত ধর্মীয় অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ ইহূদী ও খৃস্টান ধর্ম। প্রচলিত 'বিকৃত' বাইবেলের বক্তব্য অনুসারে হাওয়া প্রথম নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করেন এবং আদমকে তা ভক্ষণ করতে প্ররোচিত করেন, এ কারণে ইহূদী ও খস্টান ধর্মে মানব জাতির পতনের জন্য নারীকে দায়ি করা হয়। বাইবেলের এ গল্পকে নারী ও পুরুষের মধ্যে ধর্মীয় ও অন্যান্য বৈষম্য প্রতিষ্ঠার মূল যুক্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। বাইবেলের নতুন নিয়মে খৃস্টধর্মের বিধান নিম্নরূপ: আমি উপদেশ দিবার কিম্বা পুরুষের উপরে কর্তৃত্ব করিবার অনুমতি নারীকে দিই না, কিন্তু মৌনভাবে থাকিতে বলি। কারণ প্রথমে আদমকে, পরে হবাকে (হাওয়াকে) নির্মাণ করা হইয়াছিল। আর আদম প্রবঞ্চিত হইলেন না, কিন্তু নারী প্রবঞ্চিতা হইয়া অপরাধে পতিত হইলেন।[২]

এভাবে অপ্রাসঙ্গিক একটি কাহিনীর উপর ভিত্তি করে নারীকে তার ধর্মীয় ও সামাজিক অধিকার

---

[১] সূরা নিসা: ৩২ আয়াত।
[২] বাইবেল, নতুন নিয়ম, তীমথিয় ২/১২-১৪।

থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে এবং তাকে জন্মগতভাবেই পাপী ও অপরাধী বলে চিত্রিত করা হয়েছে। কুরআন কারীমে কখনোই প্রচলিত বাইবেলের এ গল্প সমর্থন করা হয় নি বা এ জন্য হাওয়াকে দায়ি করা হয় নি। বরং সর্বদা আদম ও হাওয়াকে সমভাবে দায়ি করা হয়েছে। সর্বোপরি, এরূপ বিষয়কে নারী ও পুরুষের মধ্যে বৈষম্যের বাহন বানানো হয় নি। বরং সকল ধর্মীয় বিষয়ে নারী ও পুরুষকে সমান অধিকার প্রদান করা হয়েছে। তবে সমান দায়িত্ব দেওয়া হয় নি। নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ও সকল ক্ষেত্রেই নারীরা সমান অধিকার ভোগ করেন। তবে নারী প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে 'দায়িত্ব' কিছুটা হাল্কা করা হয়েছে। যেমন পুরষের জন্য জামাতে নামায আদায় করা জরুরী দায়িত্ব। কিন্তু নারীর জন্য তা জরুরী দায়িত্ব নয়, সুযোগ মাত্র। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمْ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلا يَمْنَعْهَا (فائذنوا لهن)، لا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ حُظُوظَهُنَّ مِنْ الْمَسَاجِدِ إِذَا اسْتَأْذَنُوكُمْ، لا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ أَنْ يُصَلِّينَ فِي الْمَسْجِدِ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ

তোমাদের নারীগণ মসজিদে যাওয়ার অনুমতি চাইলে তাদেরকে নিষেধ করবে না, তাদেরকে অনুমতি দিবে। (অন্য বর্ণনায়: তাদেরকে মসজিদে গমনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করবে না, আল্লাহর বান্দীদের মসজিতে নামায পড়তে নিষেধ করবে না) তবে তাদের বাড়িতে নামায পড়াই তাদের জন্য উত্তম।[১]

নারীর মাতৃত্ব, দুগ্ধদান, পর্দা পালন ও অন্যান্য দায়িত্বের সাথে সঙ্গতি রেখেই তাদের জন্য এ বিধান দেওয়া হয়েছে। সকল প্রকার ইবাদতের ক্ষেত্রেই এভাবে নারীদেরকে সমান অধিকার ও সুযোগ দেওয়া হয়েছে, তবে দায়িত্বের ক্ষেত্রে অনেক রেয়াত দেওয়া হয়েছে।

হাযেরীন, দ্বিতীয় অধিকার হলো, পারিবারিক ও সামাজিক অধিকার। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পূর্বে এবং তাঁর অনেক পরেও অনেক দেশে নারীর বেঁচে থাকার অধিকারই ছিল না। ইসলাম পূর্বে ও বর্তমানেও ভারতে, চীনে ও অন্যান্য দেশে জন্মের আগে বা পরে কন্যা শিশুকে হত্যা করা হয়। স্বামীর মৃত্যুর সাথে সাথে স্ত্রী বেঁচে থাকার অধিকার হারাত এবং স্বামীর চিতায় প্রাণ দিত। শিক্ষা, কর্ম, চাকরী, বিবাহ ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারীকে অধিকার বঞ্চিত করা হয়েছে বা তার মতামতের কোনো মূল্য দেওয়া হয় নি। বাইবেলে নারীর শিক্ষার অধিকার সীমিত করা হয়েছে। তাদেরকে কেবলমাত্র স্বামীর নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। বলা হয়েছে: "স্ত্রীলোকেরা মণ্ডলীতে নীরব থাকুক, কেননা কথা কহিবার অনুমতি তাহাদিগকে দেওয়া যায় না, বরং যেমন ব্যবস্থাও (তাওরাত বা শরীয়ত) বলে, তাহারা বশীভূতা হইয়া থাকুক। আর যদি তাহারা কিছু শিখিতে চায়, তবে নিজ নিজ স্বামীকে ঘরে জিজ্ঞাসা করুক।"[২]

পক্ষান্তরে পানাহার, শিক্ষা, দীক্ষা, উপহার, আচরণ সকল ক্ষেত্রে পুত্র ও কন্যাদের সাথে সমান আচরণ ও সমান অধিকার নিশ্চিত করতে ইসলামে সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিবাহ ও পরিবার গঠনে পুরুষ ও নারী উভয়ের পছন্দ ও মতামতকে সমান অধিকার প্রদান করা হয়েছে। পারিবারিক জীবনে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে প্রাকৃতিক পার্থক্য ও দায়িত্বের ভারসম্য রক্ষা করে সমান অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। এ সকল বিষয় আমরা অন্যান্য খুতবায় আলোচনা করেছি ও করব, ইনশা আল্লাহ।

হাযেরীন, তৃতীয় অধিকার হলো অর্থনৈতিক অধিকার। আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আগমনের পূর্বে এবং তাঁর পরেও প্রায় ১২/১৩ শত বৎসর পর্যন্ত নারীরা প্রায় সকল প্রকার অর্থনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। পিতা, স্বামী, ভ্রাতা বা পুত্রের সম্পত্তিতে নারীর উত্তরাধিকার লাভের

[১] বুখারী, আস-সহীহ ১/৩০৫; মুসলিম, আস-সহীহ ১/৩২৬-৩২৯; আবূ দাউদ, আস-সুনান ১/১৫৫।
[২] বাইবেল, নতুন নিয়ম, ১ করিন্থীয় ১৪/৩৪-৩৫।

তেমন কোনো ব্যবস্থা ছিল না। নিজের পক্ষ থেকে কোনো সম্পদ উপার্জন করতে পারলেও বিবাহের সাথেসাথে স্ত্রীর সম্পত্তি স্বামীর মালিকানাধীন হয়ে যেত। উনবিংশ শতাব্দির মধ্যভাগ থেকে, অর্থাৎ প্রায় দেড় শত বৎসর যাবৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ক্রমান্বয়ে আইনের মাধ্যমে নারীর পৃথক সম্পতির মালিকানা লাভ, স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্বাধীনভাবে ব্যবসা, বাণিজ্য, চুক্তি ইত্যাদি সম্পাদনের অধিকার দেওয়া হচ্ছে।

পক্ষান্তরে ইসলামে প্রথম থেকেই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর সমঅধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। বিবাহিত ও অবিবাহিত সকল অবস্থায় একজন প্রাপ্তবয়স্ক নারী একজন প্রাপ্ত বয়স্ক পুরষের মত একইভাবে ব্যবসা, বাণিজ, চুক্তি, সম্পদ অর্জন, সম্পদ ক্রয়বিক্রয় ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে সমান অধিকার সংরক্ষণ করেন। এক্ষেত্রে পিতা, স্বামী বা অন্য কারো কোনোরূপ মাতবরী, তত্ত্বাবধান বা খবরদারির আইনগত অধিকার বা সুযোগ দেওয়া হয় নি।

অর্থনৈতিক অধিকারের একটি দিক উত্তরাধিকার, যা মূলত পরিবারের সাথে জাড়িত। মানুষ পারিবারিকভাবে যে অর্থনৈতিক অধিকার লাভ করে তার অন্যতম উত্তরাধিকার ব্যবস্থা। ইসলামের পূর্বে এবং ইসলামের পরেও উনবিংশ শতক পর্যন্ত হিন্দু ধর্ম, ইহূদী-খৃস্টান ধর্ম ও অন্যান্য ধর্ম ও সভ্যতায় পিতা বা স্বামীর সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার লাভ করেন নি। পক্ষান্তরে ইসলামে নারীর জন্য পুরুষের পাশাপাশি উত্তরাধিকার লাভের বিষয় সুনিশ্চিত করা হয়েছে। খৃস্টান বিশ্বে যেহেতু কোনো অধিকারই ছিল না, সেহেতু অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তারা স্বামী ও পিতার সম্পত্তিতে নারীর 'সমান উত্তরাধিকার' প্রতিষ্ঠার দাবি করছেন এবং অনেক দেশে এরূপ অধিকার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। পক্ষান্তরে ইসলামে উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে সাধারণত নারীকে পুরুষের অর্ধেক উত্তরাধিকার প্রদান করা হয়েছে। ইসলামী সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞতা বা ইসলাম বিদ্বেষের কারণে অনেকে এরূপ বিধানকে নারীর প্রতি বৈষম্য বলে দাবি বা প্রচার করেন। বস্তুত সমান অধিকারের নামে নারীকে পুরুষের সমান অধিকার ও দায়িত্ব প্রদান করেই নারীর প্রতি বৈষম্য করা হয়েছে। আর ইসলামে নারীকে উত্তরাধিকারে অর্ধের্ক ও অর্থনৈতিক দায়িত্বে একেবারে দায়িত্বমুক্ত করে বিশেষ সুবিধা প্রদান করেছে।

সম্মানিত উপস্থিতি, আমরা আগেই বলেছি, শুধু নিজের জন্য বেঁচে থাকতে নারী ও পুরুষকে সৃষ্টি করা হয় নি। বরং নিজের বেঁচে থাকা ও অধিকার বুঝে নেওয়ার পাশাপাশি ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সমৃদ্ধ পৃথিবীর জন্য তৈরি করা মানুষের অন্যতম দায়িত্ব। আর এ দায়িত্বের জন্যই নারী ও পুরুষের মধ্যে বৈষম্য দিয়েছে প্রকৃতি। মনোবিজ্ঞানিগণ একমত যে, জন্মের পর থেকে বয়প্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত শিশু ও কিশোরদেরকে পিতামাতার স্নেহ ও যত্নের মধ্যে লালন করা তার স্বাভাবিক মানসিক ভারসম্য ও মানবীয় মূল্যবোধের বিকাশের জন্য জরুরী। যত প্রাচুর্য ও আয়েসের মধ্যেই লালন করা হোক, যদি শিশু ও কিশোর পিতামাতার স্নেহ ও যত্ন থেকে বঞ্চিত হয় তবে তার মধ্যে হিংস্রতা ও ভারসম্যহীন মানসিকতা গড়ে উঠবেই। এজন্য পিতা ও মাতা উভয়কে অথবা একজননেক শিশু-কিশোর সন্তানের জন্য বিশেষভাবে সময় ব্যয় করতে হবে। প্রকৃতি এজন্য মাতাকেই নির্বাচন করেছে। সমান অধিকার প্রদান করে যদি সমান দায়িত্ব না দেওয়া হয় তবে যাকে অধিক দায়িত্ব প্রদান করা হবে তার উপর জুলুম করা হবে। আর সমান অধিকারের নামে পিতা ও মাতা উভয়কেউ সমান অর্থনৈতিক দায়িত্ব প্রদান করলে উভয়কেই সন্তানের জন্য উপার্জন করতে হবে এবং কেউই সন্তানের জন্য বিশেষ সুবিধা পাবেন না। এ জন্য পাশ্চাত্য সমাজে মায়েরা সন্তান ধারণ করতে মোটেও আগ্রহী হন না। পিতামাতা উভয়ের

ব্যস্ততা বা দেখাশোনার অভাবে আমাদের দেশে উঠতি বয়সের অগণিত মেধাবী ছেলেমেয়ে মাদকাসক্ত বা অশ্লীলতায় নিমজ্জিত হয়ে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। প্রাকৃতিক ভারসম্য রক্ষার জন্য ইসলামে নারীকে এক্ষেত্রে বিশেষ অধিকার ও সুযোগ প্রদান করেছে। বর্তমান যুগে মায়েরা শিশুদের মাতৃদুগ্ধ পান করান না। এর একটি কারণ হলো আধুনিক ভোগবাদী সভ্যতার প্রভাবে "সৌন্দর্য" রক্ষা ও বিলাসিতার মানসিকতা। এর চেয়েও বড় কারণ হলো বৈষম্য দূর করার নামে নারীদেরকে নারী প্রকৃতি বিরোধী পুরুষালি কর্ম করতে বাধ্য করা হচ্ছে। ফলে তাদের মধ্যে সন্তানের বুকের দুধ পান করানোর মনোদৈহিক প্রস্তুতি থাকে না। মনও অপ্রস্তুত, দেহও অপ্রস্তুত। দুধ নেই। সর্বোপরি কর্মব্যস্ততার কারণে সময় নেই। ফলে বাধ্য হয়ে পুরোপুরি অথবা আংশিকভাবে বিকল্প গুড়া দুধের উপর নির্ভর করতে হয়। যা শিশুদের মনোদৈহিক বিকাশের জন্য ও সুস্থতার জন্য মারাত্মক হুমকি বলে স্বীকৃত।

মনে করুন একজন পিতা ১০ লক্ষ টাকার সম্পদ এক ছেলে ও এক মেয়ের জন্য রেখে গেলেন। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় পুত্র সাড়ে ৬ লাখ টাকা ও কন্যা সাড়ে তিন লাখ টাকার সম্পদ লাভ করবে। বিবাহের সময় পুত্র আনুমানিক এক লক্ষ টাকা মোহর তার স্ত্রীকে দিবে এবং কন্যা ১ লক্ষ টাকা তার স্বামী থেকে মহর হিসেবে লাভ করবে। ফলে পুত্রের সাড়ে ৫ লাখ ও কন্যার সাড়ে ৪ লাখ টাকার সম্পদ থাকবে। একটি ছোট্ট পরিবারের স্বাভাবিক ব্যবয়ভার মাসিক ৫ হাজার টাকা হলে পুত্রকে তার সাড়ে ৫ লাখ টাকা থেকে প্রতি মাসে ৫ হাজার টাকা খরচ করতে হবে। পক্ষান্তরে কন্যাকে একটি পয়সাও খরচ করতে হবে না; কারণ ইসলামী ব্যবস্থায় স্ত্রী ও সন্তানদের যাবতীয় খরচ বহনের দায়িত্ব স্বামীর। কখনো বিধবা বা পরিত্যাক্তা হলে নারীকে শুধু তার নিজের ব্যয়ভার বহন করতে হবে, তার সন্তানদের খরচের দায়িত্ব স্বামীর পরিবার বা রাষ্ট্রের। এভাবে আমরা দেখছি যে, ইসলামে নারীকে পুরুষের প্রায় সমান অর্থনৈতিক অধিকার দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সকল অর্থনৈতিক দায়িত্ব থেবে মুক্ত রাখা হয়েছে। এভাবে পারিবারিক অর্থ ব্যবস্থায় নারীকে বিশেষ অধিকার ও অতিরিক্ত সুযোগ (privilage) প্রদান করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য যেন নারী সকল অর্থনৈতিক দায়ভার থেকে মুক্ত রেখে পরিবার ও সন্তানদের দুনিয়া ও আখিরাতের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য নিজেকে নিয়োজিত রাখতে পারেন। কিন্তু যদি কোনো নারী যদি ইসলামের দেওয়া সুবিধাদি গ্রহণ করেন, নিজের ও পরিবারের সকল খরচপত্র স্বামী থেকে আদায় করেন, কিন্তু নিজে পরিবার ও সন্তানদের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত না করে নিজের উচ্ছৃলতা, স্বাধীনতা ইত্যাদির নামে চাকরী, সমাজ, গল্প ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত থাকেন তবে তা নিঃসন্দেহে ভয়ঙ্কর খিয়ানত বলে গণ্য, যেজন্য তাকে দুনিয়ার জীবনের ও আখিরাতে আল্লাহর শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে।

সম্মানিত উপস্থিতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, কর্ম, চাকরী ইত্যাদির মাধ্যমে অর্থ উপার্জন, সঞ্চয় ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে নারীদেরকে পুরুষদের সমান অধিকার প্রদান করা হয়েছে। যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও শুধু নারী হওয়ার কারণে তার প্রতি কোনোরূপ বৈষম্য করা হয় নি বা কোনো কর্ম, চাকরী, ব্যবসা তার জন্য নিষিদ্ধ করা হয় নি। ইসলামের বিধানের মধ্যে থেকে নারী প্রকৃতির সাথে সুসমঞ্জস যে কোনো কর্ম তারা করতে পারেন। তবে এক্ষেত্রের অধিকার ও সুযোগের সাম্য নিশ্চিত করা হলেও দায়িত্বের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত অধিকার বা privilage প্রদান করা হয়েছে। পরিবার ও মানব সভ্যতার প্রতি নারীর প্রাকৃতিক দায়িত্ব পালনের সাথে সঙ্গতি রক্ষার জন্য নারীকে পারিবারিক জীবনে অর্থনৈতিক দায়িত্ব থেকে মুক্ত করা হয়েছে এবং তার সকল প্রয়োজন মেটাতে তার স্বামীকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এজন্য পরিবারের প্রয়োজন ছাড়া চাকরী বা কর্ম করার অর্থ হলো সন্তান ও পরিবারের দায়িত্ব পালনে অবহেলা বা ত্রুটি করা।

হাযেরীন, চতুর্থ অধিকার রাজনৈতিক অধিকার। অন্যান্য অধিকারের ন্যায় রাজনৈতিক অধিকারের ক্ষেত্রেও নারীর প্রতি কোনো বৈষম্যমূলক বিধান ইসলাম প্রদান করে নি। রাজনৈতিক অধিকারের ক্ষেত্রে মূল বিষয় দুটি: প্রথমত, রাষ্ট্র পরিচালনায় মতামত ও পরামর্শ প্রদানের সুযোগ এবং দ্বিতীয়ত রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন। কুরআন কারীমে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, সকল জাগতিক বিষয়ে পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে কর্ম নির্বাহ করা মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও খুলাফায়ে রাশেদীন বিভিন্ন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিষয়, খলীফা নির্বাচন ইত্যাদি বিষয়ে পুরুষদের পাশাপাশি নারীদের পরামর্শও গ্রহণ করতেন। বর্তমান যুগের সার্বজনীন ভোট ব্যবস্থা তখন ছিল না। তবে সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় বিষয়ে নারীদের পরামর্শ নেওয়া হতো। এ সকল বিষয়ে নারীদের ভোট, পরামর্শ বা মত প্রদানের অধিকার নেই এরূপ কোনো চিন্তা কখনোই ছিল না।

কোনো নারীকে রাষ্ট্র পরিচালনার বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের একক ক্ষমতা প্রদান করার বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ সতর্ক করেছেন। তিনি বলেন:

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً

যে জনগোষ্ঠী তাদের দায়িত্ব কোনো নারীর উপর অর্পন করে তারা সফল হয় না। (বুখারী) এ হাদীসের আলোকে কোনো কোনো ইমাম ও ফকীহ মত প্রকাশ করেছেন যে, নারী রাষ্ট্র প্রধান বা বিচারকের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারবে না। কিন্তু অন্যান্য ইমাম ও ফকীহ মত প্রকাশ করেছেন যে, কেবলমাত্র নারীকে স্বৈরতান্ত্রিক বা একচ্ছত্র ক্ষমতা প্রদান আপত্তিকর, কিন্তু পরামর্শ ভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় নারীর রাষ্ট্রপ্রধান হওয়া আপত্তিকর নয়। এছাড়া মন্ত্রী, বিচারক ও অন্যান্য সকল দায়িত্বও তারা গ্রহণ করতে পারবেন। তারা বলেন, কুরআনে নারী শাসককে প্রশংসা করা হয়েছে। নবী সুলাইমান (আ)-এর সাথে ইয়ামানের সাবা অঞ্চলের রাণী আলোচনায় উক্ত রাণীর (বিলকীস) প্রজ্ঞা ও শাসনের প্রশংসা করা হয়েছে এবং প্রসঙ্গত উল্লেখ করা হয়েছে, উক্ত রাণী পরিষদের পরামর্শ ছাড়া কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন না। এ আয়াত ও উপরের হাদীসের সমন্বয়ে হাকীমুল উম্মাত আশরাফ আলী থানবী (রাহ) ও অন্যান্য আলিম উল্লেখ করেছেন যে, আইনগতভাবে বা ব্যবহারিকভাবে মন্ত্রী বা পার্লামেন্টের পরামর্শ গ্রহণের ব্যবস্থা থাকলে নারীর জন্য রাষ্ট্রপ্রধানের পদ গ্রহণ করা ইসলামে অবৈধ বা নিষিদ্ধ নয়।[১]

হাযেরীন, শুধু আইন করে, বিচার করে, কোনো নারীকে ধরে মন্ত্রী বানিয়ে, বা কোটার মাধ্যমে কিছু নারীকে চাকরী দিয়ে সমাজে নারী প্রতি বৈষম্য রোধ করা যায় না। বৈষম্য দূর করা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য এ বিষয়ে ইসলামের নির্দেশ, নারীর অধিকার, কন্যা, স্ত্রী ও মাতার অধিকার প্রতিষ্ঠা করলে মহান আল্লাহর নিকট দুনিয়া ও আখিরাতে যে মহান পুরস্কার রয়েছে এবং এ বিষয়ে অবহেলা করলে যে কঠিন শাস্তি রয়েছে সে বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করা নারীর প্রতি বৈষম্য দূর করার অন্যতম উপায়।

নারীবাদিতা, পুরুষতান্ত্রিকতা, স্ত্রীর অত্যাচার, স্বামীর অত্যাচার ইত্যাদি বিভিন্ন বক্তব্য দিয়ে বিচ্ছিন্নতা তৈরি নয়, আমাদের মূল দায়িত্ব হলো, অধিকার ও দায়িত্ববোধের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা। বিশেষত নারীত্বের কারণে নারীর প্রতি বৈষম্য, দৈহিক বা সামাজিক দুর্বলতার কারণে যেন নারী কখনো বৈষম্যের শিকার না হন তা আমাদের নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি নারী অধিকারের দোহাই দিয়ে নারীকে তার প্রকৃতির বিরুদ্ধ কাজে লিপ্ত করা, নারীকে তার প্রকৃতি নির্ধারিত কর্ম করতে নিরুৎসাহিত করা ইত্যাদি মানবতা বিধ্বংসী প্রবণতা রোধ করতে হবে। আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক প্রদান করুন। আমীন!!

---

[১] আশরাফ আলী থানবী, ইমদাদুল ফাতাওয়া ৫/৯১।

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

أَمَّا بَعْدُ، فَيَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: وَلا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ

نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ حُظُوظَهُنَّ مِنْ الْمَسَاجِدِ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ

بَارَكَ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ فِيْ الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ. وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ. أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ، فَاسْتَغْفِرُوْهُ وَتُوْبُوْا إِلَيْهِ، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.

রজব মাসের ২য় খুতবাঃ উপার্জন, শ্রম ও শ্রমিকের অধিকার

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লী আলা রাসূলিহীল কারীম। আম্মা বাদ,

সম্মানিত উপস্থিতি, আজ রজব মাসের দ্বিতীয় জুমুআ। আজ আমরা শ্রমের গুরুত্ব ও শ্রমিকের অধিকার বিষয়ে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ। কিন্তু তার আগে আমরা এ সপ্তাহের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসগুলির বিষয়ে সংক্ষেপ আলোকপাত করি। হাযেরীন, আজ ইংরেজী ..... মাসের ..... তারিখ। এ সপ্তাহের দিবসগুলির মধ্যে রয়েছে .... ।

সম্মানিত উপস্থিতি, শ্রমিকের মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিশ্বের মানুষ ১লা মে আন্তর্জাতিক শ্রম দিবস পালন করেন। প্রাচীন ইউরোপে রোমান পৌত্তলিকগণ ১লা মে ফুলের দেবী ফ্লোরার উপাসনায় উদযাপন করত বলে জানা যায়। পররবর্তী কালে প্রাচীন ও মধ্য যুগেও ইউরোপের মানুষ বসন্তের পুনরাগমন উপলক্ষে ১লা মে উদযাপন করত। ১৮৮৬ সালের ৪ঠা মে আমেরিকার শিকাগো শহরে শ্রমিক বিক্ষোভ ও পুলিসের সাথে সংঘর্ষের প্রেক্ষাপটে ১৮৮৯ সালে প্যারিসের সোশালিস্ট পার্টি ১লা মে-কে 'আন্তর্জাতিক শ্রম দিবস (international workers' day) হিসেবে ঘোষণা করে। ক্রমান্বয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এ দিবসকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

সম্মানিত উপস্থিতি, ইসলামে শ্রম ও কর্মকে যেমন সর্বোচ্চ মর্যাদা এবং ইবাদত হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে, তেমনি শ্রমিদের মর্যাদা ও অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আজ আমরা কুরআন ও সুন্নাতের আলোকে তিনটি বিষয় আলোচনা করবঃ (১) শ্রমের মর্যাদা ও গুরুত্ব, (২) শ্রমিকের অধিকার ও (৩) শ্রমিকের দায়িত্ব।

হাযেরীন, ইতোপূর্বে হালাল ও হারাম উপার্জন বিষয়ক খুতবায় আমরা দেখেছি যে, মুমিনের জন্য ঈমানের পরে সকল নেক আমলের পূর্বে প্রথম ফরয হলো হালাল উপার্জন। আল্লাহ্ বলেছেন:

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

"হে রাসূলগণ, তোমরা পবিত্র বস্তু হতে আহার কর এবং সৎকর্ম কর। তোমরা যা কর সে বিষয়ে আমি অবহিত।"[১]

কুরআনে আরো অনেক স্থানে হালাল বা পবিত্র বস্তু আহার করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আহার বলতে উপার্জন, পানাহার ও সকল প্রকার ব্যবহার বুঝানো হয়েছে। হারাম বা অবৈধ উপার্জন বর্জন করা এবং বৈধ উপার্জনের উপর নির্ভর করা মুমিনের জীবনের অন্যতম ফরয ইবাদত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

طَلَبُ الْحَلاَلِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

"বৈধ উপার্জনের সন্ধান করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর অত্যাবশ্যকীয় বা ফরয ইবাদত।"[২]

হাযেরীন, ইসলামে বৈধ উপার্জনের সাথে শ্রমকে অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত করা হয়েছে। শ্রম ছাড়া পরের দানের বা ভাতার উপরে নির্ভরতার বিষয়ে আপত্তি করা হয়েছে। বস্তুত উপার্জন অর্থই শ্রম। বৈধ উপার্জনের পথ মূলত দুটি (১) বৈধ ব্যবসা এবং (২) বৈধ শ্রম বা কর্ম, তা কায়িক, শারীরিক, মেধার বা মানসিক কর্ম হতে পারে বা ছোট বা বড় কোনো চাকরী হতে পারে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

أَفْضَلُ الْكَسْبِ بَيْعٌ مَبْرُورٌ وَعَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ

---

[১] সূরা মুমিনূন: ৫১ আয়াত।

[২] হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/২৯১, মুনযিরী, আত-তারগীব ২/৩৪৫। হাইসামী ও মুনযিরী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

"সর্বোৎকৃষ্ট উপার্জন হলো পূণ্যময়-সততাময় বাণিজ্য এবং মানুষের নিজের হাতের কর্ম।"[১]

ব্যবসার সাথেও শ্রম জড়িত। কুরআন ও হাদীসে মুমিনেদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও শ্রমের মাধ্যমে হালাল উপর্জন করতে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়তে নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"যখন সালাত সমাপ্ত হবে তখন তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করবে, আর আল্লাহকে অধিক স্মরণ করবে, যেন তোমরা সফলকাম হও।"[২]

ব্যবসায়ের গুরুত্ব ও ফযীলত ব্যাখ্যা করে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

"সত্যবাদী বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী নবীগণ, সিদ্দীকগণ ও শহীদগণের সাথী"[৩]

পাশাপাশি ব্যবসায়ের অবিশ্বস্ততার ভয়াবহতা উল্লেখ করে তিনি বলেন;

إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا إِلاَّ مَنْ اتَّقَى اللَّهَ وَبَرَّ وَصَدَقَ

"ব্যবসায়ীগণ কিয়ামতের দিন পাপীরূপে উত্থিত হবে, তবে যারা আল্লাহকে ভয় করে সৎ থাকে, কল্যাণমূলক কর্ম করে এবং সত্যপরায়ণ তাদের কথা ভিন্ন।"[৪]

হাযেরীন, আমরা শ্রমের মর্যাদা ভালভাবে অনুভব করতে পারি যখন দেখি যে, সকল নবী-রাসূলই শ্রম ও শ্রমভিত্তিক কর্মে নিয়োজিত ছিলেন। বৈধ উপার্জনের জন্য শ্রম ও কর্ম করা নবী-রাসূলগণ এবং সাহাবীগণের সুন্নাত বা রীতি। আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلاَّ رَعَى الْغَنَمَ فَقَالَ أَصْحَابُهُ وَأَنْتَ فَقَالَ نَعَمْ كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لأَهْلِ مَكَّةَ

"আল্লাহ যত নবীই প্রেরণ করেছেন সকলেই মেষ চরিয়েছেন।" সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি? তিনি বলেন, "হ্যাঁ, আমিও। আমি নির্ধারিত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে মক্কাবাসীদের মেষ চরাতাম।"[৫]

শ্রমিক হওয়া সাহাবীগণেরও সুন্নাত। আয়েশা (রা) বলেন,

كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَّالَ أَنْفُسِهِمْ

"রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণ স্ব-শ্রমিক ছিলেন।"[৬]

অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا (مَا كَسَبَ الرَّجُلُ كَسْبًا) قَطُّ خَيْرًا (أَطْيَبَ) مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَم كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ

"স্বশ্রমে নিজের হাতে মানুষ যে উপার্জন করে তার চেয়ে উত্তম বা পবিত্রতর উপার্জন আর কিছুই হতে পারে না।আর আল্লাহর নবী দাউদ (আ) স্বশ্রমে নিজের হাতে উপার্জন করে খেতেন।"[৭]

প্রিয় ভাইয়েরা, এখানেও আমাদের একটি চিন্তা করা দরকার। এ সকল হাদীসের আলোকে

---

[১] আহমদ, আল-মুসনাদ ৩/৪৬৬; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৪/৬০; আলবানী, সহীহুত তারগীব ২/১৪১। হাদীসটি সহীহ।

[২] সূরা জুমুআ ১০ আয়াত।

[৩] তিরমিযী, আস-সুনান ৩/৫১৫; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ২/৭; আলবানী, সহীহুত তারগীব ২/১৬২। তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

[৪] তিরমিযী, আস-সুনান ৩/৫১৫; ইবনু মাজাহ, আস-সুনান ২/৭২৬; আলবানী, সহীহুত তারগীব ২/১৬২। হাদীসটি সহীহ।

[৫] বুখারী, আস-সহীহ ২/৭৮৯।

[৬] বুখারী, আস-সহীহ ২/৭৩০।

[৭] বুখারী, আস-সহীহ ২/৭৩০; ইবনু মাজাহ, আস-সুনান ২/৭২৩।

আমরা জানতে পারছি যে, নিজে পরিশ্রম করে যে বৈধ উপার্জন মানুষ ভক্ষণ করে তাই হলো আল্লাহর প্রিয়তম খাদ্য এবং তা আল্লাহর নবী রাসূলগণ ও অন্যান্য প্রিয় বান্দাদের সুন্নাত ও রীতি। কিন্তু ঈমানের দাবীদার হলেও আমরা বাংলাদেশের মুসলিমগণ ভারতীয় আর্যচিন্তায় প্রভাবিত হয়ে কায়িক শ্রম ও কর্মকে ঘৃণা করি। আমাদের মধ্যে জেলে, তাতী, কামার, কুমার, মুচি, মেথর, শ্রমিক, কুলি, মুজুর, রিকশাচালক ও অন্যান্য অগণিত পেশায় নিয়োজিত পবিত্রতম খাদ্যভক্ষণকারী নবীরাসূলগণের অনুসারীদেরকে আমরা আক্ষরিক অর্থে ঘৃণা করি এবং 'নীচু শ্রেণী' বলে বিশ্বাস করি। পক্ষান্তরে অবৈধ-হারাম উপার্জনে লিপ্ত অপবিত্র নোংরা খাদ্যভক্ষণকারীদেরকে আন্তরিকভাবে সম্মান করি। আর এই কঠিন অপরাধের জন্য আমাদের মনে সামান্যতম অনুভুতিও নেই।

এই কঠিন পাপ ও ইসলাম-বিরোধী মানসিকতার ফলে আমরা জাগতিক জীবনেও ক্ষতিগ্রস্থ। আমাদের সমাজের পিতামাত ও অভিভাবকগণ সন্তানদেরকে 'শিক্ষিত' করতে এবং 'শিক্ষিতের চাকরী' দেওয়ার জন্য অনেক অবৈধ পন্থা অবলম্বন করতে সদা আগ্রহী। কিন্তু সন্তানদেরকে কারিগরী শিক্ষা, শ্রম ও কর্ম শিক্ষা দিতে আমার মোটেও রাজি নই। কারণ এতে নাকি সম্মান, মর্যাদা ও বংশগৌরব নষ্ট হয়!!? আমাদের ছেলেদেরকে মেথরের, শ্রমিকের বা কুলির কাজ করার জন্য লক্ষটাকা খরচ করে বিদেশ যেতে হয়। কারণ এই কাজগুলি দেশে করলে নাকি মর্যাদা নষ্ট হয়। কী দুর্ভাগ্য আমাদের! যেখানে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল শ্রম ও কর্মকে মর্যাদার মাপকাঠি করলেন, সেখানে আমরা হিন্দু চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে শ্রম ও কর্মকে মর্যাদাহীনতার উৎস মনে করলাম। আর এ পাপের ফল হলো আমরা জাতিকে ও বিশ্বকে দক্ষ শ্রমিক উপহার দিতে পারি না। আমাদের ছেলেরা বিদেশে যেয়ে শুধুমাত্র অদক্ষ শ্রমিকের কাজ করে। পক্ষান্তরে অনেক দেশের প্রত্যেক যুবক বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা নিয়ে প্রবাসের মাটিতে পা রাখেন। তাদের সমাজব্যবস্থা ও শিক্ষা ব্যবস্থা এভাবে কর্ম ও শ্রমমুখি হয়ে গড়ে উঠেছে। পক্ষান্তরে আমরা শ্রমবিমুখ।

প্রিয় ভাইয়েরা, আমরা ব্যক্তিগতভাবে এবং জাতিগতভাবে ঋণ, সাহায্য, ত্রাণ, শ্রমহীন কর্ম ইত্যাদিকে ভালবাসি। অথচ আমাদের একামত্র আদর্শ রাসূলুল্লাহ ﷺ শ্রমবিমুখতা ঘৃণা করেছেন। বেকার থাকা, পরনির্ভর থাকা, অনের সাহায্যের আশায় থাকা ইত্যাদি বর্জন করে শ্রমের মাধ্যমে নিজে স্বাবলম্বী হতে উম্মাতকে বারংবার নির্দেশ প্রদান করেছেন। তিন বলেন,

لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ.

তোমাদের কারো জন্য উত্তম হলো যে, সে নিজের দড়িটি নিয়ে বের হয়ে, খড়ি কুড়িয়ে নিজের পিঠে খড়ির বোঝা বহন করে তা বাজারে বিক্রয় করবে, এভাবে আল্লাহ তার সম্মান রক্ষা করবেন। এভাবে করা তার জন্য উত্তম মানুষের কাছে চাওয়া বা ভিক্ষা করার চেয়ে, মানুষ দিতেও পারে নাও দিতে পারে।[১]

আনাস (রা) বলেন, একজন আনসারী ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আগমন করে সাহায্য প্রার্থনা করে। তিনি বলেন, তোমার বাড়িতে কি কিছুই নেই। লোকটি বলে, একটি কাঁথা আছে যার কিছুটা আমরা বিছিয়ে দিই এবং কিছুটা গায়ে দিই এবং একটি পেয়ালা আছে যাতে আমরা পানি পান করি। তিনি বলেন, দুইটিই আমার কাছে নিয়ে এস। তখন লোকটি সেগুলি এনে তাঁকে দেয়। তিনি তা নিয়ে বলেন, কে এই দ্রব্যদুইটি ক্রয় করবে। একব্যক্তি বলেন, আমি এক দিরহামে (রৌপ্যমুদ্রা) উভয়কে কিনতে চাই। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তখন দুই বা তিনবার বলেন, এক দিরহামের বেশি কে দিবে? তখন একব্যক্তি বলেন,

[১] বুখারী, আস-সহীহ ২/৫৩৫, ৫৩৮।

আমি দুই দিরহামে দ্রবদুইটি খরিদ করব। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন দ্রব্য দুইটি তাকে প্রদান করেন এবং দিরহামদ্বয় আনসারীকে দিয়ে বলেন, এক দিরহাম দিয়ে তুমি খাদ্য ক্রয় করে তোমার স্ত্রীর নিকট রেখে আস এবং অন্য দিরহাম দিয়ে একটি কুঠার কিনে আমার নিকট নিয়ে এস। লোকটি কুঠার নিয়ে আসলে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নিজ হাতে তার আছাড়ি লাগিয়ে বলেন, তুমি কাঠ কাটবে এবং তা বিক্রয় করবে। ১৫ দিন যেন আমি তোমাকে না দেখি। লোকটি নির্দেশ মত কাজ করে। এই ১৫ দিনে সে দশ দিরহাম উপার্জন করে। কয়েক দিরহাম দিয়ে সে কাপড়চোপড় ও খাদ্য ক্রয় করে। তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকে বলেন, তুমি অন্যের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করলে তা কেয়ামতের দিন তোমার চেহারায় ক্ষত হিসাবে প্রতিভাত হতো। তার চেয়ে এভাবে পরিশ্রম করে স্বাবলম্বী হওয়াই তোমার জন্য উত্তম।[১]

হাযেরীন, বৈধ উপার্জনের জন্য শ্রমে লিপ্ত থাকাকে হাদীসে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কা'ব ইবনু আজুরা (রা) বলেন,

مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ فَرَأَى أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِنْ جَلَدِهِ وَنَشَاطِهِ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ لَوْ كَانَ هَذَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى وَلَدِهِ صِغَاراً فَهُوَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيْرَيْنِ فَهُوَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى نَفْسِهِ يُعِفُّهَا فَهُوَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ

"একব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর নিকট দিয়ে গমন করে। সাহাবীগণ লোকটি শক্তি, স্বাস্থ্য ও উদ্দীপনা দেখে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, এই লোকটি যদি আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদে) থাকত! তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, যদি লোকটি তার ছোটছোট সন্তানদের জন্য উপার্জনের চেষ্টায় বেরিয়ে থাকে তাহলে সে আল্লাহর রাস্তাতেই রয়েছে। যদি সে তার বৃদ্ধ পিতামাতার জন্য উপার্জনের চেষ্টায় বেরিয়ে থাকে তাহলে সে আল্লাহর রাস্তাতেই রয়েছে। যদি সে নিজেকে পরনির্ভরতা থেকে মুক্ত রাখতে উপার্জনের চেষ্টায় বেরিয়ে থাকে তাহলে সে আল্লাহর রাস্তাতেই রয়েছে।"[২]

সম্মানিত হাযেরীন, এখানে আমাদের একটু চিন্তা করা দরকার। আমাদের ধার্মিক মানুষেরা সাধারণ 'আল্লাহর রাস্তায়' বলতে 'জিহাদ, দাওয়াত, ইলম, যিকির' ইত্যাদি ইবাদতকেই বুঝেন। সংসারের কামই রোযগার, কর্ম ইত্যাদিকে আমরা 'দুনিয়াদারী' বলে মনে করি। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ এই ধারণাটি দূর করে দিলেন। নিজের শ্রম, কর্ম, মেধা ইত্যাদি ব্যয় করে নিজের ও পরিবার পরিজনের জন্য হালাল অর্থ উপার্জন অন্যতম ইবাদত এবং এই ইবাদতে লিপ্ত ব্যক্তি "আল্লাহর রাস্তায়" কর্মরত রয়েছেন।

হাযেরীন, হক্কুল ইবাদ বা সৃষ্টিজগতের অধিকার বিষয়ক আলোচনায় আমরা সাধারণভাবে সকল মানুষের অধিকার বিষয়ে জেনেছি। শ্রমিকও এ সকল অধিকার লাভ করবেন। উপরন্তু শ্রমিকের বিশেষ শ্রমিকের অধিকার সম্পর্কে বিভিন্ন নির্দেশনা আমরা কুরআন ও হাদীসে পাই। আমরা দেখেছি, কুরআনে বারংবার অধীনস্থদের প্রতি উত্তম আচরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অধীনস্থ, শ্রমিক বা কর্মচারীদের বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ এত বেশি চিন্তা করতেন যে, তাঁর ইন্তেকালের পূর্বে তাঁর সর্বশেষ নির্দেশের মধ্যে তাদের অধিকার রক্ষার কথা তিনি বলেন। ইন্তেকালের পূর্বে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর অধিকাংশ ওসীয়ত ছিল

الصَّلاَةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

"সতর্ক সাধান থাকবে নামায এবং তোমাদের অধীনস্থগণের বিষয়ে।"[৩]

---

[১] তিরমিযী, আস-সুনান ৩/৫২২; আবূ দাউদ, আস-সুনান ২/১২০; ইবনু মাজাহ, আস-সুনান ২/৭৪০। তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

[২] মুনযিরী, আত-তারগীব ২/৩৩৫, হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৪/৩২৫। সনদ সহীহ।

[৩] ইবনু মাজাহ, আস-সুনান ১/৫১৯, ২/৯০০, ৯০১; আলবানী, সহীহুত তারগীব ২/২৭৯। হাদীসটি সহীহ।

অধীনস্থ বা শ্রমিক-কর্মচারীদের অধিকারের বিষয়ে ইসলামের মূলনীতি জানতে একটি হাদীস শুনুন। তাবিয়ী মা'রূর ইবনু সুওয়াইদ বলেন:

مَرَرْنَا بِأَبِي ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ وَعَلَى غُلامِهِ مِثْلُهُ فَقُلْنَا يَا أَبَا ذَرٍّ لَوْ جَمَعْتَ بَيْنَهُمَا كَانَتْ حُلَّةً فَقَالَ إِنَّهُ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنْ إِخْوَانِي كَلامٌ وَكَانَتْ أُمُّهُ أَعْجَمِيَّةً فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ فَشَكَانِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَلَقِيتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ؟ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ سَبَّ الرِّجَالَ سَبُّوا أَبَاهُ وَأُمَّهُ قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ هُمْ إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمْ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَأَلْبِسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ وَلا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ

"আমরা রাবযা নামক স্থানে আবূ যার গিফারীর বাড়ির পার্শ দিয়ে যাচ্ছিলাম। আমরা দেখলাম তার দেহে যে পোশাক তার চাকরের দেহেও সেরূপ একই পোশাক। আমরা বললাম, আবূ যার, আপনি যদি চাকরকে এরূপ কাপড় না দিয়ে তার কাপড়টি আপনার কাপড়ের সাথে সংযুক্ত করে আপনি ব্যবহার করতেন তাহলে একটি সুন্দর সেট হতো। আর তাকে অন্য কাপড় দিতেন। তখন তিনি বলেন, আমার ও আমার এক শ্রমিকভাইয়ের মধ্যে কথাকাটাকাটি হয়। তার মা ছিল অনারব। আমি তাকে তার মা তুলে গালি দিই। সে ভাই এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট অভিযোগ করেন। এরপর আমি যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সাক্ষাত করলাম তখন তিনি বলেন, আবূ যার, তুমি কি তাকে মা তুলে গালি দিয়েছে? তোমার মধ্যে এখনো জাহিলিয়্যাত রয়েছে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, মানুষ কাউকে গালি দিলে তো তার মা-বাবা তুলবেই! তিনি বলেন, আবূ যার, তোমার মধ্যে জাহিলিয়্যাত বিরাজমান! তারা- তোমাদের চাকরবাকর-শ্রমিক বা দাস শ্রেণী- তোমাদের ভাই, আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ ও দায়িত্বাধীন করেছেন। কাজেই তোমরা যা খাও তা থেকে তাদেরকে খাওয়াবে এবং তোমরা যা পরিধান কর তা থেকে তাদেরকে পরিধান করাবে। তাদের পক্ষে কষ্টকর বা অসাধ্য কোনো দায়িত্ব তাদের উপর চাপাবে না। যদি কোনো কষ্টসাধ্য দায়িত্ব তাদের উপর ন্যস্ত কর তবে তোমরা তা পালনে তাদেরকে সাহায্য করবে।[১]

এখানে তিনি কয়েকটি মূলনীতি প্রদান করেছেন। (১) ভ্রাতৃত্ব। শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে মূল সম্পর্ক মানবিক ভ্রাতৃত্ব। অর্থনৈতিক বা সামাজিক বৈষম্য যেন এ মৌলিক ভ্রাতৃত্ববোধ দুর্বল না করে। (২) তাদের জন্য সম্মানজনক পানাহার ও পোশাক পরিচ্ছদের ব্যবস্থা করা। অর্থাৎ তাদের কর্মের ও যোগ্যতার সাথে সঙ্গতি রেখে এমন বেতন ও সুবিধা তাদের প্রদান করতে হবে, যেন তারা স্বাভাবিক মানবীয় মর্যাদার সাথে জীবনধারণ করতে পারেন এবং তাদের মৌলিক চাহিদাগুলি পূরণ করতে পারেন। (৩) দায়িত্বের সামঞ্জস্যতা। তাদের কর্ম-সময় ও কর্মের প্রকৃতি এমন হবে যেন তা সাধ্যাতীত না হয়।

আবূ যার (রা)-এর কর্ম থেকে আমরা দেখি যে, সাহাবীগণ এ সকল নির্দেশ আক্ষরিকভাবে পালন করেছেন। বিভিন্ন হাদীসের মাধ্যমে সাহাবীগণের জীবনে আমরা এ সকল মূলনীতির প্রকৃত বাস্তবায়ন দেখতে পাই। তাঁরা শ্রমিক, ক্রীতদাস ও অধীনস্থ কর্মচারীদের সাথে একত্রে খাওয়া দাওয়া করতেন, সকল সামাজিক কর্মে ও অনুষ্ঠানে একই পরিবারের সদস্যের মত যোগদান করতেন, শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে এ সকল বিষয়ে কোনো ব্যবধান করাকে তাঁরা প্রচণ্ড ঘৃণা করতেন। তাঁরা তাঁদের নিজেদের সমমানের খাদ্য ও পোশাক শ্রমিকদেরকে প্রদান করতেন। এবং কর্ম প্রদানের ক্ষেত্রে তাদের সাধ্যের দিকে লক্ষ্য রাখতেন।

হাযেরীন, শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন যথাসময়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

---

[১] মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১২৮২-১২৮৩।

أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

"শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকানোর আগেই তাকে তার পারিশ্রমিক প্রদান করবে।"[১]

শ্রমিক, কর্মচারী ও সকল অধীনস্থের প্রতি কর্মকর্তা বা মালিকের দায়িত্বের অন্যতম হলো ক্ষমা করা। কুরআন কারীমে বিভিন্ন আয়াতে শাস্তির শক্তি থাকা সত্ত্বেও ক্রোধ সম্বরণ করা ও ক্ষমা করার বিশেষ নির্দেশনা ও বিশেষ পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। হাদীস শরীফে এরূপ ক্ষমার বিশেষ পুরস্কারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করেন, চাকর-কর্মচারী বা অধীনস্থকে কতবার ক্ষমা করতে হবে। তিনি বলেন:

اعْفُوا عَنْهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةً

"প্রতিদিন ৭০ বার তার অপরাধ ক্ষমা করবে।"[২]

হাযেরীন, মহান আল্লাহ অধিকার ও দায়িত্বের মধ্যে সর্বদা সমন্বয় করেছেন। সকল শ্রমিক ও কর্মীর উপর অর্পিত দায়িত্ব আমানতদারীর সাথে আদায় করা তার উপার্জন বৈধ হওয়ার ও আখিরাতের নাজাত পাওয়ার অন্যতম শর্ত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ... وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

" তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব বা দয়িত্বাধীনদের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে। .... কর্মচারী বা শ্রমিক তার মালিকের সম্পদের দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং তাকে সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে।"[৩]

হাযেরীন, সরকারী, বেসরকারী, প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির অধীনে কর্মরত সকল শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তার ক্ষেত্রেই এ আমানতদারী দায়িত্ব একইরূপে প্রযোজ্য। কর্মদাতার সাথে চুক্তি মোতাবেক পরিপূর্ণ সময় ধরে যথাসাধ্য কর্ম করার মাধ্যমেই এ আমানত আদায় হবে। নিজের ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান হলে বা নিজের বিশেষ লাভ হলে যতটুকু পরিশ্রম ও আন্তরিকতা নিয়ে কাজ করি, সরকারী, বেসরকারী বা ব্যক্তির অধীনে চাকরীতেও ততটুকু পরিশ্রম ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করলেই আমানত আদায় হবে।

অজ্ঞতা বা বিভ্রান্তির কারণে আমরা অনেক সময় চাকরী বা কর্মকে 'দুনিয়াবী কাজ' বলে মনে করি এবং কর্মে অবহেলা করে "ধর্ম" পালন করি। কিন্তু ইসলামের মূলনীতি অনুসারে সকল চাকুরীজীবি, কর্মকর্তা, কর্মচারী, শ্রমিক বা কর্মীর জন্য ফরয আইন দায়িত্ব হলো তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পরিপূর্ণ আমানতদারির সাথে আদায় করা। অনেক টাকা ঘুষ, পুরস্কার বা প্রমোশনের লোভে যেরূপ নিষ্ঠার সাথে ও দ্রুত কাজ করা হয়, কোনোরূপ ঘুষ, পুরস্কার বা প্রমোশনের লোভ ছাড়াই ঠিক তদ্রূপ নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করা ফরয আইন ইবাদত। ডাক্তার, অফিসার, কর্মকর্তা, কর্মচারী, শ্রমিক প্রত্যেকেই এরূপ কর্মের কারণে তার উপার্জনের বৈধতা অর্জন ছাড়াও ফরয ইবাদত পালনের সাওয়াব অর্জন করবেন। আর এরূপ ইবাদতে অবহেলা করে যদি কেউ নফল নামায, যিকর, কুরআন তিলাওয়াত, ওয়াজ মাহফিল বা অনুরূপ কোনো কর্মে লিপ্ত হন তা কঠিন গোনাহের কাজ এবং বকধার্মিকতা মাত্র। মহান আল্লাহ আমাদেরকে দীনের বিষয়ে সঠিক জ্ঞান ও পালনের আগ্রহ প্রদান করুন। আমীন।

---

[১] ইবনু মাজাহ, আস-সুনান ২/৮১৭; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৪/৯৮; আলবানী, সহীহুত তারগীব ২/১৮৩। হাদীসটি সহীহ।

[২] আবূ দাউদ, আস-সুনান ৪/৩৪১; আলবানী, সহীহ ও যায়ীফ আবী দাউদ ১১/১৬৪। হাদীসটি সহীহ।

[৩] বুখারী, আস-সহীহ ১/৩০৪, ৪৩১, ২/৮৪৮, ৯০১, ৯০২, ৩/১০১০; মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৪৫৯।

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

أَمَّا بَعْدُ، فَيَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ، قَالَ اللهُ تَعَالَىَ: يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ

عَلِيمٌ

وَقَالَ اللهُ تَعَالى: فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْضَلُ الْكَسْبِ بَيْعٌ مَبْرُورٌ وَعَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ

بَارَكَ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ فِيْ الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ. وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ. أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ، فَاسْتَغْفِرُوْهُ وَتُوْبُوْا إِلَيْهِ، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.

রজব মাসের ৩য় খুতবা: বিবাহ ও পরিবার

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লী আলা রাসূলিহীল কারীম। আম্মা বাদ,

সম্মানিত উপস্থিতি, আজ রজব মাসের ৩য় জুমুআ। আজ আমরা বিবাহ ও পরিবার বিষয়ে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ। কিন্তু তার আগে আমরা এ সপ্তাহের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসগুলির বিষয়ে সংক্ষেপ আলোকপাত করি। হাযেরীন, আজ ইংরেজী ..... মাসের ..... তারিখ। এ সপ্তাহের দিবসগুলির মধ্যে রয়েছে .... ।

সম্মানিত উপস্থিতি, বস্তুত মানব সভ্যতার মূল উপাদান "মানুষ"। আর পরিবারের মাধ্যমেই মানুষের জন্ম ও সংরক্ষণ। পরিবার গঠিত হয় বিবাহের মাধ্যমে। বিবাহ ও পরিবারই মানব সমাজের মূল ভিত্তি এবং পরিবারের অস্তিত্বের উপরেই নির্ভর করে মানব সভ্যতার অস্তিত্ব। অতীতে বিভিন্ন সমাজে ধর্মের নামে বিবাহ ও পরিবার গঠন এবং পরিবারের সদস্যদের প্রতি দায়িত্ব পালনকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। পক্ষান্তরে আধুনিক যুগে সভ্যতা, নারী অধিকার, নারীর ক্ষমতায়ন, সমঅধিকার ইত্যাদির নামে এবং সর্বোপরি অশ্লীলতার প্রসারের কারণে বিবাহ ও পরিবার গঠনের আগ্রহ কমে গিয়েছে। উপরন্তু গঠিত পরিবারের বিচ্ছেদ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বস্তুত আধুনিক ভোগবাদী সভ্যতায় বিবাহ ও পরিবারের অস্তিত্ব প্রায় বিপন্ন। যে জনগোষ্ঠী যত "সভ্য" বা যত "উন্নত" হচ্ছে সে সমাজের মানুষদের মধ্যে বিবাহ ও পরিবার গঠনের প্রবণতা তত হ্রাস পাচ্ছে। এনকার্টা এনসাইক্লোপিডীয়ার তথ্য থেকে দেখা যায় যে, ১৯৭০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ ছিল বিবাহিত পরিবার এবং ২০ ভাগ ছিল অবিবাহিত নারী বা পুরুষ। অথচ ২০০০ সালে মাত্র ৬০ ভাগ মানুষ বিবাহিত পরিবার। এদের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি সন্তানবিহীন। আর বাকী প্রায় ৪০ শতাংশ মানুষ পরিবার বিহীন একক নারী বা পুরুষ। সকল শিল্পোন্নত দেশেরই একই অবস্থা। পারিবাকি কাঠামো ভেঙ্গে পড়া ও পরিবার-বিহীন মানুষের সংখ্যা এভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার অর্থই দু-এক শতাব্দীর মধ্যে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর বিলুপ্তি।

হাযেরীন, আল্লাহ মানুষের প্রকৃতিতে যা কিছু দান করেছেন সবই তাঁর রহমত ও এ বিশ্বকে আবাদ করার জন্য মানুষের প্রতি তাঁর দান। এগুলির সুষ্ঠ ও প্রকৃতি সম্মত ব্যবহারই এ পৃথিবীর শান্তিও মানব সভ্যতার স্থায়িত্বের পথ। আর মানব প্রকৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ ও সন্তান-সন্ততির প্রতি আকর্ষণ। মানুষের জৈবিক ও মানসিক এ উভয় আগ্রহের প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক পরিণতি হলো পরিবার গঠন। এজন্য বিবাহের মাধ্যমে পরিবার গঠনকে ইসলামে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত ও আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্যলাভের অন্যতম পথ হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন:

وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

"তোমাদের মধ্যে যারা সঙ্গীবিহীন পুরুষ বা মহিলা তোমরা তাদেরকে বিবাহ দাও এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা সৎ-যোগ্য তাদেরকেও। তারা অভাবগ্রস্থ হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দিবেন। আল্লাহ তো প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। আর যাদের বিবাহের সামর্থ নেই, আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে অভাবমুক্ত না করা পর্যন্ত যেন তারা সংযম অবলম্বন করে... ।"[১] রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ

[১] সূরা নূর ৩২-৩৩ আয়াত।

يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

"হে যুবকের দল, তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহের দায়িত্বাদি পালন করতে সক্ষম তারা যেন বিবাহ করে, কারণ বিবাহ তার চক্ষুকে অধিকতর সংযত করবে এবং তার যৌন অংগকে অধিকতর সংযত-সংরক্ষিত রাখবে। আর যে তাতে সক্ষম হবে না সে যেন সিয়াম পালন করে, কারণ রোযা তাকে সংযত করবে।[১]

বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বিবাহের গুরুত্ব জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ

"বিবাহ আমার সুন্নাত বা রীতি। কাজেই যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত অনুযায়ী কর্ম করবে না সে আমার সাথে সম্পর্কিত নয়। তোমরা বিবাহ করো, কারণ আমি আমার উম্মতের বর্ধিত সংখ্যা দিয়ে অন্যান্য জাতির কাছে গৌরব প্রকাশ করব।"[২]

মুহতারাম হাযেরীন, ইবাদত-বন্দেগীর আগ্রহে বিবাহ সংসার বর্জন করা একটি প্রাচীন প্রবণতা। যুগে যুগে অগণিত আবেগী ধার্মিক মানুষ আল্লাহর ইবাদতের একাগ্রতার ক্ষেত্রে বিবাহ সংসারকে বাঁধা মনে করেছেন এবং বৈরাগ্যকে উৎসাহ দিয়েছেন এবং উচ্চমার্গের ধার্মিকতা বলে গণ্য করেছেন। হিন্দু, বৌদ্ধ ও খৃস্টান ধর্মে এভাবে পরিবারগঠন নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। বাইবেলে যীশু খৃস্ট বিবাহ না করে "স্বর্গরাজ্যের নিমিত্ত নপুংসক (eunuch)" হয়ে থাকার জন্য উৎসাহ দিয়েছেন। (মথি ১৯/৯-১২) যীশু তাঁর নিমিত্ত, স্বর্গের নিমিত্ত পিতা, মাতা, বাড়িঘর, ভাইবোন, স্ত্রী ও সন্তানদেরকে পরিত্যাগ করতে উৎসাহ দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, যদি কেউ এভাবে পিতামাতা, স্ত্রী-সন্তান ইত্যাদি পরিত্যাগ করতে পারে তবে স্বর্গে সে ১০০ গুণ বেশি পিতামাতা স্ত্রীপুত্র ও সম্পদ লাভ করবে এবং অনন্ত জীবন লাভ করবে।[৩] প্রচলিত খৃস্টধর্মের প্রতিষ্ঠাতা সাধু পৌল বিবাহ না করা উত্তম বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন: "অতএব যে আপন কুমারী কন্যার বিবাহ দেয়, সে ভাল করে; এবং যে না দেয়, সে আরও ভাল করে।"[৪]

ইসলামে এ প্রবণতার কঠোর বিরোধিতা করা হয়েছে। বিভিন্ন হাদীসে বৈরাগ্যকে নিষেধ করা হয়েছে এবং বিবাহ-সংসার করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রসিদ্ধ সাহাবী উসমান ইবনু মাযঊন (রা) এক পর্যায়ে সংসার পরিত্যাগ করে বৈরাগ্য অবলম্বনের সিদ্ধান্ত নেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

يَا عُثْمَانُ إِنِّي لَمْ أُومَرْ بِالرَّهْبَانِيَّةِ أَرَغِبْتَ عَنْ سُنَّتِي قَالَ لا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ مِنْ سُنَّتِي أَنْ أُصَلِّيَ وَأَنَامَ وَأَصُومَ وَأَطْعَمَ وَأَنْكِحَ وَأُطَلِّقَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.

"উসমান, আমাকে বৈরাগ্যের নির্দেশ দেওয়া হয়নি, তুমি কি আমার সুন্নাতকে অপছন্দ করছ? তিনি বলেন: না, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি আপনার সুন্নাতকে অপছন্দ করছি না। রাসূলে আকরাম (ﷺ) বলেন : আমার সুন্নাতের মধ্যে রয়েছে যে, আমি রাতে তাহাজ্জুদ পড়ি আবার ঘুমাই, কখনো নফল রোযা রাখি, কখনো রাখিনা, বিবাহ করি, আবার বিবাহ বিচ্ছেদও করি। যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে অপছন্দ করবে তার সাথে আমার সম্পর্ক নেই।"[৫]

বস্তুত, ইসলামের দৃষ্টিতে শুধু আল্লাহর স্মরণ, প্রার্থনা, যপতপ, যিকর-ওযীফা, নামায-রোযা এগুলিই ইবাদত নয়; উপরন্তু বিবাহ করা, স্ত্রীর সাথে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করা, খেলাধুলা হাসিতামাশা করা, স্ত্রী-

---

[১] বুখারী, আস-সহীহ ২/৬৭৩, ৫/১৯৫০; মুসলিম, আস-সহীহ ২/১০১৮-১০১৯।
[২] ইবনু মাজাহ, আস-সুনান ১/৫৯২; বূসীরী, মিসবাহুয যুজাজা ২/৯৪; আলবানী, সহীহুল জামি ২/১১৫১। হাদীসটি সহীহ।
[৩] বাইবেল, নতুন নিয়ম: মথি ১৯/২৯, মার্ক ১০/২৯-৩০, লুক ১৮/২৯-৩০।
[৪] বাইবেল, নতুন নিয়ম, ১ করিন্থীয় ৭/১-৪০।
[৫] দারেমী, আস-সুনান ২/১৭৯; আলবানী, আস-সহীহাহ ১/৩৯৩। হাদীসটি সহীহ।

সন্তানদের ভরণপোষণের জন্য কর্ম ও উপার্জন করা সবই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের অন্যতম কর্ম ও গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। একমাত্র এই বিশ্বজনীন মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমেই মানব সভ্যতা টিকিয়ে রাখা সম্ভব।

প্রিয় ভাইয়েরা, বিবাহের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম বিষয় হলো পাত্র ও পাত্রী পছন্দ করা। বিভিন্ন যোগ্যতার ভিত্তিতে এই পছন্দ হতে পারে। ইসলামে নৈতিক দৃঢ়তা ও সততা-ধার্মিকতাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কারণ, পরিবার অর্থই স্বামী-স্ত্রী উভয়কে উভয়ের জন্য কিছু ত্যাগ করতে হবে, কিছু ছাড় দিতে হবে এবং সন্তানদের জন্য উভয়েরই কিছু ত্যাগ করতে হবে। সাধারণভাবে মানুষ প্রকৃতগতভাবেই এরূপ করেন, তবে পারিবারিক জীবনের সুদীর্ঘ সময়ে অগণিত মুহূর্ত আসে যখন একমাত্র ধর্মীয় আবেগ ও আখিরাতের সাওয়াবের প্রেরণাই পরিবার টিকিয়ে রাখে। এ ছাড়া দম্পতির সামগ্রিক ধর্মীয় জীবন এবং সন্তানদের সঠিক প্রতিপালনের জন্য স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে "তাকওয়া"র গুণটির দিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। পাত্র বা পাত্রপক্ষকে লক্ষ্য করে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ

"একজন মেয়েকে চারিটি বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে বিবাহ করা হয়: তার সম্পদের কারণে, তার বংশমর্যাদার কারণে, তার সৌন্দর্যের কারণে এবং তার ধার্মিকতার কারণে। তুমি ধার্মিক মেয়েকে বেছে নিয়ে সফলতা অর্জন কর।"[১]

অপরদিকে পাত্রীপক্ষকে নির্দেশ দিয়ে তিনি বলেছেন,

إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ

"যদি এমন কোনো পাত্র তোমাদেরকে প্রস্তাব দেয় যার সততা-ধার্মিকতা এবং ব্যবহার-আচরণ তোমাদের নিকট সন্তোষজনক, তাহলে তোমরা তাকে বিবাহ দিবে। যদি তোমরা তা না কর তাহলে পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা এবং বিস্তৃত অশান্তি হবে।"[২]

মুহতারাম হাযেরীন, বিবাহের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করার ক্ষেত্রে হাদীসের আলোকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুই কাজ হলো, প্রথমত, পাত্র কর্তৃক কনে দেখা এবং দ্বিতীয়ত, আল্লাহর দরবারে ইসতিখারা করা। বিবাহের ক্ষেত্রে পাত্রপাত্রীর সাক্ষাত ও দেখাশুনার উৎসাহ দেওয়া হয়েছে হাদীসে। মেয়ের মাহরামদের উপস্থিতিতে ইসলামী শালীনতার মধ্যে পাত্র পাত্রীকে দেখবে বা উভয়ে কথাবার্তার মাধ্যমে তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ

"যদি তোমাদের কেউ কোনো মেয়েকে বিবাহের প্রস্তাব দেয় এবং বিবাহের আকর্ষণ ও আগ্রহ সৃষ্টির জন্য সে মেয়েটিকে দেখা তার জন্য সম্ভব হয় তাহলে যেন সে তা করে।"[৩]

এ অর্থে আরো অনেক হাদীস রয়েছে। এক্ষেত্রে যা বিশেষরূপে লক্ষণীয় তা হলো, এই সাক্ষাত ও দেখা শুধুমাত্র পাত্রের জন্য। পাত্রপক্ষের মহিলারা যে কোনো সময় পাত্রীকে দেখতে পারেন। কিন্তু পাত্রের পক্ষ থেকে পাত্রের পিতা, ভগ্নিপতি, বন্ধু বা পাত্রের কোনো পুরুষ আত্মীয়ের জন্য পাত্রী দেখা সম্পূর্ণ হারাম ও ইসলাম বিরোধী প্রচলন। পাত্রী দেখা তো চূড়ান্ত ব্যক্তিগত পছন্দের জন্য। কাজেই পিতা, ভগ্নিপতি বা অন্যের পছন্দে পাত্রের বিবাহ শুধু ইসলাম বিরোধীই নয় অযৌক্তিক ও অমানবিকও বটে।

সম্মানিত মুসল্লীবৃন্দ, বিবাহের ক্ষেত্রে অভিভাবকের মতামতের পাশাপাশি পাত্রী বা কনের

[১] মুসলিম, আস-সহীহ ২/১০৮৬।

[২] তিরমিযী, আস-সুনান ৩/৩৯৪; আলবানী, সহীহ ওয়া যায়ীফ সুনানিত তিরমিযী ৩/৮৪-৮৫। হাদীসটি হাসান।

[৩] আবূ দাউদ, আস-সুনান ২/২২৮; বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা ৭/৮৪; আলবানী, সাহীহাহ ১/৯৮-৯৯; সহীহুল জামি ১/১৪৯। হাদীসটি সহীহ।

মতামতকে পরিপূর্ণ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে ইসলামে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا

"অবিবাহিত বা স্বামী বিহীন মহিলার তার নিজের বিষয়ে তার অভিভাবকের চেয়ে বেশি হকদার। আর কুমারী মেয়েরও অনুমতি গ্রহণ করতে হবে। তার নীরবতাও অনুমতি।"[১]

সাধারণভাবে যৌবনের শুরুতে যুবক-যুবতী সহজেই বয়সের উন্মাদনায় বিভ্রান্ত হয় এবং নিজের চোখের ভাললাগার উপরে নির্ভর করেই সঙ্গী পছন্দ করে। আমরা দেখেছি যে, বিবাহের ক্ষেত্রে চোখের পছন্দের পাশাপাশি ভবিষ্যত জীবন ও আগত প্রজন্মের কল্যাণের কথাও চিন্তা করতে হবে। এজন্য ইসলামে বিবাহের ক্ষেত্রে পাত্রপাত্রীর মতামতের সাথে অভিভাবকদের মতামতেরও গুরত্ব দেওয়া হয়েছে।

প্রিয় উপস্থিতি, যে কোনো স্থানেই বিবাহ অনুষ্ঠিত হতে পারে। তবে মসজিদে বিবাহ অনুষ্ঠানের উৎসাহ দেওয়া হয়েছে হাদীসে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ.

"তোমরা এ বিবাহের প্রচার করবে এবং তা মসজিদে অনুষ্ঠিত করবে এবং এজন্য দফ বাজাবে।"[২]

পাত্রের উপর ফরয হলো স্ত্রীকে 'মোহর' প্রদান করা। বিবাহের ফলে মেয়েকেই স্বামীর ঘরে আসতে হয়। এজন্য স্বামীর পক্ষ থেকে সদিচ্ছা, সচ্ছলতা ও ভালবাসার প্রতীক হলো এই 'মোহরানা'। কুরআন ও হাদীসে এ বিষয়ে বারংবার মোহরানা প্রদানের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন:

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

"তোমরা স্ত্রীদের মোহরানা আনন্দিত চিত্তে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে প্রদান করবে। যদি তারা সন্তুষ্ট চিত্তে মোহরের কিয়দংশ ছেড়ে দেয় তাহলে তোমরা তা স্বচ্ছন্দে ভোগ করবে।"[৩]

মোহর একান্তই কনের পাওনা এবং মোহর ধার্য করার জন্য নয়, প্রদান করার জন্য। বিবাহের সময় মোহর দিয়ে দেওয়াই উত্তম। প্রয়োজনে পুরোটা বা আংশিক মোহর বাকি করা জায়েয। স্ত্রীকে মোহর পরিশোধ করার পরে তিনি যদি তার কিছু স্বামীকে প্রদান করেন তা ভোগ করা বৈধ। তবে মোহর পরিশোধ না করা বা শুধুমাত্র ধার্য করার জন্য ধার্য করা বৈধ নয়। অনুরূপভাবে পরিশোধ না করে স্ত্রীর কাছে বাসর রাতে বা অন্য কোনো সময়ে মোহরানা মাফ চাওয়াও কোনোভাবে বৈধ নয়। এরূপ মাফ করলেও মাফ হবে না। কারণ আল্লাহ বলেছেন যে, পরিশোধের পরে পরিপূর্ণ সন্তুষ্ট চিত্তে যদি তারা স্বামীকে কিছু দেন তবে তা স্বামী ভোগ করতে পারে। পরিশোধের আগে বা চাপ দিয়ে কিছু নেওয়ার সুযোগ নেই। যদি কেউ স্ত্রীর মোহর ও অন্যান্য হক্ক পরিপূর্ণরূপে প্রদানের নিয়্যাত ছাড়া বিবাহ করে এবং স্ত্রীর অধিকার আদায় না করে মৃত্যুবরণ করে তবে সে ব্যভিচারী হয়ে কিয়ামতে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে বলে হাদীস শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে। বাসর রাতে মাফ নেওয়ার নিয়্যাতে মোহর নির্ধারণ করাও এ পর্যায়ের।[৪]

মোহরের পরিমাণ হবে বর ও কনে উভয়ের আর্থ-সামাজিক অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। মোহর যেন বরের পক্ষে প্রদান করা সম্ভব এবং কনের সামাজিক সম্মান ও মর্যাদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। আয়েশা (রা) বলেন, "রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রীগণের মোহর ছিল সাড়ে বার উকিয়া

---

[১] মুসলিম, আস-সহীহ ২/১০৩৭।
[২] তিরমিযী, আস-সুনান ৩/৩৯৮। তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।
[৩] সূরা নিসা: ৪ আয়াত।
[৪] মাকদিসী, আল-মুখতারা ৮/৭১; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৪/১৩১-১৩২, ২৮৪-২৮৫; আলবানী, সহীহুত তারগীব ২/১৬৭। হাদীসটি সহীহ।

রৌপ্য।"[১] আলী (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, ফাতিমা (রা)- কে বিবাহ করার সময় তার কাছে কোনো নগদ অর্থ ছিল না। তিনি তাঁর মূল্যবান বর্মটি বার উকিয়া রৌপে বিক্রয় করে তা মোহর হিসাবে প্রদান করেন। কোনো কোনো বর্ণনায় রৌপ্যমূদ্রায় বর্মটির মূল্য ৪৮০ দিরহাম ছিল বলে জানা যায়।[২] ৪৮০ দিরহামে ১৭০০ গ্রাম রৌপ্য যা তৎকালীন সময়ে ২৪২ গ্রাম স্বর্ণের সমমূল্য ছিল। ৫ উকিয়া বা ৬০০ গ্রাম রৌপ্য বা ৮৫ গ্রাম স্বর্ণ হলো যাকাতের নিসাব। ৬০০ গ্রাম রৌপ্য বা ৮৫ গ্রাম স্বর্ণের মালিক সে সময়ে ধনী বলে গণ্য ছিলেন। সে সময়ে ১৭০০ গ্রাম রৌপ্য বা ২৪২ গ্রাম স্বর্ণ মহর হিসেবে সম্মানজনক অঙ্ক ছিল।

হাযেরীন, নবদম্পতিকে দুআ করা সুন্নাত। কারো বিবাহের কথা জানলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন:

بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي الْخَيْرِ.

'আল্লাহ তোমার জন্য বরকত দিন, তোমার উপরে বরকত দিন এবং তোমাদের উভয়কে কল্যাণের মধ্যে একত্রিত রাখুন।'[৩]

হাযেরীন, বাসর রাতই দম্পতির জীবনের শ্রেষ্ঠতম আনন্দঘন রাত। মানবীয় প্রকৃতির স্বাভাবিক প্রেরণায় নবদম্পতি পরস্পরকে আপন করে নেবে। তবে শুরুতেই দুআ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে হাদীস শরীফে। বর তার নববধুর মাথার সম্মুখভাগে হাত রেখে আল্লাহর নাম নেবে এবং আল্লাহর কাছে নববধুর কল্যাণ কামনা করে এবং সকল অকল্যাণ থেকে আশ্রয় চেয়ে দুআ করবে। এছাড়া আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) ও অন্যান্য সাহাবী পরামর্শ দিয়েছেন যে, স্বামী নববধুকে পিছনে নিয়ে একত্রে দু রাক'আত সালাত আদায় করে আল্লাহর কাছে সম্প্রীতি, বরকত ও কল্যাণের জন্য দোয়া করবে।

মুহতারাম হাযেরীন, বিবাহ পরবর্তী অন্যতম বিষয় হলো ওলীমা। আমাদের দেশে 'বৌ-ভাত' নামে অনুষ্ঠান করা হয় এবং তাতে নববধুকে সাজিয়ে রাখা হয়। এতে ইসলামের পর্দার ফরয বিধানকে নগ্নভাবে পদদলিত করা হয়। ইসলামী ওলীমা বৌ প্রদর্শনী নয়। ওলীমা হলো নববধুর আগমন উপলক্ষে তার সম্মানে বর কতৃক তার আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুদেরকে পানাহারের মাধ্যমে আপ্যায়ন করা ও আনন্দে শরীক করা। সাধ ও সাধ্যের সমন্বয়েই ওলীমা হবে। তবে ওলীমার ক্ষেত্রে শুধু ধনী মানুষদের দাওয়াত দেওয়া ও গরীবদের বাদ দেওয়াকে হাদীস শরীফে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

হাদীসে ওলীমার জন্য বরকে বিশেষভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এজন্য অনেক ফকীহ ওলীমা ওয়াজিব বলেছেন। তবে অধিকাংশ ফকীহ ওলীমা সুন্নাত বলে উল্লেখ করেছেন। বুরাইদা (রা) বলেন,

لَمَّا خَطَبَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ بُدَّ لِلْعُرْسِ (لِلْعَرُوْسِ) مِنْ وَلِيْمَةٍ فَقَالَ سَعْدٌ عَلَيَّ كَبْشٌ وَقَالَ فُلاَنٌ عَلَيَّ كَذَا وَكَذَا مِنْ ذُرَةٍ

"যখন আলী (রা) ফাতেমা (রা) কে বিবাহ করার প্রস্তাব দিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, বিবাহে উপলক্ষে বা কনের আগমন উপলক্ষ্যে একটি ওলীমা করা অত্যাবশ্যক। তখন সা'দ (রা) বলেন, আমি একটি ভেড়া প্রদানের দায়িত্ব গ্রহণ করলাম। আরেক জন বলেন, আমি এই পরিমান ভুট্টা প্রদান করব...।"[৪]

এ হাদীস থেকে ওলীমার গুরুত্ব ছাড়াও আমরা জানতে পারছি যে, প্রয়োজনে পাত্রকে ওলীমার আয়োজনে মাংস, খাদ্য ও আর্থিক সাহায্য করা পাত্রের আত্মীয় ও বন্ধুদের জন্য একটি সুন্নাত সম্মত দায়িত্ব।

---

[১] মুসলিম, আস-সহীহ ২/১০৪২।
[২] হাইসামী, মাজমউয যাওয়াইদ ৪/২৮৩।
[৩] তিরমিযী, আস-সুনান ৩/৪০০। তিরমিযী বলেন হাদীসটি হাসান সহীহ।
[৪] হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৪/৪৯, ৯/২০৯। সনদ গ্রহণযোগ্য।

সম্মানিত উপস্থিতি, মোহর ও ওলীমা উভয়ই পাত্র বা বরের দায়িত্ব। বিবাহে কনে বা কনের পিতার কোনো আর্থিক দায়ভার নেই। কনের পিতা ইচ্ছা করলে মেয়েকে কিছু হাদীয়া দিতে পারেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ফাতেমাকে (রা) যখন আলীর (রা) ঘরে প্রেরণ করেন তখন তার সাথে একটি মোটা চাদর, একটি তাকিয় জাতীয় গদি এবং একটি পানির পাত্র প্রদান করেন বলে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।[১]

বিবাহ উপলক্ষে যে কোনোভাবে কনের পিতার নিকট থেকে বা কনের নিকট থেকে দাবি করে বা চাপ দিয়ে কোনোরূপ আর্থিক সুবিধা বা উপহার গ্রহণ করাই যৌতুক, যা ইসলামে নিষিদ্ধ জুলুম ও অবৈধ উপার্জনের অন্যতম। এমনকি কনের পিতার ইচ্ছার অতিরিক্ত বরযাত্রী যাওয়া, বরযাত্রীদেরকে আপায়নের ক্ষেত্রে বিশেষ খাবারের দাবি করা বা অনুরূপ সকল দাবিও জুলুম ও যৌতুকের অংশ।

হাযেরীন, বিবাহে আনন্দ করার অনুমতি ও উৎসাহ দিয়েছেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)। এ উপলক্ষ্যে দফ বাজাতে ও সাধারণ গজল-গীত গাইতে অনুমতি দিয়েছেন। ওলীমার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু এ সকল অনুষ্ঠান সবই অবশ্যই অপচয়, অশ্লীলতা, বেপর্দা ও অন্যান্য ধ্বংসাত্মক পাপ থেকে মুক্ত হতে হবে। পাশ্চাত্য ও ভারতীয় সাংস্কৃতির আগ্রাসনে আজ আমাদের সমাজের অধিকাংশ বিবাহই হচ্ছে কঠিন খোদাদ্রোহিতা ও ভয়ঙ্কর পাপের মধ্য দিয়ে। আমরা দেখেছি যে, আল্লাহ পর্দা ফরয করেছেন এবং একজন মহিলার জন্য মাথা, চুল, কান, ঘাড়, গলা বা দেহের অন্য কোনো অংশ অনাবৃত করে বাইরে বা অনাত্মীয় বা দূরাত্মীয়দের সামনে যাওয়া ব্যভিচারের মতই কঠিনতম কবীরা গোনাহ। অথচ মুসলিম পরিবারগুলির বিবাহে মহিলারা দেহ ও শাড়ি-গহনা প্রদর্শনের ভয়ঙ্কর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হন। সম্পূর্ণ বেপর্দাভাবে বরকনেকে মিষ্টি খাওয়ানো, গান-বাজনা, ব্যাণ্ড শো, ভিডিও ফিল্ম তৈরি ইত্যাদি কঠিন হারামকাজগুলি একসাথে আমরা করি। অনেক দীনদার মানুষ বা পর্দানশীন মহিলাও এ সব অনুষ্ঠানে এরূপ কঠিনতম হারাম কাজে লিপ্ত হন। দেখে মনে হয়, মুসলিমরা এদিনের জন্য আল্লাহর সাথে বিদ্রোহ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। হাযেরীন, পাপ আমরা জীবনে করে ফেলি। কিন্তু দাম্পত্য জীবনের শুরুই যদি হয় খোদাদ্রোহিতা দিয়ে কিভাবে আমরা এ পরিবারের জন্য বরকত বা সফলতা আশা করতে পারি। আল্লাহ বলেন:

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ

"যারা পছন্দ করে যে, মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার ঘটুক তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দুনিয়াতে এবং আখিরাতে।"[২]

হাযেরীন, আমরা যারা এরূপ ভয়ঙ্কর অশ্লীলতার প্রসারের মাধ্যমে নিজেদের বা নিজ সন্তানদের দাম্পত্য জীবন শুরু করলাম, আমরা কিভাবে ভাবতে পারি যে, আমাদের এ দাম্পত্য জীবনে কোনো না কোনো ভাবে এ যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি নেমে আসবে না। আল্লাহ তাঁর ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। পরিবার মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতের অন্যতম ঠিকানা। পরিবারের শুরু বিবাহের মাধ্যমে। বাকী জীবনের সকল ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর রহমত, বরকত ও তাওফীক লাভের জন্য আমাদেরকে অবশ্যই বিবাহকে সকল প্রকার পাপ, বেহায়াপনা, অশ্লীলতা, জুলুম ও যৌতুক থেকে হেফাজত করতে হবে। সাময়িক স্বার্থের কারণে এ সকল পাপ দিয়ে বিবাহ শুরু করলে দম্পতির পরবর্তী জীবন সফলতার আশা করা বাতুলতা। কোনো বিবাহ বা ওলীমা অনুষ্ঠানে এরূপ শরীয়ত বিরোধী বা হারাম কর্ম হলে সে অনুষ্ঠানে যোগ না দিতে এবং সাধ্যমত প্রতিবাদ করতে নির্দেশ দিয়েছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ। আল্লাহ আমাদেরকে হেফাযত করুন। আমীন।

---

[১] হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৯/২১০, বাইহাকী, শুআবুল ঈমান ৭/৩১৭।

[২] সূরা নূর ১৯ আয়াত।

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

أَمَّا بَعْدُ، فَيَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ، قَالَ اللهُ تَعَالَىَ: وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا

فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الأُمَمَ

وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ

بَارَكَ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ فِيْ الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ. وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ. أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ، فَاسْتَغْفِرُوْهُ وَتُوْبُوْا إِلَيْهِ، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.

রজব মাসের ৪র্থ খুতবা: ইসরা ও মি'রাজ

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লী আলা রাসূলিহীল কারীম। আম্মা বাদ,

সম্মানিত উপস্থিতি, আজ রজব মাসের ৪র্থ জুমুআ। আজ আমরা ইসরা ও মি'রাজ বিষয়ে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ। কিন্তু তার আগে আমরা এ সপ্তাহের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসগুলির বিষয়ে সংক্ষেপ আলোকপাত করি। হাযেরীন, আজ ইংরেজী ..... মাসের ..... তারিখ। এ সপ্তাহের দিবসগুলির মধ্যে রয়েছে .... ।

হাযেরীন, মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয়তম রাসূল ﷺ-কে যত মুজিযা দিয়েছেন সেগুলির অন্যতম এক মুজিযা হলো ইসরা ও মি'রাজ। "ইসরা" অর্থ "নৈশ-ভ্রমন" বা "রাত্রিকালে ভ্রমণ করানো।" আর "মি'রাজ" অর্থ "উর্ধ্বারোহণ" বা "উর্ধ্বারোহণের যন্ত্র"। মহান আল্লাহ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এক রাত্রিতে মক্কা মুআজ্জামা থেকে ফিলিস্তিনের 'আল-মাসজিদুল আকসা' পর্যন্ত নিয়ে যান। এরপর সেখান থেকে উর্ধ্বে ৭ আসমান ভেদ করে তাঁর নৈকট্যে নিয়ে যান। মক্কা শরীফ থেকে আল-মাসজিদুল আকসা পর্যন্ত ভ্রমণকে "ইসরা" এবং সেখান থেকে উর্ধ্বে গমনকে মি'রাজ বলা হয়।

হাযেরীন, মিরাজের ঘটনা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনের অত্যতম ঘটনা। কুরআন কারীমে একাধিক স্থানে এ ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। সূরা বনী ইসরাঈলের শুরুতে ইসরার ঘটনা বর্ণনা করে আল্লাহ বলেন:

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا

"পবিত্র তিনি যিনি তাঁর বান্দাকে রজনীযোগে ভ্রমন করিয়েছেন মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসা পর্যন্ত, যার পরিবেশ আমি করেছিলাম বরকতময়, তাকে আমার নিদর্শন দেখাবার জন্য।"[১]

এরপর আল্লাহ মূসা (আ)-কে কিতাব প্রদান, ইহূদীদের দায়িত্ব এবং ইহূদীদের পাপাচারের কারণে দুবার আল-মাসজিদুল আকসা ধ্বংসের কথা উল্লেখ করেন। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, খৃস্টপূর্ব ১০০০ সালের দিকে সূলাইমান (আ)-এর মাসজিদুল আকসা নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়। সুলাইমান (আ)-এর পরে ইহূদীরা মুর্তিপূজা, যুদ্ধবিগ্রহ ও পাপচারে লিপ্ত হয়। প্রায় ৪০০ বৎসর পরে খৃস্টপূর্ব ৫৮৬ সালে ব্যবিলনের সম্রাট নেবুকাদনেজার মসজিদে আকসা সমূলে ধ্বংস করে ইহূদীদের বন্দী করে ব্যবিলন নিয়ে যান। প্রায় ৭০ বৎসর পরে তারা মুক্ত হয়ে পুনরায় মসজিদ নির্মাণ করে। এরপর তাদের অবাধ্যতা ও পাপাচারের ধারা অব্যাহত থাকে। সর্বশেষ ৭০ খৃস্টাব্দে রোমান সম্রাট ভ্যাসপাসিয়ানের সময়ে তার পুত্র পরবর্তী সম্রাট টিটো এ মসজিদ সম্পূর্ণভাে ধ্বংস করেন।

বস্তুত মহান আল্লাহ হযরত ইবরাহীম (আ)-এর মাধ্যমে এ পৃথিবীতে তাওহীদের বাণী পুনরুজ্জীবিত করেন এবং তাকে মানব জাতির ইমামত বা নেতৃত্ব প্রদান করেন। আজ থেকে প্রায় সাড়ে ৪ হাজার বৎসর আগে, খৃস্টজন্মের প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে ইবরাহীম (আ) ইরাক, সিরিয়া, আরব, মিসর বা তৎকালীন সভ্য জগতে তাওহীদের প্রচার করেন। ইবরাহীম (আ)-এর বড় ছেলে ইসমাঈল (আ) ও ছোট ছেলে ইসহাক (আ)। আল্লাহ ইবরাহীম (আ)-কে প্রদত্ত এ নেতৃত্বের দায়িত্ব সাময়িকভাবে ইসহাকের ছেলে ইয়াকূব বা ইসরাঈল (আ)-এর বংশধরদেরকে প্রদান করেন, যারা বনী ইসরাঈল বা ইহূদী জাতি বলে প্রসিদ্ধ। মহান আল্লাহ এ জাতিকে অনেক বরকত ও করুণা দান করেন। যেরুশালেম বা বাইতুল মাকদিসকে তাওহীদের বরকতময় কেন্দ্র বানিয়ে দেন। হাজার হাজার নবী তথায় আগমন করেন। কিন্তু এ জাতি সর্বদা অবাধ্যতা ও পাপাচারে লিপ্ত হয়েছে। ফলে বারংবার

[১] সূরা ইসরা (বনী ইসরাঈল), ১ আয়াত।

আল্লাহ তাদের উপর গযব নাযিল করেন। সর্বশেষ আল্লাহ্ তাদের হাত থেকে মানবতার নেতৃত্ব কেড়ে নিয়ে ইবরাহীম (আ)-এর বড় ছেলে ইসমাঈল (আ)-এর বংশধরকে প্রদান করেন। যেরুশালেমকে মক্কার নেতৃত্বে দিয়ে দেওয়া হয়। আর এজন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ মি'রাজের মুবারক সফরের শুরুতে প্রথমে বাইতুল মাকদিস গমন করে সকল নবীর ইমাম হয়ে সালাত আদায় করেন। তাঁর উম্মাতের পক্ষ থেকে বিশ্ব মানবতার নেতৃত্ব গ্রহণ করার পর তিন মহান স্রষ্টার সান্নিধ্যে গমন করেন।

হাযেরীন, মি'রাজের বিষয় কুরআন কারীমে সূরা নাজমেও আল্লাহ উল্লেখ করেছেন। এ সূরার শুরুতে আল্লাহ বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ জীবরাঈল (আ) থেকে ওহী লাভ করেন এবং তিনি জিবরাঈল (আ)-কে তাঁর প্রকৃত আকৃতিতে দেখেছেন। এরপর মিরাজের রাত্রিতে সিদরাতুল মুনতাহার নিকট জিবরাঈলকে পুনরায় স্বআকৃতিতে দর্শন এবং আল্লাহর অবর্ণনীয় নিয়ামত দর্শনের বিষয়ে আল্লাহ বলেন:

أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى

"সে (মুহাম্মাদ ﷺ) যা দেখেছে তোমরা কি সে বিষয়ে তার সাথে বিতর্ক করবে? নিশ্চয়ই সে তাকে (জিবরীলকে) আরেকবার দেখেছিল। সিদরাতুল মুনতাহা-র (প্রান্তবর্তী বদরী বৃক্ষের) নিকট। যার নিকট অবস্থিত জান্নাতুল মা'ওয়া। যখন বৃক্ষটি যদ্বারা আচ্ছাদিত হবার তদ্বারা ছিল আচ্ছাদিত। তার দৃষ্টি বিভ্রম হয় নি, দৃষ্টি লক্ষ্যচ্যুতও হয় নি। সে তো তার প্রতিপালকের মহান নিদর্শনাবলি দেখেছিল।"[১]

হাযেরীন, হাদীস ও সীরাত বিষয়ক গ্রন্থে প্রায় ৪০ জন সাহাবী সহীহ বা যয়ীফ সনদে মিরাজের ঘটনার বিভিন্ন দিক ছোট বা বড় আকারে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু কোনো হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে মি'রাজের তারিখ সম্পর্কে একটি কথাও বর্ণিত হয়নি। সাহাবী-তাবিয়ীগণও তারিখ বিষয়ে তেমন কিছু বলেন নি। এসকল হাদীসের শিক্ষা গ্রহণই তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল। দিবস পালন তো দূরের কথা তারিখ জানার বিষয়ে তাদের আগ্রহ ছিল অতি সামান্য। ফলে তারিখের বিষয়ে পরবর্তী যুগের মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। মি'রাজ একবার না একাধিকবার সংঘঠিত হয়েছে, কোন্ বৎসর হয়েছে, কোন্ মাসে হয়েছে, কোন্ তারিখে হয়েছে ইত্যাদি বিষয়ে অনেক মতবিরোধ রয়েছে এবং প্রায় ২০টি মত রয়েছে। ফাতহুল বারী, উমদাতুল কারী, আল-মাওয়াহিবুল্লাদুনিয়্যাহ, শারুহুল মাওয়াহিব, তারিখে ইবন কাসীর, সীরাহ শামিয়্যাহ ইত্যাদি হাদীসের ব্যাখ্যাগ্রন্থ ও সীরাতুন্নাবী বিষয়ক যে কোনো মৌলিক আরবী গ্রন্থে আপনারা এ সকল মত দেখতে পারবেন।

কোনো কোনো আলিমের মতে যুলকাদ মাসে, কারো মতে রজব মাসের এক তারিখে, বা রজব মাসের প্রথম শুক্রবারে এবং কারো মতে রজব মাসের ২৭ তারিখে মিরাজ সংঘটিত হয়েছিল। তবে অধিকাংশ আলিমই বলেছেন যে, রবিউল আউয়াল মাসে মি'রাজ সংঘটিত হয়েছিল। তাবিয়ীদের মধ্যে ইমাম যুহরী ও উরওয়া ইবনুয যুবাইর থেকে এ মত বর্ণিত। ইবনু আবী শাইবা সংকলিত এক মুরসাল হাদীসে জাবির (রা) ও ইবনু আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখ সোমবার জন্মগ্রহণ করেন, এদিনেই তিনি নুবুওয়াত লাভ করেন, এ দিনেই তিনি মি'রাজে গমন করেন, এদিনেই তিনি হিজরত করেন এবং এদিনেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।[২]

হাযিরীন, মিরাজের বিস্তারিত ঘটনার বিশদ বর্ণনা অনেক সময়ের প্রয়োজন। মিরাজ বিষয়ক

---

[১] সূরা (৫৩) নাজ্‌ম: ১২-১৮।

[২] মুহাম্মাদ ইবনু ইউসূফ শামী, সুবুলুল হুদা (সীরাহ শামিয়্যাহ) ৩/৬৪-৬৬। আরো দেখুন ইবনু কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ২/৪৭০-৪৮০; কাসতালানী, আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যাহ ২/৩৩৯-৩৯৮; খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, হাদীসের নামে জালিয়াতি,. পৃ. ৪০৯।

সিহাহ সিত্তার হাদীসগুলি একত্রিত করেছেন ইমাম ইবনুল আসীর তাঁর "জামিউল উসূল" গ্রন্থে। এ ছাড়া এ বিষয়ক বিষয়ক প্রসিদ্ধ, অপ্রসিদ্ধ সহীহ-যয়ীফ সকল হাদীস সংকলন ও সমন্বয় করেছেন আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনু ইউসূফ শামী তার "সীরাহ শামিয়্যাহ" গ্রন্থে। এগুলির আলোকে সহীহ হাদীসের ভিত্তিতে মিরাজের সংক্ষেপ ঘটনা আমরা এখানে আলোচনা করব।

রাসূলুল্লাহ ﷺ কাবা ঘরের উত্তর পার্শে হাতীম-এর মধ্যে শুয়ে ছিলেন। এমতাবস্থায় জিবরাঈল (আ) কয়েকজন ফিরিশতা সহ তথায় আগমন করেন। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বক্ষের উপরিভাগ থেকে পেট পর্যন্ত কেটে তাঁর হৃৎপিণ্ড বের করেন, তা ধৌত করেন এবং বক্ষকে ঈমান, হিকমাত ও প্রজ্ঞা দ্বারা পরিপূর্ণ করেন এবং তাঁর হৃৎপিণ্ডকে পুনরায় বক্ষের মধ্যে স্থাপন করেন। এরপর "বুরাক" নামে আলোর গতি সম্পন্ন একটি বাহন তার নিকট আনয়ন করা হয়। তিনি এ বাহনে বাইতুল মাকদিস বা যেরুশালেমে গমন করেন। মহান আল্লাহ তথায় পূর্ববর্তী সকল নবী-রাসূলদেরকে সমবেত করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইমামতিতে তাঁরা তথায় দু রাক'আত সালাত আদায় করেন। এরপর "মি'রাজ" আনয়ন করা হয়। "মি'রাজ" অর্থ "ঊর্ধ্বারোহণ যন্ত্র"। এ যন্ত্রের প্রকৃতি সম্পর্কে হাদীসে শুধু এতটুকু বলা হয়েছে যে, এর সৌন্দর্য বর্ণনাতীত। তিনি মি'রাজে উঠে ঊর্ধ্বে গমন করেন এবং একে একে সাত আসমান অতিক্রম করেন। প্রথম আসমানে আদম (আ), দ্বিতীয় আসমানে ইয়াহইয়া (আ) ও ঈসা (আ), তৃতীয় আসমানে ইউসুফ (আ), চতুর্থ আসমানে ইদরীস (আ), পঞ্চম আসমানে হারূন (আ), ষষ্ঠ আসমানে মূসা (আ) এবং সপ্তম আসমানে ইবরাহীম (আ)-এর সাথে তাঁর সাক্ষাত, সালাম ও দুআ বিনিময় হয়। এরপর তিনি সৃষ্টিজগতের শেষ প্রান্ত "সিদরাতুল মুনতাহা" গমন করেন। তথা থেকে তিনি জান্নাত, জাহান্নাম ও মহান আল্লাহর অন্যান্য মহান সৃষ্টি পরিদর্শন করেন ও তাঁর সান্নিধ্য লাভ করেন। মহান আল্লাহর তাঁর উম্মাতের জন্য দৈনিক ৫০ ওয়াক্ত সালাতের বিধান প্রদান করেন। ফিরে আসার সময় মূসা (আ)-এর সাথে সাক্ষাত হলে তিনি প্রশ্ন করেন, আল্লাহ আপনাকে কী নির্দেশ দিলেন? তিনি বলেন, তিনি আমাকে দৈনিক ৫০ ওয়াক্ত সালাতের বিধান দিয়েছেন। মূসা (আ) বলেন, আমি আমার উম্মাতের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, আপনার উম্মাত এ বিধান মানতে পারবে না, আপনি মহান রবের কাছে ফিরে গিয়ে বিধানটি সহজ করার আবেদন করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর মহান রব্বের কাছে ফিরে যেয়ে আবেদন করেন। এতে আল্লাহর দশ রাক'আত কমিয়ে দেন। মূসা (আ) এবারো আপত্তি করেন এবং আরো সহজ করার জন্য আবেদনের পরামর্শ দেন। এভাবে মূসা (আ)-এর পরামর্শে রাসূলুল্লাহ ﷺ বারংবার আল্লাহর দরবারে কমানোর আবেদন করতে থাকেন এবং আল্লাহ প্রতিবার ১০ ওয়াক্ত করে কমাতে থাকেন। সর্বশেষ দশ থেকে কমিয়ে তিনি ৫ ওয়াক্ত নামায ফরয করেন এবং বলেন, আমার নির্দেশ বলবত থাকল, আমি আমার বান্দাদেরকে দশ গুণ সাওয়াব দিব। তারা ৫ ওয়াক্ত সালাতে ৫০ ওয়াক্তের সাওয়াব পাবে। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ মিরাজ থেকে প্রত্যাবর্তন করেন।

হাযেরীন, মিরাজে গমন ও প্রত্যাবর্তনের সময় এবং জান্নাত-জাহান্নামে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বিভিন্ন পাপ ও পুন্যের বিভিন্ন প্রকার শাস্তি ও পুরস্কার দেখানো হয়। এক পর্যায়ে তিনি অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর সুগন্ধের ঘ্রাণ লাভ করেন। তিনি বলেন, জিবরাঈল, এটি কিসের সুঘ্রাণ। জিবরাঈল বলেন, এ হলো ফিরাউনের কন্যার চুল আঁচড়ানো দাসী ও তার সন্তানদের সুগন্ধ। দাসীটি ঈমানদার ছিল। একবার চুল আঁচড়ানোর সময় চিরুনী পড়ে গেলে সে বিসমিল্লাহ বলে তা তুলে নেয়। ফিরাউন-কন্যা বলে, আমার পিতার নাম নিয়েই না কর্ম শুরু করতে হবে! দাসীটি বলে, তোমার, আমার ও তোমার পিতার রব্ব আল্লাহর নামে। ফিরাউন-কন্যা ক্রোধান্বিত হয়ে তার পিতাকে বিষয়টি জানায়। ফিরাউন উক্ত দাসীকে

তাওহীদ ত্যাগ করতে চাপ দেয়। কোনো প্রকার ভয়ভীতিতে দাসীটি বিচলিত হয় না। তখন ফিরাউন অগ্নিকুণ্ড তৈরি করে দাসীকে বলে, তুমি যদি আমার ধর্মে ফিরে না আস তবে তোমার সন্তানগণ সহ তোমাকে আগুনে পুড়িয়ে মারা হবে। দাসীটি ঈমানের উপর অবিচল থাকে। তখন একে একে তার সন্তানদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়। সর্বশেষ তার কোলে ছিল দুগ্ধপোষ্য একটি শিশু। শিশুটির দিকে তাকিয়ে মায়ের মন দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তখন শিশুটির মুখে আল্লাহ্ কথা দেন। সে তার মাকে বলে, মা দ্বিধা করো না, তুমি তো সত্যের উপর রয়েছ। আখিরাতের অনন্ত কষ্ট থেকে বাঁচতে দুনিয়ার কয়েক মুহূর্তের কষ্ট কিছুই নয়। দাসীটি তখন শিশুটিকে নিয়ে আগুন বরণ করে নেয়। তাদেরকে আল্লাহ আখিরাতে এরূপ মহান মর্যাদা দিয়েছেন।

হাযেরীন, তিনি দেখেন যে, কিছু মানুষ শয়ন করে রয়েছে এবং বিশাল পাথর দিয়ে আঘাত করে তাদের মাথা চুর্ণবিচুর্ণ করা হচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যে আবার মাথাগুলি স্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে এবং পুনরায় তাদেরকে এভাবে আঘাত করা হচ্ছে। জিবরাঈল (আ) বলেন, এরা হলো আপনার উম্মাতের ঐ সব মানুষ, যারা ফরস সালাত যথাসময়ে আদায়ে অবহেলা করে, যাদের মস্তিক ফরয সালাত আদায়ের চিন্তা না করে অন্য চিন্তায় রত থাকে।

তিনি দেখেন যে, একব্যক্তি রক্তের নদীতে সাতার কাটছে এবং তাকে বড় বড় পাথর জোর করে গেলান হচ্ছে। জিবরাঈল বলেন, এ হলো সূদ খোরের শাস্তি। তিনি আরো দেখেন যে, কিছু মানুষের হাতে পিতলে নখর লাগানো এবং তার এ নখগুলি দিয়ে প্রচণ্ড জোরে তাদের মুখমণ্ডল ও বক্ষদেশ আঁচড়ে রক্তাক্ত করছে। জিবরাঈল (আ) জানান যে, এরা পৃথিবীতে মানুষদের গীবতে লিপ্ত হতো।

হাযেরীন, এভাবে তিনি এতিমের সম্পদ ভক্ষণকারী, গীবতকারী, মানুষের মধ্যে শত্রুতাসৃষ্টিকারী, ব্যভিচারী ও অন্যান্য পাপীদের কবরের ও জাহান্নামের শাস্তির প্রক্রিয়া প্রত্যক্ষ করেন। অনুরূপভাবে আল্লাহ যিকর, তাহাজ্জুদ, তাহিয়্যাতুল ওযূ, আল্লাহর পথে জিহাদ ও অন্যান্য ইবাদতের পুরস্কার প্রত্যক্ষ করেন।

হাযেরীন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মিরাজের রাত্রিতে আল্লাহকে দেখেছিলেন কি না সে বিষয়ে সাহাবীগণের যুগ থেকে মতভেদ রয়েছে। সূরা নাজমের ব্যাখ্যায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর অন্তর দিয়ে দুবার তার রব্বকে দেখেছিলেন। এ মতের অনুসারী সাহাবী-তাবিয়ীগণ বলেছেন যে, মহান আল্লাহ মূসা (আ)-কে তাঁর সাথে কথা বলার মুজিযা দিয়েছিলেন এবং মুহাম্মাদ ﷺ-তে তাঁর দর্শনের মুজিযা দিয়েছিলেন। পক্ষান্তরে হযরত আয়েশা ও অন্যান্য সাহাবী বলেছেন যে, তিনি আল্লাহকে দেখেন নি। সহীহ বুখারী সংকলিত হাদীসে প্রসিদ্ধ তাবিয়ী মাসরূক বলেনঃ "আমি আয়েশা (রা)-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। তিনি বলেন, হে আবূ আয়েশা (মাসরূক), তিনটি কথার যে কোনো একটি কথা যদি কেউ বলে তবে সে আল্লাহ্ নামে জঘন্য মিথা বলার অপরাধে অপরাধী হবে। আমি বললামঃ সে কথাগুলি কী কী? তিনি বলেন, যদি কেউ মনে করে যে, মুহাম্মাদ (ﷺ) তাঁর প্রতিপালককে (আল্লাহকে) দেখেছিলেন তবে সে আল্লাহর নামে জঘন্য মিথ্যচারী বলে গণ্য হবে। মাসরূক বলেন, আমি তখন হেলান দিয়ে ছিলাম। তাঁর কথায় আমি উঠে বসলাম এবং বললামঃ হে মুমিনগণের মাতা, আপনি আমাকে একটু কথা বলতে দিন, আমার আগেই আপনার বক্তব্য শেষ করবেন না। আল্লাহ কি বলেন নিঃ "সে তো তাকে স্পষ্ট দিগন্তে দেখেছিল"[১], "নিশ্চয় তাকে সে আরেকবার দেখেছিল"[২]?

আয়েশা (রা) বলেনঃ এ উম্মাতের মধ্যে আমিই সর্বপ্রথম ব্যক্তি যে এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে

---

[১] সূরা (৮১) তাকবীর: ২৩ আয়াত।
[২] সূরা (৫৩) নাজমঃ ১৩ আয়াত।

জিজ্ঞাসা করেছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ উত্তরে বলেন: "এ হলো জিবরীলের কথা। আল্লাহ তাঁকে যে আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন আমি এই দুবার ছাড়া আর কখনো তাঁকে তাঁর সেই প্রকৃত আকৃতিতে দেখি নি। আমি দেখলাম তিনি আকাশ থেকে নেমে আসছেন। তাঁর আকৃতির বিশালত্ব আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী সবকিছু অবরুদ্ধ করে দিচ্ছে।" আয়েশা বলেন: তুমি কি আল্লাহকে বলতে শোন নি: "তিনি দৃষ্টির অধিগম্য নন, কিন্তু দৃষ্টিশক্তি তাঁর অধিগত; এবং তিনিই সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক পরিজ্ঞাত"[১]? তুমি কি আল্লাহকে বলতে শোন নি[২]: "কোনো মানুষের জন্যই সম্ভব নয় যে, আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন ওহীর মাধ্যম ব্যতিরেকে, অথবা পর্দার অন্তরাল ব্যতিরেকে, অথবা এমন দূত প্রেরণ ব্যতিরেকে, যে দূত তার অনুমতিক্রমে তিনি যা চান তা ব্যক্ত করেন, তিনি সমুন্নত, প্রজ্ঞাময়"?"[৩]

হাযেরীন, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রভাতের দিকে মক্কায় ফিরে আসেন। আবূ বাকর (রা) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি সারারাত কোথায় ছিলেন, আমি রত্রিবেলায় আপনাকে খুঁজেছিলাম, কিন্তু পাই নি। তিনি তাঁকে মিরাজের কথা জানান। আবূ বাক্র সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করেন। দিবসে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইসরার বিষয় আবূ জাহল ও অন্যান্য কাফিরকে জানালে তারা তাদের অভ্যাসমত তা অস্বীকার করে। উপরন্তু এ বিষয়কে তারা তাঁর বিরুদ্ধে অপপ্রচারের একটি বড় হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে বলতে থাকে, বাইতুল মাকদিস বা যিরুশালেম শহরে যেতে আসতে আমাদের মাসাধিক কাল সময় লাগে, আর মুহাম্মাদ নাকি রাতারতি সেখান থেকে ঘুরে এসেছে। কতিপয় দুর্বল ঈমান মানুষ তাদের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে ইসলাম ত্যাগ করে। এক পর্যায়ে কাফিররা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অপদস্ত করার সমবেত হয়ে তাঁকে বাইতুল মাকদিস বা যিরুশালেম নগরীর বিভিন্ন খুটিনাটি বিষয়ে প্রশ্ন করে। রাত্রিকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ শহরকে অত ভালভাবে লক্ষ্য করেন নি। তিনি ভীত হয়ে পড়েন। তখন মহান আল্লাহ বাইতুল মাকদিস শহরকে তাঁর সামনে তুলে ধরেন। তিনি কাফিরদের প্রশ্নের উত্তরে শহরের বর্ণনা প্রদান করেন। মক্কাবাসীদের অনেকেই ব্যবসা উপলক্ষ্যে তথায় যাতায়াত করত। তারা অবাক হয়ে বলতে থাকে, বর্ণনা তো হুবহু মিলে যায়। তখন আবূ জাহল ও তার অনুসারীরা বিষয়টিকে মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর যাদু বলে মানুষদেরকে বুঝাতে থাকে।

হাযেরীন, শুধু আবূ জাহলের সহচরগণই নয়, পরবর্তী হাজার বৎসর যাবৎ অনেকেই বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে বিভিন্নভাবে মিরাজকে অস্বীকার করার বা অপব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছে। অনেকে দাবি করেছে মিরাজ ছিল একটি স্বপ্ন মাত্র। বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে তারা দাবি করেছে যে, পৃথিবীর উপরে বা বিভিন্ন আসমানে বরফ, আগুন, বিষাক্ত গ্যাস ইত্যাদির স্তর রয়েছে, যেগুলি ভেদ করে কোনো মানুষ যেতে পারে না। কেউ দাবি করেছে মধ্যাকর্ষণ শক্তি অতিক্রম করে যাওয়া সম্ভব নয়।

হাযেরীন, আমরা দেখেছি যে, কুরআন কারীমে আল্লাহ বলেছেন, তিনি তাঁর "বান্দা"-কে মিরাজে নিয়েছিলেন। আর 'বান্দা' বলতে আত্মা ও দেহের সমন্বিত মানুষকেই বুঝানো হয়। কুরআন কারীমে বিভিন্ন স্থানে "বান্দা" বলতে দেহ ও আত্মার সমন্বিত জাগ্রত মানুষকেই বুঝানো হয়েছে, ঘুমন্ত মানুষের আত্মাকে কখনো "বান্দা" বলা হয় নি। অগণিত হাদীস থেকে স্পষ্ট যে, মি'রাজ জাগ্রত অবস্থাতেই হয়েছিল। এছাড়া আমরা জানি যে, কাফিরগণ ইসরা ও মি'রাজ অস্বীকার করে এবং একে অসম্ভব বলে দাবি করে। এমনকি কতিপয় দুর্বল ঈমান মুসলিম ইসলাম পরিত্যাগ করে। এ থেকে নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ

---

[১] সূরা (৬) আন'আম: ১০৩ আয়াত।
[২] সূরা (৪২) শূরা: ৫১ আয়াত।
[৩] বুখারী, আস-সহীহ ৩/১১৮১; মুসলিম, আস-সহীহ ১/১৫৯-১৬১; তিরমিযী, আস-সুনান ৫/২৬২, ৩৯৪; ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ৬/৩১৩, ৮/৬০৬।

জাগ্রত অবস্থায় দৈহিকভাবে মিরাজ সংঘটিত হওয়ার কথাই বলেছিলেন। নইলে কাফিরদের অস্বীকার করার ও দুর্বল ঈমান মুসলিমদের ঈমান হারানোর কোনো কারণই থাকে না। স্বপ্নে এরূপ নৈশভ্রমন বা স্বর্গারোহণ কোনো অসম্ভব বা অবাস্তব বিষয় নয় এবং এরূপ স্বপ্ন দেখার দাবি করলে তাতে অবাক হওয়ার মত কিছু থাকে না। যদি কেউ দাবি করে যে, ঘুমের মধ্যে সে একবার পৃথিবীর পূর্বপ্রান্তে এবং একবার পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্তে চলে গিয়েছে, তবে তার দেহ স্বস্থানেই রয়েছে এবং দৈহিক অবস্থার পরিবর্তন হয় নি, তবে কেউ তার এরূপ স্বপ্ন দেখার সম্ভাবনা অস্বীকার করবে না বা এতে অবাকও হবে না।

হাযেরীন, আধুনিক বিজ্ঞান সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ করেছে যে, জাগ্রত অবস্থায় সশরীরের এরূপ অলৌকিক নৈশভ্রমন ও উর্ধ্বারোহণ অসম্ভব নয়। মি'রাজের ঘটনাবালির মধ্যে আরো অনেক বৈজ্ঞানিক মুজিযার সন্ধান পেয়েছেন আধুনিক বিজ্ঞানীরা।

হাযেরীন, আমরা অনেকে শুধু ২৭শে রজব আসলে মিরাজ আলোচনা করি। আবার কেউ এ দিনে ও রাতে খাস ইবাদত-বন্দেগী করি। আমরা দেখেছি যে, কুরআন ও হাদীসে অগণিত স্থানে মিরাজের বর্ণনা এসেছে, কিন্তু কোথাও তারিখ বলা হয় নি।মিরাজের রাত্রিতে বা দিনে নফল সালাত, নফল সিয়াম বা অন্য কোনো খাস ইবাদতের কথা রাসূলুল্লাহ ﷺ বা সাহাবীগণ শিক্ষা দেন নি। মিরাজের তারিখই রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে জানান নি। কয়েক শতক আগেও 'শবে মি'রাজ' বলতে নির্দিষ্ট কোনো রাত নির্দিষ্ট ছিল না। ২৭শে রবজ শবে মিরাজ হওয়ার বিষয়টি আলিম ও ঐতিহাসিগণের অনেকগুলি মতের মধ্যে একটি মত মাত্র। এ জন্য আমাদের উচিত এ মাসে এবং সারা বৎসরই কুরআন কারীম ও সহীহ হাদীসের আলোকে মিরাজের ঘটনাবলি ও শিক্ষা আলোচনা করা।

হাযেরীন, মিরাজের অন্যতম নেয়ামত হল ৫ ওয়াক্ত ফরয সালাত। মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয়তম রাসূলকে দীনের যত আহকাম দিয়েছেন সবই ওহীর মাধ্যমে জিবরাঈল দুনিয়াতে দিয়ে গিয়েছেন। একমাত্র ব্যতিক্রম হলো সালাত। মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয়তম রাসূল (ﷺ)-কে নিজের সান্নিধ্যে নিয়ে তাকে তার উম্মাতের জন্য সালাতের মহান নিয়ামত প্রদান করেছেন। সালাতের মাধ্যমেই উম্মাত দুনিয়া ও আখিরাতের সর্বোচ্চ নিয়ামত লাভ করতে পারবে। আবার সালাত অবহেলা করলে মুমিনের ঈমান হারিয়ে সর্বহারা হওয়ার পথ উন্মুক্ত হয়। সালাতকে গ্রহণ করলে মিরাজের হাদিয়া গ্রহণ করা হয়।

হাযেরীন, ইসরা ও মিরাজের শিক্ষা অনুধাবনের জন্য আমাদের কুরআন কারীমের "সূরা ইসরা" অধ্যয়ন করা দরকার। ১৫ পারার প্রথম সূরা, কুরআন কারীমের ১৭ নং সূরার নাম "সুরা ইসরা"। এ সূরাকে "সূরা বনী ইসরাঈল"ও বলা হয়। এ সূরায় ইসরা ও মিরাজের বিষয় উল্লেখের মধ্যে মহান আল্লাহ পৃথিবীতে ফিতনা-ফাসাদের শাস্তি, শিরকমুক্ত তাওহীদের গুরুত্ব, পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন, দরিদ্র ও অন্যান্য মানুষের অধিকার পালনের গুরত্ব, ব্যভিচার, হত্যা, এতিমের সম্পদ ভক্ষণ, ওযনে-পরিমাপে কম দেওয়া, আন্দাযে ধারণা ভিত্তিক মতামত প্রকাশ বা অপবাদ দেওয়া, অঙ্গীকার ভঙ্গ করা, অহঙ্কার করা ইত্যাদি মহাপাপের ভয়াবহতা বর্ণনা করেছেন। আমরা দেখেছি যে, মিরাজের মধ্যে এ ধরনের পাপের শাস্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রদর্শন করানো হয়। ইসরা ও মিরাজ উপলক্ষ্যে এ সূরার অনুধাবন ও পর্যালোচনা অতীব প্রয়োজন। মহান আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক দান করুন। আমীন।

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

أَمَّا بَعْدُ، فَيَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ

الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آَيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَآَهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَى مِنْ آَيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى

وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَمَّا كَذَّبَتْنِي قُرَيْشٌ قُمْتُ فِي الْحِجْرِ فَجَلَّى اللَّهُ لِي بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَطَفِقْتُ أُخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ

بَارَكَ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ فِيْ الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ. وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ. أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ، فَاسْتَغْفِرُوْهُ وَتُوْبُوْا إِلَيْهِ، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.

শাবান মাসের ১ম খুতবা: স্বামী-স্ত্রীর দায়িত্ব ও অধিকার

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লী আলা রাসূলিহীল কারীম। আম্মা বাদ,

সম্মানিত উপস্থিতি, আজ শাবান মাসের প্রথম জুমুআ। আজ আমরা কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে স্বামী-স্ত্রীর অধিকার, দায়িত্ব ও পারিবারিক জীবন সম্পর্কে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ। কিন্তু তার আগে আমরা এ সপ্তাহের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসগুলির বিষয়ে সংক্ষেপ আলোকপাত করি। হাযেরীন, আজ ইংরেজী ..... মাসের ..... তারিখ। এ সপ্তাহের দিবসগুলির মধ্যে রয়েছে .... ।

হাযেরীন, বিগত এক খুতবায় আমরা বিবাহ ও পরিবার গঠনের গুরুত্ব আলোচনা করেছি। মহান আল্লাহ মানব সভ্যতা টিকিয়ে রাখার জন্য নারী-পুরুষের স্বাভাবিক আকর্ষণ দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। পরিবার গঠনের পরে স্বভাবতই স্বামী স্ত্রীর মধ্যে গভীর ভালবাসা ও মমতা তৈরী হয়। আল্লাহ বলেন:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

"আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের জন্য জোড়া (স্ত্রী বা স্বামী) সৃষ্টি করেছেন যেন তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও মমতা সৃষ্টি করেছেন।"[১]

দীর্ঘ পারিবারিক জীবনের নানাবিধ সংঘাত ও জটিলাতার মধ্যে ভালবাসা ও মমতা চিরস্থায়ী করতে এ ভালবাসা ও মমতার স্রষ্টা মহান আল্লাহর নির্দেশনা মোতাবেক চলা একান্ত প্রয়োজন।

হাযেরীন, আমরা জানি, যে কোনো ঐক্য, সঙ্ঘ বা ইউনিয়নে কাউকে নেতৃত্ব দিতে হয়। কাউকে নেতৃত্ব না দিলে বা সকলেই নেতা হলে সে সঙ্ঘ ভঙ্গ হতে বাধ্য। কোনো ইউনিটে কাউকে নেতৃত্ব দেওয়ার অর্থ তাকে স্বেচ্ছাচারিতার সুযোগ দেওয়া বা তাকে অন্যদের প্রভু বানিয়ে দেওয়া নয়। নেতৃত্ব দেওয়ার অর্থ তাকে কিছু অতিরিক্ত দায়িত্ব ও অধিকার দেওয়া। অন্যান্য সদস্যদের সাথে পরামর্শ ও সহযোগিতার মাধ্যমে তিনি ইউনিট পরিচালনা করবেন এবং অন্যরা স্বাভাবিক ভাবে তার আনুগত্য করবে।

হাযেরীন, এখন প্রশ্ন হলো, দুজনে মিলে যে পারিবারিক ইউনিটটি গঠন করা হলো তার নেতৃত্ব কে নেবেন? স্বামী? না স্ত্রী? না কারো কোনো নেতৃত্ব থাকবে না, প্রত্যেকে যার যার ইচ্ছা মত চলবেন?

মানব প্রকৃতি, নারী-পুরুষের মনোদৈহিক গঠনের বৈজ্ঞানিক তথ্য সম্পর্কে সামান্য জ্ঞান আছে এমন সকল বিবেকবান নারী ও পুরুষ একথা মানতে বাধ্য হবেন যে, দুজনের পারিবারিক ইউনিটে নেতৃত্ব অবশ্যই স্বামীকে গ্রহণ করতে হবে। নইলে পারিবারিক এ ঐক্য অনৈক্যে পরিণত হতে বাধ্য। ইসলামের দৃষ্টিতে পরিবার গঠন অর্থ স্বামীর অধীনতা বা দাসত্ব নয়। স্বামী-স্ত্রী উভয়ের পারস্পরিক অধিকার সমান। তবে স্বামীকে নেতৃত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব ও অধিকার দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

"নারীদের উপর (পুরুষদের) যেমন অধিকার আছে, ঠিক তেমনি ন্যায়সঙ্গত অধিকার রয়েছে (পুরুষদের উপর) নারীদের, এবং পুরুষদের রয়েছে তাদের উপর একটি মর্যাদা।"[২]

হাযেরীন, এ অতিরিক্ত মর্যাদার কারণ, প্রেক্ষাপট ও এর দায়িত্ব সম্পর্কে আল্লাহ অন্যত্র বলেন:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

---

[১] সূরা (৩০) রূম: ২১ আয়াত।

[২] সূরা বাকারা: ২২৮ আয়াত।

"পুরুষগণ স্ত্রীগণের সংরক্ষক; কারণ আল্লাহ তাদের এককে অপরের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন এবং পুরুষগণ তাদের ধনসম্পদ ব্যয় করে। সুতরাং পুণ্যবতী নারীরা অনুগত। লোকচক্ষুর অন্তরালে তারা সংরক্ষণ করে ঐ সব বিষয় যা আল্লাহ সংরক্ষণ করেছেন।"[১]

এখানে আল্লাহ জানিয়েছেন যে, পুরুষকে পরিবারের কর্তৃত্ব ও সংরক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এর মূল কারণ হলো আল্লাহ সৃষ্টিগতভাবে পুরুষদেরকে কিছু অতিরিক্ত বিষয় দান করেছেন যা এ সংরক্ষণ দায়িত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আধুনিক বিজ্ঞান কুরআনের এ বক্তব্যের সত্যতা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছে। সৃষ্টিগতভাবে পুরুষদেরকে শারীরিক ও মানসিক কিছু শক্তি অধিক দেওয়া হয়েছে যা কঠোর পরিশ্রম ও সংগ্রামের সাথে সামঞ্জস্যশীল এবং এজন্য পুরুষকে সংসারের সংরক্ষণের কর্তৃত্ব এবং অর্থনৈতিক দায়ভার দেওয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে নারীকে কিছু বিষয় বেশি দেওয়া হয়েছে যা মাতৃত্ব, আবেগ ও মমতার সাথে সামঞ্জস্যশীল এবং কর্তৃত্ব ও কঠোর পরিশ্রমের সাথে সাংঘর্ষিক। দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকারের ক্ষেত্রে এ প্রাকৃতিক পার্থক্য রক্ষা করা না হলে প্রাকৃতিক ভারসম্য নষ্ট হবে এবং পারিবাকি কাঠামো বিনষ্ট হবেই।

হাযেরীন, প্রাকৃতিক এ ভারসম্যের ভিত্তিতে ইসলামে স্বামী-স্ত্রীর দায়িত্ব ও অধিকারের মূল বিষয়টি এখানে উল্লেখ করেছে। প্রথম বিষয় হলো স্বামীর সংরক্ষণের ও স্ত্রীর আনুগত্যের দায়িত্ব।

হাযেরীন, এ আয়াতে পুরুষকে স্ত্রীর "কাওয়াম" বলা হয়েছে। আমরা সাধারণত বুঝি যে, এতে পুরুষদেরকে কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছে। বস্তুত কর্তৃত্ব বা স্বেচ্ছাচারিতার ক্ষমতা নয়, বরং রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কতৃত্ব এ দায়িত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট। "কিওয়ামাহ" অর্থ সংরক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ, হেফাযত ইতাদি। স্ত্রী ও সন্তানদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মনোদৈহিক সংরক্ষণ পুরুষের মূল দায়িত্ব।

হাযেরীন, মাতৃত্বের দায়িত্বের সাথে সামঞ্জস্যতা রক্ষা করে আল্লাহ নারীর মধ্যে আবেগ বেশি দিয়েছেন। আবেগের ফলে সহজেই তারা মমতা, রাগ, জিদ ইত্যাদি দ্বারা আক্রান্ত হন। স্বামীর দায়িত্ব এ দিকে লক্ষ্য রাখা। বিশেষত সম্পূর্ণ দুটি ভিন্ন পরিবেশ ও প্রকৃতির দুজন মানুষের মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য থাকাই স্বাভাবিক। স্বামী যদি স্ত্রীকে শতভাগ নিজের মত বানাতে যান তবে তা বুমেরাং হতে বাধ্য। স্ত্রীর আবেগ, রাগ ও জিদকে তার মমতার ও নারীত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে মেনে নিয়েই তাকে পরিচালনা করতে হবে। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

(اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خيراً) إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ فَإِنْ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَبِهَا عِوَجٌ وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا

"স্ত্রীদের সাথে উত্তম আচরণের জন্য তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছি।-কারণ নারীকে বক্রতা বা আবেগ ও জিদ দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। কাজেই কখনোই সে তোমার জন্য সর্বদা এক ধারায় থাকবে না। তুমি যদি তার দাম্পত্য সঙ্গ উপভোগ করতে চাও তবে তার বক্রতা বা আবেগ সহ তা করতে হবে। আর যদি তুমি তাকে একেবারে সোজা করতে চাও তাহলে তুমি তাকে ভেঙ্গে ফেলবে।"[২]

হাযেরীন, সম্পূর্ণ দুটি ভিন্ন পরিবেশের দুটি মানুষের এ ইউনিটকে সংরক্ষণ করার দায়িত্ব স্বামীর আর এজন্যই স্ত্রীর ভুল ত্রুটি মেনে নেওয়া তার অন্যতম দায়িত্ব। স্বভাবতই স্ত্রীর আকৃতি, প্রকৃতি, কথা, চালচলন বা আচরণের কিছু বিষয় তার অপছন্দ হবেই। এ আংশিক অপছন্দ যেন তাকে আবেগতাড়িত না করে। তাকে বুঝতে হবে যে, প্রতিটি মানুষের মধ্যেই ভাল ও মন্দ দিক রয়েছে। পৃথিবীর অন্য যে

[১] সূরা নিসা: ৩৪ আয়াত।
[২] বুখারী, আস-সহীহ ৩/১২১২, ৫/১৯৮৭; মুসলিম, আস-সহীহ ২/১০৯১।

কোনো নারীকে বিবাহ করলেও আপনি একইভাবে ভাল ও মন্দ একত্রে পাবেন। তার স্ত্রীর কিছু বিষয় ভাল না লাগলেও অন্য অনেক ভাল দিক রয়েছে। স্ত্রীর ভাল দিকগুলি বারংবার মনে করতে হবে। সর্বোপরি বুঝতে হবে যে, মানবীয় বুদ্ধিতে কোনো কিছু খারাপ লাগলেও মহান আল্লাহ তার মধ্যে অসীম কল্যাণ রাখতে পারেন। কাজেই মহান আল্লাহর কল্যাণের সুদৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে। আল্লাহ বলেন:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

"তোমরা তোমদের স্ত্রীদের সাথে সদভাবে-সুন্দরভাবে বসবাস করবে। আর যদি তোমরা তাদেরকে অপছন্দ কর, তবে এমনও হতে পারে যে, তোমরা কোনো কিছুকে অপছন্দ করছ, অথচ আল্লাহ তার মধ্যে অনেক কল্যাণ রেখেছেন।"[১]

এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

لا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ، أَوْ قَالَ غَيْرَهُ

"কোনো মুমিন স্বামী কোনো মুমিন স্ত্রীকে ঘৃণা করবে না; যদি তার কোনো আচরণ তার অপছন্দ হয়, তবে পছন্দ করার মত অন্য কিছু সে তার মধ্যে পাবে।"[২]

হাযেরীন, স্বামীর কর্তৃত্ব বা সংরক্ষণের দায়িত্বের অন্যতম দিক হলো স্ত্রীর সাথে সর্বোচ্চ সুন্দর ও অমায়িক আচরণ করা। সমাজে অনেক "ধার্মিক" মুসলিমকে দেখা যায়, যারা অত্যন্ত বন্ধুবৎসল ও সমাজের মানুষদের সাথে সদাচরণের জন্য পরিচিত, কিন্তু স্ত্রী-সন্তানদের ত্রুটি বিচ্যুতিতে তারা সহজেই ক্রোধান্বিত হন এবং তাদের সাথে খারাপ আচরণ করেন। অথচ মুমিনের দায়িত্ব ঠিক এর উল্টো। সকল মানুষের মধ্যে নিজের সর্বোচ্চ সদাচরণের হকদার নিজের স্ত্রী। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا، خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِي

"তোমাদের মধ্যে সেই সর্বোত্তম যে তার স্ত্রীর সাথে আচরণের দিক থেকে সর্বোত্তম।" "তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই ভাল যে তার স্ত্রীর কাছে ভাল আর আমি আমার স্ত্রীর কাছে ভাল।"[৩]

এখানে আমরা দুটি বিষয় দেখছি। প্রথমত, ভাল মুসলিম হতে হলে ভাল স্বামী হতে হবে। দ্বিতীয়ত, ভাল স্বামী হওয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অন্যতম সুন্নাত। আমরা অনেকেই বিভিন্ন প্রকারের সুন্নাত পালনে আগ্রহী, কিন্তু সুন্নাতী স্বামী হওয়ার আগ্রহ আমাদের খুবই কম। কারণ বিষয়টি খুবই কঠিন। রাসূলুল্লাহ ﷺ কেমন ভাল ছিলেন তাঁর স্ত্রীদের কাছে তা ব্যাখ্যা করতে কয়েকটি খুতবার প্রয়োজন। সীরাত ও শামাইলের গ্রন্থগুলি পড়ে দেখুন। পরিবারে তিনি স্বেচ্ছাচারিতা করতেন না। স্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণ করতেন। তিনি স্ত্রীদের রাগারাগি হাসিমুখে সহ্য করতেন। বেশি কষ্ট হলে নীরবে সরে থাকতেন। কিন্তু কখনোই স্ত্রীদের সাথে ঝগড়া করতেন না। ব্যক্তিগত কোনো নির্দেশ অমান্য করলে বা খেদমতে ত্রুটি করলে কখনোই কাউকে ধমক দিতেন না বা রাগ করতেন না। তবে দীন ও শরীয়তের বিষয়ে তিনি কঠোর হতেন। তিনি সংসারের কাজে স্ত্রীকে সাহায্য করতেন। বাড়িতে নিজের কাজ নিজে করতেন। স্ত্রীর সাথে একত্রে খাওয়া-দাওয়া করতেন। স্ত্রীর সাথে হাসি-তামাশা ও খেলাধুলা করতেন। স্ত্রীকে খেলা দেখাতে নিয়ে যেতেন। আল্লাহ আমাদেরকে সুন্নাতী স্বামী হওয়ার তাওফীক দান করুন।

হাযেরীন, স্বামীর এ কঠিন দায়িত্বের বিপরীতে আল্লাহ স্ত্রীকে একটি কঠিন দায়িত্ব দিয়েছেন, তা

---

[১] সূরা নিসা: ১৯ আয়াত।
[২] মুসলিম, আস-সহীহ ২/১০৯১।
[৩] তিরমিযী, আস-সুনান ৩/৪৬৬। তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।

হলো আনুগত্যের দায়িত্ব। পুণ্যবতী নারীর অন্যতম পরিচয় স্বামীর আনুগত্য। নিঃসন্দেহে একজন মানুষের জন্য অন্য মানুষের আনুগত্য কষ্টকর। কিন্তু তারপরও দুনিয়ার স্বার্থেই আনুগত্য দরকার। কারণ, যে কোনো সঙ্ঘে আনুগত্য না থাকলে তা ভেঙ্গে যেতে বাধ্য। আর ইসলামের এ আনুগত্য আল্লাহর ইবাদত ও জান্নাতের অন্যতম ওসীলা হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ

"কোনো নারী যদি পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আয়াদ করে, রামাদান মাসের সিয়াম পালন করে, নিজের পবিত্রতা রক্ষা করে এবং তার স্বামীর আনুগত্য করে তবে সে নারীকে বলা হবে: তুমি জান্নাতের যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা জান্নাতে প্রবেশ কর।"[১]

হাযেরীন, কতৃত্ব ও আনুগত্যের বিষয়টি আমাদের অনেকের কাছেই অস্পষ্ট। আমরা মনে করি যে, স্বামীর প্রতিটি হুকুম মান্য করাই স্ত্রীর ফরয দায়িত্ব। বিষয়টি তা নয়। ইসলামে স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই দায়িত্ব ও অধিকারের সীমারেখা নির্ধারণ করা হয়েছে। কিছু বিষয় রয়েছে যেগুলিতে স্বামীর আনুগত্য করা স্ত্রীর ফরয দায়িত্ব এবং কিছু বিষয় রয়েছে যেগুলিতে আনুগত্য করা ফরয নয়, বরং উত্তম।

হাযেরীন, পরিবার গঠনের মূল উদ্দেশ্য নারী-পুরুষের দাম্পত্য সাহচর্যের মনোদৈহিক চাহিদাকে একমুখী করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য যোগ্য মানুষ রেখে যাওয়া। এজন্য ইসলাম যেমন বিবাহেতর সম্পর্ককে কঠিনভাবে নিষিদ্ধ ও কঠিন শাস্তিযোগ্য মহাপাপ হিসেবে গণ্য করেছে, তেমনি বিবাহিত সম্পর্ক ও আনন্দ-উপভোগকে মহাপুণ্য ও ইবাদত বলে গণ্য করেছে। পারিবারিক অন্য সকল বিষয়ের বিকল্প আছে, কিন্তু দাম্পত্য সাহচার্যের বিকল্প নেই। স্বামী বা স্ত্রী প্রয়োজনে বাজার থেকে বা অন্য কারো সহযোগিতায় পানাহার, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও অন্যান্য চাহিদা মেটাতে পারেন। কিন্তু দাম্পত্য সাহচার্যের চাহিদার ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়। আর এজন্যই স্বামী-স্ত্রীর উপর পারস্পরিক সাহাচার্য প্রদানকে অন্যতম ফরয ইবাদত বলে গণ্য করা হয়েছে এবং এ বিষয়ে স্বামীর আনুগত্য করা স্ত্রীর উপর ফরয করা হয়েছে। বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ এ বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন। এক হাদীসে তিনি বলেন:

إِذَا الرَّجُلُ دَعَا زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتَأْتِهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ

"যদি কোনা স্বামী তার স্ত্রীকে তার প্রয়োজনে ডাকে তবে সে যেন তার ডাকে সাড়া দেয়, যদিও সে চুলার পাশে (রান্নায় ব্যস্ত) থাকে।[২] অন্যান্য হাদীসে তিনি বারংবার বলেছেন যে, যদি স্বামীর এরূপ আহ্বানে স্ত্রী সাড়া না দেয় তবে যতক্ষণ না স্বামী সন্তুষ্ট হবে ততক্ষণ আল্লাহ্ তার উপর অসন্তুষ্ট থাকবেন, ফিরিশতাগণ তাকে অভিশাপ দিবেন এবং এ অবস্থায় তার সালাত আল্লাহ্ কবুল করবেন না। আর এ জন্য স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ছাড়া স্ত্রীর জন্য নফল রোযা রাখা তিনি নিষিদ্ধ করেছেন।

হাযেরীন, স্বামীর আনুগত্য ও খেদমতের দ্বিতীয় বিষয় স্বামীর ব্যক্তিগত খেদমত, যা স্ত্রী ছাড়া অন্য কেউ করতে পারে না। এ সকল বিষয়ে স্বামীর খেদমতের বিশেষ নির্দেশ দিয়েছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ।

ইমাম আবূ হানীফা, শাফিয়ী, মালিক ও অধিকাংশ ফকীহ একমত যে, রান্নবাড়া, ঘর গোছানো, কাপড় ধোওয়া ও সাংসারিক অন্যান্য কাজ বা এক্ষেত্রে স্বামীর আনুগত্য স্ত্রীর উপর ফরয দায়িত্ব নয়। তবে এগুলি তার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নেক আমল এবং স্বামীর প্রতি সদ্ব্যবহার ও কৃতজ্ঞতার অংশ। কাজেই এ সকল বিষয়ে স্বামীর আনুগত্যের বিষয়টিও সদ্ব্যবহার ও পারস্পরিক সহযোগিতা হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

---

[১] আহমদ, আল-মুসনাদ ১/১৯১; ইবনু হিব্বান, আস-সহীহ ৯/৪৭১; আলবানী, সহীহুত তারগীব ২/১৯৬। হাদীসটি হাসান।

[২] তিরমিযী, আস-সুনান ৩/৪৬৫। তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান গরীব।

হাযেরীন, উপরের আয়াত থেকে আমরা জেনেছি যে, স্ত্রীর দ্বিতীয় দায়িত্ব স্বামীর গোপনীয়তা, সম্পদ, নিজের সতীত্ব ও সন্তানগণের পবিত্রতা সংরক্ষণ করা। স্বামীর দায়িত্ব স্ত্রীকে সংরক্ষণ করা এবং স্ত্রীর দায়িত্ব স্বামীর সন্তান, গোপনীয়তা ও পবিত্রতা সংরক্ষণ করা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

أَلا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ وَلا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ

"জেনে রাখ! তোমাদের স্ত্রীদের উপর তোমাদের কিছু অধিকার আছে এবং তোমাদের স্ত্রীদেরও তোমাদের উপর কিছু অধিকার আছে। তোমাদের অধিকার হলো যে, তোমরা যাকে অপছন্দ কর তাকে তোমাদের বিছানায় বসাবে না এবং তোমাদের বাড়িতে ঢুকাবে না। আর তোমাদের উপর তাদের অধিকার হলো তোমরা তাদের পোশাকপরিচ্ছদ ও পানাহারের সুন্দর ব্যবস্থা করবে।"[১]

হাযেরীন, স্বামীর দায়িত্বের অন্যতম দিক অর্থনৈতিক দায়ভার। পরিবারে যাবতীয় খরচপত্রের দায়িত্ব এককভাবে স্বামীর। স্ত্রীর যদি অনেক সম্পদ ও সম্পত্তিও থাকে তাহলেও স্বামীর কোনো অধিকার নেই স্ত্রীর নিকট থেকে সংসারের কোনোরূপ অর্থনৈতিক সহযোগিতা দাবি করা। এমনকি স্বামী এ কথাও বলতে পারবেন না যে, তোমার নিজের কিছু খরচ তোমার টাকা থেকে চালাও। বরং স্ত্রী ও সন্তানদের যাবতীয় খরচপত্র বহন করার একক দায়িত্ব স্বামীর। ইসলামী ব্যবস্থায় স্ত্রীকে এভাবে যে বিশেষ সুযোগ ও অধিকার দেওয়া হয়েছে তা পাশ্চাত্য ও অন্যান্য সমাজে অকল্পনীয়। সেখানে সংসারের খরচে অংশ নিতে স্ত্রী বাধ্য থাকেন। ইসলামে নারীকে এ সুযোগ প্রদান করা হয়েছে শুধু মানব সভ্যতার স্থায়িত্বের স্বার্থে। যেন স্ত্রী স্বামীর পারিবারিক শান্তি, ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সঠিক পরিচর্যায় সময় দিতে পারেন।

হাযেরীন, স্ত্রী-সন্তানদের এ দায়ভার বহনের জন্য পরিশ্রম করা মুমিনের অন্যতম ফরয দায়িত্ব। আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, হাদীস শরীফে পরিবারের জন্য হালাল উপার্জনে লিপ্ত ব্যক্তিকে আল্লাহর রাস্তায় কর্মরত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, স্ত্রীকে নিজে হাতে খাবার খাওয়ানো বা পানি পান করানোও বড় নেক আমল। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ.

"একটি দীনার তুমি ব্যয় করেছ আল্লাহর রাস্তায়, একটি দীনার তুমি ব্যয় করেছ ক্রীতদাস মুক্ত করতে, একটি দীনার তুমি দরিদ্রকে দান করেছ এবং একটি দীনার তুমি তোমার স্ত্রীর জন্য ব্যয় করেছ। এগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি সাওয়াব হলো যে দীনারটি তুমি তোমার স্ত্রীর জন্য ব্যয় করেছ।"[২]

হাযেরীন, স্বামীর এ দায়িত্বের মুকাবিলায় স্ত্রীর দায়িত্ব হলো স্বামীর প্রতি কৃতজ্ঞতা অনুভব করা ও প্রকাশ করা। কৃতজ্ঞতার অংশ হিসেবে তার ত্রুটিবিচ্যুতি ক্ষমা করা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

لاَ يَنْظُرُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى امْرَأَةٍ لاَ تَشْكُرُ لِزَوْجِهَا وَهِيَ لاَ تَسْتَغْنِيْ عَنْهُ

"যে নারী স্বামীর মুখাপেক্ষী হওয়া সত্ত্বেও স্বামীর প্রতি কৃতজ্ঞ নয় আল্লাহ সে নারীর প্রতি দৃকপাত করেন না।"[৩] কৃতজ্ঞতার গভীরতা বুঝাতে বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি কোনো

---

[১] তিরমিযী, আস-সুনান ৩/৪৬৭। তিনি বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।

[২] মুসলিম, আস-সহীহ ২/৬৯২।

[৩] নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা ৫/৩৫৪; বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা ৭/২৯৪; আলবানী, সহীহুত তারগীব ২/১৯৮। হাদীসটি সহীহ।

মানুষের জন্য অন্য মানুষকে সাজদা করা বৈধ হতো তবে আমি স্ত্রীকে বলতাম স্বামীকে সাজদা করতে।

হাযেরীন, সংরক্ষণের দায়িত্বের একটি দিক হলো শাসন। আল্লাহ বলেন:

وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

"তোমরা যাদের অবাধ্যতার আশঙ্কা কর তাদেরকে সদুপদেশ দাও, শয্যায তাদেরকে বর্জন কর এবং তাদেরকে (মৃদু) প্রহার কর। যদি তারা তোমাদের আনুগত্য করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কোনো পথ অনুসন্ধান করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমুন্নত মহান।"[১]

হাযেরীন, শাসনের ক্ষেত্রে দ্বিমুখী বিভ্রান্তির শিকার আমরা। কেউ ভাবেন, স্ত্রীকে প্রহার! এ কেমন কথা!! আমাদের বুঝতে হবে যে, ইসলাম শুধু আমাদের মত "সুশীল মানুষদের" জন্য বিধান নিয়ে আসে নি। ইসলাম সর্বকালের সকল সমাজের মানুষের জন্য। সুসভ্য, অসভ্য, শিক্ষিত, অশিক্ষিত সকল সমাজের মানুষই যেন আল্লাহর নির্দেশনার মধ্যে থেকে দুনিয়া-আখিরাতের শান্তি ও সফলতা লাভ করতে পারে আল্লাহ তার ব্যবস্থা দিয়েছেন। মার্জিত স্বভাবের সভ্য পরিবার বা সমাজের একজন নারীর জন্য স্বামীর আদর-ভালবাসাই যথেষ্ট। আবার অন্য পরিবেশ, দেশ, যুগ বা সমাজের কোনো নারীর জন্য হয়ত এরূপ আচরণ যথেষ্ট নয়। সে সকল সমাজে আদর, উপদেশ, বিছানায় বর্জন ও মানসিক চাপ ব্যর্থ হয় সেখানে তালাকের চেয়ে দৈহিক চাপ প্রয়োগ উত্তম ও অধিক কার্যকর হতে পারে। বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, প্রহার অবশ্যই মৃদু হতে হবে, যা মূলত মানসিক চাপ, দৈহিক চাপ নয়।

হাযেরীন, এ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিভ্রান্তি হলো, আনুগত্য ও শাসনে ক্ষেত্র না বুঝা। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত হলো, ব্যক্তিগত বিষয়ে অবাধ্যতার কারণে স্ত্রী, সন্তান বা খাদেমকে রাগ না করা বা শাসন না করা, কিন্তু দীন সম্পর্কিত বিষয়ে শাসন করা। অধিকাংশ মুসলিম স্বামীই এর উল্টো করে থাকেন। স্ত্রী যদি তার ব্যক্তিগত খেদমতে ত্রুটি করেন বা ব্যক্তিগত আদেশ নিষেধ অমান্য করেন তবে তিনি মহাখাপ্পা হয়ে শাসন শুরু করেন। অথচ স্ত্রী শরীয়ত লঙ্ঘন করলে তিনি তেমন রিবক্ত হন না। এছাড়া কোন বিষয়ে আনুগত্য ফরয় এবং কোন্ বিষয়ে ফরয নয় তা লক্ষ্য রাখতে হবে। যে বিষয়ে আনুগত্য ফরয নয় সে বিষয়ে আনুগত্য না করা ইসলামের দৃষ্টিতে অবাধ্যতা বলে গণ্য নয়।

হাযেরীন, পারিবারিক জীবনে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের সম্মিলিতি ও পারস্পরিক আরো দায়িত্বের কথা কুরআন ও হাদীসে বলা হয়েছে। পরস্পরকে নেক কাজে উৎসাহ দেওয়া, অন্যায় থেকে নিষেধ করা, ধৈর্য ধারণে উৎসাহিত করা ফরয ইবাদত ও সফলতার পথ। উভয়কে উগ্রতা পরিহার করে ধৈর্য, নম্রতা ও ত্যাগের পথ গ্রহণ করতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা আল্লাহর রহমত ও তাওফীক প্রার্থনা করা। ঘুমানোর আগে বা শেষ রাতে সাধ্যমত দুজনে একত্রে রাতের সালাত বা তাহাজ্জুদ আদায় করতে হবে। গভীর আবেগে আল্লাহর কাছে দুআ করতে হবে:

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

" হে আমাদের রব, আমাদেরকে এমন দাম্পত্য সাথী ও বংশধর দান করুন যারা আমাদের চক্ষু শীতল করবে এবং আমাদেরকে আপনি মুত্তাকীদের নেতা বানিয়ে দিন।"[২] আমীন।

---

[১] সূরা নিসা: ৩৪ আয়াত।

[২] সূরা (২৫) ফুরকান: ৭৪ আয়াত।

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

أَمَّا بَعْدُ، فَيَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ، قَالَ اللهُ تَعَالَىَ: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

وَقَالَ تَعَالىَ: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا، خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

بَارَكَ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ فِيْ الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ. وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ. أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ، فَاسْتَغْفِرُوْهُ وَتُوْبُوْا إِلَيْهِ، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.

শাবান মাসের ২য় খুতবা: নিসফ শা'বান বা শবে বরাত

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লী আলা রাসূলিহীল কারীম। আম্মা বাদ,

সম্মানিত উপস্থিতি, আজ শাবান মাসের দ্বিতীয় জুমুআ। আজ আমরা নিসফ শাবান বা শবে বরাত সম্পর্কে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ। কিন্তু তার আগে আমরা এ সপ্তাহের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসগুলির বিষয়ে সংক্ষেপ আলোকপাত করি। হাযেরীন, আজ ইংরেজী ..... মাসের ..... তারিখ। এ সপ্তাহের দিবসগুলির মধ্যে রয়েছে ....।

হাযেরীন, শাবান মাস একটি মুবারক মাস। বিভিন্ন সহীহ হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ মাসে বেশি বেশি নফল রোযা পালন করতেন। শাবান মাসের সিয়ামই ছিল তার কাছে সবচেয়ে প্রিয়। এমাসের প্রথম থেকে ১৫ তারিখ পর্যন্ত এবং কখনো কখনো প্রায় পুরো শাবান মাসই তিনি নফল সিয়াম পালন করতেন। এ বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন,

وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ

"এ মাসে রাব্বুল আলামীনের কাছে মানুষের কর্ম উঠানো হয়। আর আমি ভালবাসি যে, আমার রোযা রাখা অবস্থায় আমার আমল উঠানো হোক।"[১]

হাযেরীন, এ মাসের একটি বিশেষ রাত হলো শবে বরাত। আমরা বাংলায় অনেক সময় "ভাগ্য রজনী" বলে থাকি। কিছু হাদীস প্রচলিত আছে যে, এ রাত্রিতে ভাগ্য অনুলিপি করা হয় বা পরবর্তী বছরের জন্য হায়াত-মওত ও রিযক ইত্যাদির অনুলিপি করা হয়। মুহাদ্দিসগণ একমত যে, এ অর্থে বর্ণিত হাদীসগুলির সনদ অত্যন্ত দুর্বল অথবা জাল ও বানোয়াট। এ অর্থে কোনো সহীহ, হাসান বা কোনো গ্রহণযোগ্য হাদীস বর্ণিত হয় নি। উল্লেখ্য যে, সূরা দুখানের ৩-৪ আয়াতে আল্লাহ বলেন:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ

"আমি তো তা অবতীর্ণ করেছি এক মুবারক রজনীতে এবং আমি তো সতর্ককারী। এই রজনীতে প্রত্যক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়।"[২]

এর ব্যাখ্যায় তাবিয়ী ইকরিমাহ, বলেন, এখানে 'মুবারক রজনী' বলতে 'মধ্য শা'বানের রাতকে' বুঝানো হয়েছে। তার মতে, এ রাতে গোটা বছরের সকল বিষয়ে ফয়সালা করা হয়। কিন্তু অন্যান্য সাহাবী-তাবিয়ী বলেছেন যে, এখানে "লাইলাতুম মুবারাকা" বলতে লাইলাতুল কদর বুঝানো হয়েছে। মুফাস্সিরগ ইকরিমার মত বাতিল বলেছেন এবং অন্যান্য সাহাবী-তাবিয়ীর মত গ্রহণ করেছেন। শবে বরাতের ফযীলত প্রমাণিত। তবে এ আয়াতে শবে বরাতের কথা বলা হয় নি। কারণ আল্লাহ কুরআনে সুস্পষ্ট বলেছেন যে, তিনি রামাদানে কুরআন নাযিল করেছেন। কাজেই বিভিন্ন উদ্ভট ব্যাখ্যা দিয়ে শবে বরাতে কুরআন নাযিলের দাবি করা ভিত্তিহীন ও অর্থহীন। আল্লাহ কুরআন নাযিলের রাতকে "লাইলাতুল কাদ্‌র" বা 'মহিমান্বিত রজনী' বলে অভিহিত করেছেন। অন্যত্র এই রাত্রিকেই 'লাইলাতুম মুবারাকা' বা 'বরকতময় রজনী' বলে অভিহিত করেছেন। এ মহিমান্বিত ও বরকতম রাত বা লাইলাতুল কাদরেই সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়। তাবারী, ইবনু কাসীর, রুহূল মাআনী, মাআরিফুল কুরআন সহ যে কোনো তাফসীরে সূরা দুখানের তাফসীর পড়লেই আপনারা বিষয়টি জানতে পারবেন।

---

[১] নাসাঈ, আস-সুনান ৪/২০১; আলবানী, সহীহুত তারগীব ১/২৪৭। হাদীসটি হাসান।
[২] সূরা: ৪৪-দুখান: আয়াত ৩-৪।

হাযেরীন, হাদীসে এবং সাহাবী-তাবিয়ীদের যুগে "লাইলাতুল বারাআত" পরিভাষাটি ছিল না। হাদীসে এ রাতটিকে "লাইলাতু নিসফি শা'বান" বা "মধ্য শাবানের রাত " বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

إِنَّ اللَّهَ لَيَطَّلِعُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ

"আল্লাহ তা'য়ালা মধ্য শাবানের রাতে তাঁর সৃষ্টির প্রতি দৃকপাত করেন এবং মুশরিক ও বিদ্বেষ পোষনকারী ব্যতীত সকলকে ক্ষমা করে দেন।"[1]

হাযেরীন, ৮ জন সাহাবীর সূত্রে বিভিন্ন সনদে এ হাদীসটি বর্ণিত। শবে বরাত বিষয়ে এটিই একমাত্র সহীহ হাদীস। এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, এ রাতটি ফযীলতময় এবং এ রাতে আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে ক্ষমা করেন। আর ক্ষমা লাভের শর্ত হলো শিরক ও বিদ্বেষ থেকে মুক্ত হওয়া। এ দুটি বিষয় থেকে যে ব্যক্তি মুক্ত হতে পারবেন তিনি কোনোরূপ অতিরিক্ত আমল ছাড়াই এ রাতের বরকত ও ক্ষমা লাভ করবেন। আর যদি এ দুটি বিষয় থেকে মুক্ত হতে না পারি, তবে কোনো আমলেই কোনো কাজ হবে না। কারণ ক্ষমার শর্ত পূরণ হলো না। দুঃখজনক হলো, আমরা শবে বরাত উপলক্ষ্যে অনেক কিছুই করি, তবে সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এ দুটি শর্ত পূরণের চেষ্টা খুব কম মানুষই করেন।

শিরকের ভয়াবহতা আমরা জানি। আরেকটি ভয়ঙ্কর পাপ হিংসা বিদ্বেষ। মহাপাপ হওয়া ছাড়াও এ পাপের দুটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। প্রথমত, তা অন্যান্য নেক আমল ধ্বংস করে দেয়। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, আগুন যেমন খড়কুটো ও খড়ি পুড়িয়ে ফেলে হিংসাও তেমনি মানুষের নেক আমল পুড়িয়ে ফেলে। এ পাপের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো আল্লাহর সাধারণ ক্ষমা থেকে বঞ্চিত হওয়া। উপরের হাদীস থেকে আমরা তা জেনেছি। এ বিষয়ে অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

تُعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ إِلاَّ عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ اتْرُكُوا أَوْ ارْكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَفِيئَا

"মানুষদের আমল প্রতি সপ্তাহে দুবার পেশ করা হয়: প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার। তখন সকল মুমিন বান্দাকে ক্ষমা করা হয়, কেবলমাত্র যে বান্দার সাথে তার ভাইয়ের বিদ্বেষ-শত্রুতা আছে সে ব্যক্তি বাদে। বলে দেওয়া হয়, এরা যতক্ষণ না ফিরে আসে ততক্ষণ এদেরকে বাদ দাও।"[2]

হাযেরীন, মুসলিম ভাইকে ভালবাসা ও তার কল্যাণকামনা যেমন ফরয ইবাদত, তেমনি ভয়ঙ্কর হারাম পাপ হলো মুসলিম ভাইকে শত্রু মনে করা, তার প্রতি হৃদয়ের মধ্যে অশুভকামনা ও শত্রুতা পোষণ করা। কোনো কারণে কাউকে ভালবাসতে না পারলে অন্তত শত্রুতা ও অশুভকামনার অনুভূতি থেকে হৃদয়কে রক্ষা করা আমাদের অন্যতম দায়িত্ব। হাযেরীন, দুনিয়াতে কেউ আমাদের পাওনা, অধিকার, সম্পদ বা পরিজনের ক্ষতি করলে আমাদের ন্যায্য অধিকার আদায় করার সর্বপ্রকার বৈধ চেষ্টা করতে ইসলামে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নিজের হক্ক আদায়ের জন্য প্রচেষ্টা করা মুমিনের দায়িত্ব। এতে অন্য মুমিনের সাথে আমাদের বিরোধ হতে পারে। তবে বিরোধ ও বিদ্বেষ এক নয়। আমাদের হক্ক আদায়ের চেষ্টা করতে হবে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় কথা বলতে হবে। কিন্তু অপ্রাসঙ্গিক গীবত, নিন্দা, শত্রুতা, অমঙ্গল কামনা ও ক্ষতি করার চিন্তা থেকে হৃদয়কে সর্বোতভাবে পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করতে হবে। সংঘাতময় জীবনে মানুষ হিসেবে আমাদের মধ্যে রাগ, লোভ, ভয়, হিংসা ইত্যাদি আসবেই।

---

[1] ইবনু মাজাহ, আস- সুনান ১/৪৪৫; বাযযার, আল-মুসনাদ ১/১৫৭, ২০৭, ৭/১৮৬; আহমদ ইবনু হাম্বল, আল-মুসনাদ ২/১৭৬; ইবনু আবি আসিম, আস-সুন্নাহ,পৃ ২২৩-২২৪; ইবনু হিব্বান, আস-সহীহ ১২/৪৮১; তাবরানী, আল-মুজাম আল-কাবীর, ২০/১০৮, ২২/২২৩; আল-মুজাম আল-আওসাত, ৭/৬৮; বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান, ৩/৩৮১; ইবনু খুযায়মা, কিতাবুত তাওহীদ ১/৩২৫-৩২৬।

[2] মুসলিম, আস-সহীহ ৪/১৯৮৮।

এসে যাওয়াটা অপরাধ নয়, বরং পুষে রাখাটাই অপরাধ। মনটা একটু শান্ত হলেই যার প্রতি বিদ্বেষভাব মনে আসছে তার নাম ধরে তার কল্যাণকামনা করে দোয় করবেন। বিরোধিতা থাকলে আল্লাহর কাছে বলবেন, আল্লাহ আমার হক্ক আমাকে পাইয়ে দিন, এছাড়া তার কোনো অমঙ্গল আমি চাই না। দেখা হলে সালাম দিবেন। এরূপ আচরণ আপনার জীবনে বিজয়, সফলতা ও রহমত বয়ে আনবে।

হাযেরীন, হিংসা বিদ্বেষের ভয়ঙ্করতম রূপ ধর্মীয় মতভেদগত বিদ্বেষ। খুটিনাটি মতভেদ নিয়ে শত্রুতা করা এবং মতভেদকে দলভেদ বানিয়ে দেওয়া ইহূদী-খৃস্টান ও অন্যান্য জাতির ধ্বংসের অন্যতম কারণ। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) অনেক হাদীসে এ বিষয়ে উম্মাতকে সতর্ক করেছেন। এক হাদীসে তিনি বলেন :

دَبَّ إِلَيكُمْ دَاءُ الأُمَمِ قَبْلَكُمْ الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ هِيَ الْحَالِقَةُ لا أَقُولُ تَحْلِقُ الشَّعَرَ وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّينَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَفَلا أُنَبِّئُكُمْ بِمَا يُثَبِّتُ ذَاكُمْ لَكُمْ أَفْشُوا السَّلامَ بَيْنَكُمْ

"পূর্ববর্তী ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিগুলির ব্যাধি তোমাদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছে : হিংসা ও বিদ্বেষ। এই বিদ্বেষ মুণ্ডন করে দেয়। আমি বলি না যে তা চুল মুণ্ডন করে, বরং তা দ্বীন মুণ্ডন ও ধ্বংস করে দেয়। আমার প্রাণ যাঁর হাতে তাঁর শপথ করে বলছি, মুমিন না হলে তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আর একে অপরকে ভালো না বাসলে তোমরা মুমিন হতে পারবে না। এ ভালবাসা প্রতিষ্ঠার মাধ্যম আমি শিখিয়ে দিচ্ছি, সর্বত্র ও সবর্দা পরস্পরে সালাম প্রদানের রেওয়াজ প্রচলিত রাখবে।"[১]

হাযেরীন, হিংসা-বিদ্বেষ দীনদার মানুষদের প্রিয়তম ও মজাদার পাপ। যে দীনদার মানুষ কোনোভাবেই গানবাজনা শুনতে বা সিনেমা দেখতে রজি নন, সে মানুষটিই খুটিনাটি ধর্মীয় মতভেদ নিয়ে অন্য মুসলিমের প্রতি শত্রুত্বা ও বিদ্বেষ পোষণ করেন। অথচ গানবাজনার চেয়েও ভয়ঙ্করতম পাপ বিদ্বেষ। কারণ গানবাজনার কারণে পাপ হলেও অন্য নেক আমল নষ্ট হওয়া বা আল্লাহর সাধারণ ক্ষমা থেকে বঞ্চিত হওয়ার কথা বর্ণিত হয় নি। আর বিদ্বেষের বিষয়ে অতিরিক্ত এ দুটি শাস্তিই রয়েছে।

হাযেরীন, শয়তান সকল আদম সন্তানকেই জাহান্নামে নিতে চায়। কুফরী, মদ, ব্যভিচার ইত্যাদি মহাপাপ তার অস্ত্র। তবে যে সকল দীনদার মানুষ পাপ থেকে আত্মরক্ষা করতে সচেষ্ট তাদেরকে জাহান্নামে নেওয়ার জন্য শয়তানের অন্যতম অস্ত্র তিনটি: শিরক, বিদ'আত ও হিংসা-বিদ্বেষ। এ পাপগুলিকে শয়তান "ধর্মের" লেবাস পরিয়ে দেয়, ফলে দীনদার মানুষ না বুঝেই তার ক্ষপ্পরে পড়েন।

হাযেরীন, শয়তানের ওয়াসওয়াসায় পাপের প্রতি ঘৃণার নামে আমরা মুসলমান ভাইকে ঘৃণা করি বা তাকে শত্রু মনে করি ও বিদ্বেষ পোষণ করি। হাযেরীন, পাপকে ঘৃণা করা যেমন আমাদের দায়িত্ব, তেমনি পুণ্যকে ভালবাসাও আমাদের দায়িত্ব। কাজেই পাপ-পুন্যের ব্যালান্স করেই হিংসা ও ভালবাসা থাকবে। সবচেয়ে বড় পুণ্য ঈমান। যতক্ষণ কোনো মানুষকে সুনিশ্চিতভাবে কসম করে কাফির বলে দবি করতে না পারব, ততক্ষণ তাকে ভালবাসা আমাদের জন্য ফরয। তার পাপের ওযন অনুসারে তার প্রতি আমার বিরক্তি থাকবে। কিন্তু কখনোই কোনো বিদ্বেষ, শত্রুতা বা অমঙ্গল কামনা থাকবে না। বরং মুমিন ভাই হিসেবে তাকে ভালবাসব, তাকে সালাম দিব, দুআ করব। মনে করুন, একজন মুসলমান নামায পড়েন এবং দাড়ি রাখেন, আর অন্য মুসলমান নামায পড়েন কিন্তু দাড়ি রাখেন না। দাড়ি পালনকারী মুসলিমের প্রতি আমার ভালবাসা বেশি হবে। দাড়ি কাটা কর্মের প্রতি আমার ঘৃণা থাকবে। দাড়ি কাটার কারণে উক্ত মুসলিম ভাইয়ের প্রতি আমার আপত্তি বা বিরক্তি থাকতে পারে। কিন্তু কোনো

[১] তিরমিযী, আস-সুনান ৪/৬৬৪, আহমদ, আল-মুসনাদ আহমদ ১/১৬৪, হাকিম, আল-মুসতাদরাক ৪/১৮৫, হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৮/৩০, আলবানী, ইরওয়াউল গালীল ৩/২৩৭-২৪২, নং ৭৭৭। হাদীসটি হাসান।

অবস্থাতেই তার প্রতি আমার বিদ্বেষ বা শত্রুতা থাকতে পারে না। যদি দাড়ির জন্য তাকে শত্রু বানান, তাহলে তার ঈমান ও নামায কোথায় রাখবেন? আল্লাহ্ বলেছেন, মুমিনের পুণ্যকে ১০ থেকে ৭০০ গুণ বৃদ্ধি করে সাওয়াব দেবেন, আর পাপের জন্য একটিই শাস্তি। অথচ আমরা শয়তানের ওয়াসওয়াসায় মুমিনের পুণ্যকে অবজ্ঞা করে পাপকে ৭০০ গুণ বৃদ্ধি করে ফেলি। হয়ত বললেন, দাড়ি রাখেনি মানেই নবী মানে না, কাজেই ওর ঈমান বা নামায-রোযার দাম কী? এগুলি হলো মুসলমানকে বিদ্বেষ করার শয়তানী ওয়াসওয়াসা। মুমিনের পুণ্যকে বড় করে দেখুন, পাপের জন্য ওযর খুজুন, দোয়া করুন, নসীহত করুন, কিন্তু মুমিনের প্রতি হৃদয়ে বিদ্বেষ বা শত্রুভাব রাখবেন না।

হাযেরীন, আরো লক্ষ্যণীয় যে, ফরয-ওয়াজিব নষ্ট করা বা হারামের লিপ্ত হওয়ার কারণে কিন্তু কেউ কাউকে ঘৃণা করছে না। এমনকি দাড়ি কাটার মত সুস্পষ্ট পাপের কারণেও হিংসা বিদ্বেষ হচ্ছে না। কিন্তু মতভেদীয় পাপ-পুণ্যের কারণে হিংসা বিদ্বেষ ছড়াচ্ছি। মীলাদ, কিয়াম, মুনাজাত, যিকরের পদ্ধতি, দীন প্রচার ও কায়েমের পদ্ধতি, কোনো একজন ইমাম, পীর, দল বা মতের কারণে আমরা একে অপরকে ঘৃণা করছি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সবই মুস্তাহাব-মাকরূহ পর্যায়ের। এ ধরনের বিষয় নিয়ে মুসলমান ভাইয়ের প্রতি হিংসা, বিদ্বেষ বা শত্রুভাব পোষণ করা যে শয়তানের ষড়যন্ত্র তা বুঝতে কি বেশি বুদ্ধির প্রয়োজন?

সবচেয়ে বড় কথা, মুমিনকে নিজের গোনাহের চিন্তায় ও আল্লাহর যিক্‌রে ব্যস্ত থাকতে হবে। অন্যের পাপের চিন্তা থেকে বিরত থাকতে হবে। এতে আমাদের হৃদয়গুলি বিদ্বেষ মুক্ত হবে। কোনো একজন মুমিনের বিরুদ্ধেও যেন মনের মধ্যে বিদ্বেষ না থাকে সেজন্য কুরআনের ভাষায় সর্বদা দুআ করুন:

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

"হে আমাদের প্রভু, আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং ঈমানের ক্ষেত্রে অগ্রণী আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা করুন। আর আপনি আমাদের অন্তরে মুমিনগণের বিরুদ্ধে কোনো হিংসা, বিদ্বেষ বা অমঙ্গল ইচ্ছা রাখবেন না। হে আমাদের প্রভু, নিশ্চয় আপনি মহা করুণাময় ও পরম দয়ার্দ্র।"[১]

আসুন আমরা সবাই আল্লাহর দরবারে এভাবে বারবার প্রার্থনা করে নিজেদের অন্তরগুলিকে সকল হিংসা, বিদ্বেষ ও অহংবোধ থেকে পবিত্র করি। আসুন আমরা শবে বরাত উপলক্ষ্যে সকল প্রকার শিরক, হিংসা ও বিদ্বেষ থেকে তাওবা করি ও হৃদয়গুলিকে মুক্ত করি। জাগতিক কারণে বা ধর্মীয় মতভেদের কারণে যাদের প্রতি শত্রুভাব বা বিদ্বেষ ছিল তাদের জন্য দুআ করি। তাহলে আমাদের কয়েকটি লাভ হবে। প্রথমত, কঠিন পাপ থেকে তাওবা হলো। দ্বিতীয়ত, শবে বরাতের সাধারাণ ক্ষমা লাভের সুযোগ হল। তৃতীয়ত, বিভিন্ন সহীহ হাদীস থেকে আমরা জানি যে, হিংসা-বিদ্বেষমুক্ত হৃদয় লালন করা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অন্যতম সুন্নাত। যার মনে হিংসা, বিদ্বেষ বা অমঙ্গল কামনা নেই তিনি অল্প আমলেই জান্নাত লাভ করবেন এবং জান্নাতে রাসূলুল্লাহ -এর সাহচার্য লাভ করবেন। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

يَا بُنَيَّ إِنْ قَدَرْتَ أَنْ تُصْبِحَ وَتُمْسِيَ لَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ/ غِلٌّ لأَحَدٍ فَافْعَلْ ثُمَّ قَالَ لِي يَا بُنَيَّ وَذَلِكَ مِنْ سُنَّتِي وَمَنْ أَحْيَا سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ

"বেটা, যদি সম্ভব হয় তাহলে এভাবে জীবনযাপন করবে যে, সকালে সন্ধ্যায় (কখনো) তোমার অন্তরে কারো জন্য কোনো ধোঁকা বা অমঙ্গল কামনা থাকবে না। অতঃপর তিনি বলেন : বেটা, এটা আমার সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত। আর যে আমার সুন্নাতকে (পালন ও প্রচারের মাধ্যমে) জীবিত করবে সে

[১] সূরা হাশর: ১০ আয়াত।

আমাকেই ভালবাসবে। আর যে আমাকে ভালবাসবে, সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।"[১]

হাযেরীন, উপরের সহীহ হাদীস থেকে আমরা জেনেছি যে, হৃদয়কে শিরক ও বিদ্বেষ থেকে মুক্ত করাই শবে বরাতের মূল কাজ। এ রাত্রিতে অন্য কোনো আমল করতে হবে কিনা সে বিষয়ে কোনো সহীহ হাদীস পাওয়া যায় না। তবে আমল করার মত কয়েকটি যয়ীফ হাদীস থেকে তিনটি আমল জানা যায়: প্রথমত: কবর যিয়ারত করা, দ্বিতীয়ত, দুআ করা এবং তৃতীয়ত নফল সালাত আদায় করা।

ইমাম তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ আয়েশা (রা)-এর সূত্রে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, যাতে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) রাতের গভীরে কাউকে না বলে একাকী বাকী গোরস্তানে যেয়ে মুর্দাদের জন্য দুআ করেছেন। তিরমিযী উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর উস্তাদ ইমাম বুখারী হাদীসটিকে যয়ীফ বলেছেন।[২]

ইমাম ইবনু মাজাহ আলী (রা)-এর সূত্রে একটি হাদীস সংকলন করেছেন, যাতে বলা হয়েছে:

إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا فَإِنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ أَلا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ لِي فَأَغْفِرَ لَهُ أَلا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ أَلا مُبْتَلًى فَأُعَافِيَهُ أَلا كَذَا أَلا كَذَا حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ.

যখন মধ্য শাবানের রাত আসে তখন তোমরা রাতে (সালাতে- দোয়ায়) দণ্ডায়মান থাক এবং দিবসে সিয়াম পালন কর। কারণ; ঐ দিন সুর্যাস্তের পর মহান আল্লাহ পৃথিবীর আকাশে অবতরণ করেন এবং বলেন, কোন ক্ষমা প্রার্থনাকারী আছে কি? আমি তাকে ক্ষমা করব। কোন রিয্‌ক অনুসন্ধানকারী আছে কি? আমি তাকে রিয্‌ক প্রদান করব। কোন দুর্দাশাগ্রস্থ ব্যক্তি আছে কি? আমি তাকে মুক্ত করব। এভাবে সুবহে সাদিক উদয় হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকে।[৩]

এ হাদীসের একমাত্র বর্ণনাকারী ইবনু আবী সাবরাহকে ইমাম আহমদ, ইমাম বুখারী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস মিথ্যাবাদী বলে অভিযুক্ত করেছেন।[৪] এছাড়া এ অর্থে আরো কয়েকটি যয়ীফ সনদের হাদীস থেকে এ রাতে দু'আ ও সালাত আদায়ের ফযীলত জানা যায়।

হাযেরীন, এক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় আমাদের মনে রাখতে হবে। প্রথমত, এ রাতের নামাযের কোনো সুনির্ধারিত নিয়ম হাদীসে বলা হয় নি। অমুক সূরা অতবার পড়ে অত রাকাত সালাত আদায় করলে অত সাওয়াব ইত্যাদি যা কিছু বলা হয় সবই জাল ও বানোয়াট কথা। মুমিন তার সুবিধামত যে কোনো সূরা দিয়ে যে কয় রাকআত সম্ভব সালাত আদায় করবেন এবং দুআ করবেন।

দ্বিতীয়ত, যিয়ারত, দুআ ও সালাত সবই একাকী আদায় করাই সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বা সাহাবীগণ কেউ কখনোই এ রাতে মসজিদে সমবেত হন নি বা সমবেতভাবে কবর যিয়ারত করতে যান নি। সকল নফল নামায ও তাহাজ্জুদের মত এ রাতের নামাযও নিজের বাড়িতে পড়া সুন্নাত। হাদীস থেকে আমরা জানি যে, এতে বাড়িতে বরকত নাযিল হয়। এছাড়া এতে স্ত্রী ও সন্তানগণও উৎসাহিত হয়।

হাযেরীন, শবে বরাত হলো ইবাদত বন্দেগি ও দুআ-ক্রন্দনের রাত। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা একে খাওয়া-দাওয়া ও উৎসবের রাত বানিয়ে ফেলেছি। এ রাতে হালূয়া-রুটি বা ভাল খাবার খাওয়া ও এরূপ করার মধ্যে কোনোরূপ সাওয়াব আছে বলে কল্পনা করা ভিত্তিহীন কুসংস্কার ছাড়া কিছুই নয়। এ

---

[১] তিরমিযী, আস-সুনান ৫/৪৬, কিতাবুল ইলম, নং ২৬০২। তিরমিযী বলেন হাদীসটিকে হাসান গরীব।

[২] তিরমিযী, আস-সুনান ৩/১১৬, ইবনু মাজাহ, আস-সুনান ১/৪৪৪, আহমদ বিন হাম্বল, আল-মুসনাদ, ৬/২৩৮।

[৩] ইবনু মাজাহ, আস- সুনান ১/৪৪৪, হাদীস নং ১৩৮৮।

[৪] ইবনু হাজার , তাক্বরীবুত তাহযীব, পৃষ্ঠা ৬৩২; তাহযীবুত তাহযীব, ১২/২৫-২৬ ।

রাতে আলোকসজ্জা, কবর বা গোরস্তানে আলোকসজ্জা, বাজি ফোটানো ইত্যাদি আরো গুরুতর অন্যায়। এগুলি মূলত এ রাতের ইবাদত ও আন্তরিকতা নষ্ট করে এবং মুমিনকে বাজে কাজে ব্যস্ত করে।

হাযেরীন, ফরয ও নফলের সীমারেখা অনুধাবন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনেকে শবে বরাতে রাত্রিতে কম বেশি কিছু নামায পড়েন, কিন্তু সকালে ফযরের নামায জামাতে পড়ছেন না বা মোটেই পড়ছেন না। এর চেয়ে কঠিন আত্মপ্রবঞ্চনা আর কিছুই হতে পারে না। শবে বরাত বা অনুরূপ রাত বা দিনগুলিতে আমরা যা কিছু করি না কেন সবই নফল ইবাদত। সারা জীবনের সকল নফল ইবাদতও একটি ফরয ইবাদতের সমান হতে পারে না। জীবনে যদি কেউ শবে বরাতের নামও না শুনে, কিন্তু ফরয-ওয়াজিব ইবাদত আদায় করে যায় তবে তার নাজাতের আশা করা যায়। আর যদি জীবনে ১০০টি শবে বরাত পরিপূর্ণ আবেগ নিয়ে ইবাদত করে কাটায়, কিন্তু একটি ফরয ইবাদত ছেড়ে দেয় তবে তার নাজাতের আশা থাকে না। আল্লাহর ফরয নির্দেশ অমান্য করে এক রাতে কাঁদা-কাটা করে তাঁর কাছ থেকে ভাল ভাগ্য লিখিয়ে নেওয়ার মত চিন্তা কি কোনো পাগল ছাড়া কেউ করবে? ফরয ইল্‌ম, আকীদা, নামায, যাকাত, রোযা, হজ্ব, হালাল উপার্জন, সাংসারিক দায়িত্ব, পিতা-মাতা, সন্তান ও স্ত্রীর দায়িত্ব, সামাজিক দায়িত্ব, সৎকাজে আদেশ অসৎকাজ থেকে নিষেধ ইত্যাদি সকল ফরয ইবাদত, যার ক্ষেত্রে যতটুকু প্রযোজ্য, পালন না-করে শবে বরাতের সারারাত নফল ইবাদত করা হলো দেহের ফরয সতর আবৃত না করে উলঙ্গ অবস্থায় টুপি-পাগড়ি পরে ফযীলত লাভের চেষ্টার মতই অবান্তর ও বাতুল কর্ম।

হাযেরীন, সবচেয়ে বড় কথা হলো, মুমিন যদি একটু আগ্রহী হন তবে প্রতি রাতই তার জন্য শবে বরাত। বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য ইমাম সংকলিত সহীহ হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

يَنْزِلُ اللَّهُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ حِينَ يَمْضِي ثُلُثُ اللَّيْلِ الأَوَّلُ فَيَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَنَا الْمَلِكُ مَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ فَلا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُضِيءَ الْفَجْرُ

"প্রতি রাতে রাতের প্রথম তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হলে আল্লাহ প্রথম আসমানে নেমে বলেন, আমিই রাজাধিরাজ, আমিই রাজাধিরাজ। আমাকে ডাকার কেউ আছ কি? আমি তার ডাকে সাড়া দিব। আমার কাছে চাওয়ার কেউ আছ কি? আমি তাকে প্রদান করব। আমার কাছে ক্ষমা চাওয়ার কেউ আছ কি? আমি তাকে ক্ষমা করব। প্রভাতের উন্মেষ হওয়া পর্যন্ত এভাবে তিনি বলতে থাকেন।"[১]

অন্যান্য হাদীসে বলা হয়েছে যে, মধ্যরাতের পরে এবং বিশেষত রাতের দু-তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়ার পরে তাওবা কবুল, দুআ কবুল ও হাজত মেটানোর জন্য আল্লাহ বিশেষ সুযোগ দেন।

হাযেরীন, তাহলে আমরা দেখছি, শবে বরাতের যে ফযীলত ও সুযোগ, তা মূলত প্রতি রাতেই মহান আল্লাহ সকল মুমিনকে প্রদান করেন। শবে বরাত বিষয়ক যয়ীফ হাদীসগুলি থেকে বুঝা যায় যে, এ সুযোগ সন্ধ্যা থেকেই। আর উপরের সহীহ হাদীসগুলি থেকে জানা যায় যে, প্রতি রাতেই এ সুযোগ শুরু হয় রাতের এক তৃতীয়াংশ- অর্থাৎ ৩/৪ ঘন্টা রাত অতিবাহিত হওয়ার পরে, রাত ১০/১১ টা থেকে। কাজেই মুমিনের উচিত শবে বরাতের আবেগ নিয়ে প্রতি রাতেই সম্ভব হলে শেষ রাত্রে, না হলে ঘুমানোর আগে রাত ১০/১১ টার দিকে দুচার রাকআত সালাত আদায় করে মহান আল্লাহর দরবারে নিজের সকল কষ্ট, হাজত, প্রয়োজন ও অসুবিধা জানিয়ে দুআ করা, নিজের যা কিছু প্রয়োজন আল্লাহর কাছে চাওয়া এবং সকল পাপ-অন্যায় থেকে ক্ষমা চাওয়া। হাযেরীন, কয়েকমাস এরূপ আমল করে দেখুন, জীবনটা পাল্টে যাবে। ইনশা আল্লাহ নিজেদের জীবনে আল্লাহর রহমত অনুভব করবেন। আল্লাহ আমদের তাওফীক দিন। আমীন।

---

[১] মুসলিম, আস-সহীহ ১/৫২২।

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

أَمَّا بَعْدُ، فَيَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ

حَكِيمٍ

وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ لَيَطَّلِعُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ

وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تُعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ إِلاَّ عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ اتْرُكُوا أَوْ ارْكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَفِيئَا

بَارَكَ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ فِيْ الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ. وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ. أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ، فَاسْتَغْفِرُوْهُ وَتُوْبُوْا إِلَيْهِ، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.

শাবান মাসের ৩য় খুতবা: ইসলামের স্বাস্থ্যনীতি ও অসুস্থের প্রতি দায়িত্ব

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লী আলা রাসূলিহীল কারীম। আম্মা বাদ,

সম্মানিত উপস্থিতি, আজ শাবান মাসের ৩য় জুমুআ। আজ আমরা ইসলামের স্বাস্থ্যনীতি ও অসুস্থের প্রতি দায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ। কিন্তু তার আগে আমরা এ সপ্তাহের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসগুলির বিষয়ে সংক্ষেপ আলোকপাত করি। হাযেরীন, আজ ইংরেজী ..... মাসের ..... তারিখ। এ সপ্তাহের দিবসগুলির মধ্যে রয়েছে .... ।

সম্মানিত মুসল্লীবৃন্দ, মানব জীবনে আল্লাহর অন্যতম নেয়ামত স্বাস্থ্য। স্বাস্থ্য শুধু দুনিয়ার নেয়ামতই নয়, তা আল্লাহর ভালবাসা লাভের মাধ্যম, কারণ আল্লাহ্ শক্তিশালী ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী বান্দাকে ভালবাসেন। দৈহিক, মানসিক ও ঈমানী দিক থেকে যে বান্দা অধিক শক্তিশালী আল্লাহ্ তাকে অধিক ভালবাসেন মর্মে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন:

الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ

"দুর্বল মুমিনের চেয়ে শক্তিশালী মুমিন অধিকতর কল্যাণময় এবং আল্লাহর নিকট অধিকতর প্রিয়, তবে উভয়ের মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে।"[১]

স্বাস্থ্যের নেয়ামতের বিষয়ে অসতর্কতা ও অবহেলা সম্পর্কে সতর্ক করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন:

نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ

"দুটি নিয়ামতের বিষয়ে অধিকাংশ মানুষই অসতর্কত ও প্রতারিত: সুস্থতা ও অবসর।"[২]

হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, শরীরের সুস্থতা, পরিবারের শান্তি ও নিরাপত্তা ও খাদ্যের নিশ্চয়তা এ তিনটি বিষয় জাগতিক জীবনে মানুষের সবচেয়ে বড় পাওয়া। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন:

مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ مُعَافًى فِي جَسَدِهِ آمِنًا فِي سِرْبِهِ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا

"তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি দেহের সার্বিক সুস্থতা এবং পরিবারের নিরাপত্তা নিয়ে দিবসের শুরু করল এবং তার কাছে যদি সেদিনের খাদ্য সঞ্চিত থাকে তবে সে যেন পুরো দুনিয়াই লাভ করল।"[৩]

মুহতারাম হাযেরীন, উপরের আয়াত ও হাদীসগুলি আমাদেরকে সুস্বাস্থ্য অর্জনে ও রক্ষায় অনুপ্রাণিত করে। তবে সবচেয়ে বড় কথা হলো, ইসলাম আমাদেরকে এমন একটি জীবন পদ্ধতি প্রদান করেছে যে, যদি কোনো মানুষ ইসলামের এ নিয়মগুলি ন্যূনতমভাবেও মেনে চলে তবে সাধারণভাবে সে সুস্বাস্থ্য লাভ ও রক্ষা করতে পারবে। অতি সংক্ষেপে আমরা এ সকল বিষয়ের উল্লেখ করব। আমরা যদি অসুস্থতা বা রোগব্যাধির কারণ অনুসন্ধান করি তাহলে দেখব যে, সাধারণভাবে তা নিম্নরূপ: (১) খাদ্য বা খাদ্যাভ্যাস জনিত। যেমন, খাদ্যের অভাব, ক্ষতিকর খাদ্য গ্রহণ, অতিভোজন ইত্যাদি। (২) অলসতা, পরিশ্রমহীনতা বা অতি পরিশ্রম। (৩) অনিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন। (৪) অপরিচ্ছন্নতা। (৫) অশ্লীলতা, (৬) মানসিক অস্থিরতা ও উৎকণ্ঠা। (৭) অসতর্কতা। একজন মুমিন যদি অতি সাধারণভাবেও ইসলাম নির্দেশিত জীবন যাপন করেন তবে এ সকল কারণ সবই তার জীবন থেকে বিদায় নেয়।

সম্মানিত মুসল্লীবৃন্দ, খাদ্য ও পানীয় মানুষের সুস্থতার ও অসুস্থতার অন্যতম উপাদান। ইসলামে এ বিষয়ে মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, ক্ষতিকারক খাদ্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং

---

[১] মুসলিম, আস-সহীহ ৪/২০৫২।

[২] বুখারী, আস-সহীহ ৫/২৩৫৭।

[৩] তিরমিযী, আস-সুনান ৪/৫৭৪; ইবনু মাজাহ, আস-সুনান ২/১৩৮৭। তিরমিযী বলেন: হাদীসটি হাসান গরীব।

অতিরিক্ত পানাহার নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

"এবং তোমরা খাও এবং পান কর এবং অপচয় করো না। নিশ্চয় তিনি অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না।"[১]

ইসলামে পবিত্র ও উপকারী খাদ্য হালাল করা হয়েছে এবং সকল ক্ষতিকর ও নোংরা খাদ্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে। স্বাস্থ্যের জন্য বিশেষ ক্ষতিকারক দ্রব্য মাদক দ্রব্য। ইসলামে সকল প্রকার মাদক দ্রব্য কঠিনভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট নির্দেশনার আলোকে মুসলিম ফকীহগণ উল্লেখ করেছেন যে, যে খাদ্য নিষিদ্ধ বলে কুরআন বা হাদীসে সুস্পষ্ট উল্লেখ করা হয় নি, কিন্তু তা স্বাস্থ্যের জন্য নিশ্চিত ক্ষতিকর বলে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে তা গ্রহণ করা মুমিনের জন্য হারাম। এমনকি মুবাহ বা বৈধ খাদ্যও যে পরিমান গ্রহণ করলে দেহের ক্ষতি হয় সে পরিমাণ গ্রহণ করা হারাম।

ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি হলো, জীবনের জন্য খাদ্য, খাদ্যের জন্য জীবন নয়। এজন্য একদিকে যেমন অনাহারে থাকা নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তেমনি অতিভোজন নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

مَا مَلأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ حَسْبُ الآدَمِيِّ لُقَيْمَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ فَإِنْ غَلَبَتْ الآدَمِيَّ نَفْسُهُ فَثُلُثٌ لِلطَّعَامِ وَثُلُثٌ لِلشَّرَابِ وَثُلُثٌ لِلنَّفَسِ

"আদম সন্তান তার নিজের পেটের চেয়ে নিকৃষ্টতর কোনো পাত্র পূর্ণ করে নি। দেহকে সুস্থ-সবল কর্মক্ষম রাখতে যতটুকু খাদ্য প্রয়োজন ততটুকুই একজন মানুষের জন্য যথেষ্ট। যদি কোনো মানুষের খাদ্যস্পৃহা বেশি প্রবল হয় (বেশি খাওয়ার ইচ্ছা দমন করতে না পারে) তবে সে পেটের এক তৃতীয়াংশ খাদ্যের জন্য, এক তৃতীয়াংশ পানীয়ের জন্য ও এক তৃতীয়াংশ শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য রাখবে।"[২]

রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে কখনো বিশেষ মেহমানদারির প্রয়োজন ছাড়া পেটপুরে আহার করতেন না। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে, মানুষের অধিকাংশ রোগব্যাধির কারণ অতিভোজন। যদি কোনো মুমিন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নির্দেশনা অনুসারে পরিমিত আহারে অভ্যস্থ হন তবে তিনি এ সকল রোগব্যধি থেকে মুক্ত থাকতে পারবেন বা রোগ হলেও তা নিয়ন্ত্রণ থাকবে।

সম্মানিত হাযেরীন, পানাহারের পাশাপাশি নিয়মিত পরিশ্রম ও বিশ্রাম সুস্বাস্থ্যের জন্য অতীব প্রয়োজনীয়। ইসলামী জীবনপন্থায় তা সুনিশ্চিত করা হয়েছে। ইসলামের অলসতাকে অত্যন্ত ঘৃণা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বদা অলসতা থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। তিনি বলতেন:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ

"হে আল্লাহ, আমি আপনার আশ্রয় চাচ্ছি উৎকণ্ঠা থেকে, মনোকষ্ট থেকে, অলসতা থেকে, কাপুরুষতা থেকে, কৃপণতা থেকে, ঋণগ্রস্থতা থেকে এবং মানুষের কর্তৃত্বাধীন হয়ে যাওয়া থেকে।"[৩]

বস্তুত, ইসলামী জীবনধারায় অলসতার কোনো স্থান নেই। ইসলামের নিয়মিত ইবাদত, বিশেষত নিয়মিত ফরয নামায, ও তাহাজ্জুদ, রাতের নামায ও অন্যান্য নফল নামায মানুষের পরিশ্রমের প্রাথমিক চাহিদা পূরণ করে এবং অলসতার পথ বন্ধ করে। জামাতে নামায আদায়ের জন্য সর্বদা হেঁটে মসজিদে যেতে রাসূলুল্লাহ ﷺ উৎসাহ দিয়েছেন। হাঁটার ক্ষেত্রে তিনি নিজে সুদৃঢ় ও লম্বা পদক্ষেপে দ্রুত হাঁটতেন। অবিকল তাঁর মত হাঁটা একজন মুমিনের জীবনে সুন্নাতের অনুসরণের বরকত ছাড়াও অসাধারণ দৈহিক

[১] সূরা আ'রাফ (৭): আয়াত ৩১।
[২] তিরমিযী, আস-সুনান ৪/৫৯০; ইবনু মাজাহ, আস-সুনান ২/১১১১; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ৪/১৩৫, ৩৬৭। হাদীসটি সহীহ।
[৩] বুখারী, আস-সহীহ ৩/১০৫৯, ৫/২০৬৯, ২৩৪০, ২৩৪২।

কল্যাণ এনে দেয়। এছাড়া ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে নিজের সকল কর্ম নিজে করতে উৎসাহ দিয়েছেন। তিনি শরীরচর্চামূলক খেলাধুলা, দৌড়ঝাঁপ, সাতার ইত্যাদিতে বিশেষ উৎসাহ দিয়েছেন।

নিয়মিত পরিশ্রমের পাশাপাশি তিনি নিয়মিত বিশ্রাম ও ঘুমের জন্য বিশেষ নির্দেশ দিয়েছেন। ইবাদতের আগ্রহে বা অন্য কোনো আগ্রহে যেন কেউ বিশ্রাম ও ঘুমের ক্ষেত্রে দেহের ন্যূনতম চাহিদ পূরণে অবহেল না করে সে বিষয়ে বিশেষ নির্দেশ দিয়েছেন। কোনো কোনো সাহাবী ইবাদতের আগ্রহে রাত্রে ঘুমাতেন না এবং দিনে প্রায়শ রোযা রাখতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে রাতে কিছু সময় ঘুমাতে ও কিছু সময় নামায পড়তে এবং দিনে মাঝে মাঝে রোযা রাখতে নির্দেশ দিয়ে বলেন:

إِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجَتِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِصَدِيقِكَ عَلَيْكَ حَقًّا

"তোমার চক্ষুর প্রাপ্য অধিকার রয়েছে তোমার উপর, তোমার দেহের প্রাপ্য অধিকার রয়েছে তোমার উপর, তোমার স্ত্রীর প্রাপ্য অধিকার রয়েছে তোমার উপর, তোমার মেহমানের প্রাপ্য অধিকার রয়েছে তোমার উপর এবং তোমার বন্ধুর প্রাপ্য অধিকার রয়েছে তোমার উপর।"[১]

মুহতারাম হাযেরীন, স্বাস্থ্য নষ্ট হওয়ার আরেকটি কারণ অনিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন। বস্তুত একজন মুমিনের পক্ষে অনিয়ন্ত্রিত জীবন কোনোমতেই সম্ভব নয়। নামায, রোযা, খাওয়া, ঘুম, বিশ্রাম, পরিশ্রম, পারিবারিক জীবন ইত্যাদির মাধ্যমে ইসলামে মুমিনের জন্য এমন একটি রুটীন নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে যার মধ্যে অনিয়ন্ত্রিত জীবন বা জীবনের প্রতি স্বেচ্ছাচারিতার কোনো সুযোগ নেই।

অসুস্থতার অন্যতম কারণ অপরিচ্ছন্নতা, যা ইসলামে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পরিচ্ছন্নতা ইসলামের মৌলিক নির্দেশনা ও ঈমানের অংশ। ইসতিনজা, মেসওয়াক, ওযূ, গোসল, পোশাক-পরিচ্ছদের পবিত্রতা ইত্যাদি বিষয় যদি মুমিন সঠিকভাবে সুন্নত নির্দেশিত পদ্ধতিতে আদায় করেন তবে তিনি সহজেই অপরিচ্ছন্নতা জনিত রোগব্যধি থেকে সাধারণভাবে নিরপদ থাকতে পারবেন। পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক ইসলাম নির্দেশিত আরেকটি কর্ম খাতনা করা। আধুনিক বিজ্ঞান নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করেছে যে, খাতনা শিশু, কিশোর ও বয়স্ক সকলকেই এইডসসহ অনেক মারাত্মক রোগ থেকে রক্ষা করে।

সম্মানিত মুসল্লীবৃন্দ, অসুস্থতার অন্যতম কারণ অশ্লীলতা। আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতায় অশ্লীলতার পথ খোলা রেখে অশ্লীলতা প্রসূত রোগব্যধিগুলি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হয়। এ হলো নৌকার ছিদ্র খোলা রেখে পানি তুলে ফেলে নৌকা বাঁচানোর চেষ্টার মতই অবাস্তব কর্ম। অশ্লীলতা নিজেই একটি কঠিন ব্যধি। উপরন্তু এর মাধ্যমে অগণিত মারাত্মক দৈহিক ও মানসিক রোগ মানুষকে আক্রমন করে। আমরা একাধিক খুতবায় দেখেছি যে, ইসলামে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল প্রকারের অশ্লীলতা এবং অশ্লীতার পথ উন্মুক্ত করতে পারে এমন সকল কর্ম নিষিদ্ধ করা হয়েছে। হাদীস শরীফে সুস্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোনো সমাজের অশ্লীলতার প্রসার ঘটলে সে সমাজে আল্লাহর শাস্তি হিসেবে নতুন নতুন মারাত্মক রোগব্যাধির প্রসার ঘটে।

সম্মানিত মুসল্লীবৃন্দ, দৈহিক সুস্থতার পাশাপাশি মানসিক সুস্থতা মানুষের জন্য অপরিহার্য। বরং মানসিক সুস্থতা দৈহিক সুস্থতার পূর্বশর্ত। প্রকৃতপক্ষে মনই মানুষের দেহ নিয়ন্ত্রণ করে। মানসিক প্রশান্তি, স্থিরতা, উৎফুল্লতা দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং সুস্থতা অর্জনের জন্য দেহের অভ্যন্তরীণ মেকানিজমকে আগ্রহী করে তোলে। পক্ষান্তরে মানসিক উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতা দেহের অসুস্থতা ত্বরান্বিত

[১] বুখারী, আস-সহীহ ২/৬৯৭, ৬৯৮, ৫/১৯৯৫, ২২৭২; মুসলিম, আস-সহীহ ২/৮১৭; আস-সহীহ নাসাঈ, আস-সুনান ৪/২১০।

করে। বর্তমান জড়বাদী সভ্যতা মানুষকে দেহের শান্তি ও বিলাসিতা প্রদান করলেও মনের প্রশান্তি ও স্থিরতা কেড়ে নিয়েছে। ব্যাপক মানসিক উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতা নিয়ন্ত্রণের জন্য অনেকেই 'মেডিটেশন', 'ধ্যান', 'যোগ-ইয়োগা' ইত্যাদির আশ্রয় গ্রহণ করছেন। এগুলির ফলাফল অত্যন্ত সীমিত। সর্বোপরি এগুলি সকলের জন্য পালনযোগ্য বা সহজ নয়। পক্ষান্তরে ইসলামের ইবাদত, প্রার্থনা ও আল্লাহর যিক্র মানসিক সুস্থতা, প্রশান্তি ও স্থিরতার জন্য অত্যন্ত সহজ, স্বাভাবিক, প্রাকৃতিক ও সর্বজনলভ্য পদ্ধতি। ধ্যান, মেডিটেশন, কোয়ান্টাম ইত্যাদিতে মানুষ জোর করে মনকে কিছু 'মিথ্যা' কল্পনা সত্য বলে মানতে বাধ্য করতে চেষ্টা করে। পক্ষান্তরে আল্লাহর যিক্র, দু'আ ও ইবাদতে কোনো কষ্টকল্পনা ছাড়াই স্বাভাবিকভাবে আল্লাহর প্রতি প্রেমের অনুভুতি, আত্মসমর্পন ও নির্ভরতার মমতাময় অনুভুতির মাধ্যমে মানুষ মনের প্রশান্তি ও স্থিরতা লাভ করে এবং তার উৎকণ্ঠা দূরীভূত হয়। সকলেই প্রতিদিন নিয়মিত ইবাদত ছাড়াও অন্তত কিছু সময় আল্লাহর যিকর করবেন। সম্ভব হলে প্রতিদিন ঘুমাতে যাওয়ার আগে ওযূ করে দুচার রাকআত সালাত আদায় করে কয়েক মিনিট সুন্নাত পদ্ধতিতে আল্লাহর যিকর, দরুদ ও দুআ করে ঘুমাতে যাবেন। ইনশা আল্লাহ উৎকণ্ঠা ও দুশ্চিন্তা দূরীভূত হবে এবং অন্তরে অসীম শক্তি ও শান্তি আসবে। আল্লাহ বলেন:

أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

"জেনে রাখ! আল্লাহর যিক্রে অন্তরসমূহ প্রশান্ত হয়।"[১]

হাযেরীন, এ ছাড়া ইসলামের নির্মল বিনোদন, খেলাধুলা, হাঁসি-তামাশা ও কৌতুকের জন্য উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালবাসার ক্রন্দন এবং নির্মল বিনোদন ও হাসি-কৌতুক মানুষের ভারসম্যপূর্ণ মানসিকতার জন্য খুবই প্রয়োজন।

হাযেরীন, অসুস্থতার আরেকটি কারণ স্বাস্থ্য বিষয়ক অসতর্কতা। বিভিন্ন হাদীসে মুমিনদেরকে স্বাস্থ্য বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন খাদ্য ও পানীয় আবৃত করে রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিশেষত রাত্রিকালে খাদ্য বা পানীয় অনাবৃত করে রাখতে কঠিনভাবে নিষেধ করা হয়েছে। খাদ্য বা পানীয়ের মধ্যে শ্বাস প্রশ্বাস ফেলতে বা ফুঁক দিতে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। কঠিন রৌদ্রতাপ থেকে সাধ্যমত আত্মরক্ষা করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ময়লা হাত পনিতে প্রবেশ করাতে নিষেধ করা হয়েছে। কুকুরের ঝুটা পাত্র মাটি ও পানি দিয়ে ৭ বা ৮ বার ধৌত করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ডান হাতকে খাওয়া-দাওয়া ও বাম হাতকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য ব্যবহার করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ সকল বিষয়ে বিস্তারিত জানা মুমিনের প্রয়োজন। মনোদৈহিক সুস্বাস্থ্যর জন্য অন্যতম প্রয়োজনীয় বিষয় বিবাহ, ও স্ত্রী-সন্তানসহ পারিবারিক জীবন। ইসলামে বিষয়টি অত্যন্ত বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

সম্মানিত মুসল্লীবৃন্দ, সকল সতর্কতার পরেও অসুস্থতা আসতে পারে। সেক্ষেত্রে মুমিনের অনেক কিছু করণীয় রয়েছে। সর্বপ্রথম করণীয় হলো সকল অস্থিরতা ও হতাশা থেকে অন্তরকে মুক্ত রাখা। মুমিন সকল প্রকার সতর্কতা অবলম্বন করবেন, কারণ এরূপ করাই আল্লাহর নির্দেশ। কিন্তু তারপরও কোনো বিপদ, অসুস্থতা উপস্থিত হলে মুমিনের ঈমানী দায়িত্ব হলো আল্লাহর সিদ্ধান্ত সর্বান্তকরণে যথাসম্ভব আনন্দিত চিত্তে মেনে নেওয়া। মুমিন বিশ্বাস করেন যে, সকল বিপদ, কষ্ট মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে গোনাহ মাফের জন্য বা মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য আসে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلا وَصَبٍ وَلا هَمٍّ وَلا حُزْنٍ وَلا أَذًى وَلا غَمٍّ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا إِلاَّ كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ

[১] সূরা ১৩-রা'দ: ২৮ আয়াত।

"যে কোনো প্রকারের ক্লান্তি, অবসাদ, অসুস্থতা, দুশ্চিন্তা, মনোবেদনা, কষ্ট, উৎকণ্ঠা যাই মুসলিমকে স্পর্শ করুক না কেন, এমনকি যদি একটি কাঁটাও তাকে আঘাত করে, তবে তার বিনিময়ে আল্লাহ তার গোনাহ থেকে কিছু ক্ষমা করবেন।"[১]

হাযেরীন, কখনোই মনে করা যাবে না যে, যদি আমি এরূপ করতাম তাহলে হয়ত এরূপ হতো, অথবা এরূপ না করলে হয়ত এরূপ হতো না। এ ধরনের আফসোস মুমিনের জন্য নিষিদ্ধ। বিপদ এসে যাওয়ার পর মুমিন আর অতীতকে নিয়ে আফসোস করবেন না। বরং আল্লাহর সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। বিভিন্ন হাদীসে এ বিষয়ে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

হাযেরীন, অসুস্থতার ক্ষেত্রে আমাদের দ্বিতীয় দায়িত্ব চিকিৎসার চেষ্টা করা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

يَا عِبَادَ اللَّهِ تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلاَّ وَضَعَ لَهُ شِفَاءً أَوْ قَالَ دَوَاءً إِلاَّ دَاءً وَاحِدًا .... الْهَرَمُ

"হে আল্লাহর বান্দাগণ, তোমরা ঔষধ ব্যবহার কর। আল্লাহ যত রোগ সৃষ্টি করেছেন সকল রোগেরই ঔষধ সৃষ্টি করেছেন, একটিমাত্র ব্যধি ছাড়া ... তা হলো বার্ধ্যক্য।[২]

মুহতারাম হাযেরীন, চিকিৎসার পাশাপাশি খাওয়া-দাওয়ার বিষয়ে সতর্ক হতে নির্দেশ দিয়েছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ। অসুস্থ মানুষের জন্য ক্ষতিকর খাদ্য গ্রহণে আপত্তি করেছেন তিনি। এ সকল হাদীস থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, ব্যবহার বা বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে রোগীর জন্য উপকারী বলে প্রমাণিত খাদ্য গ্রহণ করা এবং ক্ষতিকর বলে প্রমাণিত খাদ্য বর্জন করা ইসলামের নির্দেশনা।

সম্মানিত মুসল্লীবৃন্দ, ছোঁয়াচে রোগ বা রোগের সংক্রমণ নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে। আমরা বাস্তবেও দেখতে পাই যে, রোগীর কাছে, সাথে বা চারিপার্শে থেকেও অনেক মানুষ সুস্থ রয়েছেন। আবার অনেক সতর্কতার পরেও মানুষ আক্রান্ত হচ্ছেন বিভিন্ন রোগে। বস্তুত শুধু রোগজীবানুর সংক্রমনেই যদি রোগ হতো তাহলে আমরা সকলেই অসুখ হয়ে যেতাম; কারণ প্রতিনিয়ত বিভিন্ন প্রকারের রোগজীবানু আমাদের দেহে প্রবেশ করছে। রোগজীবানুর পাশাপাশি মানুষের দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, রোগ জীবানুর কর্মক্ষমতা ইত্যাদি অনেক কিছুর সমন্বয়ের মানুষের দেহে রোগের প্রকাশ ঘটে। আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

لا عَدْوَى ... فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا بَالُ إِبِلِي تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ فَيَأْتِي الْبَعِيرُ الأَجْرَبُ فَيَدْخُلُ بَيْنَهَا فَيُجْرِبُهَا فَقَالَ فَمَنْ أَعْدَى الأَوَّلَ

"সংক্রমনের অস্তিত্ব নেই। তখন এক বেদুঈন বলল, হে আল্লাহর রাসূল, আমার উটগুলি হরিনীর ন্যায় সুস্থ থাকে। এরপর একটি চর্মরোগে আক্রান্ত উট এগুলির মধ্যে প্রবেশ করার পরে অন্যান্য উটও আক্রান্ত হয়ে যায়। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: তাহলে প্রথম উটটিকে কে সংক্রমিত করল?"[৩]

পাশাপাশি সংক্রমনের বিষয়ে সতর্ক হতেও রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন:

لا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ

"অসুস্থকে সুস্থের মধ্যে নেওয়া হবে না (রুগ্ন উট সুস্থ উটের কাছে নেবে না।)"[৪]

إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ فَلا تَدْخُلُوهَا وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلا تَخْرُجُوا مِنْهَا

---

[১] বুখারী, আস-সহীহ ৫/২১৩৭।
[২] তিরমিযী, আস-সুনান ৪/৩৮৩। তিনি বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।
[৩] বুখারী, আস-সহীহ ৫/২১৬১, ২১৭৭; মুসলিম, আস-সহীহ ৪/১৭৪২।
[৪] বুখারী, আস-সহীহ ৫/২১৭৭; মুসলিম, আস-সহীহ ৪/১৭৪২-১৭৪৩।

"যদি তোমরা শুনতে পাও যে, কোনো জনপদে প্লেগ বা অনুরূপ মহামারীর প্রাদুর্ভাব ঘটেছে তবে তোমরা তথায় গমন করবে না। আর যদি তোমরা যে জনপদে অবস্থান করছ তথায় তার প্রাদুর্ভাব ঘটে তবে তোমরা সেখান থেকে বের হবে না।"[১]

এভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রায় দেড় হাজার বৎসর পূর্বে সংক্রমন প্রতিরোধে বিচ্ছিন্নকরণ (quarantine) ব্যবস্থার নির্দেশনা প্রদান করেন। মুমিন বিশ্বাস করেন যে, সকল বিষয়ের ন্যায় রোগের ক্ষেত্রেও আল্লাহর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। এজন্য সংক্রমনের ভয়ে অস্থির বা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার কোনো কারণ নেই। পাশাপাশি যে সকল রোগের বিস্তারে সংক্রমন একটি উপায় বলে নিশ্চিত জানা যায় সে সকল রোগের বিস্তার রোধের ও সংক্রমন নিয়ন্ত্রনের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

সম্মানিত মুসল্লীবৃন্দ, অসুস্থ ব্যক্তির সঠিক বিশ্রাম ও কষ্টদায়ক দায়িত্ব থেকে অব্যহতি দেওয়া ইসলামের নির্দেশ। অসুস্থতার কারণে নামায বসে, শুয়ে বা ইশারায় পড়তে, রোযা কাযা করতে এবং ওযূ ও গোসলের বদলে তায়াম্মুম করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যদি কেউ অসুস্থতা বৃদ্ধির আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও পানি ব্যবহার করে বা সিয়াম পালন করে তবে তার সাওয়াব তো হবেই না, বরং তিনি পাপী হবেন। আল্লাহ যে সুযোগ দিয়েছেন তা গ্রহণ না করে অতি-তাকওয়া প্রদর্শন ইসলামে নিন্দা করা হয়েছে।

হাযেরীন, অসুস্থ মানুষের প্রতি সমাজের অন্য মানুষদের দায়িত্ব হলো তাদের সেবা করা, দেখতে যাওয়া, চিকিৎসা গ্রহণে উৎসাহ প্রদান, মানসিক আস্থা তৈরি করা ও দু'আ করা। কাউকে অসুস্থ জানার পরেও তাকে দেখতে না গেলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ জবাবদিহী করবেন বলে হাদীসে বলা হয়েছে। অসুস্থ মানুষকে দেখতে যাওয়ার সাওয়াব বিষয়ে অনেক হাদীস রয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ

"যদি কেউ কোনো অসুস্থ মানুষকে দেখতে যায় তবে সে ফিরে না আসা পর্যন্ত অবিরত জান্নাতের বাগানে ফল চয়ন করতে থাকে।"[২]

مَنْ عَادَ مَرِيضاً لَمْ يَزَلْ يَخُوضُ فِيْ الرَّحْمَةِ حَتَّى يَجْلِسَ فَإِذَا جَلَسَ اغْتَمَسَ فِيْهَا

"যদি কেউ কোনো রোগীকে দেখতে যায় তবে রহমতের মধ্যে সাঁতার কাটতে থাকে। আর যখন সে রোগীর পাশে বসে তখন সে রহমতের মধ্যে ডুব দেয়।"[৩]

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعُودُ مُسْلِمًا غُدْوَةً إِلا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِيَ وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً إِلا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ

"যদি কোনো মুসলিম সকালে কোনো রোগীকে দেখতে যায় তবে সন্ধ্যা পর্যন্ত ৭০ হাজার ফিরিশতা তার জন্য দোয়া করতে থাকে। আর যদি কেউ বিকালে কোনো রোগীকে দেখতে যায় তবে পরদিন সকাল পর্যন্ত ৭০ হাজার ফিরিশতা তার জন্য দোয়া করতে থাকে। আর সে জান্নাতে একটি বাগান লাভ করে।"[৪]

কোনো অসুস্থ মানুষকে দেখতে গেলে তার জন্য দোয়া করা সুন্নাত। এ সময়ের জন্য বিভিন্ন দোয়া হাদীসে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এ সকল দুআ শিখে তা আমল করা আমাদের প্রয়োজন। মহান আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক প্রদান করুন। আমীন!!

[১] বুখারী, আস-সহীহ ৫/২১৬৩; মুসলিম, আস-সহীহ ৪/১৭৩৮, ১৭৩৯।
[২] মুসলিম, আস-সহীহ ৪/১৯৮৯।
[৩] যিয়া মাকদিসী, আল-মুখতারাহ ৭/২৬৭-২৬৮; আলবানী, সহীহুত তারগীব ৩/১৯৭। হাদীসটি সহীহ।
[৪] তিরমিযী, আস-সুনান ৩/৩০০; আলবানী, সহীহুত তারগীব ৩/১৭৯। হাদীসটি সহীহ।

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّه نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِه وَأَصْحَابِه وَسَلَّمَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِه وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

أَمَّا بَعْدُ، فَيَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ، قَالَ اللهُ تَعَالَىَ: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ

وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عِبَادَ اللَّهِ تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلاَّ وَضَعَ لَهُ شِفَاءً أَوْ قَالَ دَوَاءً إِلاَّ دَاءً وَاحِدًا .... الْهَرَمُ

وَقَالَ ﷺ: مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ

بَارَكَ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ فِيْ الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ. وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ. أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ، فَاسْتَغْفِرُوْهُ وَتُوْبُوْا إِلَيْهِ، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.

শাবান মাসের ৪র্থ খুতবাঃ সিয়াম, রামাদান ও কুরআন

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লী আলা রাসূলিহীল কারীম। আম্মা বাদ,

সম্মানিত উপস্থিতি, আজ শাবান মাসের ৪র্থ জুমুআ। আজ আমরা সিয়াম ও রামাদান সম্পর্কে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ। কিন্তু তার আগে আমরা এ সপ্তাহের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসগুলির বিষয়ে সংক্ষেপ আলোকপাত করি। হাযেরীন, আজ ইংরেজী ..... মাসের ..... তারিখ। এ সপ্তাহের দিবসগুলির মধ্যে রয়েছে .... ।

হাযেরীন, প্রভাত (সুবহে সাদেক) থেকে সূর্যাস্ত (মাগরিব) পর্যন্ত আল্লাহর এবাদত ও সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পানাহার, দাম্পত্য মিলন ইত্যাদি সকল সিয়াম বা রোযা ভঙ্গকারী কর্ম থেকে বিরত থাকা হল সিয়াম বা রোযা। আত্মার পরিশুদ্ধি, আধ্যাত্মিক উন্নতি, মানবিক মমতাবোধের বিকাশ, তাকওয়া ও সততা অর্জনের জন্য সকল যুগের সকল বিশ্বাসী মানুষের অন্যতম প্রধান অবলম্বন হলো সিয়াম। রমযানের সিয়াম ফরয ও ইসলামের রুকন। এছাড়া যথাসম্ভব বেশি অতিরিক্ত বা নফল সিয়াম পালনে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। ফরয ও নফল সিয়ামের ফযীলতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ বলেনঃ

كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلا يَرْفُثْ وَلا يَصْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ

"আদম সন্তানের সকল কর্ম তার জন্য। একমাত্র ব্যতিক্রম হলো সিয়াম, তা শুধু আমারই জন্য এবং আমিই তার প্রতিদান দিব। সিয়াম হলো ঢাল। তোমাদের কেউ যে দিনে সিয়াম পালন করবে সেই দিনে সে অশ্লীল বা বাজে কথা বলবে না ও চিল্লাচিল্লি, হৈচৈ বা ঝগড়াঝাটি করবে না। যদি কেউ তাকে গালি দেয় অথবা তার সাথে মারামারি করে তবে সে যেন বলে, আমি সিয়ামরত, আমি সিয়াম রত। মুহাম্মাদের জীবন যাঁর হাতে তার শপথ, সিয়ামরত ব্যক্তির মুখের ক্ষুধা-জনিত গন্ধ আল্লাহর নিকট মেশকের সুগন্ধির চেয়েও প্রিয়। সিয়াম পালনকারীর জন্য দুইটি আনন্দ রয়েছে যখন সে আনন্দিত হয়ঃ (১) যখন সে ইফতার করে তখন সে তার ইফতারীর জন্য আনন্দিত হয় এবং (২) যখন সে তার প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাত করবে তখন সে তার সিয়ামের জন্য আনন্দিত হবে।"[১] তিনি আরো বলেনঃ

الصِّيَامُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ كَجُنَّةِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْقِتَالِ وَصِيَامٌ حَسَنٌ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ

"যুদ্ধে তোমাদের যেমন ঢাল থাকে, তেমনি জাহান্নামের আগুন থেকে ঢাল হলো সিয়াম। আর প্রতি মাসে তিন দিন সিয়াম পালন করা ভাল।"[২]

হাযেরীন, প্রতি মাসে তিন দিন সিয়াম ছাড়াও যথাসম্ভব বেশি বেশি নফল সিয়াম পালনে উৎসাহ দিয়েছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ; কারণ সিয়াম একটি তুলনাবিহীন ইবাদত। আবূ উমামা (রা) বলেন, "আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমাকে একটি আমল শিখিয়ে দিন। তিনি বলেন,

عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لا عَدْلَ لَهُ

"তুমি সিয়াম পালন করবে, সিয়ামের মত আমল আর নেই।"আবূ উমামা বলেন, আমি তিনবার তাঁকে একইরূপ অনুরোধ করলাম এবং তিনি তিনবারই একই উত্তর দিলেন।" এজন্য আবূ উমার প্রায় ১২

---

[১] বুখারী, আস-সহীহ ২/৬৭৮; মুসলিম, আস-সহীহ ২/৮০৭।

[২] ইবনু খুযাইমা, আস-সহীহ ৩/১৯৩; আলবানী, সহীহুত তারগীব ১/২৩৮। হাদীসটি সহীহ।

মাসই সিয়াম পালন করতেন।"[১]

নফল সিয়াম পালনের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিন হলো আশুরার দিন, আরাফাতের দিন এবং শাওয়াল মাসের ৬ দিন। এছাড়া প্রতি সপ্তাহে সোমবার ও বৃহস্পতিবার এবং প্রতি আরবী মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ নফল সিয়াম পালন বিশেষ গুরত্বপূর্ণ ইবাদত। হাযেরীন, আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে, মাসে কয়েক দিন সিয়াম পালন করা দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী।

হাযেরীন, রামাদান মাসের ফরয সিয়াম পালন ইসলামের চতুর্থ স্তম্ভ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَصُفِّدَتْ الشَّيَاطِينُ

"রামাদান মাস যখন আগমন করে তখন জান্নাতের দরজাগুলি খুলে দেওয়া হয়, এবং জাহান্নামের দরজাগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়, এবং শয়তানগেরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়।"[২]

أَتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ لِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ

"তোমাদের নিকট রামাদান মাস এসেছে। এই মাসটি বরকতময়। আল্লাহ তোমাদের উপর এই মাসের সিয়াম ফরয করেছেন। এই মাসে আসমানের দরজাগুলি খুলে দেওয়া হয়। এবং এ মাসে জাহান্নামের দরজাগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই মাসে দুর্বিনীত শয়তানদেরকে শৃঙ্খলিত করা হয়। এই মাসে এমন একটি রাত আছে যা এক হাজার রাত অপেক্ষা উত্তম। যে ব্যক্তি সেই রাতের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত সে একেবারেই বঞ্চিত হতভাগা।"[৩]

হাযেরীন, সিয়াম ফরয করার উদ্দেশ্য সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের উপর সিয়াম লিপিবদ্ধ (ফরয) করা হয়েছে, যেরূপভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর তা লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল, যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার।"[৪]

হাযেরীন, আমরা দেখেছি, আল্লাহ বলেছেন যে, সিয়ামের মাধ্যমে তাকওয়া অর্জন হবে। তাকওয়া অর্থ হলো হৃদয়ের মধ্যে আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও শাস্তিথেকে আত্মরক্ষার সার্বক্ষণিক অনুভূতি। যে কোনো কথা, কর্ম বা চিন্তার আগেই মনে হবে, এতে আল্লাহ খুশি না বেজার হবেন। যদি আল্লাহর অসন্তুষ্টির বিষয় হয় তবে কোনো অবস্থাতেই হৃদয় সে কাজ করতে দেবে না।

হাযেরীন, আমরা একথা স্বীকার করতে বাধ্য হব যে, পরিপূর্ণ তাকওয়া আমরা সিয়ামের মাধ্যমে অর্জন করতে পারছি না। একজন রোযাদার প্রচণ্ড ক্ষুধা বা পিপাসায় কাতর হয়েও কোনো অবস্থাতে পানাহার করতে রাজি হন না। নিজের ঘরের মধ্যে, একাকী, নির্জনে সকল মানুষের অজান্তে পিপাসা মেটানোর সুযোগ থাকলেও তিনি তা করেন না। কারণ তিনি জানেন তা করলে দুনিয়ার কেউ না জানলেও আল্লাহ জানবেন ও তিনি অসন্তুষ্ট হবেন। এ হলো তাকওয়ার প্রকাশ। কিন্তু এ ব্যক্তিই রোযা অবস্থায় বা অন্য সময়ে এর চেয়ে অনেক কম পিপাসায় বা প্রলোভনে সুদ, ঘুষ, মিথ্যা, গীবত, ভেজাল, ওযনে ফাঁকি, কর্মে ফাঁকি, অন্যের পাওনা না দেওয়া ও অন্যান্য কঠিনতম পাপের মধ্যে নিমজ্জিত

[১] নাসাঈ ৪/১৬৫; ইবনু খুযাইমা, আস-সহীহ ৩/১৯৪; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ১/৫৮২; আলবানী, সহীহুত তারগীব ১/২৩৮। হাদীসটি সহীহ।

[২] বুখারী, আস-সহীহ ২/৬৭২, ৩/১১৯৪; মুসলিম, আস-সহীহ ২/৭৫৮।

[৩] নাসাঈ, আস-সুনান ৪/১২৯; আলবানী, সহীহুত তারগীব ১/২৪১। হাদীসটি সহীহ।

[৪] সূরা বাকারাঃ ১৮৩ আয়াত।

হচ্ছেন। কেন এরূপ হচ্ছে? এর অন্যতম কারণ হলো আমরা প্রেসক্রিপশন পাল্টে ফেলেছি। কোনো রোগে যদি ডাক্তার দুটি বা তিনটি ঔষধ দেন, আর রোগী একটি ঔষধ খেয়ে সুস্থ হতে চান তাহলে তিনি প্রকৃত সুস্থতা লাভ করতে পারবেন না। মহান আল্লাহ তাকওয়া অর্জনের জন্য আমাদেরকে দুটি বিষয় একত্রে দিয়েছেন: সিয়াম ও কুরআন। কিন্তু দুঃখজনকভাবে আমরা সিয়াম নিয়েছি এবং কুরআন বাদ দিয়েছি। এজন্য প্রকৃত ও পরিপূর্ণ তাকওয়া অর্জন করতে পারছি না। আল্লাহ বলেছেন:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

"রামাদান মাস। এতে মানুষের দিশারী এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এই মাস পাবে তারা যেন এই মাসে সিয়াম পালন করে।"[১]

হাযেরীন, এভাবে আমরা দেখছি যে, মহান আল্লাহ কুরআনের সাথে রামাদানের সিয়ামকে জড়িত করেছেন। হাদীস থেকে জানা যায় যে, দুভাবে এ সংশ্লিষ্টতা। প্রথমত রামাদানে রাতদিন কুরআন তিলাওয়াত করা এবং দ্বিতীয়ত রাতে কিয়ামুল্লাইল বা তারাবীহের সালাতে কুরআন পড়া বা শুনা।

মুমিনের অন্যতম ইবাদত কুরআন তিলাওয়াত করা। আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ যিক্‌র কুরআন তিলাওয়াত। কুরআন কারীমের একটি আয়াত শিক্ষা করা ১০০ রাক'আত নফল সালাতের চেয়েও উত্তম বলে হাদীস শরীফে বলা হয়েছে। সারা বৎসরই তিলাওয়াত করতে হবে। বিশেষত রামাদানে বেশি তিলাওয়াত করা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিশেষ সুন্নাত, যাতে অতিরিক্ত সাওয়াব ও বরকত রয়েছে।

হাযেরীন, অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, আমাদের মধ্যে উপস্থিত অনেক মুসল্লীই কুরআন পড়তে পারেন না। যদি দুনিয়ার কোনো মন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতি আপনাকে একটি চিঠি পাঠান তা পড়তে ও বুঝতে আপনি কত ব্যস্ত হন। আর রাব্বুল আলামীন আল্লাহ তাঁর হাবীব মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর মাধ্যমে আপনাকে এ কিতাবটি পাঠালেন, আর আপনি একটু পড়ে দেখলেন না। হাযেরীন, আল্লাহর কাছে যেয়ে কি জবাব দিবেন। যে কিতাব পাঠ করে এখনো হাজার হাজার কাফির মুসলিম হচ্ছে, আপনি মুসলিম হয়ে সে কিতাবটা পড়লেন না। অনেক নও-মুসলিম আছেন যারা মুসলিম হওয়ার পরে ৩/৪ বৎসরের ভিতরে কুরআন তিলাওয়াত ও অর্থ বুঝার যোগ্যতা অর্জন করেন। আর আমরা জন্ম থেকে মুসলমান আমরা অনেকেই কুবআন পড়তে পারি না। আমরা সংবাদ শুনে, পড়ে, সংবাদ পর্যালোচনা করে, অকারণ গীবত করে, বাজে গালগল্প করে কত সময় নষ্ট করি। অথচ আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত শেখার সময় হয় না। হাযেরীন, কুরআন তিলাওয়াত শিখতে বেশি সময় লাগে না। নূরানী পদ্ধতি, নাদিয়া পদ্ধতি বিভিন্ন আধুনকি পদ্ধতিতে মাত্র ৩/৪ মাস পড়লেই বিশুদ্ধভাবে তিলাওয়াত শেখা যায়। আসুন আমরা কুরআনের মাস রামাদান উপলক্ষ্যে কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা করি। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

"তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি কুরআন শিক্ষা করে ও শিক্ষা দান করে সেই সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।"[২]

مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا

"যে ব্যক্তি কুরআনের একটি বর্ণ পাঠ করবে সে একটি পুণ্য বা নেকী অর্জন করবে। পুণ্য বা নেকীকে দশগুণ বৃদ্ধি করে প্রদান করা হবে।[৩] অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

---

[১] সূরা বাকারাঃ ১৮৫ আয়াত।
[২] সহীহ বুখারী ৪/১৯১৯।
[৩] তিরমিযী ৫/১৭৫, নং ২৯১০। হাদীসটি সহীহ।

الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ

"যে ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াতে সুপারদর্শী সে সম্মানিত ফিরিশতাগণের সঙ্গে। আর কুরআন তিলাওয়াত করতে যার জিহ্বা জড়িয়ে যায়, উচ্চারণে কষ্ট হয়, কিন্তু কষ্ট করে অপারগতা সত্ত্বেও সে তিলাওয়াত করে তার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ পুরস্কার।"[১]

অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لأَصْحَابِهِ

"তোমরা কুরআন পাঠ করবে; কারণ কুরআন কিয়ামতের দিন তার সঙ্গীদের (কুরআন পাঠকারীগণের) জন্য শাফা'আত করবে।"[২]

কুরআন সাধারণভাবে দিবারাত্র সকল সময়ে পাঠ করা যায়। আর মুমিনের কুরআন পাঠের বিশেষ সময় হলো রাত্রে কিয়ামুল্লাইল বা তাহাজ্জুদের মধ্যে কুরআন তিলাওয়াত করা। কুরআন কারীমে এরূপ তিলাওয়াতকে মুমিনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। রামাদানের রাত্রিতে সালাতুল্লাইল আদায় করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। কিয়ামুল্লাইল বা তারাবীহে এক বা একাধিকবার পূর্ণ কুরআন তিলাওয়াত বা শ্রবণ করাও গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। এরূপ রাতের তিলাওয়াতের কথাই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَقُولُ الصِّيَامُ رَبِّ إِنِّي مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ رَبِّ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ فَيُشَفَّعَانِ.

"রোযা ও কুরআন বান্দার জন্য শাফা'আত করবে। রোযা বলবে : হে রব্ব, আমি একে দিনের বেলায় খাদ্য ও পানীয় থেকে বিরত রেখেছি, কাজেই তার পক্ষে আমার শাফা'আত কবুল করুন। কুরআন বলবে : হে রব্ব, আমি রাতের বেলায় তাকে ঘুম থেকে বিরত রেখেছি, কাজেই তার পক্ষে আমার শাফা'আত কবুল করুন। তখন তাদের উভয়ের শাফা'আত কবুল করা হবে।"[৩]

হাযেরীন, কুরআন কারীম তিলাওয়াতের ন্যায় তা শোনাও একইরূপ সাওয়াব। এজন্য তারাবীহের সালাতে পরিপূর্ণ আদবের সাথে মনোযোগ দিয়ে কুরআন শুনতে হবে। এ ক্ষেত্রে আমাদের অবহেলা খুবই বেশি। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত হলো ধীরে ধীরে ও টেনে টেনে তিলাওয়াত করা এবং প্রত্যেক আয়াতের শেষে থামা। এভাবে তিলাওয়াত করলেই তিলাওয়াতের সাওয়াব পাওয়া যাবে এবং এরূপ তিলাওয়াত শুনলেও তিলাওয়াতের মতই সাওয়াব পাওয়া যাবে। তাড়াহুড়ো করে কুরআন পড়তে হাদীসে কঠিনভাবে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু আমরা তারাবীহের সালাতে হাফেযদেরকে দ্রুত পড়তে বাধ্য করি। ফলে কুরআনের সাথে বেয়াদবী হয়। এছাড়া এরূপ পাঠে কুরআনের অনেক শব্দই ইমামের মুখের মধ্যে থেকে যায়, ফলে মুক্তাদিরা পুরো কুরআন শুনতে পান না। এতে কোনোভাবেই খতমের সাওয়াব পাওয়া যায় না। সুন্নাত পদ্ধতিতে তিলাওয়াত করলে হয়ত এক ঘন্টা লাগে। আর এরূপ বেয়াদবীর সাথে পড়লে হয়ত ৪০/৪৫ মিনিট লাগে। মাত্র ১৫/২০ মিনিটের জন্য আমরা অগণিত সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হই, উপরন্তু বেয়াদবির গোনাহের সমূহ সম্ভাবনা থাকে। হাযেরীন, আমাদের উদ্দেশ্য রাকাত গণনা বা খতম করেছি দাবি করা নয়, আমাদের উদ্দেশ্য সাওয়াব অর্জন। আর সাওয়াব পেতে হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশ মতই তারাবীহের কুরআন তিলাওয়াত ও শ্রবণ করতে হবে।

---

[১] সহীহ বুখারী ৬/২৭৪৩, সহীহ মুসলিম ১/৫৪৯।
[২] সহীহ মুসলিম ১/৫৫৩।
[৩] মুসতাদরাক হাকিম ১/৭৪০, মুসনাদ আহমদ ২/১৭৪, আত্-তারগীব ২/১০, ৩২৫, মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/৩৮১। হাদীসটি সহীহ।

হাযেরীন, তিলাওয়াত ও শ্রবন উভয় ক্ষেত্রেই কুরআনের অর্থ বুঝলেই শুধু পরিপূর্ণ সাওয়াবের আশা করা যায়। অধিকাংশ মুসলিমই না বুঝে পড়াকেই চূড়ান্ত ও পরিপূর্ণ ইবাদত বলে মনে করেন। হাযেরীন, না বুঝে তিলাওয়াত করলে হয়ত আল্লাহর কালাম মুখে আউড়ানোর কিছু সাওয়াব আমরা পেতে পারি। তবে না বুঝে পড়ার জন্য তো আল্লাহ কুরআন দেন নি। আল্লাহ বারবার বলেছেন যে, কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য হলো যেন মানুষেরা তা বুঝে, চিন্তা করে এবং উপদেশ গ্রহণ করে। এক আয়াতে আল্লাহ বলেছেন :

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ

"এক বরকতময় কল্যাণময় গ্রন্থ আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি যেন তারা এর আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ উপদেশ গ্রহণ করে।"[১]

আল্লাহর কিতাব পাঠ করাকে কুরআন কারীমে 'তিলাওয়াত' বলা হয়েছে, কারণ তিলাওয়াত অর্থ পিছে চলা বা অনুসরণ করা। শুধুমাত্র না বুঝে পাঠ করলে তিলাওয়াত হয় না। তিলাওয়াত মানে পাঠের সময় মন পঠিত বিষয়ের পিছে চলবে, এরপর জীবনটাও তার পিছে চলবে। আল্লাহ বলেন:

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ

"যাদেরকে আমি কিতাব প্রদান করেছি তাঁরা তা হক্কভাবে তেলাওয়াত করে, তাঁরাই এই কিতাবের উপর ঈমান এনেছে।"[২]

হাযেরীন, হাদীস শরীফে বারবার বলা হয়েছে যে, বুঝে পাঠের নামই হক্ক তিলাওয়াত। আর যারা এরূপ তিলাওয়াত করেন তারাই প্রকৃত ঈমানদার। বিভিন্ন হাদীসে কুরআন তিলাওয়াতের সাথে সাথে অর্থ চিন্তা করতে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। এমনি কোনো কোনো হাদীসে বলা হয়েছে যে, যারা কুরআনের বিভিন্ন আয়াত পাঠ করবে কিন্তু তার অর্থ নিয়ে চিন্তা করবে না তাদের জন্য শাস্তি রয়েছে।[৩]

হাযেরীন, আমরা অনেক সময় মনে করি, কুরআন বুঝা কঠিন কাজ, তা শুধু আলিমদের দায়িত্ব। হাযেরীন, আলিমদের দায়িত্ব কুরআনের গভীরে যেয়ে হাদীস ঘেটে ফিকহের বিধিবিধান বের করা। সাধারণ ঈমানী ও আমলী প্রেরণা নেওয়া প্রতিটি মুমিনের দায়িত্ব। আল্লাহ কুরআনে চার স্থানে বলেছেন:

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ

"নিশ্চয় আমি কুরআনকে বুঝার ও উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করে দিয়েছি , কে আছে উপদেশ গ্রহণ করার ?"[৪]

হাযেরীন, এরপরও আমরা যদি বলি যে, কুরআন বুঝা কঠিন তাহলে কি কুরআনকে অবজ্ঞা করা হবে না? বস্তুত কুরআন একটি অলৌকিক গ্রন্থ। এর অলৌকিকতার একটি দিক আমরা সকলে দেখতে পাই। একজন ৭/৮ বছরের অনারব শিশুও তা আগাগোড়া মুখস্থ করতে পারে। এর আরেকটি অলৌকিকত্ব হলো এর বুঝার সহজত্ব। আপনি যদি আরবী একটি শব্দ বা বাক্যও না বুঝেন, কিন্তু কুরআনের একটি অর্থানুবাদ নিয়ে আরবী আয়াত ও বাংলা অর্থ পাশাপাশি পড়ে যান, তবে আপনি দেখবেন যে, অলৌকিকভাবে অর্থটি হৃদয়ে গেঁথে যাচ্ছে। এভাবে দু/এক খতম পড়ার পরে আপনি যখন সালাতে দাঁড়াবেন এবং ইমামের তিলাওয়াত শুনবেন, তখন দেখবেন যে, আরবী শব্দের অর্থ না জানলেও আয়াতের অর্থটি আপনার হৃদয়ে জাগরুক হচ্ছে।

---

[১] সূরা সাদ: ২৯ আয়াত।
[২] সূরা বাকার : ১২১।
[৩] তাফসীরে কুরতুবী ২/২০১, তাফসীরে ইবনু কাসীর ১/৪৪২।
[৪] সূরা কামার : ১৭,২২,৩২, ৪০।

হাযেরীন, কুরআন বাদ দিয়ে সিয়াম পালন করার কারণেই আমরা প্রকৃত তাকওয়া অর্জন করতে পারছি না। রামাদানে যতটুকু আমরা কুরআন চর্চা করছি, ততটুকুও যদি বুঝে করতাম তাহলে অনেক বেশি তাকওয়া অর্জন করতে পারতাম। আমরা দিবসে তিলাওয়াতে এবং তারাবীহে, ইশা, ফজরে বা মাগরিবে ইমামের মুখে কুরআনের ভাষায় পিতামাতা, এতিম, প্রতিবেশী, দরিদ্র ও অন্যদের অধিকারের কথা, হক্ক কথা ও ইনসাফের নির্দেশ, জুলুম, মিথ্যা, ওজনে কম দেওয়া, ফাঁকি দেওয়া, গীবত করা, উপহাস করা, অহঙ্কার করা ও অন্যান্য পাপের ভয়াবহতা ইত্যাদি সবই শুনছি, কিন্তু কিছুই বুঝছি না। ফলে নামায থেকে বেরিয়ে আমরা সকল পাপ কাজই করছি। ফজর বা যোহরের পরে নিজে কুরআনে পাঠ করলাম, ওযনে কম দিলে, ফাঁকি দিলে বা প্রতারণা করলে ওয়াইল জাহান্নাম। এরপর প্রগাঢ় ভক্তিতে কুরআনে চুমু দিয়ে কর্মস্থলে যেয়ে এ সকল পাপে লিপ্ত হলাম! ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন!!

হাযেরীন, আসুন, আমরা সকলেই রামাদান উপলক্ষ্যে কুরআনের তালেবে ইলম হয়ে যাই। কুরআনের বিশুদ্ধ তিলাওয়াত শিক্ষা করি এবং কুরআনের অর্থ বুঝার চেষ্টা করি। তাহলে আমরা কুরআন তিলাওয়াতের পরিপূর্ণ সাওয়াব ও বরকত ছাড়াও প্রকৃত ঈমানদার হতে পারব। আল্লাহ বলেছেন:

وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا

"যখন তাঁদের নিকট আল্লাহর আয়াতগুলি তিলাওয়াত করা হয়, তখন তাঁদের ঈমান বৃদ্ধি পায়।"[১]

আমরা যদি অর্থই না বুঝি তাহলে কিভাবে আমাদের ঈমান বৃদ্ধি পাবে? আর যদি কুরআন তিলাওয়াত শুনে ঈমান বৃদ্ধি না পায় তাহলে তো প্রকৃত মুমিন হওয়া গেল না। আল্লাহ আরো বলেছেন :

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ

"আল্লাহ সর্বোত্তম বাণীকে সুসমঞ্জস এবং বারংবার আবৃত্তিকৃত গ্রন্থ হিসাবে অবতীর্ণ করেছেন। যারা তাদের প্রভুকে ভয় করে এই গ্রন্থ থেকে (এই গ্রন্থ পাঠ করলে বা শ্রবণ করলে) তাদের শরীর রোমাঞ্চিত ও শিহরিত হয়। অতঃপর তাদের দেহ ও মন প্রশান্ত হয়ে আল্লাহর যিক্‌রের প্রতি ঝুকে পড়ে।"[২]

কুরআনের অর্থ হৃদয়ে প্রবেশ করে হৃদয়কে নাড়া না দিলে শরীর কিভাবে শিহরিত হবে? মন কিভাবে প্রশান্ত হবে? রামাদানে আমরা তারাবীহে অন্তত এক খতম কুরআন শুনি। এ সময়ে যদি কিছুটা হলেও অর্থ বুঝতে পারি তাহলে আমাদের ঈমান বৃদ্ধি পাবে এবং আমরা সত্যিকার আল্লাহ-ভীরু মুত্তাকীদের গুণাবলি অর্জন করতের পারব। হাযেরীন, আল্লাহর কাছে তো এক সময় যেতেই হবে। আর কুরআন নিয়েই তার কাছে সবচেয়ে ভালভাবে যাওয়া যাবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

إِنَّكُمْ لاَ تَرْجِعُونَ إِلَى اللهِ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِمَّا خَرَجَ مِنْهُ يَعْنِيْ الْقُرْآنَ

"আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে তোমাদের জন্য আল্লাহর নিকট থেকে যা এসেছে তার চেয়ে, অর্থাৎ কুরআনের চেয়ে উত্তম আর কিছুই নেই।"[৩]

অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, যারা কুরআনের মানুষ- অর্থাৎ কুরআন পাঠ, হৃদয়ঙ্গম, প্রচার ও পালনে রত- তারাই পৃথিবীতে আল্লাহর পরিজন। আল্লাহ আমদেরকে তাঁর পরিজন হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

---

[১] সূরা আনফাল : আয়াত ২।
[২] সূরা যুমার : আয়াত ২৩।
[৩] হাকিম, আল-মুসতাদরাক ১/৭৪১, মুনযীরী, আত-তারগীব২/৩২৭, নং ২১১৯। হাকিম ও যাহাবী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

أَمَّا بَعْدُ، فَيَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ، قَالَ اللهُ تَعَالىَ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ

قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

وَقَالَ: شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُـدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: اَلـصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَقُوْلُ الـصِّيَامُ رَبِّ إِنِّـيْ مَنَعْتُـهُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِيْ فِيْهِ وَيَقُوْلُ الْقُرْآنُ رَبِّ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِيْ فِيْهِ فَيُشَفَّعَانِ.

بَارَكَ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ فِيْ الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ. وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ. أَقُـوْلُ قَـوْلِيْ هَـذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُـلِّ ذَنْـبٍ، فَاسْتَغْفِرُوْهُ وَتُوْبُوْا إِلَيْهِ، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.

রামাদান মাসের ১ম খুতবা: আহকামে সিয়াম ও কিয়াম

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লী আলা রাসূলিহীল কারীম। আম্মা বাদ,

সম্মানিত উপস্থিতি, আজ রামাদান মাসের প্রথম জুমুআ। আজ আমরা সিয়াম ও কিয়ামের আহকাম আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ। কিন্তু তার আগে আমরা এ সপ্তাহের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসগুলির বিষয়ে সংক্ষেপ আলোকপাত করি। হাযেরীন, আজ ইংরেজী ..... মাসের ..... তারিখ। এ সপ্তাহের দিবসগুলির মধ্যে রয়েছে ....।

হাযেরীন, আল্লাহর কত দয়া! ইসলামকে কত সহজ করেছেন। সাহরী খাওয়া আমাদের নিজেদের জন্যই প্রয়োজন, অথচ আল্লাহ এ কাজটিকে ইবাদত বানিয়ে দিয়েছেন। খেলে আল্লাহ খুশি হন এবং সাওয়াব দেন। বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহরী খেতে নির্দেশ দিয়েছেন। এক হাদীসে তিনি বলেন:

السَّحُورُ أَكْلُهُ بَرَكَةٌ فَلا تَدَعُوهُ وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جُرْعَةً مِنْ مَاءٍ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ

"সাহরী খাওয়া বরকত; কাজেই তোমরা তা ছাড়বে না; যদি এক ঢোক পানি পান করেও হয় তবুও; কারণ যারা সাহরী খায় তাদের জন্য আল্লাহ ও তাঁর ফিরিশতাগণ সালাত (রহমত ও দুআ) প্রদান করেন।"[১]

কোনো কোনো হাদীসে সাহরীতে খেজুর খেতে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। সাহরী খাওয়ার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত ও শিক্ষা হলো একেবারে শেষ মুহূর্তে সাহরী খাওয়া। যাইদ ইবনু সাবিত বলেন:

تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ قُلْتُ كَمْ كَانَ قَدْرُ مَا بَيْنَهُمَا قَالَ خَمْسِينَ آيَةً

"আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সাহরী খেলাম এরপর ফজরের সালাতে দাঁড়ালাম। যাইদকে জিজ্ঞাসা করা হলো, মাঝে কতটুকু সময় ছিল? তিনি বলেন ৫০ আয়াত তিলাওয়াতের মত।"[২]

হাযেরীন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে ইফতার করা। তিনি এত তাড়াতাড়ি ইফতার করতেন যে, অনেক সময় সাহাবীগণ বলতেন, হে আল্লাহর রাসূল, সন্ধ্যা হোক না, এখনো তো দিন শেষ হলো না! তিনি বলতেন, সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই ইফতার করতে হবে। বিভিন্ন হাদীসে রয়েছে যে, সাহাবীগণ সর্বদা শেষ সময়ে সাহরী খেতেন এবং সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে ইফতার করতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

لا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ

"যতদিন মানুষ সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে তাড়াতাড়ি ইফতার করবে ততদিন তারা কল্যাণে থাকবে।"[৩]

إِنَّا مَعْشَرَ الأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا بِتَعْجِيلِ فِطْرِنَا وَتَأْخِيرِ سُحُورِنَا

"আমরা নবীগণ আমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে প্রথম সময়ে ইফতার করতে ও শেষ সময়ে সাহরী খেতে।"[৪]

হাযেরীন, ইফতারের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশ হলো খেজুর মুখে দিয়ে ইফতার করা। তিনি সম্ভব হলে গাছ পাকা টাটকা রুতাব খেজুর, না হলে খুরমা খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন। খেজুর না পেলে তিনি পানি মুখে দিয়ে ইফতার করতেন। তিনি ইফতারিতে তিনটি খেজুর খেতে পছন্দ করতেন।[৫]

---

[১] আহমদ, আল-মুসনাদ ৩/১২, ৪৪; ইবনু হিব্বান, আস-সহীহ ৮/২৪৫; আলবানী, সহীহুত তারগীব ১/২৫৮। হাদীসটি হাসান।

[২] বুখারী আস-সহীহ ২/৬৭৮; মুসলিম, আস-সহীহ ২/৭৭১।

[৩] বুখারী, আস-সহীহ ২/৬৯২; মুসলিম, আস-সহীহ ২/৭৭১।

[৪] হাইসামী, মাজামউয যাওয়াইদ২/১০৫, ৩/১৫৫। হাদীসটির সনদ সহীহ।

[৫] যিয়া মাকদিসী, আল-মুখতারাহ ৫/১৩১-১৩২; হাইসামী, মাজমাউয ৩/১৫৫-১৫৬। এ বিষয়ে অনেক সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

হাযেরীন, সাহরীর সময় রোযাদারদের ডাকা মুসলিম উম্মাহর একটি বরকতময় রীতি। বর্তমানে প্রত্যেক মসজিদে মাইক থাকার কারণে বাড়ি বাড়ি বা মহল্লার মধ্যে যেয়ে ডাকার রীতি উঠে গিয়েছে। মসজিদের মাইক থেকেই ডাকা হয়। তবে এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, ডাকার উদ্দেশ্য যারা সাহরী খেতে চান তাদেরকে ঘুম ভাঙ্গতে সাহায্য করা। এজন্য ফজরের আযানের ঘন্টাখানেক আগে কিছু সময় ডাকাডাকি করাই যথেষ্ট। বর্তমানে অনেক মসজিদে শেষ রাতে একদেড় ঘন্টা একটানা গজল-কিরাআত পড়া হয় ও ডাকাডাকি করা হয়। বিষয়টি খুবই নিন্দনীয় ও আপত্তিকর কাজ। অনেকেই সাহরীর এ সময়ে খাওয়ার আগে বা পরে তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করেন, বা তিলাওয়াত করেন, কেউ বা সাহরী খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েন, কারণ সকালে তার কাজ আছে, অনেক অসুস্থ মানুষ থাকেন। এরা সকলেই এরূপ একটানা আওয়াজে ক্ষতিগ্রস্থ হন। বান্দার হক্কের দিকে আমাদের বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার।

হাযেরীন, সাহরী ও ইফতার খাওয়ার অর্থ এ নয় যে, সারাদিন যেহেতু খাব না, সেহেতু এ দু সময়ে দ্বিগুণ খেয়ে সারাদিন জাবর কাটব! এরূপ খেলে তো সিয়ামের মূল উদ্দেশ্যই নষ্ট হলো। সাহরী ও ইফতার খাওয়ার অর্থ স্বাভাবিকভাবে আমরা যা খাই তা খাওয়া। সমাজে প্রচলিত আছে যে, সাহরী ও ইফতারীতে বা রামাদানে যা খাওয়া হবে তার হিসাব হবে না। এজন্য আমরা রামাদান মাসকে খাওয়ার মাস বানিয়ে ফেলেছি। বস্তুত, হিসাব হবে কি না তা চিন্তা না করে, সাওয়াব কিসে বেশি হবে তা চিন্তা করা দরকার। রামাদান মাস মূলত খাওয়ানোর মাস। দুভাবে খাওয়ানোর নির্দেশ রয়েছে হাদীসে। প্রথমত দরিদ্রদেরকে খাওয়ানো এবং দ্বিতীয়ত রোযাদারকে ইফতার খাওয়ানো। রোযা অবস্থায় দরিদ্রকে খাওয়ানোর ফযীলত আমরা অন্য খুতবায় জেনেছি। আর ইফতার করানোর বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا

"যদি কেউ কোনো রোযাদারকে ইফতার করায়, তাহলে সে উক্ত রোযাদারের সমপরিমাণ সাওয়াব লাভ করবে, তবে এতে উক্ত রোযাদারের সাওয়াব একটুও কমবে না।"[১]

হাযেরীন, ইফতার করানো অর্থ আনুষ্ঠানিকতা নয়। দরিদ্র সাহাবী-তাবিয়ীগণ নিজের ইফতার প্রতিবেশীকে দিতেন এবং প্রতিবেশীর ইফতার নিজে নিতেন। এতে প্রত্যেকেই ইফতার করানোর সাওয়াব পেলেন। অনেকে নিজের সামান্য ইফতারে একজন মেহমান নিয়ে বসতেন। আমাদের সকলেরই চেষ্টা করা দরকার নিয়মিত নিজেদের খাওয়া থেকে সামান্য কমিয়ে অন্যদেরকে ইফতার করানো। বিশেষত দরিদ্র, কর্মজীবি, রিকশাওয়ালা অনেকেই কষ্ট করে রোযা রাখেন এবং ইফতার করতেও কষ্ট হয়। সাধ্যমত নিজেদের খাওয়া একটু কমিয়ে এদেরকে খাওয়ানো দরকার।

হাযেরীন, হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, রামাদান মাসে যারা সিয়াম পালন করেন তাদের দুটি শ্রেণী রয়েছে। এক শ্রেণীর পূর্ববর্তী সকল গোনাহ ক্ষমা করা হবে। অন্য শ্রেণী ক্ষুধা-পিপাসায় কষ্ট করা ছাড়া কিছুই লাভ হবে না। প্রথম শ্রেণীর রোযাদারদের বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

"যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং আল্লাহর নিকট সাওয়াব অর্জনের খাঁটি নিয়্যাতে রামাদানের সিয়াম পালন করবে তার পূর্ববর্তী সকল গোনাহ ক্ষমা করা হবে।"[২]

দ্বিতীয় শ্রেণীর রোযাদারদের বিষয়ে তিনি বলেন:

رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلاَّ الْجُوعُ وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلاَّ السَّهَرُ

---

[১] তিরমিযী, আস-সুনান ৩/১৭১। তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।

[২] বুখারী, আস-সহীহ ১/২২, ২/৬৭২, ৭০৯; মুসলিম, আস-সহীহ ১/৫২৩।

"অনেক সিয়াম পালনকারী আছে যার সিয়াম থেকে শুধু ক্ষুধা ও পিপাসা ছাড়া আর কোন লাভ হয় না। এবং অনেক কিয়ামকারী বা তারাবীহ-তাহাজ্জুদ পালনকারী আছে যাদের কিয়াম-তারাবীহ থেকে শুধু রাত্রি জাগরণ ছাড়া আর কোনোই লাভ হয় না।"[১]

এরূপ রোযাদারদের প্রতি বদদোয়া করে তাদের দুর্ভাগ্যের কথা জানিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

بَعُدَ مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ

"যে ব্যক্তি রামাদান মাস পেল, কিন্তু এই মাসে তাকে ক্ষমা করা হলো না সেই ব্যক্তি আল্লাহর রহমত থেকে চির-বঞ্চিত বিতাড়িত।"[২]

হাযেরীন, আমরা যারা রামাদানের সিয়াম পালন করতে যাচ্ছি তাদের একটু ভাবতে হবে, আমরা কোন্ দলে পড়ব। আর তা জানতে হলে রোযা বা সিয়ামের অর্থ বুঝতে হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

لَيْسَ الصِّيَامُ مِنَ الأَكْلِ وَالشُّرْبِ إِنَّمَا الصِّيَامُ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ

"পানাহার বর্জনের নাম সিয়াম নয়। সিয়াম হলো অনর্থক ও অশ্লীল কথা-কাজ বর্জন করা।"[৩]

তাহলে চিন্তাহীন, অনুধাবনহীন, সৎকর্মহীন পানাহার বর্জন "উপবাস" বলে গণ্য হতে পারে তবে ইসলামী "সিয়াম" বলে গণ্য হবে না। হারাম বা মাকরূহ কাজেকর্মে রত থেকে হালাল খাদ্য ও পানীয় থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখার নাম সিয়াম নয়। সিয়াম অর্থ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সকল হারাম, মাকরূহ ও পাপ বর্জন করার সাথে সাথে হালাল খাদ্য, পানীয় ও সম্ভোগ থেকে নিজেকে বিরত রাখা। এভাবে হৃদয়ে সার্বক্ষণিক আল্লাহ সচেতনতা ও আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকে লক্ষ্য রেখে শত প্রলোভন ও আবেগ দমন করে সততা ও নিষ্ঠার পথে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য সিয়াম। যদি আপনি কঠিন ক্ষুধা বা পিপাসায় কাতর হয়েও আল্লাহর ভয়ে ও তাঁর সন্তুষ্টির আশায় নিজেকে খাদ্য ও পানীয় থেকে বিরত রাখেন, অথচ সামান্য রাগের জন্য গালি, ঝগড়া ইত্যাদি হারাম কাজে লিপ্ত হন, মিথ্যা অহংবোধকে সমুন্নত করতে পরনিন্দা, গীবত, চোগলখুরী ইত্যাদি ভয়ঙ্কর হারামে লিপ্ত হন, সামান্য লোভের জন্য মিথ্যা, ফাঁকি, সুদ, ঘুষ ও অন্যান্য যাবতীয় হারাম নির্বিচারে ভক্ষণ করেন, তাহলে আপনি নিশ্চিত জানুন যে, আপনি সিয়ামের নামে আত্মপ্রবঞ্চনার মধ্যে লিপ্ত আছেন। ধার্মিকতা ও ধর্ম পালনের মিথ্যা অনুভতি ছাড়া আপনার কিছুই লাভ হচ্ছে না। রাসলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ

"যে ব্যক্তি পাপ, মিথ্যা বা অন্যায় কথা, অন্যায় কর্ম, ক্রোধ, মূর্খতাসুলভ ও অজ্ঞতামুলক কর্ম ত্যাগ করতে না পারবে, তার পানাহার ত্যাগ করাতে আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই।"[৪]

হাযেরীন, আল্লাহ কুরআনে বলেছেন, তোমরা রোযার সময় দিবসে পানাহার করো না। এর পরের আয়াতেই আল্লাহ বললেন, তোমরা অপরের সম্পদ অবৈধভাবে "আহার" করো না। এখন আপনি প্রথম আয়াতটি মেনে দিবসে আপনার ঘরের খাবার আহার করলেন না, কিন্তু পরের আয়াতটি মানলেন না, সুদ, ঘুষ, জুলুম, চাঁদাবাজি, যৌতুক, মিথ্যা মামলা, যবর দখল, সরকারি সম্পত্তি অবৈধ দখল ইত্যাদি নিষিদ্ধ পদ্ধতিতে অন্যের সম্পদ "আহার" করলেন, তাহলে আপনি কেমন রোযাদার?

---

[১] ইবনু মাজাহ, আস-সুনান ১/৫৩৯; আলবানী, সহীহুত তারগীব ১/২৬২। হাদীসটি সহীহ।
[২] হাকিম, আল-মুসতাদরাক ৪/১৭০; ইবনু হিব্বান, আস-সহীহ ২/১৪০-১৪১; আলবানী সহীহুত তারগীব ১/২৬২। হাদীসটি সহীহ।
[৩] ইবনু হিব্বান, আস-সহীহ ৮/২৫৫; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ১/৫৯৫; আলবানী, সহীহহুত তারগীব ১/২৬১। হাদীসটি সহীহ।
[৪] বুখারী, আস-সহীহ ২/৬৭৩, ৫/২২৫১।

হাযেরীন, একটি বিশেষ "আহার" হলো "গীবত"। "গীবত" শতভাগ সত্য কথা। যেমন লোকটি বদরাগী, লোভী, ঘুমকাতুরে, ঠিকমত জামাতে নামায পড়ে না, অমুক দোষ করে, কথার মধ্যে অমুক মুদ্রা দোষ আছে ইত্যাদি। এরূপ দোষগুলি যদি সত্যই তার মধ্যে বিদ্যমান থাকে তবে তার অনুপস্থিতিতে তা অন্য কাউকে বলা বা আলোচনা করা "গীবত"। আল্লাহ বলেছেন, গীবত করা হলো মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়া। মৃতভাইয়ের মাংস ভক্ষণ করার মতই "গীবত" করা সর্ববস্থায় হারাম। উপরন্তু সিয়ামরত অবস্থায় গীবত করলে "মাংস খাওয়ার" কারণে সিয়াম নষ্ট হবে বা সিয়ামের সাওয়াব সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যাবে।

হাযেরীন, সিয়াম শুধু বর্জনের নাম নয়। সকল হারাম ও মাকরূহ বর্জনের সাথে সাথে সকল ফরয-ওয়াজিব ও যথাসম্ভব বেশি নফল মুস্তাহাব কর্ম করাই সিয়াম। বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায় যে, রামাদান মাসে নফল-ফরয সকল ইবাদতের সাওয়াব বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। এজন্য সকল প্রকার ইবাদতই বেশি বেশি আদায় করা দরকার। সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রামাদান মাসে উমরা আদায় করা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে হজ্জ করার সমতুল্য। যদি কেউ রোযা অবস্থায় দরিদ্রকে খাবার দেয়, অসুস্থ মানুষকে দেখতে যায় এবং জানাযায় শরীক হয় তবে সে ব্যক্তিকে আল্লাহ জান্নাত দান করবেন। এ ছাড়া হাদীসে রামাদানে বেশি বেশি তাসবীহ, তাহলীল, দুআ ও ইসতিগফারের উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, রোযা অবস্থার দুআ ও ইফতারের সময়ের দুআ আল্লাহ কবুল করেন।

বিশেষভাবে দু প্রকারের ইবাদত রামাদানে বেশি করে পালন করতে হাদীসে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। প্রথমত, দান। "সাদকা" বা দান আল্লাহ তাআলার প্রিয়তম ইবাদত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, সাদকার কারণে মুমিন অগণিত সাওয়াব লাভ ছাড়াও অতিরিক্ত দুটি পুরস্কার লাভ করেন: প্রথমত দানের কারণে গোনাহ ক্ষমা করা হয় এবং দ্বিতীয়ত দানের কারণে আল্লাহর বালা-মুসিবত দূর হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, দুজন মানুষের মধ্যে বিবাদ মিটিয়ে দেওয়া, ন্যায় কর্মে নির্দেশ দেওয়া, অন্যায় থেকে নিষেধ করা, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক দ্রব্য বা বস্তু সরিয়ে দেওয়া, বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করা বা যে কোনোভাবে মানুষের উপকার করাই আল্লহর নিকট সাদকা হিসাবে গণ্য। রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বদা বেশি বেশি দান করতে ভালবাসতেন। আর রামাদান মাসে তাঁর দান হতো সীমাহীন। কোনো যাচঞাকারীকে বা প্রার্থীকে তিনি বিমুখ করতেন না।

হাযেরীন, রামাদান আসলেই দ্রব্যমূল বেড়ে যায়। বাংলাদেশ মুসলমানদের দেশ। এদেশের অধিকাংশ ব্যবসায়ী মুসলাম। অধিকাংশ ব্যবসায়ী রোযা রাখেন এবং দান করেন। কিন্তু আমাদের দান হালাল উপার্জন থেকে হচ্ছে কিনা তা দেখতে হবে। গুদামজাত করে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করা বা স্বাভাবিকের বাইরে অতিরিক্ত দাম গ্রহণের মাধ্যমে ক্রেতাদের জুলুম করা নিষিদ্ধ। হারাম বা নিষিদ্ধভাবে লক্ষ টাকা আয় করে তার থেকে হাজার টাকা ব্যয় করার চেয়ে হালাল পদ্ধতিতে হাজার টাকা আয় করে তা থেকে দু-এক টাকা ব্যয় করা অনেক বেশি সাওয়াব ও বরকতের কাজ। এ ছাড়া অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাদের মনে রাখতে হবে। আমরা জানি, মানুষের কল্যাণে ও সহমর্মিতায় যা কিছু করা হোক সবই দান। যদি কোনো সৎ ব্যবসায়ী যদি রামাদানে ক্রেতা সাধারণের সুবিধার্থে তার প্রতিটি পন্যে এক টাকা কম রাখেন বা নায্যমূল্যে তা বিক্রয় করেন তাও আল্লাহর নিকট অত্যন্ত বড় সাদকা হিসেবে গণ্য হবে।

হাযেরীন, রামাদানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হলো কুরআন তিলওয়াত। বিগত খুতবায় আমরা এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করেছি। রামাদানে দু ভাবে কুরআন তিলাওয়াত করতে হবে: প্রথমত কুরআন কারীম দেখে দেখে দিবসে ও রাতে তিলাওয়াত করতে হবে। সাহাবী-তাবিয়ীগণ রামাদানে এভাবে তিলাওয়াত করে কেউ তিন দিনে, কেউ ৭ দিনে বা কেউ ১০ দিনে কুরআন খতম করতেন। আমাদের সকলকেই চেষ্টা করতে হবে রামাদানে কয়েক খতম কুরআন তিলাওয়াতেরর। তিলাওয়াতের সাথে তা

বুঝার জন্য অর্থ পাঠ করতে হবে। কুরআনের অর্থ বুঝা, চিন্তা করা ও আলোচনা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত যার জন্য অতিরিক্ত সাওয়াব, বরকত ও ঈমান বৃদ্ধির কথা কুরআন ও হাদীসে বলা হয়েছে। সম্ভব হলে অর্থসহ অন্তত একখতম কুরআন তিলাওয়াত করতে হবে। যারা তিলাওয়াত করতে পারেন না তারা আল্লাহর ওয়াস্তে রামাদানে তিলাওয়াত শিখতে শুরু করুন। অবসর সময়ে তিলাওয়াতের বা অর্থসহ তিলাওয়াতের ক্যাসেটে শুনুন। কুরআন তিলাওয়াতে যেমন সাওয়াব, তা শ্রবণেও তেমনি সাওয়াব।

হাযেরীন, কুরআনের দ্বিতীয় আসর হলো কিয়ামুল্লাইল। সালাতুল ইশার পর থেকে সুবহে সাদেক পর্যন্ত সময়ের মধ্যে যে কোনো সময়ে নফল সালাত আদায় করাকে কিয়ামুল্লাইল, সালাতুল্লাইল বা রাতের সালাত বলা হয়। তাহাজ্জুদও কিয়ামুল্লাইল। একটু ঘুমিয়ে উঠে কিয়ামুল্লাইল আদায় করলে তাকে তাহাজ্জুদ বলা হয়। সারা বৎসরই কিয়ামুল্লাইল করা দরকার। রামাদানের কিয়ামের বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

"যে ব্যক্তি খাটি ঈমান ও ইখলাসের সাথে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সাওয়াবের উদ্দেশ্যে রামাদানে কিয়ামুল্লাইল আদায় করবে তার পূর্ববর্তী সকল গোনাহ ক্ষমা করা হবে।"[১]

হাযেরীন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রামাদান ও গাইর রামাদান সর্বদা প্রতি রাতে মধ্য রাত থেকে শেষ রাত পর্যন্ত ৪/৫ ঘন্টা ধরে কিয়ামুল্লাইল আদায় করতেন। তিনি এত লম্বা কিরাআত ও দীর্ঘ রুকু সাজদা করতেন যে, অনেক সময় ২ বা ৪ রাকাতেই এ দীর্ঘ ৪/৫ ঘন্টা শেষ হতো। সাধারণত তিনি ৪/৫ ঘন্টা ধরে ৮ বা ১০ রাকাত সালাতুল্লাইল এবং ৩ রাকাত বিতর আদায় করতেন। রামাদানে সাহাবীগণ তাঁর সাথে জামাতে কিয়ামুল্লাইল বা তাহাজ্জুদ আদায় করতে আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু কিয়ামুল্লাইল ফরয হওয়ার ভয়ে তিনি জামাতে আদায় না করে ঘরে পড়তে উপদেশ দেন। সে সময়ে অধিকাংশ সাহাবীই কুরআনের পূর্ণ বা আংশিক হাফিয ছিলেন। এজন্য তারা প্রত্যেকে যার যার মত ঘরে, বিশেষত শেষ রাতে রামাদানের কিয়াম আদায় করতেন। উমার (রা)-এর সময়ে দ্বিতীয় প্রজন্মের মুসলমানদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। এরা কুরআনের হাফিয না হওয়াতে হাফিযদের পিছনে কিয়াম করতে চেষ্টা করতেন। এজন্য মসজিদে নববীতে সালাতুল ইশার পরে ছোট ছোট জামাত শুরু হতো। এ দেখে উমার (রা) উবাই ইবনু কাব (রা)-কে বলেন, মানুষেরা দিবসে রোযা রাখে, কিন্তু তারা কুরআনের হাফেয না হওয়াতে রাতের কিয়াম ভালভাবে আদায় করতে পারে না। এজন্য আপনি তাদেরকে নিয়ে সালাতুল ইশার পরে জামাতে কিয়াম বা তারাবীহ আদায় করেন। এছাড়া তিনি সুলাইমান ইবনু আবী হাসমাকে নির্দেশ দেন মহিলাদের নিয়ে পৃথক তারাবীহের জামাত করতে। উসমান (রা) ও আলী (রা)-এর সময়েও এভাবে জামাতে তারাবীহ আদায় করা হতো এবং মহিলাদের জন্য পৃথক তারাবীহের জামাত কায়েম করা হতো।[২]

উমার (রা)-এর সময়ে ৮ ও ২০ রাকআত তারাবীহ পড়া হতো বলে সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায় যে, সাহাবী-তাবিয়ীদের সময়ে ইশার পর থেকে মধ্য রাত বা শেষ রাত পর্যন্ত তারাবীহের জামাত চলত এবং তাঁরা প্রত্যেক রাকআতে ১/২ পারা কুরআন পাঠ করতেন। এ থেকে বুঝা যায় যে, প্রথম দিকে ৮ রাকাত তারাবীহ আদায় করা হতো। প্রত্যেক রাকাতে তারা ১/২ পারা কুরআন পাঠ করতেন এবং ইশার পর থেকে শেষ রাত পর্যন্ত প্রায় ৫/৬ ঘন্টা তারা এভাবে সালাত আদায় করতেন। প্রতি রাকাতে আধা ঘন্টা বা তার বেশি দাঁড়াতে কষ্ট বেশি। এজন্য পরে তারা এরূপ ৫/৬ ঘন্টা

---

[১] বুখারী, আস-সহীহ ১/২২, ২/৭০৭; মুসলিম, আস-সহীহ ১/৫২৩।
[২] বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা, ২/৪৯৩।

ধরে ২০ রাকাত পাঠ করতেন। রাকআাতের সংখ্যা বাড়াতে দাঁড়ানো কষ্ট কিছুটা কম হতো।

হাযেরীন, তাহলে, কিয়ামুল্লাইলের মূল সুন্নাত হলো নামাযে দাঁড়িয়ে কুরআন তিলাওয়াত করা। বর্তমানে আমরা কুরআন তিলাওয়াত ও শ্রবণের চেয়ে সংখ্যা গণনা করা ও তাড়াতাড়ি শেষ করাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করি। অনেকে আবার ৮/১০ রাকাত পড়েই চলে যান। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

مَنْ قَامَ مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ

"যদি কেউ ইমামের সাথে শেষ পর্যন্ত কিয়ামুল্লাইল আদায় করে তবে সে সারারাত কিয়ামুল্লাইলের সাওয়াব লাভ করবে।"[১]

হাযেরীন, পূর্ববর্তী যামানার মানুষেরা প্রায় একঘন্টা ধরে ৪ রাকআত তারাবীহ আদায় করে এরপর কিছু সময় বিশ্রাম করতেন । আমরা ৮/১০ মিনিটে ৪ রাকাত আদায় করেই বিশ্রাম করি। এ সময়ে নীরবে বিশ্রাম করা যায়, বা কুরআন পাঠ, যিকর, দরুদ পাঠ বা অন্য যে কোনো আমল করা যায়। এ বিশ্রামের সময়ে আমাদের সমাজে যে দুআ ও মুনাজাত প্রচলিত আছে তা কোনো হাদীসে বা পূর্ববর্তী ফিকহের গ্রন্থগুলিতে পাওয়া যায় না। পরবর্তী আলিমগণ দুআ ও মুনাজাতটি বানিয়েছেন। এর অর্থে কোনো দোষ নেই। তবে অনেকে মনে করেন যে, দুআ ও মুনাজাতটি বোধহয় তারাবীর অংশ বা তা না হলে তারাবীহের সাওয়াব কম হবে। এমনকি অনেকে দুআ-মুনাজাত না জানার কারণে তারাবীহ পড়েন না। এগুলি সবই ভিত্তিহীন ধারণা। এ সময়ে তাসবীহ, তাহলীল, মাসনূন দুআ-যিকর অথবা দরুদ পাঠ করাই উত্তম।

হাযেরীন, সাহাবী-তাবিয়ীগণ প্রতি তিন দিন বা দশ দিনে তারাবীহের জামাতে কুরআন খতম করেতন। আর আমরা পুরো রামাদানে এক খতম করতেও কষ্ট পাই। তাঁরা ৫/৬ ঘন্টা ধরে তারাবীহ পড়তেন। আমরা এক ঘন্টাও দাঁড়াতে চাই না। হাফেয সাহেব একটু সহীহ তারতীলের সাথে পড়লে আমরা রাগ করি। কুরআনের সাথে এর চেয়ে বেশি বেয়াদবি আর কি হতে পারে। কুরআন শ্রবণের আগ্রহ নিয়ে ইমামের সাথে শেষ পর্যন্ত তারাবীহ আদায় করুন। ইমামের সাথে সাথেই নিয়্যাত করুন এবং পুরো কুরআন মহব্বতের সাথে শুনুন। সময় তো চলেই যাবে ভাই। হয়ত এভাবে কুরআন শোনার সময় আর পাব না। আল্লাহ আমাদের সিয়াম ও কিয়াম কবুল করুন। আমীন।

হাযেরীন, পিতামাতার দায়িত্ব হলো, সাত বছর থেকে ছেলেমেয়েদের নামায, রোযা, তারাবীহ ইত্যাদিতে অভ্যস্থ করা। তাদের বয়স দশ বৎসর হলে এ বিষয়ে কঠোরতা অবলম্বন করা ফরয। নিজের নামায রোযা যেমন ফরয, ছেলেমেয়েদের নামায রোযা আদায় করানোও তেমনি ফরয। ছেলেমেয়েরা নামায পড়লে, রোযা রাখলে, তারাবীহতে শরীক হলে তারা যেমন সাওয়াব বরকত লাভ করবে, তেমনি তাদের পিতামাতাও সাওয়াব ও বরকত লাভ করবেন। এছাড়া ছেলেমেয়েরা আজীবন যত নামায, রোযা, তারাবীহ, কুরআন, যিক্‌র, দান ও অন্যান্য ইবাদত করবে সকল ইবাদতের সমপরিমাণ সাওয়াব পিতামাতা লাভ করবেন। পক্ষান্তরে পিতামাতার অবহেলার কারণে যদি ছেলেমেয়েরা বেনামাযী বা বে-রোযাদার হয় তবে তাদের গোনাহের সমপরিমাণ গোনাহ তারা লাভ করবেন। হাযেরীন, ছেলেমেয়েরা আমাদের হৃদয়ের শান্তি। আসুন রামাদানের বরকতে তাদের শরীক করি। তাদেরকে রোযা রাখতে উৎসাহিত করি। ৭ বৎসর বা তার বেশি বয়সের ছেলেদেরকে তারাবীহের জামাতে সাথে করে নিয়ে যাই। তাদেরকে নেককার রূপে গড়ে তুলি। তাহলে তারা দুনিয়াতে যেমন আমাদের হৃদয়ের শান্তি হবে, জান্নাতেও তেমনি আমাদের হৃদয়ের শান্তি হবে। আল্লাহ কবুল করুন। আমীন।

---

[১] তিরমিযী, আস-সুনান ৩/১৬৯; নাসাঈ, আস-সুনান ৩/২০২। তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

أَمَّا بَعْدُ، فَيَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ

قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّا مَعْشَرَ الأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا بِتَعْجِيْلِ فِطْرِنَا وَتَأْخِيْرِ سُحُوْرِنَا

وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

وَقَالَ ﷺ: مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ

بَارَكَ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ فِيْ الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ. وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ. أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ، فَاسْتَغْفِرُوْهُ وَتُوْبُوْا إِلَيْهِ، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.

রামাদান মাসের ২য় খুতবাঃ যাকাত

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লী আলা রাসূলিহীল কারীম। আম্মা বাদ,

সম্মানিত উপস্থিতি, আজ রামাদান মাসের ২য় জুমুআ। আজ আমরা যাকাতের আহকাম আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ। কিন্তু তার আগে আমরা এ সপ্তাহের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসগুলির বিষয়ে সংক্ষেপ আলোকপাত করি। হাযেরীন, আজ ইংরেজী ..... মাসের ..... তারিখ। এ সপ্তাহের দিবসগুলির মধ্যে রয়েছে ....।

হাযেরীন, ঈমান ও সালাতের পরে যাকাত ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ। অনেক ইবাদতই কুরআন কারীমে মাত্র ২/৪ বার উল্লেখিত হয়েছে, যেমন রোযা, হজ্জ ইত্যাদি। আবার কিছু ইবাদত অনেক বেশী বার উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআনে একবার বললেই ফরয হয়ে যায়। বারবার বলার অর্থ গুরুত্ব বুঝানো। সালাতের পরে সবচেয়ে বেশী যাকাতের কথা কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা সাধারণত দীনের সবচেয়ে বড় কাজ বুঝাতে বলি "নামায-রোযা", কিন্তু কুরআনে কোথাও "নামায-রোযা" বলা হয় নি, সব সময় বলা হয়েছে "নামায-যাকাত"। রোযা হলো যাকাতের পরে। যাকাত না দেওয়া কাফিরদের বৈশিষ্ট্য ও জাহান্নামের শাস্তির অন্যতম কারণ। আল্লাহ বলেন:

وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِيْنَ الَّذِيْنَ لا يُؤْتُوْنَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُوْنَ

"ধ্বংস মুশরিকদের জন্য, যারা যাকাত প্রদান করে না, আর যারা আখেরাতে অবিশ্বাস করে।"[১]

কুরআনে বলা হয়েছে, জাহান্নামীগণকে প্রশ্ন করা হবে: কিজন্য তোমরা জাহান্নামে শাস্তি ভোগ করছ? তারা তাদের কুফুরীর উল্লেখের সাথে সাথে নামায ও যাকাত ত্যাগের কথা বলবে। তারা বলবে:

لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ

"আমরা সালাত পালনকারীগণের মধ্যে ছিলাম না। আর আমরা দরিদ্রগণকে খাওয়াতাম না।"[২]

আমরা মনে করি, বৈধ-অবৈধভাবে মাল বৃদ্ধি করলে এবং সঞ্চয় করলেই সম্পদশালী হলাম। কিন্তু আল্লাহ বলেন উল্টো কথা। ব্যয় করলেই আল্লাহ বৃদ্ধি করেন। আপনি দুয়ে দুয়ে চার গুণেছেন। কিন্তু কার জন্য গুণলেন? আপনার জন্য না সন্তানদের জন্য? আল্লাহ বরকত নষ্ট করে দিলে কিছুই থাকবে না। কিভাবে বরকত নষ্ট হবে তা আপনি বুঝতেও পারবেন না। আল্লাহ তাঁর ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। আল্লাহ বলেন:

يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِيْ الصَّدَقَاتِ

"আল্লাহ সুদের বৃদ্ধিকে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করেন আর 'সাদাকাহ' বা যাকাতকে বৃদ্ধি করেন।"[৩]

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِيْ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلاَ يَرْبُوْ عِنْدَ اللهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ

"এবং তোমরা মানুষের সম্পদ বৃদ্ধির জন্য যে বৃদ্ধি (সুদ) প্রদান কর তা আল্লাহর নিকট বৃদ্ধি পায় না। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তোমরা যে যাকাত প্রদান কর সেই যাকাতই হল বহুগুণ বৃদ্ধিকারী।"[৪]

আরো কয়েকটি সহীহ হাদীস শুনুন:

---

[১] সূরা ফুসসিলাত (৪১): আয়াত ৬-৭।
[২] সূরা আল- মুদ্দাসসির (৭৪): আয়াত: ৪২-৪৩।
[৩] সূরা বাকারা: ২৭৬ আয়াত।
[৪] সূরা রূম: ৩৯ আয়াত।

ثَلاثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ فَقَدْ طَعِمَ طَعْمَ الإِيمَانِ مَنْ عَبَدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَ(عَلِمَ) أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ

"যে ব্যক্তি তিনটি কাজ করবে সে ঈমানের স্বাদ ও মজা লাভ করবে: যে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবে, জানবে যে আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং আনন্দিত চিত্তে পবিত্র মনে তার সম্পদের যাকাত প্রদান করবে।"[১]

ثَلاثٌ أَحْلِفُ عَلَيْهِنَّ لا يَجْعَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ لَهُ سَهْمٌ فِي الإِسْلامِ كَمَنْ لا سَهْمَ لَهُ فَأَسْهُمُ الإِسْلامِ ثَلاثَةٌ الصَّلاةُ وَالصَّوْمُ وَالزَّكَاةُ

"তিনটি বিষয় আমি শপথ করে বলছি: যে ব্যক্তির ইসলামে অংশ আছে আর যার ইসলামে কোন অংশ নেই দুইজনকে আল্লাহ কখনোই সমান করবেন না। ইসলামের অংশ তিনটি: সালাত, সিয়াম ও যাকাত।"[২]

مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ فَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ شَرُّهُ

"যে তার সম্পদের যাকাত প্রদান করে, তার সম্পদের অকল্যাণ ও অমঙ্গল দূর হয়ে যায়।"[৩]

হাযেরীন, প্রথম যে তিন ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করবে তাদের একজন হলো যাকাত প্রদান থেকে বিরত সম্পদশালী মুসলিম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

وَأَمَّا أَوَّلُ ثَلاثَةٍ يَدْخُلُونَ النَّارَ فَأَمِيرٌ مُسَلَّطٌ وَذُو ثَرْوَةٍ مِنْ مَالٍ لا يُؤَدِّي حَقَّ اللهِ فِيْ مَالِهِ وَفَقِيرٌ فَجُورٌ

"প্রথম যে তিন ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করবে তারা হলো: সেচ্ছাচারী শাসক বা প্রশাসক, সম্পদশালী ব্যক্তি যে তার সম্পদে আল্লাহর যে অধিকার (যাকাত) তা প্রদান করে না এবং পাপাচারে লিপ্ত দরিদ্র ব্যক্তি।"[৪]

হাযেরীন, যাকাত প্রদান থেকে যে মুসলিম বিরত থাকে বা যাকাত দিতে টালবাহনা ও দ্বিধা করে তাকে হাদীসে অভিশপ্ত বা মাল'উন বলা হয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রা.) বলেন:

آكِلُ الرِّبَا وَمُوكِلُهُ وَكَاتِبُهُ وَشَاهِدَاهُ إِذَا عَلِمُوا بِهِ وَالْوَاشِمَةُ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ لِلْحُسْنِ وَلاوِي الصَّدَقَةِ وَالْمُرْتَدُّ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ هِجْرَتِهِ مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"সুদ গ্রহণকারী, সুদ প্রদানকারী, সুদের লেখক, সুদের সাক্ষীদ্বয়- যদি তা জেনেশুনে করে, সৌন্দর্যের জন্য যে নারী নিজের দেহে উল্কিকাটে বা অন্যের দেহে উল্কি কেটে দেয়, যাকাত প্রদানে যে ব্যক্তি টালবাহনা করে বা বিরত থাকে এবং হিজরত করার পরে আবার যে ব্যক্তি বেদুঈন (যাযাবর) জীবনে ফিরে যায় তারা সকলেই কিয়ামতের দিন মুহাম্মাদু ﷺ-এর জবানীতে অভিশপ্ত মাল'উন।"[৫]

হাযেরীন, যারা যাকাত না দিয়ে সম্পদ জমা করে রাখে তাদের বিষয়ে আল্লাহ বলেন:

وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

---

[১] আবূ দাউদ, আস-সুনান ২/১০৩; আলবানী, সহীহুত তারগীব ১/১৮৩।
[২] হাকিম, আল-মুসতাদরাক ১/৬৭; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৩৭; আলবানী সহীহুত তারগীব ১/৮৯, ১৮১। হাদীসটি সহীহ।
[৩] হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৩/৬৩; আলবানী, সহীহুত তারগীব ১/১৮২। হাদীসটি হাসান।
[৪] ইবনু হিব্বান, আস-সহীহ ১০/৫১৩; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ১/৫৪৪; আলবানী, সহীহুত তারগীব ২/৬৬। হাদীসটি সহীহ।
[৫] আহমদ, আল-মুসনাদ ১/৪০৯, ৪৩০, ৪৬৪; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ১/৫৪৫; আলবানী, সহীহুত তারগীব ১/১৮৫। হাদীসটি হাসান।

"আল্লাহ অনুগ্রহ করে যে সম্পদ দান করেছেন সেই সম্পদ নিয়ে যারা কৃপণতা করে, তারা যেন কখনই মনে না করে যে, তাদের এই সম্পদ তাদের জন্য কল্যাণবহ বা উপকারী, বরং তা তাদের জন্য ক্ষতিকর। তাদের কৃপণতা করে সঞ্চিত সম্পদ কিয়মতের দিন তাদের গলার বেড়ী হবে।"[১]

হাদীসের আলোকে জানা যায় যে, কিছু কঠিন পাপ আছে যেগুলির শাস্তি শুধু আখেরাতেই নয়, দুনিয়াতেও ভোগ করতে হয়। বিশেষত যে পাপগুলি মানুষের অধিকারের সাথে জাড়িত এবং যে পাপের ফলে অন্য মানুষ কষ্ট পায় বা সমাজের ক্ষতি হয়। এরূপ পাপ যদি সমাজে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে তবে আল্লাহ সে সমাজে গযব দেন এবং সমাজের সকলেই সে শাস্তি ভোগ কনে। যাকাত প্রদানে টালবাহানা সেসকল পাপের অন্যতম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا إِلا فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلافِهِمِ الَّذِينَ مَضَوْا وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَئُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ.

"(১) যখন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে অশ্লীলতা এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ে যে তারা প্রকাশ্যে অশ্লীলতায় লিপ্ত হতে থাকে, তখন তাদের মধ্যে এমন সব রোগব্যাধি ছড়িয়ে পড়ে যা তাদের পুর্বপুরুষদের মধ্যে প্রসারিত ছিল না। (২) যখন কোন সম্প্রদায়ের মানুষেরা ওজনে কম বা ভেজাল দিতে থাকে, তখন তারা দুর্ভিক্ষ, জীবনযাত্রার কাঠিন্য ও প্রশাসনের বা ক্ষমতাশীলদের অত্যাচারের শিকার হয়। (৩) যদি কোন সম্প্রদায়ের মানুষেরা যাকাত প্রদান না করে, তাহলে তারা অনাবৃষ্টির শিকার হয়। যদি পশুপাখি না থাকতো তাহলে তারা বৃষ্টি থেকে একেবারেই বঞ্চিত হতো। (৪) যখন কোন সম্প্রদায়ের মানুষ আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের ওয়াদা বা আল্লাহর নামে প্রদত্ত ওয়াদা ভঙ্গ করে, তখন আল্লাহ তাদের কোন বিজাতীয় শত্রুকে তাদের উপর ক্ষমতাবান করে দেন, যারা তাদের কিছু সম্পদ নিয়ে যায়। (৫) আর যদি কোন সম্প্রদায়ের শাসকবর্গ ও নেতাগণ আল্লাহর কিতাব (পবিত্র কুরআন) অনুযায়ী বিচার শাসন না করেন এবং আল্লাহর বিধানের সঠিক ও ন্যায়ানুগ প্রয়োগের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা না করে, তখন আল্লাহ তাদের মধ্যে পরস্পর শত্রুতা ও মতবিরোধ সৃষ্টি করে দেন, তারা তাদের বীরত্ব একে অপরকে দেখাতে থাকে।"[২]

হাযেরীন, মূলত পাঁচ প্রকার সম্পদের যাকাত প্রদান করা ফরয। (১) বিচরণশীল উট, গরু, ছাগল ইত্যাদি গৃহপালিত পশু, (২) সোনা-রূপা, (৩) নগদ টাকা, (৪) ব্যবসা বা বিক্রয়ের জন্য রক্ষিত দ্রব্য ও (৫) কৃষি উৎপাদন বা ফল ও ফসল। যেহেতু আমাদের দেশে খোলা চারণভুমিতে পশু পালনের ব্যবস্থা নেই এবং নিসাবযোগ্য পশুও কারো থাকে না, সেহেতু আমাদের দেশে গৃহপালিত পশুর যাকাত সাধারণভাবে কাউকে দিতে হয় না। এছাড়া বাকি সম্পদগুলির যাকাত প্রদানের নিয়ম নিম্নরূপ:

(১) স্বর্ণ: যদি কারো নিকট সাড়ে ৭ তোলা (ভরি) বা তার বেশি স্বর্ণ থাকে তবে প্রতি চান্দ্র বৎসর (৩৫৪ দিন) পূর্তিতে মোট স্বর্ণের ২.৫% যাকাত প্রদান করতে হবে। যেমন কারো যদি ১০ ভরি স্বর্ণ থাকে তবে প্রতি বৎসরে তাকে ০.২৫ ভরি স্বর্ণ বা তার দাম যাকাত হিসাবে প্রদান করতে হবে। সাড়ে ৭ ভরির কম স্বর্ণ থাকলে যাকাত ফরয হবে না।

---

[১] সূরা আল ইমরান (৩): আয়াত ১৮০।

[২] ইবনু মাজাহ, আস-সুনান ২/১৩৩২; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৫/৩১৮; আলবানী, সহীহুত তারগীব ১/১৮৭। হাদীসটি সহীহ।

(২) রৌপ্যঃ যদি কারো কাছে সাড়ে ৫২ তোলা বা তার বেশি রূপা থাকে তবে প্রতি চান্দ্র বৎসরে মোট রূপার ২.৫% যাকাত প্রদান করতে হবে।

(৩) নগদ টাকা। নগদ টাকার নিসাব হবে স্বর্ণ বা রৌপ্যের নিসাবে। হাদীসে মূলত রৌপ্যের নিসাবই বলা হয়েছে। এছাড়া রূপার নিসাবে আগে যাকাত ফরয হয়। এজন্য বর্তমানে কারো কাছে যদি সাড়ে ৫২ তোলা রূপার দাম (২০০৮ সালের বাজার মূল্য অনুসারেঃ ২৪/২৫ হাজার টাকা) এক বৎসর সঞ্চিত থাকে তবে তাকে মোট টাকার ২.৫% যাকাত দিতে হবে। যেমন কারো যদি ৩০ হাজার টাকা সঞ্চিত থাকে তবে তাকে বছর শেষে ৬৫০ টাকা যাকাত দিতে হবে।

(৪) ব্যবসায়ের সম্পদ। বিক্রয়ের জন্য রক্ষিত সকল সম্পদের যাকাত দিতে হবে। যদি দোকানে, গোডাউনে, বাড়িতে মাঠে বা যে কোনো স্থানে বিক্রয়ের জন্য রক্ষিত মাটি, বালি, ইট, গাড়ী, জমি, বাড়ি, ফ্লাট বা অন্য যে কোনো পণ্য থাকে এবং তার মূল্য সাড়ে ৫২ তোলা রূপার মূল্যের সমান বা তার চেয়ে বেশি হয় তবে বৎসর শেষে মোট সম্পদের মূল্যের ২.৫% যাকাত দিতে হবে।

(৫) ভূমিজাত ফল ও ফসল। ফল-ফসলের যাকাতকে "উশর" বলা হয়। ভুমি ব্যবহার করে উৎপাদিত সকল প্রকারের ফল, ফসল, মধু, লবন ইত্যাদির যাকাত দিতে হবে। ফল-ফসলের যাকাত দিতে হয় প্রতি মৌসূমে ফল-ফসল ঘরে উঠালে। হাদীস শরীফে ফল ফসলের নিসাব বলা হয়েছে ৫ ওয়াসাক। অর্থাৎ প্রায় ২৫ মণ। তবে ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) বলেছেন যে, কম বেশি সব ফল-ফসলেরই যাকাত দেওয়া দরকার। ফল-ফসলের যাকাতের পরিমাণ হলে ৫% বা ১০%। বৃষ্টির পানিতে বা স্বাভাবিক মাটির রসে যে সকল ফসল বা ফল হয় তা থেকে ১০% যাকাত দিতে হবে। আর সেচের মাধ্যমে উৎপাদিত ফল-ফসলের ৫% যাকাত দিতে হবে। ফল বা ফসলের মূল্যও প্রদান করা যায়।

হাযেরীন, টাকা-পয়সার যাকাত অনেকে প্রদান করেন, কিন্তু ফল-ফসলের যাকাত আমরা প্রদান করি না। ফল-ফসলের যাকাত যে ফরয এ কথাটিই অনেক দীনদার মুসলমান জানেন না। কেউ চিন্তা করেন, এত উৎপাদন ব্যয়, ট্যাক্স, খাজনা ইত্যাদি দেওয়ার পরে আর কিভাবে যাকাত দেব? এরূপ চিন্তা করলে তো আর ব্যবসায়ের যাকাতও দেওয়া লাগে না। সরকারের ট্যাক্স, ভ্যাট, দোকানের ভাড়া, সন্ত্রাসীদের চাঁদা ইত্যাদির কারণে কি আল্লাহর ফরয যাকাত মাফ হয়? কেউ মনে করেন, ইসলামী রাষ্ট্র নয়, কাজেই ফসলের যাকাত লাগবে না। আমাদের দেশ ইসলামী রাষ্ট্র কি না তা অন্য প্রশ্ন। তবে ইসলামী রাষ্ট্র না হলেই যদি ফসরের যাকাত হয় তাহলে টাকাপয়সার যাকাতও মাফ হওয়া দরকার। নামাযও মাফ হওয়া দরকার।

হাযেরীন, হানাফী ফকহীহগণ বলেছেন যে, অনৈসলামিক দেশের জমি, যে জমি উশরীও নয় খারাজীও নয়, সে জমির উৎপাদনের উশর বা যাকাত দেওয়া ফরয। ইসলামী রাষ্ট্রে খারাজী জমির শরীয়ত নির্ধারিত খারাজ দিলে যাকাত মাফ হতে পারে। খারাজ হলো উশরের দ্বিগুণ রাষ্ট্রীয় ট্যাক্স, মূলত যাকাতের পরিবর্তে কাফিরদের জমি থেকে ইসলামী রাষ্ট্র তা গ্রহণ করে। কিন্তু যে দেশ ইসলামী রাষ্ট্র নয় তথাকার কোনো জমি খারাজী হতে পারে না এবং এরূপ দেশের জমির উৎপাদনের উশর বা যাকাত মুসলিমকে দিতেই হবে।[১]

হাযেরীন, আল্লাহ যে ইবাদত ফরয করেছেন, কোনোভাবে কোনো ছাড় দেওয়ার কথা বলেন নি, আমরা মুমিন হয়ে কিভাবে তা এরূপ এরূপ উদ্ভট যুক্তি বা কোনো আলিমের অপ্রাসঙ্গিক লেখার "দলিল" দিয়ে তা বন্দ করে দেব? এভাবে তো বাংলাদেশে জুমার নামায বন্ধ করা যায়! উপরে যাকাত প্রদান না করার ভয়ঙ্কর পরিণতি জেনেছি। ফসলের যাকাতের ক্ষেত্রেও তা একইভাবে প্রযোজ্য। কুরআন ও হাদীসে বারংবার ফলফসলের যাকাত প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেনঃ

---

[১] ইবনু আবেদীন, হাশিয়াতু রাদ্দিল মুহতার ২/৩২৫।

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ

"হে মুমীনগণ, তোমরা তোমাদের পবিত্র উপার্জন থেকে খরচ কর (যাকাত প্রদান কর) এবং আমি তোমাদের জন্য ভূমি থেকে যা বের করেছি তা থেকে (যাকাত প্রদান কর)।"[১]

অন্য এক আয়াতে এরশাদ করা হয়েছেঃ

وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

এবং ফল-ফসল কর্তনের দিনে তার পাওনা (দরিদ্রগণের অধিকার বা যাকাত) পরিশোধ কর।"[২]

হাযেরীন, অগণিত হাদীসে বারংবার ফল-ফসলের যাকাত প্রদান করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কুরআনে বা হাদীসে কোথাও কোনোভাবে বলা হয় নি যে, মুমিনের কোনো জমির ফল বা ফসলের যাকাত দিতে হবে না। তবে যদি তিনটি শর্ত পূরণ হলে হানাফী মাযহাবে উশর বা ফসলের যাকাত না দিলেও চলেঃ (১) জমিটি ইসলামী পদ্ধতিতে খারাজী ভূমি বলে নির্ধারিত হতে হবে, (২) খারাজের পরিমাণ ইসলামী পদ্ধতিতে নির্ধারিত হতে হবে এবং (৩) কোন ইসলামী রাষ্ট্র সেই নির্ধারিত খারাজ গ্রহণ করে ইসলামী ব্যবস্থায় ব্যয় করবে। এ তিনটি শর্ত আমাদের দেশের কোথাও পাওয়া যায় না।

বিষয়টি বুঝতে হলে উশর ও খারাজের পার্থক্য বুঝা দরকার। কাফিরদের জমি থেকে যে কর নেওয়া হতো তাকে খারাজ বলে। খারাজ উশরের দ্বিগুণ বা আরো বেশি হয়। মুসলিম বিজয়ের সময় যে জমি মুসলিম সৈন্যরা দখল করে কাফির নাগরিকদের প্রদান করে তাকে খারাজী জমি বলে। আর মুসলিম বিজয়ের সময় যে জমি মুসলমানদের হাতে ছিল, বা পতিত ছিল, বা কাফিররা ফেলে রেখে চলে গিয়েছিল, পরে মুসলিমরা আবাদ করেছেন অথবা সরকারীভাবে দখল নিয়েছেন বা ক্রয় করেছেন এরূপ সকল জমি ওশরী জমি। কোনো সরকার যদি এরূপ ওশরী জমি থেকে খারাজ গ্রহণ করেন তবে তারপরও মুসলিমের উপর সে জমির ফল-ফসলের যাকাত দেওয়া ফরয। হানাফী ফিকহের মূলনীতি অনুসারে আমাদের দেশের অধিকাংশ জমি উশরী জমি। আর যা কিছু খারাজী জমি আছে তা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। আর কোনো জমি থেকেই ইসলামী নিয়মে খারাজ নেওয়া হয় না। আমরা যে খাজনা, ট্যাক্স ইত্যাদি প্রদান করি তা কখনোই ইসলামী খারাজ নয়। এগুলিকে খারাজ মনে করে যাকাত না দেওয়া আর ইনমাক ট্যাক্স দেওয়ার কারণে যাকাত না দেওয়া একই কথা। আল্লাহর গযব থেকে বাঁচতে প্রত্যেক মুমিনের দায়িত্ব নিজের ফল ও ফসলের যাকাত আদায় কর।

হাযেরীন, সকল প্রকার যাকাত মূলত দরিদ্রদের পাওনা। আল্লাহ বলেনঃ

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"নিশ্চয় সাদাকাহ (যাকাত) শুধুমাত্র অভাবীদের জন্য, সম্বলহীনদের জন্য, যারা এ খাতে কর্ম করে তাদের জন্য, যাদের অন্তর আকর্ষিত করতে হবে তাদের জন্য, দাসমুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর রাস্তায় এবং মুসাফিরদের জন্য। আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারণ। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী মহাপ্রজ্ঞাময়।"[৩]

হাযেরীন, ইসলামের যাকাত ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য হলো দারিদ্র্য বিমোচন করা। যাকাতের মাধ্যমে দুভাবে দরিদ্রদেরকে সাহায্য করতে হবে। প্রথমত তাদের তাৎক্ষণিক চাহিদা মেটানো এবং

---

[১] সূরা বাকারাহ: আয়াত ২৬৭।

[২] সূরা আন'আম, আয়াত ১৪১।

[৩] সূরা তাওবাহ, আয়াত ৬০।

দ্বিতীয়ত তাদের দারিদ্রের স্থায়ী সমাধান করা। এজন্য ইসলামে যাকাতকে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় প্রদান করা হয়েছে। ইসলামের নির্দেশ হলো রাষ্ট্র নাগরিকদের নিকট থেকে যাকাত গ্রহণ করবে এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় তা বণ্টন করবে। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার অনুপস্থিতিতে মুমিন অবশ্যই নিজের ফরয ইবাদত নিজেই আদায় করবেন। যদিও ব্যক্তিগতভাবে যাকাত আদায়ের কারণে দারিদ্র বিমোচনে যাকাত পূর্ণ অবদান রাখতে পারছে না। কারণ দরিদ্র ব্যক্তি নগদ টাকা খরচ করে ফেলেন এবং তা উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করতে পারেন না। এতদসত্ত্বেও আমাদের চেষ্টা করতে হবে ব্যক্তিগতভাবে বা কয়েকজন মিলে একত্রিতভাবে প্রতি বৎসর যাকাতের কিছু টাকা দারিদ্য বিমোচনে ব্যয় করার। যাকাতের টাকা দিয়ে দরিদ্রদেরকে রিকশা, গরু, সেলাই মেশিন বা কুটিরশিল্প জাতীয় কিছু কিনে দেওয়া যায়। যেন গ্রহিতা এগুলি বিক্রয় না করতে পারে সেজন্য তত্ত্বাবধান প্রয়োজন।

হাযেরীন, যাকাতের সম্পদ প্রদানের ক্ষেত্রে প্রধান মূলনীতি হলো তা ব্যক্তিকে প্রদান করতে হবে এবং প্রদান নি:শর্ত হবে। যাকাত গ্রহণকারী ব্যক্তিকে পরিপূর্ণ স্বত্ব, মালিকানা ও ব্যয়ের ক্ষমতা দিয়ে তা প্রদান করতে হবে। এজন্য যাকাতের অর্থ কোনো সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান তৈরি করতে, মসজিদ, মাদ্রাসা, রাস্তাঘাট ইত্যাদি কাজে ব্যয় করা যাবে না। অনুরূপভাবে মৃত ব্যক্তির দাফন কাফন বা ঋণ পরিশোধের জন্যও ব্যয় করা যাবে না। কারণ এখানে নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তিকে যাকাত সম্পদের মালিকানা প্রদান করা হচ্ছে না। কোনো নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান যদি সঠিক খাতে ব্যয় করার জন্য যাকাত সংগ্রহ করে তাহলে তাদেরকে যাকাত প্রদান করা যাবে। উক্ত প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা যাকাত প্রদানকারী মুসলিমের পক্ষ থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত এটর্নি হিসাবে বিবেচিত হবেন। তাদের দায়িত্ব হলো সংগৃহীত যাকাত সঠিক খাতের মুসলিমগণকে সঠিকভাবে প্রদান বা বণ্টন করা।

হাযেরীন, যাকাত গ্রহণকারী ব্যক্তি অবশ্যই মুসলিম হবেন। যাকাত শুধুমাত্র মুসলিমদের প্রাপ্য। কোন অমুসলিম যাকাত পাবেন না। মুসলিম নামধারী কোনো ব্যক্তি যদি নামাজ না পড়ে বা প্রকাশ্য শিরক বা কুফরীতে লিপ্ত থাকে তাহলে তাকে যাকাত দেওয়া যাবে না। একজন মুসলিম কোনো অমুসলিমকে নফল দান, সাহায্য ও সামাজিক সহযোগিতা করতে পারেন। কিন্তু তার ফরয দান বা যাকাত তিনি শুধুমাত্র মুসলিমকেই প্রদান করবেন। নিজের পিতামাতা, স্ত্রী ও সন্তানগণকে যাকাত দেওয়া যায় না। এছাড়া ভাই বোন, চাচা, মামা ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজন কেউ দরিদ্র হলে তাকে যাকাত দেওয়া যায়। বরং তাদেরকে সবচেয়ে আগে বিবেচনা করতে হবে।

হাযেরীন, যাকাত এবং সকল দানের ক্ষেত্রে একটি মূলনীতি হলো এর উপকার যত ব্যাপক হবে সাওয়াবও তত বেশি হবে। যেমন, যে কোনো মুসলিম দরিদ্রকে যাকাত প্রদান করা যাবে। তবে একজন দরিদ্র তালেবে এলেম বা আলেমকে যাকাত প্রদান করলে এ সাহায্য তাকে অধিকতর ইলম চর্চা ও প্রসারের সুযোগ দেবে, যা উক্ত যাকাত দ্বারা অর্জিত অতিরিক্ত উপকার। এজন্য যাকাত দাতার সাওয়াব বৃদ্ধি পাবে। যাকাত ও উশর প্রদানের সময় এ মূলনীতির দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার, যেন আমাদের যাকাত শুধুই ব্যক্তিগত আর্থিক সাহায্য না হয়ে অধিকতর কিছু কল্যাণে পরোক্ষভাবে হলেও অবদান রাখে। কোনো ভাল মাদ্রাসায় যদি যাকত তহবিল থাকে তাহলে আপনাদের যাকাত ও উশরের টাকা বা ফসল সেখানে দেবেন। এতে যাকাত আদায় ছাড়াও ইলম প্রচারের অতিরিক্ত সাওয়াব হবে। অনুরূপভাবে দীনদার দরিদ্র মানুষকে দিলে যাকাত আদায় ছাড়াও দীন পালনে সহযোগিত হবে।

আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক প্রদান করুন। আমীন।

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

أَمَّا بَعْدُ، فَيَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ

مِنْ الأَرْضِ

وَقَالَ: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ فَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ شَرُّهُ

بَارَكَ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ فِيْ الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ. وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ. أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ، فَاسْتَغْفِرُوْهُ وَتُوْبُوْا إِلَيْهِ، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.

রামাদান মাসের ৩য় খুতবা: শবে কদর, ইতিকাফ ও ফিতরা

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লী আলা রাসূলিহীল কারীম। আম্মা বাদ,

সম্মানিত উপস্থিতি, আজ রামাদান মাসের তৃতীয় জুমুআ। আজ আমরা রামাদানের শেষ দশ রাত, শবে কদর, ইতিকাফ ও সাদাকাতুল ফিতর সম্পর্কে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ। কিন্তু তার আগে আমরা এ সপ্তাহের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসগুলির বিষয়ে সংক্ষেপ আলোকপাত করি। হাযেরীন, আজ ইংরেজী ..... মাসের ..... তারিখ। এ সপ্তাহের দিবসগুলির মধ্যে রয়েছে .... ।

হাযেরীন, রামাদানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় হলো শেষ দশ রাত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) রামাদানের প্রথম ২০ রাতে কিয়ামুল্লাইল করার আগে বা পরে কিছু সময় ঘুমাতেন। কিন্তু রামাদানের শেষ দশ রাতে তিনি সারারাত বা প্রায় সারারাত জাগ্রত থেকে কিয়ামুল্লাইল ও ইবাদতে রত থাকতেন। শুধু তাই নয়, তিনি তাঁর পরিবার-পরিজনকেও জাগিয়ে দিতেন। আয়েশা (রা) বলেন:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ أَحْيَا اللَّيْلَ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ وَجَدَّ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ

"যখন রামাদানের শেষ দশ রাত এসে যেত তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) রাত্রি জাগরিত থাকতেন, তাঁর পরিবারের সদস্যদেরকে জাগিয়ে দিতেন, তিনি অত্যন্ত উদ্দীপনার সাথে ইবাদত-বন্দেগিতে রত থাকতেন এবং সাংসারিক, পারিবারিক বা দাম্পত্য কাজকর্ম বন্দ করে দিতেন।"[১]

রামাদানের শেষ দশ রাতের মধ্যেই রয়েছে 'লাইলাতুল ক্বাদ্‌র' বা তাকদীর বা মর্যাদার রাত। ইমাম বাইহাকী বলেন: লাইলাতুল কাদর অর্থ হলো, এ রাত্রিতে আল্লাহ পরবর্তী বৎসরে ফিরিশতাগণ মানুষদের জন্য কি কি কর্ম করবেন তার তাকদীর বা নির্ধারণ করে দেন।"[২]। সূরা কাদ্‌র-এ আল্লাহ বলেন:

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ

"লাইলাতুল ক্বাদ্‌র এক হাজার মাস থেকেও উত্তম।"

এই রাতটি উম্মাতে মুহাম্মাদীর জন্য সবচেয়ে বড় নেয়ামত। একটি রাতের ইবাদত এক হাজার মাস বা প্রায় ৮৪ বৎসর ইবদতের চেয়েও উত্তম। কত বড় নেয়ামত! শুধু তাই নয়, এ রাত্রি কিয়ামুল্লাইল বা তাহাজ্জুদে জাগ্রত থাকলে আল্লাহ পূর্ববর্তী সকল গোনাহ ক্ষমা করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

"যদি কেউ ঈমানের সাথে সাওয়াব লাভের খাঁটি নিয়্যাতে লাইলাতুল ক্বাদর কিয়ামুল্লাইল বা তাহাজ্জুদে অতিবাহিত করে তবে তাঁর পূর্ববর্তী সকল গোনাহ ক্ষমা করা হবে।"[৩]

আমরা মনে করি, ২৭ শের রাতই কদরের রাত। এই চিন্তাটি সঠিক নয়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কখনোই বলেন নি যে, ২৭শে রামাদানের রাত কদরের রাত। তবে অনেক সাহাবী, তাবিয়ী বা আলিম বলেছেন যে, ২৭শের রাত শবে কদর হওয়ার সম্ভবানা বেশি। এজন্য আমাদের দায়িত্ব হলো রামাদারের শেষ দশ রাতের সবগুলি রাতকেই 'শবে কদর' হিসাবে ইবাদত করব। ২৭শের রাতে অতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়ে ইবাদত করব।

হাযেরীন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তরীকাই আমাদের জন্য সর্বোত্তম তরীকা। এতেই আমাদের নাজাত। তিনি নিজে 'লাইলাতুল ক্বাদর' লাভ করার জন্য রামাদানের শেষ দশরাত সবগুলিই ইবাদতের ও তাহাজ্জুদে জাগ্রত থেকেছেন এবং এরূপ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺবলেন:

---

[১] বুখারী, আস-সহীহ ২/৭১১; মুসলিম, আস-সহীহ ২/৮৩২।
[২] বাইহাকী, শুআবুল ঈমান ৩/৩১৯।
[৩] বুখারী, আস-সহীহ ২/৬৭২, ৭০৯; মুসলিম, আস-সহীহ ১/৫২৩।

مَنْ كَانَ مُلْتَمِسَهَا فَلْيَلْتَمِسْهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ

"যদি কেউ লাইলাতুল ক্বাদর খুঁজতে চায় তবে সে যেন তা রামাদানের শেষ দশ রাত্রিতে খোঁজ করে।"[১]

এ অর্থে আরো অনেকগুলি হাদীস রয়েছে। এ সকল হাদীসে তিনি রামাদানের শেষ দশ রাত্রির সকল রাত্রিকেই শবে কদর ভেবে ইবাদত করতে বলেছেন। এক হাদীসে তিনি বলেন:

الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ فَإِنْ ضَعُفَ أَحَدُكُمْ أَوْ عَجَزَ فَلَا يُغْلَبَنَّ عَلَى السَّبْعِ الْبَوَاقِي

"তোমরা রামাদানের শেষ দশ রাত্রিতে লাইলাতুল কাদর সন্ধান করবে। যদি কেউ একান্তই দুর্বল হয়ে পড়ে, তবে অন্তত শেষ ৭ রাতের ব্যাপারে যেন কোনোভাবেই দুর্বলতা প্রকাশ না করে।"[২]

কোনো কোনো হাদীসে তিনি বেজোড় রাত্রিগুলির বেশি গুরুত্ব দিতে বলেছেন। তিনি বলেন:

إِنِّي أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ثُمَّ أُنْسِيتُهَا أَوْ نُسِّيتُهَا فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ فِي الْوَتْرِ

"আমাকে লাইলাতুল কদর দেখানো হয়েছে, অতঃপর আমাকে তা ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। অতএব তোমরা শেষ দশ রাতের বেজোড় রাতগুলিতে তা খোঁজ করবে।"[৩]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) লাইলাতুল কাদরের উদ্দেশ্যে রামাদানের শেষ কয়েক বেজোড় রাত্রিতে সাহাবীদের নিয়ে জামাতে তারাবীহ্ বা কিয়ামুল্লাইল আদায় করেন। আবূ যার (রা) বলেন,

قَامَ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الأَوَّلِ ثُمَّ قَالَ لا أَحْسَبُ مَا تَطْلُبُونَ إِلاَّ وَرَاءَكُمْ ثُمَّ قَامَ بِنَا فِي الْخَامِسَةِ (لَيْلَةَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ) إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ثُمَّ قَالَ لا أَحْسَبُ مَا تَطْلُبُونَ إِلا وَرَاءَكُمْ ثم قُمْنَا مَعَهُ لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ حَتَّى أَصْبَحَ (وَصَلَّى بِنَا فِي الثَّالِثَةِ وَدَعَا أَهْلَهُ وَنِسَاءَهُ فَقَامَ بِنَا حَتَّى تَخَوَّفْنَا الْفَلَاحَ قُلْتُ لَهُ وَمَا الْفَلَاحُ قَالَ السُّحُورُ)

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ২৩শে রামাদানের রাত্রিতে আমাদের নিয়ে কিয়ামুল্লাইল করলেন রাত্রির এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত। এরপর বলেন, তোমরা যা খুঁজছ তা মনে হয় সামনে। এরপর ২৫শের রাত্রিতে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত কিয়াম করলেন। এরপর বলেন, তোমরা যা খুঁজছ তা বোধহয় সামনে। এরপর ২৭শের রাত্রিতে তিনি নিজের স্ত্রীগণ, পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণ সবাইকে ডেকে আমাদেরকে নিয়ে প্রভাত পর্যন্ত জামাতের কিয়ামুল্লাইল করলেন, এমনকি আমরা ভয় পেয়ে গেলাম যে, সাহরী খাওয়ার সময় পাওয়া যাবে না।"[৪]

আমরা অনেক সময় মনে করি তারাবীহ্ বা কিয়ামুল্লাইল বোধ হয় বিশ রাকাতের বেশি পড়া যায় না বা জামাতে পড়া যায় না। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের সুন্নাত সম্পর্কে অজ্ঞতাই এর কারণ। রামাদানের কিয়ামুল্লাইল ইশার পরে বা মধ্য রাতে বা শেষ রাতে যে কোনো সময়ে ২০ রাকাত বা তার বেশি জামাতে আদায় করা যায়। সাহাবী-তাবিয়ীগণ অনেকেই শেষ দশ রাত্রিতে অতিরিক্ত ৪ বা ৮ রাকাআত কিয়ামুল্লাইল আদায় করতেন। আমাদের দায়িত্ব হলো, রামাদানের শেষ দশ রাত্রির প্রতি রাত্রিতে ইশা ও তারাবীহ-এর পরে প্রয়োজন মত কিছু সময় ঘুমিয়ে ঘুম থেকে উঠে পড়তে হবে। এরপর সেহেরী পর্যন্ত বাকী সময় 'লাইলাতুল কদর'-এর নামায, তিলাওয়াত, দোয়া, দরুদ ইত্যাদি ইবাদতে সময় কাটাতে হবে। যদি মহল্লার মসজিদে কোনো ভাল হাফেজ পাওয়া যায়, তবে এ রাতগুলিতে রাত

---

[১] মুসলিম, আস-সহীহ ২/৮২৩।

[২] বুখারী, আস-সহীহ ২/৭১১; মুসলিম, আস-সহীহ ২/৮২৩।

[৩] বুখারী, আস-সহীহ ২/৭০৯; মুসলিম, আস-সহীহ ২/৮২৩।

[৪] তিরমিযী, আস-সুনান ৩/১৬৯; ইবনু খুযাইমা, আস-সহীহ ৩/৩৩৭; আহমদ, আল-মুসনাদ ৫/১৮০। হাদীসটি হাসান সহীহ।

১২/১টা থেকে ৩/৪ টা পর্যন্ত ৩/৪ ঘন্টা লম্বা কিরাআত ও দীর্ঘ রুকু সাজদা সহকারে জামাতে লাইলাতুল কাদর-এর উদ্দেশ্যে কিয়ামুল্লাইল আদায় করতে হবে এবং বেশি বেশি করে দোয়া করতে হবে। তা সম্ভব না হলে, প্রত্যেকে নিজের সুবিধা মত বেশি বেশি কিয়ামুল্লাইল বা শবে কদরের নামায আদায় করতে হবে। বেজোড় রাতগুলিকে এবং বিশেষ করে ২৭শের রাত্রি বেশি কষ্ট করতে হবে।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর তরীকায় সাহাবী, তাবিয়ী ও পরবর্তী বুজুর্গগণও এভাবে রামাদানের শেষ দশ রাত পালন করতেন। তাঁরা অনেকেই রামাদানের প্রথম ২০ রাতে ৩/৪ রাতে কুরআন খতম করতেন। আর শেষ দশ রাতে প্রতি রাতে ১০/১২ পারা কুরআন তিলাওয়াত করতেন নামাযের মধ্যে।

হাযেরীন, শবে কদরের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি দুআ শিখিয়েছেন। আয়েশা (রা) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, যদি আমি লাইলাতুল কাদর পাই তাহলে আমি কি বলব? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তুমি বলবে:

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

"হে আল্লাহ, আপনি ক্ষমাশীল মর্যাদাময়, আপনি ক্ষমা করতে ভালবাসেন, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।"[১]

এ দুআটি মুখস্থ করে অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে এ দশ রাত্রির নামাযের সাজদায়, নামাযের পরে, এবং সর্বাবস্থায় বেশি বেশি করে পাঠ করতে হবে। আল্লাহ আমাদের সকলকে তাওফীক দিন। আমীন।

হাযেরীন, রামাদানের শেষ দশ দিনের অন্যতম ইবাদত হলো ই'তিকাফ করা। ইতিকাফের অর্থ হলো সার্বক্ষণিকভাবে মসজিদে অবস্থান করা। ওযু, ইসতিনজা, পানাহার ইত্যাদি একান্ত প্রয়োজন ছাড়া মসজিদ থেকে বের না হওয়া। মসজিদে অবস্থানকালে ঘুমানো, বসে থাকা বা কথাবার্তা বলা যায়। তবে ইতিকাফরত অবস্থায় যথাসম্ভব চেষ্টা করতে হবে, সকল জাগতিক চিন্তা, কথাবার্তা ও মেলামেশা বাদ দিয়ে সাধ্যমত আল্লাহর যিক্র ও ইবাদত বন্দেগিতে রত থাকা। না হলে নীরব থাকা।

ই'তিকাফ মূলতই একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। তদুপরি লাইলাতুল কাদর-এর ফযীলত লাভের জন্যই এ সময়ে ই'তিকাফের গুরুত্ব বাড়ে। আয়েশা (রা) বলেন,

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ.

"রাসূলুল্লাহ ﷺ রামাদান মাসের শেষ দশ দিন ই'তিকাফ করতেন। তিনি তাঁর ওফাত পর্যন্ত এভাবে ই'তিকাফ করেন। অতঃপর তাঁর স্ত্রীগণ তার পরে ই'তিকাফ করেন।"[২]

আমাদের সকলেরই চেষ্টা করা দরকার রামাদানের শেষ দশদিন সুন্নাত ই'তিকাফ আদায় করার। না হলে নফল-মুস্তাহাব হিসেবে দু-এক দিনের জন্যও ই'তিকাফ করা যায়। যদি পুরো দশ দিন না পারি তবে দু-এক দিনের জন্য হলেও ই'তিকাফ করা দরকার। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বর্ণিত হয়েছে:

مَنْ مَشَى فِيْ حَاجَةِ أَخِيْهِ كَانَ خَيْراً لَهُ مِنِ اعْتِكَافِهِ عَشْرَ سِنِيْنَ. وَمَنِ اعْتَكَفَ يَوْماً ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ جَعَلَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ ثَلاَثَ خَنَادِقَ كُلُّ خَنْدَقٍ أَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ الْخَافِقَيْنِ.

"যদি কেউ তার ভাইয়ের প্রয়োজন মেটাতে হাঁটে তবে তা তার জন্য দশ বৎসর ই'তিকাফ করার চেয়েও উত্তম। আর যে ব্যক্তি একদিন আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ই'তিকাফ করবে আল্লাহ তার ও জাহান্নামের মধ্যে তিনটি পরিখার দুরত্ব সৃষ্টি করবেন, প্রত্যেক পরিখার প্রশস্ততা দুই দিগন্তের চেয়েও বেশি।[৩]

---

[১] তিরমিযী, আস-সুনান ৫/৫৩৪; ইবনু মাজাহ, আস-সুনান ২/১২৬৫। হাদীসটি হাসান সহীহ।

[২] বুখারী, আস-সহীহ ২/৭১৩, ৭১৯; মুসলিম, আস-সহীহ ২/৮৩০, ৮৩১।

[৩] হাকিম, আল-মুসতাদরাক ৪/৩০০; মুনযিরী, আত-তারগীব ৩/২৬৩; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৮/১৯২; আলবানী, যয়ীফুত তারগীব ১/১৬৭। হাকিম, মুনযিরী ও হাইসামী হাদীসটির সনদ শক্তিশালী বলেছেন। পক্ষান্তরে ইবনুল জাওযী ও আলবানী হাদীসটিকে যয়ীফ বলেছেন।

হাযেরীন, রামাদানের শেষে যাকাতুল ফিতর আদায় করতে হয়। ইবনু আব্বাস (রা) বলেন

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاَةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ.

"রাসূলুল্লাহ ﷺ যাকাতুল ফিত্‌র ফরয করেছেন, যেন সিয়াম পালনকারী বাজে কথা, অশ্লীল কথা (ইত্যাদি ছোটখাট অপরাধ) থেকে পবিত্রতা লাভ করে এবং দরিদ্র মানুষেরা যেন খাদ্য লাভ করে। যে ব্যক্তি সালাতুল ঈদের আগে তা আদায় করবে তার জন্য তা কবুলকৃত যাকাত বলে গণ্য হবে। আর যে ব্যক্তি সালাতুল ঈদের পরে তা আদায় করবে, তার জন্য তা একটি সাধারণ দান বলে গণ্য হবে।"[১]

আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন,

كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ ﷺ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ

"রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময়ে আমরা এক সা' খাদ্য, অথবা এক সা যব, অথবা এক সা' খেজুর, অথবা এক সা পনির, অথবা এক সা কিশমিশ যাকাতুল ফিতরা হিসেবে প্রদান করতাম।"[২]

আসমা বিনতু আবী বাকর (রা) বলেন,

كُنَّا نُؤَدِّي زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর যুগে আমরা যাকাতুল ফিত্‌র আদায় করতাম দুই মুদ্দ গম দিয়ে।[৩]

এক সা' হলো চার মুদ্দ। তাহলে দুই মুদ্দ হলো অর্ধ সা'। সা'-এর পরিমাপ নিয়ে ফকীগণের মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফার (রাহ) মতে এক সা হলো প্রায় ৩ কেজি ৩০০ গ্রাম। ইমাম আবূ ইউসূফ ও অন্য তিন ইমামের মতে এক সা' হলো প্রায় ২ কেজি ২০০ গ্রাম।

তাহলে আমরা দেখছি যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এক সা' খাদ্য ফিতরা দিতে বলেছেন। খেজুর, কিসমিস, পনির এবং যব এই চার প্রকার খাদ্য থেকে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ৩ কেজি ৩০০ গ্রাম ফিতরা দিতে হবে। আর একটি বর্ণনায় আমরা দেখছি যে, গম বা আটার ক্ষেত্রে এর অর্ধেক, অর্থাৎ ১ কেজি ৬৫০ গ্রাম হিসাবে ফিত্‌রা দিলে চলবে। আমাদের দেশে এ পাঁচ প্রকার খাদ্যের কোনোটি মূল খাদ্য নয়। এক্ষেত্রে ইসলামী মূলনীতি হলো, দান গ্রহণকারী দরিদ্রগণের সুবিধা ও কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রাখা। এ জন্য সবচেয়ে উত্তম হলো, খেজুর বা খেজুরের মূল্য প্রদান করা। কারণ সাহাবীগণ খেজুর প্রদান করতে ভালবাসতেন। এছাড়া দরিদ্রের জন্য তা অধিকতর উপকারী। তবে আমাদের দেশে সাধারণত ফিতরা-দাতাদের সুবিধার দিকে তাকিয়ে আটার মূল্য হিসেবে ফিতরা প্রদান করা হয়। এ হিসাবে বাজারের উত্তম আটা পরিবারের প্রত্যেকের পক্ষ থেকে ১ কেজি ৬৫০ গ্রাম করে ফিতরা প্রদান করতে হবে। যাদের সচ্ছলতা আছে তারা মাথাপ্রতি ৩ কেজি ৩০০ গ্রাম খেজুর প্রদানের চেষ্টা করবেন। এতে ফিতরা আদায় ছাড়াও রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের একটি অতিরিক্ত সুন্নাত পালন করা হবে।

ঈদের দিন নামাযের আগে অথবা তার আগে রামাদানের শেষ কয়েক দিনের মধ্যে ফিতরা আদায় করতে হবে। একজনের ফিতরা কয়েকজনকে এবং কয়েকজনের ফিতরা একজনকে দেওয়া যায়।

হাযেরীন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

---

[১] আবু দাউদ, আস-সুনান ২/১১১; ইবনু মাজাহ, আস-সুনান ১/৫৮৫; আলবানী, সহীহুত তারগীব ১/২৬৩। হাদীসটি হাসান।
[২] বুখারী, আস-সহীহ ২/৫৪৮; মুসলিম, আস-সহীহ ২/৬৭৮-৬৭৯।
[৩] আহমদ, আল-মুসনাদ ৬/৩৫৫। হাদীসটি সহীহ। বিস্তারিত দেখুন, তাহাবী, শারহু মুশকিলিল আসার ৯/১৬-৪২।

إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَرَضَ لِيْ فَقَالَ بَعُدَ مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ قُلْتُ آمِيْن... بَعُدَ مَنْ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ فَقُلْتُ آمِيْن ... قَالَ بَعُدَ مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ الكِبَرُ عِنْدَهُ أَوْ أَحَدَهُمَا فَلَمْ يُدْخِلاَهُ الْجَنَّةَ قُلْتُ آمِيْن

"জিবরাঈল (আ) আমার নিকট উপস্থিত হন। তিনি বলেন: যে ব্যক্তি রামাদান মাস পেল, অথচ তার গোনাহ ক্ষমা করা হলো না সে বিতাড়িত হোক। আমি বললাম: আমীন। তিনি বলেন: যার নিকট আপনার কথা বলা হলো, অথচ সে আপনার উপর সালাত পাঠ করলো না সে বিতাড়িত হোক। আমি বললাম: আমীন। তিনি বললেন: যার পিতামাতা বা একজন তার নিকট বৃদ্ধ হলেন, কিন্তু তাকে জান্নাতে প্রবেশ করালেন না সে বিতাড়িত হোক। আমি বললাম: আমীন।"[১]

হাযেরীন, আমরা রামাদানের শেষ প্রান্তে চলে এসেছি। আমল কি করলাম আল্লাহই ভাল জানেন। তবে সঞ্চয় যাই হোক না হোক, সবচেয়ে বড় কথা হলো ক্ষমা লাভ করা। তাই এ কদিন বেশি বেশি করে আল্লাহর কাছে তাওবা করতে হবে এবং ক্ষমা চাইতে হবে। হাদীস শরীফে এসেছে, মুমিন ব্যক্তি তাঁর পাপকে খুব বড় করে দেখেন, যেন তিনি পাহাড়ের নিচে বসে আছেন, ভয় পাচ্ছেন, যে কোনো সময় পাহাড়টি ভেঙ্গে তাঁর উপর পড়ে যাবে। আরা পাপী মানুষ তার পাপকে খুবই হালকাভাবে দেখেন, যেন একটি উড়ন্ত মাছি তার নাকের ডগায় বসেছে, হাত নাড়ালেই উড়ে যাবে।"[২]

হাযেরীন, সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ব্যাপার হলো, পাপের জন্য মনের মধ্যে ওযর তৈরি করা। আমি তো অনেক ভাল কাজই করি, শুধু এ কাজটি বাধ্য হয়ে করছি... অথবা অমুক কারণে এটা করা যেতে পারে। পাপের পক্ষে এরূপ যুক্তি তৈরি করার অর্থ শয়তানের শতভাগ সফলতা ও তাওবার দরজা বন্দ হওয়া। কাজেই কোনো পাপের পক্ষে যুক্তি দিবেন না বা কোনো পাপকে ছোট মনে করবেন না। মুমিনের কর্ম হলো সকল পাপকে বড় ও কঠিন মনে করে আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করা। পাপ হয়ে গেলে তাওবা করা। এতে মুমিনের দুটি লাভ: প্রথমত পাপ কম হয়। দ্বিতীয়ত পাপ হয়ে গেলে তাওবা করতে আগ্রহ হয়। আর পাপকে ছোট মনে করলে মুমিন ধ্বংস হয়ে যান। কারণ এতে পাপ বেশি হতে থাকে এবং তাওবার আগ্রহ থাকে না। ফলে এক সময় হৃদয়টা পচে যায়। তাওবার অর্থ হলো ফিরে আসা। তাওবার শর্ত তিনটি: (১) পাপের কারণে মনের মধ্যে অনুশোচনা বোধ করা, (২) আর কখনো এ পাপ করব না বলে সুদৃঢ় সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং (৩) এ অনুশোচনা ও সিদ্ধান্ত নিয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা।

হাযেরীন, রামাদানের এ মুবারক সময়ে আসুন আমাদের জীবনের সকল পাপের কথা স্মরণ করে আল্লাহ কাছে তাওবা করি। সকল পাপ থেকেই তাওবা করা দরকার। এরপরও যদি একান্ত অসুবিধা হয় তবে কিছু পাপ থেকে তাওবা করা যায়। যেমন, আল্লাহ আমি নামায কাযা করতাম, সিনেমা দেখতাম এবং দাড়ি কাটতাম। দাড়ি কাটা এখন বাদ দিতে পারছি না। আল্লাহ আমি নামায কাজা করা ও সিনেমা দেখা থেকে তাওবা করছি, আল্লাহ আমি আর কোনোদিন এ কাজ করব না। আল্লাহ আপনি আমার অতীত পাপ ক্ষমা করে দেন এবং ভবিষ্যতে এ পাপ থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দেন। হাযেরীন, সকল পাপ থেকেই তাওবা করুন। কোনো পাপেই কোনো মঙ্গল নেই। সাময়িক অস্থিরতা এবং চিরস্থায়ী ক্রন্দন। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে, রামাদান উপলক্ষ্যে আল্লাহ অগণিত বান্দাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে দেন। আসুন আমরা সকল গোনাহ থেকে তাওবা করে এ সকল মুক্তিপ্রাপ্তদের দলে নিজেদের নাম লিখিয়ে নিই।

হাযেরীন, অন্তরের বেদনা, অনুশোচনা ও অনুতাপ নিয়ে তাওবা করার অর্থ অতীতের পাপের পাতা

---

[১] হাকিম, আল-মুসতাদরাক ৪/১৭০; আলবানী, সাহীহুত তারগীব ১/২৪০। হাদীসটি সহীহ।

[২] বুখারী, আস-সহীহ ৫/২৩২৪, নং ৫৯৪৯, তিরমিযী, আস-সুনান ৪/৬৫৮, নং ২৪৯৭।

মুছে যাওয়া। আমরা অনেকে সিদ্ধান্ত নিই যে, রামাদানে অমুক অমুক পাপ করব না। রামাদানের পরে আবার পাপ করব বলেই মনের মধ্যে ধারণা থাকে। এতে তাওবা হয় না এবং অতীতের পাপের বোঝা মাথায় থাকে। শুধু রামাদান পাপটা হলো না। কিন্তু যদি আমরা সিদ্ধান্ত নিই যে, রামাদান উপলক্ষে আল্লাহ তাওবা করলাম, আমি এ সকল পাপ আর করব না। তাহলে অতীতের পাপ ক্ষমা হলো এবং পাপের পাতা মুছে গেল। বান্দা নিষ্পাপ হয়ে গেলেন। এরপর যদি আবার শয়তানের প্ররোচনায় বা প্রবৃত্তির তাড়নায় আবার পাপ করেন, তবে আবারো তাওবা করবেন। এতে পূর্বের পাপ আর ফিরে আসবে না।

হাযেরীন, পাপ যত কঠিনই হোক আন্তরিকভাবে তাওবা করলে আল্লাহ তা ক্ষমা করবেন বলে ওয়াদা করেছেন। কুরআন ও হাদীসে বারংবার তা বলা হয়েছে। তবে যে পাপের সাথে বান্দার হক্ক থাকে সে পাপের বান্দার পাওনা আল্লাহ ক্ষমা করেন না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন

مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لا يَكُونَ دِينَارٌ وَلا دِرْهَمٌ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ

"যদি কারো যিম্মায় অন্য কারো প্রতি কোনো জুলুম জনিত হক্ক থেকে থাকে, তা সম্মান নষ্ট করার কারণে বা অন্য যে কোনো কারণে, তবে সে যেন আজই তার থেকে বিমুক্ত হয়, সেই দিন আসার আগেই যে দিন কোনো টাকা-পয়সা দীনার দিরহাম থাকবে না। যদি তার কোনো নেক আমল থাকে তবে তা থেকে তার জুলুম বা অন্যায় অনুসারে গ্রহণ করা হবে। আর যদি তার নেক কর্ম না থাকে তবে তার সঙ্গীর (ক্ষতিগ্রস্থের বা মাজলূমের) পাপরাশী নিয়ে তার উপর চাপানো হবে।"[১]

রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীদেরকে প্রশ্ন করেন, হত-দারিদ্র দেউলিয়া কে তা কি তোমরা জান? তাঁরা বলেন, যার কোনো টাকপয়সা সহায় সম্পদ নেই সেই তো দরিদ্র দেউলিয়া। তিনি বলেন:

إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ. مسلم.

আমার উম্মতের দেউলিয়া তো সে ব্যক্তি যে কিয়ামতের দিন সালাত, সিয়াম ও যাকাত নিয়ে উপস্থিত হবে। কিন্তু সে কাউকে গালি দিয়েছে, কারো অপবাদ ছড়িয়েছে, কারো সম্পদ ভক্ষণ করেছে, কারো রক্তপাত করেছে। তখন এদেরকে তার সাওয়াব থেকে দেওয়া হবে। পাওনা শেষ হওয়ার আগেই তার সাওয়াব ফুরিয়ে গেলে পাওনাদারদের গোনাহ নিয়ে তার উপর চাপিয়ে দিয়ে তাকে জাহান্নাতে ফেলে দেওয় হবে।"[২]

হাযেরীন, বড় ভয়ঙ্কর কথা। কত কষ্ট করে আমরা সালাত, সিয়াম, যাকাত, ফিতরা ইত্যাদি ইবাদত পালন করছি। কিয়ামতের সে কঠিন দিনে যদি আমাদের সকল সাওয়াব অন্যরা নিয়ে নেয়, আর আমাদেরকে পরের পাপ নিয়ে জাহান্নামে যেতে হয় তবে এর চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কিছুই হতে পারে না। আমাদের সাবধান হওয়া দরকার। আল্লাহর কাছে যে অপরাধই করি না কেন, কোনো বান্দার হক্ক যেন আমাদের দ্বার নষ্ট না হয়। যদি নষ্ট হয়ে থাকে তবে এখনই তা ফিরিয়ে দিয়ে বা যে কোনোভাবে ক্ষমা নিয়ে নিতে হবে। আল্লাহ আমদের সবাইকে তাওফীক প্রদান করুন।

---

[১] বুখারী, আস-সহীহ ২/৮৬৫, ৫/২৩৯৪।
[২] মুসলিম, আস-সহীহ ৪/১৯৯৭।

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

أَمَّا بَعْدُ، فَيَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ

خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ

وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

بَارَكَ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ فِيْ الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ. وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ. أَقُولُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ، فَاسْتَغْفِرُوْهُ وَتُوبُوْا إِلَيْهِ، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.

রামাদান মাসের ৪র্থ খুতবা: জুমু'আতুল বিদা ও ঈদুল ফিতর

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লী আলা রাসূলিহীল কারীম। আম্মা বাদ,

সম্মানিত উপস্থিতি, আজ রামাদান মাসের শেষ জুমুআ। আজ আমরা ঈদের আহকাম ও রামাদানের বিদায় সম্পর্কে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ। কিন্তু তার আগে আমরা এ সপ্তাহের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসগুলির বিষয়ে সংক্ষেপ আলোকপাত করি। হাযেরীন, আজ ইংরেজী ..... মাসের ..... তারিখ। এ সপ্তাহের দিবসগুলির মধ্যে রয়েছে .... ।

হাযেরীন, সামনে আমাদের ঈদুল ফিতর। হাদীস শরীফে 'চাঁদ দেখে সিয়াম শুরু করার ও শেষ করার' নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, যে কেউ যেখানে ইচ্ছা চাঁদ দেখলেই ঈদ করা যাবে। রাষ্ট্রীয়ভাবে তার সাক্ষ্য গৃহিত হলে বা চাঁদ দেখা প্রমাণিত হলেই শুধু ঈদ করা যাবে। রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ও সমাজের সিদ্ধান্তের উপরেই আমাদের ঈদ পালন করতে নির্দেশ দিয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

الْفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ وَالْأَضْحَى يَوْمَ يُضَحِّي النَّاسُ

"যে দিন সকল মানুষ ঈদুল ফিত্‌র পালন করবে সেই দিনই ঈদুল ফিত্‌র-এর দিন এবং যেদিন সকল মানুষ ঈদুল আযহা পালন করবে সেই দিনই ঈদুল আযহার দিন।"[১]

প্রসিদ্ধ তাবিয়ী মাসরূক বলেন, আমি একবার আরাফার দিনে, অর্থাৎ যিলহাজ্জ মাসের ৯ তারিখে আয়েশা (রা)-এর নিকট গমন করি। তিনি বলেন, মাসরূককে ছাতু খাওয়াও এবং তাতে মিষ্টি বেশি করে দাও। মাসরূক বলেন, আমি বললাম, আরাফার দিন হিসাবে আজ তো রোযা রাখা দরকার ছিল, তবে আমি একটিমাত্র কারণে রোযা রাখিনি, তা হলো, চাঁদ দেখার বিষয়ে মতভেদ থাকার কারণে আমার ভয় হচ্ছিল যে, আজ হয়ত চাঁদের দশ তারিখ বা কুরবানীর দিন হবে। তখন আয়েশা (রা) বলেন,

اَلنَّحْرُ يَوْمَ يَنْحَرُ الإِمَامُ وَالْفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ الإِمَامُ

যেদিন ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধান কুরবানীর দিন হিসাবে পালন করবেন সেই দিনই হলো কুরবানীর দিন। আর যেদিন রাষ্ট্রপ্রধান ঈদুল ফিতর হিসেবে পালন করবে সেই দিনই হলো ঈদের দিন।"[২]

হাযেরীন, মুমিনের জন্য নিজ দেশের সরকার ও সংখ্যাগরিষ্ট জনগণের সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে ঈদ করা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশ। অন্য দেশের খবর তো দূরের কথা যদি কেউ নিজে চাঁদ দেখেন কিন্তু রাষ্ট্র তার সাক্ষ্য গ্রহণ না করে তাহলে তিনিও একাকী সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের বিপরীতে ঈদ করতে পারবেন না।

হাযেরীন, সকল মাসের ন্যায় শাওয়ালের নতুন চাঁদ দেখে চাঁদ দেখার মাসনূন দোয়া করতে হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ হেলাল বা নতুন চাঁদ দেখলে নিম্নের দোয়াটি পাঠ করতেন:

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالأَمْنِ [باليمن] وَالإِيمَانِ وَالسَّلاَمَةِ وَالإِسْلامِ وَالتَّوْفِيقِ لِمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى رَبُّنَا [ربي] وَرَبُّكَ اللَّهُ

"আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। হে আল্লাহ, আপনি এই নতুন চাঁদের (নতুন মাসের) সূচনা করুন কল্যাণ, নিরাপত্তা ও ঈমানের সাথে, শান্তি ও ইসলামরে সাথে {এবং আমাদের প্রভু যা ভালবাসেন এবং পছন্দ করেন তা পালনের তাওফীকসহ।} (হে নতুন চাঁদ), আমাদের ও তোমার প্রভু আল্লাহ।"[৩]

---

[১] তিরমিযী, আস-সুনান ৩/১৬৫। তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

[২] বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা ৫/১৭৫; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৩/১৯০; মুনযিরী, তারগীব ২/৬৮। মুনযিরী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

[৩] তিরমিযী, আস-সুনান ৫/৫০৪, নং ৩৪৫১, হাকিম, আল-মুসতাদরাক ৪/৩১৭; মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/১৩৯। হাদীসটি হাসান।

এরপর থেকে তাকবীর বলতে হয়। ঈদুল আযহার সময় পাঠের প্রসিদ্ধ 'তাকবীর' প্রত্যেকে নিজের মত মনে মনে বা মৃদু শব্দে তাকবীর বলতে হবে। সালাতুল ঈদ পর্যন্ত তাকবীর বলতে হয়।

রামাদানের সিয়ামের হুকুম দিয়ে আল্লাহ বলেন:

وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

"যেন তোমরা (রামাদানের সিয়ামের) সংখ্যা পূরণ কর, এবং আল্লাহর তাকবীর ঘোষণা কর; কারণ তিনি তেমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন এবং যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।"[১]

হাযেরীন, ঈদুল ফিতরের অন্যতম ইবাদত যাকাতুল ফিতর বা ফিতরা আদায় করা। যদি ইতোপূর্বে ফিতরা আদায় করা না হয় তবে অবশ্যই ঈদুল ফিতরের দিন সকালে সালাতুল ঈদের আগেই তা আদায় করতে হবে। ঈদের দিনে সকালে গোসল করা, নতুন বা সুন্দর পোশাক পরা ও সুগন্ধি ব্যবহার করা সুন্নাত নির্দেশিত আদব। ঈদুল ফিতরের দিনে সালাতুল ঈদে গমনের পূর্বে কিছু খাদ্য গ্রহণ করা সুন্নাত। বুখারী সংকলিত হাদসে আনাস ইবনু মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কয়েকটি খেজুর না খেয়ে ঈদুল ফিতরের জন্য বের হতে না। ... আর তিনি বেজোড় সংখ্যায় খেজুর খেতেন।"

অন্য হাদীসে বুরাইদা (রা) বলেন, "রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদুল ফিতরের দিনে খাদ্য গ্রহণ না করে বের হতেন না। আর তিনি ঈদুল আযহার দিনে ফিরে আসার আগে কিছুই খেতেন না। ফিরে এসে তার কুরবানীর পশুর গোশত থেকে ভক্ষণ করতেন।"[২]

হাযেরীন, সালাতুল ঈদের অন্যতম সুন্নাত হলো, প্রশস্ত মাঠে তা আদায় করতে হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বদা মাঠে যেয়ে সালাতুল ঈদ আদায় করতেন। মসজিদে নববীতে সালাত আদায় করার ফযীলত অনেক বেশি। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি কখনো মসজিদের নববীতে সালাতুল ঈদ আদায় করতেন না। শধু একবার বৃষ্টির কারণে তিনি মসজিদে নববীতে সালাতুল ঈদ আদায় করেন। মদীনায় আরো অনেক মসজিদ ছিল যেগুলিতে জুমুআর সালাত আদায় করা হতো, কিন্তু তিনি সেগুলিতে ঈদের সালাত আদায় করার অনুমতি দেন নি। একই শহরে অনেক জুমআ মসজিদ থাকলেও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে, সাহাবীগণের যুগে ও ইসলামের সোনালী যুগে সালাতুল ঈদ একাধিক স্থানে আদায় করতে অনুমতি দেওয়া হতো না। একই শহরে বা একই এলাকায় একাধিক স্থানে ঈদের সালাত আদায় করলে তা আদায় হবে কি না সে বিষয়ে ফকীহদের মতভেদ রয়েছে। আজকাল শহরগুলিতে বিশেষ করে প্রত্যেক মহল্লার মসজিদে ঈদের সালাত আদায় করা হয়। এ কাজটি ইসলামী চেতনার পরিপন্থী, সুন্নাতের খেলাফ এবং মাকরূহ। ওযর ছাড়া মসজিদে সালাতুল ঈদ আদায় করা মাকরূহ বলে ফকীহগণ উল্লেখ করেছেন।

হাযেরীন, সালাতুল ঈদ ইসলামী ভ্রাতৃত্ব, ঐক্য ও ভালবাসার প্রতীক। এই সালাতে শহরের বা গ্রামের সকল মানুষ একটি বড় মাঠে একত্রিত হয়ে সালাত আদায় করবেন। সারা শহরের বা এলাকার সকলেই একস্থানে সমবেত হবেন, দেখা সাক্ষাত, সালাম ও শুভেচ্ছা বিনিময় করবেন। সারা বৎসর যাদের সাথে সাক্ষাত হয় না তাদের সাথেও এই উপলক্ষ্যে সাক্ষাত হবে। ছোটবড় সকলেই আনন্দ ও প্রাণচাঞ্চল্যে উদ্বেলিত হবেন। আর এই সব উৎসব, আনন্দ ও প্রাণচাঞ্চল্যের মূল কেন্দ্র হবে ঈদের মাঠ ও সালাতুল ঈদ আদায়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও সাহাবীগণের যুগে ও মুসলিম উম্মাহর সোনালী দিনগুলিতে এই অবস্থায় ছিল। আধুনিক সভ্যতার স্বার্থপর মানসিকতার প্রভাবিত হয়ে আমরা ঈদের এই তাৎপর্যটি হারিয়ে ফেলতে যাচ্ছি।

---

[১] সূরা বাকারা ১৮৫ আয়াত।

[২] হাকিম, আল-মুসতাদরাক ১/৪৩৩; তিরমিযী, আস-সুনান ২/৪২৬। হাকিম ও যাহাবী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

এখন আমরা অন্যান্য পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের মতই 'ঈদের সালাত' আদায় করি। বিষয়টি অত্যন্ত দুঃখজনক!

হাযেরীন, ঈদের মাঠে হেঁটে যাওয়া সুন্নাত। এছাড়া এক রাস্তা দিয়ে যাওয়া ও অন্য রাস্তা দিয়ে ফিরে আসা সুন্নাত। কারণ এতে সকলের সাথে দেখা সাক্ষাত হয়, সাম্য ও ভালবাসা প্রকাশ পায়।

হাযেরীন, সূর্য পুরোপুরি উদিত হওয়ার প্রায় আধ ঘন্টা পর থেকে দুপুরের আগ পর্যন্ত ঈদুল ফিত্‌র-এর সালাত আদায় করা যায়। বিভিন্ন হাদীসের আলোকে আমরা বুঝতে পরি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সূর্য উদিত হওয়ার ঘন্টা দেড়েকের মধ্যে ঈদুল ফিতর এবং ঘন্টা খানেকের মধ্যে ঈদুল আযহার সালাত আদায় করতেন। সালাতুল ঈদ আদায়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত ছিল ঈদের মাঠে পৌঁছে প্রথমে ঈদের সালাত আদায় করা। এরপর তিনি সমবেত মুসল্লীদের উদ্দেশ্যে খুতবা বা বক্তৃতা প্রদান করতেন। মহিলা মুসল্লীগণ যেহেতু মাঠের শেষ প্রান্তে বসতেন এজন্য সাধারণ খুতবার পর তিনি মহিলা মুসল্লীদের কাছে যেয়ে পৃথকভাবে তাদেরকে কিছু নসীহত করতেন। এরপর তিনি ঈদের মাঠ ত্যাগ করতেন।

হাযেরীন, বিভিন্ন হাদীসে ঈদের দিনে শরীরচর্চা ও বিনোদনের জন্য খেলাধুলা ও আনন্দে উৎসাহ দিয়েছেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)। বর্তমানে শরীরচর্চামূলক খেলাধুলার স্থান দখল করছে অলস বিনোদন। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বিষয় হলো, ঈদের দিনে এবং অন্যান্য সময়ে বিনোদনের নামে, খেলাধুলার নামে বেহায়াপনা, বেল্লেলপনা ও অশ্লীলতা সমাজকে গ্রাস করছে। ঈদ উপলক্ষ্যে বেড়ানোর নামে আমাদের মেয়েরা অর্ধ উলঙ্গ হয়ে দেহ, পোশাক ও অলঙ্কার প্রদর্শন করে বেড়ায়। মেয়েদের জন্য বাইরে বোরোতে পুরো দেহ আবৃত করা আল্লাহ কুরআনে ফরয করেছেন। একজন মহিলার জন্য মাথা, চুল, কান, ঘাড়, গলা, বা দেহের যে কোনে অংশ অনাবৃত করে বাইরে যাওয়ার অর্থ প্রতি মুহূর্তে ব্যভিচারের মত একটি কঠিন কবীরা গোনাহে লিপ্ত হওয়া। এরূপ মহিলাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে অভিশাপ দেওয়া হয় বলে হাদীসে বলা হয়েছে। ঈদের দিনে যারা এভাবে বের হয় তাদের অনেকেই রামাদানে কষ্ট করে রোযা রেখেছে। এদের অধিকাংশের পিতামাতা রোযাদার মুসলমান। কিভাবে তারা এরূপ ভয়ঙ্কর পাপে লিপ্ত হন তা আমরা বুঝতে পারি না। আমরা যদি সত্যিই আল্লাহকে ভয় করি এবং আল্লাহর গযব থেকে বাঁচতে চাই তাহলে আমাদের সন্তানদেরকে এরূপ পাপ থেকে বাঁচাতে হবে।

হাযেরীন, জুমুআতুল বিদার মাধ্যমে আমরা রামাদানকে বিদায় জানাতে চলেছি। কিন্তু কিভাবে? বিশ্বাসঘাতকতার সাথে না বিশ্বস্ততার সাথে। রামাদান এসেছিল কুরআন, সিয়াম, কিয়াম ও তাকওয়া উপহার নিয়ে। আমরা কি রামাদানের সাথে এগুলিকেও বিদায় করে দেব? তাহলে রামাদানের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা হলো। হাযেরীন, রামাদানের হাদিয়া ভালবেসে গ্রহণ করুন। কুরআন ছাড়বেন না। কত কষ্ট করে সারা মাস তারাবীহে কুরআন শুনলেন। যদি বুঝতে পারতেন তাহলে এ শোনার আনন্দ, তৃপ্তি ও সাওয়াব আরো অনেক বেশি হতো। কুরআনের নূরে হৃদয় আলোকিত হতো। আসুন সকলেই নিয়্যাত করি, আগামি রামাদানের আগে একবার অন্তত পূর্ণ কুরআন অর্থ সহ পাঠ করব। যেন আগামী রামাদানে তারাবীহের সময কুরআন শোনার সময় অন্তত কিছু বুঝতে পারি।

হাযেরীন, সিয়াম ছাড়বেন না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বিভিন্ন হাদীসে বলেছেন যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি, রহমত, বরকত ও রূহানিয়্যাত অর্জনের জন্য নফল সিয়াম অতুলনীয় ইবাদত। প্রতি মাসে তিন দিন, বিশেষত প্রতি আরবী মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে সিয়াম পালন করা, প্রতি সপ্তাহে সোমবার ও বৃহস্পতিবার, যুলহাজ্জ মাসের প্রথম ৯ দিন, বিশেষত আরাফার দিন, আশূরার দিন এবং তার আগে বা পরে এক দিন সিয়াম পালন করার অসীম ফযীলত ও সাওয়াবের কথা বিভিন্ন হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি। রামাদানের পরেই শাওয়াল মাস। ১লা শাওয়াল আমরা ঈদুল ফিতর আদায় করি।

ঈদের পরদিন থেকে পরবর্তী ২৮/২৯ দিনের মধ্যে ৬টি রোযা রাখার বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ

"যে ব্যক্তি রামাদান মাসের সিয়াম পালন করবে। এরপর সে শাওয়াল মাসে ৬টি সিয়াম পালন করবে, তার সারা বৎসর সিয়াম পালনের মত হবে।"[১]

হাযেরীন, কিয়াম ছাড়বেন না। কিয়ামুল্লাইলের সাওয়াব ও ফযীলত শুধু কুরআন ও সহীহ হাদীস থেকে জমা করলেও একটি বড় বই হয়ে যাবে। যদি শেষ রাত্রে না পারেন তবে অন্তত প্রথম রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে, দু চার রাকাত সালাত আদায় করবেন। বিভিন্ন সহীহ হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, প্রতি রাতে, রাতের প্রথম তৃতীয়াংশ বা ৪ ঘন্টা অতিক্রান্ত হওয়ার পরে, রাত ১০/১১ টা থেকে দুআয় কবুলের ও রহমত-বরকতের সময় শুরু হয়। সারাদিন যে ভাবেই কাটান না কেন, অন্তত ঘুমাতে যাওয়ার আগে দু-চার রাকাআত কিয়ামুল্লাইল আদায় করে সামান্য সময় আল্লাহর যিক্‌র ও দরূদ পাঠ করে আল্লাহর দরবারে সারাদিনের গোনাহের ক্ষমা চেয়ে ও নিজের সকল আবেগ আল্লাহকে জানিয়ে ঘুমাতে যাবেন।

হাযেরীন, তাকওয়া ছেড়ে দেবেন না। রামাদানের পরে ইবাদত বন্দেগী কিছু কমে যাওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তাই বলে মুমিন ইচ্ছাকৃতভাবে পাপের পথে ফিরে যেতে পারেন না। তাহলে তো রামাদানের সকল পরিশ্রম বাতিল করে দেওয়া হলো। আর নিজের কষ্টে অর্জিত কর্ম নষ্ট করার মত পাগলামী আর কিছুই হতে পারে না। আল্লাহ বলেন:

وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا

"তোমরা সে (উন্মাদিনী) মহিলার মত হয়ো না যে তার সূতা মযবুত করে পাকানোর পর পাক খুলে নষ্ট করে ফেলে।"[২]

কষ্টের আমল রক্ষা করতে আমাদের রামাদানের তাকওয়া রক্ষা করার জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করতে হবে। এছাড়া কিছু বিষয় আছে যা মুমিনের জীবনের সকল আমল ধ্বংস করে দেয়। তার অন্যতম হলো শিরক ও কুফর। আল্লাহর কোনো ক্ষমতায়, গুণে বা ইবাদতে অন্য কাউকে শরীক করা হলো শিরক। আল্লাহ ছাড়া কোনো নবী, ওলী, ফিরিশতা, জিন বা অন্য কারো কোনো অলৌকিক ক্ষমতা আছে, ইচ্ছ করলেই তারা কোনো মানুষের মনের কথা জানতে পারেন, উপকার বা ক্ষতি করতে পারেন এরূপ বিশ্বাস করা শিরক। আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সাজদা করা, গায়েবী সাহায্য চাওয়া, গায়েবী ভাবে নির্ভর করা, কারো নাম নিয়ে কাজ শুরু করা, মানত করা ইত্যাদি শিরক। শিরকের মতই মহাপাপ কুফর। যেমন, আল্লাহর দীনের কোনো বিধান অচল মনে করা, উপহাস করা, ইসলামের কোনো বিধান অমান্য করা কারো জন্য বৈধ হতে পারে বলে মনে করা ইত্যাদি। হাযেরীন, আমরা যত পাপই করি না কেন, সকল পাপের ক্ষমার আশা আছে। কিন্তু শিরক-কুফর পাপের কোনো ক্ষমার আশা নেই। আর শিরক ও কুফরের কারণে পূর্ববর্তী সকল নেক আমর বিনষ্ট হয়ে যায়। একজন মানুষ যদি নামায, রোযা, যাকাত, হজ্জ ও অন্যান্য ইবাদত পালন করে এবং পাশাপাশি মদ, সিনেমা বা অন্যান্য পাপে লিপ্ত হয়, তবে পাপের কারণে নামায বাতিল হবে না। পাপ ও পুন্য উভয়ই জমা হবে। কিন্তু যদি কেউ শিরক করে তবে তার পূর্ববর্তী সকল ইবাদত বাতিল হবে। তাকে পুনরায় হজ্জ ও অন্যান্য ইবাদত আদায় করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন:

---

[১] মুসলিম, আস-সহীহ ২/৮২২।

[২] সূরা (১৬) নাহল: ৯২ আয়াত।

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

"তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই ওহী করা হয়েছে যে, 'তুমি আল্লাহর শরীক স্থির করলে তোমার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং তুমি হবে ক্ষতিগ্রস্ত'।"[১] আল্লাহ আরো বলেন:

وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

"কেউ ঈমানের সাথে কুফরী করলে তার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"[২]

হাযেরীন, যুগে যুগে শিরক হয় মূলত নবী, ওলী, ফিরিশত বা আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের নিয়ে। যারা শিরক করে তারা মনে করে এ সকল নবী, ওলী বা ফিরিশতা তাদের জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবেন এবং তাদের পারের কাণ্ডারী হবেন। আল্লাহ বলেছেন যে, নবী, ওলী ও ফিরিশতাগণ আল্লাহর অনুমতিতে সুপারিশ করবেন ঠিকই, তবে শিরক-কুফরমুক্ত তাওহীদ ও ঈমান নিয়ে মরবেন শুধু তাদের জন্যই সুপারিশ করবেন। যারা শিরকে লিপ্ত হবে তাদের জন্য কেউ সুপারিশ করবে না। আল্লাহ বলেন:

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

"কেউ আল্লাহর শরীক করলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত নিষিদ্ধ করবেন ও তার আবাস জাহান্নাম; জালিমদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই।"[৩]

হাযেরীন, আমরা রামাদানে প্রতি দিন প্রায় ৭০ বার এবং সারামাসে প্রায় ২ হাজার বার সূরা ফাতেহার মধ্যে আল্লাহর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি: "শুধু তোমারই ইবাদত করি এবং শুধু তোমারই কাছে সাহায্য চাই"। এর পরও কি আমরা বিপদে আপদে কোনো দরগা, মাযার, জিন্ন, নবী, ওলী বা অন্য কাউকে ডাকব বা তাদের কাছে বিপদ ত্রাণের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করব? মুমিন কি তা করতে পারে? মাযারে যাবেন মাযরস্থ ব্যক্তিকে যিরারত করতে, তাকে সালাম দিতে ও তার জন্য দুআ করতে। আলিমদের কাছে যাবেন দীন শিখতে। পীরের কাছে যাবেন আল্লাহর পথে চলার ও বেলায়াত অর্জনের পথ শিখতে। কিন্তু চাওয়া, পাওয়া, বিপদ, সাহায্য, ত্রাণ উদ্ধার এগুলি সবই একমাত্র আল্লাহর জন্য। কোথায় দৌড়াচ্ছেন দুআ করতে? আল্লাহ তো আপনার কাছে রয়েছেন। তিনি কখনোই বলেন নি, বান্দা আমার কাছে দুআ করতে তোমাকে কোথাও যেতে হবে। তিনি বলেছেন, বান্দা যেখানেই তুমি থাক না কেন, আমি তোমার কাছেই আছি। তুমি ডাকলেই আমি সাড়া দিব। রামাদান উপলক্ষ্যে আল্লাহ আমাদেরকে এ কথা বিশেষ করে শিখিয়েছেন। রামাদানের রোযার বিধান দিয়েই পরের আয়াতে আল্লাহ বলেন:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

"আর আমার বান্দারা যখন আপনাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, আমি তো নিকটেই। যখনই কোনো আহ্বানকারী আমাকে ডাকে আমি তার ডাকে সাড়া প্রদান করি। কাজেই তারা আমার ডাকে সাড়া দিক এবং আমার উপর বিশ্বাস রাখুক, তাহলে তারা ঠিক পথে থাকতে পারবে।"[৪]

মুমিন পাপী হতে পারে, তবে হৃদয়ের গভীরে আল্লাহ ছাড়া আর কারো উপর নির্ভরতা থাকতে পারে না। বিপদে আপদে আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে যাওয়ার প্রশ্নই মনে আসে না। বিদায় হজ্জের

[১] সূরা (৩৯) যুমার: ৬৫ আয়াত।
[২] সূরা (৫) মায়িদা: ৫ আয়াত।
[৩] সূরা (৫) মায়িদা: ৭২ আয়াত।
[৪] সূরা বাকারা: ১৮৬ আয়াত।

সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর চাচাতো ভাই আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাসকে কি শিক্ষা দিয়েছেন শুনুন:

يَا غُلامُ إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ احْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتْ الأَقْلامُ وَجَفَّتْ الصُّحُفُ

"হে বালক, আমি তোমাকে কয়েকটি বাক্য শিক্ষা দিচ্ছি। তুমি আল্লাহকে হেফাযত করবে, তাহলে তিনি তোমাকে রক্ষা করবেন। তুমি আল্লাহকে (তোমার অন্তরে সদা জাগরুক ও) সংরক্ষিত রাখবে, তাহলে তাঁকে সর্বদা তোমার সামনে পাবে। যখন চাইবে বা প্রার্থনা করবে তখন শুধু আল্লাহর কাছেই চাইবে। যখন সাহায্য প্রার্থনা করবে, তখন শুধু আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইবে। জেনে রাখ, যদি সকল মানুষ তোমার কোনো কল্যাণ করতে সম্মিলিত হয়, তাহলে তারা তোমার শুধুমাত্র ততটুকুই কল্যাণ করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ নির্ধারণ করেছেন। আর যদি তারা সবাই তোমার অকল্যাণ করতে একজোট হয়, তাহলে তারা তোমার শুধুমাত্র ততটুকুই অকল্যাণ করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ তোমার বিরুদ্ধে নির্ধারণ করেছেন। কলমগুলি উঠে গেছে এবং পৃষ্ঠাগুলি শুকিয়ে গিয়েছে।"[১]

হাযেরীন, রামাদানের আমল বরবাদ হওয়ার আরেকটি বিষয় সালাত। অনেকেই রামাদানে রোযা রাখেন এবং নামায পড়েন, কিন্তু রামাদানের পরে আর ফরয নামায পড়েন না। এর চেয়ে দুর্ভাগ্যজনক আর কি হতে পারে। কুরআন ও হাদীসে নামায পরিত্যাগ করাকে কুফরী বলা হয়েছে। সাহাবী-তাবিয়ীগণ অনেকেই এক ওয়াক্ত সালাত পরিত্যাগ করাকেই কুফরী বলে গণ্য করতেন। অন্যরা বলেছেন যে, নামায ত্যাগ করা কুফরী না হলেও কুফরী গোনাহ। অর্থাৎ মদপান, শুকরের মাংশ ভক্ষণ ও অন্য সকল পাপের চেয়েও মহাপাপ হলো এক ওয়াক্ত নামায পরিত্যাগ করা। আর যদি কেউ মনে করে যে, নামায না পড়েও ভাল মুসলমান থাকা যায় তবে সে নিঃসন্দেহে কাফির হয়ে যায়।

হাযেরীন, আমরা চেষ্টা করব, সকল সুন্নাত-মুস্তাহাব পালন করে পরিপূর্ণভাবে সালাত আদায় করতে। কিন্তু অসুবিধা হলে যতটুকু সম্ভব হাযিরা দিতে হবে। ওযূ না করতে পারলে তায়াম্মুম করে, পবিত্র কাপড় না থাকলে নাপাক কাপড়ে, কাপড় না থাকলে উলঙ্গ হয়ে, কিবলামুখি হতে না পারলে যে দিকে মুখ করে সম্ভব, দাঁড়াতে না পারলে বসে, শুয়ে যেভাবে সম্ভব, সূরা কিরাআত বা দুআ না জানলে শুধু আল্লাহু আকবার বা সুবহানাল্লাহ পড়ে সালাত আদায় করতে হবে। এতেই সালাত আদায় হয়ে যাবে। তবে কোনো অবস্থাতেই জ্ঞান থাকা অবস্থায় সালাত কাযা করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

ফরয সালাত কাযা করার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

لاَ تَتْرُكْ صَلاَةً مَكْتُوْبَةً مُتَعَمِّداً فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّداً فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ (ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُوْلِهِ)

"ইচ্ছাপূর্বক এক ওয়াক্ত ফরয সালাতও পরিত্যাগ করবে না। কারণ যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক এক ওয়াক্ত ফরয সালাত পরিত্যাগ করবে, সে আল্লাহর যিম্মা ও তাঁর রাসূলের (ﷺ) যিম্মা থেকে বহিস্কৃত হবে।"[২]

হাযেরীন, এর চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কী হতে পারে? নাম কাটা যাওয়ার পরে তো আর উম্মাত হিসেবে কোনো দাবিই থাকে না। ক্ষমা লাভ বা শাফাআত লাভের আশাও থাকে না। আল্লাহ আমদেরকে রামাদানের তাকওয়া, সালাত, সিয়াম, কিয়াম ও সকল আমল হিফাযত করার তাওফীক দিন। আমীন।

---

[১] তিরমিযী, আস-সুনান ৪/৬৬৭, নং ২৫১৬, মুসতাদরাক হাকিম ৩/৬২৩, ৬২৪। হাদীসটি সহীহ।

[২] হাকিম, আল-মুসতাদরাক ৪/৪৪; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ১/২৯৫; আলবানী, সহীহুত তারগীব ১/১৩৮-১৩৯। হাদীসটি সহীহ।

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

أَمَّا بَعْدُ، فَيَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ، قَالَ اللهُ تَعَالَىَ: وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا

سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

وَقَالَ تَعَالَى: إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ

بَارَكَ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ فِيْ الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ. وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ. أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ، فَاسْتَغْفِرُوْهُ وَتُوْبُوْا إِلَيْهِ، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.

শাওয়াল মাসের ১ম খুতবাঃ হজ্জ

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লী আলা রাসূলিহীল কারীম। আম্মা বাদ,

সম্মানিত উপস্থিতি, আজ শাওয়াল মাসের প্রথম জুমুআ। আজ আমরা হজ্জ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ। কিন্তু তার আগে আমরা এ সপ্তাহের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসগুলির বিষয়ে সংক্ষেপ আলোকপাত করি। হাযেরীন, আজ ইংরেজী ..... মাসের ..... তারিখ। এ সপ্তাহের দিবসগুলির মধ্যে রয়েছে ....।

হাযেরীন, হজ্জ ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভ। জিলহজ্জ মাসের ৯ তারিখে মক্কার প্রান্তরে "আরাফাত" নামক স্থানে অবস্থান করা ও এর আগে ও পরে কাবাঘর তাওয়াফ করা, সাফা-মারওয়া সাঈ করা, মিনায় অবস্থান করা, মিনার জামারাতগুলিতে কাঁকর নিক্ষেপ করা, হজ্জের কুরবানী বা হাদী জবাই করা, মাথা মুণ্ডন করা, এ সকল কর্মের মধ্যে আল্লাহর যিকির করা, দোয়া করা ইত্যাদি হলো হজ্জের কার্যসমূহ। উমরাহ হলো সংক্ষিপ্ত হজ্জ। বছরের যে কোন সময়ে নির্ধারিত স্থান থেকে ইহরাম করে মক্কায় যেয়ে নির্দিষ্ট নিয়মে আল্লাহর যিকিরের সাথে কাবাঘর সাতবার তাওয়াফ করা, সাফা মারওয়ার মাঝে সাতবার সাঈ করা ও এরপর মাথার চুল কাটা বা ছাঁটা হলো উমরা। জীবনে একবার উমরাহ আদায় করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ বা ওয়াজিব। এরপর নফল উমরাহ পালন করা যায়।

হাযেরীন, একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের জন্য তৈরী প্রথম ইবাদত-গৃহ হল পবিত্র কাবা ঘর। তাওহীদ বা একত্ববাদের চূড়ান্ত বিজয়ের সূচনা হয় ইবরাহীম (আ) কর্তৃক এ ঘরের নির্মাণের মধ্য দিয়ে, আর এর সমাপ্তি ঘটে মহানবী (ﷺ) কর্তৃক এ ঘরের পবিত্রতা ও তাওহীদী ধর্মের প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। হজ্জের মাধ্যমে আমরা এ দুই মহান রাসূলের অগণিত নিদর্শন দেখতে পাই। হজ্জের মাধ্যমে ঈমানের পরীক্ষা হয়। হজ্জের মাধ্যমে ব্যক্তির মানসিকতা প্রশস্ততা লাভ করে, বৃহৎ মানব গোষ্ঠীর সকল জাতি ও বর্ণের পাশাপাশি সমাবেশ ঘটে। পরস্পরে বর্ণগত, ভাষাগত, দেশগত, জাতিগত সকল হিংসা, বিদ্বেষ ও রেষারেষি হজ্জপালনকারীর হৃদয় থেকে মুছে যায়। সে হৃদয় দিয়ে অনুভব করে বিশ্ব কত বড় আর সকল মুসলিম কত আপন। মুসলিম জাতির মধ্যে সাম্য, ঐক্য ও সহযোগিতার প্রবণতা সৃষ্টি হয়।

হাযেরীন, মক্কা মুকাররামাহ পর্যন্ত পৌছাতে সক্ষম এমন প্রত্যেক মুসলিম পুরুষ ও মহিলার জন্য জীবনে একবার হজ্জ আদায় করা ফরজ। বারবার হজ্জ আদায় করা মুস্তাহাব। কেউ হজ্জের আবশ্যকীয়তা বা ফরয হওয়া অস্বীকার করলে তাকে অমুসলিম বলে গণ্য করা হবে। আর যদি কোন সক্ষম ব্যক্তি হজ্জ ফরয মানা সত্ত্বেও তা আদায় না করেন তাহলে তিনি কঠিন পাপের মধ্যে নিপতিত হবেন এবং ঈমান নষ্ট হওয়ার ভয় রয়েছে। আল্লাহ বলেছেনঃ

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

"বাইতুল্লাহ পর্যন্ত পৌছাতে সক্ষম প্রত্যেক ব্যক্তির উপর আল্লাহর জন্য হজ্জ আদায় করা ফরয।"[১]

হাযেরীন, শাওয়াল মাস শুরু হয়েছে। শাওয়াল থেকেই হজ্জের সময় শুরু। আল্লাহ বলেনঃ

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ

"হজ্জের সময় নির্দিষ্ট কয়েকটি মাস। অতএব এ মাসগুলিতে যে হজ্জ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল

[১] সূরা আল-ইমরানঃ ৯৭ আয়াত।

তাকে হজ্জে অশ্লীলতা, পাপ-অন্যায় ও কলহ-বিবাদ থেকে সম্পূর্ণ বিমুক্ত থাকতে হবে। আর তোমরা যা ভাল কাজ কর আল্লাহ তা জানেন। এবং তোমরা পাথেয় গ্রহণ করো; আর তাকওয়া বা আল্লাহ-ভীতি ও আত্মসংযমই শ্রেষ্ঠ পাথেয়। এবং হে বিবেক সম্পন্নগণ, তোমরা আমাকে ভয় কর।"[১]

হাযেরীন, যারা হজ্জের নিয়্যাত করেছেন এবং হজ্জের সফরের প্রস্তুতি নিচ্ছেন এ আয়াতটি তাদের জন্যই দিক নির্দেশনা। অনেক কষ্ট করে হজ্জে যাচ্ছেন। গতানুগতিকতায় গা ভাসিয়ে দেবেন না। আল্লাহর নির্দেশ মন দিয়ে স্মরণ করুন। প্রথম বিষয় হলো সর্ব প্রকারের অশ্লীলতা বোধক চিন্তা, কর্ম, দৃষ্টি ও আচরণ থেকে সর্বোতভাবে বিমুক্ত থাকতে হবে। কারো সাথে কোনো অশোভন আচরণ করা যাবে না এবং ঝগড়া বিবাদ করা যাবে না। হাযেরীন, লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিড়ের মধ্যে হাজারো কষ্ট পেয়েও কাউকে রাগ করা যাবে না বা কারো সাথে ঝগড়া করা যাবে না।এরই নাম হজ্জ।

হাযেরীন, হজ্জ আপনাকে কি শেখাল? শেখাল আমিত্ব বর্জন করতে। আপনি লাখপতি-কোটিপতি, ধনী, ক্ষমতাবান ইত্যাদি সকল পরিচয় মুছে ফেলতে হবে। আপনি আপনার দেহ থেকে আমিত্ব খুলেছেন। ধনী, গরবী, ফকীর, ক্ষমতাবান, দুর্বল, সাদা, কাল সকলেই একই প্রকারের অতি সাধারণ কাফনের কাপড়ের মত কাপড় পরে হজ্জে সমবেত হয়েছেন। কিন্তু আপনি কি আপনার মনের মধ্য থেকে আমিত্বকে খুলে ফেলতে পেরেছেন? এটিই হলো মূল কঠিন কাজ। গায়ে কি পোশাক আছে খেয়াল থাকে না। কিন্তু আমি যে, অমুক ধনী বা ক্ষমতাবান মানুষ তা আমরা ভুলতে পারি না। কেউ অন্যায় করলে বা আমাদের আমিত্বকে আহত করলে রেগে উঠতে মন চায়। সাবধান! নিজের আমিত্ব একেবারে ভুলে যান। মনে করুন, এ ময়দানে আমিই সবচেয়ে বেশি গোনাহগার, অন্য সকলেই আল্লাহর প্রিয় বান্দা। এ অনুভূতি দিয়ে সকলের খেদমতের চেষ্টা করুন এবং সকলের দেওয়া কষ্ট সহ্য করুন।

হাযেরীন, আপনারা সকলেই "হজ্জ মাবরূর" কথাটি শুনেন। "মাবরূর" অর্থ "বির্‌র"-ময়। আরবীতে বির্‌র অর্থ নেক আমল এবং মানুষের খিদমত ও উপকার করা। তাহলে মাবরূর মানে হলো পূণ্যময় এবং পরোপকারময়। হজ্জ কবুল হওয়ার শর্ত হলো মাবরূর হওয়া, অর্থাৎ হজ্জের মধ্যে বেশি বেশি নেক আমল করতে হবে, বিশেষত মানুষের খেদমত করতে হবে এবং কারো অপকার করা যাবে না। যত কষ্টই হোক, সকলের সাথে সুন্দর আচরন ও কথা বলতে হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

بِرُّ الْحَجِّ إِطْعَامُ الطَّعَامِ وَطِيبُ الْكَلَامِ

"হজ্জের বির্‌ব বা কল্যাণকর্ম হলো খাদ্য খাওয়ানো এবং সুন্দর কথা বলা।"[২]

অন্যান্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বির্‌র ও কল্যাণকর্মের বিষয়ে বলেছেন যে, মানুষের কল্যাণে কোনো কর্মকেই ছোট মনে করতে নেই। একজন মানুষকে নিজের রশির অতিরিক্ত অংশ ব্যবহার করতে দেওয়া, জুতার ফিতার মত সামান্য জিনিস প্রদান করা, নিজের বালতি বা জগ থেকে কিছু পানি ঢেলে দেওয়া, হাসিমুখে কথা বলা, চিন্তাক্লিষ্টকে শান্তনা দেওয়া সবই আল্লাহর নিকট গুরুত্বপূর্ণ নেক আমল।

হাযেরীন, উপরের আয়াতে আল্লাহ হাজীদের জন্য দ্বিতীয় যে নির্দেশনা দিয়েছেন তা হলো, নিজের হৃদয়কে আল্লাহ-ভীতি ও তাকওয়া দিয়ে পরিপূর্ণ ভরে নিতে হবে। হজ্জের সফরে তাকওয়া হলো সবচেয়ে বড় পাথেয়। জীবনে যত গোনাহ করেছেন তা থেকে অন্তর দিয়ে তাওবা করতে থাকুন। সগীরা-কবীরা সকল প্রকার গোনাহকে বিষের মত মনে করুন। হজ্জের পুরো সফরে এবং বিশেষ করে আরাফাতের

---

[১] সূরা বাকারা: ১৯৭ আয়াত।

[২] হাকিম, আল-মুসতাদরাক ১/৬৫৮; আলবানী, সহীহুত তারগীব ২/১। হাকিম ও যাহাবী হাদীটিকে সহীহ বলেছেন।

মাঠে, মুযদালিফায়, মিনায়, তাওয়াফ ও সায়ীর সময় নিজের গোনাহের কথা স্মরণ করে অনবরত অনুশোচনা করতে থাকুন। আর কখনো কোনো গোনাহ করব না বলে সুদৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন।

হাযেরীন, হজ্জ দীর্ঘ সময়ের ইবাদত। অধিকাংশ সময় হাজি সাহেব কিছু ইবাদত বন্দেগি, তাওয়াফ, সায়ী, দোয়া-মুনাজাত করেন। এরপর মানবীয় প্রকৃতি অনুসারে সাথীদের সাথে গল্পগুজব ও কথাবার্তায় রত হয়ে পড়েন। কার হজ্জ কেমন হলো, দেশের রাজনীতি কেমন চলছে, কে কোন্ ক্যাম্পে আছে ইত্যাদি খোজ খবর নিতে ও গল্প গুজবে সময় কাটান। আর গল্প ও কথাবার্তার অর্থই হলো অকারণ বাজে কথায় সময় নষ্ট করা অথবা অনুপস্থিত কোনো মানুষের আলোচনা-সমালোচনা করে গীবত ও অপবাদের মত ভয়ঙ্কর পাপে লিপ্ত হওয়া। গল্প-গুজবের মধ্যে এ দুটি ক্ষতি ছাড়া কোনো লাভ নেই। কেউবা বাজারে ঘুরাঘুরি করে সময় নষ্ট করেন অথবা পাপময় দৃশ্য দেখে পাপ কামায় করেন।

হাযেরীন, দেশ, রাজনীতি, বাজার ইত্যাদির সুযোগ অনেক পাবেন। কিন্তু মক্কা, মদীন, মীনা, আরাফা জীবনে বারবার আসবে না। আল্লাহ দয়া করে তাঁর পবিত্র ভূমিতে নিয়ে গিয়েছেন। প্রতিটি মুহূর্তকে মহামূল্যবান বলে মনে করে আল্লাহর যিক্র ও তাওবা-ইসতিগফারে কাটান। ক্লান্ত হলে বিশ্রাম করুন। তাহলে বিশ্রামও ইবাদতে পরিণত হবে। কিন্তু হজ্জকে টুরিজম মনে করে দেখে শুনে, বেড়িয়ে, গল্প করে পবিত্রভূমির মহামূল্যবান সময়গুলি নষ্ট করবেন না। বিশেষ করে গীবত ও পরচর্চা করা বা শোনা, টেলিভিশনে বা বাস্তবে অসুন্দর, তাকওয়াবিহীন বা আপত্তিকর দৃশ্য দেখা বা গল্প করা বা আল্লাহর ভয় ও যিক্র মন থেকে সরিয়ে দেয় এমন গল্পগুজব থেকে যথাসাধ্য আত্মরক্ষা করুন।

হাযেরীন, হজ্জের আহকামগুলি সুন্দরভাবে জেনে নেবেন। বিশেষ করে সুন্নাত জানার ও মানার জন্য প্রাণপনে চেষ্টা করবেন। অমুক কাজ জায়েয, ভাল ইত্যাদি বিষয় দেখবেন না। বরং দেখবেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণ কিভাবে কোন্ কাজটি করেছেন। তাঁরা যে কর্ম যেভাবে করেছেন হুবহু সেভাবে তা পালন করুন। তারা যা করেন নি তা বর্জন করুন। এভাবে হুবহু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তরীকা অনুসারে ইবাদত পালন করতে পারা সৌভাগ্যের লক্ষণ। এতেই রয়েছে কবুলিয়্যাতের নিশ্চয়তা।

হাযেরীন, বিশেষত মদীনা শরীফে ইবাদত-বন্দেগী, যিয়ারাত, দুআ ইত্যাদি সকল বিষয়ে অবশ্যই হুবহু সুন্নাতের মধ্যে থাকবেন। বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য ইমাম সংকলিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَائِرٍ إِلَى كَذَا مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلا عَدْلٌ

"আইর থেকে অমুকস্থান পর্যন্ত মদীনার সমস্ত এলাকা মহাসম্মানিত হারাম বা পবিত্রস্থান। এ স্থানের মধ্যে যদি কেউ নব-উদ্ভাবিত কোনো কর্ম করে, অথবা কেনো নব-উদ্ভাবককে আশ্রয়-প্রশ্রয় দেয় তাহলে তার উপর আল্লাহর লানত, ফিরিশতাগণের লানত এবং সকল মানুষের লানত। তার থেকে তাওবা, কাফ্ফারা বা ফরয-নফল কোনো ইবাদতই কবুল করা হবে না।"[১]

হাযেরীন, বড় ভয়ঙ্কর কথা। এত কষ্ট করে সাওয়াব অর্জনের জন্য সেই পবিত্রভূমিতে যেয়ে অভিশাপ অর্জন করে আসা! আরো ভয়ঙ্কর বিষয় হলো, হাজীরা মদীনায় গেলেই নব-উদ্ভাবিত কর্ম বেশি করেন। মসজিদে নববীতে, রাওযা শরীফে, বাকী গোরস্থানে, উহুদের শহীদদের গোরস্থানে, খন্দকের মসজিদগুলিতে, কুবা ও অন্যান্য মসজিদে ও অন্যান্য স্থানে যিয়ারত, সালাত, দুআ ইত্যাদি ইবাদত

[১] বুখারী, আস-সহীহ ২/৬৬১, ৬/২৪৮২; মুসলিম, আস-সহীহ ২/৯৯৫, ১১৪৭।

পালনের ক্ষেত্রে হাজীগণ আবেগ ও অজ্ঞতার সংমিশ্রণে অনেকভাবে সুন্নাতের ব্যতিক্রম নব-উদ্ভাবিত পদ্ধতি অনুসরণ করেন। সাবধান হোন! যিয়ারতের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ কি বলতেন, কিভাবে দাঁড়াতেন, কি করতেন তা সহীহ হাদীসের আলোকে জেনে নিন। কুবা, খন্দক, কিবলাতাইন ও অন্যান্য স্থানে গমন ও সালাত আদায়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের হুবহু পদ্ধতি সহীহ হাদীসের আলোকে জেনে নিন। তাঁরা যা করেন নি তা বিষবৎ পরিত্যাগ করুন। সাওয়াব কামাতে গিয়ে অভিশাপ ও ধ্বংস কামাই করবেন না।

নব-উদ্ভাবিত কর্ম বা বিদআতের বিষয়ে পরবর্তী যুগের আলিমগণ কিছু মতভেদ করেছেন। কোনো কোনো বিদ'আতকে কোনো কোনো আলিম ভাল বা "হাসানা" বলেছেন। এ সকল তর্ক অন্য স্থানে করবেন। অন্তত মদীনার মাটিতে হাসানা এবং সাইয়েয়াহ সকল নব-উদ্ভাবিত কর্ম বিষবৎ পরিত্যাগ করুন। অন্তত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সম্মানে মদীনার মাটিতে প্রতিটি ইবাদতে সুন্নাতের হুবহু অনুসরণ করুন। হাযেরীন, বিদআতে হাসানা পালন না করলে গোনাহ হবে কেউই বলবেন না। তবে মদীনার মাটিতে নব-উদ্ভাবিত কাজ করলে অভিশাপ ও ধ্বংস আসবে তা সুনিশ্চিত জানা গেল। এরপরও কি রিস্ক নিবেন? তর্ক করবেন? কেন? আল্লাহ আমাদেরকে হেদায়াত নসীব করুন।

হাযেরীন, আপনাদের অনেকেই হজ্জ করেন নি। হজ্জ করার ইচ্ছাও অনেকের নেই। কারণ হজ্জ কখন কার উপর ফরয হয় তা আমরা অনেকেই ভালভাবে জানি না। নিজের ও পরিবারের প্রয়োজনীয় খরচ মিটিয়ে মক্কা শরীফে যাওয়ার খরচ বহনের ক্ষমতা হলেই হজ্জ ফরয হয়ে যায়। এমনকি কারো যদি নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত জমি থাকে, যে জমির ফসল না হলেও তার বৎসর চলে যায়, অথবা অতিরিক্ত বাড়ি থাকে যে বাড়ি তার ব্যবহার করতে হয় না, বরং ভাড়া দেওয়া, অথচ যে বাড়ির ভাড়া না হলেও তার বছর চলে যায় তবে সেই জমি বা বাড়ি বিক্রয় করে হজ্জে যাওয়া ফরয হবে বলে অনেক ফকীহ সুস্পষ্টত উল্লেখ করেছেন। তাহলে চিন্তা করুন! আমাদের মধ্যে অনেকে আছেন যারা প্রতি বৎসর প্রয়োজনের অতিরিক্ত টাকা দিয়ে নতুন জমি কিনছেন, বাড়ি বানাচ্ছেন বা বিনিয়োগ করছেন, অথচ হজ্জ করছেন না। আর হজ্জ ফরয হওয়ার পরেও হজ্জ না করে মৃত্যুবরণ করাকে কোনো কোনো হাদীসে ইহূদী-খৃস্টান হয়ে মরা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ বলেন:

إِنَّ عَبْداً صَحَّحْتُ لَهُ جِسْمَهُ وَوَسَّعْتُ عَلَيْهِ فِيْ الْمَعِيْشَةِ تَمْضِيْ عَلَيْهِ خَمْسَةُ أَعْوَامٍ لاَ يَفِدُ إِلَيَّ لَمَحْرُوْمٌ

"যে বান্দার শরীর আমি সুস্থ রেখেছি এবং তার জীবনযাত্রায় সচ্ছলতা দান করেছি, এভাবে পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও সে আমার ঘরে আগমন করল না সে সুনিশ্চিত বঞ্চিত ও হতভাগা।"[১]

হাযেরীন, কুরআন ও হাদীসে অগণিত স্থানে বারংবার হজ্জের গুরুত্ব ও ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। এগুলির আলোচনা সংক্ষিপ্ত পরিসরে সম্ভব নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

"যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য নিবেদিতভাবে, সর্বপ্রকার পাপ, অন্যায় ও অশ্লীলতা মুক্ত হয়ে হজ্জ আদায় করলো, সে নবজাতক শিশুর মত নিষ্পাপ হয়ে ঘরে ফিরল।"[২]

الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلا الْجَنَّةُ

"একবার উমরা আদায়ের পরে দ্বিতীয়বার যখন উমরা আদায় করা হয়, তখন দুই উমরার মধ্যবর্তী

[১] ইবনু হিব্বান, আস-সহীহ ৯/১৬; আলবানী, সহীহুত তারগীব ২/২০। হাদীসটি সহীহ।
[২] সহীহ বুখারী ২/৫৫৩, ৬৪৫, ৬৪৬।

গোনাহ আল্লাহ মাফ করে দেন। আর পুণ্যময়-পরোপকারময় হজ্জের একমাত্র পুরস্কার হলো জান্নাত।"[১]

تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ

"তোমরা বারবার হজ্জ ও উমরা আদায় কর, কারণ কর্মকারের ও স্বর্ণকারের আগুন যেমন লোহা ও সোনা-রূপার ময়লা মুছে ফেলে তেমনিভাবে এ দুই ইবাদত দারিদ্র্য ও পাপ মুছে ফেলে। আর পুণ্যময়-পরোপকারময় হজ্জের একমাত্র পুরস্কার হলো জান্নাত।[২]

হাযেরীন, হজ্জের মাধ্যমে গোনাহ মাফ ছাড়াও রয়েছে অগণিত পুরস্কার ও সাওয়াব। হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, হাজী যখন বাড়ি থেকে বের হন তখন থেকে তার প্রতিটি পদক্ষেপে আল্লাহ তাকে অগণিত নেকী প্রদান করেন, তার ব্যয়িত প্রতিটি টাকার বহুগুণ এমনকি ৭০০ গুণ সাওয়াব প্রদান করেন বলে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, আল্লাহ হাজীর দুআ ও ইসতিগফার কবুল করেন এবং হাজী সাহেব যাদের জন্য দুআ করেন তাদেরকেও আল্লাহ ক্ষমা করেন। হজ্জের সবচেয়ে বরকতময় দিন হলো আরাফাতের দিন। বিভিন্ন হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, আরাফাতের দিনে আল্লাহ যত মানুষকে ক্ষমা করেন অন্য কোনো দিনে অত মানুষকে ক্ষমা করেন না। আরাফাতের দিনে সমবেত হাজীদের জীবনের পাপগুলি তিনি ক্ষমা করেন।

হাযেরীন, মূলত আরাফাতের দিন দুপুর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফাতের মাঠে অবস্থান করে আল্লাহর যিকর ও দুআয় কাটানোই মূলত হজ্জ। যারা হজ্জে যাচ্ছেন তারা এ বিষয়ে খেয়াল রাখবেন। ফ্রী খাবার জোগাড় করতে, হাজীদের সাথে গল্প করতে বা খাওয়া দাওয়ার পিছনে অযথা সময় নষ্ট করবেন না। যথাসাধ্য একাকী হয়ে জীবনের সকল পাপ স্মরণ করে নিজেকে দুনিয়ার সবচেয়ে পাপী মনে করে আল্লাহর কাছে দুআ ও ইসতিগফার করুন। ক্লান্তি লাগলে আল্লাহর যিকর করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"সর্বশ্রেষ্ঠ দুআ হলো আরাফাতের দিনের দুআ। আর আমি এবং আমার পূর্বের নবীগণ সর্বশ্রেষ্ঠ যে কথাটি বলেছি তা হলোঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুআ আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর। আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবূদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই, এবং প্রশংসা তাঁরই এবং তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।"[৩]

হাযেরীন, এ মহান পুরস্কার থেকে নিজেকে বঞ্চিত করবেন না। অনেকে মনে করেন পিতামাতার অনুমতি ছাড়া হজ্জ করা যায় না। চিন্তাটি ভুল। পিতামাতার আনুগত্য প্রত্যেক সন্তানের উপর ফরয। কিন্তু তাদের নির্দেশে আল্লাহর ফরয-ওয়াজিব নির্দেশ পিছানো বা নষ্ট করা যাবে না। ফরয দায়িত্ব পালনে তাঁদের অনুমতির প্রয়োজন নেই। ফরয নামায আদায় এবং ফরয হজ্জ আদায়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তবে পিতামাতার নিকট থেকে দোয়া-এজাযত নেওয়া খুবই ভাল ও বরকতের কাজ। অনেকে পিতামাতাকে হজ্জ না করিয়ে হজ্জ করাকে অনুচিত মনে করেন। এটিও ভুল। পিতামাতার ভরণপোষণ সন্তানের উপর ফরয

---

[১] সহীহ বুখারী ২/৬২৯, সহীহ মুসলিম ২/৯৮৩।

[২] তিরমিযী, আস-সুনান ৩/১৭৫, ইবনু মাজাহ, আস-সুনান ২/৯৬৪, নাসাঈ, আস-সুনান ৫/১১৫, ইবনু খুযাইমা, আস-সহীহ ৪/১৩০। হাদীসটি সহীহ।

[৩] তিরমিযী, আস-সুনান ৫/৫৭২; আলবানী, সহীহুত তারগীব ২/১০৬। হাদীসটি হাসান।

দায়িত্ব। তবে হজ্জ ফরয হবে যার অর্থ আছে তার উপর। যদি পিতার নিজস্ব অর্থ থাকে তবে তাকে নিজের দায়িত্বে হজ্জ করতে হবে। সন্তান তাকে সাহায্য করবেন। আর যদি সন্তান অর্থ উপার্জনের কারণে বা নিকটবর্তী কোন দেশে গমনের কারণে তার উপর হজ্জ ফরয হয় তাহলে তাকে আগে নিজের হজ্জ পালন করতে হবে। পরে সম্ভব হলে পিতামাতাকে হজ্জ করানো খুবই ভাল কাজ।

অনেকে মনে করেন মেয়ে বিয়ে না দিয়ে বা এই জাতীয় পারিবারিক দায়িত্ব পালন না করে হজ্জে যাওয়া ঠিক না। চিন্তাটি ঠিক নয়। মেয়ে বিয়ের জন্য কি যাকাত দেওয়া বন্দ রাখবেন? ফরয নামায বন্দ রাখবেন? হজ্জও নামাযের মতই ফরয ইবাদত। হজ্জের টাকার ব্যবস্থা হয়ে গেলে হজ্জ করা ফরয। যদি মেয়ের বিবাহ ঠিক হয়ে থাকে তাহলে বিবাহ দিন। এরপর হজ্জের টাকা হলে হজ্জ করুন। বিয়ে ঠিক না হলে হজ্জের টাকা হলে হজ্জ করুন। এরপর যখন বিবাহের সময় হবে তখন বিবাহ দিবেন। মূল কথা হলো, আগের যুগে রাস্তার নিরাপত্তার অভাবে এদেশের মুসলমান সকল সামাজিক দায়িত্ব পালনের পরে চির বিদায় নিয়ে হজ্জে গমন করতেন। এ থেকে আমাদের দেশে এরূপ কুসংস্কার জন্ম নিয়েছে।

অনেকে মনে করেন হজ্জ বৃদ্ধ বয়সের বা শেষ জীবনের ইবাদত। হজ্জের পরে আর কোন সাংসারিক কাজ করা যায় না। অনেকে বলেন, অল্প বয়সে হজ্জ করলে রাখবে কিভাবে! এ সবই শয়তানী ওয়াসওয়াসা ও ইসলামী চেতনার সম্পূর্ণ বিপরীত। কেউ যদি মনে করে যে, সারাজীবন কাফির থাকব, শেষ জীবনে ইমান এনে সকল গোনাহর ক্ষমা লাভ করে মৃত্যু বরণ করব, অথবা চিন্তা করে যে, সারাজীবন বেনামাযী থাকব আর শেষ জীবনে নামায পড়ে গোনাহের ক্ষমা নিয়ে মরব, তাহলে তার চিন্তা যেমন ইসলাম বিরোধী, তেমনি ইসলাম বিরোধী চিন্তা যে, হজ্জ ফরয হওয়ার পরেও তা পালন না করে ভালমন্দ সকল কাজ করতে থাকব এরপর শেষ বয়সে হজ্জ করে ক্ষমা লাভ করে মৃত্যু বরণ করব। এ সবই শয়তানী চিন্তা। যারা এভাবে পাপ জমা করে রাখে শেষে তাওবা করব বলে তাদের তাওবা নসীব হয় না এবং তাদের তাওবা আল্লাহ্ কবুল করেন না বলে কুরআনেব বলেছেন:

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ وَلا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ

"তাওবা তাদের জন্য নয় যারা মন্দ কাজ করতেই থাকে, শেষ পর্যন্ত যখন তাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন সে বলে, আমি এখন তাওবা করছি, এবং তাদের জন্যও তাওবা নয় যারা কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে।"[১]

হাযেরীন, নামায, রোযা, যাকাত ইত্যাদির মত হজ্জও একটি ফরয আঈন ইবাদত। যখন যে বয়সেই তা ফরয হোক তা যতশীঘ্র সম্ভব আদায় করতে হবে। আর সর্বাবস্থায় আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইতে হবে ও আল্লাহর পথে থাকার চেষ্টা করতে হবে। হাযেরীন, প্রকৃত সত্য কথা হলো, হজ্জ যৌবনকাল ও শক্তির সময়ের ইবাদত। কোনো বৃদ্ধ মানুষ সঠিকভাবে হজ্জ আদায় করতে পারেন না। সম্পূর্ণ বৈরি আবহাওয়ায়, লক্ষলক্ষ মানুষের ভিড়ের মধ্যে মাইলের পর মাইল হাঁটা, দৌড়ানো, কাঁকর নিক্ষেপ করা ইত্যাদি ইবাদতের সুন্নাত পর্যায় রক্ষা করা তো দূরের কথা ওয়াজিব পর্যায় ঠিক রাখাও বৃদ্ধ ব্যক্তির জন্য ৶ওকর। এজন্য যুবক বয়সের হজ্জই প্রকৃত ও পরিপূর্ণ হজ্জ হতে পারে। মহান আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত করুন। আমীন।

---

[১] সূরা নিসা: ১৭-১৮ আয়াত।

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

أَمَّا بَعْدُ، فَيَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا

وَقَالَ: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الأَلْبَابِ

وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِرُّ الْحَجِّ إِطْعَامُ الطَّعَامِ وَطِيْبُ الْكَلاَمِ

وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

بَارَكَ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ فِيْ الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ. وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ. أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ، فَاسْتَغْفِرُوْهُ وَتُوْبُوْا إِلَيْهِ، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.

শাওয়াল মাসের ২য় খুতবাঃ আল্লাহর পথে দাওয়াত

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লী আলা রাসূলিহীল কারীম। আম্মা বাদ,

সম্মানিত উপস্থিতি, আজ শাওয়াল মাসের প্রথম জুমুআ। আজ আমরা আল্লাহর পথে দাওয়াত সম্পর্কে কিছু আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ। কিন্তু তার আগে আমরা এ সপ্তাহের জাতীয় ও আন্ত র্জাতিক দিবসগুলির বিষয়ে সংক্ষেপ আলোকপাত করি। হাযেরীন, আজ ইংরেজী ..... মাসের ..... তারিখ। এ সপ্তাহের দিবসগুলির মধ্যে রয়েছে .... ।

হাযেরীন, নিজের জীবনের ইসলাম পালন ও প্রতিষ্ঠা করার পরে নিজের আশেপাশে সমাজের ও বিশ্বের সকলের কাছে ইসলামের দাও'আত পৌঁছে দিয়ে আল্লাহর দীনকে সমাজে ও বিশ্বে প্রতিষ্টিত করতে চেষ্টা করা মুমিনের অন্যতম দায়িত্ব। কুরআন ও হাদীসে দীন প্রচার ও প্রতিষ্ঠার এ দায়িত্বকে ন্যায়ের আদেশ, অন্যায়ের নিষেধ, আল্লাহর পথে দাওয়াত, তাবলীগ, ওয়াজ, নসীহত, দীন প্রতিষ্ঠা, জিহাদ ইত্যাদি নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এবং বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহর পথে দাওয়াত দেওয়া, সৎকার্যে আদেশ ও অসৎকার্যে নিষেধ বা এককথায় আল্লাহর দ্বীন পালনের পথে আহ্বান করাই ছিল সকল নবী ও রাসূলের দায়িত্ব। এ দায়িত্বই উম্মাতে মুহাম্মাদীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ বলেনঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

"তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি, মানবজাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে। তোমরা ন্যায়কার্যের নির্দেশ দান কর এবং অন্যায় কার্যে নিষেধ কর এবং আল্লাহের উপর ঈমান আন।"[১]

এভাবে কুরআনে বিভিন্ন স্থানে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহর প্রকৃত মুমিন বান্দাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ। এভাবে আমরা দেখছি যে, ঈমান, নামায, রোযা ইত্যাদি ইবাদতের মত সৎকাজের নির্দেশ ও অসৎকাজের নিষেধ মুমিনের অন্যতম কর্ম।

হাযেরীন, উম্মাতের মধ্যে আদেশ, নিষেধ বা দাওয়াতের ধারা অব্যাহত রাখা উম্মাতের উপর ফরয কিফাইয়া। কোনো সমাজে যদি কেউ দীন সম্পর্কে অজ্ঞ থাকেন, দীনের কোনো বিধান অমান্য করেন বা পাপে লিপ্ত থাকেন তবে সে সমাজের মুসলিমদের উপর ফরয কিফায়া হলো তাকে আদেশ, নিষেধ ও দাওয়াত করা। যদি কেউই এ দায়িত্ব পালন না করেন তবে সকলেই গোনাহগার হবেন। আর সমাজের মধ্য থেকে "কিছু মানুষ" যদি এ দায়িত্ব পালন করেন তাহলে তিনিই এর অসীম সাওয়াব লাভ করবেন, অন্যরা গোনাহ থেকে মুক্ত হবেন, কিন্তু কোনো সাওয়াব তারা পাবেন না। আল্লাহ বলেনঃ

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"তোমাদের মধ্যে এমন একদল হোক যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে, ন্যায়কার্যে নির্দেশ দিবে এবং অন্যায় কার্যে নিষেধ করবে। এরাই সফলকাম।"[২]

হাযেরীন, ক্ষমতা ও দায়িত্বের ভিত্তিতে আদেশ নিষেধ বা দাওয়াত ফরয ইবাদতে পরিণত হয়। যারা সমাজে ও রাষ্ট্রে দায়িত্ব ও ক্ষমতায় রয়েছেন তাদের জন্য এই দায়িত্ব অধিকাংশ ক্ষেত্রে ফযর আইন। দায়িত্ব ও ক্ষমতা যত বেশি সৎকর্মে আদেশ ও অসৎকর্ম থেকে নিষেধের দায়িত্বও তত বেশি। আল্লাহর কাছে জবাবদিহীতার ভয়ও তাদের তত বেশি। আল্লাহ বলেনঃ

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ

[১] সূরা আল-ইমরানঃ ১১০ আয়াত।
[২] সূরা আল-ইমরানঃ ১০৪ আয়াত।

وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

"যাদেরকে আমি পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠাদান বা ক্ষমতাবান করলে তারা সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয়, সৎকার্যে নির্দেশ দেয় এবং অসৎকার্যে নিষেধ করে। আর সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহর এখতিয়ারে।"[১]

অনুরূপভাবে পরিবার, প্রতিষ্ঠান বা যে কোনো অফিস বা কার্যালয়ের দায়িত্বশীলের উপর তার অধীনস্থদেরকে আদেশ, নিষেধ ও দাওয়াত করা ফরয আইন। তার অধীনস্থদের পাপ, পুন্য, অন্যায়, ন্যায় ইত্যাদি সম্পর্কে কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে তাকে হিসাব দিতে হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

أَلا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ

"সাবধান! তোমরা সকলেই অভিভাবকত্বের দায়িত্ব প্রাপ্ত এবং প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। মানুষের উপর দায়িত্ব প্রাপ্ত শাসক বা প্রশাসক অভিভাবক এবং তাকে তার অধীনস্থ জনগন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। বাড়ির কর্তাব্যক্তি তার পরিবারের সদস্যদের দায়িত্বপ্রাপ্ত অভিভাবক এবং তাকে তাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে। স্ত্রী তার স্বামীর বাড়ি ও তার সন্তান-সন্ততির দায়িত্ব প্রাপ্তা এবং তাকে তাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে।[২]

হাযেরীন, যিনি বা যারা অন্যায় বা গর্হিত কর্ম দেখবেন তার বা তাদের উপর সামষ্টিকভাবে দায়িত্ব হয়ে যাবে সাধ্য ও সুযোগমত তার প্রতিবাদ বা প্রতিকার করা। রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ.

"তোমাদের কেউ যদি কোন অন্যায় দেখতে পায় তবে সে তাকে তার বাহুবল দিয়ে পরিবর্তন করুক। যদি তাতে সক্ষম না হয় তাহলে সে তার বক্তব্যের মাধ্যমে তা পবিবর্তন করুক। এতেও যদি সক্ষম না হয় তাহলে সে তার অন্তর দিয়ে তার পরিবর্তন (কামনা) করুক, আর এটাই হলো ঈমানের দুর্বলতম পর্যায়।"[৩]

হাযেরীন, প্রত্যেক মুমিনেরই দায়িত্ব হলো, অন্যায় বা গর্হিত কর্ম দেখতে পেলে সাধ্য ও সুযোগ মত তার প্রতিবাদ-প্রতিকার করা। এক্ষেত্রে অন্যায়কে অন্তর থেকে ঘৃণা করা এবং এর অবসান ও প্রতিকার কামনা করা প্রত্যেক মুমিনের উপরেই ফরয। অন্যায়ের প্রতি হৃদয়ের বিরক্তি ও ঘৃণা না থাকা ঈমান হারানোর লক্ষণ। আমরা অগণিত পাপ, কুফরী, হারাম ও নিষিদ্ধ কর্মের সায়লাবের মধ্যে বাস করি। বারংবার দেখতে দেখতে আমাদের মনের বিরক্তি ও আপত্তি কমে যায়। তখন মনে হতে থাকে, এত স্বাভাবিক বা এত হতেই পারে। পাপকে অন্তর থেকে মেনে নেওয়ার এই অবস্থাই হলো ঈমান হারানোর অবস্থা। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ) যা নিষেধ করেছেন বা যা পাপ ও অন্যায় তাকে ঘৃণা করতে হবে, যদিও তা আমার নিজের দ্বারাও সংঘটিত হয় বা বিশ্বের সকল মানুষ তা করেন। এ হলো ঈমানের ন্যূনতম দাবী।

হাযেরীন, ফরয আইন, ফরয কিফায়া বা মুস্তাহাব, সকল পর্যায়ে মানুষকে ন্যায়ের আদেশ দেওয়া, অন্যায় থেকে নিষেধ করা, দাওয়াত দেওয়া বা সামগ্রিকভাবে দীনের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা অতুলনীয় সাওয়াব ও ফযীলতের ইবাদত। আপনার দাওয়াত, আদেশ বা নিষেধের মাধ্যমে কেউ ভাল হোক বা না হোক, আপনার মুখ দিয়ে একটি ভাল উপদেশ দেওয়াই বড় ইবাদত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

---

[১] সূরা হজ্জ: ৪১ আয়াত।

[২] বুখারী, আস-সহীহ ১/৩০৪; মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৪৫৯।

[৩] মুসলিম, আস-সহীহ ১/৬৯।

أَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ

"ভাল কার্যে নির্দেশ করা সাদকা বলে গণ্য এবং খারাপ থেকে নিষেধ করা সাদকা বলে গণ্য।"[১]

আমরা যারা সহজে মুখ খুলতে চাই না তাদের একটু চিন্তা করা দরকার। প্রতিদিন অগণিতবার আমরা সুযোগ পাই মুখ দিয়ে মানুষকে একটি ভাল কথা বলার। লোকটি কথা শুনবে কিনা তা কোনো বিষয়ই নয়। আমি শুধু বলার সুযোগটা ব্যবহার করে সাওয়াব অর্জন করতে চাই। একটু ভালবেসে একটি ভাল উপদেশমূলক একটি কথা আমার জন্য আল্লাহর দরবারে অগণিত পুরস্কার জমা করবে। সাথে সাথে লোকটিরও উপকার হতে পারে। যদি হয় তাহলে আমরা দ্বিতীয় পর্যায়ের বিশেষ পুরুষ্কার লাভ করব।

আর যদি আপনার কথায় কোনো মানুষ ভাল হন তবে তা আপনার অনন্ত সৌভাগ্যের বিষয়। দাওয়াতের অফুরন্ত সাওয়াব ছাড়াও হেদায়াত প্রাপ্ত মানুষদের জীবনের সকল নেক আমলের সমপরিমান সাওয়াব আপনি লাভ করবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

وَاللَّهِ لأَنْ يُهْدَى بِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ

"আল্লাহর কসম, তোমার মাধ্যমে যদি একজন মানুষও হেদায়াত লাভ করে তাহলে তা তোমার জন্য সর্বোচ্চ সম্পদ লাল-উটের চেয়েও উত্তম বলে গণ্য হবে।"[২]

مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا.

"যদি কোনো ব্যক্তি কোনো ভালপথে আহ্বান করে তবে যত মানুষ তার অণুসরণ করবে তাদের সকলের পুরস্কারের সমপরিমাণ পুরস্কার সেই ব্যক্তি লাভ করবে, তবে এতে অনুসরণকারীদের পুরস্কারের কোনো ঘাটতি হবে না। আর যদি কোনো ব্যক্তি কোনো বিভ্রান্তির দিকে আহ্বান করে তবে যত মানুষ তার অণুসরণ করবে তাদের সকলের পাপের সমপরিমাণ পাপ সেই ব্যক্তি লাভ করবে, তবে এতে অনুসরণকারীদের পাপের কোনো ঘাটতি হবে না।"[৩]

হাযেরীন, ন্যায়ের আদেশ, অন্যায়ের নিষেধ ও দাওয়াতের পুরস্কার যেমন অফুরন্ত, তা পালনে অবহেলার শাস্তিও ভয়ানক। কুরআন ও হাদীস থেকে জানা যায় যে, এ ইবাদত পালনে অবহেলা করলে চার প্রকারের শাস্তি পাওয়া যায়: ১. দুনিয়াবী গযব ও শাস্তি, ২. পরস্পরের সৌহার্দ ও সম্প্রীতি নষ্ট হওয়া, ৩. দোয়া কবুল না হওয়া এবং ৪. পাপ না করেও শুধুমাত্র আপত্তি না করার কারণে পাপের ভাগী হওয়া।

হাযেরীন, "ওকে বললে কোনো লাভ হবে না" এ ধারণা করে মানুষকে সৎকার্যে আদেশ ও অসৎকার্যে নিষেধ থেকে বিরত থাকা জায়েয নয়। কারণ প্রথমত, 'লোকটি কথা শুনবে না' একথা নিশ্চিত জানলেও আমাকে বলতে হবে। আমার দায়িত্ব হলো বলা, আমাকে আমার দায়িত্ব পালন করতেই হবে। দ্বিতীয়ত, 'লোকটি কথা শুনবে না' এ কথা এভাবে নিশ্চিত ধারণা করাও ঠিক নয়। কারণ, হয়ত ভাল কথাটি তার মনে প্রভাব ফেলতে পারে। তবে যদি মুমিন নিশ্চিত হন যে, সৎকাজে আদেশ করলে বা অন্যায় থেকে নিষেধ করলে তাকে লাঞ্ছিত করা হবে তাহলে তিনি আপত্তি ও ঘৃণা সহ নীরব থাকতে পারেন। তবে সেক্ষেত্রে তাকে পাপের স্থান পরিত্যাগ করা জরুরী। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

---

[১] মুসলিম, আস-সহীহ ১/৪৯৮, ২/৬৯৭।
[২] বুখারী, আস-সহীহ ৩/১০৭৭।
[৩] মুসলিম, আস-সহীহ ৪/২০৬০।

إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الْمُنْكَرَ لا يُغَيِّرُونَهُ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابِهِ

"যখন মানুষেরা অন্যায় দেখেও তা পরিবর্তন বা সংশোধন করবে না তখন যে কোন মুহূর্তে আল্লাহর শাস্তি তাদের সবাইকে গ্রাস করবে।"[১]

অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي قَوْمٍ يَعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي يَقْدِرُونَ عَلَى أَنْ يُغَيِّرُوا عَلَيْهِ فَلا يُغَيِّرُوا إِلا أَصَابَهُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمُوتُوا.

"কোনো সমাজের মধ্যে যদি কোনো ব্যক্তি অবস্থান করে সেখানে অন্যায়-পাপে লিপ্ত থাকে এবং সেই সমাজের মানুষেরা তার সংশোধন-পরিবর্তন করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তা পরিবর্তন না করে, তবে তাদের মৃত্যুর পূর্বেই আল্লাহর আযাব তাদেরকে গ্রাস করবে।"[২]

অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেন:

كَلاً وَاللَّهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدَيِ الظَّالِمِ وَلَتَأْطُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا وَلَتَقْصُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ قَصْرًا أَوْ لَيَضْرِبَنَّ اللَّهُ بِقُلُوبِ بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ ثُمَّ لَيَلْعَنَنَّكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ

"মহান আল্লাহর কসম করে বলছি, তোমরা অবশ্যই সৎকর্মের আদেশ করবে, অন্যায় থেকে নিষেধ করবে, অন্যায়কারী বা অত্যাচারীকে হাত ধরে বাধা দান করবে, তাকে সঠিক পথে ফিরে আসতে বাধ্য করবে এবং তাকে ন্যায় ও সত্যের মধ্যে থাকতে বাধ্য করবে। যদি তোমরা তা না কর তাহলে আল্লাহ তোমাদের মধ্যে পরস্পর বিরোধিতা ও শত্রুতা সৃষ্টি করে দেবেন এবং তোমাদেরকে অভিশপ্ত করবেন যেমন ইসরাঈল সন্তানদেরকে অভিশপ্ত করেছিলেন।"[৩]

অন্য হাদীসে তিনি বলেন:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلا يُسْتَجَابُ لَكُمْ

"যার হাতে আমার জীবন সেই মহান আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, তোমরা অবশ্যই সৎকর্মের আদেশ করবে, অন্যায় থেকে নিষেধ করবে, তা নাহলে আল্লাহ অচিরেই তোমাদের সবার উপর তাঁর গজব ও শাস্তি পাঠাবেন, যে শাস্তি ভাল-মন্দ সকল মানুষকে গ্রাস করবে, তারপর তোমরা আল্লাহকে ডাকবে, কিন্তু তিনি তোমাদের ডাকে সাড়া দিবেন না, তোমাদের দোয়া কবুল করবেন না।"[৪]

সরকার, প্রশাসক বা নেতৃবৃন্দের অন্যায়ের ক্ষেত্রে করণীয় ব্যাখ্যা করে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

إِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلا نُقَاتِلُهُمْ قَالَ لا مَا صَلَّوْا

"অচিরেই তোমাদের উপর অনেক শাসক প্রশাসক আসবে যারা ন্যায় ও অন্যায় উভয় প্রকারের কাজ করবে। যে ব্যক্তি তাদের অন্যায়কে অপছন্দ করবে সে অন্যায়ের অপরাধ থেকে মুক্ত হবে। আর

[১] তিরমিযী, আস-সুনান ৪/৪৬৭, ৫/২৫৬; আবু দাউদ, আস-সুনান ৪/১২২; ইবনু মাজাহ, আস-সুনান ২/১৩২৭। হাদীসটি সহীহ।
[২] আবু দাউদ, আস-সুনান ৪/১২২; ইবনু মাজাহ ২/১৩২৯; আলবানী, সহীহুত তারগীব ২/২৮৬। হাদীসটি হাসান।
[৩] আবু দাউদ, আস-সুনান ৪/১২২; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৭/২৬৯। হাইসামী হাদীসটির সনদ শক্তিশালী বলেছেন।
[৪] তিরমিযী, আস-সুনান ৪/৪৬৮। তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

যে ব্যক্তি আপত্তি করবে সে (আল্লাহর অসন্তুষ্টি থেকে) নিরাপত্তা পাবে। কিন্তু যে এ সকল অন্যায় কাজ মেনে নেবে বা তাদের অনুসরণ করবে (সে বাঁচতে পারবে না।) সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করব না? তিনি বলেন, না, যতক্ষণ তারা সালাত আদায় করবে।"[১]

অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

إِذَا عُمِلَتِ الْخَطِيئَةُ فِي الأَرْضِ كَانَ مَنْ شَهِدَهَا فَكَرِهَهَا وَقَالَ مَرَّةً أَنْكَرَهَا كَانَ كَمَنْ غَابَ عَنْهَا وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيَهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا

"যখন পৃথিবীর উপরে কোনো পাপ সংঘটিত হয় তখন পাপের নিকট উপস্থিত থেকেও যদি কেউ তা ঘৃণা করে বা আপত্তি করে তাহলে সেই ব্যক্তি অনুপস্থিত ব্যক্তির মত পাপমুক্ত থাকবে। আর যদি কেউ অনুপস্থিত থেকেও পাপটির বিষয়ে সন্তুষ্ট থাকে বা মেনে নেয় তাহলে সে তাতে অংশগ্রহণের পাপে পাপী হবে।"[২]

তিনি আরো বলেন:

لا يَحْقِرَنَّ أَحَدُكُمْ نَفْسَهُ أَنْ يَرَى أَمْرًا لِلَّهِ عَلَيْهِ فِيهِ مَقَالا ثُمَّ لا يَقُولُهُ فَيَقُولُ اللَّهُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَقُولَ فِيهِ فَيَقُولُ رَبِّ خَشِيتُ النَّاسَ فَيَقُولُ وَأَنَا أَحَقُّ أَنْ يُخْشَى * أحمد، والسند صحيح.

"তোমাদের কেউ কোথাও আল্লাহর জন্য কথা বলার প্রয়োজন বা সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কথা না বলে নীরব থাকাকে হালকা ভাবে দেখবে না। কারণ, আল্লাহ তাকে বলবেন, তুমি এ বিষয়ে কেন কথা বল নি? তখন সে বলবে, হে আল্লাহ, আমি মানুষদেরকে ভয় পেয়েছিলাম। তখন তিনি বলবেন, আমার অধিকারই তো বেশি ছিল যে, তুমি আমাকেই বেশি ভয় করবে।"[৩]

হাযেরীন, আদেশ, নিষেধ ও দাওয়াতের ক্ষেত্রে বিনয় ও নম্রতা অন্যতম শর্ত। আমরা অনেক সময় আদেশ-নিষেধের নামে মাদবরী করতে চাই এবং অন্যায়কারীকে রূঢ় ভাষায় আদেশ বা নিষেধ করি। ফলে তার মধ্যে মানসিক প্রতিরোধ তৈরি হয় এবং সে আমাদের কথা গ্রহণ করে না। তখন আবার আমরা তাকে ইসলামের শত্রু বানিয়ে ফেলি। হাযেরীন, যদি আমাদের আচরণের কারণে কেউ দীনের প্রতি রুষ্ট হয় তাহলে তার পাপ আমাদের উপরেও বর্তাবে। কারণ কুরআন ও হাদীসে বারংবার আদেশ, নিষেধ বা দাওয়াতের ক্ষেত্রে সবর, বিনয় ও উত্তম আচরণের নির্দেশ দিয়েছেন। এক আয়াতে আল্লাহ বলেন:

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ

"কথায় কে উত্তম ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা যে আল্লাহর প্রতি মানুষকে আহ্বান করে, সৎকর্ম করে এবং বলে, আমি তো আত্মসমর্পনকারীদের অন্তর্ভুক্ত। ভাল এবং মন্দ সমান হতে পারে না। মন্দ প্রতিহত কর উৎকৃষ্ট দ্বারা; ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত। এই গুণের অধিকারী করা হয় কেবল তাদেরকেই যারা ধৈর্যশীল, এই গুণের অধিকারী করা হয় কেবল তাদেরকেই যারা মহা ভাগ্যবান।"[৪]

---

[১] মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৪৮১।
[২] আবু দাউদ, আস-সুনান ৪/১২৪; আলবানী, সহীহুত তারগীব ২/২৮৮; সহীহুল জামি ১/১৭৯। হাদীসটি হাসান।
[৩] আহমদ, আল-মুসনাদ ৩/৩০, ৭৩, ৯১; বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা ১০/৯০। হাদীসটির সনদ সহীহ বলে প্রতিয়মান হয়।
[৪] সূরা হা মীম সাজদা (ফুস্সিলাত): ৩৩-৩৫ আয়াত।

হাযেরীন, মুমিনের দায়িত্ব আদেশ, নিষেধ ও অন্যায় বন্ধ করার চেষ্টা করা। শাস্তি দেওয়ার দায়িত্ব ব্যক্তি মুমিনের নয়। সুন্নাত থেকে আমরা জানতে পারি যে, শাস্তি ও বিচার রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও অধিকার। যেমন মদপান বা নেশার দ্রব্য গ্রহণ একটি কঠিন পাপ ও অন্যায়। ইসলামী শরীয়তে এর শাস্তি বেত্রাঘাত। যদি কোনো মুমিন কোথাও কাউকে মদপান বা নেশাগ্রহণ করতে দেখেন তাহলে তার দায়িত্ব হলো তা বন্ধ করার চেষ্টা করা। তিনি সম্ভব হলে তাকে শক্তি দিয়ে একাজ থেকে বিরত করবেন। না হলে তাকে বিরত হতে উপদেশ দিবেন। না হলে অন্তর দিয়ে ঘৃণা করবেন এবং এই পাপ বন্ধ হোক তা কামনা করবেন। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই তিনি মদপানকারীর বিচার করতে পারবেন না বা শাস্তি দিতে পারবেন না। বিচার ও শাস্তির জন্য ইসলামে নির্ধারিত প্রক্রিয়া রয়েছে। সাক্ষ্য, প্রমান, আত্মপক্ষ সমর্থন ইত্যাদি প্রক্রিয়ার বাইরে শাস্তি দেওয়ার অধিকার রাষ্ট্রপ্রধান বা বিচারকেরও নেই। কোর্ট যদি সঠিক বিচার না করে তাহলে কোর্ট দায়ী হবে। মুমিন সঠিক বিচারের জন্য দাওয়াত দিবেন। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই ব্যক্তি বা গোষ্ঠী আইন নিজের হাতে তুলে নিতে পারে না। বুখারী শরীফ, মুসনাদ আহমদ ও অন্যান্য গ্রন্থের হাদীস থেকে আমরা দেখি যে, খলীফা উমার (রা) ও অন্যান্য সাহাবী একমত হয়েছেন যে, যদি স্বয়ং রাষ্ট্র প্রধান বা প্রধান বিচারপতি কাউকে ব্যভিচার, মদপান বা অন্য কোনো পাপে লিপ্ত দেখতে পান, তাহলে তিনি তাকে নিষেধ করতে বা বাধা দিতে পারেন, কিন্তু শাস্তি দিতে পারেন না। শাস্তি দিতে হলে তাকে কোর্টে বিচারকের সামনে উপস্থিত করতে হবে। আমীরুল মুমিনীন বা প্রধান বিচারপতি সেখানে একজন সাক্ষী হবেন মাত্র।

হাযেরীন, অন্যায়কারীর গোপন অন্যায়ের প্রতিবাদ গোপনে করতে হবে। কোনো মানুষের ব্যক্তিগত দোষ, পাপ বা অন্যায় প্রকাশ করবেন না। বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বারংবার বলেছেন যে, যদি কেউ অন্য মানুষের ব্যক্তিগত দোষ গোপন করে তাহলে আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ গোপন রাখবেন। আজ আর সময় নেই। একটি মাত্র হাদীস শুনুন। সাহাবী উকবা ইবনু আমির (রা) মিশরের গভর্নর ছিলেন। তার কেরানী 'আবুল হাইসাম দুখাইন' বলেন, আমি উকবা (রা) কে বললাম, আমাদের কয়েকজন প্রতিবেশী মদপান করছে। আমি এখনি যেয়ে পুলিশ ডাকছি যেন তাদের ধরে নিয়ে যায়। উকবা বলেন, তুমি তা করো না। বরং তুমি তাদেরকে উপদেশ দাও এবং ভয় দেখাও।.... রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ مُؤْمِنٍ فَكَأَنَّمَا اسْتَحْيَا مَوْءُودَةً فِيْ قَبْرِهَا

"যে ব্যক্তি কোনো মুমিন ব্যক্তির দোষ গোপন করল, সে যেন জীবন্ত প্রেথিত একটি কন্যাকে তার কবর থেকে উঠিয়ে জীবন দান করল।"[১]

হাযেরীন, অন্যায়কারীর কাছে যেয়ে তাকে দাওয়াত দেওয়া ইবাদত, কিন্তু বিরক্তিকর ও কষ্টকর ইবাদত। পক্ষান্তরে দূর থেকে তার সত্য বা মিথ্যা দোষের কথা আলোচনা করা খুবই মজাদার কাজ। শয়তান ও নফসের কাছে খুবই প্রিয় কাজ। এজন্য নানা ওজুহাতে একে বৈধ বানাতে চায়। খবরদার! কোনোভাবে শয়তানের ক্ষপ্পরে পড়বেন না। অন্যায়কারীর অনুপস্থিতিতে তার অন্যায় বা পাপের কথা অন্যের কাছে বলা গীবত ও কঠিন হারাম। অন্যায়কারীকে আদেশ, নিষেধ বা দাওয়াত করুন। সম্ভব না হলে তার অন্যায়কে ঘৃণা করুন এবং দুআ করুন। অন্যায়কে অন্যায় বলুন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলুন। কিন্তু অন্যায়কারীরর অনুপস্থিতিতে তার নাম ধরে বা তাকে চিহ্নিত করে অন্য মানুষদের কাছে তার দোষের কথা বলা, উপহাস করা, খারাপ উপাধি প্রদান করা ইত্যাদি কুরআন নিষিদ্ধ কঠিন পাপ। এগুলি থেকে বিরত থাকতে হবে। আল্লাহ আমাদেরকে তার সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত করুন। আমীন।

---

[১] আহমদ, আল-মুসনাদ ৪/১৫৩; ইবনু হিব্বান, আস-সহীহ ২/২৭৫; হাইসামী, মাওয়ারিদুয যামআন ৫/৩৫-৩৮। হাদীসটি হাসান।

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

أَمَّا بَعْدُ، فَيَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي

مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِـالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِـيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ

وَقَالَ: كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّـةٍ أُخْرِجَـتْ لِلنَّـاسِ تَـأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ: مَـنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَـمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ.

بَارَكَ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ فِيْ الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ. وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ. أَقُـوْلُ قَـوْلِيْ هَـذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُـلِّ ذَنْـبٍ، فَاسْتَغْفِرُوْهُ وَتُوْبُوْا إِلَيْهِ، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.

শাওয়াল মাসের ৩য় খুতবা: জিহাদ ও সন্ত্রাস

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লী আলা রাসূলিহীল কারীম। আম্মা বাদ,

সম্মানিত উপস্থিতি, আজ শাওয়াল মাসের তৃতীয় জুমুআ। আজ আমরা জিহাদ ও সন্ত্রাস সম্পর্কে কিছু আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ। কিন্তু তার আগে আমরা এ সপ্তাহের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসগুলির বিষয়ে সংক্ষেপ আলোকপাত করি। হাযেরীন, আজ ইংরেজী ..... মাসের ..... তারিখ। এ সপ্তাহের দিবসগুলির মধ্যে রয়েছে ....।

হাযেরীন, ইসলামের অন্যতম ইবাদত "জিহাদ"। 'জিহাদ' অর্থ প্রচেষ্টা, পরিশ্রম, কষ্ট ইত্যাদি। আল্লাহর বিধান পালনের সকল প্রকার প্রচেষ্টাকেই আভিধানিকভাবে জিহাদ বলা হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ أَوْ أَمِيرٍ جَائِرٍ

"সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ হলো জালিম শাসক বা প্রশাসকের কাছে ইনসাফের কথা বলা।"[১]

أَفْضَلُ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ

"সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ হলো নেককর্মময়-পরোপকারময় হজ্জ বা হজ্জ মাবরূর।"[২]

الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ

"যে নিজ প্রবৃত্তির সাথে জিহাদ করে সেই মুজাহিদ।"[৩]

إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ

"কষ্ট সত্ত্বেও পরিপূর্ণ ওযূ করা, বেশি বেশি মসজিদে গমন করা এবং এক সালাতের পরে অন্য সালাতের অপেক্ষা করা, এই হলো জিহাদের প্রহরা।"[৪]

পিতামাতার খিদমতকে রাসূলুল্লাহ ﷺ জিহাদ বলে আখ্যায়িত করেছেন। বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য গ্রন্থে সংকলিত হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আগমন করে তাঁর সাথে জিহাদে অংশগ্রহণের অনুমতি প্রার্থনা করে। তিনি বলেন, তোমার পিতামাতা কি জীবিত আছেন? লোকটি বলে, হ্যাঁ। তিনি বলেন: فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ "তাহলে তুমি তাদেরকে নিয়ে জিহাদ কর।"[৫]

জিহাদের একটি বিশেষ পর্যায় হলো কিতাল। কিতাল অর্থ পারস্পরিক হত্যা বা যুদ্ধ। ইসলামী পরিভাষায় ও ইসলামী ফিক্‌হে যুদ্ধ বা কিতালকে জিহাদ বলা হয়। পারিভাষিকভাবে জিহাদ হলো শত্রুরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর সাথে মুসলিম রাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর যুদ্ধ। মুসলিম রাষ্ট্রের শত্রু সাধারণত "কাফির" বা "অমুসলিম" হয়। পারিভাষিক জিহাদ "ধর্মযুদ্ধ" বা "পবিত্র যুদ্ধ" নয় বরং এর অর্থ "রাষ্ট্রীয় যুদ্ধ"।

হাযেরীন, পারিভাষিক জিহাদ বা সশস্ত্র যুদ্ধের জন্য ইসলামে চারটি শর্ত আরোপ করা হয়েছে। প্রথম শর্ত হলো রাষ্ট্রের অস্তিত্ব। রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্বে ইসলামে জিহাদের অনুমতি প্রদান করে নি। রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ প্রচার বা দাওআতের মাধ্যমে দীন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালিয়ে যান এবং এভাবে এক পর্যায়ে মদীনা শরীফের অধিকাংশ মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তারা তাদের রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে গ্রহণ করেন। এভাবে সেখানে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। কাফিরগণ এ রাষ্ট্রকে গলাটিপে মেরে ফেলার জন্য চারিদিক থেকে যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়। তখন আল্লাহ যুদ্ধের অনুমতি প্রদান করে বলেন:

---

[১] তিরমিযী, আস-সুনান ৪/৪৭১; আবূ দাউদ, আস-সুনান ৪/১২৪; ইবনু মাজাহ, আস-সুনান ২/১৩২৯। হাদীসটি হাসান।
[২] বুখারী, আস-সহীহ ২/৫৫৩, ৩/১০২৬।
[৩] তিরমিযী, আস-সুনান ৪/১৬৫; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ১/৫৪। হাদীসটি সহীহ।
[৪] মুসলিম, আস-সহীহ ১/২১৯।
[৫] বুখারী, আস-সহীহ ৩/১০৯৪, ৫/২২২৮; মুসলিম, আস-সহীহ ৪/১৯৭৫।

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا

যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হলো তাদেরকে যারা আক্রান্ত হয়েছে; কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে।"[১]

হাযেরীন, এ আয়াত থেকে আমরা সশস্ত্র জিহাদ বা কিতালের দ্বিতীয় শর্ত জানতে পারছি, তা হলো আক্রান্ত বা অত্যাচারিত হওয়া। যখন মুসলিম রাষ্ট্র বা তার নাগরিকগণ অন্য কোনো রাষ্ট্র দ্বারা আক্রান্ত বা অত্যাচারিত হবেন, অথবা এরূপ হওয়ার নিশ্চিত সম্ভাবনা প্রকাশিত হবে তখনই কিতাল বৈধ হবে।

জিহাদের তৃতীয় শর্ত হলো রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমতি ও নেতৃত্ব। কোনো অবস্থাতেই কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী জিহাদের ঘোষণা বা অনুমিত প্রদান করতে পারে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

إِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ

"রাষ্ট্রপ্রধান হলেন ঢাল, যাকে সামনে রেখে কিতাল বা যুদ্ধ পরিচালিত হবে।"[২]

জিহাদের চতুর্থ শর্ত হলো, শুধু সশস্ত্র শত্রুযোদ্ধাদের সাথেই যুদ্ধ করতে হবে। আল্লাহ বলেন:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

"তোমরা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ কর তাদের সাথে যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করছে। কিন্তু সীমা লঙ্ঘন করবে না, আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীগণকে ভালবাসেন না।"[৩]

এ নির্দেশের মাধ্যমে ইসলাম যুদ্ধের নামে অযোদ্ধা লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করা, অযোদ্ধা মানুষদেরকে হত্যা করা ইত্যাদি রাষ্ট্রীয় বা গোষ্ঠীয় সকল সন্ত্রাসের পথ রোধ করেছে। এমনকি যোদ্ধা টার্গেটের বিরুদ্ধে সীমালঙ্ঘন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অন্যান্য আয়াতে শত্রুপক্ষ সন্ধির প্রস্তাব দিলে তা গ্রহণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: "যুদ্ধে তোমরা ধোঁকার আশ্রয় নেবে না, চুক্তিভঙ্গ করবে না, কোনো মানুষ বা প্রাণীর মৃতদেহ বিকৃত করবে না বা অসম্মান করবে না, কোনো শিশু-কিশোরকে হত্যা করবে না, কোনো মহিলাকে হত্যা করবে না, কোনো সন্ন্যাসী বা ধর্মজাযককে হত্যা করবে না, কোনো বৃদ্ধকে হত্যা করবে না, কোনো অসুস্থ মানুষকে হত্যা করবে না, কোনো জনপদ ধ্বংস করবে না, খাদ্যের প্রয়োজন ছাড়া গরু, উট বা কোনো প্রাণী বধ করবে না, যুদ্ধের প্রয়োজন ছাড়া কোনো গাছ কাটবে না...।[৪]

হাযেরীন, ইসলামে মানুষ হত্যা করা কঠিনতম পাপ। একটি মানুষের জীবন বাঁচাতে যেমন তার কোনো অঙ্গ সার্জারীর মাধ্যমে কেটে ফেলতে হয়, তেমনি মানব সমাজকে বাঁচাতে একান্ত বাধ্য হয়ে দুটি পথে মানুষ হত্যার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। প্রথমত বিচারের মাধ্যমে এবং দ্বিতীয়ত যুদ্ধের ময়দানে। এক্ষেত্রেও ইসলামের মূলনীতি হলো যথাসম্ভব হত্যা পরিহার করা। কারণ জিহাদের শর্তগুলি পূর্ণ না হওয়া সত্ত্বেও যদি কেউ জিহাদের নামে অস্ত্র ধারণ করে বা হত্যা করে তবে সে ব্যক্তি কঠিনতম পাপে লিপ্ত হলো। আর জিহাদের সকল শর্ত পূরণ হওয়ার পরেও যদি কেউ জীবনেও জিহাদ না করে তাহলে তার কোনো গোনাহ হবে না, শুধু জিহাদের মহান সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে। আল্লাহ বলেন:

لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلاًّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى ...

মুমিনদের মধ্যে যারা কোনো অসুবিধা না থাকা সত্ত্বেও (জিহাদ না করে) ঘরে বসে থাকে এবং

---

[১] সূরা (২২) হজ্জ: আয়াত ৩৯।
[২] বুখারী, আস-সহীহ ৩/১০৮০; মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৪৭১।
[৩] সূরা (২) বাকারা, আয়াত ১৯০।
[৪] বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা ৯/৯০

যারা আল্লাহর পথে নিজেদের প্রাণ ও সম্পদ দ্বারা জিহাদ করে তারা সমান নয়। যারা নিজেদের প্রাণ ও সম্পদ দ্বারা জিহাদ করে আল্লাহ তাদেরকে যারা ঘরে বসে থাকে তাদের উপর মর্যাদা দিয়েছেন। উভয় প্রকারের মুমিনকেই আল্লাহ কল্যাণের (জান্নাতের) প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ....।"[১]

হাযেরীন, ইসলামের আলো সহজেই মানুষকে আকৃষ্ট করে। ইসলামের সত্যকে মিথ্যা দিয়ে আড়াল করতে মিথ্যার পূজারীরা প্রতিনিয়ত চেষ্টা করছে। ১৯৭৯ সালের ১৬ই এপ্রিল টাইম ম্যাগাজিনে প্রকাশিত একটি আর্টিকেল উল্লেখ করেছিল যে, বিগত দেড় শত বৎসরে ইসলামের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্যে ৬০ হাজারেরও বেশি বই লেখা হয়েছে। এছাড়াও টেলিভিশন, সিনেমা, ইলেকট্রনিক গেম, ওয়েব সাইট ইত্যাদি অগনিত প্রচার মাধ্যমের দ্বারা ইসলামের বিরুদ্ধে যে সকল প্রপাগান্ডা চালানো হয় তার অন্যতম বিষয় হলো জিহাদ।

জিহাদ বিষয়ে অনেক মিথ্যা প্রপাগাণ্ডা চালানো হয়। যেমন বলা হয়, ধর্মই সকল হানাহানির মূল, ধর্মের নামেই রক্তপাত হয়েছে সবচেয়ে বেশি। কী জঘন্য মিথ্যাচার!! এ কথা সত্য যে, অনেক সময় ধর্মকে হানাহানির হাতিয়ার বানানো হয়, আবার অনেক সময় সত্য ও ন্যায়ের স্বার্থে ধর্ম যুদ্ধের অনুমতি দেয়। কিন্তু কখনোই ধর্মের নামে সবচেয়ে বেশি রক্তপাত হয় নি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, কমুনিষ্ট চীনের সাথে কমুনিষ্ট ভিয়েতনামের যুদ্ধ, আমেরিকার সাথে ভিয়েতনামের যুদ্ধ ইত্যাদি যুদ্ধে কোটি কোটি মানুষ মরেছে। কম্পূচীয়ায় খেমার রূজের হাতে লক্ষলক্ষ মানুষের ভয়ঙ্কর মৃত্যু, জোসেফ স্টালিনের নির্দেশে প্রায় সাড়ে তিন কোটি মানুষের হত্যা, মাওসেতুং-এর চীনে প্রায় দু কোটি মানুষের হত্যা, মুসোলিনির নির্দেশে ইটালির ৪ লক্ষ মানুষের মৃত্যু ও এরূপ অগণিত মানুষের হত্যা সবই কি ধর্মের নামে হয়েছে?

হাযেরীন, তারা বলে, ইসলামই জিহাদ বৈধ করেছে। এর চেয়ে বড় মিথ্যা আর কী হতে পারে। হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ মহাভারত ও রামায়ন পুরোটায় যুদ্ধ ও হানাহানি নিয়ে। গীতায় যুদ্ধের নির্দেশ রয়েছে। বাইবেলে বারংবার যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বাইবেলের যীশুখৃস্ট তার সকল শত্রুকে ধরে ধরে জবাই করতে নির্দেশ দিয়েছেন (লুক ১৯/২৭)। যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করে তিনি বলেন, আমি তরবারী নিয়ে এসেছি: Think not that I am come to send peace on earth: I came not to send peace, but a sword[2].

প্রকৃত সত্য কথা হলো পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থগুলি পুরোহিতদের অত্যাচারে বিকৃত হয়েছে ফলে এগুলির মধ্যে যুদ্ধের নামে নির্বিচারে গণহত্যার নির্দেশ পাওয়া যায়। বাইবেলে যুদ্ধের ক্ষেত্রে বেসামরিক মানুষ হত্যা, বাড়িঘর কৃষিক্ষেত ও প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংস করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, কোনো দেশ যুদ্ধ করে দখল করতে পারলে তার সকল পুরুষ অধিবাসীকে নির্বিচারে হত্যা করতে হবে এবং নারীদের ভোগের জন্য রাখতে হবে। আর সে দেশ যদি ইহূদীদের বসবাসের কোনো দেশ হয় তবে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল মানুষ এবং প্রাণী হত্যা করতে হবে।[৩] যদি কোনো মুসল্লী কষ্ট করে বাইবেলে যিহোশূয়ের পুস্তক (The Book of Joshua), বিচারকর্তৃগণের বিবরণ (The Book of Judges), শমুয়েলের পুস্তক (Books of Samuel), রাজাবলির (The Kings), বংশাবলি (The Chronicles) ইত্যাদি গ্রন্থ পাঠ করেন তবে বর্বর গণহত্যা, কল্পনাতীত নিপীড়ন, উন্মাদ ধ্বংসযজ্ঞের লোমহর্ষক ঘটনাবলি দেখবেন।

হাযেরীন, রাষ্ট্র থাকলেই রাষ্ট্রের ও নাগরিকদের সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য যুদ্ধের ব্যবস্থা থাকতেই হবে। তবে যুদ্ধকে যথাসম্ভব কম ধ্বংসাত্মক করতে হবে এবং সকল অযোদ্ধা মানুষ, দ্রব্য ও বস্তুকে যুদ্ধের আওতা থেকে মুক্ত রাখতে হবে। ইসলামে এ কাজটিই সর্বোত্তমভাবে করা হয়েছে। তাত্ত্বিকভাবে যেমন, তেমনি প্রায়োগিকভাবে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন যথাসম্ভব কম প্রাণহানি ঘটাতে। শুধু মুসলিম যোদ্ধাদের জীবনই নয়, উপরন্তু তিনি শত্রুপক্ষের যোদ্ধাদেরও প্রাণহানি

---

[১] সূরা নিসা: ৯৫ আয়াত।

[২] বাইবেল, মথি ১০/৩৪।

[৩] বাইবলে, গণনাপুস্তক ৩১/১৭-১৮; দ্বিতীয় বিবরণ ২০/১৩-১৬।

কমাতে চেয়েছেন। শুধু সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও আগ্রাসন প্রতিরোধের জন্য বাধ্য হয়ে তাঁকে যুদ্ধ করতে হয়েছে এবং তার সারাজীবনের সকল যুদ্ধে মুসলিম ও কাফির মিলে সর্বমোট মাত্র ১ হাজার আঠারো জন মানুষ নিহত হয়েছে। যে দেশে প্রতি মাসেই সহস্রাধিক মানুষ মারামারি করে খুন হতো, সে দেশে মাত্র সহস্র মানুষের জীবনের বিনিময়ে তিনি বিশ্বব্যাপী চিরস্থায়ী শান্তির ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন।

পক্ষান্তরে বাইবেলের এককে যুদ্ধেই ৪০/৫০ হাজার থেকে কয়েক লক্ষ "কাফির" হত্যার গৌরবময় বিবরণ লেখা হয়েছে। শুধু মুসলিমদের বিরুদ্ধেই নয়, ভিন্নমতাবলম্বী খৃস্টান ও ইহূদীদের বিরুদ্ধেও ক্রুসেড চালিয়েছেন খৃস্টান ধর্মগুরু পোপগণ এবং একেক যুদ্ধে লক্ষাধিক মানুষ হত্যা করেছেন। আপনারা যে কোনো এনসাইক্লোপীডিয়াতে ক্রুসেড (Crusade), এ্যালবিজেনসিয়ান ক্রুসেড (the Albigensian Crusade), সেন্ট বার্থলমিউস দিবসের গণহত্যা (Massacre of Saint Bartholomew's Day), ইনকুইজিশন (Inquisition), ধর্মের যুদ্ধ (The Wars of Religion) ইত্যাদি আর্টিকেল পড়লেই অনেক তথ্য জানতে পারবেন। যদিও আধুনিক এনসাইক্লোপীডিয়াতে বিষয়গুলিকে খুবই হালকা করা হয় এবং নিহতদের সংখ্যা কম করা হয়, তবুও যেটুক সত্য দেখবেন তাতেই গায়ের লোম শিউরে উঠবে! এ হলো ইহূদী-খৃস্টানদের এককেটি ধর্মযুদ্ধের অবস্থা। মহাভারত, গীতা বা রামায়ণের যুদ্ধেরও কাছাকাছি অবস্থা।

হাযেরীন, ইসলামের জিহাদের বিষয়ে আরেকটি বিভ্রান্তি হলো, মুসলিমরা ধর্মপ্রচার বা ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ করে বা ইসলাম তরবারীর জোরে প্রচারিত হয়েছে। এটি শুধু জঘন্য মিথ্যাই নয়, বরং প্রকৃত সত্যের সম্পূর্ণ বিপরীত তথ্য। বস্তুত বাইবেলে ধর্মের কারণে মানুষ হত্যার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বারংবার বিধর্মীদের উপাসনালয় ভেঙ্গে ফেলার, দেশের বিধর্মী নাগরিকদের দাওআতের নামে ডেকে এনে ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করার ও নিরিহ বির্ধমীদের ধরে হত্যা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।[1] ৩২৫ খৃস্টাব্দে বাইযেন্টাইন সম্রাট কনস্টানটাইন খৃস্টধর্মকে রাষ্ট্রধর্মের মর্যাদা দেন। সেদিন থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত খৃস্টান চার্চ, পোপ, প্রচারক ও রাষ্ট্রগুলির ইতিহাস হলো রক্তের ইতিহাস। অধার্মিকতা বা heresy দমনের নামে অথবা ধর্ম প্রচারের নামে পরধর্ম অসহিষ্ণুতা, পরধর্মের প্রতি বিষোদ্গার, জোরপূর্বক ধর্মান্তকরণ, অন্য ধর্মাবলম্বীদের হত্যা, নির্যাতন বা জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ করা খৃস্টান ধর্মের সুপরিচিত ইতিহাস।

পক্ষান্তরে ইসলামে শুধু রাষ্ট্রীয় সাবভৌমত্ব ও নাগরিকদের নিরাপত্তার জন্যই যুদ্ধ বৈধ করা হয়েছে, ধর্ম প্রচারের জন্য নয়। ইসলামে যুদ্ধের ময়দান ছাড়া কখনোই অমুসলিম হওয়ার কারণে কাউকে হত্যা করা হয় নি বা জোরপূর্বক মুসলিম বানানোর চেষ্টা করা হয় নি। আল্লাহ বলেছেন:

لاَ إِكْرَاهَ فِيْ الدِّيْنِ

"ধর্মের মধ্যে কোনো জোর যবরদস্তি নেই।"[2] রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا

"যদি কোনো ব্যক্তি মুসলিম রাষ্ট্রের মধ্যে বসবাসকারী অমুসলিম নাগরিক বা মুসলিম দেশে অবস্থানকারী অমুসলিম দেশের কোনো অমুসলিম নাগরিককে হত্যা করে তবে সে জান্নাতের সুগন্ধও লাভ করতে পারবেন না, যদিও জান্নাতের সুগন্ধ ৪০ বৎসরের দুরত্ব থেকে লাভ করা যায়।"[3]

যুইশ এনসাইক্লোপিডীয়া ও অন্য যে কোনো ইতিহাস বা বিশ্বকোষ থেকে আপনারা জানতে পারবেন যে, বিগত দেড় হাজার বছরে ইউরোপের সকল খৃস্টান দেশে ইহূদীদের উপর বর্বর অত্যাচার করা হয়েছে,

---

[1] বাইবেল, ১ রাজাবলি ১৮/৪০; ২ রাজাবলি ১০/১৮-২৮।

[2] সূরা বাকারা: ২৫৬ আয়াত।

[3] বুখারী, আস-সহীহ ৩/১১৫৫, ৬/২৫৩৩; মুসলিম, আস-সহীহ ৪/২২৭৮।

জোর পূর্বক তাদের ধর্মান্তরিত করা হয়েছে, নানভাবে তাদের সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। অথচ এ সময়ে মুসলিম দেশগুলিতে ইহূদীরা পরিপূর্ণ নাগরিক অধিকার নিয়ে বসবাস করেছে। আজ এ বর্বরতার অনুসারী ও উত্তরসূরীরা তাদের বর্বরতা ঢাকতে ইসলামের জিহাদকে সন্ত্রাস বলে অপ-প্রচার চালাচ্ছে।

প্রায় দেড় হাজার বৎসর ধরে মুসলিমগণ আরববিশ্ব শাসন করেছেন। সেখানে দেড় কোটিরও বেশি খৃস্টান ও কয়েক লক্ষ ইহূদী এখন পর্যন্ত বংশপরম্পরায় বসবাস করছে। ভারতে মুসলিমগণ প্রায় একহাজার বছর শাসন করেছেন, সেখানে প্রায় শতকরা ৮০ জন হিন্দু। অথচ খৃস্টানগণ যে দেশই দখল করেছেন, জোরযবরদস্তি করে বা ছলে বলে সেদেশের মানুষদের ধর্মান্তরিত করেছেন অথবা হত্যা ও বিতাড়ন করেছেন। ইসলাম যদি তরবারীর জোরেই প্রচারিত হবে তাহলে ইন্দোনেশিয়া বিশ্বের সর্ববৃহৎ ইসলামী দেশ হলো কি করে? সেখানে তো কোনো মুসলিম বাহিনী কখনোই যায় নি। বিগত অর্ধ শতাব্দি যাবৎ ইসলাম হলো The firstest growing religion বা সর্বাধিক বর্ধনশীল ধর্ম। ইউরোপ ও আমেরিকা-সহ সকল দেশের হাজার হাজার মানুষ ইসলাম গ্রহণ করছেন। কোন্ তরবারীর ভয়ে তারা ইসলাম গ্রহণ করছেন?

হাযেরীন, জিহাদ বিষয়ক অন্য বিভ্রান্তি হলো, জিহাদ ও সন্ত্রাসকে এক করা। সন্ত্রাস বা টেরোরিজম (terrorism)-কে সংজ্ঞায়িত করা কঠিন। এনসাইক্লোপিডীয়া ব্রিটানিকা ও অন্যান্য গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, অবৈধভাবে সহিংসতা ব্যবহার করে সরকার বা জনগণকে ভীত করে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করা হলো সন্ত্রাস। বৈধ ও অবৈধতা খুবই অস্পষ্ট। ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধারা ছিল দখলদারদের নিকট সন্ত্রাসী। বর্ণবাদী আফ্রিকার বিরুদ্ধে সংগ্রামের নেতা নেলসন ম্যান্ডেলা আমেরিকার দৃষ্টিতে ছিলেন সন্ত্রাসী। নেপালের মাওবাদীরা ছিল অন্যদের দৃষ্টিতে সন্ত্রাসী।

সন্ত্রাসের অন্য সংজ্ঞা হলো: premeditated, politically motivated violence perpetrated against noncombatant targets: রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে পূর্বপরিকল্পিতভাবে অযোদ্ধা লক্ষ্যের বিরুদ্ধে সহিংসতা।" ইসলাম এরূপ সন্ত্রাসের সকল পথ রুদ্ধ করেছে। যুদ্ধের জন্য রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমতি শর্ত করেছে। এছাড়া অযোদ্ধা লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত কঠিনভাবে নিষিদ্ধ ও হারাম করেছে। সর্বেপরি সন্ত্রাসের মূল কারণ হলো জুলুম এবং মাজলুমের বিচার পাওয়ার সুযোগ না থাকা। ইসলাম জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য ন্যায় বিচার ও ইনসাফ নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছে।

হাযেরীন, কিছু মুসলমান বিভিন্ন দেশে অযোদ্ধা ও নিরীহ মানুষ হত্যা করছে বা সন্ত্রাসের আশ্রয় নিচ্ছে বলে জানা যায়। এগুলিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রমাণিত নয়। সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসী ঘটনা আমেরিকার টুইন টাওয়ার ধ্বংস। বিন লাদেন বা তার বাহিনী তা করেছে বলে দাবি করে আমেরিকা এ দাবির ভিত্তিতে আফগানিস্তানের ও ইরাকের লক্ষ লক্ষ নিরীহ নিরস্ত্র অযোদ্ধা নারী-পুরুষ ও শিশুকে হত্যা করেছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনোভাবেই বিষয়টি প্রমাণ করতে পারেনি। উপরন্তু এ অভিযোগে আটক ব্যক্তিদের গুয়ান্তামো বে-তে সকল মানবাধিকার ও ন্যায় বিচারের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে বর্বর অত্যাচারের মাধ্যমে স্বীকারোক্তি গ্রহণের চেষ্টা করা হচ্ছে। বাহ্যত এদের বিরুদ্ধে মার্কিন জনগণ ও বিচারকদের সামনে পেশ করার মত গ্রহণযোগ্য কোনো প্রমাণ নেই বলেই এরূপ করা হচ্ছে বলে মনে হয়।

ভারতে, আমেরিকায় বা অন্যত্র কোনো সন্ত্রাসী ঘটনা হলেই প্রথমে মুসলিমদেরকে দায়ী করা হয় এবং প্রচার মাধ্যমে তা ফলাও করা হয়। পরবর্তী তদন্তে অনেক সময় এদের সম্পৃক্ততা প্রমাণ করা যায় না, অথবা প্রমাণিত হয় যে, অন্যরা তা করেছে। কিন্তু সাধারণত প্রচার মাধ্যমে তা ফলাও করা হয় না। এত কিছুর পরেও যদি মুসলিমদের নামে কথিত সন্ত্রাসী ঘটনাগুলিকে সত্য বলে মেনে নেওয়া হয় তবে তা বিশ্বের সকল সন্ত্রাসী ঘটনার কত পারসেন্ট? ১ বা ২ পারসেন্টও নয়। যে কোনো এনসাইক্লোপীডিয়া বা ওয়েবসাইটে সন্ত্রাসের ইতিহাস পাঠ করুন। দেখবেন সন্ত্রাসের উৎপত্তি ও বিকাশে মুসলমানদের অবদান

খুবই কম। মানব ইতিহাসে প্রাচীন যুগের প্রসিদ্ধতম সন্ত্রাসী কর্ম ছিল উগ্রপন্থী ইহূদী যীলটদের (Zealots) সন্ত্রাস। আধুনিক ইতিহাসে ভারতে, ইউরোপে ও অন্যান্য দেশে অগণিত সন্ত্রাসী দল ও সন্ত্রাসী ঘটনা পাবেন। এদের প্রায় সকলেই ইহূদী, খৃস্টান, হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী বা মাওবাদী বা সমাজতন্ত্রী।

আসাম, মনিপুর, মিজোরাম, বিহার, শ্রীলঙ্কা, আয়ারল্যান্ড, স্পেন, ফ্রান্স বা অন্য কোনো স্থানের হিন্দু, খৃস্টান, বৌদ্ধ, ক্যাথলিক, প্রটেসট্যান্ট বা অন্য ধর্মের সন্ত্রাসীদের বিষয়ে তাদের ধর্ম উল্লেখ করা হয় না বা ধর্মকে দায়ী করা হয় না। কিন্তু কোথাও কোনো মুসলিম এরূপ করলে তার ধর্মকে দায়ী করা হয়। ধর্মের নামে ধর্মীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য ইহূদীরা সন্ত্রাস করে অগণিত নিরস্ত্র মানুষ হত্য কারেছে। এদেরকে তখন সন্ত্রাসীও বলা হয়েছে। পরে তাদেরকে শান্তির জন্য নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কখনোই তো তাদের ধর্মকে দায়ী করা হয় নি। ধর্মের নামে ধর্মগ্রন্থের প্রেরণায় উদ্বদ্ধ হয়ে মেনাহেম বেগিনের নেতৃত্বে ১৯৪৬ সালে যেরুশালেমের কি ডেভিড হোটেলে বোমা হামলা চালিয়ে ইরগুন যাভি লিয়াম (the Irgun Zvai Le'umi: National Military Organization) নামক এক ইহূদী সন্ত্রাসী জঙ্গি সংগঠন নিরস্ত্র শিশু ও মহিলা সহ আরব, বৃটিশ ও ইহূদী শতাধিক মানুষকে হত্যা করা করে এবং আরো অনেক মানুষ আহত হয়। এনকার্টা এনসাইক্লোপীডিয়ার এ ঘটনাকে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ-জমকালো সন্ত্রাসী ঘটনা (The most spectacular terrorist incident) এবং বিংশ শতাব্দীর ভয়ঙ্করতম সন্ত্রাসী ঘটনা (the most deadly terrorist incidents of the 20th century) বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। সেই সন্ত্রাসী মেনাহেম বেগিন ইসরাঈলের প্রধানমন্ত্রী হয়েছে এবং তাকে শান্তিতে নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয়েছে। সর্বোপরি এজন্য কখনোই ইহূদী ধর্মকে দায়ী করা হয় নি। ১৯৯৫ সালে আমেরিকার ওকলাহোমা সিটির (Oklahoma City) ফেডারেল বিল্ডিং-এ গাড়িবোমা হামলা করে প্রায় ২০০ নারী, পুরুষ ও শিশুকে হত্যা করা হয়। প্রথমেই এজন্য মুসলিমদের দায়ী করা হয়েছিল। পরে জানা গেল খৃস্টান ধর্মীয় উগ্রপন্থীরা কাজটি করেছিল। আপনার হেট গ্রুপ বিষয়ক আর্টিকেল পড়লে এরূপ অনেক তথ্য পাবেন। কখনোই এদের ধর্মকে এদের সন্ত্রাসের জন্য দায়ী করা হয় নি। অথচ কোনো মুসলিম যদি স্বাধীনতা সংগ্রামেও রত হন তবে ইসলামী সন্ত্রাসকে দায়ী করা হয়।

হাযেরীন, কিছু মুসলিমও জিহাদ সম্পর্কে বিভ্রান্তিতে আক্রান্ত। আলী (রা)-এর সময়ে খারিজী সম্প্রদায়ের মাধ্যমে জিহাদ বিষয়ক বিভ্রান্তির শুরু। উগ্রতা ও বাড়াবাড়ি ছিল তাদের বিভ্রান্তির মূল। পাপের কারণে তারা ব্যক্তি মুসলিমকে এবং মুসলিম রাষ্ট্রকে কাফির বলত। জিহাদের ফযীলত বিষয়ক আয়াত ও হাদীসের অপব্যাখ্য করে এবং কুরআন ও হাদীসে উল্লেখিত জিহাদ বিষয়ক শর্তগুলি অস্বীকার করে তারা জিহাদকে ফরয আইন ও বড় ফরয বলে দাবি করত। অন্যায়ের প্রতিবাদের নামে তারা আইন ও বিচার নিজের হাতে তুলে নিত। কুরআন ও হাদীসে কতিপয় বক্তব্য দিয়ে তারা এগুলি বলত। তাদের মতের বিরুদ্ধে সকল আয়াত ও হাদীস ব্যাখ্যা করে বাতিল করত। জিহাদের নামে রাষ্ট্রদ্রোহিতায় লিপ্ত হতো। অথচ বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বারংবার বলেছেন যে, জালিম বা পাপী শাসকদের অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে হবে বা ঘৃণা করতে হবে, তবে সুস্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন কুফরী প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় আনুগত্য পরিত্যাগ করা যাবে না। কোনো অবস্থাতেই আইন নিজের হাতে নেওয়া যাবে না। এক হাদীসে তিনি বলেন:

إِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلاَتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ وَلاَ تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ

"যখন তোমরা তোমাদের শাসক-প্রশাসকগণ থেকে এমন কিছু দেখবে যা তোমরা অপছন্দ কর, তখন তোমরা তার কর্মকে অপছন্দ করবে, কিন্তু তার আনুগত্য থেকে হাত গুটিয়ে নিবে না।"[1] মহান আল্লাহ আমাদেরকে ইসলাম সম্পর্কে সহীহ জ্ঞান দান করুন এবং উগ্রতা থেকে রক্ষা করুন। আমীন।

---

[1] মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৪৮১।

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّه نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِه وَأَصْحَابِه وَسَلَّمَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

أَمَّا بَعْدُ، فَيَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ، قَالَ اللهُ تَعَالىَ: وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ

الْمُعْتَدِينَ

وقال: لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِـــي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِـــأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُـــسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَـــى الْقَاعِـــدِينَ دَرَجَةً وَكُلاًّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى ...

وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ

بَارَكَ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ فِيْ الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ. وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ. أَقُــوْلُ قَــوْلِيْ هَــذا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُــلِّ ذَنْــبٍ، فَاسْتَغْفِرُوْهُ وَتُوْبُوْا إِلَيْهِ، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.

শাওয়াল মাসের ৪র্থ খুতবা: স্বাধীনতা ও বিজয়

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লী আলা রাসূলিহীল কারীম। আম্মা বাদ,

সম্মানিত উপস্থিতি, আজ শাওয়াল মাসের ৪র্থ জুমুআ। আজ আমরা আমাদের স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস সম্পর্কে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ। কিন্তু তার আগে আমরা এ সপ্তাহের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসগুলির বিষয়ে সংক্ষেপ আলোকপাত করি। হাযেরীন, আজ ইংরেজী ..... মাসের ..... তারিখ। এ সপ্তাহের দিবসগুলির মধ্যে রয়েছে .... ।

হাযেরীন, আল্লাহ মানুষের জীবনে জাগতিক যত নেয়ামত প্রদান করেছেন তার অন্যতম নেয়ামত স্বাধীনতা। আমাদের স্বাধীনতার সাথে জড়িত অন্যতম দিবসগুলি হলো ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস এবং ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস। কুরআন ও হাদীসের আলোকে স্বাধীনতা ও বিজয় উপলক্ষে আমাদের দায়িত্বের বিষয়ে আমরা আজ আলোচনা করব। হাযেরীন, মহান আল্লাহ সকল মানুষকে সমান করে সৃষ্টি করেছেন। ধর্ম, বর্ণ, অঞ্চল বা অন্য কোনো কারণে কোনো জনগোষ্ঠীকে তাদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করার বা শোষণ করার অধিকার কারো নেই। জুলুম, বঞ্চনা বা শোষণ থেকে আত্মরক্ষা করা এবং নিজের অধিকার আদায় করার জন্য সক্রিয় ও সচেষ্ট হওয়া মুমিনের দায়িত্ব ও অধিকার বলে কুরআন কারীমের ঘোষণা করা হয়েছে। মুমিনদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন:

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ

"এবং যারা অত্যাচারিত হলে প্রতিরোধ করেন।"[১]

এখানে আরবীতে "ইনতিসার" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যার অর্থ নিজেকে সাহায্য করা, জুলুম প্রতিরোধ করা জালিমের উপর বিজয়ী হওয়া বা নায়সঙ্গত প্রতিশোধ গ্রহণ করা। হাদীসের আলোকে আমরা জানতে পারি যে, নিজের অধিকার, প্রাপ্য, সম্পদ বা প্রাণ রক্ষা করতে যদি কেউ নিহত হন তবে তিনি শহীদ বলে গণ্য হন। সাঈদ ইবনু যাইদ (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ أَوْ دُونَ دَمِهِ أَوْ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ.

"নিজের সম্পদ রক্ষা করতে যেয়ে যে নিহত হয় সে শহীদ, নিজের পরিবার-পরিজন রক্ষা করতে যে নিহত হয় সে শহীদ, নিজের প্রাণ বা ধর্ম রক্ষা করতে যে নিহত হয় সে শহীদ।"[২]

অন্য হাদীসে ইবনু আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুলল্লাহ ﷺ বলেছেন:

مَنْ قُتِلَ دُونَ مَظْلَمَتِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

"যে ব্যক্তি নিজের অধিকার রক্ষা করতে নিহত হয় সে শহীদ।"[৩]

অন্য হাদীসে সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

نِعْمَ الْمِيتَةُ أَنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ دُونَ حَقِّهِ

"ব্যক্তি নিজের অধিকার বা হক্ক প্রতিষ্ঠা বা রক্ষা করতে মৃত্যুবরণ করে তার মৃত্যু খুবই ভাল মৃত্যু।"[৪]

সম্মানিত উপস্থিতি, মহান আল্লাহ আমাদেরকে স্বাধীনতার নেয়ামত দান করেছেন। এ স্বাধীনতার ইতিহাস দীর্ঘ। অতি প্রাচীন যুগ থেকেই বাংলাদেশে একটি শক্তিশালী অনার্য বা দ্রাবিড় জনগোষ্ঠী

---

[১] সূরা শূরা: ৩৯ আয়াত।

[২] তিরমিযী, আস-সুনান ৪/৩০; আবু দাউদ, আস-সুনান ৪/২৪৬। হাদীসটি সহীহ। সমার্থক হাদীস দেখুন: বুখারী ২/৮৭৭; মুসলিম ১/১২৪।

[৩] নাসাঈ, আস-সুনান ৭/১১৬, ১১৭; হাইসামী, মাজামউয যাওয়ায়িদ ৬/২৪৪; আলবানী, সহীহুত তারগীব ২/৭৬। হাদীসটির সনদ সহীহ।

[৪] আহমদ, আল-মুসনাদ ১/১৮৪; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৬/২৪৪। হাদীসটির সনদের রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।

বসবাস করত। অনেক গবেষক এদেরকে নূহ (আ)-এর পুত্র সামের বংশধর 'আবূ ফীরের" বংশধর বলে গণ্য করেছেন। আবূ ফীরের নামই বিকৃত হয়ে দ্রাবীড় রূপ ধারণ করে বলে তারা দাবি করেছেন। খৃস্টপূর্ব সময়ের প্রাচীন গ্রীক ও ল্যাটিন ইতিহাসে এদেরকে "গঙ্গারিডাই" (*Gangaridae*) বলা হয়েছে এবং এদের শক্তি ও সভ্যতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এরা ছিলেন অনার্য এবং ভারতের হিন্দুধর্মের প্রবর্তক আর্য ব্রাহ্মণদের শত্রু। এদের ধর্ম, সভ্যতা ও কৃষ্টি ছিল আর্যদের থেকে পৃথক। এজন্য মহাভারত ও পুরাণে বাঙালীদেরকে ম্লেচ্ছ, সর্প, দাস, অসুর ইত্যাদি বলা হয়েছে।

পরবর্তী কালে আর্যরা ক্রমান্বয়ে এদেশ দখল করে। তবে বাংলার সাধারণ মানুষদের সাথে তাদের দূরত্ব থেকে যায়। বিশেষত বর্ণবাদী হিন্দু ধর্মের রীতি অনুসারে সাধারণ বাঙালী অচ্ছুৎ, অস্পৃশ্য নিম্নজাতি বলে গণ্য হতেন। এদের ভাষাও আর্যদের কাছে নিন্দিত ছিল। নবম খৃস্টীয় শতকে বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার লাভ করে। নবম খৃস্টীয় শতকে সেন বংশের শাসকগণ বাংলায় গোঁড়া হিন্দু বর্ণবাদী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন এবং বৌদ্ধদের উপর অত্যাচার করেন। এ সময়ে এদেশে অনেক মুসলিম ওলী-আউলিয়ার আগমন ঘটে। অনেক বাঙালী এদের হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। ১২০৪ খৃস্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মাদ বখতিয়ার বাংলায় প্রথম স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করেন। ক্রমান্বয়ে বাংলায় অনেক স্বাধীন মুসলিম সুলতান রাজত্ব করেন। মাঝে মাঝে দিল্লীর কেন্দ্রীয় শাসনের অধীন হলেও, অধিকাংশ সময় বাংলা স্বাধীন ছিল। অনার্য "গঙ্গারিডাই" জাতি আর্য ধর্ম প্রত্যাখ্যান করে দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। পাশাপাশি অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের সাথে সৌহার্দ ও শান্তিতে বসবাস করেন।[১]

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রে ১৭৫৭ খৃস্টাব্দের ২৩শে জুন পলাশীর যুদ্ধে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়। মুসলিম প্রধান পূর্ববঙ্গের মানুষদেরকে অধিকতর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক সুযোগ দানের জন্য ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর বৃটিশ শাসকরা বাংলা ভেঙ্গে পূর্ব বাংলা ও আসাম রাজ্য গঠন করে এবং ঢাকা পূর্ববাংলার রাজধানী হয়। এতে পূর্ব বাংলা বা বর্তমান বাংলাদেশের জনগণের জন্য অধিকার লাভের সুযোগ ঘটে। কিন্তু উগ্র ভারতীয় জাতীয়তাবাদী হিন্দু নেতৃবৃন্দ বাংলা মায়ের খণ্ডিতকরণ রোধে "বন্দেমাতরম" বা "মা তোমার বন্দান বা পূজা করি" শ্লোগান দিয়ে জোরালো আন্দোলন করেন। একপর্যায়ে তারা সন্ত্রাস ও উগ্রতার পথ বেছে নেন। ৩০ শে এপ্রিল ১৯০৮ সালে ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী বড়লাটকে লক্ষ্য করে বোমা ছোড়ে। পরে প্রফুল্ল আত্মহত্যা করে এবং ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়। এক পর্যায়ে ১৯১১ সালে বৃটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গ রদ করে। তবে এ বঙ্গভঙ্গের ধারাবাহিকতাতেই পূর্ববঙ্গের মুসলিম প্রধান বাঙালী জনগোষ্ঠী রাজনীতিতে সক্রিয় হয়ে ওঠেন তার ধারাবাহিকতায় ১৯৪৭ সালে আমরা বৃটিষ উপনিবেশের অধীনতা থেকে স্বাধীনতা লাভ করি। পরবর্তীতে পাকিস্তানী শাসকবর্গের শোষণ, বঞ্চনা ও জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ধারায় এদেশের মানুষ ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভ করে। পাকিস্তানের মাধ্যমে অর্জিত ভৌগলিক সীমারেখার মধ্যেই আমরা স্বাধীনতা লাভ করি। ১৯৪৭ সালে সে স্বাধীনতার শুরু হয়েছিল ১৯৭১ সালে সে নিয়ামত পূর্ণতা লাভ করে।

সম্মানিত উপস্থিতি, এ নেয়ামতের প্রতি আমাদের বহুমুখি দায়িত্ব রয়েছে। প্রথম দায়িত্ব আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। যে কোনো নেয়ামতের স্থায়িত্বের এবং বৃদ্ধির প্রথম শর্ত মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ। মহান আল্লাহ বনী ইসরাঈলদেরকে ফেরাউনের শোষণ ও নিপীড়ন থেকে স্বাধীনতা প্রদান করেন। এ কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন:

---

[১] বাংলাপিডিয়া দেখুন এবং আখতার ফারুকের বাঙ্গালীর ইতিকথা পড়ুন।

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

"এবং যখন তোমাদের প্রতিপালক ঘোষণা করেন, তোমরা কৃতজ্ঞ হলে আমি অবশ্যই তোমাদেরকে বাড়িয়ে দিব। আর অকৃতজ্ঞ হলে অবশ্যই আমার শাস্তি হবে কঠোর।"[১]

নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কয়েকটি পর্যায় রয়েছে। প্রথম পর্যায় হলো সর্বান্তকরণে এ নেয়ামত উপলব্ধি করা। মানবীয় প্রকৃতির একটি দুর্বল দিক যে, আল্লাহর নেয়ামত লাভ করার পরে তা নিজেদের যোগ্যতায় অর্জিত বলে দাবি করা। মহান আল্লাহ্ বলেন:

فَإِذَا مَسَّ الإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ

"যখন কষ্ট-দৈন্য মানুষকে স্পর্শ করে তখন সে আমাকে ডাকে। অতঃপর যখন আমি তাকে কোনো নিয়ামত প্রদান করি তখন সে বলে, 'আমি তো তা লাভ করেছি নিজের জ্ঞানের মাধ্যমে।' বস্তুত এ একটি পরীক্ষা, কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না।"[২]

হাযেরীন, জীবনের সকল নিয়ামত ও সফলতাই মহান আল্লাহর দান। আবার প্রত্যেক নিয়ামত, সৌভাগ্য ও সফলতার পিছনে ব্যক্তির নিজের ও অন্য অনেক মানুষের অবদান থাকে। সকলের অবদানের স্বীকৃতি অত্যাবশ্যকীয়। তবে আমাদের সুদৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হবে যে, নিজের যোগ্যতা, শ্রম বা অন্যান্য সকলের কষ্ট সবই ব্যর্থ হতো যদি আল্লাহর দয়া না হতো। স্বাধীনতার কথাই ভাবুন। আমাদের চোখের সামনে স্বাধীনতার জন্য বিশ্বের অনেক জনগোষ্ঠী যুগযুগ ধরে সংগ্রাম করছেন, আত্মাহুতি দিচ্ছেন,.সশস্ত্র সংগ্রাম ও প্রতিরোধ চালিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু স্বাধীনতা লাভ করতে পারছেন না। অথচ আল্লাহ্ সীমিত সময়ের মধ্যে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সফলতা দান করেছেন। আমাদরেকে হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে হবে যে, এ সফলতা একান্তভাবেই আল্লাহর দান। এ উপলব্ধি না থাকা বা নেয়ামতটি নিজেদের ত্যাগ, কষ্ট বা বুদ্ধি-কৌশলের মাধ্যমেই অর্জিত বলে বিশ্বাস করার অর্থ মহান আল্লাহর প্রতি কঠিনতম অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। আর মহান আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন যে, অকৃতজ্ঞতার শাস্তি বড় কঠিন।

মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দ্বিতীয় পর্যায় হৃদয়, মন ও মুখ দিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। উপরের উপলব্ধি থেকেই প্রকাশ আসে। নিজেদের সকল আলোচনা, বক্তব্য ও কর্মের মাধ্যমে আমাদের সদা সর্বদা মহান আল্লাহর এ নেয়ামতের কথা স্মরণ ও প্রকাশ করতে হবে।

হাযেরীন, আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অংশ হলো যে সকল মানুষের মাধ্যমে নেয়ামত অর্জিত হয়েছে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, তাদের অবদানের কথা স্মরণ ও আলোচনা করা, তাদের প্রশংসা করা এবং তাদের জন্য দোয়া করা। এ বিষয়ে কয়েকটি হাদীস শুনুন:

مَنْ لَمْ يَشْكُرْ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرْ اللَّهَ. وفي لفظ: إِنَّ أَشْكَرَ النَّاسِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَشْكَرُهُمْ لِلنَّاسِ

"যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ নয় সে আল্লাহর প্রতিও অকৃতজ্ঞ।" অন্য বর্ণনায়: "সেই আল্লাহর প্রতি সবচেয়ে বেশি কৃতজ্ঞ যে মানুষের প্রতি সবচেয়ে বেশি কৃতজ্ঞ।"[৩]

وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ

---

[১] সূরা ১৪-ইবরাহীম ৭ আয়াত

[২] সূরা ৩৯-যুমার: ৪৯ আয়াত।

[৩] তিরমিযী, আস-সুনান ৪/৩৩৯; আহমদ, আল-মুসনদা ৫/২১২; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৮/১৮০-১৮১।হাদীসটি সহীহ।

"যদি কেউ তোমাদের কোনো উপকার করে তবে তাকে প্রতিদান দিবে। প্রতিদান দিতে না পারলে তার জন্য এমনভাবে দুআ করবে যেন তোমরা অনুভব কর যে, তোমরা তার প্রতিদান দিয়েছ।"[১]

مَنْ أُعْطِيَ عَطَاءً فَوَجَدَ فَلْيَجْزِ بِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُثْنِ بِهِ فَمَنْ أَثْنَى بِهِ فَقَدْ شَكَرَهُ وَمَنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ

"কাউকে যদি কিছু প্রদান করা হয় তবে সে যেন তাকে প্রতিদান দেয়। যদি প্রতিদান দিতে না পারে তবে সে যেন তার গুণকীর্তন ও প্রশংসা করে। যে ব্যক্তি উপকারীর গুণকীর্তন ও প্রশংসা করল সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল। আর যে উপকারীর উপকারের কথা গোপন করল সে অকৃতজ্ঞ।[২]

مَنْ أُتِيَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَلْيُكَافِئْ بِهِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَذْكُرْهُ فَمَنْ ذَكَرَهُ فَقَدْ شَكَرَهُ

"যদি কাউকে কোনোভাবে উপকার করা হয় তবে সে যেন উপকারকারীকে প্রতিদান দেয়। যদি প্রতিদান দিতে না পারে তবে সে যেন তার কথা স্মরণ করে ও উল্লেখ করে, এতে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হবে।"[৩]

কোনো অমুসলিম কাফির কোনো কল্যাণ করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন, প্রশংসা করতেন এবং তাকে যথাযোগ্য মর্যদার সাথে স্মরণ করতেন।

এ সকল হাদীসের আলোকে আমরা বুঝতে পারি যে, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, দল, মত নির্বিশেষে স্বাধীনতা অর্জনের পিছনে যাদেরই অবদান রয়েছে তাদের সকলের প্রতি ব্যক্তিগত ও জাতীয়ভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, তাদের অবদানের সঠিক তথ্য উল্লেখ করা, স্মরণ করা, আলোচনা করা, লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণ করা, তাদের মধ্যে যারা জীবিত রয়েছেন তাদের প্রতিদান প্রদানের চেষ্টা করা ও তাদের কল্যাণের জন্য দুআ করা এবং তাদের মধ্যে যারা তাওহীদ ও রিসালাতের ঈমান নিয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন বলে আশা করা যায় তাদের জন্য আখিরাতের মুক্তি ও কল্যাণের দুআ করা আমাদের ঈমানী ও দীনী দায়িত্ব। পূর্ববর্তী বা পরবর্তীকালে সৃষ্ট কোনো মতভেদ, দলভেদ, শত্রুতা বা অন্য কোনো কারণে কারো অবদান অস্বীকার করা, গোপন করা বা অবমূল্যায়ন করা কঠিন পাপ ও আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞতার অপরাধ, যা আমাদের ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে আল্লাহর শাস্তি এবং আখিরাতের অকল্যাণ বয়ে আনবে।

হাযেরীন, স্বাধীনতার এ নিয়ামত বা সৌভাগ্যের প্রতি আমাদের অন্যতম দায়িত্ব তা সংরক্ষণ করতে সচেষ্ট থাকা। আমারা দেখেছি যে, আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতায় নেয়ামত স্থায়িত্ব ও বৃদ্ধি লাভ করে এবং অকৃতজ্ঞতায় তা ধ্বংস হয়। আর মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের চূড়ান্ত পর্যায় হলো, আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতকে তাঁর সন্তুষ্টির পথে ব্যবহার করা। জীবনের প্রতিটি নেয়ামতকেই আল্লাহর নির্দেশিত ও তাঁরই সন্তুষ্টির পথে ব্যবহার করতে হবে। যেমন, সুস্থতাকে ইবাদত ও সেবায়, সম্পদকে মানব সেবায়, ক্ষমতাকে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনে ব্যবহার করাই মহান আল্লাহর প্রতি প্রকৃত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। স্বাধীনতার নেয়ামতকে এভাবে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণমুখি সেবা ও উন্নয়নের জন্য ব্যবহার করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন:

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ

আমি যদি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করি তবে তারা সালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, ন্যায়কাজে আদেশ করে এবং অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করে।[৪]

---

[১] আবূ দাউদ, আস-সুনান ২/১২৮, ৪/৩২৮; নাসাঈ, আস-সুনান ৫/৮২; আলবানী, সহীহুত তারগীব ১/২০৮, ২৩৪। হাদীসটি সহীহ।
[২] আবূ দাউদ, আস-সুনান ৪/২৫৫; তিরমিযী, আস-সুনান ৪/৩৭৯; আলবানী, সহীহুত তারগীব ১/২৩৪। হাদীসটি হাসান।
[৩] আহমদ, আল-মুসনাদ ৬/৯০; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৮/১৮১। হাদীসটির সনদ মোটামুটি গ্রহণযোগ্য বলে প্রতীয়মান হয়।
[৪] সূরা ২২-হাজ্জ, ৪১ আয়াত।

এখানে আল্লাহ স্বাধীনতা বা প্রতিষ্ঠা লাভকারীদের জন্য চারটি মৌলিক দায়িত্বের কথা উল্লেখ করেছেনঃ প্রথমত, সালাত কায়েম করা। সালাতের মাধ্যমেই ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে আল্লাহর ভয়, আখিরাতে জবাবদিহিতার সচেতনতা, নৈতিক মূল্যবোধ ও দুর্নীতির প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করা সম্ভব।

দ্বিতীয়ত, যাকাত প্রদান করা। সম্পদের বৈষম্য, সচ্ছল ও অভাবী মানুষদের মধ্যকার দূরত্ব ও বিদ্বেষ এবং দারিদ্র্য দূরীভূত করে পারস্পরিক সহমর্মিতামূলক মানব সমাজ গঠনে যাকাতের চেয়ে বড় মাধ্যম আর কিছুই নেই।

তৃতীয় ও চতুর্থ ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ, তথা দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন। বস্তুত, সমাজের অধিকাংশ মানুষই সততা পছন্দ করেন এবং ঝামেলা, দুর্নীতি, অন্যায় ও জুলমু থেকে দুরে থাকতে চান। কিন্তু সমাজে যদি আইনের শাসন না থাকে, দুষ্ট ব্যক্তি তার অন্যায় কর্মের শাস্তি না পেয়ে অন্যায়ের মাধ্যমে লাভবান হতে থাকেন, সৎ ও যোগ্য ব্যক্তি তার যোগ্যতার মূল্যায়ন ও পুরস্কার না পান তবে সে সমাজের সাধারণ মানুষের মধ্যে হতাশা ও দুর্নীতি মুখিতা সৃষ্টি হয়। আর দেশ ও সমাজের ধ্বংসের এটি বড় পথ। এজন্য স্বাধীনতা লাভকারী জনগোষ্ঠীর অন্যতম দায়িত্ব সমাজের সর্বস্তরে আইনের শাসন, ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধের শক্তিশালী ধারা তৈরি করা। এটি সকল নাগরিকের দায়িত্ব। এ বিষয়ে অবহেলা করা, অবহেলার পরিবেশ তৈরি করা বা অবহেলা মেনে নেওয়া সবই আমাদেরকে জাগতিক ক্ষতি ও আখিরাতের শাস্তির মুখোমুখি করবে। ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধের স্তর, পর্যায়, গুরুত্ব ও দায়িত্ব সম্পর্কে আমরা শাওয়ালের দ্বিতীয় খুতবায় আলোচনা করেছি।

সম্মানিত উপস্থিতি, মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেনঃ

إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

"কোনো জাতি যতক্ষণ না তাদের অবস্থার পরিবর্তন করে ততক্ষণ আল্লাহ তাদের অবস্থার পরিবর্তন করেন না।"[১]

কাজেই আমাদেরকে আমাদের অবস্থা পরিবর্তনের জন্য সচেষ্ট হতে হবে। শিক্ষা, কর্ম, সততা, দায়িত্ববোধ ইত্যাদির মাধ্যমে জাতির উন্নয়নের চেষ্টা করতে হবে। এভাবে আমরা আল্লাহর রহমত লাভে সক্ষম হবো। জাগতিক উন্নতি ও বরকত লাভের জন্য আল্লাহ দুটি বিষয় অর্জনের কথা বলেছেনঃ

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ

"যদি কোনো জনপদের মানুষ ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত তবে আমি তাদের জন্য আকাশ ও পৃথিবীর বরকতসমূহ উন্মুক্ত করে দিতাম।"[২]

আমরা ইতোপূর্বে ঈমান ও বিশ্বাসের অর্থ আলোচনা করেছি। আর তাকওয়া হলো আল্লাহর অসন্তুষ্টি থেকে আত্মরক্ষার অনুভূতি। দুর্নীতি, অসততা, অবৈধ উপার্জন, মানুষের ক্ষতি, জনগণের বা রাষ্ট্রের সম্পদ অপব্যবহার বা অপচয়, মানুষের অধিকার নষ্ট করা, অশ্লীলতা, মাদকতা ও অন্যান্য সকল হারাম কর্ম বর্জন করা এবং সকল ফরয ইবাদত ও দয়িত্ব পালন করাই তাকওয়া। এ বিষয়ে অবহেলা যদি ব্যপকতা লাভ করে তবে স্বাধীনতা বিপন্ন হয়, বিজাতীয় শত্রুতরা জাতীয় সম্পদ লুণ্ঠন করে এবং জাগতিক শাস্তি ও কষ্ট পাওনা হয় বলে হাদীস শরীফে বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

---

[১] সূরা ১৩-রা'দঃ ১১ আয়াত।

[২] সূরা ৭-আ'রাফঃ ৯৬ আয়াত।

لَمْ تَظْهَرْ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا إِلا فَشَا فِيهِمْ الطَّاعُونُ وَالأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلافِهِمْ الَّذِينَ مَضَوْا وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَئُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنْ السَّمَاءِ وَلَوْلا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ

"যখন কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে অশ্লীলতা এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ে যে তারা প্রকাশ্যে অশ্লীলতায় লিপ্ত হতে থাকে, তখন তাদের মধ্যে এমন সব রোগব্যাধি ছড়িয়ে পড়ে যা তাদের পুর্বপুরুষদের মধ্যে দেখা যায় নি। যখন কোনো সম্প্রদায়ের মানুষেরা ওজনে কম বা ভেজাল দিতে থাকে, তখন তারা দুর্ভিক্ষ, জীবনযাত্রার কাঠিন্য ও প্রশাসনের বা ক্ষমতাশীলদের অত্যাচারের শিকার হয়। যদি কোনো সম্প্রদায়ের মানুষেরা যাকাত প্রদান না করে, তাহলে তারা অনাবৃষ্টির শিকার হয়। যদি পশুপাখি না থাকতো তাহলে তারা বৃষ্টি থেকে একেবারেই বঞ্চিত হতো। যখন কোনো সম্প্রদায়ের মানুষ আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের ওয়াদা বা আল্লাহর নামে প্রদত্ত ওয়াদা ভঙ্গ করে, তখন আল্লাহ তাদের কোনো বিজাতীয় শত্রুকে তাদের উপর ক্ষমতাবান করে দেন, যারা তাদের কিছু সম্পদ নিয়ে যায়। আর যদি কোনো সম্প্রদায়ের শাসকবর্গ ও নেতাগণ আল্লাহর কিতাব (পবিত্র কুরআন) অনুযায়ী বিচার শাসন না করে এবং আল্লাহর বিধানের সঠিক ও ন্যায়ানুগ প্রয়োগের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা না করে, তখন আল্লাহ তাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও সংঘর্ষ বাধিয়ে দেন।"[১]

সম্মানিত উপস্থিতি, স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে তাকে সঠিক মর্যাদা দিতে হবে। স্বাধীনতা যেন স্বেচ্ছাচারিতায় পর্যবসিত না হয়। মহান আল্লাহ বলেন:

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ

"আল্লাহ দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন এক জনপদের যা ছিল নিরাপদ ও নিশ্চিত, যেথায় আসত সবদিক থেকে প্রচুর জীবনোপকরণ, অতপর তারা আল্লাহর নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল, ফলে তারা যা করত তার কারণে আল্লাহ তাদেরক আস্বাদ গ্রহণ করালেন ক্ষুধা ও ভীতির আচ্ছাদনের।"[২]

হাযেরীন, এ আয়াত থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে, জীবন, সম্পদ ও ইজ্জত-আবরুর নিরাপত্তা এবং জীবনোপকরণে সহজলভ্যতা বা সচ্ছলতা একটি স্বাধীন জনগোষ্ঠীর জন্য মহান আল্লাহর অন্যতম নিয়ামত। আল্লাহর নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞ হলে এর বিপরীতে ক্ষুধা, অসচ্ছলতা, ও নিরাপত্তাহীনতার পোশাক আল্লাহ পরিধান করান। এদিকে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। হৃদয়ের অনুভব দিয়ে, নিয়ামতকে আল্লাহর দয়ার দান বলে বিশ্বাস করে, স্বাধীনতা অর্জনে যাদের অবদান রয়েছে তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, স্বাধীনতাকে আল্লাহর নির্দেশমত পরিচালনা করে, সালাত, যাকাত, তাকওয়া ও আইনের শাসনের পরিপূর্ণ প্রতিষ্ঠা করে আমাদেরকে এ নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে ও অকৃতজ্ঞতা থেকে আত্মরক্ষা করতে হবে। আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক দিন। আমীন!!

---

[১] ইবনু মাজাহ, আস-সুনান ২/১৩৩২; হাকিম, আল-মুস্তাদরাক ৪/৫৮৩, আলবানী, সহীহুল জামি ২/১৩২১, সাহীহাহ ১/২১৬-২১৮।
[২] সূরা ১৬-নাহল: ১১২ আয়াত।

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

أَمَّا بَعْدُ، فَيَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ

وَقَالَ: وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لأَزِيــدَنَّكُمْ وَلَــئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ أَوْ دُونَ دَمِهِ أَوْ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ.

وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَمْ يَشْكُرْ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرْ اللَّهَ.

بَارَكَ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ فِيْ الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ. وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ. أَقُــوْلُ قَــوْلِيْ هَــذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُــلِّ ذَنْــبٍ، فَاسْتَغْفِرُوْهُ وَتُوْبُوْا إِلَيْهِ، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.

যুলকাদ মাসের ১ম খুতবা: মাতৃভাষা

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লী আলা রাসূলিহীল কারীম। আম্মা বাদ,

সম্মানিত উপস্থিতি, আজ যুলকাদ মাসের প্রথম জুমুআ। আজ আমরা মাতৃভাষা ও মাতৃভাষা দিবস বিষয়ে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ। কিন্তু তার আগে আমরা এ সপ্তাহের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসগুলির বিষয়ে সংক্ষেপ আলোকপাত করি। হাযেরীন, আজ ইংরেজী ..... মাসের ..... তারিখ। এ সপ্তাহের দিবসগুলির মধ্যে রয়েছে .... ।

সম্মানিত উপস্থিতি, মহান আল্লাহ মানুষকে যত নেয়ামত দিয়েছেন সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো মানুষের ভাষা বা কথা বলার ক্ষমতা। এ ক্ষমতাই মানুষকে অন্য সকল প্রাণী থেকে পৃথক ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে। মহান আল্লাহ এ বিষয়ে বলেন:

الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ.

"দয়াময় আল্লাহ, তিনিই শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন, তিনিই সৃষ্টি করেছেন মানুষ, তিনিই তাকে শিক্ষা দিয়েছেন ভাব প্রকাশের ক্ষমতা বা কথা বলার ক্ষমতা।"[১]

মহান আল্লাহর মহান ক্ষমতার নিদর্শন এ পৃথিবীর বৈচিত্র। পৃথিবীর মানুষ, প্রকৃতি ও অন্যান্য সকল সৃষ্টির বৈচিত্রের ন্যায় ভাষার বৈচিত্রও আল্লাহর মহান কুদরতের মহা-নিদর্শন। আল্লাহ বলেন:

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ

"তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। এতে জ্ঞানীদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে।[২]

এভাবে আমরা দেখছি যে, পৃথিবীর সকল মানুষ যেমন মহান আল্লহর প্রিয় সৃষ্টি, সকল ভাষাও তেমনি আল্লাহর প্রিয় সৃষ্টি, কাজেই কোনো ভাষাকে অন্য ভাষা থেকে অধিকমর্যাদাময় বা আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয় বা কোনো ভাষাকে আল্লাহর দৃষ্টিতে ঘৃণ্য বলে মনে করার কোনো অবকাশ নেই। প্রত্যেক মানুষের কাছে নিজের পিতামাতা ও দেশের যেমন মর্যাদা ও গুরুত্ব, তেমনি গুরুত্ব ও মর্যাদা তার মাতৃভাষার। মাতৃভাষার গুরুত্ব সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلا بِلِسَانِ قَوْمِهِ

"স্বজাতির ভাষা বা মাতৃভাষা ছাড়া আমি কোনো রাসূলই প্রেরণ করিনি।"[৩]

হাযেরীন, ইসলামের এ মূলনীতির ভিত্তিতে বিশ্বের সকল দেশের মুসলিম জনগোষ্ঠী তার মাতৃভাষাকে যথাযথ মর্যাদা ও গুরত্ব দিয়েছে, মাতৃভাষায় অন্য সকল জ্ঞানের ন্যায় ইসলামী জ্ঞানেরও চর্চা করেছে এবং মাতৃভাষাকে ইসলামী সাহিত্যকর্মে সমৃদ্ধ করেছে। আরবী ভাষাকে যেহেতু মহান আল্লাহ তাঁর মহান গ্রন্থ আল-কুরআন ও মহান নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর ভাষা হিসেবে গ্রহণ করেছেন এজন্য আরবী ভাষাকে বিশেষ মর্যাদা ও গুরুত্ব প্রদান করা বিশ্বের সকল ভাষার সকল মুসলিমের ঈমানের দায়িত্ব। আরবীর মর্যাদা ও গুরুত্ব প্রদানের পাশাপাশি তারা মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধ করেছেন।

আমাদের প্রিয় মাতৃভাষা বাংলার বিকাশেও মুসলমানদের অবদান ছিল ব্যাপক। বাংলায় মুসলিম আগমনের পূর্বে আর্য ও ব্রাহ্মণ শাসিত ভারতীয় সমাজে বাংলা ভাষাকে অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখা

---

[১] সূরা আর-রাহমান: ১-৪ আয়াত।
[২] সূরা রূম: ২২ আয়াত।
[৩] সূরা ইবরাহীম: ৪ আয়াত।

হতো। মুসলিম শাসনামলে সুলতানগণ বাংলাভাষা চর্চায় উৎসাহ দেন। তাদের উৎসাহে বাংলাভাষায় সাহিত্য চর্চা ব্যাপকতা লাভ করে এবং রামায়ন, মহাভারত ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করা হয়। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, পরবর্তীকালে হিন্দু পণ্ডিতগণ বাংলাকে হিন্দু ধর্মীয় ভাষা, "বাঙালী" মানেই হিন্দু এবং "বাঙালী জাতীয়তা" মানেই হিন্দু জাতীয়তা বলে দাবি করতে থাকেন। যদিও বাংলার সংখ্যাগরিষ্ট জনগণ ছিলেন মুসলমান, কিন্তু হিন্দু পণ্ডিতগণ তাদেরকে বাঙালী বলে মানতে রাজি ছিলেন না। এজন্য আমরা দেখি যে, হিন্দু ও মুসলমান ছেলেদের মধ্যকার খেলার কথা বলতে যেয়ে শরৎচন্দ্র লিখেন "বাঙালী ও মুসলমান" ছেলে। এখনো পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানদের পরিচয়ে বাঙালী লিখতে আপত্তি করা হয়। তাদের মতে "বাঙালীত্ব" মানেই হিন্দুত্ব এবং হিন্দুত্ব মানেই আর্য ধর্ম ও ধর্মীয় সংস্কৃতি।

সম্মানিত হাযেরীন, হিন্দু পণ্ডিতগণের এরূপ উন্নাসিকতার বিপরীতে অনেক বাঙালী মুসলিমের মধ্যেও এ বিষয়ে উদ্ভট মুর্খতা বিদ্যমান। অজ্ঞতা ও সরলতা বশতঃ অনেক সাধারণ বাঙ্গালী মুসলিম ও আলিম বাংলাভাষায় ইসলাম চর্চা অবহেলা করেছেন। তারা ধারণা করেছেন যে, বাংলা ভাষায় দেবদেবীর নাম আছে বা হিন্দুরা এ ভাষা ব্যবহার করেন কাজেই ভাষাটি বোধহয় হিন্দুদেরই ভাষা, অথবা এ ভাষায় বোধহয় কুরআন, হাদীস, ফিক্হ, উসূল ও অন্যান্য ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা উচিত নয় বা সম্ভব নয়। এরূপ চিন্তা কঠিন আপত্তিকর ও নিরেট অজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই নয়। ইসলামের আগমনের পূর্বে আরবী ভাষা ছিল পৌত্তলিক মুশরিকদের ভাষা। ফারসী ভাষা প্রাচীন কাল থেকে মুশরিক অগ্নি উপাসকদের ভাষা। উর্দু ভাষা ভারতের সংস্কৃত ভাষা থেকে উদ্ভুত ও ভারতীয় হিন্দু-মুসলিম সকলের ব্যবহৃত একটি ভাষা। এ সকল ভাষার অনুসারীরা নিজেদের ভাষায় ইসলাম চর্চা করেছেন এবং এ সকল ভাষা ইসলামী সভ্যতার অংশ হয়ে গিয়েছে।

১৯১৮ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্তির প্রেক্ষাপটে ইংরেজদের দেওয়া ওয়াদা মোতাবেক ভারতকে "স্বরাজ" প্রদানের রাজনৈতিক ইস্যুটি তৎকালীন ভারতীয় রাজনীতিতে প্রাধান্য পায়। এরই সাথে স্বাধীন ভারতের সাধারণ ভাষা বা "লিংগুয়া ফ্রাঙ্কা" কি হবে তা নিয়েও আলোচনা শুরু হয়। মহাত্মা গান্ধী এ বিষয়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতামত চান। কবিগুরু লিখিত মতামত প্রদান করেন যে, একমাত্র হিন্দিভাষাই ভারতের "লিংগুয়া ফ্রাঙ্কা" বা সাধারণ ভাষা বা "রাষ্ট্র ভাষা" হতে পারে। দু বছর পরে ১৯২০ সালে শান্তি নিকেতনের বিশ্বভারতীতে ভারতের "লিংগুয়া ফ্রাঙ্কা" সম্পর্কে আলোচনার জন্য এক মহাসভার আয়োজন করা হয়। এ মহাসভায় কবিগুরু ইংরেজির পক্ষে এবং ইংরেজী না হলে হিন্দিকে "লিংগুয়া ফ্রাঙ্কা" বা রাষ্ট্রভাষার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। কিন্তু বরেণ্য ভাষাবিদ ড. মোহাম্মাদ শহীদুল্লাহ ভাষাতাত্ত্বিক তথ্যাদির ভিত্তিতে প্রমাণ করেন যে, হিন্দির চেয়ে বাংলা অনেক উন্নত ভাষা এবং বাংলা ভাষাই ভারতের "লিংগুয়া ফ্রাঙ্কা" হওয়ার যোগ্যতা রাখে। প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে এ ছিল প্রথম আওয়াজ।

হাযেরীন, বাংলার যোগ্যতা প্রমাণিত হওয়ার সত্ত্বেও বাঙালী ও অবাঙালী সকল ভারতীয় কংগ্রেস নেতা হিন্দিকে স্বাধীন ভারতের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হওয়ার পক্ষে মতপ্রকাশ করেন। এর প্রতিক্রিয়ায় অনেক বাঙালী-অবাঙালী ভারতীয় মুসলিম নেতৃবৃন্দ "উর্দু"-কে ভারতের একমাত্র রাষ্টভাষা হওয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। বস্তুত উর্দু ও হিন্দি একই ভাষার দুটি রূপ বা প্রকাশ মাত্র। উত্তর ও মধ্য ভারতের মুসলিমগণ "উর্দু" রূপ ব্যবহার করেন আর হিন্দুগণ "হিন্দি" রূপ ব্যবহার করেন।

হাযেরীন, পরবর্তীতে ভারতকে স্বাধীন পাকিস্তান ও স্বাধীন ভারতে বিভক্ত করে স্বাধীনতা প্রদানের সিদ্ধান্ত হয়। তখন কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ হিন্দিকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা বলে ঘোষণা দেন। এর বিপরীতে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বলে ঘোষণা দেওয়ার দাবি করেন অনেকে।

হাযেরীন, বাঙ্গালী মুসলমানদের অজ্ঞতা ও সরলতার সুযোগে অবাঙ্গালী মুসলিমরা তাদের বুঝান যে, উর্দু ইসলামী ভাষা। ফলে ১৯৪৭ এর আগে থেকেই অনেক বাঙালী মুসলিম উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি করতে থাকেন। আমরা আগেই বলেছি যে, ইসলামের সাথে উর্দু বা ফার্সী ভাষার কোনোরূপ বিশেষ সম্পর্ক নেই। উর্দুও বাংলার মত সংস্কৃতি থেকে জন্মপ্রাপ্ত ভারতীয় ভাষা। তবে বাংলা ভাষা উর্দুর চেয়ে অনেক বেশি সমৃদ্ধ ও উন্নত। তবুও প্রতারণামূলকভাবে এরূপ দাবি করা হয়। অনেক আলিম, মুসলিম রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতা এরূপ দাবির প্রতিবাদ করেন। তাঁরা দাবি করেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা অবশ্যই বাংলা হতে হবে। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের স্বাধীনতা লাভের পরও এ বিষয়ে বিতর্ক চলতে থাকে। 'তমদ্দুন মজলিস' ও অন্যান্য সংস্থা ও ব্যক্তি পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা ও পূর্ব-পাকিস্তানের সরকারী ভাষা হিসেবে ঘোষণা করার জোর দাবি জানান, যা এদেশের মানুষের গণদাবিতে পরিণত হয়। ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ এ দাবির পক্ষে ঢাকায় সাধারণ ধর্মঘট পালিত হয়।

১৯৪৮ সালের ১৯ মার্চ পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মাদ আলী জিন্নাহ পূর্ব পাকিস্তান সফরে আসেন। তিনি ঢাকায় দুটি সভায় বক্তৃতা দেন এবং দু জায়গাতেই বাংলাভাষার দাবি উপেক্ষা করে একমাত্র উর্দুকেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করেন। এ সময় সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে ভাষা আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৫২ সালের শুরু থেকে ভাষা আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ মোড় নেয়। এ সময়ে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা রাখার সিদ্ধান্তে অটল থাকেন এবং বাংলার দাবি একেবারে উপেক্ষা করেন। এর ধারাবাহিকতায় ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী (৮ ফাল্গুন, ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ) সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে হরতাল, জনসভা ও বিক্ষোভ মিছিল আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সরকার পাল্টা ১৪৪ ধারা জারি করে। ছাত্ররা ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল বের করলে পুলিশ গুলি চালায় এবং রফিক উদ্দীন আহমদ, আব্দুল জব্বার, আবুল বরকত, আব্দুস সালাম সহ অনেকে নিহত হন এবং আরো অনেক আহত হন। আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ১৯৫৬ সালে উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্টভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত ২১ শে ফেব্রুয়ারী মাতৃভাষা ও শহীদ দিবস হিসেবে পালিত হয়। ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কো ২১শে ফেব্রুয়ারীকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা করে। ২০০০ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী থেকে দিবসটি জাতিসঙ্ঘের সদস্যদেশসমূহে যথাযথ মর্যাদায় পালিত হচ্ছে।[১]

হাযেরীন, নিজের সম্পদ, প্রাণ, পরিবার বা বৈধ অধিকার আদায়ের জন্য কথা বলে, দাবি করে বা চেষ্টা করে যদি কেউ নিহত হয় তবে সে ব্যক্তি শহীদ হন বলে হাদীস শরীফে বলা হয়েছে। স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের আলোচনায় আমরা হাদীসগুলি আলোচনা করেছি। এদেশের মানুষের মাতৃভাষায় সকল কার্য সম্পাদন করার জন্মগত ও ইসলাম নির্দেশিত অধিকার রক্ষার জন্য কথা বলে যারা নিহত হয়েছেন তাদের মৃত্যু শহীদী মৃত্যু বলে এ সকল হাদীসের আলোকে প্রতীয়মান হয়। এ সকল শহীদের প্রতি আমাদের দায়িত্ব হলো প্রথমত, তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, দ্বিতীয়ত, তাদের জন্য দু'আ করা এবং তৃতীয়ত, মাতৃভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় তাদের রেখে যাওয়া দায়িত্ব আঞ্জাম দেওয়া।

আমরা দেখেছি যে, ব্যক্তি বা জাতির জীবনে যে কোনো নিয়ামত অর্জনে যাদের অবদান আছে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অংশ এবং ইসলামের নির্দেশ। কাজেই যে সকল মানুষ আমাদের মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য জীবন দিয়েছেন তাদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে। এজন্য সকল প্রকার পক্ষপাতিত্ব পরিত্যাগ করে তাদের ত্যাগের প্রকৃত তথ্য

[১] বিস্তারিত জানতে মুকুল চৌধুরী সম্পাদিত, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশিত "ভাষা আন্দোলন" বইটি পড়ুন।

পরবর্তী প্রজন্মকে ও বিশ্বকে জানাতে হবে এবং তাদের স্বীকৃতির ব্যবস্থা করতে হবে।

কৃতজ্ঞতার অন্যতম দিক তাদের জন্য দু'আ করা। বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কেউ তোমাদের কোনো উপকার বা কল্যাণ করলে তার প্রতিদান দিবে এবং তার জন্য দু'আ করবে। এজন্য আমাদের দায়িত্ব তাদের জন্য সর্বদা দু'আ করা। তাদের আখিরাতের কল্যাণের উদ্দেশ্যে সাদাকায়ে জারিয়া হিসেবে তাঁদের স্মৃতিতে মসজিদ, মাদ্রাসা, এতিমখানা ও জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান তৈরি করা।

সম্মানিত উপস্থিতি, অত্যন্ত দুঃখজনক বিষয় যে, এ সকল মহান শহীদের জন্য দু'আ করা পরিবর্তে আমরা তাদেরকে নিয়ে এমন কিছু কাজ করি যা ইহূদী-খৃস্টানদের অন্ধ অনুকরণ বৈ কিছুই নয়। আমরা শহীদ মিনারে ফুল প্রদান, খালি পায়ে হাঁটা, নীরবে দাঁড়িয়ে থাকা ইত্যাদি কর্মের মাধ্যমে শহীদদের 'স্মরণ করি', তাদের প্রতি "শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি" বা তাদের আত্মার শান্তি কামনা করি। এগুলি এদেশের মানুষদের বা বাঙালী সংস্কৃতির অংশ নয়। ইউরোপীয় খৃস্টানদের সংস্পর্শে আসার আগে এদেশের হিন্দু বা মুসলমান কেউই এভাবে মৃতদের স্মরণ বা তাদের 'আত্মার শান্তি কামনা' করে নি। তেমনি এগুলি ইসলামী সংস্কৃতি বা দীনের অংশ নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ, তাঁর সাহাবীগণ বা পরবর্তী যুগের মুসলিমগণ কখনোই এরূপ করেন নি। এগুলি সবই ইহূদী-খৃস্টান ধর্মের ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের অংশ। আমরা অন্ধভাবে তাদের ধর্মীয় অনুকরণ করি। নগ্নপদে গমন করা, বেদীতে ফুল অর্পন করা, নীরবে দাঁড়িয়ে থাকা ইত্যাদি কর্ম আর্য-ইউরোপীয় সভ্যতায় ও ধর্মে 'ইবাদত' বা পূজা-অর্চনার অংশ। আর আমরা আমাদের শহীদদের পূজা, অর্চনা বা বন্দনা করি না বা করতে পারি না। আমাদের দায়িত্ব তাদের জন্য দু'আ করা।

শহীদদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য আমাদের মূল দায়িত্ব হলো, আমাদের প্রিয় মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধ করে আন্তর্জাতিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা।

হাযেরীন, মাতৃভাষার প্রতি ভালবাসা ও মাতৃভাষাকে মর্যাদা প্রদানের অর্থ এই নয় যে, বিদেশী ভাষা ঘৃণা করতে হবে বা তা শিক্ষা করা পরিহার করতে হবে। মাতৃভাষাকে ভালবাসতে হবে, তাকে সমৃদ্ধ করতে হবে, প্রয়োজন না হলে বিদেশী ভাষা পরিহার করতে হবে এবং পাশাপাশি প্রয়োজন অনুসারে বিদেশী ভাষা শিক্ষা করতে হবে। আমরা অনেক সময় 'মাতৃভাষা'-কে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহারের অযুহাতে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করতে অবহেলা করি। ফলে আন্তর্জাতিক কর্ম বাজারের অনেক সুবিধা থেকে আমাদের সন্তানগণ বঞ্চিত হয়। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে আরবী ও ইংরেজী ভাষায় দখল থাকার কারণে ভারতীয়গণ কর্মের যে সুযোগ পান্, বাংলাদেশীগণ তা পান না। অন্যান্য দেশেও প্রায় একই অবস্থা।

পাশাপাশি অনেক ধার্মিক মানুষ বিদেশী ভাষা বা কাফিরদের ভাষা মনে করে ইংরেজী শিক্ষা করাকে আপত্তিকর বা দীনের জন্য ক্ষতিকর বা দীনের জন্য অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করেন। অথচ প্রয়োজন মত এরূপ বিদেশী ভাষা বা ইহূদী-খৃস্টানদের ভাষা শিক্ষা করা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশ। প্রসিদ্ধ সাহাবী যাইদ ইবনু সাবিত আনসারী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মদীনায় হিজরত করে আসলেন তখন আমি ১১/১২ বৎসরের তরুণ। ইতোমধ্যেই আমি কুরআনের অনেকগুলি সূরা মুখস্থ করেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ সূরাগুলি শুনে চমৎকৃত হন। আমার মেধা দেখে তিনি বলেন, যাইদ তুমি ইহূদীদের ভাষা, হিব্রু ভাষা (Hebrew Language) ও সিরীয় ভাষা (Syriac language, Christian Aramaic, usually called Syriac) শিক্ষা কর। তারা কি লিখে ও বলে সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত হতে চায়। তখন আমি মাত্র ১৫ বা ১৭ দিনের মধ্যে তাদের ভাষা শিক্ষা করি। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ ইহূদীদেরকে কিছু লিখতে চাইলে আমি তা লিখে দিতাম এবং ইহূদী-খৃস্টানগণ কিছু লিখলে আমি তা তাঁকে পড়ে শুনাতাম।"[১]

[১] বুখারী, আস-সহীহ ৬/২৬৩১; ইবনু হিব্বান, আস-সহীহ ১৬/৮৪; ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ১৩/১৮৬-১৮৭।

সম্মানিত উপস্থিতি, মাতৃভাষার পাশাপাশি যে ভাষাটি শিক্ষা করা আমাদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় তা হলো আরবী ভাষা। আমরা আমাদের পিতামাতাকে ভালবাসি। কিন্তু এ ভালবাসা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি ভালবাসার অন্তরায় নয়। আমরা আমাদের দেশ বা গ্রামকে ভালবাসি। কিন্তু এ জন্য মক্কা ও মদীনার প্রতি ভালবাসার ঘাটতি হতে পারে না। ঠিক তেমনি ভাবে মাতৃভাষার প্রতি ভালবাসা আরবীর প্রতি ভালবাসার অন্তরায় হতে পারে না। আরবী কোনো বিদেশী ভাষা নয়। আরবী আমাদের প্রতিটি মুসলিমের হৃদয়ের ভাষা, ঈমানের ভাষা ও দীনের ভাষা। প্রতিটি মুমিনের দায়িত্ব অন্তত কুরআন কারীম বা নামাযে পঠিত কুরআনের সূরাগুলি ও যিক্র-দু'আগুলি বুঝার মত আরবী ভাষা শিক্ষা করা। নিজের সন্তানদেরকেও এভাবে গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরী। সাধারণ জ্ঞান বা অসাধারণ জ্ঞানের নামে আমরা আমাদের সন্তানদেরকে এমন অনেক কিছু শিক্ষা দিই যা তাদের অধিকাংশের জন্যই দুনিয়া বা আখিরাতে কখনোই কোনো কাজে লাগবে না। অথচ আরবী শিক্ষার প্রতি আমরা ক্ষমাহীন অবহেলা করছি।

আরবী এখন বিশ্বের অন্যতম 'বাণিজ্যিক' ভাষা। আরবী ভাষার সামান্য জ্ঞান ও ভাব প্রকাশের ক্ষমতা মধ্যপ্রাচ্যের শ্রমবাজারে দক্ষ ও অদক্ষ সকল শ্রমিকের জন্য ও ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ও অন্যান্য পেশার মানুষদের জন্য অনেক সুবিধা বয়ে আনে। বৃটিশ যুগে এ দেশের স্কুলগুলিতে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ১০০ নম্বরের আরবী পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল। এতে মুসলিম ছাত্রছাত্রীরা একটু চেষ্টা করলেই কুরআন বুঝতে সক্ষম হতেন এবং আরবী কিছু বলতে ও বুঝতে পারতেন। বাংলাদেশের জাতীয় পাঠ্যক্রমে আরবী শিক্ষার এরূপ ব্যবস্থা করা অতীব প্রয়োজনীয় ও সময়ের দাবি।

হাযেরীন, দুর্নীতি কমাতে এবং দেশকে সমৃদ্ধ করতে জাতীয় পাঠ্যক্রমে অন্তত ১০০ নম্বরের বাধ্যতামূলক আরবী অতি প্রয়োজনীয়। আমরা অধিকাংশ মুসলিম দৈনিক, সাপ্তাহিক ও ঈদের নামাযে সর্বদা কুরআন শুনি। এছাড়া অনেকেই কুরআন পড়ি। কিন্তু না বুঝার কারণে কুরআনে বারংবার উল্লেখিত ভয়াবহ দুর্নীততে লিপ্ত। মানুষের মধে পশু প্রবৃত্তি রয়েছে। এজন্য ভয় ও লোভ ছাড়া প্রকৃত সততা নিশ্চিত হয় না। সমাজ, আইন বা রাষ্ট্রের কাছে নিন্দিত বা নন্দিত হওয়ার ভয় বা লোভ মানুষকে দুর্নীতির প্ররোচনা থেকে কিছুটা রক্ষা করে। কিন্তু সকলেই জানে সমাজ, রাষ্ট্র বা আইনকে ফাঁকি দেওয়া যায়। আর সমাজ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সততার সঠিক মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হয়। এজন্য প্রকৃত সততা তৈরি করতে আল্লাহর ভয় ও লোভ সৃষ্টির কোনো বিকল্প নেই। আল্লাহ্ সকল কষ্টের পরিপূর্ণ পুরস্কার দিবেন এবং সকল অন্যায়ের শাস্তি দিবেন বলে অবচেতনের বিশ্বাস লাভের পর মানুষ যে কর্মটি আল্লাহর কাছে অন্যায় বলে নিশ্চিত জানতে পারে সে কাজ করতে পারে না। আমাদের দেশের অনেক ধার্মিক মানুষ মদ, ব্যভিচার ইত্যাদি পরিত্যাগ করেন, কিন্তু সুদ, ঘুষ, প্রতারণা, যৌতুক, কর্মে অবহেলা, মানবাধিকার নষ্ট, অবৈধ সম্পদ অর্জন ইত্যাদি অন্যায়ে লিপ্ত হন। এর কারণ দ্বিতীয় পর্যায়ের অন্যায়গুলি সম্পর্কে তার সচেতনতার অভাব। তিনি যদি কুরআন বুঝতে পারতেন তাহলে প্রতিদিন নামাযে বা নামাযের বাইরে যা কুরআন পড়তেন বা শুনতেন তাতেই তার মধ্যে এ সকল অন্যায়ের বিষয়ে সচেতনতা তৈরি হতো এবং তিনি ক্রমান্বয়ে এগুলি থেকে মুক্ত হতেন।

ধর্ম বিষয়ক কুসংস্কার আমাদের জাতীয় জীবনের অন্যতম সমস্যা। দরগা-মাজারগুলির দিকে তাকান। মাদকতা ও অনাচারের প্রসার ছাড়াও এ সকল স্থানে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ কর্মঘন্টা ও টাকা নষ্ট হচ্ছে ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে। যদি আমাদের জাতীয় শিক্ষা কারিকুলামে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে আরবী শিক্ষার ব্যবস্থা থাকতো এবং সাধারন শিক্ষিত মানুষেরা কুরআন কিছুটা বুঝতেন তবে অধিকাংশ মানুষ এ সকল কুসংস্কার থেকে রক্ষা পেতেন। যে সকল অন্ধ বিশ্বাস মাজার পূজা, মাজারে অলস সময় যাপন, মাদকতা ও "পাগল" ভক্তি সৃষ্টি করে সেগুলি সবই কুরআন বুঝলে দূর হয়ে যাবে।

মুহতারাম হাযেরীন, মাতৃভাষার প্রতি অবহেলার ফলে আমাদের দেশের আলিমগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে আরবীতেও দুর্বল থেকেছেন। উর্দু ও ফার্সী ভাষার প্রতি অপ্রয়োজনীয় গুরুত্ব আরোপের ফলে একদিকে যেমন তালিবে ইলমগণ বাংলায় দুর্বল থেকেছেন, তেমনিভাবে তারা আরবীতেও দুর্বল থেকেছেন। উর্দু-ফার্সী ভাষা শিক্ষায় কোনো দোষ নেই। বরং এ দুই ভাষা সহ মুসলিম উম্মাহর অন্যান্য ভাষা, যেমন তুর্কি, সোহেলী, মালয়ী ইত্যাদি ভাষায় পারদর্শী আলিমগণ সে সকল ভাষার মূল্যবান গ্রন্থাদি বাংলায় অনুবাদ করবেন এবং বাংলার মূল্যবান গ্রন্থাদি সে সকল ভাষায় অনুবাদ করবেন এবং এভাবে উম্মাতের খেদমত করবেন। তবে সকল তালিবে ইলমকে উর্দু শিখতে হবে বলে মনে করা বা উর্দু বা ফার্সী ভাষাকে ইলম শিক্ষার জন্য উপযোগী মনে করা একেবারেই বাতিল ধারণা। এ কথা ঠিক যে, বাঙালী আলিম সমাজ মাতৃভাষার প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন না করলেও উর্দু ও ফার্সী ভাষাভাষী আলিমগণ তাদের মাতৃভাষার প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন করেছেন। ফলে তাফসীর, হাদীস, ফিকহ ও ইসলামী জ্ঞানের অন্যান্য শাখায় অনুবাদ ও মৌলিক কর্মের বিশাল ভাণ্ডার গড়ে উঠেছে এ সকল ভাষায়। তবে এ সকল ভাষার কিতাবাদি কখনই আরবীর চেয়ে বেশি নয়। বরং ইসলামের মূল জ্ঞানভাণ্ডার আরবী ভাষাতেই রয়েছে। আমাদের আলিম ও তালিবে ইলমদের দায়িত্ব আরবী ও মাতৃভাষায় পারদার্শিতা অর্জন করে নিজের ভাষাকে এভাবে সমৃদ্ধ করা।

মুহতারাম হাযেরীন, বিশেষ করে আলিমদের জন্য মাতৃভাষায় বুৎপত্তি অত্যাবশ্যকীয়। আমরা দেখেছি যে, আল্লাহ মাতৃভাষা ছাড়া কোনো নবী-রাসূল প্রেরণ করেন নি। এজন্য মাতৃভাষায় বুৎপত্তি ছাড়া কোনো ব্যক্তি নায়েবে নবী বা ওয়রিসে নবী অর্থাৎ নবীর উত্তরাধিকারী হতে পারেন না। সর্বোপরি আমাদের মহান নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর সর্বশ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য ছিল ভাষার উচ্চাঙ্গতা ও চিত্তাকর্ষণীয়তা। কাজেই প্রতিটি আলিমের ও দীনের দাওয়াতে আত্মনিয়োজিত ব্যক্তির অন্যতম দায়িত্ব হলো মাতৃভাষায় উচ্চাঙ্গের সাহিত্যিক মান অর্জন করা, যেন তিনি তার জাতির মন, মানসিকতা, সুবিধা, অসুবিধা, সন্দেহ, সমস্যা ইত্যাদি ভালভাবে অনুভব করতে পারেন, এবং তার বক্তব্য, ওয়াজ, লেখনি ইত্যাদি সকল বাঙ্গালী শ্রোতার হৃদয় আলোড়িত করতে পারে। এজন্য বাংলার সকল তালিবে ইলম ও আলিমের দায়িত্ব মাতৃভাষা বাংলা ও দীনের ভাষা আরবীতে গভীর পারদর্শিতা অর্জন করা। এরপর যথাসম্ভব ইংরাজী ভাষা শেখা তাঁদের দায়িত্ব, কারণ ইংরেজীও বর্তমানে আমাদের দেশের 'লিসানে কওম' বা জাতির ভাষা-সংস্কৃতির অংশ। এছাড়া আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে মুসলিম উম্মার পক্ষে ও বিপক্ষে আবর্তিত তথ্যাদি জানা ও উম্মাতকে জানানোর জন্যও আলিমদের ইংরেজি ভাষা জানা প্রয়োজন। এরপর কেউ ইচ্ছা করলে উর্দু, ফার্সী, তুর্কি, মালয়, সোহেলী ইত্যাদি মুসলিম জনগোষ্ঠীর ভাষা শিক্ষা করতে পারেন।

এ বিষয়ে ফুরফুরার পীর মাওলানা আবূ বাকর সিদ্দীকীর[১] একটি ওসীয়ত প্রণিধানযোগ্য। ১৯২৯-৩০ সালে তিনি বিভিন্ন প্রত্রিকায় তাঁর ওসীয়ত ছাপেন। এতে তিনি উর্দু ফার্সীকে অন্যান্য ভাষার কাতারে রেখে আরবী, বাংলা ও ইংরেজী ভাষা শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি লিখেন: "সেই জন্য মোছলমান মাত্রকেই দ্বীনের এল্ম আরবী শিক্ষা করা অবশ্য প্রয়োজন। ইংরাজী, বাংলা, উর্দু, ফারছী প্রভৃতি ভাষার দ্বারাও এছলামের খেদমত এবং উহা জেন্দা রখিতে পারা যায়। কিন্তু উহার মূলে আরবী শিক্ষার নেহায়াত জরুরৎ। কেননা আরী না হইলে এছলামকে যথাথরূপে বুঝিতে পারা যাইবে না। .... দেশীয় ভাষা বাংলা, রাজ ভাষা ইংরেজী খুব আবশ্যক।"[২] মহান আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক প্রদান করুন। আমীন!!

---

[১] জন্ম ১৮৪৬খৃ/১২৬৩হি, মৃত্যু ১৯৩৯খৃ/১৩৪৫হি

[২] হক্বীকতে ইনসানিয়্যাত, ১১২ পৃষ্ঠা।

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

أَمَّا بَعْدُ، فَيَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ.

وَقَالَ: وَمِنْ آَيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ

وَقَالَ: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلا بِلِسَانِ قَوْمِهِ

وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قُتِلَ دُونَ مَظْلَمَتِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَمْ يَشْكُرْ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرْ اللَّهَ

بَارَكَ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ فِيْ الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ. وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ. أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ، فَاسْتَغْفِرُوْهُ وَتُوْبُوْا إِلَيْهِ، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.

যুলকাদ মাসের ২য় খুতবা: ভালবাসা দিবস, অশ্লীলতা ও এইডস

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লী আলা রাসূলিহীল কারীম। আম্মা বাদ,

সম্মানিত উপস্থিতি, আজ যুলকাদ মাসের ২য় জুমুআ। আজ আমরা ভালবাসা দিবস, অশ্লীলতা ও এইড্স বিষয়ে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ। কিন্তু তার আগে আমরা এ সপ্তাহের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসগুলির বিষয়ে সংক্ষেপে আলোকপাত করি। হাযেরীন, আজ ইংরেজী ..... মাসের ..... তারিখ। এ সপ্তাহের দিবসগুলির মধ্যে রয়েছে ....।

হাযেরীন, ১৪ই ফেব্রুয়ারী সাধু ভ্যালেন্টাইন দিবস বর্তমানে 'বিশ্ব ভালবাসা দিবস' নামে ব্যাপক উদ্দীপনার সাথে আমাদের দেশে পালিত হয়। মূলত দিবসটি ছিল প্রাচীন ইরোপীয় গ্রীক-রোমানপৌত্তলিকদের একটি ধর্মীয় দিবস। ভারতীয় আর্যদের মতই প্রাচীন রোমান পৌত্তলিকগণ মধ্য ফেব্রুয়ারী বা ১লা ফাল্গুন ভূমি ও নারী উর্বরতা এবং নারীদের বিবাহ ও সন্তান কামনায় প্রাচীন দেবদেবীদের বর লাভ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে বিভিন্ন নগ্ন ও অশ্লীল উৎসব পালন করত, যা লুপারকালিয়া (Lupercalia) উৎসব (feast of Lupercalis) নামে প্রচলিত ছিল। ইউরোপে খৃস্টান ধর্মের প্রতিষ্ঠা ও রাষ্ট্রধর্মের মর্যাদা লাভের পরেও এ সকল অশ্লীল উৎসব অব্যাহত থাকে। পরে একে 'খৃস্টীয়' রূপ দেওয়া হয়। ইউরোপে খৃস্টান ধর্মের প্রতিষ্ঠার পরে ধর্মের নামে, বিশ্বাসের নামে, ডাইনী শিকারের নামে, অবিশ্বাস বা ধর্মীয় ভিন্নমতের (heresy) অভিযোগে লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা ও আগুনে পুড়িয়ে মারা হলেও, বিভিন্ন প্রকারের অশ্লীলতা, পাপাচার, মুর্তিপূজা, সাধুপূজা ইত্যাদির প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে।

বস্তুত হযরত ঈসা (আ)-এর প্রস্থানের কয়েক বৎসর পরে শৌল নামক এক ইহূদী- যিনি পরে পৌল নাম ধারণ করেন- তাঁর ধর্ম ও শরীয়তকে বিকৃত করেন। শৌল প্রথমে ঈসা (আ)–এর প্রতি যারা ঈমান এনেছিলেন তাদের উপর কঠিন অত্যাচার করতেন। এরপর হঠাৎ তিনি দাবি করেন যে, যীশু তাকে দেখা দিয়েছেন এবং তাকে ধর্ম প্রচারের দায়িত্ব দিয়েছেন। ফিলিস্তিনে ঈসা (আ)–এর মূল অনুসারীরা তার বিষয়ে সন্দেহ করার কারণে তিনি এশিয়া মাইনর ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যেয়ে খৃস্টান ধর্ম প্রচার করেন। বর্তমানে প্রচলিত খৃস্টান ধর্মের তিনিই প্রতিষ্ঠাতা। এ ধর্মের মূলনীতি হলো, ঈশ্বরের মর্যাদা রক্ষার জন্য যত খুশি মিথ্যা বল। প্রয়োজন মত যত ইচ্ছা পরিবর্তন, পরিবর্ধন করে এবং মিথ্যা বলে মানুষকে 'খৃস্টান' বানাও। পৌল নিজেই বলেছেন: "For if the truth of God hath more abounded through my lie unto his glory; why yet am I also judged as a sinner? কিন্তু আমার মিথ্যায় যদি ঈশ্বরের সত্য তাঁহার গৌরবার্থে উপচিয়া পড়ে, তবে আমিও বা এখন পাপী বলিয়া আর বিচারিত হইতেছি কেন?"[১]।

বর্তমানে প্রচলিত বাইবেল থেকে যে কোনো পাঠক দেখবেন যে, যীশু খৃস্ট যেখানে এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে, সালাত আদায় করতে, সিয়াম পালন করতে, সম্পদ সঞ্চয় না করতে, নারীর দিকে দৃষ্টিপাত না করতে, শূকরের মাংস ভক্ষণ না করতে, খাতনা করতে, তাওরাতের সকল নিয়ম পালন করতে এবং ব্যভিচার বর্জণ করতে, সততা ও পবিত্রতা অর্জন করতে নির্দেশ দিয়েছেন, সেখানে পৌল এ সকল বিধান সব 'বাতিল' করে বলেছেন যে, শুধু যীশুকে ত্রাণকর্তা বিশ্বাস করলেই চলবে। বরং তিনি এ সকল বিধান নিয়ে নোংরা ভাবে উপহাস করে বলেছেন, বিধান পালন করে যদি জান্নাতে যেতে হয় তবে যীশু কি জন্য! যীশু-ভক্তির নামে তিনি নিজেই যীশুর সকল শিক্ষা বাতিল করে দিয়েছেন। পৌল প্রতিষ্ঠিত এ খৃস্টান ধর্মের মূল চরিত্রই হলো যুক্তি ও দলিল দিয়ে বা পাদরি-পোপদের নামে ধর্মের মধ্যে

---

[১] বাইবেল, রোমান ৩/৭।

নতুন নতুন অনুষ্ঠান ও নিয়মকানুন জারি করা এবং যে সমাজে ও যুগে যা প্রচলিত আছে তাকে একটি "খৃস্টীয়" নাম দিয়ে বৈধ করে নেওয়া। এজন্য জে. হিকস (J. Hicks) তার লেখা (The Myth of God Incarnate) গ্রন্থে বলেন: "Christianity has throughout its history been a continuously growing and changing movement of adjustments".

এ পরিবর্তনের ধারায় ৫ম-৬ষ্ঠ খৃস্টীয় শতকে লুপারকালিয়া উৎসবকে 'সেন্ট ভ্যালেন্টাইনস ডে' বা সাধু ভ্যালেন্টাইনের দিবস' নামের চালানোর ব্যবস্থা করা হয়। সেন্ট ভ্যালেন্টাইন নামক ব্যক্তিটি কে ছিলেন তা নিয়ে অনেক কথা আছে। তবে মূল কথা হলো, লুপারকালিয়া উৎসবকে খৃস্টান রূপ প্রদান করা। এভাবে আমরা দেখছি যে, এ দিবসটি একান্তই পৌত্তলিক ও খৃস্টানদের ধর্মীয় দিবস। কিন্তু বর্তমান যুগে "বিশ্ব ভালবাসা দিবস" নাম দিয়ে এটিকে 'ধর্ম নিরপেক্ষ' বা সার্বজনীন রূপ দেওয়ার একটি সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত কার্যকর। যে দিবসটির কথা কয়েক বৎসর আগে দেশের কেউই জানত না, সে দিবসটির কথা জানে না এমন মানুষ দেশে নেই বললেই চলে। ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমেই এরূপ করা সম্ভব হয়েছে। এ চক্রান্তের উদ্দেশ্য "ভালবাসা দিবসের" নামে যুবক-যুবতীদেরকে মাতিয়ে ব্যাপক 'বাণিজ্য' করা, যুবক-যুবতীদের নৈতিক ও চারিত্রিক ভিত্তি নষ্ট করে দেওয়া এবং তাদেরপক ভোগমুখী করে স্থায়ীভাবে আন্তর্জাতিক 'বাণিজ্যিক' সাম্রাজ্যবাদের অনুগত করে রাখা।

হাযেরীন, ইংরেজী Love, বাংলা ভালবাসা ও আরবী (محبة) 'মাহাব্বাত' একটি হার্দিক কর্ম। পানাহার, দর্শন, শ্রবণ ইত্যাদি কর্মের মত ভালবাসাও ইসলামের দৃষ্টিতে কখনো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত এবং কখনো কঠিন নিষিদ্ধ হারাম কর্ম। পিতামাতাকে ভালবাসা, স্বামী-স্ত্রীসন্তানদেরকে ভালবাসা, ভাইবোনকে ভালবাসা, আত্মীয়-স্বজন, সঙ্গীসাথী ও বন্ধুদের ভালবাসা, সৎমানুষদেরকে ভালবাসা, সকল মুসলিমকে ভালবাসা, সকল মানুষকে ভালবাসা এবং সর্বোপরি মহান আল্লাহর সকল সৃষ্টিকে ভালবাসা ইসলাম নির্দেশিত কর্ম। এরূপ ভালবাসা মানুষের মানবীয় মূল্যবোধ উজ্জীবিত করে, হৃদয়কে প্রশস্ত ও প্রশান্ত করে এবং সমাজ ও সভ্যতার বিনির্মাণে কল্যাণময়, গঠনমূলক ভূমিকা ও ত্যাগস্বীকারে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সাম্রাজ্যবাদের প্রচারিত তথাকথিত "বিশ্ব ভালবাসা দিবসে" ভালবাসার এ দিকগুলি একেবারেই উপেক্ষিত, অথচ সংঘাতময় এ পৃথিবীকে মানুষের বসবাসযোগ্য করার জন্য এরূপ ভালবাসার প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার কতই না প্রয়োজন!

ভালবাসার একটি বিশেষ দিক নারী ও পুরুষের জৈবিক ভালবাসা। আন্তর্জাতিক বেনিয়া সাম্রাজ্যবাদীরা 'বিশ্ব ভালবাসা দিবসের' নামে শুধু যুবক-যুবতীদের এরূপ জৈবিক ও বিবাহেতর বেহায়াপনা উস্কে দিচেছ। যুবক-যুবতীদের বয়সের উন্মাদনাকে পুঁজি করে তারা তাদেরকে অশ্লীলতার পঙ্কিলতার মধ্যে ডুবিয়ে দিয়ে তাদের সাম্রাজ্যবাদী ও বাণিজ্যিক স্বার্থসিদ্ধি করতে চায়।

হাযেরীন, ধর্মের নামে অনেক ধর্মে, বিশেষত পাদ্রী-পুরোহিত নিয়ন্ত্রিত খৃস্টান ধর্মে নারী-পুরুষের এরূপ ভালবাসা, দৈহিক সম্পর্ক ও পারিবারিক জীবনকে অবহেলা করা হয়েছে বা ঘৃণার চোখে দেখা হয়েছে। নারীকে শয়তানের দোসর মনে করা হয়েছে। স্ত্রীর সাহচার্য বা পারিবারিক জীবনকে পরকালের মুক্তির বা আল্লাহর প্রেম অর্জনের পথে অন্তরায় বলে মনে করা হয়েছে। এজন্য সন্যাস বা বৈরাগ্যকে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। এখনো যেখানেই তারা সুযোগ পায় সংসার ও পরিবার বর্জন করে 'নান' (nun), মঙ্ক (monk) বা সন্যাসী হওয়ার উৎসাহ দেয় এবং এরূপ হওয়াকে ধার্মিকতার জন্য উত্তম বলে প্রচার করে। মধ্যযুগীয় খৃস্টীয় গীর্জা ও মঠগুলির ইতিহাসে এ সকল সন্যাসী-সন্যাসিনীর অশ্লীলতার বিবরণ পড়লে গা শিউরে ওঠে এবং আধুনিক যুগের অশ্লীল গল্পের চেয়ে জঘন্যতর অগণিত ঘটনা আমরা দেখতে পাই।

বস্তুত, এ সকল চিন্তা সবই মানবতা বিরোধী ও প্রকৃতি বিরোধী। ইসলামে এরূপ চিন্তা কঠিনভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পরিবার গঠন করা এবং পারিবারিক কাঠামোর মধ্যে নারী-পুরুষের এরূপ জৈবিক প্রেমকে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত বলে গণ্য করা হয়েছে। আমরা অন্য খুতবায় এ বিষয়ে আলোচনা করেছি।

মুহতারাম হাযেরীন, মানব জাতিকে টিকিয়ে রাখতে মহান আল্লাহ মানুষের মধ্যে এ জৈবিক ভালবাসা প্রদান করেছেন। এরূপ ভালবাসার প্রবল আকর্ষণে মানুষ পরিবার গঠন করে, সন্তান গ্রহণ করে, পরিবার-সন্তানের জন্য সকল কষ্ট অকাতরে সহ্য করে এবং এভাবেই মানব জাতি পৃথিবীতে টিকে আছে। মানব সভ্যতা টিকিয়ে রাখার জন্য এরূপ ভালবাসাকে একমুখী বা পরিবারমুখী করা অত্যাবশ্যকীয়। যদি কোনো সমাজে পারিবারিক সম্পর্কের বাইরে নারী-পুরুষের এরূপ ভালবাসা সহজলভ্য হয়ে যায়, তবে সে সমাজে পরিবার গঠন ও পরিবার সংরক্ষণ অসম্ভব হয়ে যায় এবং ক্রমান্বয়ে সে সমাজ ধ্বংস হয়ে যায়। এজন্য সকল আসমানী ধর্ম ও সকল সভ্য মানুষ ব্যভিচার ও বিবাহেতর 'ভালবাসা' কঠিনতম অপরাধ ও পাপ বলে গণ্য করেছে।

ইসলামে শুধু ব্যভিচারকেই নিষেধ করা হয় নি, বরং ব্যভিচারের নিকটে নিয়ে যায় বা ব্যভিচারের পথ খুলে দিতে পারে এমন সকল কর্ম কঠিনভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সামান্য কয়েকটি আয়াত শুনুন:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ

"বল, আমার প্রতিপালক হারাম (নিষিদ্ধ) করেছেন সকল প্রকার অশ্লীলতা, তা প্রকাশ্য হোক আর অপ্রকাশ্য হোক।"[১]

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

"তোমরা নিকটবর্তী হয়ো না ব্যভিচারের, নিশ্চয় তা অশ্লীল এবং নিকৃষ্ট আচরণ।"[২]

وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ

"তোমরা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য কোনো প্রকারের অশ্লীলতার নিকটবর্তী হয়ো না।"[৩]

হাযেরীন, জঘন্যতম বর্বরতা হলো ধর্মের নামে অশ্লীলতা। বর্তমান যুগের বাউল, ফকীর, সন্যাসী নামের প্রতারকদের ন্যায় আরবের অনেক মানুষ ধার্মিকতার নামে বা যিক্র, দুআ, হজ্জ, ধ্যান ইত্যাদির সাথে বেপর্দা, নগ্নতা বা অশ্লীলতার সংমিশ্রণ ঘটাতো। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন:

وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

"যখন তারা কোনো অশ্লীল-বেহায়া কর্ম করে তখন বলে আমাদের পূর্বপুরুষরা এরূপ করতেন বলে আমরা দেখেছি এবং আল্লাহ আমাদেরকে এরূপ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। বল, আল্লাহ কখনোই অশ্লীলতার নির্দেশ দেন না, তোমরা কি আল্লাহর নামে এমন কিছু বলছ যা তোমরা জান না?"[৪]

ব্যভিচারের পথ রোধের অন্যতম দিক চক্ষু সংযত করা, অনাত্মীয় নারী-পুরুষের দিকে বা মনের মধ্যে জৈবিক কামনা সৃষ্টি করার মত কোনো কিছুর দিকে দৃষ্টিপাত না করা। আল্লাহ বলেন:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ... وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ

---

[১] সূরা আ'রাফ: ৩৩ আয়াত।
[২] সূরা ইসরা (বানী ইসরাঈল): ৩২ আয়াত।
[৩] সূরা আনআম: ১৫১ আয়াত।
[৪] সূরা আ'রাফ: ২৮ আয়াত।

وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

"মুমিনদেরকে বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের সম্ভ্রম হিফাজত করে ... মুমিন নারীদেরকে বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের সম্ভ্রম হিফাজত করে...।"[১]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ وَالأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الاسْتِمَاعُ وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلامُ وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى.

"চক্ষুদ্বয়ের ব্যভিচার দৃষ্টিপাত, কর্ণদ্বয়ের ব্যভিচার শ্রবণ, জিহ্বার ব্যভিচার কথা বলা, হাতের ব্যভিচার স্পর্শ করা, পায়ের ব্যভিচার পদক্ষেপ, অন্তরের ব্যভিচার কামনা...।"[২]

হাযেরীন, ভালবাসা দিবসের নামে যা কিছু করা হয় সবই এ পর্যায়ের ব্যভিচার, যা অধিকাংশ সময়ে চূড়ান্ত ব্যভিচারের পঙ্কিলতার মধ্যে নিমজ্জিত করে। আর এ ভয়ঙ্কর পাপের জন্য আখিরাতে রয়েছে ভয়ঙ্কর শাস্তি। আর তার আগেই দুনিয়াতেও রয়েছে ভয়াবহ গযব। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا إِلا فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلافِهِمِ الَّذِينَ مَضَوْا

"যখন কোন জাতির মধ্যে অশ্লীলতা এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ে যে তারা প্রকাশ্যে অশ্লীলতায় লিপ্ত হতে থাকে, তখন তাদের মধ্যে এমন সব রোগব্যাধি ছড়িয়ে পড়ে যা তাদের পুর্বপুরুষদের মধ্যে প্রসারিত ছিল না।"[৩]

হাযেরীন, এ হাদীস পড়ে ও শুনে পাশ্চাত্যের অনেক অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করেছেন। কারণ দেড় হাজার বছর পূর্বে রাসূলুল্লাহ ﷺ যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন তা আজ আমরা বাস্তবে দেখতে পাচ্ছি। অশ্লীলতার প্রসারের কারণে এইডস নামক ভয়াবহ রোগ দেখা দিয়েছে, যা ইতোপূর্বে প্রসারিত ছিল না।

হাযেরীন, আল্লাহর এ গযব থেকে বাঁচতে হলে গযবের কারণ রোধ করতে হবে। কিন্তু আজ এইডস প্রতিরোধের নামে বেহায়াপনা উস্কে দেওয়া হচ্ছে। অনেক সময় না বুঝে আমরা পাশ্চাত্যের হুবহু অনুকরণ করি। সাধু পৌল ও তার অনুসারীদের প্রতিষ্ঠিত খৃস্টধর্মে সকল পাপকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে। ফলে পাশ্চাত্যের খৃস্টান সমাজগুলি ব্যভিচারের মহামারিতে আক্রান্ত। "ব্যভিচার পাপ" একথা বলার মত কোনো সাহস বা সুযোগ সেখানকার পাদরীদেরও নেই। আর এজন্যই তাদেরকে শুধু সাবধানতা শেখাতে হয়। কিন্তু আমাদের সমাজ তা নয়। আল্লাহর রহমতে আমাদের সমাজ এ সকল মহামারী থেকে মুক্ত। আমরা যদি পাশ্চাত্যের হুবহু অনুকরণ করি, এইডস বিরোধী প্রচারণার নামে উস্কানিমুলক প্রচারণা করি, প্রজনন-স্বাস্থ্য নামে উস্কানিমূলক তথ্য আলোচনা করি, ব্যভিচার বিরোধী মনোভাব হালকা করার চেষ্টা করি তাহলে আল্লাহর গযব অতি তাড়াতাড়ি নামবে এবং অতি দ্রুত এইডস মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়বে।

এইডস প্রতিরোধের জন্য একটি অতি-পরিচিত শ্লোগান "বাঁচতে হলে জানতে হবে"। অর্থাৎ এইডস থেকে বাঁচতে হলে এইড বিষয়ে বিস্তারিত জানতে হবে। কথাটি ঠিক। তবে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যে, গত শতকের আশির দশকে এইডস আবিস্কৃত হয়েছে। বিগত প্রায় ত্রিশ বছরে বাংলাদেশের মানুষ এইডস সম্পর্কে কিছুই জানত না তা সত্ত্বেও বাংলাদেশে এইডস নেই বললেই চলে। আর আমেরিকার

---

[১] সূরা নূর: ৩০-৩১ আয়াত।

[২] মুসলিম, আস-সহীহ ৪/২০৭৪।

[৩] ইবনু মাজাহ, আস-সুনান ২/১৩৩২; হাকিম, আল-মুস্তাদরাক ৪/৫৮৩, আলবানী, সহীহুল জামি ২/১৩২১, সাহীহাহ ১/২১৬-২১৮।

মানুষেরা "বাঁচার জন্য যা জানার" প্রয়োজন সবই জানত, কিন্তু তা সত্ত্বেও সেখানে এইডস প্রায় মহামারী আকারে। এজন্য আমাদের সবচেয়ে বেশি জানতে হবে আমেরিকা, ইউরোপ, ভারত, বার্মা ও পার্শবর্তী দেশগুলিতে এইডস মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়লেও কেন তা বাংলাদেশে এখনো প্রায় নেই বললেই চলে? এর কারণ হলো ধর্মীয় ও নৈতিক চেতনা। বাংলাদেশের হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকলেই ব্যভিচারকে কঠিনতম পাপ বলে বর্জন করে, সকলেই একে কঠিনভাবে ঘৃণা করে, ব্যভিচার, প্রকাশ্যে বেহায়াপনা ও এতদসংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডকে কখনোই প্রশ্রয় দেয় না। পিতামাতা নামায রোযা না করলেও কখনোই সন্তানদের ব্যভিচারমুখিতা সহ্য করেন না। মাদকাশক্তির বিষয়েও একই অবস্থা। আর যতদিন এদেশে এ ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধ উজ্জীবিত থাকবে ততদিন কখনোই এদেশে এইডস দেখা যাবে না। বিদেশ থেকে ব্যভিচারের মাধ্যমে আমদানী করা দু চারজনের মধ্যেই তা সীমিত থাকবে। এজন্য আমরা যদি সত্যিকার অর্থেই এদেশকে এইডসমুক্ত রাখতে চাই তাহলে ধর্মীয় মূল্যবোধ বিকাশ ও মাদকাশক্তি ও ব্যভিচারের প্রতি ঘৃণা জাগরুক করতে হবে। এইডস বিরোধী প্রচারণায় মূল কথা হতে হবে, ব্যভিচার, অশ্লীতা ও মাদকতা হারাম, কাজেই এগুলি বর্জন কর, তাতেই এইডস থেকে রক্ষা পাবে। পাশাপাশি কখনো যদি রক্ত নিতে হয় তবে রক্ত পরীক্ষা করে নিবে এবং ইঞ্জেকশনের ব্যবহৃত সিরিঞ্জ ব্যবহার করবে না।

হাযেরীন, পাশ্চাত্য সভ্যতার অনেক ভাল দিক রয়েছে। তারা জাগতিকভাবে অনেক উন্নতি লাভ করেছে। তবে অশ্লীলতার প্রসারে যে অবক্ষয় তাকে স্পর্শ করেছে তা তার সকল অর্জনকে ম্লান করেছে এবং সার্বিক ধ্বংসের পথ উন্মুক্ত করেছে। 'ভালবাসা' উন্মুক্ত করে পথেঘাটে 'সহজলভ্য' করে দেওয়া হয়েছে। ফলে কেউই আর পরিবার গঠনের মত কঠিন ঝামেলাই যেতে চাচ্ছে না। পরিবার গঠন করলেও পরিবার টিকছে না। বিবাহ বিচ্ছেদের হার খুবই ভয়ঙ্কর। বিবাহেতর 'জৈবিক' ভালবাসার সহজলভ্যতাই এগুলির অন্যতম কারণ। ১৯৭০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় ৮০% মানুষ পারিবারিক জীবন যাপন করতেন। ২০০০ সালে সেদেশের প্রায় ৫০% মানুষ কোনোরকম পারিবারিক বন্ধন ছাড়া একেবারেই পৃথক ও একক জীবন যাপন করেন। বাকী ৫০% ভাগ যারা পরিবার গঠন করেছেন তাদেরও প্রায় তিনভাগের একভাগের কোনো সন্তান সন্ততি নেই। পরিবার গঠন, পরিবারের মধ্যে পবিত্র ভালবাসার লালন এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্ম ও লালন এখন 'সভ্য' মানুষদের উদ্দেশ্য নয়, বরং সভ্য মানুষদের উদ্দেশ্য কেবলমাত্র 'অসভ্য' পশুদের মত নিজে বেঁচে থাকা এবং আনন্দ-ফুর্তি করা। এজন্য ইউরোপে-আমেরিকায় পারিবারিক কাঠামো নষ্ট হয়ে গিয়েছে। সহিংসতা, স্বার্থপরতা ও হিংস্রতা অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

সম্মানিত উপস্থিতি, মানব সভ্যতা টিকিয়ে রাখার জন্য মানব সমাজে ভালবাসার প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠা আমাদের দায়িত্ব। পিতামাতা, স্বামী-স্ত্রী, সন্তানসন্ততি, সৎমানুষ, সকল মুসলমান এবং সকল মানুষের মধ্যে ভালবাসা ও সহমর্মিতার প্রসারের জন্য আমাদের সর্বদা সচেষ্ট থাকতে হবে। পারিবারিক কাঠামোর মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রেম-ভালবাসার স্থায়িত্ব ও বৃদ্ধির জন্য সাম্ভাব্য সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। তবে এ সকল ভালবাসার বাণী প্রচারের জন্য 'ভালবাসা দিবস'-কে বেছে নেওয়া বৈধ নয়। কারণ আমরা জানি যে, এ দিবসটি পৌত্তলিক ও খৃস্টানদের একটি ধর্মীয় দিবস। আর কোনো ধর্মের অনুসারীদের ধর্মীয় দিবস পালন করা কুফরী, যাতে মুমিনের ঈমান নষ্ট হয়ে যায়। আমরা জানি, পিতামাতা, আত্মীয় স্বজন বা বন্ধুদেরকে আপ্যায়ন করা বা শুভেচ্ছে বিনিময় করা একটি ভাল কর্ম। কিন্তু দুর্গাপূজা বা বড়দিন উপলক্ষ্যে কোনো মুমিন এ কাজ করলে তার ঈমান নষ্ট হবে, কারণ তিনি অন্য ধর্মের বিধান বা দিবস পালন করার মাধ্যমে নিজের ধর্ম বর্জন করেছেন। ভালবাসার দিবসে পিতামাতা, সন্ত ানসন্ততি বা স্বামী-স্ত্রীকে মেসেজ পাঠানো, শুভেচ্ছা জানানো বা উপহার দেওয়াও একই রকমের পাপ। এছাড়া যেহেতু দিবসটি ভালবাসার নামে বেহায়াপনা ও ব্যভিচার প্রচারের জন্যই নির্ধারিত, সেহেতু

কোনোভাবে এ দিবস পালন করার অর্থ এ দিবস পালনে সহযোগিতা করা এবং একে স্বীকৃতি দেওয়া।

হাযেরীন, যে যুবক-যুবতী তার যৌবনকে কলঙ্কমুক্ত ও পবিত্র রাখতে পারবে এবং আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগির মধ্যে থাকতে পারবে তাকে আল্লাহ কেয়ামতের দিন আল্লাহর প্রিয়তম আওলিয়াদের সাথে একই কাতারে মহান আরশের ছায়ায় স্থান দান করবেন বলে হাদীস শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি যুবক-কিশোর মুসল্লীদেরকে অনুরোধ করব, বয়সের উন্মাদনায় ভুলভ্রান্তি ও পাপ হয়ে যেতে পারে, তবে অন্তত দুটি বিষয় থেকে সর্বদা আত্মরক্ষা করবেঃ ব্যভিচার ও মাদকতা। আর যে কোনো অবস্থায় নামায ছাড়বে না। ইনশা আল্লাহ এ দুনিয়ার জীবনেই তোমাদের বয়স যখন ৪০/৫০ হবে তখন তোমরাই অনুভব করবে যে, তোমাদের যে সকল বন্ধু পাপের পথে পা বাড়িয়েছিল তাদের চেয়ে আল্লাহ তোমাদের ভাল রেখেছেন এবং কিয়ামতে তোমরা আল্লাহর আরশের নীচে মহান ওলীদের কাতারে স্থান লাভ করবে।

সম্মানিত উপস্থিতি, আমাদের নিজেদের সন্তানদের স্বার্থে, জাতির স্বার্থে, মানব সভ্যতার স্বার্থে এবং আমাদের আখিরাতের মুক্তির স্বার্থে 'ভালবাসার' নামে বেহায়াপনা ও ব্যভিচারের উস্কানি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে রোধ করা আমাদের অন্যতম জরুরী দায়িত্ব। 'ভালবাসা' দিবসের নামে যুবক-যুবতীদের আড্ডা, গল্পগুজব, মেসেজ আদান প্রদান, উপহার আদান প্রদান, উল্লাস করা বা অনুরূপ যে কোনো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিবাহেতর ভালবাসার উস্কানি দেওয়া শূকরের মাংস ভক্ষণ করার চেয়েও অনেক বেশি ভয়ঙ্কর পাপ। আমরা জানি, শূকরের মাংস ভক্ষণ করা যেমন হারাম, তেমনি হারাম ব্যভিচারের উস্কানিমূলক সকল কর্ম। তবে পার্থক্য এই যে, শূকরের মাংস একবার ভক্ষণ করলে বারবার ভক্ষণ করার অদম্য আগ্রহ সৃষ্টি হয় না, কিন্তু যে কোনো উপলক্ষে কিশোর-কিশোরী ও যুবক-যুবতী 'ভালবাসা'-র নামে ফ্রি মেলামেশা বা আড্ডার খপ্পরে পড়লে তার মধ্যে এ বিষয়ে অদম্য আগ্রহ তৈরী হয় এবং ক্রমান্বয়ে সে ব্যভিচার ও আনুষঙ্গিক সকল পঙ্কিলতার মধ্যে ডুবে যায়।

হাযেরীন, সতর্ক হোন! ভালবাসা দিবস বা অন্য কোনো নামে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা সমর্থন করা, প্রশ্রয় দেওয়া বা অশ্লীলতার বিরুদ্ধে সোচ্চার না হওয়া আপনার দুনিয়া ও আখিরাতের জীবন ধ্বংস করবে এবং আপনার, আপনার পরিবার ও সমাজে আল্লাহর সুনিশ্চিত গযব বয়ে আনবে। বিষয়টিকে সহজ ভাবে নিবেন না। নিজের ব্যবসা, রাজনীতি বা অন্য কোনো স্বার্থের কারণে এ দিবস পালনে সহযোগিতা করবেন না। মহান আল্লাহ কুরআন কারীমে বলেছেন:

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ

"যারা চায় যে, মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রচার ঘটুক তাদের জন্য পৃথিবীতে এবং আখিরাতে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আর আল্লাহ্ জানেন, তোমরা জান না।"[১]

সাবধান! মহান আল্লাহর প্রতিশ্রুতিকে হালকা করে দেখবেন না!! কখন কিভাবে আপনার জীবনে দুনিয়াতেই 'যন্ত্রণা দায়ক শাস্তি' নেমে আসবে আপনি তা অনুমানও করতে পারবেন না। রোগব্যধি, জাগতিক অপমান, শাস্তি, লাঞ্ছনা, পরিবারের অশান্তি সন্তানদের অধঃপতন ইত্যাদি বিভিন্ন ভাবে আল্লাহর শাস্তি আপনার জীবনকে স্পর্শ করতে পারে। কাজেই আল্লাহর শাস্তিকে ভয় করুন। অশ্লীলতার সকল পথ রোধে সচেষ্ট হোন। অন্তত কোনোভাবে অশ্লীলতার প্রসারে সহায়ক হবেন না। মহান আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক প্রদান করুন। আমীন!!

---

[১] সূরা ২৪ নূর: ১৯ আয়াত।

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

أَمَّا بَعْدُ، فَيَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ، قَالَ اللهُ تَعَالَىَ: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ

وقَالَ: وَلا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ

وَقَالَ: إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّـذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآَخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْـتُمْ لا تَعْلَمُونَ

وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَـمْ تَظْهَـرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُـوا بِهَـا إِلا فَـشَا فِـيهِمُ الطَّاعُونُ وَالأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِـي أَسْـلافِهِمِ الَّذِينَ مَضَوْا

بَارَكَ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ فِيْ الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ. وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ. أَقُـوْلُ قَـوْلِيْ هَـذا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُـلِّ ذَنْـبٍ، فَاسْتَغْفِرُوْهُ وَتُوْبُوْا إِلَيْهِ، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.

যুলকাদ মাসের ৩য় খুতবাঃ পানাহার, মাদকতা ও ধুমপান

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লী আলা রাসূলিহীল কারীম। আম্মা বাদ,

সম্মানিত উপস্থিতি, আজ যুলকাদ মাসের তৃতীয় জুমুআ। আজ আমরা পানাহার, মাদকতা ও ধুমপান বিষয়ে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ। কিন্তু তার আগে আমরা এ সপ্তাহের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসগুলির বিষয়ে সংক্ষেপ আলোকপাত করি। হাযেরীন, আজ ইংরেজী ..... মাসের ..... তারিখ। এ সপ্তাহের দিবসগুলির মধ্যে রয়েছে .... ।

সম্মানিত উপস্থিতি, মানব জীবনের অপরিহার্য দিক হলো পানাহার। পবিত্র ও কল্যাণকর সকল খাদ্য ও পানীয় আল্লাহ বৈধ করেছেন এবং ধর্মের নামে, বেশি ইবাদতের আশায়, বৈরাগ্যের জন্য, কৃচ্ছতার জন্য বা আখিরাতের উন্নাতির জন্য বৈধ কোনো খাদ্যকে অবৈধ করা বা বৈধ কোনো খাদ্যকে আত্মিক উন্নতীর জন্য ক্ষতিকর বলে গণ্য করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ...

"তোমরা আহার কর এবং পান কর, আর অপচয় করো না; তিনি অপচয়কারীদের ভালবাসেন না। বল, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য যে সৌন্দর্য ও পবিত্র রিযক প্রদান করেছেন তা কে হারাম করল? এগুলি তো মুমিনদের দুনিয়ার জীবনের জন্য এবং কিয়ামতে শুধু তাদের জন্যই... ।"[১]

বৈধ ও অবৈধ খাদ্য ও পানীয়ের বিষয়ে ইসলামের মূলনীতি হলো পবিত্র ও কল্যাণকর দ্রব্য বৈধ, আর ক্ষতিকর, নোংরা ও সাধারণভাবে মানব প্রকৃতির কাছে ঘৃণ্য বিষয়গুলি অবৈধ। এরমধ্যে কুরআন ও হাদীসে কিছু বিষয়কে সুস্পষ্টরূপে হালাল বা হারাম বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"তিনি তো শুধু হারাম করেছেন তোমাদের জন্য মৃতপ্রাণী, রক্ত, শূকরের মাংস এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে বা সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে জবাইকৃত প্রাণী। তবে যে অনোন্যপায় কিন্তু নাফরমান অথবা সীমালঙ্ঘনকারী নয় তার কোনো পাপ হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।"[২]

রাসূলুল্লাহ ﷺ সকল হিংস্র ও মাংশাসী বা দাত দিয়ে শিকার কারী প্রাণী ও নখ দিয়ে শিকারকারী পাখী হারাম বলে ঘোষণা করেছেন।[৩]

পানাহারের ক্ষেত্রে ইসলামের নির্দেশনা হলো মধ্যপন্থা অবলম্বন করা। দরবেশী করে বৈধ খাদ্য সর্বদা বর্জন করা যেমন নিষিদ্ধ, তেমনি সর্বদা ভালমন্দ খাওয়ার পিছনে ছোটা এবং অতিরিক্ত পানাহার করা নিষিদ্ধ। মহান আল্লাহ বলেন:

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلا تَطْغَوْا فِيهِ

"তোমাদেরকে যে পবিত্র রিযক প্রদান করেছি তা থেকে ভক্ষণ কর এবং তাতে সীমালঙ্ঘন করো না।"[৪]

---

[১] সূরা আরাফ: ৩১-৩২ আয়াত।
[২] সূরা বাকারা: ১৭৩ আয়াত।
[৩] বুখারী, আস-সহীহ ৫/২১০২, ২১০৩, ২১৭৯; মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৫৩৩-১৫৩৪।
[৪] সূরা তাহা: ৮১ আয়াত।

হাযেরীন, রাসূলুল্লাহ ﷺ অতি-ভোজনের নিন্দা করে বলেন:

مَا مَلأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ حَسْبُ الآدَمِيِّ لُقَيْمَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ فَإِنْ غَلَبَتْ الآدَمِيَّ نَفْسُهُ فَثُلُثٌ لِلطَّعَامِ وَثُلُثٌ لِلشَّرَابِ وَثُلُثٌ لِلنَّفَسِ

"আদম সন্তান তার নিজের পেটের চেয়ে নিকৃষ্টতর কোনো পাত্র পূর্ণ করে নি। দেহকে সুস্থ-সবল কর্মক্ষম রাখতে যতটুকু খাদ্য প্রয়োজন ততটুকুই একজন মানুষের জন্য যথেষ্ট। যদি কোনো মানুষের খাদ্যস্পৃহা বেশি প্রবল হয় (বেশি খাওয়ার ইচ্ছা দমন করতে না পারে) তবে সে পেটের এক তৃতীয়াংশ খাদ্যের জন্য, এক তৃতীয়াংশ পানীয়ের জন্য ও এক তৃতীয়াংশ শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য রাখবে।"[১]

হাযেরীন, সুন্নাতই হলো মুমিনের সাওয়াব ও নাজাতের একমাত্র পথ। রাসূলুল্লাহ ﷺ যে কর্ম যেভাবে করেছেন তা অবিকল সেভাবে করার নামই সুন্নাত। তিনি যা করেন নি তা না করাই সুন্নাত। সুন্নাতের ব্যতিক্রম কাজ দু প্রকারের। প্রথমত যা তিনি করেন নি এবং করতে নিষেধ করেছেন। এরূপ বিষয় নিষিদ্ধ ও অবৈধ। দ্বিতীয়ত, যে কর্ম তিনি করেন নি এবং করতে নিষেধও করেন নি। এরূপ কর্ম জায়েয় বা বৈধ পর্যায়ের। প্রয়োজনে, বাধ্য হয়ে, প্রাকৃতিক কারণে এরূপ কর্ম করা যায়। কিন্তু তাতে কোনো সাওয়াব হবে না। এরূপ কর্মের মধ্যে সাওয়াব কল্পনা করলে তা বিদ'আতে পরিণত হয়। কারণ এতে দাবি করা হয় যে, কিছু কাজে সাওয়াব রয়েছে, কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ সে সাওয়াব অর্জন করতে পারেন নি, কিন্তু আমরা তা অর্জন করছি। এছাড়া এরূপ চিন্তার অর্থই হলো সুন্নাতের মধ্যে পূর্ণ সাওয়াব অর্জন সম্ভব নয়, সাওয়াবের জন্য সুন্নাতের অতিরিক্ত কিছু কর্মের প্রয়োজন আছে। এভাবে সুন্নাতকে অবজ্ঞা করা হয়।

হাযেরীন, পানাহারের ক্ষেত্রেও মুমিনের দায়িত্ব যথাসম্ভব সুন্নাত অনুসরণ করা। প্রতিদিন তো আমাদেরকে প্রাকৃতিক প্রয়োজনে পানাহার করতেই হচ্ছে। যদি আমরা এক্ষেত্রে সুন্নাতের অনুসরণ করতে পারি তবে অফুরন্ত সাওয়াব লাভ করতে পারি। স্বল্প আহার রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অন্যতম সুন্নাত। মেহমানদারির প্রয়োজন ছাড়া তিনি পেট ভরে আহার করতেন না, বরং পেট কিছুটা খালি রাখতেন। বেশি খেলে ভরা পেটের ঢেকুর ওঠে। কেউ তার সামনে ঢেকুর তুললে তিনি আপত্তি করতেন এবং তাকে সরে যেতে বলতেন। ইসলামের এ আদবটির বিষয়ে আমরা অনেকেই অসচেতন।

পানাহারের ক্ষেত্রে স্বল্পাহারের পাশাপাশি আরেকটি সুন্নাত হলো বিনয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ খাওয়ার জন্য বিনীতভাবে মাটিতে বসা পছন্দ করতেন। তিনি বলতেন, আমি রাজার মত নয়, বরং দাসের মত বসতে চাই। তিনি সাধারণত মাটিতে বসে খাদ্য দস্তরখানের উপর রেখে খেতেন। আনাস (রা) বলেন:

مَا أَكَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى خِوَانٍ وَلا فِي سُكُرُجَةٍ وَلا خُبِزَ لَهُ مُرَقَّقٌ. قُلْتُ لِقَتَادَةَ عَلامَ يَأْكُلُونَ قَالَ عَلَى السُّفَرِ

"রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো টুল বা টেবিলের উপর খান নি, প্লেট-পেয়ালায় খান নি এবং কখনো মিহি আটার রুটি খান নি। হাদীসের বর্ণনাকারী তাবিয়ী কাতাদা বলেন, তাঁরা দস্তরখানের উপর খেতেন।"[২]

এগুলি সবই তাঁর বিনয় ও সাদাসিদে জীবন যাপনের চিত্র ও আমাদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ। আমাদের দায়িত্ব, যথাসাধ্য এভাবে সুন্নাত অনুসারে পানাহার করা। তিনি যা করেন নি বা বর্জন করেছেন তা না করা বা বর্জন করাই সুন্নাত। হুবহু তাঁর অনুকরণই সুন্নাত। তবে এর অর্থ এ নয় যে, চেয়ার-টেবিলে খাওয়া, পিরিচ-পেয়ালা ও প্লেটে খাওয়া, সাদা আটা বা ময়দার রুটি খাওয়া বা দস্তরখানে খাবার না রেখে প্লেটে রেখে খাওয়া অবৈধ, নিষিদ্ধ বা মাকরূহ। তা কখনোই নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ এগুলি ব্যবহার করতে

---

[১] ইবনু মাজাহ, আস-সুনান ২/১১১১; তিরমিযী, আস-সুনান ৪/৫৯০; হাকিম ৪/১৩৫, ৩৬৭। হাদীসটি সহীহ।

[২] বুখারী, আস-সহীহ ৫/২০৫৯, ২০৬৬।

কখনো নিষেধ করেন নি। কাজেই জাগতিক প্রয়োজনে বা দেশীয় রীতির কারণে এগুলি ব্যবহারে কোনো দোষ নেই। তবে এতে সুন্নাতের সাওয়াব থেকে মাহরূম হতে হবে।

পানাহারের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাতের মধ্যে রয়েছে শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা, শেষে আল-হামদু লিল্লাহ বলা, পানাহারের আগে ও পরে হাত ধৌত করা, খাওয়ার সময় তিন আঙুল ব্যবহার করা, খাওয়ার পরে হাতের আঙুল ও প্লেট পরিস্কার করে চেটে খাওয়া, পানাহার শেষে দুআ করা ইত্যাদি।

হাযেরীন, খাদ্য ও পানীয়ের একটি বিশেষ প্রকার হলো মাদকতাযুক্ত খাদ্য বা পানীয়। আমরা মানব সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই যে, মানবীয় অপরাধ, পারিবারিক ও সামাজিক অবক্ষয় ও বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ হলো মাদকতা, অশ্লীলতা ও জুয়া। আধুনিক সভ্যতার সকল অবক্ষয়ের মূল বিষয়ও এগুলি। মদপান ও মাদকাসক্তি শুধু আক্রান্ত ব্যক্তিরই ক্ষতি করে না, উপরন্তু তার আশপাশের সকলেরই ক্ষতি করে। বিশেষত উক্ত ব্যক্তির স্ত্রী ও পরিবার পরিজন সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সকল বিবেকবান মানুষই মদের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন, কিন্তু কেউই তা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন নি। প্রায় আড়াই শতাব্দী ধরে ইউরোপ ও আমেরিকায় মদ নিষিদ্ধ ও নিয়ন্ত্রণ করার জন্য অনেক আন্দোলন হয়েছে। নারীরা এ সকল আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন। এ সকল আন্দোলনের ভিত্তিতে গত শতাব্দীতে ইউরোপের অনেক দেশে মদ নিষিদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়। আমেরিকায় ১৯২০ সালে মদ নিষিদ্ধ করা হয়। কিন্তু মদব্যবসায়ী ও মাদকাসক্তদের চাপে ১৯৩৩ সালে তা আবার বৈধ করা হয়।

মদ, মাদকতা, মাদকাসক্তি, মদ-নির্ভরতা (Alcoholism or Alcohol Dependence) আধুনিক সভ্যতার ভয়ঙ্করতম ব্যধিগুলির অন্যতম। এর ফলে নানাবিধ দৈহিক অসুস্থতা, মানসিক অসুস্থতা, লিভার সিরোসিস সহ অন্যান্য মরণব্যধিতে আক্রান্ত হয় মানুষ। বিশ্বে অগণিত সফল ব্যবসায়ী, চাকুরীজীবি, দক্ষ টেকনিশিয়ান, শ্রমিক ও অনুরূপ সফল মানুষদের জীবন ও পরিবার ধ্বংস হয়েছে মদের কারণে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা WHO -এর পরিসংখ্যান অনুসারে বিশ্বের ৭৬ মিলিয়ন বা প্রায় ৮ কোটি মানুষ মদ পানের কারণে সৃষ্ট বিভিন্ন রকমের কঠিন রোগে ভুগছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মোট জনসংখ্যার শতকরা ১৫ ভাগ মদপান জনিত সমস্যাদিতে ভুগছেন। ধর্মীয় অনুভূতি একেবারেই নষ্ট করার কারণে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে রাশিয়ার মানুষেরা। রাশিয়ার মোট জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ মদপান জনিত মারাত্মক রোগব্যধিতে ভুগছেন। বর্তমান যুগে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞগণ মদপান ও মদ-নির্ভরতাকে বিশ্বের অন্যতম প্রধান স্বাস্থ্য সমস্যা বলে চিহ্নিত করছেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা WHO এর পরিসংখ্যান অনুসারে বর্তমান বিশ্বের সকল রোগব্যাধির শতকরা ৩.৫ ভাগ হলো মদপান জনিত। মদপান জনিত রোগব্যাধি ও সম্পদ ধ্বংসের কারণে প্রতি বৎসর শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই ১৮৫ বিলিয়ন ডলার নষ্ট হয়।[১]

হাযেরীন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরিসংখ্যান প্রমাণ করে যে, ধুমপান ও ড্রাগের চেয়েও মদপান মানব সভ্যতার জন্য বেশি ক্ষতিকর, অথচ বর্তমানে পাশ্চাত্য বিশ্ব ধুমপান ও "ড্রাগ"-এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হলেও "মদের" বিরুদ্ধে সোচ্চার নয়। কারণ মদপান সমস্যার সমাধান সম্ভব নয় বলেই তারা ধরে নিয়েছে। যদিও এইডস, ক্যানসার ও অন্যান্য মরণব্যাধির চেয়েও মদ মারাত্মক সমস্যা। আর একমাত্র ইসলামই এ সমস্যা সফলভাবে সমাধান করেছে। ইসলাম মদপান ও সকল প্রকার মাদকদ্রব্য হারাম করেছে এবং ভয়ঙ্করতম কবীরা গোনাহ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। ফলে ঈমানের চেতনায় অধিকাংশ মুসলিম মদপান থেকে বিরত থাকেন। অতি সামান্য সংখ্যক মানুষ হয়ত প্রবৃত্তির প্ররোচনায় মদপান করে ফেলেন। মদপান যেন সমাজে প্রশ্রয় না পায় এবং ঘৃণিত ও নিন্দিত থাকে এজন্য ইসলামী

---

[১] দেখুন: মাইক্রোসফট এনকার্টা, Articles: Alcohol, Alcoholism, Prohibition, Wine.

আইনে মদপান, মাদক দ্রব্য গ্রহণ বা মাতলামির জন্য প্রকাশ্য বেত্রাঘাতের শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে। কেউ প্রকাশ্যে মাদপান করলে, মাদক গ্রহণ করলে বা মাতলামি করলে এবং তার অপরাধ প্রমাণিত হলে সে এ শাস্তি পাবে। এভাবে ঈমান, তাকওয়া ও আইনের মাধ্যমে মানব সভ্যতার ভয়ঙ্করতম ব্যধি মদ ও মাদকতা ইসলাম সবচেয়ে সফলভাবে নিয়ন্ত্রণ বরং নির্মূল করেছে। আল্লাহ বলেন:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

"তারা তোমাকে মদ এবং জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে। তুমি বল এতদুভয়ের মধ্যে বড় পাপ রয়েছে এবং মানুষের জন্য কিছু কল্যাণ রয়েছে। তাদের উপকারের চেয়ে তাদের পাপ অধিকতর।"[১]

সভ্যতার ইতিহাস ও বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে, মদ বা জুয়ার মধ্যে যে কল্যাণকর দিক তা খুবই সামান্য আর এর অকল্যাণ ভয়ানক ও ভয়ঙ্কর। আর এজন্যই ইসলাম এগুলি নিষিদ্ধ করেছে। আল্লাহ বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

"হে মুমিনগণ, মদ, জুয়া, পূজার বেদি ও ভাগ্যনির্ধারক তীর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কর্ম, কাজেই তোমরা তা বর্জন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চার করতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণে ও সালাতে বাধা দিতে চায়। তাহলে তোমরা কি বিরত হবে না?"[২]

রাসূলুল্লাহ ﷺ মদপান বা মাদক দ্রব্য গ্রহণের ভয়ঙ্কর পরিণতি সম্পর্কে উম্মাতকে সাবধান করেছেন। কোনো মানুষ যখন মদপান করে বা মাদকদ্রব্য গ্রহণ করে তখন সে আর মুমিন থাকে না। মাদকদ্রব্যের ব্যবহারকারী, প্রস্তুতকারী, সরবরাহকারী, বহনকারী, বিক্রেতা, ক্রেতা বা কোনোভাবে মদ বা মাদক ব্যবসায়ের উপার্জন ভোগকারী অভিশপ্ত বলে তিনি বারংবার বলেছেন। কয়েকটি হাদীস শুনুন:

لا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ

"ব্যভিচারী যখন ব্যভিচার করে তখন সে মুমিন থাকে না; মদপানকারী যখন মদপান করে তখন সে মুমিন থাকে না; চোর যখন চুরি করে তখন যে মুমিন থাকে না।"[৩]

لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَآكِلَ ثَمَنِهَا

"মহান আল্লাহ মদকে অভিশপ্ত করেছেন। আর অভিশপ্ত করেছেন মদ পানকারীকে, মদ সরবরাহকারীকে, মদ বিক্রেতাকে, মদ ক্রেতাকে, মদ প্রস্তুতকারককে, মদ প্রস্তুতের ব্যবস্থাকারীকে, মদ বহনকারীকে, যার নিকট মদ বহন করা হয় তাকে এবং মদের মূল্য যে ভক্ষণ করে তাকে।"[৪]

---

[১] সূরা বাকারা: ২১৯ আয়াত।
[২] সূরা মায়িদা: ৯০-৯১ আয়াত।
[৩] বুখারী, আস-সহীহ ২/৮৭৫, ৫/২১২০, ৬/২৪৮৭, ২৪৮৯, ২৪৯৭; মুসলিম, আস-সহীহ ১/৭৬-৭৭।
[৪] আবূ দাউদ ৩/৩২৬; তিরমিযী ৩/৫৮৯; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ২/৩৭; আলবানী, সহীহুত তারগীব ২/২৯৭। হাদীসটি সহীহ।

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

সকল মাদকদ্রব্যই মদ বলে গণ্য এবং সকল মাদকদ্রব্যই হারাম।"[১]

ثَلاثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَالْعَاقُّ وَالدَّيُّوثُ الَّذِي يُقِرُّ فِي أَهْلِهِ الْخَبَثَ

তিন ব্যক্তির জন্য আল্লাহ জান্নাত হারাম বা নিষিদ্ধ করেছেন: মাদকাসক্ত ব্যক্তি, পিতামাতার অব্যাধ্য ব্যক্তি ও দাইয়ূস ব্যক্তি যে, নিজের স্ত্রী-পরিবারের অশ্লীলতা মেনে নেয়।"[২]

اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ

"তোমরা মদ-মাদকদ্রব্য বর্জন করবে; কারণ তা হলো সকল অকল্যাণ ও ক্ষতির উৎস।"[৩]

হাযেরীন, মদ ও মাদকদ্রব্যের ন্যায় ধুমপানও মানবদেহের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। তামাক সেবন ও ধুমপান রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে তাঁর সমাজে বিদ্যমান ছিল না। প্রায় হাজার বছর পরে তা বিভিন্ন মানব সমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। পানাহার ও জাগতিক বিষয়ে একটি মূলনীতি হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে বিদ্যমান না থাকার কারণে যে সকল খাদ্য ও পানীয় সম্পর্কে তার কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশনা নেই, সে বিষয়ে তাঁর অন্যান্য নির্দেশনার আলোকে ইজতিহাদ করতে হবে। তামাক ও ধুমপান প্রচলিত হওয়ার পরে কোনো কোনো ফকীহ মত প্রকাশ করেন যে, তা "মুবাহ" বা বৈধ; কারণ তা অবৈধ করার মত কোনো সুনির্দিষ্ট কারণ পাওয়া যায় না। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই অধিকাংশ ফকীহ মত প্রকাশ করেন যে, ধুমপান মাকরূহ, অর্থাৎ শরীয়তের দৃষ্টিতে অন্যায় ও অপছন্দনীয় কর্ম। এর কারণ হিসেবে তারা উল্লেখ করেন যে, দেহে বা মুখে দুর্গন্ধ সৃষ্টি করতে পারে এমন খাদ্য ভক্ষণ করতে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন। বিশেষত এরূপ খাদ্য ভক্ষণ করে মসজিদে গমন করতে নিষেধ করে তিনি বলেন:

مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ يَعْنِي الثُّومَ فَلا يَأْتِيَنَّ الْمَسَاجِدَ أَو لا يُصَلِّيَنَّ مَعَنَا، ولا يُؤْذِيَنَّا بِرِيحِ الثُّومِ حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهَا فَإِنَّ الْمَلائِكَةَ تَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الإِنْسُ

"যদি কেউ রসুন খায় তবে সে যেন তার দুর্গন্ধ দূর না হওয়া পর্যন্ত মসজিদে না আসে বা আমাদের সাথে সালাত আদায় না করে এবং রসুনের দুর্গন্ধ দিয়ে আমাদেরকে কষ্ট না দেয়; কারণ মানুষ যা থেকে কষ্ট পায়, ফিরিশতাগণও তা থেকে কষ্ট পান।"[৪]

এ হাদীস ও এ অর্থের আরো অনেক হাদীসের আলোকে ফকীহগণ বলেছেন যে, পিয়াজ, রসুন বা কোনো দুর্গন্ধযুক্ত খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ করে মুখে বা দেহে তার দুর্গন্ধ নিয়ে মসজিদে গমন করা মাকরূহ। আর ধুমপানের মাধ্যমে মুখে যে দুর্গন্ধ হয় তা পিঁয়াজ বা রসুনের দুর্গন্ধের চেয়ে অনেক বেশি কষ্টদায়ক। বিশেষত অধুমপায়ীদের জন্য এবং স্বভাবতই ফিরিশতাগণের জন্য। আর পিয়াজ, রসুন ইত্যাদি খেয়ে মুখের দুর্গন্ধ দূর করে মসজিদে যাওয়ার সুযোগ আছে, কিন্তু ধূমপানের দুর্গন্ধের ক্ষেত্রে তা মোটেও সম্ভব নয়। এজন্য অধিকাংশ ফকীহ একমত হন যে, ধুমপান সর্বাবস্থায় মাকরূহ।

পরবর্তীকালে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রমাণিত হয় যে, ধুমপান মানবদেহের জন্য ক্ষতিকারক। এজন্য আধুনিক যুগের অধিকাংশ আলিম ধুমপান হারাম বলেছেন। কারণ তা সুনিশ্চিতরূপে ক্ষতিকারক, তা অপচয় এবং তা খবীস বা দুর্গন্ধময়। আর আল্লাহ স্বহস্তে নিজেকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিতে ও

[১] বুখারী, আস-সহীহ ৪/১৫৭৯, ৫/২২৬৯, ৬/২৬২৪; মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৫৮৫-১৫৮৭।
[২] আহমদ, আল-মুসনাদ ২/৬৯, ১২৮; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৪/৩২৭; আলবানী, সহীহুত তারগীব ২/২৯৯। হাদীসটি হাসান।
[৩] হাকিম, আল-মুসতাদরাক ৪/১৬২। হাদীসটি সহীহ। আরো দেখুন: ইবনু মাজাহ, আস-সুনান ২/১১১৯, ১৩৩৯।
[৪] বুখারী, আস-সহীহ ১/২৯২, ২৯৩; মুসলিম, আস-সহীহ ১/৩৯৩-৩৯৫।

অপচয় করতে নিষেধ করেছেন এবং খবীস দ্রব্য হারাম করেছেন। আল্লাহ বলেন:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

"তিনি তাদের জন্য পবিত্র বস্তুগুলি হালাল করেন এবং নোংরা-খবিস বস্তুগুলি হারাম করেন।"[১]

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

"আর তোমরা নিজ হাতে নিজদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না।"[২]

وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ

"আর অপচয় করো না; নিশ্চয় অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই।"[৩]

হাযেরীন, ৩১শে মে বিশ্ব তামাক মুক্ত দিবস এবং ২৬শে জুন বিশ্ব মাদকমুক্ত দিবস পালন করা হয়। পাশ্চাত্যের সভ্যতা সাম্রাজ্যবাদী বেনিয়াদের অর্থ ও প্রভাবের নিয়ন্ত্রণাধীন। মদ ও সিগারেট বিক্রয় করে কোটি কেটি টাকা উপার্জন করে তা থেকে কয়েক লক্ষ টাকা মাদক নিয়ন্ত্রণ ফান্ডে জমা দিয়ে বাহবা নিচ্ছেন। তাদের চক্রান্তে পাশ্চাত্যের রীতি হলো, সর্বত্র সিগারেট ও মদের ব্যাপক সাপ্লাই রাখ, ধুমপান ও মদপানের সকল সুযোগ ও ব্যবস্থা কর, এগুলির পক্ষে চিত্তাকর্ষক বিজ্ঞাপন প্রচার কর এবং পাশাপাশি ধুমপান ও মদপানের ক্ষতিকর দিকগুলি তুলে ধরে মাঝে মাঝে বা বছরে একবার মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে আলোচনা কর। জন সাধারণের রক্ত চুষে মদ, ড্রাগস, ও তামাক ব্যবসায়ীরা কোটি কোটি ডলার কামাই করছেন। এদের কাল টাকার দৌরাত্মে সেমিনার সিম্পোজিয়ামে আমাদের শুনতে হয় যে, মদ বা সিগারেট একেবারে নিষিদ্ধ করলে মানুষের ব্যক্তিগত অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হয়, অথবা সরকারের ট্যাক্স কমে যাবে, অথবা কালোবাজারী বেড়ে যাবে, অথবা, অথবা ..। হাযেরীন, আত্মহত্যা করা, সমাজ, রাষ্ট্র বা পরিবার ধ্বংস করা কোনো মানবাধিকার নয়। সভ্যতার অর্থই হলো ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সীমাবদ্ধতা এবং পরিবার, সমাজ ও আশপাশের পরিবেশ-প্রকৃতির স্বার্থে মানুষের ব্যক্তিগত অধিকার খর্ব ও নিয়ন্ত্রিত করা। যে সভ্যতা মানুষের মাথায় টুপি, পাগড়ি বা ওড়না দেওয়ার অধিকার আইন করে কেড়ে নেয়, সে সভ্যতাই আবার মানবাধিকারের নামে মদ বা ড্রাগস নিষিদ্ধ করতে দেয় না। কয়েক কোটি টাকা ট্যাক্সের নামে মদ বা সিগারেট বৈধ করছে, অথচ এর কারণে প্রতি বৎসর কোটি কোটি টাকা স্বাস্থ্য খাতে নষ্ট হচ্ছে, লক্ষ লক্ষ নাগরিকের জীবন ধ্বংস হচ্ছে।

হাযেরীন, বিশ্বের ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে, একমাত্র ইসলামের পদ্ধতিতেই মাদকতা ও মাদকাসক্তি নির্মূল করা সম্ভব। আর তা হলো, মদ ও মাদক দ্রব্যর অবৈধতা ও ভয়াবহতা বিষয়ে কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনাবলি বেশি বেশি প্রচার করা, এর বিরুদ্ধে প্রগাঢ় ঘৃণা সৃষ্টি করা এবং ইসলামী আইনেরর সঠিক প্রয়োগ করা। সকল মুসলিমের দায়িত্ব এ বিষয়ে সচেতন হওয়া ও আদেশ, নিষেধ ও দাওয়াতের মাধ্যমে জনসচেতনতা তৈরি করা। যারা প্রশাসনিক দায়িত্বে রয়েছেন এবং বিশেষত যারা মাদক নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব রয়েছে তাদের সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে এ আমানত আদায় করার। দুনিয়ার আদালতকে ফাঁকি দেওয়া যায়, কিন্তু আল্লাহর আদালতকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। মহান আল্লাহ আমদের জাতিকে সাম্রাজ্যবাদী বেনিয়াদের ষড়যন্ত্র ও মাদকতার করাল গ্রাস থেকে রক্ষা করুন। আমীন।

---

[১] সূরা আরাফ: ১৫৯ আয়াত।

[২] সূরা বাকারা: ১৯৫ আয়াত।

[৩] সূরা বণী ইসরাঈল: ২৬-২৭ আয়াত।

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

أَمَّا بَعْدُ، فَيَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مَلأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ حَسْبُ الآدَمِيِّ لُقَيْمَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ فَإِنْ غَلَبَتْ الآدَمِيَّ نفسُهُ فَثُلُثٌ لِلطَّعَامِ وَثُلُثٌ لِلشَّرَابِ وَثُلُثٌ لِلنَّفَسِ

وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَآكِل ثَمَنِهَا

بَارَكَ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ فِيْ الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ. وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ. أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ، فَاسْتَغْفِرُوْهُ وَتُوْبُوْا إِلَيْهِ، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.

যুলকাদ মাসের ৪র্থ খুতবা: যুলহাজ্জের তের দিন ও আল্লাহর যিক্র

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লী আলা রাসূলিহীল কারীম। আম্মা বাদ,

সম্মানিত উপস্থিতি, আজ যুলকাদ মাসের ৪র্থ জুমুআ। আজ আমরা যুলহাজ্জ মাসের প্রথম দশ দিন, আরাফার দিন এ সময়ের নেক আমল সম্পর্কে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ। কিন্তু তার আগে আমরা এ সপ্তাহের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসগুলির বিষয়ে সংক্ষেপ আলোকপাত করি। হাযেরীন, আজ ইংরেজী ..... মাসের ..... তারিখ। এ সপ্তাহের দিবসগুলির মধ্যে রয়েছে ....।

হাযেরীন, ইসলামী আরবী ক্যালেন্ডারের সর্বশেষ মাস হলো যুলহাজ্জ মাস। এ মাসেই হাজ্জীগণ হজ্জ আদায় করেন। এ মাসের ৮ তারিখ থেকে হজ্জের কার্যক্রম শুরু হয়। ৮ তারিখকে 'ইয়াওমুত তারবিয়া' বা পানি পানের দিবস। এ দিবসেই হাজীগণ মক্কা থেকে মিনায় গমন করেন। পরদিন ৯ই যুলহজ্জা ইয়াওমু আরাফা বা আরাফাতের দিবস। এ দিবসে সকালে হাজীগণ মিনা থেকে আরাফাতের মাঠে গমন করেন এবং সারাদিন আরাফাতে অবস্থান করে আল্লাহর যিকর ও দুআয় রত থাকেন। রাতে তারা মুযদালিফায় ফিরে আসেন এবং পরদিন সকালে ১০ই যুলহাজ্জ তারা মিনায় জামারাতে কাঁকর নিক্ষেপ, মাথা মুণ্ডন, হজ্জের পশু জবাই বা হাদয়ী ও কুরবানী আদায়, তাওয়াফ-সায়ী ইত্যাদি হজ্জের আহকাম পালন করেন। পরবর্তী ২ বা ৩ দিন তারা মিনাতেই অবস্থান করেন।

হাযেরীন, যারা হজ্জে গমন করেন না, তাদের জন্যও যুলহাজ্জ মাসটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাস। এ মাসের দশ তারিখে আমরা ঈদুল আযহা বা কুরবানীর ঈদ আদায় করি। এ ছাড়াও এ মাসের প্রথম দশটি দিন মুমিনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফযীলতের দিন, যে বিষয়ে আমাদের অনেকেই সচেতন নই। বিভিন্ন সহীহ হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, যুলহাজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনের নেক আমল আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয়। সহীহ বুখারী অন্যান্য গ্রন্থে সংকলিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ وَلا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ

"যুলহাজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনে নেক আমল করা আল্লাহর নিকট যত বেশি প্রিয় আর কোনো দিনের আমল তাঁর নিকট তত প্রিয় নয়। সাহাবীগণ প্রশ্ন করেন, হে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহর পথে জিহাদও কি এ দশদিনের নেক আমলের চেয়ে আল্লাহর নিকট প্রিয়তর নয়? তিনি বলেন, না, আল্লাহর পথে জিহাদও প্রিয়তর নয়, তবে ঐ ব্যক্তি ছাড়া, যে ব্যক্তি নিজের প্রাণ ও সম্পদ নিয়ে জিহাদে বেরিয়ে গেল এবং কোনো কিছুই আর ফিরে এলো না (সম্পদও শেষ হলো, সেও শহীদ হলো)।"[১]

অন্য হাদীসে তিনি বলেন:

أَفْضَلُ أَيَّامِ الدُّنْيَا الْعَشْرُ، يَعْنِي عَشْرَ ذِي الْحِجَّةِ

দুনিয়ার সবচেয়ে বেশি ফযীলতের দিন হলো যুলহাজ্জ মাসের প্রথম এ দশ দিন।"[২]

যয়ীফ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, এই দশ দিনের প্রতি দিনের সিয়াম এক বৎসরের সিয়ামের তুল্য এবং প্রত্যেক রাতের নামায বা কিয়ামুল্লাইল লাইলাতুল কাদ্‌রের নামাযের তুল্য।[৩] অন্য একটি দুর্বল

[১] বুখারী, আস-সহীহ ১/৩২৯; ইবনু খুযাইমা, আস-সহীহ ৪/২৭৩; তিরমিযী, আস-সুনান ৩/১৩০-১৩১।
[২] হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৩/২৫৩, ৪/১৭; আলবানী, সহীহুত তারগীব ২/১৫। হাদীসটি সহীহ।
[৩] তিরমিযী, আস-সুনান ৩/৩১৩। হাদীসটির সনদ দুর্বল।

হাদীসে বলা হয়েছে, এই দশ দিনের নেক আমলের ৭০০ গুণ সাওয়াব প্রদান করা হয়।[১] অন্য একটি যয়ীফ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, আনাস ইবনু মালিক (রা) বলেছেন, কথিত আছে যে, যিলহাজ্জ মাসের প্রথম ১০ দিন এক হাজার দিনের সমান এবং বিশেষত আরাফার দিন ১০ হাজার দিনের সমান।[২]

হাযেরীন, এভাবে আমরা দেখছি যে, যুলহাজ্জ মাসের এ দশটি দিন মুমিনের জন্য অত্যন্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিন। এদিনগুলিকে অবহেলায় নষ্ট করার চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কিছুই হতে পারে না। প্রত্যেক মুমিনের চেষ্টা করা দরকার এদিনগুলিতে বেশি বেশি নেক আমল করার। সকল প্রকার ইবাদতই নেক আমল। ফরয ইবাদত তো সঠিক সময়ে সঠিকভাবে করতেই হবে। ফরযের জন্য ফযীলতের সময় খোঁজা মুশকিল। এজন্য নেক আমল বলতে সাধারণত সকল প্রকারের নফল আমলই বুঝানো হয়। যিকর, দুআ, ইসতিগফার, নফল নামায, নফল রোযা, কুরআন তিলাওয়াত, সালাত, সালাম, দান, পরোপকার, মানুষকে সাহায্য করা, সৃষ্টির সেবা করা, অসুস্থ মানুষকে দেখতে যাওয়া, সত্য সাক্ষ্য দেওয়া, মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকা ইত্যাদি সবই নেক আমল। আমাদের সকলেরই উচিত এ দিনগুলিতে এ সকল নেক আমলের মধ্য থেকে যা কিছু সম্ভব বেশি বেশি পালন করা।

হাযেরীন, হাদীস শরীফে বিশেষ করে তিন প্রকার ইবাদত এ দিনগুলিতে পালনের জন্য উৎসাহ দেওয়া হয়েছে: কিয়ামুল্লাইল বা রাতের নামায, সিয়াম ও যিকর। কিয়াম ও সিয়ামের গুরুত্ব সম্পর্কে আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি। সারা বৎসরই রাতে নফল কিয়াম ও দিবসে নফল সিয়াম পালনের জন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে। বিশেষত যুলহাজ্জ মাসের প্রথম দশ রাতে কিয়ামুল্লাইল বা নফল সালাত আদায় করতে হবে এবং প্রথম ৯ দিন নফল সিয়াম পালনের চেষ্টা করতে হবে। বিশেষ করে যুলহাজ্জ মাসের ৯ তারিখে যেদিন হাজীগণ আরাফার মাঠে অবস্থান সে দিন যারা হজ্জে যান না তাদেরকে সিয়াম পালন করতে বিশেষভাবে উৎসাহ দিয়েছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ। তিনি বলেন:

صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ

"আমি আশা করি আরাফার দিবসের সিয়াম বিগত বছর ও আগামী বছরের কাফ্ফারা হবে।"[৩]

হাযেরীন, তৃতীয় যে ইবাদতটি এ দিনগুলিতে পালনের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ উৎসাহ দিয়েছেন তা হলো "যিক্র"। তাবারানী, বাইহাকী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস সংকলিত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ وَلاَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ الْعَمَلُ فِيهِنَّ مِنْ أَيَّامِ الْعَشْرِ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ. وَفِيْ رِوَايَةٍ (فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَذِكْرِ اللهِ)

"যুলহাজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনের চেয়ে আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাময় কোনো দিন নেই এবং নেক আমল করার জন্য এগুলির চেয়ে বেশি প্রিয় দিন আর নেই। অতএব তোমরা এদিনগুলিতে বেশি বেশি তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ), তাহমীদ (আলহামদু লিল্লাহ), তাহলীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) ও তাকবীর (আল্লাহু আকবার) আদায় করবে। অন্য বর্ণনায়: বেশি বেশি তাহলীল, তাকবীল ও আল্লাহর যিকর করবে।"[৪]

এ মাসের পরবর্তী তিন দিন ১১, ১২ ও ১৩ তারিখে আল্লাহর যিকরের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন:

وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى

---

[১] বাইহাকী, শুআবুল ঈমান ৩/৩৫৬; মুনযিরী, আত-তারগীব ২/১২৮। হাদীসটির সনদ দুর্বল।
[২] বাইহাকী, শুআবুল ঈমান ৩/৩৫৮; মুনযিরী, আত-তারগীব ২/১২৮। হাদীসটির সনদ দুর্বল।
[৩] মুসলিম, আস-সহীহ ২/৮১৯।
[৪] হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ২/৩৯; মুনযিরী, আত-তারগীব ২/১২৭, ১২৮; আলবানী, সহীহুত তারগীব ২/১৫। হাদীসটি সহীহ।

"তোমরা নির্দিষ্ট সংখ্যক দিনগুলিতে আল্লাহর যিক্‌র করবে। যদি কেউ তাড়াতাড়ি করে দুদিনে চলে আসে তবে তার কোনো পাপ নেই, আর যদি কেউ বিলম্ব করে তবে তারও কোনো পাপ নেই, এ তার জন্য যে তাকওয়া অবলম্বন করে।[১]

এ নির্দেশের ভিত্তিতে হাজীগণ ৯ তারিখে আরাফার মাঠে, ১০ তারিখে মুযদালিফা ও মিনার মাঠে হজ্জের আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে আল্লাহর যিক্‌র সম্পন্ন করার পর ১১, ১২, ও ১৩ অথবা ১১ ও ১২ই যুলহাজ্জ মিনার প্রান্তরে অবস্থান করে আল্লাহ্ যিক্‌র করেন। আর যারা হজ্জে যান না অর্থাৎ সারা বিশ্বের সকল মুসলিম এ আয়াতের নির্দেশ অনুসারে যুলহাজ্জ মাসের ৯ তারিখ আরাফার দিবস থেকে ১৩ তারিখ পর্যন্ত প্রত্যেক সালাতের পরে আল্লাহর যিক্‌র করেন। আল্লাহর যিক্‌র অর্থ ইচ্ছামত আল্লার নাম জপ করা নয়। বরং যেখানে যেভাবে যিকর করতে রাসুলুল্লাহ ﷺ শিক্ষা দিয়েছেন সেভাবে যিকর করা। সুন্নাতের শিক্ষা অনুসারে এ ২৩ ওয়াক্ত সালাতের শেষে "আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। ওয়া আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার ওয়ালিল্লাহিল হামদ" বাক্য একবার সশব্দে বলতে হবে।

হাযেরীন, এভাবে আমরা দেখছি যে, যুলহাজ্জ মাসে প্রথম ১৩ দিন বিশেষভাবে আল্লাহর যিকরের জন্য নির্ধারিত। এ উপলক্ষ্যে আমরা আল্লাহর যিকরের গুরুত্ব সম্পর্কে দু একটি কথা বলতে চাই।

হাযেরীন, 'যিক্‌র' অর্থ স্মরণ করা বা স্মরণ করানো। যে কোনো প্রকারে মনে, মুখে, অন্তরে, কর্মের মাধ্যমে, চিন্তার মাধ্যমে, আদেশ পালনের মাধ্যমে বা নিষেধ মান্য করার মাধ্যমে আল্লাহর নাম, গুণাবলী, বিধিবিধান, তাঁর পুরস্কার, শাস্তি ইত্যাদি স্মরণ করা বা এ সকল বিষয়ে ওয়ায, দাওয়াত বা আলোচনা করে অন্যকে স্মরণ করানো সবই আল্লাহর যিক্‌র। তবে কুরআন ও হাদীসে বিশেষ ইবাদত হিসেবে যিকরের পারিভাষিক অর্থ হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শেখানো আল্লাহর মর্যাদা জ্ঞাপক বিশেষ বাক্যাদি মুখে উচ্চারণ ও আউড়ানোর মাধ্যমে আল্লাহর যিক্‌র করা। যেমন সকল দুআ বা প্রার্থনাকেই আরবীতে সালাত বলা হয়, তবে সাধারণ দুআর মাধ্যমে "সালাত" নামক পারিভাষিক ইবাদত পালন হবে না।

হাযেরীন, যিকরের গুরুত্ব সম্পর্কে এখানে অল্প কয়েকটি সহীহ হাদীস উল্লেখ করছি:

مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ...تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ

"যে ব্যক্তি ফজরের সালাত জামাতে আদায় করবে, এরপর বসে সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহর যিক্‌রে রত থাকবে। অতঃপর সে দুই রাক'আত সালাত আদায় করবে, সে একটি হজ্ব ও একটি ওমরার সাওয়াব পাবে, পরিপূর্ণ, পরিপূর্ণ, পরিপূর্ণ (হজ্ব ও ওমরার সাওয়াব)।"[২]

أَلا أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ؟ قَالُوا وَذَلِكَ مَا هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ذِكْرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا شَيْءٌ أَنْجَى مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ

"আমি কি তোমাদেরকে বলব না তোমাদের জন্য সর্বোত্তম কর্ম কোন্‌টি? তোমাদের প্রভুর নিকট সবচেয়ে পবিত্র, তোমাদের জন্য সবচেয়ে উঁচু মর্যাদার কারণ, স্বর্ণ ও রৌপ্য দান করার চেয়েও উত্তম, জিহাদের ময়দানে শত্রুর মুখোমুখি হয়ে শত্রু নিধন করতে করতে শাহাদত বরণ করার থেকেও উত্তম

---

[১] সূরা বাকারা: ২০৩ আয়াত।
[২] তিরমিযী, আস-সুনান ২/৪৮১; আলবানী, সহীহুত তারগীব ১/১১১। হাদীসটি হাসান।

কর্ম কি তা-কি তোমাদেরকে বলব? সাহাবীগণ বললেন : হে আল্লাহর রাসূল, সেই কর্মটি কী? তিনি বললেন : 'আল্লাহর যিক্‌র।' মু'আয ইবনু জাবাল (রা) বলেন : আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহর যিক্‌রের চেয়ে উত্তম ইবাদত আর কিছুই নেই।"[১]

أَحَبُّ الأَعْمَالِ إِلَى اللهِ أَنْ تَمُوتَ وَلِسَانُكَ رَطْبٌ مِنْ ذِكْرِ اللهِ

"আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় কর্ম যে, তুমি যখন মৃত্যু বরণ করবে তখনো তোমরা জিহ্বা আল্লাহর যিক্‌রে আর্দ্র থাকবে।"[২] অর্থাৎ, সর্বদা মুমিন মুখে আল্লাহর যিক্‌র করবে। আল্লাহর যিক্‌রে তাঁর জবান সর্বদা আর্দ্র থাকবে। তাহলে তাঁর যখন মৃত্যু হবে তখনো তাঁর জবান যিক্‌রেই ব্যস্ত থাকবে।

একব্যক্তি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, ইসলামের বিধানাবলী আমার জন্য বেশি হয়ে গিয়েছে। আমাকে এমন একটি আমল বলে দিন যা আমি দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকব। অর্থাৎ সকল প্রকার নফল আমলের স্থান পূরণ করার মত একটি আমল আমাকে শিখিয়ে দিন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

لا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ

"তোমার জিহ্বা যেন সর্বদা আল্লাহর যিক্‌রে আর্দ্র থাকে।"[৩]

হাযেরীন, এ মহান ফযীলত অর্জনের জন্য কোন্ কোন্ বাক্য মুখে আউড়াতে বা জপ করতে হবে তাও রাসূলুল্লাহ ﷺ শিখিয়েছেন। তাঁর শেখানো চারটি যিকর উপরে আমরা দেখেছি, সেগুলি হলো (১) সুবহানাল্লাহ, (২) আলহামদু লিল্লাহ, (৩) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, (৪) আল্লাহু আকবার। মাসনূন যিকরের অন্যান্য বাক্যের মধ্যে রয়েছেঃ সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী, সুবহানাল্লাহিল আযীম। লা ইলাহা ইল্লল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু, ওয়া লাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর, লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ, ইত্যাদি।

হাযেরীন, এ সকল বাক্য দ্বারা নিজের জিহ্বাকে সর্বদা আদ্র রাখা শুধু সর্বশ্রেষ্ঠ নফল ইবাদতই নয়, উপরন্তু এগুলির প্রত্যেকটির জন্য রয়েছে অফুরন্ত সাওয়াব। কয়েকটি সহীহ ও হাসান হাদীস শুনুনঃ ইবনু মাস'উদ, সালমান ফরেসী, আবু হুরাইরা ও ইবনু আব্বাস বর্ণিত বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, এই বাক্য চারিটির প্রতিটি বাক্য একবার বললে জান্নাতে একটি করে বৃক্ষ রোপণ করা হয়। (তারগীব) আবু যার (রা.) ও আয়েশা (রা.) বর্ণিত বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺবলেছেন : "এই বাক্যগুলির প্রত্যেক বাক্য একবার যিকির করা একবার আল্লাহর ওয়াস্তে দান করার সমতুল্য।" (মুসলিম) আবু সালমা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ "এই বাক্যগুলি কেয়ামতের দিনে বান্দার আমল নামায় সবচেয়ে বেশি ভারী হবে।" (নাসাঈ) হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : "এই বাক্যগুলিই হলো জাহান্নামের আগুন থেকে মুমিনের ঢাল।" (হাকিম) হযরত আনাস বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : "গাছের ডালে ঝাকি দিলে যেমন পাতাগুলি ঝড়ে যায় অনুরূপভাবে এই যিকিরগুলি বললে বান্দার গোনাহ ঝরে যায়।" (আহমদ) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু উমর বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : "এই চারিটি বাক্য যিকিরকারী প্রতিটি বাক্যের প্রতিটি অক্ষরের জন্য ১০টি করে সাওয়াব লাভ করবেন।" (তাবারানী) হযরত আবু হুরাইরা (রা.) ও হযরত আবু সাঈদ (রা.) উভয়ে নবীয়ে আকরাম ﷺ

---

[১] তিরমিযী, আস-সুনান ৫/৪৫৯; ইবনু মাজাহ, আস-সুনান ২/১২৪৫; আহমদ, আল-মুসনাদ ৬/৪৪৬; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/৭৩, ৭৪; হাকিম, আল- মুসতাদরাক ১/৬৭৩; আলবানী, সহীহুত তারগীব ২/৯৬। হাদীসটির সনদ হাসান।

[২] বুখারী, খালকু আফ'আলিল ইবাদ ১/৭২, ইবনু হিব্বান, আস-সহীহ ৩/৯৯, হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/৭৪-৭৬, মুনযিরী, আত তারগীব ২/৩৬৭, আলবানী, সহীহুল জামি ১/৯৫, নং ১৬৫, হাইসামী, মাওয়ারিদুয যামআন ৭/৩১৩-৩১৫। হাদীসটি হাসান।

[৩] তিরমিযী, আস-সুনান ৫/৪৫৮; ইবনু হিব্বান, আস-সহীহ ৩/৯৬, হাকিম, আল-মুসতাদরাক ১/৪৯৫, হাইসামী, মাওয়ারিদুয যামআন ৭/৩১২; আলবানী, সহীহুত তারগীব ২/৯৫। হাদীসটি সহীহ।

থেকে বর্ণনা করেছেন : "আল্লাহ এই চারটি বাক্যকে বেছে পছন্দ করে নিয়েছেন। এই বাক্যগুলির যে কোনো একটি বাক্য একবার বললে আল্লাহ ২০ টি সাওয়াব প্রদান করবেন এবং ২০ টি গোনাহ ক্ষমা করবেন। আর এভাবে যে বেশি বেশি যিকির করবে সে মুনাফিকী থেকে মুক্তি লাভ করবে।" (আহমদ)

হাযেরীন, এ সকল বাক্যের যিক্‌র দু ভাবে করতে হবে বলে রাসূলুল্লাহ ﷺ শিখিয়েছেন। প্রথমত সকালে ফজরের সালাতের পর, বিকালে আসরের সালাতের পর, সন্ধ্যায় মাগরিবের সালাতের পর এবং ঘুমাতে যাওয়ার আগে বিছানায়। এ সকল সময়ে এ সকল যিক্‌র নির্ধারিত সংখ্যায় পাঠ করলে অফুরন্ত সাওয়াব পাওয়া যাবে বলে বিভিন্ন হাদীসে বলা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, সদাসর্বদা সকল কর্মের মধ্যেই যত বেশি সম্ভব এ বাক্যগুলি পাঠ করা। এভাবে যিক্‌র করতেও বারংবার নির্দেশ দিয়েছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ।

হাযেরীন, মুমিনের সবচেয়ে আনন্দের বিষয় হলো, ওযুসহ ও ওযূ ছাড়া, গোসলসহ বা গোসল ছাড়া, পোশাক পরে বা খালি গায়ে, শুয়ে, বসে হাটতে, চলতে, বাজারে, মাঠে, দোকানে সর্বাবস্থায় যিকর করা যায় এবং সর্বাবস্থায় যিক্‌র করাই হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের সুন্নাত। হাযেরীন, আমরা কত সময় অলস চিন্তা করে বা গল্প করে নষ্ট করি। অথচ এ সময়ে এ যিকরের বাক্যগুলি কয়েকবার পাঠ করলে আমাদের আমল নামায় অনেক সাওয়াব জমা হতো, অনেক গোনাহ মাফ হতো। সর্বোপরি বান্দা যতক্ষণ আল্লাহর যিক্‌র করতে থাকেন ততক্ষণ শয়তান তার অন্তরে প্রবেশ করতে পারে না। আর অলস চিন্তা বা গল্প করে সময় নষ্ট করার ক্ষতি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

لَمْ يَتَحَسَّرْ أَهْلُ الْجَنَّةِ إِلاَّ عَلَى سَاعَةٍ مَرَّتْ بِهِمْ لَمْ يَذْكُرُوْا اللهَ تَعَالَى فِيْهَا

"জান্নাতের অধিবাসীগণ দুনিয়ার কোনো কিছুর জন্য আফসোস করবেন না, শুধুমাত্র যে মুহূর্তগুলি আল্লাহর যিক্‌র ছাড়া অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে সেগুলির জন্য তাঁরা আফসোস করবেন।"[১]

مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِساً لَمْ يَذْكُرُوْا اللهَ فِيْهِ إَلاَّ كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً وَمَا مَشَى أَحَدٌ مَمْشَى (طَرِيْقاً) لَمْ يَذْكُرِ اللهَ فِيْهِ إِلاَّ كَانَ عَلَيْهِ تِرَةً وَمَا أَوَى أَحَدٌ إِلَى فِرَاشِهِ وَلَمْ يَذْكُرِ اللهَ فِيْهِ إِلاَّ كَانَ عَلَيْهِ تِرَةً

"যদি কয়েকজন মানুষ কোথাও একত্রে বসে কিন্তু সে বৈঠকে তারা আল্লাহর যিক্‌র না করে তবে তা তাদের জন্য ধ্বংস ও ক্ষতির কারণ হবে। যদি কোনো মানুষ সামান্য পরিমাণও হাঁটে এবং সেই হাঁটার মধ্যে সে আল্লাহর যিক্‌র না করে, তাহলে তা তার জন্য ধ্বংস ও ক্ষতির কারণ হবে। যদি কোনো মানুষ বিছানায় শোয় এবং শোয়া অবস্থায় আল্লাহর যিক্‌র না করে তাহলে তা তার জন্য ধ্বংস ও ক্ষতির কারণ হবে।"[২]

হাযেরীন, যিকরের অন্যতম প্রকার হলো সালাত ও সালাম। সালাত ও সালামের মধ্যে মুমিন আল্লাহর যিক্‌র করেন, কারণ তিনি আল্লাহর কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর সালাত ও সালাম পাঠানোর আবেদন করেন। এছাড়া সালাত ও সালামের জন্য রয়েছে অভাবনীয় ও অফুরন্ত সাওয়াব। রাসূলুল্লাহ ﷺ অসংখ্য হাদীসে তাঁর উপর দরুদ ও সালামের নির্দেশনা প্রদান করেছেন এবং সালাত ও সালামের অতুলনীয় পুরস্কারের বর্ণনা দিয়েছেন। হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, কোন উম্মত তাঁর উপর সালাত ও সালাম পাঠ করলে আল্লাহ তাকে অগণিত পুরস্কার প্রদান করেন, তার গোনাহ ক্ষমা করেন, তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন, তার উপর রহমত বর্ষণ করেন, ফিরিশতাগণ তার জন্য দু'আ করেন, তার সালাত ও সালাম তার নাম ও পিতার নামসহ ফিরিশতাগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর রাওযা মুবারাকায় পৌঁছে দেন, তিনিও তার জন্য দোওয়া করেন। সর্বোপরি যে ব্যক্তি যত বেশি সালাত ও সালাম পাঠ করবে সে কিয়ামতে ততবেশী তাঁর

---

[১] হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/৭৩, মুনযিরী, তারগীব ২/৩৭৫, আলবানী, সাহীহুল জামিয় ২/৯৫৮। হাদীসটির সনদ মোটামুটি গ্রহণযোগ্য।
[২] ইবনু হিব্বান, আস-সহীহ ৩/১৩৩, হাইসামী, মাওয়ারিদুয যামআন ৭/৩১৭-৩২২; মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/৮০। হাদীসটির সনদ সহীহ।

নৈকট্য পাবে। অধিক পরিমাণে সালাত পাঠকারীর সকল সমস্যা আল্লাহ মিটিয়ে দিবেন।

হাযেরীন, সর্ববাস্থায় দরুদ-সালাম পাঠ করবেন। হাটতে, চলতে, শুয়ে, বসে, কর্মব্যস্ততার ফাঁকে যে কোনো সময় সুযোগ পেলে বা খেয়াল হলে ওযু-সহ বা ওযু ছাড়া সর্বাবস্থায় দরুদ পাঠ করতে পারেন। এ ছাড়াও প্রতিদিন এক বা একাধিক সময়ে নির্ধারিত সংখ্যায় দরুদের একটি নির্ধারিত ওযীফা রাখবেন। ফজর বাদ, আসর বাদ বা অন্য যে কোনো সময়ে দরুদের ওযীফা পালন করা যায়। তবে সুন্নাতের নির্দেশনা অনুসারে দরুদের বিশেষ সময় রাত। সম্ভব হলে তাহাজ্জুদের পরে, না হলে ইশার সালাতের পরে যথাসম্ভব বেশি করে সালাত (দরুদ) পাঠ করবেন। সম্ভব হলে ৫০০ বার সালাত বা দরুদ শরীফ পাঠ করবেন। না হলে অন্তত ১০০ বার দরুদ পাঠ করবেন।

হাযেরীন, কোনো কোনো দীনদার মানুষ যিক্রকে ইবাদতকে অবহেলা করেন। আন্দাজে বলেন, যিক্রের ফযীলতের হাদীস সব যয়ীফ, এর কোনো গুরুত্ব নেই। অথবা বলেন, কর্মই তো যিক্র, মুখে বারবার আউড়ালে কী হয়? ইত্যাদি। অথচ সহীহ হাদীস থেকে আমরা নিশ্চিতরূপে জানতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের সুন্নাত হলো, দাওয়াত, জিহাদ, ব্যবসা-বাণিজ্য, পারিবারিক ও সামাজিক সকল কর্মের সাথে, কর্ম ও ওয়াজ-নসীহতের যিকরের পাশাপাশি সকল সময় তাসবীহ, তাহলীল ইত্যাদি মুখে আওড়ে বা জপ করে অনবরত যিক্র করা। পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পরে, বিশেষত ফজর, আসর ও মাগরিবের পরে, বিছানায় শুয়ে, হাঁটতে-চলতে, বাজারে-ঘাটে সর্বদা ও সর্বাবস্থায় তারা মনে মনে বা অত্যন্ত মৃদু শব্দে এ সকল মাসনূন যিক্রগুলি মুখে জপ করতেন। তাকওয়া অর্জনের জন্য, বাতিলের বিরুদ্ধে ঈমানী শক্তি অর্জনের জন্য, দুনিয়ার বহুমুখি প্রলোভন থেকে আত্মরক্ষার শক্তি অর্জনের জন্য, আত্মার শান্তির জন্য, জান্নাতের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য ও সর্বোপরি আল্লাহর বেলায়াত ও মহব্বত অর্জনের জন্য সুন্নাত পদ্ধতিতে সুন্নাত বাক্যে আল্লাহর যিক্র সহজতম ও শ্রেষ্ঠতম ইবাদত।

অন্যদিকে অনেক মুমিন যিক্র ভালবাসেন, যিক্র করেন এবং নিজেদেরকে যাকির বলে মনে করেন। কিন্তু তাদের যিক্র রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের যিক্রের সাথে মিলে না। যিক্রের শব্দ পদ্ধতি সবই আলাদা। 'যিক্র' শব্দটিই তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। রাসূলুল্লাহ ﷺ কী শব্দে, কী-ভাবে, কখন, কোন্ পদ্ধতিতে যিক্র করলেন বা করতে বললেন সে বিষয়টি তাদের কাছে ধর্তব্য নয়। তাদের যিক্রের ধরন-পদ্ধতি এবং যিকিরে ব্যবহৃত শব্দ ও বাক্যগুলো অধিকাংশই সুন্নাত বিরোধী। বিভিন্ন যুক্তি, তর্ক বা দলীল দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ বলেন নি বা করেন নি এমন সব শব্দ, বাক্য ও পদ্ধতিতে তারা যিকর করেন। হাযেরীন, সকল যুক্তিতর্ক বাদ দিয়ে সুন্নাতের পরিপূর্ণ অনুসরণ করুন। সুন্নাত থাকতে যুক্তি তর্কের দরকার কী? সুন্নাতের অনুসরণে যখন পরিপূর্ণ সাওয়াব ও বেলায়াত, তখন সুন্নাতের বাইরে যাওয়ার দরকার কী? মহান আল্লাহর নির্দেশ মত মনের মধ্যে বিনয়, আকুতি ও ভয়ভীতির সাথে অনুচ্চ শব্দে আল্লাহর যিক্র করুন। অমনোযোগী হবেন না। যথাসাধ্য অর্থের দিকে লক্ষ্য রাখুন। শুধু মুখের বা শুধু মনের যিকরও যিকর। তবে অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে মন ও মুখের একত্র যিক্র হলো সর্বোত্তম যিকর।

হাযেরীন, আল্লাহর যিক্র আমাদের অন্যতম সম্বল ও পাথেয়। যুলহাজ্জ মাসের প্রথম দশ দিন অন্যান্য নফল ইবাদতের পাশাপাশি বেশি বেশি আল্লাহর যিকর করুন। এছাড়া সারা বৎসরই সদা সর্বদা নিজের মন ও জবানকে আল্লাহর যিকরে আদ্র রাখুন। আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক দিন। আমীন।

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

أَمَّا بَعْدُ، فَيَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ

وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى

وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْضَلُ أَيَّامِ الدُّنْيَا الْعَشْرُ، يَعْنِيْ عَشْرَ ذِيْ الْحَجَّةِ

وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ.

وَقَالَ: أَحَبُّ الأَعْمَالِ إِلَى اللهِ أَنْ تَمُوْتَ وَلِسَانُكَ رَطْبٌ مِنْ ذِكْرِ اللهِ

بَارَكَ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ فِيْ الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ. وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ. أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ، فَاسْتَغْفِرُوْهُ وَتُوْبُوْا إِلَيْهِ، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.

যুলহাজ্জ মাসের ১ম খুতবা: ঈদুল আযহা ও কুরবানী

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লী আলা রাসূলিহীল কারীম। আম্মা বাদ,

সম্মানিত উপস্থিতি, আজ যুলহাজ্জ মাসের প্রথম জুমুআ। আজ আমরা ঈদুল আযহা ও কুরবানীর বিষয়ে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ। কিন্তু তার আগে আমরা এ সপ্তাহের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসগুলির বিষয়ে সংক্ষেপ আলোকপাত করি। হাযেরীন, আজ ইংরেজী ..... মাসের ..... তারিখ। এ সপ্তাহের দিবসগুলির মধ্যে রয়েছে ....।

হাযেরীন, গত জুমুআয় আমরা যুলহাজ্জ মাসের মর্যাদা সম্পর্কে আলোচনা করেছি। যুলহাজ্জ মাসে ১০ তারিখে আমরা ঈদুল আযহার সালাত ও কুরবানী আদায় করি। ঈদ শব্দের অর্থ পুনরাগমণ। যে উৎসব বা পর্ব নির্ধারিত দিনে বা সময়ে প্রতি বৎসর ঘুরে ঘুরে আসে তাকে ঈদ বলা হয়। প্রতি সপ্তাহে জুমুআর দিনকে সপ্তাহিক ঈদ বলা হয়। হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, মহান আল্লাহ আমাদেরকে বাৎসরিক ঈদ হিসেবে দুটি দিন দিয়েছেন: ঈদুল ফিতরের দিন এবং ঈদুল আযহা দিন।[1]

হাযেরীন, ইসলাম সামাজিক আনন্দ ও উৎসবকে ইবাদত ও জনকল্যাণের সাথে সংযুক্ত করেছে। ঈদুল ফিতরের দিনে প্রথমে ফিতরা আদায়, এরপর সালাত আদায়এবং এরপর সামাজিক আনন্দ, উৎসব ও শরীয়ত সম্মত খেলাধুলায় অংশ গ্রহণ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর ঈদুল আযহায় প্রথমে সালাত আদায়, এরপর কুরবানী করা ও গোশত বিতরণ করা এবং এরপর আনন্দ, খেলাধুলা বা বৈধ বিনোদনের নিয়ম করা হয়েছে। যেন আমাদের আনন্দ পাশবিকতায় বা স্বার্থপরতায় পরিণত না হয়।

হাযেরীন, আমরা ইতোপূর্বে রামাদানের শেষ খুতবায় আলোচনা করেছি যে, ঈদ, কুরবানী, হজ্জ ইত্যাদি সমাজ ও রাষ্ট্র কতৃক পরিচালিত হতে হবে। কেউ কেউ অন্য দেশের চাঁদ দেখার উপর ঈদ করতে চান এবং এভাবে সমাজে বিভক্তি ও দলাদলি সৃষ্টি করেন, যা কঠিন হারাম ও অন্যায়। নিজের মতামত এমনকি নিজের চাঁদ দেখার ভিত্তিতেও রাষ্ট্র বা সংখ্যাগরিষ্ট জনগণের বিরোধিতা করা বৈধ নয়। হাদীসের সুস্পষ্ট নির্দেশ হলো, চাঁদ দেখলেই ঈদ হয় না, রাষ্ট্র প্রশাসনের নিকট চাঁদ দেখা প্রমাণিত হতে হবে। রাষ্ট্রপ্রধান ও সংখ্যাগরিষ্ট জনগণ যে দিন ঈদ করবেন সেদিনেই ঈদ করতে হবে। সাহাবী-তাবিয়ীগণ বলেছেন যে, এক্ষেত্রে ভুল হলেও ঈদ, হজ্জ, কুরবানী সবই আদায় হয়ে যাবে।[2] এক্ষেত্রে ভুলের জন্য মুমিন কখনোই দায়ী হবেন না। এ বিষয়ক দলাদলি বন্ধ করে সমাজে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা জরুরী।

হাযেরীন, ঈদুল আযহার দিনে গোসল করা, যথাসাধ্য পরিস্কার ও সুন্দর পোশাক পরিধান করা, এক পথে যাওয়া ও অন্য পথে ফিরে আসা ইত্যাদি বিষয়ে আমরা জানি। ঈদুল আযহার দিনে কিছু না খেয়ে খালিপেটে সালাতুল ঈদ আদায় করতে যাওয়া সুন্নাত। সম্ভব হলে ঈদের সালাতের পরে দ্রুত কুরবানী করে কুরবানীর গোশত দিয়ে "ইফতার" করা বা ঈদের দিনের পানাহার শুরু করা ভাল।

হাযেরীন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাধারণভাবে সূর্যোদয়ের ঘন্টাখানেকের মধ্যেই ঈদের সালাত আদায় করতেন। বিভিন্ন হাদীসের আলোকে জানা যায় যে, ঈদুল ফিতরের সালাত তিনি একটু দেরী করে সূর্যোদয়ের ১ বা দেড় ঘন্টা পরে পড়তেন এবং ঈদুল আযহার সালাত একটু তাড়াতাড়ি সূর্যোদয়ের আধাঘন্টা থেকে একঘন্টার মধ্যে আদায় করতেন। আমাদেরও সুন্নাত সময়ে সালাতুল ঈদ আদায়ের চেষ্টা করতে হবে। তবে প্রয়োজনে কিছু দেরী করা নিষিদ্ধ নয়। তবে সর্বাবস্থায় ঈদুল আযহার সালাত

---

[1] আবূ দাউদ, আস-সুনান ১/২৯৫; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ১/৪৩৪। হাকিম ও যাহাবী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।
[2] ইবনু হাজার, তালখীসুল হাবীর ২/২৫৬।

একটু আগে আদায়ের চেষ্টা করতে হবে, যেন কুরবানীর দায়িত্ব পালন করে যথাসময়ে কুরবানীর গোশত খাওয়া ও বণ্টন করা সম্ভব হয়।

হাযেরীন, ঈদুল আযহার অন্যতম ইবাদত "আযহা" বা কুরবানী আদায় করা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

مَنْ وَجَدَ سَعَةً لأَنْ يُضَحِّيَ فَلَمْ يُضَحِّ فَلاَ يَحْضُرْ مُصَلاَّنَا

"যার সাধ্য ছিল কুরবানী দেওয়ার, কিন্তু কুরবানী দিল না, সে যেন আমাদের ঈদগাহে উপস্থিত না হয়।"[১]

হাযেরীন, উট, গরু বা মহিষ, ছাগল, ভেড়া বা দুম্বা কুরবানী দিতে হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ সাধারণত কাটান দেওয়া বা খাসী করা পুরুষ মেষ, ভেড়া বা দুম্বা (ram/male sheep) কুরবানী দিতেন:

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ اشْتَرَى كَبْشَيْنِ عَظِيمَيْنِ سَمِينَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ مَوْجُوأَيْنِ فَيَذْبَحُ أَحَدَهُمَا عَنْ أُمَّتِهِ مِمَّنْ شَهِدَ بِالتَّوْحِيدِ وَشَهِدَ لَهُ بِالْبَلاَغِ وَذَبَحَ الآخَرَ عَنْ مُحَمَّدٍ ﷺ وَآلِ مُحَمَّدٍ

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কুরবানী দেওয়ার ইচ্ছা করতেন তখন দুটি বিশাল বড় সাইযের সুন্দর দেখতে খাসী করা বা কাটান দেওয়া পুরুষ মেষ বা ভেড়া ক্রয় করতেন। তাঁর উম্মাতের যারা তাওহীদের ও তাঁর রিসালাতের সাক্ষ্য দিয়েছে তাদের পক্ষ থেকে একটি কুরবানী করতেন এবং অন্যটি মুহাম্মাদ ﷺ ও মুহাম্মাদে ﷺ-এর পরিবারের পক্ষ থেকে কুরবানী করতেন।"[২]

এছাড়া তিনি গরু ও উট কুরবানীও দিয়েছেন। গরু ও উটের ক্ষেত্রে একটি পশুর মধ্যে সাত জন শরীক হওয়ার অনুমতি তিনি দিয়েছেন। তিনি স্বাস্থ্যবান ভাল পশু কুরবানী দিতে উৎসাহ দিয়েছেন। পক্ষান্তরে রোগা, অসুস্থ, খোড়া, কানা ইত্যাদি ত্রুটিযুক্ত পশু কুরবানী দিতে নিষেধ করেছেন।

হাযেরীন, কুরবানীকারী হজ্জে না যেয়েও হজ্জের কর্ম পালনের অর্জনের সুযোগ পান। এজন্যই হাজীর অনুকরণে তাকে কুরবানীর আগে নখ-চুল কাটতে নিষেধ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

إِذَا رَأَيْتُمْ هِلاَلَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ ... حَتَّى يُضَحِّيَ

"যদি তোমাদের কেউ কুরবানীর নিয়্যাত করে তবে যুলহাজ্জ মাসের নতুন চাঁদ দেখার পরে সে যেন কুরবানী না দেওয়া পর্যন্ত তার চুল ও নখ স্পর্শ না করে।"[৩]

হাযেরীন, হজ্জ ও ঈদুল আযহার কুরবানী ইবরাহীম (আ)-এর কুরবানীর অনুসরণ। আজ থেকে প্রায় ৪ হাজার বৎসর পূর্বে, খৃস্টপূর্ব ২০০০ সালের দিকে ইরাকের "উর" নামক স্থানে ইবরাহীম (আ) জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা, পরিবার, রাষ্ট্র ও সামজের সকলের বিরোধিতা ও প্রতিরোধের মুখে তিনি তাওহীদের প্রচারে অনড় থাকেন। একপর্যায়ে তিনি ইরাক থেকে ফিলিস্তিনে হিজরত করেন। বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। ৮৬ বৎসর বয়সে তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী হাজেরার গর্ভে তাঁর প্রথম পুত্র ইসমাঈল (আ) জন্মগ্রহণ করেন। বৃদ্ধ বয়সের এ প্রিয় সন্তানকে কুরবানী করতে আল্লাহ তাঁকে নির্দেশ দেন। আল্লাহ বলেন:

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ

---

[১] হাকিম, আল-মুসতাদরাক ৪/২৫৮; আলবানী, সহীহুত তারগীব ১/২৬৪। হাকিম ও যাহাবী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। আলবানী হাসান বলেছেন।

[২] আবূ দাউদ ৩/৯৫; ইবনু মাজাহ ২/১০৪৩; আহমদ, আল-মুসনাদ ৬/২২০; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৪/২১। হাদীসটি হাসান।

[৩] মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৫৬৫-১৫৬৬।

"অতঃপর যখন তার ছেলে তার সাথে চলাফেরা করার মত বয়সে উপনীত হলো তখন ইবরাহীম বলল, হে প্রিয় বৎস, আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে আমি যবেহ করছি, অতএব দেখ তোমার কি অভিমত? পুত্রটি বলল: হে আমার পিতা, আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে তা করুন। ইনশা আল্লাহ আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন। অতঃপর যখন তারা উভয়েই আত্মসমর্পন করল এবং ইবরাহীম তার পুত্রকে কাত করে শুইয়ে দিল তখন আমি তাকে আহ্বান করে বললাম, হে ইবরাবীম, তুমি তো স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করেছ- স্বপ্নাদেশ পালন করেছ- এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদের পুরস্কৃত করে থাকি। নিশ্চয় এটি সুস্পষ্ট পরীক্ষা। আর আমি তাকে মুক্ত করলাম এক মহান যবেহের বিনিময়ে।"[১]

হাযেরীন, ইবরাহীম (আ) নবী ছিলেন। এজন্য তাঁর স্বপ্ন ছিল ওহী। স্বপ্নে তিনি দেখেছেন যে, তিনি পুত্রকে কুরবানী করছেন এবং তিনি এবং তাঁর কিশোর পুত্র উভয়েই এ নির্দেশ মেনে নিয়েছেন। কিন্তু সাধারণ মানুষ কখনোই কোনোভাবে স্বপ্নের উপর নির্ভর করে শরীয়ত বিরোধী কিছু করতে পারেন না। অনেক সময় সাধারণ মানুষের অজ্ঞতার সুযোগ স্বপ্নের মাধ্যমে শয়তান মানুষকে শিরক-কুফরের মধ্যে নিপতিত করে। সে স্বপ্ন দেখায়, অমুক মাযারে বা দরগায় মানত কর, ছেলের নাক বা কান ফুড়িয়ে দাও, অমুক দেবতার নামে শিরনী দাও ইত্যাদি। এমনকি যদি কেউ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে স্বপ্ন দেখে এবং স্বপ্নের মধ্যে তিনি তাকে কোনো শরীয়ত বিরোধী কর্মের নির্দেশ দেন তবে সে তা করতে পারবে না। স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখলে তা সত্য; কারণ শয়তান তাঁর আকৃতি ধারণ করতে পারে না। তবে ঘুমন্ত অবস্থার শ্রবন ও দর্শন জাগ্রত অবস্থার কর্মের দলীল হবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ জাগ্রত অবস্থায় সাহাবীদের মাধ্যমে যে শরীয়ত দিয়েছেন ঘুমের মধ্যকার শ্রবণ দিয়ে তার বিরোধিতা করা যাবে না।

হাযেরীন, এখানে লক্ষ্য করুন! পিতা যখন পুত্রকে কাত করে শুইযে দিলেন তখনই আল্লাহ ইবরাহীমকে (আ) বললেন, স্বপ্নাদেশ পালন করা হয়ে গিয়েছে। কারণ এখানে মূলকথা হলো মনের কুরবানী। ইবরাহীম (আ) ও ইসমাঈল (আ) মন থেকে আল্লাহর আদেশ মেনে নিয়েছেন। পিতা তাঁর মন থেকে ছেলের মায়া পরিপূর্ণরূপে কুরবানী করে দিয়ে ছেলেকে জবাই করতে প্রস্তুত হয়েছেন। পুত্র তাঁর মন থেকে পিতামাতা ও দুনিয়ার সকল মায়া কুরবানী দিয়ে আখিরাতের জন্য প্রস্তুতি নিয়েছেন। তাঁদের মনের এ কুরবানী ছিল নিখাদ। আর এজন্যই শায়িত করার সাথে সাথেই আল্লাহ জানিয়ে দিলেন যে, তার কুরবানী কবুল হয়ে গিয়েছে। আর এর বিনিময়ে আল্লাহ জান্নাতী দুম্বা দিয়ে কুরবানীর ব্যবস্থা করলেন।

হাযেরীন, কুরবানীর মূল বিষয় হলো উদ্দেশ্যের বিশুদ্ধতা। নিজের সম্পদের কিছু অংশ একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বিলিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে কুরবানী করলেই তা প্রকৃত কুরবানী। আল্লাহ বলেন:

لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ

"এগুলির- অর্থাৎ কুবরানীকৃত পশুগুলির গোশত বা রক্ত আল্লাহর নিকট পৌছে না; বরং তোমাদের তাকওয়া তাঁর নিকট পৌছায়। এভাবেই তিনি এ সব পশুকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন, যাতে তোমরা আল্লাহর তাকবীর পাঠ করতে পার, এজন্য যে, তিনি তোমাদেরকে হেদায়াত করেছেন; সুতরাং তুমি সৎকর্মশীলদেরকে সুসংবাদ দাও।"[২]

হাযেরীন, তাহলে মূল বিষয় হলো অন্তরের তাকওয়া, আল্লাহ ভীতি, আল্লাহর কাছে সাওয়াব পাওয়ার

---

[১] সূরা সাফ্ফাত: ১০২-১০৭ আয়াত।

[২] সূরা হাজ্জ: ৩৭ আয়াত।

আবেগ, আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও শাস্তি থেকে আত্মরক্ষার আগ্রহ। একমাত্র এরূপ সাওয়াবের আগ্রহ ও অসন্তুষ্টি থেকে রক্ষার আবেগ নিয়েই কুরবানী দিতে হবে। আর মনের এ আবেগ ও আগ্রহই আল্লাহ দেখেন এবং এর উপরেই পুরস্কার দেন। কুরবানী দেওয়ার পর গোশত কে কতটুকু খেল তা বড় কথা নয়।

এ কথা ঠিক যে আমরা নিজেরা ও পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়স্বজন সকলেই কুরবানীর পশুর গোশত খাব। পশুটির গোশত সুন্দর হবে, মানুষ ভালভাবে খেতে পারবে ইত্যাদি সবই চিন্তা করতে হবে। কিন্তু গোশত খাওয়ার উদ্দেশ্যে কুরবানী দিলে কুরবানীই হবে না। মূল উদ্দেশ্য হবে, আমি আল্লাহর রেযামন্দি ও নৈকট্য লাভের জন্য আমার কষ্টের সম্পদ থেকে যথাসম্ভব বেশি মূল্যের ভাল একটি পশু কুরবানী করব। কুরবানীর পর এ থেকে আল্লাহর বান্দারা খাবেন। আল্লাহর বান্দা হিসেবে আমি ও আমার পরিজন কিছু খাব। আর যথাসাধ্য বেশি করে মানুষদের খাওয়াব। আল্লাহ বলেন:

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ

"যেন তারা নিজেদের কল্যাণের স্থানসমূহে হাযির হতে পারে এবং তিনি তাদেরকে চতুষ্পদ জন্তু থেকে যে রিযক দান করেছেন তার উপর নির্দিষ্ট দিনগুলিতে আল্লাহর নাম যিক্‌র করে। অতঃপর তোমরা তা থেকে খাও এবং দুস্থ-দরিদ্রদেরকে খেতে দাও।"[১]

হাযেরীন, তাহলে, দুস্থ-দরিদ্রদেরকে খাওয়ানো আগ্রহ ও উদ্দেশ্য কুরবানীর অবিচ্ছেদ্য অংশ। কুরবানীর গোশত তিনভাগ করে একভাগ পরিবারের, একভাগ আত্মীয়দের এবং একভাগ দরিদ্রদের প্রদানের রীতি আছে। এরূপ ভাগ করা একটি প্রাথমিক হিসাব মাত্র। যাদের সারা বৎসর গোশত কিনে খাওয়ার মত সচ্ছলতা আছে তারা চেষ্টা করবেন যথাসম্ভব বেশি পরিমান গোশত দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করতে। আর যারা কিছুটা অসচ্ছল এবং সাধারণভাবে পরিবার ও সন্তানদের গোশত কিনে খাওয়াতে পারেন না, তারা প্রয়োজনে পরিবারের জন্য বেশি পরিমান রাখতে পারেন। তবে কুরবানীর আগে আমার পরিবার কি পরিমান গোশত পাবে, অথবা বাজার দর হিসেবে গোশত কিনতে হলে কত লাগত এবং কুরবানী দিয়ে আমার কি পরিমাণ সাশ্রয় হলো ইত্যাদি চিন্তা করে কুরবানী দিলে তা আর কুরবানী হবে না।

হাযেরীন, কুরবানীর গোশত ঘরে রেখে দীর্ঘদিন ধরে খাওয়া বৈধ। তবে ত্যাগের অনুভূতি যেন নষ্ট না হয়। আজকাল ফ্রীজ হওয়ার কারণে অনেকেই কুরবানীর গোশত রেখে দিয়ে বাজার খরচ বাচানোর চিন্তা করি। বস্তুত যথাসম্ভব বেশি পরিমাণ দান করতে এবং যথাসম্ভব বেশি দরিদ্রকে ঈদুল আযহার আনন্দে শরীক করতে চেষ্টা করতে হবে। এরপর কিছু রেখে দিলে অসুবিধা নেই।

হাযেরীন, কুরবানী দিতে হবে আল্লাহর নামে। আমরা বাংলায় বলি, অমুকের নামে কুরবানী। আমাদের উদ্দেশ্য ভাল হলেও কথাটি ভাল নয়। এক্ষেত্রে বলতে হবে, "অমুকের পক্ষ থেকে কুরবানী"। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে কুরবানী বা জবাই করা শিরক এবং এভাবে জবাইকৃত পশুর গোশত খাওয়া হারাম। উপরের আয়াতে আমরা দেখেছি যে, কুরবানীর পশু জবাইয়ের সময় আল্লাহর নামের যিক্‌র করতে নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ। অন্যত্র আল্লাহ বলেন:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ

"প্রত্যেক জাতির জন্য আমি কুরবানীর নিয়ম করে দিয়েছি; এজন্য যে, আল্লাহ তাদেরকে যে সকল

---

[১] সূরা হাজ্জ: ২৮ আয়াত।

চতুষ্পদ জন্তু রিযক হিসেবে প্রদান করেছেন সেগুলির উপর তারা আল্লাহর নাম যিক্র করতে পারে।"[১]

হাযেরীন, কুরবানীর ক্ষেত্রে মূল সুন্নাত হলো "বিসমিল্লাহ" বাক্যটি বলে আল্লাহর নাম যিক্র করা। বিভিন্ন হাদীস থেকে আমরা দেখি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো কখনো শুধু বিসমিল্লাহ বলেই কুরবানী করেছেন। এরপর তিনি কবুলিয়্যাতের দু'আ করেছেন। সাধারণত তিনি "বিসমিল্লাহি ওয়া আল্লাহু আকবার" বলতেন। কখনো কখনো তিনি প্রথমে "ওয়াজ্জাহতু ওয়াজহিয়া লিল্লাযি ফাতারাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদা হানীফাও ওয়ামা আনা মিনাল মুশরিকীন। ইন্না সালাতী ওয়া নুসুকী ওয়া মাহইয়ায়াইয়া ওয়া মামাতী লিল্লাহি রাব্বীল আলামীন। লা শারীকা লাহু ওয়া বি যালিকা উমিরতু ওয়া আনা আউয়ালুল মুসলিমীন" বলতেন। এরপর বলতেন: বিসমিল্লাহি ওয়া আল্লাহু আকবার। এরপর তিনি কবুলের দু'আ করে বলতেন "আল্লাহুম্মা লাকা ওয়া মিনকা", "আল্লাহুম্মা 'আন মুহাম্মাদিন ওয়া আলি মুহাম্মাদ", অথবা "আল্লাহুম্মা তাকাব্বাল মিন মুহাম্মাদিন ওয়া আলি মুহাম্মাদিন ওয়া উম্মাতি মুহাম্মাদিন" "আল্লাহ আপনারই জন্য এবং আপনার পক্ষ থেকে।" "হে আল্লাহ, মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদের পরিবারের পক্ষ থেকে", "হে আল্লাহ আপনি কবুল করুন এ কুবরানী মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে, মুহাম্মাদের পরিবারের পক্ষ থেকে ও মুহাম্মাদের উম্মাতের পক্ষ থেকে।"

আমাদের ফকীহগণ উল্লেখ করেছেন যে, কবুলের দু'আগুলি জবাইয়ের আগে বা পরে বলতে হবে, যেন, জবাইয়ের সময় আল্লাহ ছাড়া কারো নাম মুখে উচ্চারণ করা না হয়।

হাযেরীন, আমরা জানি, আল্লাহর নাম হলো "আল্লাহ"। ফকীহগণ লিখেছেন যে, আল্লাহর নাম নেওয়ার নিয়্যাতে শুধু "আল্লাহ", "আল্লাহুম্মা", "সুবহানাল্লাহ", "আলহামদু লিল্লাহ" বা অন্য কোনোভাবে আল্লাহর নাম যিকর করলেই কুরবানী বা জবাই জায়েয হবে। যদি ফারসী, বাংলা বা অন্য কোনো অনারব ভাষাতে আল্লাহর নাম বা নাম সম্বলিত কোনো বাক্য যিক্র করে তাহলেও জবাই ও কুরবানী জায়েয হবে বলে হানাফী ফকীহগণ ফিকহের সকল কিতাবে উল্লেখ করেছেন।

হাযেরীন, এর অর্থ কী? ফকীহগণের এ সকল বক্তব্যের অর্থ কি এই যে, আমরা সকলেই "আল্লাহ", "আল-হামদুল্লিাহ", "প্রশংসা আল্লাহর", "আল্লাহ মহান" ইত্যাদি বাক্য বলে কুরবানী করার রীতি চালু করব? এর অর্থ কি আমরা ইচ্ছাকৃতভাবে এভাবে কুরবানী কবর? না আমরা কুরবানীর সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ কি কথা বলে আল্লাহর নামের যিক্র করতেন তা জেনে তাঁর হুবহু অনুসরণের চেষ্টা করব?

হাযেরীন, ফকীহদের এ কথার অর্থ হলো, এভাবে আল্লাহর নাম নিলে নূন্যতম নাম নেওয়া হবে এবং কুরবানী হালাল হয়ে যাবে। এর মানে এ নয় যে, আমরা ইচ্ছাকৃতভাবে সুন্নাতের ব্যতিক্রম করব বা সুন্নাত বাদ দিয়ে "জায়েয"-কে রীতি ও অভ্যাসে পরিণত করব। হাযেরীন, সাবধান! সুন্নাত বাদ দিয়ে জাযেযকে ইবাদত বা রীতিতে পরিণত করলে তা বিদ'আত হয় এবং তাতে সুন্নাতকে অবজ্ঞা করা হয়।

তিনটি কারণে আমরা না বুঝে খেলাফে সুন্নাতকে প্রাধান্য দিয়ে থাকি। প্রথমত, কুরআন-হাদীসের নির্দেশের ভুল ব্যাখ্যা। যেমন, আল্লাহ বলেছেন আল্লাহর নামের যিকর করে কুরবানী করতে, আর আল্লাহর নাম "আল্লাহ", কাজেই আমি শুধু "আল্লাহ" বলে কুরবানী দেব। আমাদের বুঝতে হবে যে, কুরআনে আল্লাহ যত নির্দেশ দিয়েছেন তা কিভাবে পালন করতে হবে তা শিক্ষা দিয়েছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ। আমাদের দেখতে হবে রাসূলুল্লাহ ﷺ জবাই বা কুরবানীর সময় কিভাবে আল্লাহর নামের যিক্র করতেন। এভাবে কুরআন ও হাদীসের প্রতিটি নির্দেশই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ব্যবহারিক সুন্নাতের আলোকে পালন করতে হবে।

---

[১] সূরা হাজ্জ: ৩৪ আয়াত।

অনুরূপ আরেকটি দলীল হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" শ্রেষ্ঠ যিকর, কাজেই আমরা কুরবানী বা জবাইয়ের সময় এ বাক্য বলব। এখানেও একই ভুল। 'আম' বা 'সাধারণ' দলীলকে 'খাস' বা নির্দিষ্ট স্থানে লাগালে বিদ'আত জন্ম নেবে। তিনি যেখানে যে যিকর করেছেন সেখানে সে যিকর করতে হবে। সাধারণ সময়ে সাধারণ ফযীলতের উপর আমল করতে হবে।

বিভ্রান্তির দ্বিতীয় কারণ হলো এক ইবাদতের সুন্নাতকে অন্য ইবাদতে বা অন্য স্থানে দলীল নামে পেশ করা। যেমন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হজ্জের সময় খালি মাথায় নামায পড়েছেন কাজেই আমি সর্বদা খালি মাথায় নামাজ পড়ব। তিনি নফল নামায দাঁড়িয়ে পড়া উত্তম বলেছেন কাজেই নফল কুরআন তিলাওয়াত, বা নফল যিকর, বা নফল দরুদ সালাম পাঠও দাঁড়িযে করা উত্তম। তিনি ওয়াজ বা খুতবা দেওয়ার সময় দাঁড়াতেন, কাজেই ওয়াজ শোনার সময়ও দাঁড়াতে হবে। কেউ আসলে তিনি দাঁড়িয়ে সালাম-মুসাফাহা করতেন, কাজেই আমরা কারো নাম নিতে হলে বা তাঁকে সালাম দিতে হলে দাঁড়িয়ে পড়ব। তিনি রামাদানে বা অন্য সময়ে মাঝে মাঝে জামাতে কিয়ামুল্লাইল বা তাহাজ্জুদ আদায় করেছেন, কাজেই আমরা সর্বদা তা জামাতে আদায় করব। আমাদের বুঝতে হবে যে, সকল ইবাদতই রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে পালন করেছেন। কাজেই প্রত্যেক ইবাদতই তাঁর হুবহু অনুকরণে পালন করতে হবে। তা না করে যদি এক ইবাদতের দলীল অন্য ইবাদতে পেশ করি তাহলে সুন্নাত নষ্ট হবে এবং বিদআতের জন্ম নেবে। হজ্জের ইহরাম অবস্থায় খালি মাথায় নামায পড়াই সুন্নাত, আর অন্য সময় টুপি-পাগড়ী মাথায় দিয়ে নামায পড়াই সুন্নাত। নফল নামায দাঁড়িয়ে পড়া উত্তম, কারণ তিনি তা শিখিয়েছেন, কিন্তু নফল তিলাওয়াত, যিকর বা দরুদ সালাম দাঁড়িয়ে পড়া উত্তম নয়, কারণ তিনি তা শেখান নি। বরং তিনি এগুলি বসে বসেই করতেন। নফল নামাযের উপর কিয়াস করে নফল তিলাওয়াত, যিক্‌র বা দরুদ-সালাম দাঁড়িয়ে পড়া উত্তম বলে দাবি করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণ অনুত্তম কাজ করেছেন বলে দাবি করা হবে। রামাদানে কিয়ামুল্লাইল ও বিতর জামাতে পড়াই সুন্নাত, অন্য সময়ে তা একাকী পড়াই সুন্নাত। রামাদানের উপর কিয়াস করে অন্য সময়ে কিয়ামুল্লাইল বা বিতর জামাতে পড়া উত্তম বললে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণ অনুত্তম কাজ করেছেন বলে প্রমাণ করা হয়।

বিভ্রান্তির তৃতীয় কারণ হলো, ফকীহ, আলিম বা বুজুর্গগণের কর্ম বা কথার দলিল দেওয়া। যেমন বলা যে, অমুক বুজুর্গ করেছেন, বা অমুক তমুক কিতাবে লেখা আছে, শুধু "আল্লাহ" বলে কুরবানী করা জায়েয, কাজেই যারা এ কথা মানে না তারা অমুক গোমরাহ দলের লোক! এখানে সমস্যা হলো জায়েয ও সুন্নাতের মধ্যে পার্থক্য না করা। ফকীহদের কথার অর্থ হলো, মাঝে মধ্যে, না জানার কারণে, ভুলে বা অন্য কোনো অসুবিধায় যদি শুধু "আল্লাহ" বা অনুরূপ কোনো শব্দ বলে কেউ জবাই করে তবে তা জায়েয হবে। কিন্তু সুন্নাত জেনেও ইচ্ছাকৃতভাবে এরূপ করার অর্থই হলো, সুন্নাত অপছন্দ করা। কখনোই যুক্তি, তর্ক বা দলীল দিয়ে সুন্নাতের ব্যতিক্রম কোনো কর্ম, কর্মপদ্ধতিকে সুন্নাতের চেয়ে উত্তম বা সুন্নাতের সমপর্যায়ের বলে প্রমাণ করতে চেষ্টা করবেন না। এতে সুন্নাতকে অবজ্ঞা করা হবে, যার পরিণতি ভয়াবহ। প্রত্যেক ইবাদতের ক্ষেত্রে খুটিনাটি সকল বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হুবহু অনুকরণের চেষ্টা করুন।

হাযেরীন, আমাদের দেশের মুসলিমদের মধ্যে যত দলাদলি মারামারি তার মূল কারণ হলো, ইবাদত বন্দেগি পালনের ক্ষেত্রে সুন্নাতের বিষয়ে গুরুত্ব না দেওয়া। আমরা যদি প্রতিটি ইবাদত পালনের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের পদ্ধতি হুবহু অনুসরণ করতে চেষ্টা করতাম এবং সুন্নাতের অতিরিক্ত কর্ম বা পদ্ধতিকে ইবাদতের অংশ না মনে করতাম তাহলে আমাদের অধিকাংশ বিবাদ নিরসন হতো, আমরা সুন্নাত পালনের অফুরন্ত সাওয়াব পেতাম এবং পারস্পরিক ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্বের সাওয়াবও পেতাম। আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক দিন। আমীন।

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

أَمَّا بَعْدُ، فَيَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ

سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ

وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَـنْ وَجَـدَ سَعَةً لِأَنْ يُضَحِّيَ فَلَمْ يُضَحِّ فَلاَ يَحْضَرْ مُصَلاَنَا

وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ: إِذَا رَأَيْـتُمْ هِلاَلَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَـنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ ... حَتَّى يُضَحِّيَ

بَارَكَ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ فِيْ الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ. وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ. أَقُـوْلُ قَـوْلِيْ هَـذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُـلِّ ذَنْـبٍ، فَاسْتَغْفِرُوْهُ وَتُوْبُوْا إِلَيْهِ، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.

যুলহাজ্জ মাসের ২য় খুতবা: সৃষ্টির সেবা ও সুন্দর আচরণ

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লী আলা রাসূলিহীল কারীম। আম্মা বাদ,

সম্মানিত উপস্থিতি, আজ যুলহাজ্জ মাসের ২য় জুমুআ। আজ আমরা খিদমাতে খালক ও হুসন খুলুক সম্পর্কে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ। কিন্তু তার আগে আমরা এ সপ্তাহের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসগুলির বিষয়ে সংক্ষেপ আলোকপাত করি। হাযেরীন, আজ ইংরেজী ..... মাসের ..... তারিখ। এ সপ্তাহের দিবসগুলির মধ্যে রয়েছে ....।

হাযেরীন, খিদমাত অর্থ সেবা এবং খালক অর্থ সৃষ্টি। খিদমাত খালক অর্থ সৃষ্টির সেবা। কুরআন ও হাদীস থেকে আমরা দেখতে পাই যে, আল্লাহর রহমত, বরকত ও সাওয়াব অর্জনের সবচেয়ে সহজ ও সংক্ষিপ্ত পথ হলো আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি, বিশেষত মানুষের প্রতি সহযোগিতা, কল্যাণ ও উপকারের হাত বাড়িয়ে দেওয়া। এ বিষয়টি সম্পর্কে আমরা অনেকেই অসচেতন। আমরা যিক্র, তাহাজ্জুদ ইত্যাদি ইবাদতের সাওয়াব সম্পর্কে যতটুকু সচেতন, সৃষ্টির সেবার ফযীলত, গুরুত্ব ও সাওয়াব সম্পর্কে আমরা মোটেও সচেতন নই। অথচ কুরআন ও হাদীসে এ বিষয়ে অগণিত নির্দেশনা রয়েছে।

হাযেরীন, আল্লাহকে ভালবাসতে হলে অবশ্যই তাঁর সৃষ্টিকে ভালবাসতে হবে এবং তাদের সেবা ও সাহায্যে এগিয়ে আসতে হবে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষকে সকল জাগতিক প্রয়োজনে সাহায্য করা, সমাজের কিছু মানুষের মধ্যে পরস্পরে গোলমাল বা অশান্তি হলে শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা, অসুস্থকে দেখতে যাওয়া, সেবা করা, বিপদে পড়লে উদ্ধার করা, মাযলূম হলে সাহায্য করা, মৃত্যুবরণ করলে কাফন-দাফনে শরীক হওয়া ইত্যাদি সকল প্রকার মানব সেবামূলক কাজের জন্য অকল্পনীয় সাওয়াব ও মর্যাদার কথা অগণিত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ يَعْمَلُ بِيَدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ وَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ. وفي حديث: تُعِينُ صَانِعًا أَوْ تَصْنَعُ لأَخْرَقَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ ضَعُفْتُ عَنْ بَعْضِ الْعَمَلِ قَالَ تَكُفُّ شَرَّكَ عَنِ النَّاسِ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ.

"প্রত্যেক মুসলিমের দায়িত্ব মানুষের কল্যাণে ব্যয় করা। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর নবী, যদি কারো দান করার মত কিছু না থাকে? তিনি বলেন, সে নিজ হাতে কর্ম করবে, যে কর্মের উপার্জন দিয়ে সে নিজে উপকৃত হবে এবং অন্যকে দান করবে। সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, যদি সে তাও করতে সক্ষম না হয়? তিনি বলেন, সে সমস্যাগ্রস্ত সাহায্য-প্রার্থীকে সাহায্য করবে। তাঁরা বলেন, যদি সে তাও করতে অক্ষম হয়? তিনি বলেন, তাহলে সে কল্যানমুখী কর্ম করবে এবং অকল্যাণকর কর্ম থেকে নিজেকে বিরত রাখবে। এই কর্মও তার জন্য দান বলে গণ্য হবে।" অন্য বর্ণনায়: "তুমি পেশাদার শ্রমিক বা কর্মজীবিকে সাহায্য করবে, অদক্ষ বা কর্মহীন বেকারের জন্য কর্ম করবে।" সাহাবী প্রশ্ন করেন: "হে আল্লাহর রাসূল যদি আমি দুর্বলতার কারণে কিছু কিছু নেক কর্ম করতে অক্ষম হই তবে কি করব?" তিনি বলেন, "তুমি কোনো মানুষের ক্ষতি বা অকল্যাণ করবে না। মানুষের অকল্যাণ করা থেকে বিরত থাকাও তোমার নিজের জন্য নিজের পক্ষ থেকে দান বলে গণ্য হবে।[১]

---

[১] বুখারী, আস-সহীহ ২/৫২৪, ৫/২২৪১; মুসলিম, আস-সহীহ ২/৬৯৯।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন :

يَعْدِلُ بَيْنَ الاثْنَيْنِ صَدَقَةٌ وَيُعِينُ الرَّجُلَ عَلَى دَابَّتِه فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ وَكُلُّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الصَّلاةِ صَدَقَةٌ وَيُمِيطُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ.

"দু জন মানুষের মধ্যে বিবাদ মিটিয়ে ন্যায়-সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করা দান বলে গণ্য, কোনো মানুষকে তার বাহন নিয়ন্ত্রণ বা পরিচালনা করতে সাহায্য করা দান বলে গণ্য, কারো বাহনে তার জিনিসপত্র তুলে দেওয়া দান বলে গণ্য, সুন্দর আনন্দদায়ক কথা দান বলে গণ্য, মসজিদে গমনের জন্য প্রতিটি পদক্ষেপ দান বলে গণ্য এবং রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক দ্রব্য সরিয়ে দেওয়া দান বলে গণ্য"[১]

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

"যতক্ষণ একজন মানুষ অন্য কোনো মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত থাকবে ততক্ষণ আল্লাহ তার কল্যাণে রত থাকবেন।"[২]

صَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ تَقِيْ مَصَارِعَ السُّوْءِ وَصَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِيءُ غَضَبَ الرَّبِّ وَصِلَةُ الرَّحِمِ تَزِيْدُ فِيْ الْعُمُرِ

"মানব-কল্যাণমুখী কর্ম বিপদাপদ ও অপমৃত্যু থেকে রক্ষা করে, গোপন দান আল্লাহর ক্রোধ নির্বাপিত করে, রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা আয়ু বৃদ্ধি করে।"[৩]

হাযেরীন, দরিদ্র, এতিম, বিধবা ও অনুরূপ সমাজের দুর্বল শ্রেণীগুলির সেবা ও স্বার্থরক্ষার চেষ্টার জন্য রয়েছে বিশেষ সাওয়াব ও মর্যাদা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا وَقَالَ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى

"যে ব্যক্তি এতিম-অনাথের রক্ষণাবেক্ষণ বা লালনপালন করে সে আমার সাথে পাশাপাশি জান্নাতে থাকবে, একথা বলে তিনি মধ্যমা ও তর্জনীকে পাশাপাশি রেখে দেখান।"[৪]

السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَكَالْقَائِمِ لا يَفْتُرُ وَكَالصَّائِمِ لا يُفْطِرُ

"বিধবা ও দরিদ্রদের স্বার্থসংরক্ষণ বা কল্যাণের জন্য চেষ্টারত মানুষ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে রত, ক্লান্তিহীন বিরামহীন তাহাজ্জুদ আদায়কারী এবং অবিরত সিয়ামপালনকারী ব্যক্তির ন্যায়।"[৫]

সৃষ্টির সেবার একটি দিক অসুস্থ মানুষকে দেখতে যাওয়া। বিষয়ে আমরা শাবান মাসের তৃতীয় খুতবায় আলোচনা করেছি। বস্তুত, সৃষ্টির সেবাতেই আল্লাহর সেবা করা হয়। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلانًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِي قَالَ يَا رَبِّ وَكَيْفَ أُطْعِمُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي فُلانٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِي قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فُلانٌ فَلَمْ تَسْقِهِ أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ وَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي

---

[১] বুখারী, আস-সহীহ ২/৯৬৪, ৩/১০৯০।

[২] মুসলিম, আস-সহীহ ৪/২০৭৪।

[৩] হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৩/১১৫; আলবানী, সহীহুত তারগীব ১/২১৬। হাদীসটি হাসান।

[৪] বুখারী, আস-সহীহ ৫/২০৩২, ২২৩৭।

[৫] বুখারী, আস-সহীহ ৫/২০৪৭, ২২৩৭; মুসলিম, আস-সহীহ ৪/২২৮৬।

"কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ বলবেন, হে আদম সন্তান, আমি অসুস্থ হয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে দেখতে যাও নি! সে বলবে, হে রাব্ব, আপনি তো রাব্বুল আলামীন, আমি কিভাবে আপনাকে দেখতে যাব? তিনি বলবেন, তুমি তো জেনেছিলে যে, আমার অমুক বান্দা অসুস্থ হয়েছিল, তবুও তুমি তাকে দেখতে যাও নি। তুমি কি জানতে না যে, তুমি যদি তাকে দেখতে যেতে তবে আমাকে তার কাছে পেতে। হে আদম সন্তান, আমি তোমার কাছে খাদ্য চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে খাদ্য দাও নি। সে বলবে, হে রাব্ব, আপনি তো রাব্বুল আলামীন, আমি কিভাবে আপনাকে খাদ্য দিব? তিনি বলবেন, তুমি তো জেনেছিলে যে, আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে খাদ্য চেয়েছিল, কিন্তু তুমি তাকে খাদ্য দাও নি। তুমি কি জানতে না যে, তুমি যদি তাকে খাদ্য দিতে তবে আমার নিকট তা পেতে। হে আদম সন্তান, আমি তোমার কাছে পানি পান করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে পানি দেও নি। সে বলবে, হে রাব্ব, আপনি তো রাব্বুল আলামীন, আমি কিভাবে আপনাকে পানি পান করতে দেব? তিনি বলবেন, তুমি তো জেনেছিলে যে, আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে পানি পান করতে চেয়েছিল, কিন্তু তুমি তাকে পানি দাও নি। তুমি কি জানতে না যে, তুমি যদি তাকে দেখতে যেতে তবে আমাকে তার কাছে পেতে।[১]

হাযেরীন, কাউকে হয়ত টাকাপয়সা দিয়ে উপকার করতে পারেন নি, কিন্তু তার সাথে কয়েক পা হেঁটে যেয়ে মুখের একটি কথা দিয়ে বা যে কোনোভাবে তার একটু উপকার যদি আপনি করেন তবে তা মসজিদে নববীতে একমাস ইতিকাফ করার চেয়েও উত্তম বলে জানিয়েছেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)। তিনি বলেন:

أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللهِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ وَأَحَبُّ الأَعْمَالِ إِلَى اللهِ سُرُوْرٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ أَوْ تَكْشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً أَوْ تَقْضِيْ عَنْهُ دَيْناً أَوْ تَطْرُدُ عَنْهُ جُوْعاً وَلأَنْ أَمْشِيْ مَعَ أَخٍ لِيْ فِيْ حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِيْ هَذَا الْمَسْجِدِ يَعْنِيْ مَسْجِدَ الْمَدِيْنَةِ شَهْراً وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَ اللهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ كَظَمَ غَيْظَهُ وَلَوْ شَاءَ أَنْ يُمْضِيَهُ أَمْضَاهُ مَلأَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ قَلْبَهُ أَمْناً (رِضَى) يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ مَشَى مَعَ أَخِيْهِ فِيْ حَاجَةٍ حَتَّى أَثْبَتَهَا لَهُ أَثْبَتَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدَمَهُ عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزِلُّ فِيْهِ الأَقْدَامُ، وَإِنَّ سُوْءَ الْخُلُقِ لَيُفْسِدُ الْعَمَلَ كَمَا يُفْسِدُ الْخَلُّ الْعَسَلَ

"আল্লাহর নিকট সেই ব্যক্তিই সবচেয়ে প্রিয় যে মানুষের সবচেয়ে বেশি উপকার করে। আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় নেক আমল হলো কোনো মুসলিমের হৃদয়ে আনন্দ প্রবেশ করান, অথবা তার বিপদ, কষ্ট বা উৎকণ্ঠা দূর করা, অথবা তার ঋণ আদায় করে দেওয়া, অথবা তার ক্ষুধা দূর করা। আমার কোনো ভাইয়ের কাজে তার সাথে একটু হেঁটে যাওয়া আমার কাছে এই মসজিদে, অর্থাৎ মসজিদে নববীতে এক মাস ইতেকাফ করার চেয়েও বেশি প্রিয়। যে ব্যক্তি তার ক্রোধ সম্বরণ করবে, আল্লাহ তার দোষত্রুটি গোপন রাখবেন। কেউ নিজের ক্রোধ কার্যকর করার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি তা সম্বরণ করবে, কিয়ামতের দিন মহিমাময় আল্লাহ তার অন্তরকে নিরাপত্তা ও সন্তুষ্টি দিয়ে ভরে দিবেন। যে ব্যক্তি তার কোনো ভাইয়ের সাথে যেয়ে তার প্রয়োজন মিটিয়ে দেবে কেয়ামতের কঠিন দিনে যেদিন পুল-সিরাতের উপরে সকলের পা পিছলে যাবে সেদিন আল্লাহ তার পা সুদৃঢ় রাখবেন। সিরকা বা ভিনিগার যেমন মধু নষ্ট করে দেয় তেমনিভাবে অসৌজন্যমূলক আচরণ মানুষের নেক কর্ম বিনষ্ট করে দেয়।"[২]

হাযেরীন, এভাবে আমরা দেখছি যে, আল্লাহর বান্দার সেবা করার চেয়ে আল্লাহর প্রিয়তর কর্ম আর

---

[১] মুসলিম, আস-সহীহ ৪/১৯৯০।
[২] হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৮/১৯১; আলবানী, সহীহুল জামি ১/৯৭; সহীহুত তারগীব ২/৩৫৯। হাদীসটি হাসান।

কিছুই নেই। নিজের দায়িত্ব ইনসাফের সাথে পালন করাও ইবাদত। থানায়, হাসপাতালে বা অফিসে আগত গ্রামের অসহায় মানুষটিকে আপনি হাসিমুখে কাছে ডেকে আন্তরিকতার সাথে তার সমস্যা শোনেন এবং তার প্রতি আপনার দায়িত্বটুকুই পরিপূর্ণভাবে পালন করেন তাহলে এর জন্য আপনি নফল যিকর, তাহাজ্জুদ ও অনুরূপ ইবাদতের চেয়ে বেশি সাওয়াব ও বরকত লাভ করবেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন যে সকল বান্দাকে আল্লাহ সর্বোচ্চ সম্মান দিয়ে আরশের ছায়ায় আশ্রয় দিবেন তাদের অন্যতম হলো ন্যায়পরায়ণ বা ইনসাফের সাথে দায়িত্বপালনকারী কর্মকর্তা, প্রশাসক বা শাসক।

হাযেরীন, মানুষের উপকার করা শুধু সাওয়াব ও বরকতেরই উৎস নয়, উপরন্তু বিপদ মুক্তিরও উপায়। সহীহ বুখারী ও অন্যান্য গ্রন্থে সংকলিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, তিন ব্যক্তি একবার বিজন মরুভূমির মধ্যে এক পাহাড়ের গুহার মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিলেন। প্রবল বৃষ্টিতে বিশাল এক পাথর পড়ে গুহার মুখটি সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। এভাবে গুহাটি তাদের জীবন্ত কবরে পরিণত হয়। তারা অনেক চেষ্টা করেও পাথরটি একচুল নড়াতে সক্ষম হন না। সর্বশেষ তারা নিজেদের জীবনে প্রিয়তম নেক আমলের ওসীলা দিয়ে আল্লাহর কাছে দু'আ করেন। একজন তাঁর বৃদ্ধ পিতামাতা খিদমতের ওসীলা দিয়ে অপরজন শ্রমিকের পাওনা সঠিকভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার ওসীলা দিয়ে এবং তৃতীয়জন সুযোগ থাকা সত্ত্বেও ব্যভিচার না করে মানুষের উপকার করার ওসীলা দিয়ে আল্লাহর কাছে দু'আ করেন যে, হে আল্লাহ, কেবলমাত্র আপনার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই আমরা এরূপ করেছিলাম। আপনি যদি আমাদের এ কর্ম কবুল করে থাকেন তবে তার ওসীলায় আমাদের এ কঠিন বিপদ কাটিয়ে দেন। তখন আল্লাহ অলৌকিকভাবে পাথরটি সরিয়ে দেন।

হাযেরীন, জীবনে মানুষের উপকার করার কোনো সুযোগ ছাড়বেন না। জাগতিক কোনো উদ্দেশ্যে নয়, শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সুযোগ পেলেই মানুষের সাহায্য করুন। আর কখনো বিপদে পড়লে এ কর্মের ওসীলা দিয়ে আল্লাহর কাছে দুআ করুন। ইনশা আল্লাহ আল্লাহ বিপদ কাটিয়ে দিবেন।

হাযেরীন, শুধু ব্যক্তি মানুষের নয়, জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য কল্যাণকর কার্য করাও অত্যন্ত বড় ইবাদত। রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক দ্রব্য সরিয়ে দেওয়া ঈমানের অংশ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ فَأَخَّرَهُ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ

"একব্যক্তি রাস্তায় চলতে চলতে একটি কাটাওয়ালা ডাল দেখতে পায়, সে ডালটি সরিয়ে দেয়। আল্লাহ তার এ কাজ কবুল করেন এবং তাকে ক্ষমা করে দেন।"[১]

مَنْ رَفَعَ حَجَراً مِنَ الطَّرِيقِ كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ وَمَنْ كَانَتْ (تُقُبِّلَتْ) لَهُ حَسَنَةٌ دَخَلَ الْجَنَّةَ

"যদি কেউ রাস্তা থেকে একটি পাথর সরিয়ে দেয় তবে তার আমলনামায় একটি নেকি লেখা হয়। আর যদি কারো একটি নেকিও কবুল হয়ে যায় তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[২]

হাযেরীন, শুধু মানুষ নয়, যে কোনো প্রাণীর সেবাও বড় ইবাদত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: এক ব্যক্তি বিজন পথে চলতে চলতে পিপাসার্ত হলে একটি কূপে নেমে পানি পান করে। কূপ থেকে বেরিয়ে সে দেখে যে, একটি কুকুর পিপাসার্ত হয়ে হাঁপাচ্ছে এবং মাটি চাটছে। লোকটি বলে, আমার যেমন কষ্ট হচ্ছিল এ কুকুরটিরও তেমন কষ্ট হচ্ছে। তখন সে কূপের মধ্যে নেমে নিজের চামড়ার মোজাটি পানিপূর্ণ করে মুখে কামড়ে ধরে দুহাত দিয়ে কূপ থেকে উঠে আসে এবং কুকুরটিকে পানি খাওয়ায়। আল্লাহ এতে খুশি হয়ে তার এ কর্ম কবুল করেন এবং তাকে ক্ষমা করে দেন। সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহর

---

[১] বুখারী, আস-সহীহ ১/২৩৩, ২/৮৭৪; মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৫২১, ৪/২০২১।

[২] হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৩/১৩৫; আলবানী, সহীহুত তারগীব ৩/৮১। হাদীসটি হাসান।

রাসূল, জীব-জানোয়ারের সেবাতেও কি আমরা সাওয়াব পাব? তিনি বলেন,

فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ

যে কোনো প্রাণের সেবাতেই তোমরা সাওয়াব পাবে।"[১]

সৃষ্টির সেবার অন্যতম বিষয় হলো "হুসনুল খুলুক", অর্থাৎ সুন্দর আচরণ বা অমায়িক ব্যবহার। বিভিন্ন হাদীসে আমরা দেখেছি যে, হাসিমুখে মানুষের সাথে সাক্ষাত করাও ইবাদত এবং ভিনিগার যেমন মধু নষ্ট করে অশোভন আচরণ তেমনি নেক আমল নষ্ট করে। আরো কয়েকটি সহীহ্ হাদীস শুনুন:

مَنْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ فَقَدْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَصِلَةُ الرَّحِمِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ وَحُسْنُ الْجِوَارِ يَعْمُرَانِ الدِّيَارَ وَيَزِيدَانِ فِي الأَعْمَارِ

"যদি কেউ বিনম্রতা ও নম্র আচরণ লাভ করে তাহলে সে দুনিয়া ও আখিরাতের পাওনা সকল কল্যাণই লাভ করল। আর রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা এবং সুন্দর আচরণ বাড়িঘর ও জনপদে বরকত দেয় এবং আয়ু বৃদ্ধি করে।[২]

مَا شَيْءٌ أَثْقَلُ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ، وَإِنَّ صَاحِبَ حُسْنِ الْخُلُقِ لَيَبْلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِبِ الصَّوْمِ وَالصَّلاةِ.

"কিয়ামতের দিন মুমিনের আমলনামায় সুন্দর আচরণের চেয়ে অধিক ভারী আমল আর কিছুই হবে না। যে ব্যক্তি অশ্লীল ও কটু কথা বলে বা অশোভন আচরণ করে তাকে আল্লাহ্ ঘৃণা করেন। আর যার ব্যবহার সুন্দর সে তার ব্যবহারের কারণে নফল রোযা ও তাহাজ্জুদের সাওয়াব লাভ করে।"[৩]

أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ .. تَقْوَى اللَّهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ وَأَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ .. الْفَمُ وَالْفَرْجُ

"সবচেয়ে বেশি যা মানুষকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে তা হলো আল্লাহর ভয় এবং সুন্দর আচরণ। আর সবচেয়ে বেশি যা মানুষকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবে তা হলো মুখ এবং গুপ্তাঙ্গ।"[৪]

أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ

"নিজের মতামত সঠিক হওয়া সত্ত্বেও যে ব্যক্তি বিতর্ক পরিত্যাগ করে আমি তার জন্য জান্নাতের পাদদেশে একটি বাড়ির নিশ্চয়তা প্রদান করছি। আর যে ব্যক্তি সর্বদা মিথ্যা পরিত্যাগ করে, হাসি-মস্করাচ্ছলেও মিথ্য বলে না, তার জন্য আমি জান্নাতের মধ্যস্থলে একটি বাড়ির নিশ্চয়তা প্রদান করছি। আর যার আচরণ-ব্যবহার সুন্দর আমি তার জন্য সর্বোচ্চ জান্নাতে একটি বাড়ির নিশ্চয়তা প্রদান করছি।"[৫]

হাযেরীন, সহীহ মুসলিমের এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, একব্যক্তিকে মৃত্যুর পর আল্লাহ বলেন, তুমি তোমার সম্পদ দিয়ে কি করতে? লোকটি বলে, আমি ব্যবসাবাণিজ্য করতাম। লেনদেনে উত্তম আচরণ করতাম। কারো দেনা পরিশোধে অসুবিধা হলে তাকে সময় দিতাম। মানুষের ক্ষমা করা ও ভাল আচরণ করা ছিল আমার রীতি। তখন আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দেন।" অন্য হাদীসে তিনি বলেন:

---

[১] বুখারী, আস-সহীহ ২/৮৩৩, ৮৭০, ৫/২২৩৮; মুসলিম, আস-সহীহ ৪/১৭৬১।

[২] আহমদ, আল-মুসনাদ ৬/১৫৯; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৮/১৫৩; আলবানী, সহীহুত তারগীব ২/৩৩৬। হাদীসটি সহীহ।

[৩] তিরমিযী, আস-সুনান ৪/৩৬২-৩৬৩; আলবানী, সহীহুত তারগীব ৩/৫। হাদীসটি সহীহ।

[৪] তিরমিযী, আস-সুনান ৪/৩৬৩; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ৪/৩৬০; আলবানী, সহীহুত তারগীব ২/১৪৮, ৩/৫। হাদীসটি সহীহ।

[৫] আবূ দাউদ, আস-সুনান ৪/২৫৩; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৮/২৩; আলবানী, সহীহুত তারগীব ৩/৬। হাদীসটি হাসান।

غَفَرَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانَ سَهْلًا (سَمْحاً) إِذَا بَاعَ سَهْلًا إِذَا اشْتَرَى سَهْلًا إِذَا اقْتَضَى

"তোমাদের পূর্বের এক ব্যক্তি ক্রয়, বিক্রয় ও পাওনা আদায়ে নম্রতা ও শোভন আচরণ করত, এজন্য আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন।"[১]

হাযেরীন, সুন্দর ও ভদ্র আচরণের ফযীলতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এত বেশি নির্দেশনা হাদীস গ্রন্থসমূহে সংকলিত হয়েছে যে, এ বিষয়ক হাদীসগুলি আলোচনা করতে কয়েকটি খুতবার প্রয়োজন। তিনি বলেন: "সুন্দর আচরণই নেক আমল।" (মুসলিম) "মুমিনদের মধ্যে তার ঈমানই পরিপূর্ণ যার আচরণ সুন্দরতম" (আবূ দাউদ, তিরমিযী)। "তোমাদের মধ্যে যার আচরণ-ব্যবহার সুন্দর সে আমার সবচেয়ে বেশি প্রিয় এবং কিয়ামতের দিন সে আমার সবচেয়ে কাছে থাকবে।" (তিরমিযী)। "অশোভন-অশ্লীল কথা ও আচরণের সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। আর যার আচরণ যত সুন্দর তার ইসলাম তত সুন্দর।" (আহমদ) "তোমরা তো টাকাপয়সা দিয়ে মানুষদের চাহিদা মিটিয়ে দিতে পারবে না; তবে তোমাদের সুন্দর আচরণ এবং হাস্যোজ্জ্বল মুখ তাদের চাহিদা মেটাবে।" (আবূ ইয়ালা)। "মহান আল্লাহ দয়ালু-বিনম্র, তিনি সকল বিষয়ে নম্রতা পছন্দ করেন।" (বুখারী ও মুসলিম)। তিনি দুআ করতেন যে, হে আল্লাহ আপনির যেভাবে আমাকে সুন্দর আকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, সেভাবে আপনি আমার প্রকৃতি ও আচরণকে সুন্দর বানিয়ে দিন। (আহমদ) নামাযের সানা পাঠের সময় তিনি দুআ করতেন, হে আল্লাহ, আমাকে সুন্দর আচরণের প্রতি পরিচালিত করুন এবং খারাপ আচরণ থেকে রক্ষা করুন। (মুসলিম)।

হাযেরীন, সুন্দর আচরণের ছয়টি দিকের প্রতি হাদীস শরীফে বিশেষভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে: (১) সকলের সাথে হাস্যোজ্জ্বল মুখে সাক্ষাত করা ও কথাবার্তা বলা। (২) বিনয়-বিনম্রতা ও অহঙ্কার বর্জন, (৩) বিতর্ক পরিহার করা, (৪) মানুষের আচরণে কষ্ট পেলে ধৈর্য ধারণ করা, (৫) মানুষের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা এবং যথাসম্ভব কম বলা এবং (৬) উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।

হাযেরীন, আমরা দেখেছি যে, কারো উপকার করতে না পারলে ক্ষতি থেকে বিরত থাকাও সাওয়াবের কাজ। এর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো ব্যক্তিগত দোষত্রুটি গোপন করা। মানুষের গোপন দোষত্রুটি জানার চেষ্টা করা হারাম। কোনো দোষ জানতে পারলে তা তার অনুপস্থিতিতে অন্যকে বলা গীবত ও হারাম। আর এরূপ দোষ গোপন রাখা অত্যন্ত বড় সাওয়াবের কাজ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ

"যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের দোষ গোপন রাখবে আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ গোপন রাখবেন।"[২]

মিশরের গভর্নর সাহাবী উকবা ইবনু আমির (রা) এর সেক্রেটারী 'আবুল হাইসাম দুখাইন' বলেন, আমি উকবা (রা) কে বললাম, আমাদের কয়েকজন প্রতিবেশী মদপান করছে। আমি এখনি যেয়ে পুলিশ ডাকছি যেন তাদের ধরে নিয়ে যায়। উকবা বলেন, তুমি তা করো না। বরং তুমি তাদেরকে উপদেশ দাও এবং ভয় দেখাও।.... আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) -কে বলতে শুনেছি,

مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ مُؤْمِنٍ فَكَأَنَّمَا اسْتَحْيَا مَوْءُودَةً فِيْ قَبْرِهَا

"যে ব্যক্তি কোনো মুমিন ব্যক্তির দোষ গোপন করল, সে যেন জীবন্ত প্রোথিত একটি কন্যাকে তার কবর থেকে উঠিয়ে জীবন দান করল।"[৩] আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক দান করুন। আমীন।

---

[১] তিরমিযী, আস-সুনান ৩/৬১০। হাদীসটি সহীহ। সমার্থক হাদীস দেখুন, বুখারী, আস-সহীহ ২/৭৩০।
[২] বুখারী, আস-সহীহ ২/৮৬২; মুসলিম, আস-সহীহ ৪/১৯৯৬, ২০৭৪।
[৩] হাকিম, আল-মুসতাদরাক ৪/৪২৬; ইবনু হিব্বান, আস-সহীহ ২/২৭৫; হাইসামী মাওয়ারিদুয যামআন ৫/৩৫। হাদীসটি সহীহ।

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِه وَأَصْحَابِه وَسَلَّمَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِه وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

أَمَّا بَعْدُ، فَيَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: فَلا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي

يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ

وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَاللَّـــهُ فِـــي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَـــا وَكَافِـــلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا وَقَالَ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى

بَارَكَ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ فِيْ الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ. وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ. أَقُــوْلُ قَــوْلِيْ هَــذا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُــلِّ ذَنْــبٍ، فَاسْتَغْفِرُوْهُ وَتُوْبُوْا إِلَيْهِ، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.

যুলহাজ্জ মাসের ৩য় খুতবাঃ দু'আ ও মুনাজাত

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লী আলা রাসূলিহীল কারীম। আম্মা বাদ,

সম্মানিত উপস্থিতি, আজ যুলহাজ্জ মাসের তৃতীয় জুমুআ। আজ দুআ ও মুনাজাত বিষয়ে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ। কিন্তু তার আগে আমরা এ সপ্তাহের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসগুলির বিষয়ে সংক্ষেপ আলোকপাত করি। হাযেরীন, আজ ইংরেজী ..... মাসের ..... তারিখ। এ সপ্তাহের দিবসগুলির মধ্যে রয়েছে ....।

হাযেরীন, যিকরের গুরুত্ব আমরা জেনেছি। দুআ-মুনাজাত হলো যিকরের অন্যতম একটি দিক। দু'আর মাধ্যমে বান্দা আল্লাকে স্মরণ করে, আল্লাহকে ডাকে এবং তাঁর কাছে কিছু চায়। দু'আ অর্থ ডাকা, প্রার্থনা করা বা চাওয়। আর মুনাজাত অর্থ চুপেচুপে কথা বলা। এজন্য সকল প্রকার যিক্‌রই মুনাজাত। আর চাওয়া, প্রার্থনা করা বা ডাকা হলো দু'আ। কুরআন ও হাদীসের আলোকে দু'আর গুরুত্ব আলোচনা করতে কয়েকটি খুতবার প্রয়োজন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ ثُمَّ قَرَأَ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

"দু'আ বা প্রার্থনাই হলো ইবাদত। এরপর তিনি কুরআনের আয়াত[১] পাঠ করেনঃ তোমাদের প্রভু বলেনঃ "তোমরা আমার কাছে দু'আ কর, আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব বা তোমাদের প্রার্থনা পূরণ করব। নিশ্চয় যারা আমার ইবাদত থেকে অহঙ্কার করে তারা শীঘ্রই লাঞ্ছিত অপমানিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।"[২]

হাযেরীন, তাহলে দু'আই হলো ইবাদত। আপনি যদি নিজের যে কোনো প্রয়োজনে ১৫ মিনিট আল্লাহর কাছে দু'আ করেন তাহলে ১৫ মিনিট ধরে তাহাজ্জুদ বা যিকরের মতই সাওয়াব লাভ করবেন, দু'আর ফল পান অথবা না পান। দু'আর গুরুত্ব ও ফযীলত বিষয়ে কয়েকটি হাদীস শুনুনঃ

لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنَ الدُّعَاءِ

"আল্লাহর কাছে দু'আর চেয়ে সম্মানিত বস্তু আর কিছুই নেই।"[৩]

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيهَا إِثْمٌ وَلَا قَطِيعَةُ رَحِمٍ إِلا أَعْطَاهُ اللَّهُ بِهَا إِحْدَى ثَلَاثٍ إِمَّا أَنْ تُعَجَّلَ لَهُ دَعْوَتُهُ وَإِمَّا أَنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ وَإِمَّا أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا قَالُوا إِذًا نُكْثِرُ قَالَ اللَّهُ أَكْثَرُ

"যখনই কোনো মুসলিম পাপ ও আত্মীয়তা নষ্ট করা ছাড়া অন্য যে কোনো বিষয় আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে তখনই আল্লাহ তাঁর প্রার্থনা পূরণ করে তাঁকে তিনটি বিষয়ের একটি দান করেন : হয় তাঁর প্রার্থিত বিষয় তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে প্রদান করেন, অথবা তাঁর প্রার্থনাকে (প্রার্থনার সাওয়াব) তাঁর আখিরাতের জন্য সঞ্চয় করে রাখেন অথবা দু'আর পরিমাণে তাঁর অন্য কোনো বিপদ তিনি দূর করে দেন।" একথা শুনে সাহাবীগণ বলেন : তাহলে আমরা বেশি বেশি দু'আ করব। তিনি উত্তরে বলেন : আল্লাহ তা'আলা আরো বেশি (প্রার্থনা পূরণ করবেন)।[৪]

---

[১] সূরা গাফির (মুমিন) : ৬০।

[২] তিরমিযী ৫/২১১; আবূ দাউদ ২/৭৬; ইবনু মাজাহ ২/১২৫৮; ৩/১৭২; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ১/৬৬৭। হাদীসটি সহীহ।

[৩] তিরমিযী, আস-সুনান ৫/৪৫৫; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ১/[illegible]; হাইসামী, মাজমাউষ যাওয়াইদ ১/৮১। হাদীসটি সহীহ।

[৪] তিরমিযী, আস-সুনান ৫/৫৬৬; হাকিম, আল-মুসতাদরাক [illegible]; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/১৪৭-১৪৮। হাদীসটি সহীহ।

إِنَّ اللَّهَ حَيِيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي إِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ إِلَيْهِ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا خَائِبَتَيْنِ

"নিশ্চয় আল্লাহ লাজুক দয়াবান। যখন কোনো মানুষ তাঁর দিকে দু'খানা হাত উঠায় তখন তিনি তা ব্যর্থ ও শূন্যভাবে ফিরিয়ে দিতে লজ্জা পান।"[১]

لا يَرُدُّ الْقَضَاءَ إِلا الدُّعَاءُ وَلا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلا الْبِرُّ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِخَطِيئَةٍ يَعْمَلُهَا

"দু'আ ছাড়া আর কিছুই তাকদীর উল্টাতে পারে না। মানুষের উপকার ও কল্যাণের কাজেই শুধু আয়ু বৃদ্ধি পায়। অনেক সময় মানুষ গোনাহ্ করার ফলে তার রিযিক থেকে বঞ্চিত হয়।"[২]

الدُّعَاءُ سِلاحُ الْمُؤْمِنِ، وَعِمَادُ الدِّيْنِ، وَنُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ

"দু'আ হচ্ছে মু'মিনের অস্ত্র, দ্বীনের স্তম্ভ ও আসমান ও যমিনের নূর।"[৩]

أَعْجَزُ النَّاسِ مَنْ عَجَزَ عَنِ الدُّعَاءِ وَأَبْخَلُ النَّاسِ مَنْ بَخِلَ بِالسَّلامِ

"সবচেয়ে অক্ষম যে দু'আ করতে অক্ষম। আর সবচেয়ে কৃপণ যে সালাম দিতেও কৃপণতা করে।"[৪]

مَنْ لَمْ يَدْعُ اللهَ غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ

"কেউ আল্লাহর কাছে না চাইলে বা দু'আ না করলে আল্লাহ্ তার উপর ক্রোধান্বিত হন।"[৫]

হাযেরীন, দু'আর এ অভাবনীয় সাওয়াব ও বরকত পেতে হলে দু'আ নামক ইবাদতটি আপনাকে নিজে করতে হবে। আপনি যদি আমার কাছে এসে দু'আ চান তাহলে দু'আ করার কোনো সাওয়াব, বরকত বা ফযীলত কিছুই আপনি পেলেন না। আপনার অনুরোধে বা বিনা অনুরোধে আমি যদি আপনার জন্য দু'আ করি তবে আমি সাওয়াব পাব। আল্লাহ্ আমার দু'আ কবুল করে আপনার প্রয়োজন মেটাবেন, অথবা আমার অন্য কোনো বিপদ কাটিয়ে দেবেন, অথবা আমার জন্য দু'আর সাওয়াব আখিরাতে জমা রাখবেন। আপনি কিছুই পাবেন না। কারণ ইবাদতটি তো আপনি করেন নি, আমি করেছি।

আপনি হয়ত মনে করবেন, আপনাকে তো হাদিয়া দিলাম, তাহলে দু'আর সাওয়াব আমি পাব না কেন? আর এ চিন্তা হলো আরো ভয়ানক কথা। আপনি যদি আল্লাহকে খুশি করার জন্য কোনো আলিম বা বুজুর্গকে হাদিয়া দেন তবে আপনি হাদিয়ার সাওয়াব পাবেন। আর যদি দু'আর পারিশ্রমিক হিসেবে টাকা দেন তবে সবই লস। ইসলামে উস্তাদ বা মুরশিদ আছে, পুরোহিত নেই। আপনার নামায, রোযা, দু'আ, যিকর বা অন্য কোনো ইবাদাত অন্য কেউ করতে পারে না। এমনকি আপনার নামায, রোযা, যিকর, দু'আ বা অন্য কোনো ইবাদত কবুল হওয়ার জন্যও কারো মধ্যস্থতা বা সুপারিশের প্রয়োজন হয় না।

হাযেরীন, পিতামাতা, উস্তাদ, আলিম বা নেককার কোনো জীবিত মানুষের কাছে দু'আ চাওয়া জায়েয। পাশাপাশি নিজেও সর্বদা দু'আ করতে হবে। কারো কাছে দু'আ না চাইলে আল্লাহ্ রাগ করবেন তা কোথাও বলেন নি। কিন্তু আল্লাহর কাছে দু'আ করা বাদ দিলে আল্লাহ্ রাগ করবেন। আমরা অনেক সময় মনে করি, আমরা গোনাহগার, আমাদের দু'আ কি আল্লাহ্ শুনবেন? আসলে গোনাহগারের দু'আই

---

[১] তিরমিযী, আস-সুনান ৫/৫৫৬; ইবনু মাজাহ, আস-সুনান ২/১২৭১;, ইবনু হিব্বান, আস-সহীহ ৩/১৬০; ১৬৩; হাইসামী, মাওয়ারিদুয যামআন ৮/৩৭-৪০; মুনযিরী, আত-তারগীব ২/৪৭৭। হাদীসটি সহীহ।

[২] হাকিম, আল-মুসতাদরাক ১/৬৭০; তিরমিযী, আস-সুনান ৪/৪৪৮। হাদীসটি সহীহ।

[৩] হাকিম, আল-মুসতাদরাক ১/৬৬৯; হাকিম ও যাহাবী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[৪] আব্দুল গনী মাকদিসী, কিতাবুদ দু'আ পৃ. ১৪১; তাবারানী, আল-মু'জামুল আউসাত ২/৪২; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/১৪৬-১৪৭; আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদীসিস সাহীহাহ ২/১৫০; সহীহুল জামিয়িস সাগীর ১/২৩৮। হাদীসটি সহীহ।

[৫] ইবনু মাজাহ, আস-সুনান ২/১২৫৮, নং ৩৮২৭, আলবানী, সহীহ্ সুনানু ইবুন মাজাহ ৩/২৫২, মুসনাদু আহমাদ ২/৪৪৩, ২/৪৭৭, ইবনু আবী শাইবা, আল-মুসান্নাফ ৬/২২, মুবারাকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াযী ৯/২২১, যারকানী, শারহুল মাওয়াহিব ২/৪৪। হাদীসটি হাসান।

তো তিনি শুনেন। আল্লাহ আকুতি ও বেদনাময় হৃদয়ের দু'আ পছন্দ করেন এবং কবুল করেন। নিজের কান্না কি অন্য কেউ কাঁদতে পারে। রাসূলুল্লাহ ﷺ কে প্রশ্ন করা হয়, "সর্বোত্তম দু'আ কি?" তিনি বলেন:

دُعَاءُ الْمَرْءِ لِنَفْسِهِ

"মানুষের নিজের জন্য নিজের দু'আ।"[১]

হাযেরীন, দু'আর অনেকে শর্ত ও আদব আছে, যেগুলির কারণে দু'আ কবুল হওয়ার বেশি আশা করা যায়। এগুলির মধ্যে রয়েছে: হালাল ভক্ষণ করা ও হারাম উপার্জন থেকে দূরে থাকা। সৎকাজে আদেশ করা এবং অন্যায় থেকে নিষেধ করা। সুন্নাতপন্থী ও সুন্নাত অনুসারী হওয়া। সদা সর্বদা বেশি বেশি দু'আ করা। শুধুমাত্র মঙ্গলময় বিষয়ই কামনা করা এবং বদদোয়া থেকে বিরত থাকা। দু'আ করে ফলাফলের জন্য ব্যস্ত না হওয়া। আল্লাহ কবুল করবেন এই সুদৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে মনোযোগের সাথে দু'আ করা। নিজের জন্য নিজে দু'আ করা। অন্যের জন্য দু'আ করলে প্রথমে নিজের জন্য দু'আ করা। অনুপস্থিত মুসলমানদের জন্য দু'আ করা। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জাগতিক ও পারলৌকিক সকল বিষয় শুধুমাত্র আল্লাহর নিকটেই চাওয়া। অসহায় ও কাতর হৃদয়ে দু'আ করা। দু'আর আগে কিছু নেক আমল করা, বিশেষত কিছু যিকর, তাসবীহ, আল্লার প্রশংসা, দরূদ ইত্যাদি পাঠ করা। আল্লাহর মহান নাম ও ইসমে আ'যম দ্বারা দু'আ চাওয়া। দু'আর শুরুতে ও শেষে দরূদ পড়া। দু'আয় 'ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরামক' বলা। একই সময়ে বারবার চাওয়া বা তিনবার দু'আ করা। দু'আর সময় শাহাদত আঙ্গুলি দিয়ে ইশারা করা। দু'আর সময় দৃষ্টি বিনীত ও নত রাখা। দু'আর সময় হাত উঠানো। দু'আর সময় কিবলামুখী হওয়া।[২]

হাযেরীন, সকল সময় সকল অবস্থাতেই দু'আ করবেন। বিশেষভাবে মাসনূন সময়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখবেন। বিভিন্ন হাদীসে দু'আ কবুলের বিভিন্ন সময়ের কথা বলা হয়েছে। যেমন, রাত, বিশেষত শেষ রাত, রমযান মাস, ফরয বা নফল রোযা অবস্থায়, ইফতারের সময়, যমযমের পানি পান করার সময়, আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়, জিহাদের ময়দানে যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে, শুক্রবারের দিনের ও রাত্রের বিশেষ মুহূর্ত, নামাযের মধ্যে, সাজদা রত অবস্থায়, নামাযের শেষে তাশাহ্হুদ ও দরুদের পরে সালামের আগে, কুনুতের সময়, পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের পর।[৩]

হাযেরীন, সকল ইবাদতের ন্যায় দু'আর ক্ষেত্রেও যথাসাধ্য সুন্নাত পদ্ধতি অবলম্বন করবেন এবং মাসনূন বা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শেখানো কথা ব্যবহার করে দু'আ করবেন। হাদীসে নিষেধ নেই এমন যে কোনো ভাষায়, যে কোনো সময়ে এবং যে কোনো অবস্থায় মুমিন আল্লাহর নিকট মুনাজাত করতে পারেন। এতে দু'আর মূল ইবাদত পালন হবে এবং বান্দা সাওয়াবের আশা করবেন। তবে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর শেখানো কথা দ্বারা মুনাজাত করলে মুমিন মাসনূন বাক্য ব্যবহারের জন্য অতিরিক্ত সাওয়াব লাভ করবেন। এ ছাড়া মাসনূন বাক্য ব্যবহারের মাধ্যমে মুমিন অতিরিক্ত বরকত ও মহব্বত লাভ করবেন এবং দোয়া কবুল হওয়ার বেশি আশা করতে পারবেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ যে মুনাজাত যখন যেভাবে করতে শিক্ষা দিয়েছেন তা তখন সেভাবেই করার চেষ্টা করবেন। এজন্য সহীহ হাদীস থেকে মাসনূন দু'আ ও দু'আর মাসনূন পদ্ধতি জেনে নেবেন। মেশকাত শরীফে দু'আর অধ্যায়গুলি, ইমাম নববীর কিতাবুল আযকার ও সহীহ হাদীস ভিত্তিক মাসনূন দু'আর বইগুলি পাঠ করবেন।

হাযেরীন, নিজের জন্য দু'আ করার পাশাপাশি পিতামাতা ও অন্য সকল মুমিন মুমিনার জন্য

---

[১] হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/১৫২। হাদীসটির সনদ গ্রহণযোগ্য।

[২] বিস্তারিত দেখুন, ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, রাহে বেলায়াত: রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যিকর ওযীফা, পৃ. ৮৩-১৩৮।

[৩] বিস্তারিত দেখুন, ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, রাহে বেলায়াত: রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যিকর ওযীফা, পৃ. ১২৫-১৩৬।

দু'আ করতে হবে বিশেষত যারা দু'আর সময় আমাদের কাছে নেই তাদের জন্য দু'আ করতে হবে। এভাবে সারা বিশ্বের মুসলিমদের জন্য দু'আ করতে হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ كُلَّمَا دَعَا لأَخِيهِ بِخَيْرٍ قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ آمِينَ وَلَكَ بِمِثْلٍ

"কোনো মুসলিম তার কোনো অনুপস্থিত ভাইয়ের জন্য দু'আ করলে তা কবুল করা হয়। তার মাথার কাছে একজন ফিরিশতা নিয়োজিত থাকেন। যখনই ঐ মুসলিম তার অনুপস্থিত ভাইয়ের জন্য কোনো কল্যাণ বা মঙ্গল চায়, তখনই ফিরিশতা বলেন : আমীন, এবং আপনার জন্যও অনুরূপ।"[১]

হাযেরীন, নিজে দু'আ করার পাশাপাশি কোনো জীবিত নেককার মানুষকে আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য দু'আ করতে অনুরোধ করা সাধারণভাবে সুন্নাত-সম্মত। সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে দোয়া চাইতেন। তাঁরা একে অপরের কাছেও দুআ চেয়েছেন কখনো কখনো। একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে : উমর (রা.) উমরাহ আদায়ের জন্য মক্কা শরীফে গমনের অনুমতি চাইলে রাসূলুল্লহ ﷺ অনুমতি প্রদান করেন এবং বলেন : আমাদেরকেও তোমার দু'আর মধ্যে মনে রেখ, ভুলে যেও না।[২]

তাবেয়ীগণও সাহাবীগণের কাছে মাঝেমধ্যে দু'আ চাইলে তাঁরা দু'আ করতেন। এক ব্যক্তি আনাস (রা)-এর কাছে এসে দু'আ চায়। তিনি বলেন: "আল্লাহুম্মা আতিনা ফিদদুনিয়া হাসানাতাও ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাহ।" (হে আল্লাহ, আপনি আমাদেরকে দুনিয়ায় কল্যাণ এবং আখেরাতে কল্যাণ দান করুন।) ঐ ব্যক্তি বার বার দু'আ চাইলে তিনি শুধু এতটুকুই বলেন।[৩]

অপরদিকে তাঁরা এ বিষয়ে বাড়াবাড়ি বা অতিভক্তি নিষেধ করতেন। অনেক সময় অনেক সাহাবী দোয়া চাইলে করতেন না, কারণ এতে মানুষ দোয়া চাওয়ার রীতি তৈরি করে নেবে। এক ব্যক্তি খলীফা উমরের (রা.) কাছে চিঠি লিখে দোয়া চায়। তিনি উত্তরে লিখেন :

إِنِّي لَسْتُ بِنَبِيٍّ، وَلَكِنْ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَاسْتَغْفِرِ اللهَ لِذَنْبِكَ

"আমি নবী নই (যে, তোমাদের জন্য দোয়া করব বা আমার দোয়া কবুল হবেই), বরং যখন নামায কায়েম করা হবে, তখন তুমি তোমার গোনাহের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে।"[৪]

সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রা.) সিরিয়ায় গেলে এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে দোয়া চেয়ে বলেন : আপনি দোয়া করুন, যেন আল্লাহ আমার গোনাহ ক্ষমা করেন। তিনি বলেন: আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন। এরপর অন্য একজন এসে একইভাবে দোয়া চান। তখন তিনি বলেন : আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা না করুন, আগের ঐ ব্যক্তিকেও ক্ষমা না করুন! আমি কি নবী?[৫]

হাযেরীন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের সুন্নাত ছিল সদা সর্বদা নিজের জন্য নিজে আল্লাহর কাছে দু'আ করা। রাসূলুল্লাহ ﷺ ছাড়া অন্য কারো কাছে দু'আ চাওয়া, সাহাবী বা তাবেয়ীগণের মধ্যে পরস্পরের দু'আ চাওয়া বা তাবেয়ীগণ কর্তৃক সাহাবীগণের নিকট দু'আ চাওয়ার ঘটনা খুবই কম। এজন্যই এক্ষেত্রে এ সকল সাহাবী (রা) কঠোরতা অবলম্বন করেছেন।[৬]

---

[১] সহীহ মুসলিম ৪/২০৯৪, নং ২৭৩২, ২৭৩৩।
[২] তিরমিযী, আস-সুনান ৫/৫৫৯; আবু দাউদ, আস-সুনান ২/৮০। তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।
[৩] শাতেবী, আল-ইতিসাম ১/৫০০-৫০১।
[৪] শাতেবী, আল-ইতিসাম ১/৫০১।
[৫] শাতেবী, আল-ইতিসাম ১/৫০১।
[৬] শাতেবী, আল-ইতিসাম ১/৫০০-৫০৩।

হাযেরীন, অন্যের কাছে দু'আ চাওয়ার ক্ষেত্রে একটি বিষয় লক্ষণীয়। হাদীস শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সন্তানের জন্য পিতামাতার দু'আ আল্লাহ কবুল করেন। অনুরূপভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাদের দু'আ কবুল করেন। আল্লাহর প্রিয় বান্দা কে আমরা তা কেউই নিশ্চিত বলতে পারি না। অলৌকিকত্ব বা কারামত বেলায়াতের প্রমাণ নয়, কারণ কোন্ অলৌকিক কর্ম কারামত, আর কোন্ অলৌকিক কর্ম শয়তানী ইসতিদরাজ তা আমরা জানি না। হিন্দু সন্ন্যাসী, ন্যাড়ার ফকির, শিয়া, বাতিনী ও অন্যান্য বাতিল ফিরকার লোকেরাও অলৌকিক কর্ম দেখায়। আল্লাহ কুরআনে বলেছেন যে, বেলায়াতের ভিত্তি হলো ঈমান ও তাকওয়া। আর এ দুটি বিষয়ই অন্তরের মধ্যে থাকে। এজন্য কে ওলী তা সুনিশ্চিত জানা যায় না। তবে আমরা ধারণা ও আশা করি যে, অমুক ব্যক্তি ওলী, এবং এ ধারণার ভিত্তিতে আমরা তাদের কাছে দু'আ চাই। পক্ষান্তরে আমাদের পিতামাতা কে তা সবাই নিশ্চিত জানি। তা সত্ত্বেও আমরা পিতামাতার কাছে দু'আ চাই না। সমাজে প্রচলিত অগণিত বানোয়াট গল্প-কাহিনীর ফলে অনেকের ধারণা হয়েছে যে, পিতামাতার দু'আ কবুল করা আল্লাহর ইচ্ছা, কিন্তু ওলীআল্লাহর দু'আ কবুল না করে আল্লাহ পারেন না। এরূপ চিন্তা শিরকী চিন্তা ছাড়া কিছুই নয়।

হাযেরীন, অন্যের কাছে দু'আ চাওয়ার অর্থ জীবিত কাউকে অনুরোধ করা যে, আপনি আমার জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করুন। মৃত পিতামাতা বা ওলীআল্লাহদের কবরে যেয়ে তাদেরকে এরূপ অনুরোধ করা সুন্নাতের বিপরীতে কঠিন অন্যায় কাজ। একটি মিথ্যা কথা সমাজে হাদীস নামে প্রচলিত, যাতে বলা হয় "আল্লাহর ওলীরা মরেন না।" এতে আমরা মনে করি, জীবিতদের মত তাদের কাছেও দু'আ চাওয়া যায়। হাযেরীন, "ওলীরা মরেন না" কথাটি জাল কথা হলেও কুরআন থেকে জানা যায় যে, শহীদরা মরেন না এবং হাদীস থেকে জানা যায যে, নবীগণের মৃত্যুপরবর্তী বরযখী হায়াত আছে। তারপরেও আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের দিকে তাঁকান। রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো কোনো মৃত নবী, ওলী বা শহীদদের কাছে দু'আ চান নি এবং এরূপ দু'আ চাওয়ার কোনোরূপ নির্দেশনা দেন নি। মৃত নবী, ওলী বা শহীদকে সালাম দিতে ও তাদের জন্য দু'আ করতে বলেছেন, তাদের কাছে দু'আ চেতে কখনোই বলেন নি। আল্লাহর কাছে দু'আ চাওয়ার জন্য কোনো নবী বা ওলীর মাযারে যেতে বলেন নি। কারো মাযারে যেয়ে আল্লাহর কাছে দু'আ চাইলে আল্লাহ তাড়াতাড়ি কবুল করবেন তাও বলেন নি।

সাহাবীগণ কখনোই কোন নবী, ওলী বা বুজুর্গের কবরে যেয়ে তাঁদের কাছে দোয়া চান নি। এমনকি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইন্তেকালের পর তাঁর রওযা মুবারাকায় যেয়ে তাঁর কাছে দোয়া চাওয়ার রীতিও সাহাবীগণের মধ্যে ছিল না। ভক্তি ও মহব্বতের সাথে যিয়ারত ও সালামের রীতি ছিল তাঁদের মধ্যে। সাহাবীগণ বিভিন্ন সমস্যায় পড়েছেন, যুদ্ধবিগ্রহ করেছেন বা বিপদগ্রস্ত হয়েছেন। কখনোই খুলাফায়ে রাশেদীন বা সাহাবীগণ দলবেঁধে বা একাকী রাসূলুল্লাহর ﷺ রওযা মুবারাকে যেয়ে তাঁর কাছে দোয়া চাননি বা আল্লাহর কাছে দু'আ চাওয়ার জন্য রাওযা শরীফে সমবেত হন নি। সিহাহ সিত্তা ও হাদীসের অন্যান্য গ্রন্থ খুঁজে দেখুন। এ জাতীয় কোনো ঘটনা পাবেন না। তাঁদের অনেক পরে এরূপ কর্মের উদ্ভব হয়েছে।

হাযেরীন, সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বিষয় হলো আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যের কাছে চাওয়া বা বিপদে আপদে আল্লাহকে না ডেকে জীবিত বা মৃত কোনো ওলী-বুজুর্গকে ডেকে সাহায্য বা উদ্ধার প্রার্থনা করা। এরূপ করা শিরক। সবচেয়ে বড় কথা মুমিন কেন আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকবে? কুরআনে আল্লাহ বারংবার বলেছেন একমাত্র তাঁরই কাছে চাইতে এবং তাঁকেই ডাকতে। তাঁকে ছাড়া অন্য কাউকে ডাকতে নিষেধ করেছেন। যারা তাঁকে ডাকে না তারা লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে যাবে বলে জানিয়েছেন। অগণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে শিখিয়েছেন সবকিছু একমাত্র আল্লাহর কাছে চাইতে। কুরআন বা হাদীসে

ঘুনাক্ষরে কখনো কোথাও বলা হয় নি যে, বিপদে আপদে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকতে হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো তা করেন নি বা করতে শেখান নি। সাহাবীগণ কখনোই তা করেন নি। ভয়ঙ্করতম বিপদে পড়েও কখনো তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রাওযায় যেয়ে বলেন নি যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি আমাদেরকে উদ্ধার করুন। এরপরও কেন আজগুবি গল্পকাহিনীর ভিত্তিতে আল্লাহ ছাড়া অন্যকে ডাকব?

হাযেরীন, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে কিছু চাইবে কেন মুমিন? তিনিই তো সব ক্ষমতার মালিক। কেউ তো তাঁর ইচ্ছার বাইরে কোনো কল্যাণ বা অকল্যাণ করার নূন্যতম ক্ষমতা রাখে না। আমি কেন অন্যের কাছে চেয়ে নিজেকে হেয় ও আমার মহান রব্বের প্রতি আমার আস্থা কমিয়ে ফেলব? ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন :

يَا غُلامُ إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ احْفَظْ اللَّهَ يَحْفَظْكَ احْفَظْ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتْ الأَقْلامُ وَجَفَّتْ الصُّحُفُ

'হে বালক, আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিক্ষা দিচ্ছি। তুমি আল্লাহকে হেফাযত করবে, তাহলে তিনি তোমাকে রক্ষা করবেন। তুমি আল্লাহকে হেফাযত করবে, তাহলে তাঁকে সর্বদা তোমার সামনে পাবে। যখন চাইবে তখন শুধু আল্লাহর কাছেই চাইবে। যখন সাহায্য প্রার্থনা করবে, তখন শুধু আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইবে। জেনে রাখ, যদি সকল মানুষ তোমার কোনো কল্যাণ করতে সম্মিলিত হয়, তাহলে তারা তোমার শুধুমাত্র ততটুকুই কল্যাণ করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ নির্ধারণ করেছেন। আর যদি তারা সবাই তোমার অকল্যাণ করতে একজোট হয়, তাহলে তারা তোমার শুধুমাত্র ততটুকুই অকল্যাণ করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ তোমার বিরুদ্ধে নির্ধারণ করেছেন। কলমগুলি উঠে গেছে এবং পৃষ্ঠাগুলি শুকিয়ে গিয়েছে।"[১]

হাযেরীন, দু'আর জন্য ওযু, গোসল ইত্যাদি শর্ত নয়। হাটতে, চলতে, বসে শুয়ে সর্বদা যিকর ও দু'আ করবেন। নিম্নের দু'আটি সদাসর্বদা বেশিবেশি বলতে শিক্ষা দিতেন রাসূলুল্লাহ ﷺ:

اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاهْدِنِيْ [وَعَافِنِيْ] وَارْزُقْنِيْ

অর্থ: "হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা করুন, আমাকে দয়া করুন, আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন, আমাকে সার্বিক নিরাপত্তা ও সুস্থতা দান করুন এবং আমাকে রিযিক দান করুন।"[২]

হাযেরীন, এ দু'আর মধ্যে দুনিয়া ও আখিরাতের সবই আছে। মাসনূন দু'আগুলি শিখুন। না পারলে নিজের ভাষায় সর্বদা আল্লাহর কাছে চাইতে থাকুন। আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক দান করুন। আমীন।

---

[১] তিরমিযী, আস-সুনান ৪/৬৬৭, নং ২৫১৬, মুসতাদরাক হাকিম ৩/৬২৩, ৬২৪। হাদীসটি সহীহ।
[২] সহীহ মুসলিম ৪/২০৭৩, নং ২৬৯৭।

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

أَمَّا بَعْدُ، فَيَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ

عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ شَـــيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ الدُّعَاءِ

وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: لا يَــرُدُّ الْقَضَاءَ إِلا الدُّعَاءُ وَلا يَزِيدُ فِي الْعُمْــرِ إِلا الْبِــرُّ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِخَطِيئَةٍ يَعْمَلُهَا

بَارَكَ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ فِيْ الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ. وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ. أَقُــوْلُ قَــوْلِيْ هَــذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُــلِّ ذَنْــبٍ، فَاسْتَغْفِرُوْهُ وَتُوْبُوْا إِلَيْهِ، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.

যুলহাজ্জ মাসের ৪র্থ খুতবা: সুন্নাত, জামা'আত ও ফিরকা

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লী আলা রাসূলিহীল কারীম। আম্মা বাদ,

সম্মানিত উপস্থিতি, আজ যুলহাজ্জ মাসের ৪র্থ জুমুআ। আজ আমরা সুন্নাত, জামাআত ও ফিরকা সম্পর্কে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ। কিন্তু তার আগে আমরা এ সপ্তাহের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসগুলির বিষয়ে সংক্ষেপ আলোকপাত করি। হাযেরীন, আজ ইংরেজী ..... মাসের ..... তারিখ। এ সপ্তাহের দিবসগুলির মধ্যে রয়েছে ....।

হাযেরীন, মুমিনদেরকে দলাদলি বর্জন করতে এবং ঐক্যবদ্ধ থাকতে নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا

"তোমরা আল্লাহর রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধারণ কর সমবেতভাবে, এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।"[১]

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

"যারা তাদের দীনকে বিভক্ত করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে তাদের কোনো দায়িত্ব তোমার নয়; তাদের বিষয় আল্লাহর ইখতিয়ারভুক্ত। আল্লাহ তাদেরকে তাদের কর্ম সম্বন্ধে অবহিত করবেন।"[২]

হাযেরীন, দলাদলি ও ফিরকাবাজির ভয়াবহতা ও প্রকৃতি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ

"তোমাদের মধ্যে যারা আমার পরে বেঁচে থাকবে তারা অনেক মতবিরোধ দেখতে পাবে। এক্ষেত্রে তোমাদের উপর দায়িত্ব আমার সুন্নাত ও সুপথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত অনুসরণ করা। তোমরা দৃঢ়ভাবে তা আঁকড়ে ধরবে, কোনো প্রকারেই তার বাইরে যাবে না। আর তোমরা (আমার ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতের বাইরে) নতুন উদ্ভাবিত সকল বিষয় সর্বতোভাবে পরিহার করবে; কারণ সকল নতুন উদ্ভাবিত বিষয়ই বিদআত এবং সকল বিদআতই বিভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতা।"[৩]

دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الأُمَمِ قَبْلَكُمْ الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ هِيَ الْحَالِقَةُ لا أَقُولُ تَحْلِقُ الشَّعَرَ وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّينَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا ...

"পূর্ববর্তী উম্মাতগণের ব্যাধি তোমাদের মধ্যে ধীরে ধীরে প্রবেশ করছে, সে ব্যাধি হলো হিংসা ও বিদ্বেষ। বিদ্বেষ মুণ্ডনকারী। আমি বলি না যে, তা মাথার চুল মুণ্ডন করে, বরং তা দীন মুণ্ডন করে।"[৪]

مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لا يُؤْمَرُونَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ

---

[১] সূরা (৩) আল-ইমরান: ১০৩ আয়াত।

[২] সূরা (৬) আন'আম: ১৫৯ আয়াত।

[৩] তিরমিযী, আস-সুনান ৫/৪৪; আবূ দাউদ, আস-সুনান ৪/২০০; ইবনু মাজাহ ১/১৫। তিরমিযী বলেন: হাদীসটি সহীহ হাসান।

[৪] তিরমিযী, আস-সুনান ৪/৬৬৪; আলবানী, সহীহুত তারগীব ৩/১৭, ৬১। হাদীসটি হাসান।

"আমার পূর্বে যে উম্মাতের মধ্যেই আল্লাহ কোনো নবী প্রেরণ করেছেন সে নবীরই উম্মাতের মধ্যে তাঁর ঘনিষ্ঠ শিষ্য ও সাহাবী ছিলেন, তাঁরা তাঁর সুন্নাত আঁকড়ে ধরতেন এবং তাঁর নির্দেশ অনুসরণ করতেন। অতঃপর তাদের পরে এমন একদল উত্তরসূরির আবির্ভাব ঘটে যারা যা বলে তা করে না এবং যা তাদের করতে নির্দেশ দেওয়া হয় নি তা তারা করে। কাজেই যে ব্যক্তি এদের সাথে হাত দিয়ে জিহাদ করবে সে মুমিন, যে ব্যক্তি তাদের সাথে মুখ দিয়ে জিহাদ করবে সেও মুমিন এবং যে ব্যক্তি এদের সাথে অন্তর দিয়ে জিহাদ করবে সেও মুমিন। এর পরে আর শরিষা পরিমাণ ঈমানও অবশিষ্ট থাকে না।"[১]

إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلا مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوا وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ (الْيَوْمَ) وَأَصْحَابِي

"ইসরায়েল সন্তানগণ ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিল। আর আমার উম্মাত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। এদের মধ্যে সকলেই জাহান্নামী, একটিমাত্র দল বাদে। সাহাবীগণ প্রশ্ন করেন: হে আল্লাহর রাসূল, এ মুক্তিপ্রাপ্ত দলটি কারা? তিনি বলেন: 'আমি এবং আমার সাহাবীগণ এখন যার উপর আছি।"[২]

إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابَيْنِ افْتَرَقُوا فِي دِينِهِمْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَإِنَّ هَذِهِ الأُمَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً يَعْنِي الأَهْوَاءَ كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلا وَاحِدَةً وَهِيَ الْجَمَاعَةُ وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ تَجَارَى بِهِمْ تِلْكَ الأَهْوَاءُ كَمَا يَتَجَارَى الْكَلْبُ بِصَاحِبِهِ لا يَبْقَى مِنْهُ عِرْقٌ وَلا مَفْصِلٌ إِلا دَخَلَهُ

"তোমাদের পূর্ববর্তী কিতাবীগণ ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিল। আর এ উম্মাত ৭৩ দলে বিভক্ত হয়ে যাবে, তারা মনগড়া মতের অনুসরণ করবে। এরা সকলেই জাহান্নমী, কেবলমাত্র একটি দল বাদে, যারা 'আল-জামা'আত' বা ঐক্যপন্থী। আর আমার উম্মাতের মধ্যে এমন কিছু দল বের হবে যাদের মধ্যে মনগড়া মত বা পছন্দের অনুসরণ এমনভাবে প্রবেশ করবে যেমনভাবে জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির মধ্যে তার রোগ প্রবেশ করে। তার দেহের সকল শিরা, উপশিরা ও অস্তিসন্ধিতে তা প্রবেশ করে।"[৩]

হাযেরীন, এ হাদীসগুলিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ নাজাতের পথ, বিভ্রান্তির কারণ, নাজাতপ্রাপ্ত ও বিভ্রান্তদের চিহ্ন জানিয়ে দিয়েছেন। নাজাতপ্রাপ্তদের চিহ্ন ও নাজাতের পথ মূলত একটিই। আর তা হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ, খুলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবীগণের সুন্নাত অনুসরণ করা এবং জামাআত বা ঐক্য বজায় রাখা। আর বিভ্রান্তদের চিহ্ন এবং বিভ্রান্তির পথ ও বিভ্রান্তদের চিহ্ন হলো নব-উদ্ভাবন বা বিদ'আত অনুসরণ করা, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের ব্যতিক্রম চলা, তিনি যা করতে নির্দেশ দেন নি তা করা এবং মুখে যা বলা কাজে তা না করা। আর এর মূল কারণ হলো প্রবৃত্তির বা মনমর্জির অনুসরণ করা এবং হিংসা-বিদ্বেষ।

হাযেরীন, আহ্‌ল অর্থ পরিজন, জনগণ বা অনুসারী। 'সুন্নাত' অর্থ মুখ, প্রতিচ্ছবি, প্রকৃতি, জীবনপদ্ধতি, কর্মধারা বা রীতি। আর ইসলামের পরিভাষায় 'সুন্নাত' অর্থ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা, কর্ম, অনুমোদন বা এক কথায় তাঁর সামগ্রিক জীবনাদর্শ। সফর মাসের প্রথম খুতবায় আমরা সুন্নাত ও ইত্তিবায়ে সুন্নাত বা সুন্নাতের অনুসরণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি যে, ইত্তিবায়ে সুন্নাত অর্থ কর্মে ও বর্জনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হুবহু অনুসরণ। যে বিষয়ে তিনি কোনে আপত্তি বা নিষেধ করেন নি, শুধু বর্জন করেছেন সে বিষয়েও অনুকরণ বলতে বর্জন করাই বুঝায়। তিনি যা করেন নি এবং নিষেধও করেন নি তা করা অবৈধ নাও হতে পারে, তবে তা করলে আর তাঁর অনুকরণ করা হয় না। তিনি যা বলেছেন বা

---

[১] মুসলিম, আস-সহীহ ১/৬৯।

[২] তিরমিযী, আস-সুনান ৫/২৬; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ১/২১৮। তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান গরীব বলেছেন।

[৩] আবূ দাউদ ৪/১৯৮; আহমদ, আল-মুসনাদ ৪/১০২; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ১/২১৮। হাকিম ও যাহাবী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

করেছেন তা বলার বা করার পরে যদি তিনি যা বলেন নি বা করেন নি তাও করা হয় তাহলে আর ইত্তিবায়ে সুন্নাত হয় না, বরং সুন্নাতের ব্যতিক্রম বা খেলাফ হয়ে যায়। সুন্নাতের ব্যতিক্রম বিষয়টি যদি নিষিদ্ধ না হয় তবে প্রয়োজনে বা আবেগে সাময়িকভাবে করা যেতে পারে। তবে তা রীতিতে পরিণত করা বা তাকে তাকওয়া বা উত্তম মনে করা বা দীনের অংশ বানানো হলে সুন্নাতের অবজ্ঞা করা হয়। কারণ তখন সুন্নাতের ব্যতিক্রম কথাটি না বললে বা কর্মটি না করলে দীন পালন বা তাকওয়া অর্জন কিছুটা হলেও কম হলো বলে মনে হয়। আর এর পরিণতি হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের দীন কিছুটা কম ছিল বলে মনে হওয়া। এজন্যই যে সকল সাহাবী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাতের অতিরিক্ত তাহাজ্জুদ; নফল সিয়াম বা কৃচ্ছতা করতে চেয়েছিলেন তাদেরকে তিনি আপত্তি করেন এবং সুন্নাতের অবজ্ঞা বলে আখ্যায়িত করেন।

হাযেরীন, বিদআত অর্থ নব-উদ্ভাবন বা নব-উদ্ভাবিত বিষয়। যে মত, কথা বা কর্ম রাসূলুল্লাহ ﷺ বা তাঁর সাহাবীগণ বলেন নি বা করেন নি তা উদ্ভাবন করা ও দীনের মধ্যে সংযোজন করা হলো বিদআত। বিদআত কর্মের মধ্যে হতে পারে আবার বিশ্বাস বা আকীদার ক্ষেত্রেও হতে পারে। ফিরকা বা দলাদলি বিষয়ক বিদ'আতগুলি মূলত বিশ্বাস বা আকীদার বিদআত।

হাযেরীন, সুন্নাত ও বিদআতের পরে আমাদের জামাআত ও ফিরকার পরিচয় জানতে হবে। জামাআত অর্থ ঐক্য, ঐক্যবদ্ধ সমাজ বা জনগোষ্ঠী। ইজতিমা অর্থ ঐক্যবদ্ধ হওয়া বা দলাদলিমুক্ত হওয়া। ইফতিরাক অর্থ দলাদলি বা বিচ্ছিন্নতা। ফিরকা অর্থ দল বা গ্রুপ। এ অর্থে আরবীতে হিযব, কাউম, জামইয়্যাহ (حزب، قوم، جمعية) ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হয়। আর জামা'আত অর্থ দলবিহীন সম্মিলিত জনগোষ্ঠী বা সমাজ। যে কোনো স্থানে অবস্থানরত সকল মানুষকে 'জামা'আত' বলা হয়। জামা'আতের মধ্য থেকে কিছু মানুষ পৃথক হলে তাকে ফিরকা বা দল বলা হয়।

মনে করুন একটি মসজিদের মধ্যে ১০০ জন মুসল্লী বসে আছেন। এরা মসজিদের জামা'আত। এদের মধ্যে কম বা বেশি সংখ্যক মুসল্লী যদি পৃথকভাবে একত্রিত হয়ে মসজিদের এক দিকে বসেন তবে তারা একটি ফিরকা, কাওম বা হিযব, অর্থাৎ দল, গ্রুপ বা সম্প্রদায় বলে গণ্য, কিন্তু তারা জামা'আত বলে গণ্য নয়। যেমন, উপর্যুক্ত ১০০ জনের মধ্য থেকে ৫ জন এক কোনে পৃথক হয়ে বসলেন, আর দশ জন অন্য কোণে পৃথক হয়ে বসলেন এবং অন্য কোণে আরো কয়েকজন একত্রিত হলেন। এখন আমরা ইফতিরাক ও জামা'আতের রূপ চিন্তা করি। মূলত মসজিদের জামা'আত ভেঙ্গে ইফতিরাক এসেছে। তিনটি ফিরকা মূল জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। আর বাকি যারা কোনো 'দল' বা ফিরকা গঠন না করে দলবিহীনভাবে রয়ে গিয়েছেন তারা নিজেদেরকে 'জামা'আত' বলতে পারেন।

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অবস্থা এরূপই। এটি মূলত কোনো দল বা ফিরকা নয়। সাহাবী-তাবিয়ীগণের অনুসরণে যারা মূল ধারার উপর অবস্থান করছেন এবং কোনো দল বা ফিরকা তৈরি করেন নি তারাই 'আল-জামা'আত'।

হাযেরীন, জামাআত বা ইজতিমার বিপরীত হলো ইফতিরাক, অর্থাৎ দলাদলি বা বিচ্ছিন্নতা। ইফতিরাক বা দলাদলি মূলত বিশ্বাসের বিষয়, ইখতিলাফ বা মতভেদ থেকে যার উৎপত্তি। ইখতিলাফ বা মতভেদ ইসলামে নিষিদ্ধ নয়, তবে ইফতিরাক বা দলাদলি ও বিচ্ছিন্নতা নিষিদ্ধ। মতভেদের ক্ষেত্রে যখন মতভেদকারী নিজের মতকেই একমাত্র সঠিক মত বলে বিশ্বাস করে এবং ভিন্নমতের মুসলিমকে ভিন্ন দল বা ভিন্ন ধর্মের মত মনে করে বা বিশ্বাস করে তখন তা "ইফতিরাক" বা বিচ্ছিন্নতায় পরিণত হয়।

সাহাবীগণের মধ্যেও মতভেদ বা ইখতিলাফ ছিল, কিন্তু কখনোই ইফতিরাক বা বিচ্ছিন্নতা বা দলাদলি ছিল না। এমনকি রাষ্ট্র বিষয়ক মতভেদের কারণে যারা পরস্পরে যুদ্ধ করেছেন তারাও সর্বদা

একে রাষ্ট্রীয় ও ইজতিহাদী বিষয় বলেই গণ্য করেছেন। প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেও তাদেরকে পৃথক 'দল' বা ধর্মচ্যুত বলে গণ্য করেন নি। সিফফীনের যুদ্ধ চলাকালে আলী (রা)-এর পক্ষের এক ব্যক্তি মু'আবিয়া (রা)-এর পক্ষের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়িমূলক কথা বললে আলী (রা) বলেন, এরূপ বলো না, তারা মনে করেছে আমরা বিদ্রোহী এবং আমরা মনে করছি যে, তারা বিদ্রোহী। আর এর কারণেই আমরা যুদ্ধ করছি। আম্মার ইবনু ইয়াসার বলেন, সিরিয়া-বাহিনীকে কাফির বলো না, বরং আমাদের দীন এক, কিবলা এক, কথাও এক; তবে তারা আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, তাই আমরা লড়াই করছি।"[১]

এমনকি খারিজী বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা সত্ত্বেও আলী (রা) ও সাহাবীগণ তাদেরকে কাফির বলে গণ্য করেন নি। খারিজীগণ তাঁদেরকে কাফির বলেছে, নির্বিচারে মুসলিমদেরকে হত্যা করেছে, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ এদের সাথে যুদ্ধ করতে ও এদেরকে হত্যা করতে নির্দেশ দিয়েছেন, সাহাবীগণ তাদের বিরুদ্ধে অনেক যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন, কিন্তু কখনো আলী (রা) বা অন্য কোনো সাহাবী তাদেরকে কাফির বলে ফাতওয়া দেন নি। বরং তাঁরা এদের সাথে মুসলিম হিসেবেই মিশেছেন, কথাবার্তা বলেছেন, আলোচনা করেছেন এমনকি এদের ইমামতিতে সালাত আদায় করেছেন। যুদ্ধের ময়দানে বা বিচারের কাঠগড়ায় ছাড়া কখনোই এদেরকে হত্যা করার অনুমতি দেন নি।[২]

হাযেরীন, আমরা বুঝতে পারছি যে, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত অর্থ সুন্নাত ও ঐক্যের অনুসারী। তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের হুবহু অনুসরণ করেন এবং ঐক্যের উপর থাকেন। তাদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও দলাদলি থাকে না। মতভেদের কারণে কেউ কাউকে অন্য দল বলে মনে করেন না। আর আহলুল বিদআত ওয়াল ইফতিরাক অর্থ বিদআত ও দলাদলির অনুসারী। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের হুবহু অনুসরণ করে না। আর মতভেদের কারণে ভিন্নমতের মানুষদেরকে ভিন্নদল বলে মনে করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাতের পর ৪০ বৎসর পার না হতেই আলী (রা)-এর খিলাফতের সময় থেকে উম্মাতের মধ্যে বিদআত ও বিভক্তির অনুসারীদের আবির্ভাব ঘটতে থাকে। প্রথম আবির্ভাব ঘটে "খারিজী" দলের। এরপর প্রকাশ পায় "শীয়া" দল। ইসলামের এ প্রথম দুটি ফিরকাই ছিল রাজনৈতিক। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় কে যাবেন, কিভাবে যাবেন, কতক্ষণ থাকবেন এবং কিভাবে তার অপসারণ হবে ইত্যাদি বিষয় ছিল তাদের ফিরকাবাজির মূল। এরপর কাদারীয়া, জাবারিয়া, মুতাযিলা, জাহমিয়্যা, মুরজিয়া, মুশাব্বিহা ইত্যাদি দল প্রকাশ পায়। শাইখ আব্দুল কাদির জীলানী (রাহ) (৫৬১ হি) উল্লেখ করেছেন যে, ৭৩ ফিরকা মূলত ১০ ফিরকার অন্তর্ভুক্ত। এ দশ দল হল আহলু সুন্নাত, খারিজী, শিয়া, মু'তাজিলা, মুরজিয়া, মোশাব্বিয়া, জাহ্‌মিয়া, জাবারিয়া, নাজারিয়া এবং কালাবিয়া। অন্যান্য ফিরকা এ দশ ফিরকার মধ্যে শামিল।[৩]

হাযেরীন, এ সকল বিভ্রান্ত ফিরকার আকীদাগুলি বিস্তারিত আলোচনা করা একটি খুতবার পরিসরে সম্ভব নয়। সকল ফিরকাবাজির উৎস একটিই: সুন্নাত ও সাহাবীগণকে গ্রহণ করা বা না করা। বিভ্রান্ত ফিরকাগুলি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত ও সাহাবীগণকে পরিপূর্ণ আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে রাজি হন নি। তারা আকীদা বিশ্বাসের জন্য সম্পূরক উৎস গ্রহণ করেছে, যেগুলিই তাদের মূল ভিত্তিতে পরিণত হয়েছে।

শীয়াদের আকীদার মূল উৎস ইমামগণ ও তাদের খলীফাগণের বক্তব্য ও ব্যাখ্যা। তারা বিশ্বাস করে যে, আলী (রা) ও তাঁর বংশের ইমামগণ নিষ্পাপ। তাঁরা সকল ইলম গাইবের মালিক। বিশ্ব

---

[১] মুহাম্মাদ ইবনু নাসর আল-মারওয়াযী, তা'যীমু কাদরিস সালাত ২/৫৪৪-৫৪৬।

[২] তিরমিযী, আস-সুনান ৪/১২৫; আবূ দাউদ, আস-সুনান ৩/৭৪, ১৪৬; ইবনু হিব্বান, আস-সহীহ ১১/১৫৫; ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ৮/৩১০, ৫৫৭, ৬৮৬; ইবনু তাইমিয়া, মাজমূউল ফাতাওয়া ৭/২১৭-২১৮; ড. নাসির আল-আকল, আল-খাওয়ারিজ, পৃ. ৪৭-৫৬।

[৩] শাইখ আব্দল কাদির জীলানী, গুনিয়াতুত তালেবীন, পৃ. ২১০।

পরিচালনা ও কল্যাণ অকল্যাণের অলৌকিক ক্ষমতাও আল্লাহ তাদেরকে অর্পন করেছেন। কাজেই কুরআন সম্পর্কে আল্লাহর পক্ষ থেকে ইলম লাদুন্নী ও ইলম গাইব প্রাপ্ত ইমামগণ বা তাদের খলীফাগণ যে ব্যাখ্যা দিবেন তাই মানতে হবে। হাদীস ও সাহাবীগণকে তারা পরিপূর্ণ অস্বীকার করেছে। কুরআনকে ব্যাখ্যার নামে অস্বীকার করেছে। খারিজীগণ কুরআন ও হাদীস মেনেছে। কিন্তু সুন্নাত ও সাহাবীগণকে মানে নি। তারা কুরআন বা হাদীসের যে অর্থ বা ব্যাখ্যা নিজেরা বুঝতো তাকেই চূড়ান্ত বলে মনে করত। মুতাযিলী, জাহমী ও অন্যান্য সম্প্রদায় দর্শন, যুক্তি ও মানবীয় আকল-বুদ্ধিকেই আকীদা-বিশ্বাসের মূল ভিত্তি বলে গ্রহণ করত। কুরআন ও হাদীসের কথা যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করে সে ব্যাখ্যাকে আকীদা বানাতো।

পক্ষান্তরে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মূলনীতি হলো দীনের সবকিছুর ন্যায় আকীদা-বিশ্বাসের একমাত্র উৎস সুন্নাতে রাসূল ﷺ। তিনি কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমে আমাদের যা বলেছেন বা শিখিয়েছেন হুবহু তাই বলতে ও বিশ্বাস করতে হবে। আর কুরআন ও হাদীস বুঝা ও মানার ক্ষেত্রে সাহাবীগণ সর্বোত্তম আদর্শ। তাঁদের মত ও কথার বাইরে নতুন কিছুই দীনের মধ্যে সংযোজন করা যাবে না। বিশেষত আকীদা বা বিশ্বাসের সম্পর্ক গায়েবী জগতের সাথে। মানবীয় চেষ্টায় এ বিষয়ে কিছু জানা যায় না এবং জানার দরকারও নেই। এজন্য কুরআন, হাদীস বা সাহাবীগণের ঐকমত্য থেকে যা জানা যায় তা হুবহু মানতে হবে। তাঁরা যা বলেন নি তা কখনোই আকীদার অংশ বানানো যাবে না।

বাতিল ফিরকাগুলি কুরআন ও হাদীসের মধ্যে বৈপরীত্য কল্পনা করে। তারা কুরআনের বা হাদীসের একটি বিষয় মূল হিসেবে গ্রহণ করে এবং এর বিপরীতে সকল আয়াত ও হাদীস ব্যাখ্যা করে বাতিল করে দেয়। যেমন কুরআনে ও হাদীসে তাকদীরের কথাও বলা হয়েছে, মানুষের কর্ম ও কর্মফলের কথাও বলা হয়েছে। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত উভয় দিক সমানভাবে বিশ্বাস করেন। আর কাদারিয়া ও জাবারিয়াগণ একটি বিষয়কে মূল ধরে অন্য বিষয়টি ব্যাখা করে বাতিল করেছে।

হাযেরীন, অতীতের ফিরকাবাজি থেকে আত্মরক্ষা করলেও আমরা অনেকেই বর্তমান ফিরকাবাজি থেকে আত্মরক্ষা করতে পারছি না। আজ আমরা সামান্য মতভেদগুলিকে ভিত্তি করে ভিন্নমতের মুসলিমদেরকে ভিন্নদল বলে বিশ্বাস করে ফিরকাবাজির মত কঠিন হারাম ও নিষিদ্ধ কর্মে লিপ্ত হচ্ছি। এ পাপ থেকে বাঁচতে হলে আমাদের সুন্নাত, সাহাবী ও জামাআত আঁকড়ে ধরতে হবে।

হাযেরীন, জীবনের সকল বিষয়ের ন্যায় বিশ্বাস বা আকীদার বিষয়েও সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরুন এবং হুবহু অনুসরণ করুন। কুরআন ও হাদীসে যা বলা হয়েছে হুবহু আক্ষরিকভাবে বিশ্বাস করুন। যা বলা হয় নি তা কোনোভাবে দীনের বা আকীদার মধ্যে ঢুকাবেন না। সাহাবীগণকে আদর্শ মানুন। কুরআন বা হাদীসে কোনো বিষয়ে বৈপরীত্য মনে হলে সাহাবীগণের মত জানার চেষ্টা করুন এবং তাদের মত আঁকড়ে ধরুন। যদি তাদের কোনো মত না পান তবে বুঝে নিন যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ নয়। এরূপ বিষয় দীনের অংশ হতে পারে না। এরূপ বিষয় নিয়ে দলাদলি ও বিচ্ছিন্নতা বিষবৎ পরিত্যাগ করুন।

হাযেরীন, সুন্নাত ও সাহাবীগণের মত ও কর্মের বাইরে কোনো কিছুকেই দীনের অংশ বানাবেন না। তাঁরা যা বলেন নি তা না বললে অথবা তাঁরা যা করেন নি তা না করলে দীনে ঘাটতি থাকবে এরূপ চিন্তা কোনোভাবেই করবেন না। ইলম, দাওয়াত, দীন প্রতিষ্ঠা, জিহাদ, তাযকিয়ায়ে নাফস ইত্যাদি ইবাদতের ক্ষেত্রে আধুনিক যুগে আমরা প্রয়োজনে অনেক নতুন পদ্ধতি বা সিলেবাস অনুসরণ করি। ওয়ায, মিছিল, গ্রন্থ রচনা, গণমাধ্যম, মসজিদ ভিত্তিক প্রচার ইত্যাদির মাধ্যমে আমরা সকলেই একটি ইবাদত পালন করছি যার নাম "দাওয়াত" বা "দীন প্রতিষ্ঠা"। অনুরূপভাবে মাসনূন যিক্‌র ও ইবাদত পালন বা বিভিন্ন তরীকতের আমল দিয়ে তাযকিয়ার চেষ্টা করছি। আলিয়া, কওমী, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি ভিন্নভিন্ন

পদ্ধতিতে ইলম শিক্ষা করছি। কোনো ক্ষেত্রেই পদ্ধতি ইবাদত নয় বা ইবাদতের অংশ নয়, কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ বা সাহাবীগণ হুবহু এ পদ্ধতিতে এ সকল ইবাদত পালন করেন নি। পদ্ধতি দীন পালনের উপকরণ মাত্র। এগুলিকে দীনের অংশ মনে করলেই বিদ'আত হবে এবং বিচ্ছিন্নতা দেখা দেবে। আর বাস্তবে হচ্ছেও তাই। দাওয়াত, দীন প্রতিষ্ঠা, তাযকিয়া বা ইলম হলো ইবাদত। সাওয়াবের কমবেশি হবে ইবাদতের কমবেশির উপরে, পদ্ধতির উপরে নয়। আমরা বড়জোর বলতে পারি আমাদের পদ্ধতি ইবাদতটি পালনের বেশি উপযোগী বা ফলাফল বেশি। কিন্তু আমরা পদ্ধতিকে ইবাদত মনে করছি এবং অন্য পদ্ধতির অনুসরণকারীর সমালোচনা করছি বা তার ইবাদত হচ্ছে না বলেই মনে করছি।

হাযেরীন, আহলুস সুন্নাতের আকীদা জানতে চার ইমামের লেখা বইপত্র পড়ুন। বিশেষত ইমাম আবূ হানীফার লেখা 'আল-ফিকহুল আকবার" এবং ইমাম তাহাবীর (মৃত্যু ৩২১ হি) "আকীদাতু আহলিস সুন্নাহ" বই পড়ুন। এ সকল বইয়ে যা নেই তাকে আহলুস সুন্নাতের আকীদার মধ্যে ঢুকাবেন না।

হাযেরীন, "জামাআত" বা ঐক্যের উপর থাকুন। আপনি যাকে সুন্নাত সম্মত মনে করছেন তা করুন এবং তার পক্ষে বলুন। কিন্তু ভিন্নমতের অনুসারীকে ভিন্ন ধর্ম বা ভিন্ন দল বানাবেন না। আমরা সকল মুসলিম "ইসলাম" নামক একটি দলের অনুসারী। এরূপ বিশ্বাসের নামই হলো 'জামাআত' বা ঐক্য। আমদেরর মতভেদ আছে, দলভেদ নেই। এমনকি যারা আপনাকে ভিন্নমতের কারণে ভিন্ন দল মনে করছে তাদেরকেও নিজদল মনে করুন। এই হলো সাহাবীগণের তরীকা।

হাযেরীন দীন পালনের জন্য আমরা অনেক সময় "দল" গঠন করি। এ হলো দীন শিক্ষার জন্য মাদ্রাসা তৈরির মত। এর প্রয়োজন আছে। কিন্তু প্রত্যেক মাদ্রাসার ছাত্র কি নিজেদেরকে পৃথক দল মনে করবে? সকল তালিবে ইলমই সমান। ইলমের গভীরতায় মর্যাদা বাড়বে, মাদ্রাসার নামে নয়। এ ভাবেই সকল দলের সকল মুসলিমকে এক উম্মাত, একদল ও এক জামাতের বলে বিশ্বাস করুন। আল্লাহ্ কার কর্ম অধিক কবুল করছেন কেউ জানি না। কারো পদ্ধতির মধ্যে সুস্পষ্ট শরীয়ত বিরোধী বিষয় থাকলে তা অবশ্যই নিন্দনীয়। তবে নিন্দিত মুসলিমও আমার ভাই এবং একই দলের ও দীনের অনুসারী।

হাযেরীন, আপনি যাকে শির্ক, কুফ্র, বিদ্'আত বা অন্যায় মনে করছেন তার প্রতি তো ঘৃণা ও আপত্তি থাকবেই। তবে এগুলিতে লিপ্ত ঈমানের দাবিদারদের কুফরী নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত মুমিন বলে গ্রহণ করুন। ভিন্নমতের মানুষের কথা বা কর্মের বিচার করুন, মনের বা উদ্দেশ্যের বিচার করবেন না। ভিন্নমতাবলম্বীর কথা বা কর্মটি বাহ্যিকভাবে কতটুকু অন্যায় এবং তার বাহ্যিক ভালকাজগুলি কতটুকু ভাল তা সুন্নাত ও সাহাবীগণের মতামতের আলোকে যাচাই করুন। একজন মুমিনের সবচেয়ে বড় আমল হলো ঈমান। কাজেই সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন কুফরী না পাওয়া পর্যন্ত তার ঈমানের পাশে তার সকল অন্যায় ও বিদ'আত ম্লান হয়ে যায়। তাকে মুমিন ভাই হিসেবে ভালভাসা ও একদলের বলে মনে করা আমাদের উপর ফরয হয়ে যায়। আপনি যদি মুস্তাহাব বা মাকরূহ বিষয় বা মতভেদীয় বিষয় যা কেউ জায়েয ও কেউ না-জায়েয বলেছেন তার কারণে ঈমান, সালাত, সিয়াম ও অন্যান্য ইবাদতকে বাতিল করে দিয়ে ভিন্নমতের মুসলিমকে ভিন্নদলের বলে ভিন্নধর্মের মত বিদ্বেষ করেন তাহলে কি আপনি দীনমুণ্ডনকারী ব্যধি থেকে বাঁচতে পারলেন? উম্মাতের মধ্যকার বিভ্রান্তদের জন্য আমাদের দায়িত্ব দু'আ ও নসীহত; হিংসা ও গালি নয়। হিংসার ওজুহাত না খুঁজে ভালবাসার ওজুহাত খুঁজুন, যার মধ্যে যতটুকু ঈমান, ইসলাম ও সুন্নাত আছে ততটুকুকেই ভালবাসার ওজুহাত বানিয়ে তাঁকে ভালবাসুন এবং তার হেদায়াতের জন্য দু'আ করুন। মহান আল্লাহ আমাদেরকে আকীদা ও কর্মে পরিপূর্ণভাবে সুন্নাতে রাসূল ও সুন্নাতে সাহাবার হুবহু অনুসারী বানিয়ে দিন এবং জামাআত বা ঐক্যের উপর থাকার তাওফীক দিন। আমীন।

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

أَمَّا بَعْدُ، فَيَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى:
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا

وَقَالَ: إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

بَارَكَ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ فِيْ الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ. وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ. أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ، فَاسْتَغْفِرُوْهُ وَتُوْبُوْا إِلَيْهِ، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.

৫ম খুতবা-১: কবীরা গোনাহ ও দীনদারদের প্রিয় গোনাহ

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লী আলা রাসূলিহীল কারীম। আম্মা বাদ,

সম্মানিত উপস্থিতি, আজ .... মাসের ৫ম জুমুআ। আজ আমরা ঈদুল আযহা ও কুরবানীর বিষয়ে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ। কিন্তু তার আগে আমরা এ সপ্তাহের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসগুলির বিষয়ে সংক্ষেপ আলোকপাত করি। হাযেরীন, আজ ইংরেজী ..... মাসের ..... তারিখ। এ সপ্তাহের দিবসগুলির মধ্যে রয়েছে ....।

হাযেরীন, মুমিনের জীবনের সর্বোচ্চ দায়িত্ব হলো বিশুদ্ধ তাওহীদ ও রিসালাতের ঈমান অর্জন। এরপর হালাল ও বৈধ উপার্জন তার প্রথম ফরয। এরপর তার ফরয দায়িত্ব হলো যাবতীয় হারাম ও কবীরা গোনাহ থেকে আত্মরক্ষা করা এবং যাবতীয় ফরয দায়িত্ব পালন করা। কবীরা গোনাহ থেকে আত্মরক্ষা করার বিষয়ে আমাদের সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে। কুরআন ও হাদীসে বারংবার বলা হয়েছে যে, আমরা যদি কবীরা বা ভয়ঙ্কর ও বড় গোনাহগুলি থেকে আত্মরক্ষা করতে পারি তাহলে সাধারণ ছোটখাট গোনাহগুলি আল্লাহ অন্যান্য ফরয ও নফল ইবাদতের ওসীলায় ক্ষমা করে দেবেন।

হাযেরীন, কুরআন ও হাদীসে যে সকল ভয়ঙ্কর গুনাহের শাস্তির কথা বলা হয়েছে সেগুলি দু প্রকারের। প্রথম প্রকার হক্কুল্লাহ বা বান্দার ব্যক্তিগত কবীরা গোনাহ। দ্বিতীয় প্রকার হক্কুল ইবাদ বা অন্য মানুষের বা প্রাণীর অধিকার সংশ্লিষ্ট কবীরা গোনাহ। প্রথম প্রকার কবীরা গোনাহের মধ্যে ঈমান বিষয়ক কিছু গোনাহ যেমন, শিরক, কুফর, নিফাক, বিদ'আত, আল্লাহর শাস্তি থেকে নিরাপত্তা বোধ করা, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া, তকদীরে অবিশ্বাস করা, গনক বা জ্যোতিষীর কথা সত্য মনে করা, অশুভ, অমঙ্গল বা অযাত্রায় বিশ্বাস করা, মক্কার হারামে যে কোনো প্রকার অন্যায় করার ইচ্ছা, যাদু শিক্ষা বা ব্যবহার, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য জবাই করা, নিজের জীবন, সম্পদ, ও সকল মানুষের চেয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বেশি ভালবাসায় ত্রুটি থাকা, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে মিথ্যা হাদীস বলা, নিজের পছন্দ-অপছন্দ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত ও শরীয়তের অনুগত না হওয়া, বিদ'আতে লিপ্ত হওয়া, আত্মহত্যা করা।

ফরয ইবাদত পরিত্যাগ বিষয়ক কিছু গোনাহ, যেমন, সালাত পরিত্যাগ, যাকাত প্রদান থেকে বিরত থাকা, ওজর ছাড়া রমযানের সিয়াম পালনে অবহেলা, জুম'আর সালাত পরিত্যাগ করা, সুযোগ থাকা সত্ত্বেও হজ্জ আদায় না করা, ধর্ম পালনে অতিশয়তা বা সুন্নাতের অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি ইবাদত করা, সালাতরত ব্যক্তি সামনে দিয়ে গমন করা। খাদ্য পানীয় বিষয়ক কিছু গোনাহ, যেমন, মদপান, মৃত প্রাণী, প্রবাহিত রক্ত ও শূকরের গোশত ভক্ষণ করা, স্বর্ণ বা রৌপ্যের পাত্রে পান করা।

পবিত্রতা ও অন্যান্য অভ্যাস বিষয়ক কিছু গোনাহ, যেমনঃ পেশাব থেকে পবিত্র না হওয়া, মিথ্যা বলার অভ্যাস, প্রাণীর ছবি তোলা বা আঁকা, কৃত্রিম চুল লাগান, শরীরে খোদাই করে উল্কি লাগান। পুরুষের জন্য মেয়েলী পোশাক বা চাল চলন, টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে পোশাক পরা, সোনা ও রেশমের ব্যবহার, গোফ বেশি বড় করা, দাড়ি না রাখা। মেয়েদের জন্য পুরষালী পোশাক বা আচরণ, সৌন্দর্য প্রকাশক পোশাক পরিধান করে, মাথা, মাথার চুল বা শরীরের কোনো অংশ অনাবৃত রেখে বা সুগন্ধি মেখে বাইরে যাওয়া।

অন্তরের বা মনের কিছু গোনাহ, যেমন, অহংকার, গর্ব করা, নিজেকে বড় ভাবা, নিজের মতামত বা কর্মের প্রতি পরিতৃপ্ত থাকা, রিয়া, হিংসা, কোনো মুসলিমকে হেয় বা ছোট ভাবা, ক্রোধ, প্রশংসা ও সম্মানের লোভ, সম্পদের লোভ, কৃপণতা, নিষ্ঠুরতা, দ্বীনী ইল্‌ম পার্থিব উদ্দেশ্যে শিক্ষা করা, ইল্‌ম গোপন করা।

দ্বিতীয় প্রকারের গোনাহ বা অন্য মানুষের হক্ক সংশ্লিষ্ট গোনাহের মধ্যে রয়েছেঃ ইসলাম নির্ধারিত

শাস্তিযোগ্য অপরাধে অপরাধীর শাস্তি মওকুফের জন্য সুপারিশ বা চেষ্টা করা। আইনের মাধ্যমে বিচার ছাড়া কোনো মানুষকে খুন বা হত্যা করা। রাষ্ট্রপ্রধান, প্রশাসক বা বিচারক কর্তৃক জনগণের দায়িত্ব, সম্পদ বা আমানত আদায়ে অবহেলা বা ফাঁকি দেওয়া। নাগরিক কর্তৃক রাষ্ট্রপ্রধান, শাসক, প্রশাসক বা প্রধানকে ধোকা দেওয়া বা রাষ্ট্রের ক্ষতিকর কিছু করা। রাষ্ট্র বা সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বা সশস্ত্র বিদ্রোহ। অন্যায় দেখেও সাধ্যমতো প্রতিকার বা প্রতিবাদ না করা। রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের বাইরে থেকে মৃত্যুবরণ করা। রাষ্ট্র প্রশাসনের অন্যায় বা জুলুম সমর্থন বা সহযোগিতা করা। সমাজের মানুষদেরকে কবীরা গোনাহের কারণে কাফির বলা বা মনে করা। বিচারকের জন্য ন্যায় বিচারে একনিষ্ঠ না হওয়া বা বিচার্য বিষয়ের বাইরে কোনো কিছু দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিচার করা। আইন প্রয়োগকারীর জন্য আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব করা ও আপনজনদের জন্য হালকাভাবে শাস্তি প্রয়োগ করা।

হাযেরীন, এজাতীয় পাপের মধ্যে রয়েছে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান বা প্রয়োজনের সময় সত্য সাক্ষ্য প্রদান থেকে বিরত থাকা। রাষ্ট্রীয় সম্পদ অবৈধভাবে ভক্ষণ, দখল বা ভোগ করা, তা যত সামান্যই হোক। মুনাফিককে নেতা বলা। জিহাদের মাঠ থেকে পালিয়ে আসা। মুসলিমগণকে কষ্ট প্রদান ও গালি দেওয়া। জুলুম, যবরদস্তি, মিথ্যা মামলা বা অবৈধভাবে কোনো মানুষ থেকে কিছু গ্রহণ করা। হাটবাজার, রাস্তাঘাটে টোল আদায় করা বা চাঁদাবাজী করা। মুসলিম সমাজে বসবাসরত অমুসলিম নাগরিককে কষ্ট প্রদান বা তার অধিকার নষ্ট। কোনো মহিলা বা এতিমের সম্পদ ভক্ষণ করা। আল্লাহর প্রিয় ধার্মিক বান্দাগণকে কষ্ট প্রদান বা তাদের সাথে শত্রুতা করা। প্রতিবেশীর কষ্ট প্রদান।

এরূপ কবীরা গোনাহে মধ্যে রয়েছে, কোনো মাজলিসে এসে খালি জায়গা দেখে না বসে ঠেলাঠেলি করে অন্যদের কষ্ট দিয়ে মাজলিসের মাঝে এসে বসে পড়া বা এমনভাবে মাঝে বসা যাতে অন্য মানুষদের অসুবিধা হয়। কারো স্ত্রী বা চাকর বাকর ফুসলিয়ে সরিয়ে দেওয়া। কর্কশ ব্যবহার ও অশ্লীল- অশ্রাব্য কথা বলা। অভিশাপ বা গালি দানে অভ্যস্ত হওয়া। কোনো মুসলিমের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে কিছু অর্থলাভ করা। তিন দিনের অধিক কোনো মুসলিমের সাথে কথাবার্তা বন্ধ রাখা। মুসলিমগণের একে অপরকে ভালো না বাসা, বা তাদের মধ্যে ভালবাসার অভাব থাকা। মুসলিমদের গোপন দোষ খোঁজা, জানা ও বলে দেওয়া। নিজের জন্য যা পছন্দ করে অন্যের জন্য তা পছন্দ না করা। কোনো ব্যক্তিকে তার বংশের বিষয়ে অপবাদ দেওয়া। পিতামাতার অবাধ্য হওয়া বা তাঁদের কষ্ট প্রদান করা। সুদ গ্রহণ করা, প্রদান করা, সুদ লেখা বা সুদের সাক্ষী হওয়া। ঘুষ গ্রহণ করা, প্রদান করা ও ঘুষ আদান প্রদানের মধ্যস্থতা করা। মিথ্যা শপথ করা। হীলা বিবাহ করা বা করানো।

হাযেরীন, হক্কুল ইবাদ বিষয়ক কবীরা গোনাহের মধ্যে আরো রয়েছে আমানতের খেয়ানত করা। কোনো মানুষের উপকার করে পরে খোটা দেওয়া। মানুষের গোপন কথা শোনা বা জানার চেষ্টা করা। স্ত্রীর জন্য স্বামীর অবাধ্য হওয়া। স্বামীর জন্য স্ত্রীর টাকা বা সম্পদ তার ইচ্ছার বাইরে ভোগ বা দখল করা। চোগলখুরী করা বা একজন মানুষের কাছে অন্য মানুষের নিন্দামন্দ ও শত্রুতামূলক কথা বলে উভয়ের মধ্যে সুসম্পর্ক নষ্ট করা। গীবত বা পরচর্চা করা। অর্থাৎ কারো অনুপস্থিতিতে তার মধ্যে বিরাজমান বাস্তব ও সত্য দোষগুলি উল্লেখ করা। অসত্য দোষারোপ করা। অর্থাৎ কারো মধ্যে যে দোষ বিরাজমান নেই অনুমানে বা লোকমুখে শুনে সেই তার সম্পর্কে সেই দোষের কথা উল্লেখ করা। জমির সীমানা পরিবর্তন করা। মহান সাহাবীগণকে গালি দেওয়া। আনসারগণকে গালি দেওয়া। পাপ বা বিভ্রান্তির দিকে বা খারাপ রীতির দিকে আহ্বান করা। কারো প্রতি অস্ত্র জাতীয় কিছু উঠান বা হুমকি প্রদান। নিজের পিতা ছাড়া অন্যকে পিতা বলা। জেদাজেদি ঝগড়া, বিতর্ক কলহ বা কোন্দল। ওজন,

মাপ বা দ্রব্যে কম দেওয়া বা ভেজাল দেওয়া। কোনো উপকারীর উপকার অস্বীকার করা বা অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি অন্যকে প্রদান থেকে বিরত থাকা। কোনো প্রাণীর মুখে আগুণে পুড়িয়ে বা কেঁটে দাগ বা মার্কা দেওয়া। জুয়া খেলা। অবৈধ ঝগড়া বা গোলযোগে সহযোগিতা করা। কথাবার্তায় সংযত না হওয়া। ওয়াদা ভঙ্গ করা। উত্তরাধিকারীকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা। স্বামী বা স্ত্রী কর্তৃক তাদের একান্ত গোপনীয় কথা অন্য কাউকে বলা। কারো বাড়ি বা ঘরের মধ্যে অনুমতি ছাড়া দৃষ্টি দেওয়া। কেউ আল্লাহর নামে শপথ করে সাহায্য বা ক্ষমা চাইলে আর তার প্রতি বিরক্ত থাকা অথবা তাকে ক্ষমা বা সাহায্য না করা। যা কিছু শোনা হয় বিচার বিশ্লেষণ ও সত্যাসত্য নির্ধারণ না করে তা বলা। বঞ্চিত ও দরিদ্রদেরকে খাদ্য প্রদানে ও সাহায্য দানে উৎসাহ না দেওয়া। ব্যভিচার, সমকামিতা বা যৌন অনাচার ও অশ্লীলতা। নিরপরাধ মানুষকে, বিশেষত মহিলাকে ৪ জন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীর স্পষ্ট সাক্ষ্য ছাড়া ব্যভিচার বা অনৈতিকতার অপবাদ দেওয়া। মুসলিম সমাজে অশ্লীলতা প্রসার করতে পারে এমন কোনো গল্পগুজব বা কথাবার্তা বলা বা প্রচার করা।[১]

হাযেরীন, উপরের সকল গোনাহই ভয়ঙ্কর এবং কুরআনে ও হাদীসে এগুলির কঠিন শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তবে সাধারণত দীনদার মানুষেরা এগুলির অধিকাংশ পাপ বর্জন করেন এবং এগুলির বিষয়ে সচেতন। তবে কিছু ভয়ঙ্কর পাপ আছে যা দীনদার মানুষেরাও পছন্দ করেন বা প্রায় তাতে লিপ্ত হয়ে পড়েন। এগুলির মধ্যে রয়েছে হিংসা, বিদ্বেষ, গীবত, নামীমাহ, উপহাস, অহঙ্কার, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশা, হতাশা ইত্যাদি। অধিকাংশ সময় দীনদার মুমিনও এ সকল পাপে লিপ্ত হতে মজা পান। বস্তুত দীনদার মানুষদেরকে শয়তান মদ, ব্যভিচার, ফরয তরক ইত্যাদি পাপে লিপ্ত করতে পারে না। এজন্য দীনদার মানুষদের জাহান্নামে নেওয়ার জন্য শয়তানের অন্যতম ফাঁদ হলো এ সকল পাপ। দীনদার মুমিন বেখেয়ালে এ সকল পাপে লিপ্ত হয়ে নিজের নেক আমল নষ্ট করে ফেলেন।

হাযেরীন, দীনদাররা যে সকল হারামে লিপ্ত হন তার অন্যতম উপহাস বিদ্রূপ। আল্লাহ বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

"হে মুমিনগণ, কোনো সম্প্রদায় যেন অপর সম্প্রদায়কে উপহাস-বিদ্রূপ না করে; হতে পারে তারা বিদ্রূপকারীদের চেয়ে উত্তম। কোনো নারী যেন অন্য নারীকে বিদ্রূপ-উপহাস না করে; হতে পারে সে বিদ্রূপকারিনী অপেক্ষা উত্তম। আর তোমরা একে অপরকে নিন্দা করো না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ উপাধি দিয়ে ডেকো না। ঈমানের পর পাপী নাম পাওয়া খুবই খারাপ বিষয়। আর যারা তাওবা করে না তারাই যালিম।"[২]

হাযেরীন, এ আয়াতে আল্লাহ মুমিন নারী, পুরুষ ব্যক্তি বা দলগতভাবে একে অপরকে উপহাস করতে, বিদ্রূপ করতে, নিন্দা করতে ও মন্দ উপাধি প্রদান করতে নিষেধ করলেন। পেশা, আকৃতি, বর্ণ, দেশ, জাতি, গোত্র, শিক্ষা, পোশাকপরিচ্ছদ বা অন্য যে কোনো কারণে কোনো মানুষকে অবজ্ঞা করা, হেয় করা, ছোট মনে করা, উপহাস করা, নিন্দা করা মন্দ উপাধি দেওয়া সবই হারাম। অথচ এরূপ হারামে আমরা অহরহ লিপ্ত হচ্ছি। ধর্মীয় মতভেদের কারণে এরূপ করাও একইরূপ নিষিদ্ধ। যদি কারো

---

[১] বিস্তারিত দেখুন, ইমাম যাহাবী, আল-কাবাইর, ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, রাহে বেলায়াত, পৃ. ১৯৫-২১৭।
[২] সূরা হুজুরাত: ১১ আয়াত।

কোনো কর্মে শরীয়তের আলোকে সুনির্দিষ্ট অন্যায় থাকে তবে তার অন্যায়কে অন্যায় বলা যাবে, তবে সে অন্যায়ের ভিত্তিতে তার অন্য কোনো খারাপ উপাধি দেওয়া বা উপহাস-বিদ্রূপ করা বৈধ নয়।

এ সব পাপের মূল অহঙ্কার, যা একটি কঠিন পাপ এবং আরো পাপের জন্ম দেয়। আল্লাহ বলেন:

إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالا فَخُورًا

"যারা দাম্ভিক, অহঙ্কারী তাদেরকে আল্লাহ পছন্দ করেন না।"[১]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ

"যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহঙ্কার আছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"[২]

হাযেরীন, আমরা প্রতিনিয়ত অনেক মানুষকে দেখি যাদের পোশাক, কথা, কর্ম, আচরণ ইত্যাদি দেখে তাদেরকে আমাদের চেয়ে ছোট মনে হয় ও অবজ্ঞা ভাব আসে। সাবধান থাকুন। কখনোই সম্পদ, শক্তি, শিক্ষা, সৌন্দর্য বা অন্য কোনো নিয়ামতের কারণে অহঙ্কার করবেন না বা অন্যকে হেয় মনে করবেন না। আপনার যা কিছু আছে সবই তো আল্লাহর দান। আপনি নিজেকে অধিক নিয়ামতপ্রাপ্ত ও দয়াপ্রাপ্ত মনে করে আল্লাহর শুকরিয়া করুন। কিন্তু নিজেকে বড় ও অপর ব্যক্তিকে হেয় মনে করবেন না। কারণ পরের দানে অহঙ্কার করার অর্থ দানকারীর দানের অবজ্ঞা করা। এছাড়া আপনি যাকে অবজ্ঞা করছেন সে তো আল্লাহর কাছে আপনার চেয়ে অনেক প্রিয় হতে পারে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

كَمْ مِنْ أَشْعَثَ أَغْبَرَ ذِي طِمْرَيْنِ لا يُؤْبَهُ لَهُ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لأَبَرَّهُ

"অনেক মানুষ এমন আছেন যার মাথার চুল এলোমেলো, পদযুগল ধুলিধসরিত, পরণের কাপড় অতি-সাধারণ এবং সমাজে তাদেরকে কোনো গুরত্ব দেওয়া হয় না, কিন্তু আল্লাহর নিকট তার মর্যাদা এত বেশি যে, যদি তিনি শপথ করে আল্লাহর কাছে কিছু দাবি করেন তবে আল্লাহ তা পূরণ করেন।"[৩]

হাযেরীন, এরূপ কয়েকটি পাপ হলো অনুমানে কথা বলা, দোষ খুঁজা ও গীবত করা। আল্লাহ বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ

"হে মুমিনগণ, তোমরা অধিকাংশ অনুমান পরিত্যাগ কর; কারণ কিছু অনুমান পাপ। আর তোমরা একে অপরের গোপন বিষয় অনুসন্ধান করো না এবং একে অপরের গীবত করো না। তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? তোমরা তো তা অপছন্দই কর। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ তাওবা গ্রহণকারী পরম দয়ালু।"[৪]

এখানে আল্লাহ আন্দায অনুমানের উপর কথা বলতে নিষেধ করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلا تَحَسَّسُوا وَلا تَجَسَّسُوا وَلا تَنَافَسُوا وَلا تَحَاسَدُوا وَلا تَبَاغَضُوا وَلا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا.

"খবরদার! তোমরা অবশ্যই অনুমান-ধারণা থেকে বহুদূরে থাকবে। কারণ অনুমান ধারণাই

---

[১] সূরা নিসা: ৩৬ আয়াত।

[২] সহীহ মুসলিম ১/৯৩, নং ৯১।

[৩] তিরমিযী, আস-সুনান ৫/৬৯২। তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

[৪] সূরা হুজুরাত: ১২ আয়াত।

সবচেয়ে বড় মিথ্যা। এবং তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় জানার চেষ্টা করবে না, গোপন দোষ সন্ধান করবে না, পরস্পরে হিংসা করবে না, পরস্পরে বিদ্বেষে লিপ্ত হবে না এবং পরস্পরে শত্রুতা ও সম্পর্কচ্ছেদ করবে না। তোমরা পরস্পরে ভাইভাই আল্লাহর বান্দা হয়ে যাও।"[১]

এভাবে আমরা জানতে পারছি যে, আন্দায বা অনুমানের উপর নির্ভর করে বা ধারণা করে কথা বলা এবং অন্যের দোষ অনুসন্ধান করা হারাম। শুধু তাই নয়, অনুসন্ধান ছাড়াও যদি অন্যের কোনো দোষত্রুটি মানুষ জানতে পারে তা তার অনুপস্থিতিতে উল্লেখ করা গীবত ও হারাম। গাইব থেকে গীবত। গীবত অর্থ অনুপস্থিত ব্যক্তির দোষ বলা। গীবত ১০০% সত্য কথা। কোনো ব্যক্তির ১০০% সত্য দোষত্রুটির কথা তার অনুপস্থিতিতে উল্লেখ করার নামই গীবত। আবূ হুরাইরা (রা) বলেন,

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ قَالَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ.

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, তোমরা কি জান গীবত কী? সাহাবীগণ বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই (ﷺ) ভাল জানেন। তিনি বলেন, তোমার ভাইকে তার অনুপস্থিতিতে এমনভাবে উল্লেখ করা যা সে অপছন্দ করে। প্রশ্ন করা হলো, বলুন তো, আমি যা বলছি তা যদি সত্যই আমার ভাইয়ের মধ্যে বিদ্যমান হয় তাহলে কি হবে? তিনি বলেন, তুমি যা বলছ তা যদি সত্যই তার মধ্যে বিদ্যমান থাকে তাহলে তুমি তার গীবত করলে। আর যদি তা তার মধ্যে না থাকে তাহলে তুমি তার মিথ্যা অপবাদ করলে।"[২]

আমরা ভাবি, সত্য কথা বলব তাতে অসুবিধা কি? আমরা হয়ত বুঝি না বা প্রবৃত্তির কুমন্ত্রনায় বুঝতে চাই না যে, সব সত্য কথা জায়েয নয়। অনেক সত্য কথা মিথ্যার মত বা মিথ্যার চেয়েও বেশি হারাম। আবার কখনো বলি, আমি এ কথা তার সামনেও বলতে পারি। আর সামানে যা বলতে পারেন তা পিছনে বলাই তো গীবত। গীবতের নিন্দায় এবং এর কঠোরতম শাস্তির বর্ণনায় অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এখানে সেগুলির বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয়। এখানে শুধু আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, ধার্মিক মানুষদের পতনের অন্যতম কারণ গীবত। সমাজের অনেক ধর্মপ্রাণ মুসলিম নিজেদের সহকর্মী, সঙ্গী অথবা অন্য কোনো দলের বা মতের কোনো ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির গীবত করে মজা পান। এছাড়া সমাজের ব্যবসায়ী, নেতৃস্থানীয় মানুষ সকলেরই ব্যক্তিগত সমালোচনা ও গীবত করে আমরা তৃপ্তি পাই। অনেক সময় আমরা গীবতকে ধর্মীয় রূপদান করি। লোকটি অন্যায় করে, পাপ করে তা বলব না? হাযেরীন, অন্যায় বা পাপ সম্ভব হলে তাকে বলে সংশোধন করুন। না হলে দুআ করুন। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই গীবত করবেন না।

প্রচলিত একটি কথা হলো: "ফাসিক বা পাপীর গীবত নেই।" অর্থাৎ পাপীর দোষের কথা অগোচরে বললে গীবত হয় না। একে হাদীস বলে চালানো হয়। মুহাদ্দিসগণ নিশ্চিত করেছেন যে, কথাটি জাল ও বানোয়াট। পাপীর যদি গীবত না হয় তাহলে তো আর দুনিয়াতে কোনো গীবতই নেই। কারণ আমরা সকলেই পাপী। একে অপরকে পাপী মনে করলেই যদি গীবত করা হালাল হয়ে যায় তাহলে তো আর কারো গীবতই হারাম থাকে না। আমরা তো সকলেই একে অপরকে পাপী মনে করি।

হাযেরীন, শূকরের মাংস যেমন হারাম, গীবতও তেমনি হারাম। কুরআনে বারংবার বলা হয়েছে যে, জীবন বাঁচাতে শূকরের মাংস খাওয়া যায়। কিন্তু কুরআন বা হাদীসে কোথাও বলা হয় নি যে, কোনো কারণে গীবত করা যায়। তবে বিভিন্ন হাদীসের আলোকে আলিমগণ বলেছেন যে, সমাজ বা ব্যক্তির সম্পদ বা সম্ভ্রম

---

[১] সহীহুল বুখারী ৩/১০০৯, ৫/১৯৭৬, ২২৫৩, ৬/২৪৭৪; সহীহ মুসলিম ৪/১৯৮৫।

[২] সহীহ মুসলিম ৪/২০০১।

বাঁচাতে একান্ত বাধ্য হয়ে শুধু সংশ্লিষ্ট সত্য দোষটি বলা যাবে। তাও বাধ্য হয়ে শূকরের মাংস খাওয়ার অনুভূতি নিয়ে বলতে হবে। সম্ভব হলে নাম না তুলে আকারে ইঙ্গিতে বলতে হবে। অন্যায়ের সমালোচনা করুন। তবে অন্যায়ে লিপ্ত মানুষের নাম নিয়ে তার পিছনে তার দোষ বলা বর্জন করুন।

হাযেরীন, হাদীসে বলা হয়েছে যে, গীবত করার ন্যায় শোনাও গোনাহ এবং কারো সামনে অন্যের গীবত করা হলে তিনি যদি বাধা দেন তবে অফুরন্ত সাওয়াব পাবেন। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

مَنْ ذَبَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيْهِ بِالْغَيْبَةِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُعْتِقَهُ مِنَ النَّارِ.

"কেউ যদি তার অনুপস্থিত ভাইয়ের মর্যাদাহানীর বা গীবতের প্রতিবাদ করে তাহলে আল্লার উপর দায়িত্ব হয়ে যায় তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেওয়া।"[১]

হাযেরীন, গীবতের চেয়েও ভয়াবহ হলো মিথ্যা দোষ দেওয়া। দীনদার মুসলিমগণ প্রায়ই অনুমানের উপর ভিন্নমতের মুমিনদের এরূপ অপবাদ দেন। অমুক অমুক ব্যক্তি বা দলের দালাল, অমুকের নিকট থেকে পয়সা খেয়ে এমন করছে। সে অমুক মতে বিশ্বাস করে ইত্যাদি কথা আমরা প্রায়ই বলি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এগুলি অনুমান নির্ভর মিথ্যা অপবাদ, আর কখনো সত্য গীবত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

مَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ أَسْكَنَهُ اللَّهُ رَدْغَةَ الْخَبَالِ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ

"যে ব্যক্তি কোনো মুমিনের বিষয়ে এমন কথা বলবে যা তার মধ্যে নেই তাকে আল্লাহ জাহান্নামীদের মলমুত্র-রক্তপূঁজের সমূদ্রে রেখে দেবেন, যতক্ষণ না সে যা বলেছে তা প্রমাণ করবে।"

হাযেরীন, গীবত জাতীয় আরেকটি মহাপাপ হলো নামীমাহ বা কানভাঙ্গানো বা কথা লাগান। একজনের কাছে অনুপস্থিত কারো কোনো দোষত্রুটি আলোচনা গীবত। আর যদি এমন দোষত্রুটি আলোচনা করা হয় যাতে দুই ব্যক্তির মধ্যে সম্পর্ক নষ্ট হয় তাহলে তাকে আরবীতে 'নামীমাহ' বলা হয়। সত্য কথা লাগানোও নামীমাহ, যেমন সত্য দোষ বলা গীবত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ

"কথালাগানো বা কানভাঙ্গানিতে লিপ্ত ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"[২]

হাযেরীন, মানুষের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপনের জন্য মিথ্য কথা বলা জায়েয, কিন্তু সম্পর্ক নষ্টকারী সত্য কথা জায়েয নয়। যদি কেউ আপনার কাছে এসে আপনার কোনো ভাই সম্পর্কে এধরনের কথা বলে তাহলে তাকে থামিয়ে দিন। এই লোকটি চোগলখোর। সে সত্যবাদী হলেও আপনার শত্রু। আপনার হৃদয়ের প্রশান্তি, প্রবিত্রতা ও আপনার ভাইয়ের সাথে আপনার সম্পর্ক নষ্ট করতে চায়।

অহঙ্কার, হিংসা, গীবত, নামীমা ইত্যাদি থেকে রক্ষা পাওয়ার অন্যতম উপায়, যথাসম্ভব সর্বদা নিজের জাগতিক ও পারলৌকিক উন্নতি, নিজের দোষত্রুটি সংশোধন ও তাওবার উপায় ইত্যাদির চিন্তায় মনকে মগ্ন রাখা। কোনো মানুষের কথা মনে হলে, আলোচনা হলে বা কেউ তাঁর প্রশংসা করলে মনের মধ্যে হিংসা বা অহংকার আসতে পারে। এজন্য এ সকল ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি সম্পর্কে নিজের মনে বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে ভাল ধারণা বদ্ধমূল করা, তার প্রশংসা যৌক্তিক ও উচিত বলে নিজের মনকে বিশ্বাস করানো, তার ভাল গুণাবলীর কথা মনে করে তাকে শ্রদ্ধা করতে নিজের মনকে উদ্বুদ্ধ করা প্রয়োজন। ক্রমান্বয়ে এভাবে আমরা এ সকল কঠিন ও ধ্বংসাত্মক কর্ম থেকে নিজেদেরকে সম্পূর্ণ মুক্ত করতে পারব। আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক দিন। আমীন।

---

[১] হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৮/৯৫; আলবানী, সহীহুত তারগীব ৩/৫২, ৫৩। হাদীসটি সহীহ।

[২] বুখারী, আস-সহীহ ৫/২২৫০; মুসলিম, আস-সহীহ ১/১০১।

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

أَمَّا بَعْدُ، فَيَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ

وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَـدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَـوَّابٌ رَحِيمٌ

وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ: لا يَـدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ

وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ: لا يَـدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ

بَارَكَ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ فِيْ الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ. وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ. أَقُـوْلُ قَـوْلِيْ هَـذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُـلِّ ذَنْـبٍ، فَاسْتَغْفِرُوْهُ وَتُوْبُوْا إِلَيْهِ، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.

৫ম খুতবা-২ঃ সালাম, মুসাফাহা, কোলাকুলি ও অনুমতি

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লী আলা রাসূলিহীল কারীম। আম্মা বাদ,

সম্মানিত উপস্থিতি, আজ .... মাসের ৫ম জুমুআ। আজ আমরা সালাম, মুসাফাহা, কোলাকুলি, অনুমতি গ্রহণ ইত্যাদি ইসলামী শিষ্টাচারের বিভিন্ন দিক আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ। কিন্তু তার আগে আমরা এ সপ্তাহের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসগুলির বিষয়ে সংক্ষেপ আলোকপাত করি। হাযেরীন, আজ ইংরেজী ..... মাসের ..... তারিখ। এ সপ্তাহের দিবসগুলির মধ্যে রয়েছে ...... ।

হাযেরীন, পারস্পরিক সালাম বিনিময় করা ইসলামের অন্যতম ইবাদত। আল্লাহ্ বলেনঃ

وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا

"তোমাদেরকে যখন সালাম দেওয়া হবে তখন তোমরা তার চেয়ে উত্তম সালাম দেবে, অথবা উক্ত সালামই প্রদান করবে; আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে পূর্ণ হিসাবগ্রহণকারী।"[১]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি "আস-সালামু আলাইকুম" বলবে তার জন্য ১০টি নেকি লেখা হবে, যে "আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ" বলবে তার জন্য ২০টি নেকি লেখা হবে এবং যে "আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু" বলবে তার জন্য ৩০টি নেকি লেখা হবে।"[২]

হাযেরীন, জান্নাতে যাওয়ার অন্যতম পথ হলো সালামের প্রচলন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ

أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلاَمَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ (وَصِلُوا الأَرْحَامَ) وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلاَمٍ

"হে মানুষেরা, তোমরা সালামের প্রচলন কর, মানুষকে খাদ্য খাওয়াও, রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয়তা রক্ষা কর এবং মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন (তাহাজ্জুদের) সালাত আদায় কর, তাহলে তোমরা নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[৩]

لاَ تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَوَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ

"ঈমানদার না হওয়া পর্যন্ত তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আর একে অপরেক ভাল না বাসলে তোমরা ঈমানদার হতে পারবে না। আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি কর্ম শিখিয়ে দেব না, যে কর্ম করলে তোমরা পরস্পরে ভালবাসতে পারবে? তোমাদের মধ্যে সালামের প্রচলন করবে।"[৪]

একব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করে, ইসলামের সর্বোত্তম কর্ম কী? তিনি বলেনঃ

تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ

"খাদ্য খাওয়াবে এবং পরিচিত ও অপরিচিত সবাইকে সালাম দিবে।"[৫]

হাযেরীন, সালামের অফুরন্ত সাওয়াবের কারণে সাহাবায়ে কেরাম অনেক সময় বাজারে যেতেন শুধু মানুষদেরকে সালাম দেওয়ার জন্য। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণ কোনো কারণে সামান্য একটু চোখের আড়াল হওয়ার পরে আবার দেখা হলে তারা আবারো সালাম দিতেন। আনাস (রা) বলেনঃ

كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَتَفَرَّقُ بَيْنَنَا شَجَرَةٌ فَإِذَا الْتَقَيْنَا يُسَلِّمُ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ

---

[১] সূরা নিসাঃ ৮৬ আয়াত।

[২] হাদীসটি সহীহ। তাবারানী। সহীহুত তারগীব ৩/২০। ঘটনাসহ সমার্থক হাদীস আবূ দাউদ, তিরমিযী ও অন্যান্য মুহাদ্দিস সংকলন করেছেন।

[৩] তিরমিযী, আস-সুনান ৪/৬৫২; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ৩/১৪। তিরমিযী ও হাকিম হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। সহীহুত তারগীব ৩/১৭।

[৪] মুসলিম, আাস-সহীহ ১/৭৪।

[৫] বুখারী, আস-সহীহ ১/১৩, ১৯; মুসলিম, আস-সহীহ ১/৬৫।

"আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে থাকতাম। এমতাবস্থায় একটি গাছ যদি আমাদের মাঝে আড়াল করত তবে গাছটি অতিক্রম করার পরে আবার আমরা একে অপরকে সালাম দিতাম।"[১]

হাযেরীন, সালাম দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত ইবাদত। সালামের উত্তর দেওয়া ওয়াজিব। সালাম দেওয়ার ক্ষেত্রেও আমাদের সুন্নাত নিয়ম পদ্ধতি অনুসরণ করা প্রয়োজন। আমরা জানি যে, যে আগে সালাম দিবে সেই উত্তম। তবে এ হলো দুজনেই যদি চলন্ত অবস্থায় থাকে। তা না হলে সুন্নাত হলো দাঁড়ানো ব্যক্তি বসা ব্যক্তিকে, চলন্ত ব্যক্তি দাঁড়ানো ব্যক্তিকে, আরোহী ব্যক্তি চলন্ত, দাঁড়ানো বা বসা ব্যক্তিকে, অল্প বেশিকে এবং আগন্তুক উপস্থিত ব্যক্তিদেরকে সালাম দিবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ، يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ

"আরোহী ব্যক্তি চলন্ত ব্যক্তিকে, চলন্ত ব্যক্তি বসা ব্যক্তিকে, কম বেশিকে, ছোট বড়কে সালাম দিবে।"[২]

يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ وَالْمَاشِيَانِ أَيُّهُمَا بَدَأَ فَهُوَ أَفْضَلُ

"আরোহী বসে চলন্ত ব্যক্তিকে, চলন্ত ব্যক্তি বসে থাকা ব্যক্তিকে সালাম করবে। আর দুজনই যদি চলন্ত হয় তাহলে যে আগে সালাম দিবে সেই উত্তম।"[৩]

আবূ উমামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করা হয়,

الرَّجُلاَنِ يَلْتَقِيَانِ أَيُّهُمَا يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ فَقَالَ أَوْلاَهُمَا بِاللَّهِ، إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللَّهِ مَنْ بَدَأَهُمْ بِالسَّلاَمِ

দুজন মানুষের সাক্ষাত হলে তাদের মধ্য থেকে কে আগে সালাম দিবে? তিনি বলেন, যে আল্লাহর প্রিয়তর ও অধিক নিকটবর্তী সে, যে আগে সালাম দেয় সেই আল্লাহর নিকট প্রিয়তর।"[৪]

হাযেরীন, ব্যক্তি বা মাজলিসে সাক্ষাতের শুরুতে যেমন সালাম দেওয়া সুন্নাত, তেমনি শেষে বিদায়ের সময়ও সালাম দেওয়া সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَجْلِسِ فَلْيُسَلِّمْ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ فَلْيُسَلِّمْ فَلَيْسَتْ الأُولَى بِأَحَقَّ مِنْ الآخِرَةِ

"তোমরা কোনো মাজলিসে গেলে সালাম দিবে। যখন মজলিস ত্যাগের সিদ্ধান্ত নেবে তখনও সালাম দিবে। প্রথম সালামের চেয়ে দ্বিতীয় সালামের গুরুত্ব মোটেও কম নয়।"[৫]

হাযেরীন, মুসলিমের সালাম হবে মুখে সশব্দে উচ্চারণ করে, যেন পরস্পরে তা শুনতে পান। হাতের ইশারায় সালাম দিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا لا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَلا بِالنَّصَارَى فَإِنَّ تَسْلِيمَ الْيَهُودِ الإِشَارَةُ بِالأَصَابِعِ وَتَسْلِيمَ النَّصَارَى الإِشَارَةُ بِالأَكُفِّ... وَأَحْفُوا الشَّارِبَ وَاعْفُوا اللِّحَى

"যে ব্যক্তি অন্যদের অনুকরণ করে সে আমাদের সাথে সম্পর্কিত নয়। তোমরা ইহূদী বা খৃস্টানদের অনুকরণ করো না। ইহূদীদের সালাম হলো হাতের আঙ্গুলের ইশারায় এবং খৃস্টানদের সালাম হলো হাতের ইশারায় আর তোমরা গোঁফ ছোট করবে এবং দাড়ি বড় করবে।"[৬]

হাযেরীন, সাক্ষাতের সময় শিষ্টাচার হিসাবে মাথা ঝুকানো, দেহ ঝুকানো, প্রণাম করা বা সাজদা

---

[১] হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৮/৩৪; আলবানী, সহীহুত তারগীব ৩/১৯। হাদীসটি হাসান।

[২] বুখারী, আস-সহীহ ৫/২৩০১।

[৩] ইবনু হিব্বান, আস-সহীহ ২/২৫১; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৮/৩৬; আলবানী, সহীহুত তারগীব ৩/১৯। হাদীসটি সহীহ।

[৪] তিরমিযী, আস-সুনান ৫/৫৬; আবূ দাউদ, আস-সুনান ৪/৩৫১। তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

[৫] তিরমিযী, আস-সুনান ৫/৬২; আবূ দাউদ, আস-সুনান ৪/৩৫৩। হাদীসটি হাসান।

[৬] তিরমিযী, আস-সুনান ৫/৫৬; সহীহুত তারগীব ৩/২৩। হাদীসটি হাসান।

করার প্রচলন আরব ও পার্শবর্তী দেশগুলিতে, বিশেষত ইহূদী খৃস্টানদের মধ্যে ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ এগুলি কঠিনভাবে নিষেধ করেছেন। বিভিন্ন সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, সাহাবীগণ সিরিয়া ও অন্যান্য দেশে ইহূদী-খৃস্টানদেরকে দেখেন যে, তারা তাদের আলিম, ওলী-বুজুর্গ ও নেতাদের সাজদা করে সম্মান প্রদর্শন করে এবং বলে এগুলি শিষ্টাচারের বা তাহিয়্যার সাজদা ও নবীদের সাজদা। সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এভাবে তাহিয়্যা বা শিষ্টাচার বা সম্মানের সাজদা করতে চান। তিনি বলেন, ইহূদী-খৃস্টানরা মিথ্যা বলে। এরূপ সাজদা নবীদের সাজদা নয়। আল্লাহ ছাড়া কাউকে সাজদা করা বৈধ নয়। আমি যদি কোনো মানুষকে সাজদা করার অনুমতি দিতাম তাহলে স্ত্রীকে বলতাম তার স্বামীকে সাজদা করতে।[১] আনাস (রা) বলেন:

قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّه الرَّجُلُ منَّا يَلْقَى أَخَاهُ أَوْ صَدِيقَهُ أَيَنْحَنِي لَهُ قَالَ لا

"একব্যক্তি বলে, হে আল্লাহর রাসূল, আমাদের কারো যদি তার ভাইয়ের সাথে সাক্ষাত হয় তাহলে কি সে তার জন্য একটু ঝুকবে? তিনি বলেন না।"[২]

সাহাবীগণ এ বিষয়ে কত কঠোরতা অবলম্বন করতেন তা দেখুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ৭ম হিজরীতে আমর ইবনুল আস (রা)-কে ইথিওপিয়ার শাসকের কাছে দাওয়াতের দূত প্রেরণ করেন। তিনি দেখেন যে, তথাকার মানুষেরা শাসক নাজ্জাসীর দরবারে প্রবেশ করে একটি ছোট প্রবেশ পথ দিয়ে মাথা ঝুকিয়ে। তখন তারা পিছন ফিরে তার দরবারে প্রবেশ করেন এবং নাজ্জাশীর সামনে পরিপূর্ণ সোজা হয়ে দাঁড়ান। এতে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে হত্যা করতে উদ্দ্যত হয় এবং বলে, আমরা যেভাবে ঢুকি তুমি সেভাবে ঢুকলে না কেন? তিনি বলেন, আমরা আমাদের নবীকে এভাবে সম্মান প্রদর্শন করি না, অথচ তিনিই তো সর্বোচ্চ সম্মান ও শিষ্টাচার পাওয়ার যোগ্য। তখন নাজ্জাশী বলেন, সে ঠিকই বলেছেন, তাকে ছেড়ে দাও।"[৩]

হাযেরীন, কারো বাড়ি বা ঘরে প্রবেশের আগে সালাম দিয়ে অনুমতি গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহ বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

"হে মুমিনগণ, তোমাদের অনুমতি না নিয়ে এবং গৃহবাসীদের সালাম না দিয়ে তোমাদের নিজেদের গৃহ ছাড়া অন্য কোনো গৃহে প্রবেশ করবে না। এটিই তোমাদের জন্য উত্তম, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। যদি তোমরা সেখানে কাউকে না পাও তবে তোমাদের অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত তোমরা সেখানে প্রবেশ করো না। আর যদি তোমাদের বলা হয় "তোমরা ফিরে যাও" তবে তোমরা ফিরে যাবে। এটিই তোমাদের জন্য অধিক পবিত্র। আর আল্লাহ তোমাদের কর্মের বিষয়ে সম্যক অবগত।"[৪]

বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ অনুমতি গ্রহণের নিয়ম ও গুরুত্ব বলেছেন। সালাম দিয়ে অনুমতি চাইতে হবে। সাড়া না পেলে তিনবার পর্যন্ত অনুমতি চাইতে হবে। তিনবারেও সাড়া না পেলে ফিরে আসতে হবে। অনুমতি গ্রহণের আগে বা গ্রহণকালে কোনোভাবেই বাড়ি বা ঘরের মধ্যে দৃষ্টি দেওয়া যাবে না, বরং এমনভাবে দাঁড়াতে হবে যেন ভিতরে দৃষ্টি না যায়। অনুমতি ছাড়া কারো বাড়ি বা ঘরের মধ্যে দৃষ্টিপাত করা কঠিন হারাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, যদি কেউ এভাবে বাড়ি বা ঘরের মধ্যে দৃষ্টি দেয় আর বাড়িওয়ালা লোকটির চোখ তুলে নেয় তাহলে বিচারে তাকে শাস্তি পেতে হবে না।[৫]

---

[১] হাকিম, আল-মুসতাদরাক ২/২০৪, ৪/১৯০; ইবনু মাজাহ, আস-সুনান ১/৫৯৫; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৪/৩০৯-৩১০।
[২] তিরমিযী, আস-সুনান ৫/৭৫। তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।
[৩] হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৮/৩৯। সনদের রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।
[৪] সূরা নূর: ২৭-২৮ আয়াত।
[৫] বুখারী, আস-সহীহ ২/৮২১; মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৬৯৯।

হাযেরীন, ইসলামী শিষ্টাচারের অন্যতম দিক হলো মুসাফাহা বা হাত মেলানো। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا

"যদি দুজন মুসলিম সাক্ষাত করে পরস্পরে হাত মেলান বা একে অপরের হাত ধরেন তবে তাদের পৃথক হওয়ার আগেই তাদের পাপ ক্ষমা করা হয়।"[১]

বিভিন্ন হাদীস থেকে মুসাফাহা বা হাত মেলানোর আদব ও সুন্নাত নিয়ম জানা যায়। যেমন মুসাফাহার সময় আল্লাহর প্রশংসা করা ও ইসতিগফার করা, দুআ করা, "ইয়াগফিরুল্লাহু লানা ওয়া লাকুম" বলা, দরুদ পাঠ করা, অপরব্যক্তি হাত টেনে না নেওয়া পর্যন্ত নিজের হাত টেনে না নেওয়া ইত্যাদি।[২]

মুসাফাহা অবশ্যই ডান হাতে হবে। ওযর বা অক্ষমতা ছাড়া বাম হাত মেলানো ইসলামী আদবের ঘোর পরিপন্থী। একে অপরের শুধু ডান হাত ধরবেন, না অপরের ডান হাতকে নিজের দুহাতের মধ্যে রাখবেন তা নিয়ে আলিমগণ মতভেদ করেছেন। হাদীসের আলোকে বুঝা যায় যে, এক হাতে বা দু হাতে যে কোনো ভাবে ডান হাত মেলালেই মুসাফাহা হবে। হাদীস শরীফে বারংবার "হাত" মেলানোর কথা এবং ডান হাত মেলানোর কথা বলা হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, শুধু ডান হাত মেলালেই হবে। তবে ইমাম বুখারী উল্লেখ করেছেন যে, প্রসিদ্ধ দুজন তাবি-তাবিয়ী হাম্মাদ ইবনু যাইদ (মৃত্যু ১৭৯ হিজরী) ও আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক (মৃত্যু ১৮১ হি) দু হাতে মুসাফাহা করেন। এছাড়া তিনি নিম্নের হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন:

عن ابْنَ مَسْعُودٍ عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَكَفِّي بَيْنَ كَفَّيْهِ التَّشَهُّدَ

"আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ বলেন, আমার হাতটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হস্তদ্বয়ের মধ্যে ছিল, এমতাবস্থায় তিনি আমাকে তাশাহ্হুদ বা আত-তাহিয়্যাত শিক্ষা দেন।"[৩]

এ থেকে বুঝা যায় যে, দু হাতে মুসাফাহা করার রীতি ইসলামের প্রথম যুগে প্রচলিত ছিল।

হাযেরীন, সালাম-মুসাফাহার সাথে "কেমন আছেন" বা অনরূপ বাক্য দ্বারা অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করাও ইসলামী আদব। অনেকে বলেন: "আল্লাহ কেমন রেখেছেন?" হাদীসে এরূপ পাওয়া যায় না। বিভিন্ন হাদীসে আমরা দেখতে পাই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণ বলতেন (كَيْفَ أَصْبَحْتَ، كَيْفَ أَنْتَ) অর্থাৎ কেমন আছেন? সকালে কেমন আছেন? ইত্যাদি। প্রশ্নের সময় নয়, বরং উত্তরের সময় আল্লাহর প্রশংসা করতে হয়। যেমন, ভাল আছি এবং আল্লাহর প্রশংসা করছি, বা আল্লাহর রহমতে ভাল আছি, ইত্যাদি।

হাযেরীন, মুআনাকা বা কোলাকুলি করাও ইসলামী আদবের অন্তর্ভুক্ত। কোনো কোনো হাদীসে মুআনাকা বা কোলাকুলি করতে নিষেধ করা হয়েছে। একব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করে, আমাদের কেউ যদি তার ভাইয়ের সাথে সাক্ষাত করে তাহলে কি সে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরবে বা কোলাকুলি করবে? তিনি বলেন: না।[৪] কিন্তু অন্যান্য হাদীসে মুআনাকার অনুমতি আছে। আয়েশা (রা) বলেন, যাইদ ইবনু হারিসা মদীনায় আগমন করে আমার বাড়ির বাইরে এসে সাড়া দিলে রাসূলুল্লাহ ﷺ উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে দৌড়ে যান, তাকে জড়িয়ে ধরেন এবং চুমু খান।[৫] আনাস (রা) বলেন:

كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا تَلاقَوْا تَصَافَحُوا وَإِذَا قَدِمُوا مِنْ سَفَرٍ تَعَانَقُوا

"রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণ যখন পরস্পর সাক্ষাত করতেন তখন মুসাফাহা করতেন বা হাত

---

[১] তিরমিযী, আস-সুনান ৫/৭৪; আবূ দাউদ, আস-সুনান ৭/৯৯; ইবনু মাজাহ, আস-সুনান ২/১২২০। হাদীসটি হাসান।
[২] মুবারাকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াযী ৭/৩২।
[৩] বুখারী, আস-সহীহ ৫/২৩১১।
[৪] তিরমিযী, আস-সুনান ৫/৭৫। তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।
[৫] তিরমিযী, আস-সুনান ৫/৭৬। তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

মেলাতেন। আর যখন সফর থেকে আগমন করতেন তখন মুআনাকা করতেন।[১]

এজন্য ইমাম নববী ও অন্যান্য আলিম উল্লেখ করেছেন যে, সফর থেকে আগমন করলে বা দীঘ দিন পরে দেখা হলে কোলাকুলি করা সুন্নাত-সম্মত হয়। অন্যান্য সময়ে কোলাকুলি না করাই সুন্নাত সম্মত এবং কোলাকুলি করা মাকরূহ তানযীহী বা অনুত্তম।

কোলাকুলিকে হাদীসে "ইলতিযাম" বা জড়িয়ে ধরা এবং মুআনাকা বা ঘাড় মেলানো বলা হয়েছে। উভয়ের ডান ঘাড় ও বুক মিলিয়ে ঘাড়ের উপর দিয়ে হাত দিয়ে একবার জড়িয়ে ধরাই হলো মুআনাকা।

হাযেরীন, সাক্ষাতের শিষ্টাচারের একটি বিষয় হলো চুম্বন করা। সন্তান, পিতামাতা, উস্তাদ, আলিম বা নেককার বুজুর্গদের হাতে চুমু খাওয়া ইসলামী শিষ্টাচারের অংশ। আয়েশা (রা) বলেন:

كَانَتْ (فاطمة) إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ قَامَ إِلَيْهَا فَأَخَذَ بِيَدِهَا وَقَبَّلَهَا وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتْ إِلَيْهِ فَأَخَذَتْ بِيَدِهِ فَقَبَّلَتْهُ وَأَجْلَسَتْهُ فِي مَجْلِسِهَا

"ফাতিমা (রা) যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসতেন তখন তিনি উঠে দাঁড়িযে তাঁর হাত ধরতেন, তাঁকে চুমু খেতেন এবং তাঁর নিজের বসার স্থানে তাকে বসতে দিতেন। আর যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ফাতিমার (রা) ঘরে গমন করতেন তখন তিনি তার আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর হাত ধরতেন, তাঁকে চুমু খেতেন এবং তার নিজের বসার স্থানে তাকে বসাতেন।[২]

এছাড়া দু চারটি ঘটনায় সাহাবী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাতে চুমু খেয়েছেন বা সাহাবীগণ একে অপরের হাতে চুমু খেয়েছেন বা তাবিয়ীগণ সাহাবীগনের হাতে চুমু খেয়েছেন বলে কোনো কোনো হাদীসে দেখা যায়। এছাড়া শিশুদের গালে-কপালে, মাথায় বা দেহে আদরের চুমু দেওয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রীতি ছিল।[৩]

পায়ে চুমু খাওয়া বা পা জড়িয়ে ধরার রেওয়াজও আরব দেশে ছিল। ৩/৪টি হাদীস থেকে আমরা দেখি যে, নতুন আগন্তুক বেদুঈন বা ইহূদী-খৃস্টান এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পায়ে চুমু খেয়েছেন। কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করে পরবর্তী সময়ে আর তারা এরূপ করেন নি। এ সকল হাদীসের আলোকে অনেক আলিম পায়ে চুমু খাওয়া বা পায়ে হাত দিয়ে হাতে চুমু খাওয় বা কদমমুছি জায়েয বলেছেন। তবে তা সুন্নাত নয়। কোনো হাদীসে এরূপ করার কোনো সাওয়াব, ফযীলত বা গুরুত্ব বর্ণিত হয় নি। সাহাবীগণ কখনো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পায়ে চুমু খান নি। আবূ বাকর, উমার, উসমান, আলী ও অন্যান্য অগণিত সাহাবী কখনোই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কদমমুছি বা কদমবুছি করেন নি। আয়েশা, আলী, ফাতেমা, হাসান, হুসাইন বা তাঁর স্ত্রী-সন্তানগণও কখনো তা করেন নি। সাহাবীদের স্ত্রী-সন্তানগণ তাদের কদমমুছি করেন নি। সাহাবী, তাবিয়ী, তাবি-তাবিয়ীগণের যুগেও ইসলামী শিষ্টাচার হিসেবে এর কোনো অস্তিত্ব ছিল না। মূলত সালাম ও মুসাফাহাই হলো ইসলামী শিষ্টাচারের সুন্নাত নিয়ম। এ দুটি কাজেরই সাওয়াব, ফযীলত ও গুরুত্ব হাদীসে বলা হয়েছে এবং উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। হস্ত চুম্বন ও কোলাকুলির প্রচলনটি রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের মধ্যে প্রচলন ছিল বলে জানা যায়, তবে এর ফযীলতে কিছু বর্ণিত হয় নি।[৪]

হাযেরীন, আগন্তুকের সম্মানে উঠে দাঁড়ানো বিভিন্ন সমাজে শিষ্টাচারের অংশ। কোনো কোনো হাদীসে এরূপ করতে কঠিনভাবে নিষেধ করা হয়েছে। আবূ উমামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি লাঠিতে ভর দিয়ে আমাদের নিকট আগমন করেন। তখন আমরা তাঁর দিকে উঠে গেলাম। তিনি বললেন:

---

[১] তাবারানী। হাদীসটি হাসান। সহীহুত তারগীব ৩/২২।

[২] তিরমিযী, আস-সুনান ৫/৭০০; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ৪/৩০৩; আবূ দাউদ, আস-সুনান ৪/৩৫৫। তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

[৩] ইবনুল মুকরী, আর-রুখসাতু ফী তাকবীলির ইয়াদ, পৃ. ১৫-১১২; নববী, আল-আযকার ১/২৬২-২৬৫।

[৪] বিস্তারিত দেখুন: ড. খোন্দকার আব্দুলআহ জাহাঙ্গীর, এহইয়াউস সুনান: সুন্নাতের পুনরুজ্জীবন ও বিদ'আতের বিসর্জন,পৃ. ৩৮৬-৩৮৭।

لا تَقُومُوا كَمَا تَقُومُ الأَعَاجِمُ يُعَظِّمُ بَعْضُهَا بَعْضًا

"অনারবরা যেমন একে অপরের তাযীম-সম্মান করতে দাঁড়ায় সেভাবে তোমরা দাঁড়িও না।"[১]

অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

"যে ব্যক্তির ভাললাগে যে, তার জন্য মানুষ দাঁড়িয়ে থাকুক তাকে জাহান্নামে অবস্থান করতে হবে।"[২]

এ সকল হাদীস থেকে জানা যায় যে, আগন্তুকের সম্মানে দাঁড়ানো নিষিদ্ধ। কিন্তু অন্যান্য হাদীস থেকে দাঁড়ানোর অনুমোদন বুঝা যায়। আমরা দেখেছি যে, ফাতিমা (রা) ও রাসূলুল্লাহ ﷺ একে অপরের নিকট গমন করলে তিনি দাঁড়িয়ে তাঁর হাত ধরে চুমু খেয়ে নিজের আসনে বসতে দিতেন। অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, খন্দকের যুদ্ধে আনসারদের নেতা সা'দ ইবনু মুআয আহত হন। তিনি মসজিদে নববীতে অবস্থান করছিলেন। এ সময়ে বুনু কুরাইযার ইহূদীদের বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ যুদ্ধ পরিচালনা করেন। ইহূদীরা পরাজিত হয়ে বলে, তারা সা'দ ইবনু মুআযের ফয়সালা মেনে নেবে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সা'দকে খবর দেন। তিনি যখন নিকটবর্তী হন তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আনসারদেরকে বলেন:

قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ أَوْ خَيْرِكُمْ

"তোমরা তোমাদের নেতার দিকে দাঁড়াও বা দাঁড়িয়ে তার কাছে যাও।"[৩]

এ সকল হাদীসের ভিত্তিতে আলিমগণ মতভেদ করেছেন। তবে গ্রহণযোগ্য মত হলো, আগন্তুককে সালাম, মুসাফাহা, চুম্বন করতে, এগিয়ে নিতে বা তাকে অভ্যর্থনা করে বসতে দেওয়ার জন্য মাজলিসের বসা মানুষের জন্য উঠে দাঁড়ানো সুন্নাত সম্মত। আর শুধু সম্মানের জন্য দাঁড়ানো বা দাঁড়িয়ে থাকা নিষিদ্ধ।[৪]

লক্ষ্যণীয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নিজের জন্য দাঁড়াতে অনুমতি দিতেন না। আনাস (রা) বলেন:

لَمْ يَكُنْ شَخْصٌ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَكَانُوا إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُوا لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَاهِيَتِهِ لِذَلِكَ

"সাহাবীগণের নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেয়ে বেশি প্রিয় ব্যক্তি আর কেউই ছিলেন না। কিন্তু তাঁরা তাঁকে দেখে উঠে দাঁড়াতেন না ; কারণ তাঁরা জানতেন যে, তিনি তা অপছন্দ করেন।"[৫]

তবে তাঁরা তাঁর প্রস্থানের সময় তিনি যখন উঠতেন তখন তাঁর সাথে সাথে উঠে দাঁড়াতেন। সম্ভবত এজন্য যে, প্রস্থানের সময় তাঁরই সাথে সাথে উঠে দাঁড়ালে তাঁর অনুসরণ ও অনুকরণ করা হয়, কাজেই তিনি তা অপছন্দ করবেন না। আবু হুরাইরা (রা) বলেন :

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَجْلِسُ مَعَنَا فِي الْمَجْلِسِ يُحَدِّثُنَا فَإِذَا قَامَ قُمْنَا قِيَامًا حَتَّى نَرَاهُ قَدْ دَخَلَ بَعْضَ بُيُوتِ أَزْوَاجِهِ

"নবীজী ﷺ আমাদের সাথে মাজলিসে বসে কথাবার্তা বলতেন। এরপর যখন তিনি উঠতেন তখন আমরাও উঠে দাঁড়াতাম এবং যতক্ষণ না তিনি তাঁর কোনো স্ত্রীর ঘরে প্রবেশ করতেন, ততক্ষণ দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতাম।"[৬]

মহান আল্লাহ আমাদেরকে সুন্নাতের পরিপূর্ণ অনুসরণের তাওফীক দান করুন। আমীন।

---

[১] আবূ দাউদ, আস-সুনান ৪/৩৫৮; মুনযিরী, আত-তারগীব। মুনযিরী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

[২] তিরমিযী, আস-সুনান ৫/৯০। তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

[৩] বুখারী, আস-সহীহ ২/৯০০, ৩/১১০৭, ১৩৮৪, ৪/১৫১১, ৫/২৩১০; মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৩৮৮।

[৪] ইমাম নববীর "আত-তার-তারখীস ফিল কিয়াম" বা "দাঁড়ানোর অনুমতি" নামক পুস্তিকাটি দেখুন।

[৫] সুনানে তিরমিযী, ৫/৯০, নং ২৭৫৪। তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

[৬] আবূ দাউদ, সুনান ৪/২৪৭, নং ৪৭৭৫, নাসাঈ, সুনান ৮/৩৩, নং ৪৭৭৬।

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

أَمَّا بَعْدُ، فَيَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا

وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَوَلا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلامَ بَيْنَكُمْ

وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا

بَارَكَ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ فِيْ الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ. وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ. أَقُولُ قَوْلِيْ هَذا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ، فَاسْتَغْفِرُوْهُ وَتُوْبُوْا إِلَيْهِ، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.

৫ম খুতবা-৩ঃ পহেলা এপ্রিল ও পহেলা বৈশাখ

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লী আলা রাসূলিহীল কারীম। আম্মা বাদ,

সম্মানিত উপস্থিতি, আজ .... মাসের ৫ম জুমুআ। আজ আমরা এপ্রিল মাসের দুটি দিনঃ পহেলা এপ্রিল ও পহেলা বৈশাখ সম্পর্কে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ। কিন্তু তার আগে আমরা এ সপ্তাহের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসগুলির বিষয়ে সংক্ষেপ আলোকপাত করি। হাযেরীন, আজ ইংরেজী ..... মাসের ..... তারিখ। এ সপ্তাহের দিবসগুলির মধ্যে রয়েছে ....।

হাযেরীন, এপ্রিল মাসে আমাদের দেশে দুটি দিবস পালন করা হয়ে থাকে। পহেলা এপ্রিল এবং পহেলা বৈশাখ বা ১৪ই এপ্রিল। পহেলা এপ্রিল বাংলায় "এপ্রিল ফুল" নামে পরিচিত। এখানে ফুল অর্থ ইংরেজী ফুল অর্থাৎ বোকা, হাবা বা নির্বোধ। ইংরেজিতে বলা হয়ঃ April Fools' Day or All Fools' Day. এদিনে "প্র্যাকটিক্যাল জোক" বা বাস্তব বা ব্যবহারিক তামাশার নামে একে অপরকে মিথ্যা বলে ঠকানো হয়ে থাকে। এ উপলক্ষ্যে পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে নানা রকম উৎসবের ব্যবস্থা করা হয়।

হাযেরীন, এপ্রিল ফুলের রহস্য বুঝতে আমাদের মানব ইতিহাসের কয়েকটি তথ্য জানতে হবে।

হাযেরীন, আদম (আ)-এর মাধ্যমে পৃথিবীর বুকে মানব জাতির পথ চলা শুরু। তাঁর সন্তানেরা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ক্রমান্বয়ে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। পরবর্তী প্রথম রাসূল ছিলেন নূহ (আ)। নূহ (আ)-এর প্লাবনের পর তাঁর সন্তানেরা ক্রমান্বয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। তাঁর তিন ছেলের নাম "হাম", "সাম" ও "ইয়াফিস"। হামের বংশধরগণ ক্রমান্বয়ে আফ্রিকায় চলে যান। সামের বংশধরগণ মূলত মধ্যপ্রাচ্যে বসবাস করেন এবং কেউ কেউ পার্শবতী দেশগুলিতে ছড়িয়ে পড়েন। ভারতের দ্রাবিড়গণও তাদেরই বংশধর বলে বুঝা যায়। ইয়াফেসের বংশধরগণ অনেকে ইরানে বসবাস করেন। আরেক দল 'আর্য" নামে ভারতে আসেন এবং আরেক দল ইউরোপে চলে যান। এজন্য ইউরোপ, ভারতের আর্য ও প্রাচীন ইরানের ভাষা, কৃষ্টি ও ধর্মের মধ্যে অনেক অনেক মিল পাওয়া যায়। তার একটি দিক হলো পহেলা এপ্রিল।

হাযেরীন, বসন্তের শেষে ভারতে হিন্দুরা হোলি উৎসর পালন করেন। হিন্দুদের বিশ্বাস অনুসারে ভগবান বিষ্ণুর অবতার বা মানবরূপ শ্রীকৃষ্ণের সাথে গোপিনীদের লীলাখেলার স্মৃতিপালন ও উদযাপনে তারা এ উৎসব করেন। এ হোলি উৎসবেরই প্রাচীন ইউরোপীয় রূপ ছিল প্রাচীন রোমান ধর্মের হিলারিয়া (Hilaria) উৎসব। এ উপলক্ষ্যে নানারকম অশ্লীল, অশালীন আনন্দ উৎসব প্রচলিত ছিল ইউরোপে।

হাযেরীন, ইউরোপে খৃস্টধর্ম আগমনের পরে "ভিন্নমতের" কারণে লক্ষলক্ষ খৃস্টান, ইহূদী ও মুসলিমকে হত্যা ও আগুনে পোড়ানো হলেও, খৃস্টান পোপ-পাদরিগণ ধর্মকে সহজ করার নামে সকল প্রকার পাপাচার প্রশ্রয় দিয়েছেন। এ কারণে খৃস্টান ইউরোপে এপ্রিল ফুল দিবস নামে হিলারিয়া বা হোলি উৎসবের বিভিন্ন প্রকারের পাপাচার, মিথ্যাচার ও অশ্লীলতা প্রশ্রয় দেওয়া হয়। এমন একটি মহাপাপ, মিথ্যাচার ও বর্বরতা ছিল স্পেনের মুসলিমদের সাথে খৃস্টানগণের "এপ্রিল ফুল"।

হাযেরীন, স্পেনের অত্যাচারিত মানুষদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে মুসলিম বাহিনী ৯২ হিজরী মুতাবেক ৭১১ খৃস্টাব্দে স্পেনে প্রবেশ করে। মুসলিমগণই ইউরোপের মানুষদেরকে জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষা দেন। মুসলিম স্পেনের গ্রানাডা, কর্ডোভা ও অন্যান্য শহরের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলের শিক্ষার্থীরা পড়তে আসত। প্রায় আট শত বৎসর মুসলিমগণ স্পেন শাসন করেন। শেষ দিকে তাদের মধ্যে আভ্যন্তরীন কোন্দল ছড়িয়ে পড়ে। ফলে খৃস্টানগণ ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন অঞ্চল মুসলিমদের

থেকে ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হয়। ৮৯৮ হিজরী মুতাবেক ১৪৯৩ খৃস্টাব্দে রাজা ফার্দিনান্দ ও রানী ইযাবেলার যৌথ খৃস্টান বাহিনী মুসলিমদের শেষ রাজধানী গ্রানাডা দখল করতে সক্ষম হয়। তারা এ সময়ে "এপ্রিল ফুল" নামে মুসলিমদের প্রতারণা করে তাদের মধ্যে গণহত্যা চালাতে সক্ষম হয়।

হাযেরীন, বিশ্বের যে কোনো ঐতিহাসিকের বই পড়ে দেখুন, ৮০০ বৎসরের শাসনামলে মুসলিমগণ কখনোই খৃস্টানদেরকে ধর্মান্তরিত করতে চেষ্টা করেন নি বা দেশ থেকে বের করে দেন নি। ইহূদী-খৃস্টানগণ মুসলিম শাসনামলে সর্বোচ্চ নাগরিক অধীকার ও ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করেছেন। কিন্তু মুসলিমদের পরাজিত করার পরে পাদরীগণের নেতৃত্বে খৃস্টানগণ মুসলিমদের উপর যে ভয়াবহ গণহত্যা চালিয়েছেন তার কোনো নযির বিশ্বের ইতিহাসে পাবেন না। লক্ষ লক্ষ মুসলিমকে মসজিদে আটকে আগুনে পুড়িয়ে, পাহাড় থেকে ফেলে, সমূদ্রের মধ্যে জাহাজ ডুবিয়ে ও গণজবাই অনুষ্ঠানে জবাই করে হত্যা করা হয়। অনেককে জোর করে ধর্মান্তরিত করা হয়। এরপরও প্রায় একশত বৎসর পরে ১৬০৯ খৃস্টাব্দের ৪ আগস্ট প্রায় ৫০ লক্ষ মুসলিমকে স্পেন থেকে বিতাড়িত করা হয়। কার্ডিনাল বা খৃস্টান ধর্মগুরুর আদেশে জ্ঞানবিজ্ঞানের মূল সূত্র লক্ষ লক্ষ আরবী পুস্তক পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়।

শুধু মুসলিমগণ নয়, ইহূদীদের উপরও খৃস্টানগণ একইরূপ অত্যাচার করে। অনেককে জোরকরে খৃস্টান বানায়। অধিকাংশকে স্পেন থেকে বিতাড়িত করে। বিতাড়িত ইহূদীরা ইউরোপের কোনো দেশে ঠাঁই না পেয়ে মুসলিম তুরস্কে এসে শান্তিতে বসবাস করতে থাকে। জুইশ এনসাইক্লোপিডিয়া ও অন্যান্য সকল এনসাইক্লোপিডিয়া ও ইতিহাস গ্রন্থে আপনারা এ সকল তথ্য দেখতে পাবেন।

হাযেরীন, এ হলো খৃস্টানদের এপ্রিল ফুলের ইতিহাস। যদি ইসলামে প্র্যাকটিক্যাল জোক নামে বা আনন্দ উল্লাসের নামে মিথ্যা বলার অনুমতি থাকত তাহলেও এ দিনে কোনো মুসলিম আনন্দ করতে পারতেন না। কারণ প্রথমত তা প্যাগান বা মুর্তিপূজকদের ধর্মীয় উৎসবের অংশ ও অনুকরণ। দ্বিতীয়ত এ দিবসটি মুসলিমদের জন্য শোকের ও প্রতিবাদের দিন, আনন্দের নয়। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হলো, হাসি-মস্করার নামে মিথ্যা বলা ইসলামে কঠিনভাবে নিষিদ্ধ ও হারাম।

হাযেরীন, মিথ্যা ইসলামে সবচেয়ে নিকৃষ্ট হারাম গোনাহগুলির অন্যতম। মিথ্যা বলা মুনাফিকের অন্যতম চিহ্ন। মিথ্যা সর্বাবস্থায় হারাম। সবচেয়ে জঘন্যতম মিথ্যা হলো আল্লাহ বা তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর নামে, হাদীসের নামে বা ধর্মের নামে মিথ্যা বলা। এরপর জঘন্য মিথ্যা হলো মিথ্যার মাধ্যমে কোনো মানুষের অধিকার নষ্ট করা, সম্পদ দখল করা বা মিথ্যা কথা বলে কিছু বিক্রয় করা। বিভিন্ন হাদীসে এরূপ কর্মের জন্য কঠিন অভিশাপ ও কঠিন শাস্তির কথা বলা হয়েছে।

হাযেরীন, ইসলামে হাসি-মস্করা, আনন্দ ও বিনোদনকে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সে জন্য মিথ্যা বলা বৈধ করা হয় নি। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে হাঁসি-মস্করা করতেন, কিন্তু মিথ্যা পরিহার করতেন। এক বৃদ্ধাকে বলেন, কোনো বুড়ো মানুষ তো জান্নাতে যাবে না। এতে বেচারী কান্নাকাটি শুরু করে। তখন তিনি বলেন, বুড়োবুড়িকে আল্লাহ জোয়ান বানিয়ে জান্নাতে দিবেন। একব্যক্তি তাঁর কাছে এসে সফরের জন্য একটি উট চান। তিনি বলেন, তোমাকে আমি একটি উটনীর বাচ্চা দিব। লোকটি হতাশ হয়ে বলে, বাচ্চাতে আমার কি হবে? তিনি বলেন, সকল উটই তো উটনীর বাচ্চা। এরূপ অনেক ঘটনা হাদীসে রয়েছে। সাহাবীগণও হাসি-মস্করা করতেন, তবে মিথ্যা বর্জন করতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ فَيَكْذِبُ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ

"যে ব্যক্তি মানুষ হাসানোর জন্য মিথ্যা বলে তার জন্য ধ্বংস! তার জন্য ধ্বংস! তার জন্য ধ্বংস!"[১]

---

[১] তিরমিযী, আস-সুনান ৪/৫৫৭; আবূ দাউদ, আস-সুনান ৪/২৯৭। তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا

"যে ব্যক্তি সর্বদা মিথ্যা বর্জন করে, মস্করা বা কৌতুক করতেও মিথ্যা বলে না, তার জন্য জান্নাতের মধ্যদেশে একটি বাড়ির জন্য আমি দয়িত্বগ্রহণ করলাম।"[১]

মস্করা বা কৌতুকচ্ছলে কাউকে ভয় পাইয়ে দেওয়াও জায়েয নয়। এক সফরে সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলেন। একজন সাহাবী ঘুময়ে পড়েছিলেন। তখন অন্য একজন যেয়ে তার তীরটি নিয়ে আসেন। এতে ঘুমন্ত ব্যক্তি ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে উঠে পড়েন। তার ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থা দেখে সাহাবীগণ হেসে উঠেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমরা হাসছ কেন? তারা ঘটনাটি বললে তিনি বলেন:

لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا

"কোনো মুসলিমের জন্য বৈধ নয় যে, সে অন্য মুসলিমকে ভয় পাইয়ে দিবে।"[২]

হাযেরীন, আমরা অনেক সময় কৌতুকভরে বা ভুলানোর জন্য শিশুদের সাথে মিথ্যা বলি। অথচ এরূপ মিথ্যাও মিথ্যা এবং গোনহের কাজ। শুধু তাই নয়, এরূপ মিথ্যার মাধ্যমে আমরা শিশুদেরকে মিথ্যায় অভ্যস্ত করে তুলি এবং মিথ্যার প্রতি তাদের ঘৃণা ও আপত্তি নষ্ট করে দিই। কিশোর সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু আমির বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের বাড়িতে বসে ছিলেন, এমতাবস্থায় আমার মা আমাকে ডেকে বলেন, এস তোমাকে একটি জিনিস দিব। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তুমি তাকে কি দিতে চাও? তিনি বলেন: আমি তাকে একটি খেজুর দিতে চাই। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

أَمَا إِنَّكِ لَوْ لَمْ تُعْطِه شَيْئًا كُتِبَتْ عَلَيْكِ كِذْبَةٌ

"তুমি যদি তাকে কিছু না দিতে তবে তোমার নামে একটি মিথ্যার গোনাহ লেখা হতো।"[৩]

হাযেরীন, নিজের সাথে নিজে মিথ্যা বলাও বৈধ নয়। আর এজন্যই কেউ যদি নিজের মনে শুধু নিজের জন্যই কোনো বিষয়ের কসম করে যে, আমি অমুক কাজটি করব বা করব না, কিন্তু পরে তার ব্যক্তিগত কসম না রাখতে পারে তবে তাকে কসমের কাফ্ফারা দিতেই হবে। কাজেই নিজের মনে নিজের জন্য কোনো সিদ্ধান্ত নিলে তা পূরণ করুন, নিজের মনকে মিথ্যায় অভ্যস্থ করবেন না।

হাযেরীন, শুধু নিশ্চিত মিথ্যাই নয়, মিথ্যা হওয়ার সম্ভাবনা আছে এরূপ কথা বলতে বা যা কিছু শোনা যায় সবই বলাবলি করতে নিষেধ করেছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ। তিনি বলেন:

كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ

"একজন মানুষের মিথ্যাবাদি হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনবে তাই বলবে।"[৪]

হাযেরীন, এ অপরাধটি আমরা সকলেই করি। ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র, বিশ্ব ইত্যাদি সম্পর্কে মুখরোচক গল্প, গণমাধ্যমের খবর ইত্যাদি যা কিছু শুনি তাই বলি। অথচ বিষয়টি সঠিক কিনা সে সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে কথা বলা ঠিক নয়। যদি কোনো মানুষের ব্যক্তিগত মর্যাদাহানী বা গীবত জাতীয় কিছু না হয়, তবে সে ক্ষেত্রে বড়জোর বলা যেতে পারে যে, অমুক একথা বলেছে বলে শুনেছি, সত্য মিথ্যা বলতে পারি না।

হাযেরীন, সর্বদা সত্য বলুন। সত্যপ্রীতি আপনাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ

---

[১] আবূ দাউদ, আস-সুনান ৪/২৫৩; হাইসামী মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১৫৭। হাদীসটি হাসান। সহীহুত তারগীব ১/৩৩, ৩/৬, ৭১।

[২] আবূ দাউদ, আস-সুনান ৪/৩০১; আলবানী, সহীহুত তারগীব ৩/৪২-৪৩। হাদীসটি সহীহ।

[৩] আবূ দাউদ, আস-সুনান ৪/২৯৮; আলবান, সহীহুত তারগীব ৩/৭৪। হাদীসটি হাসান।

[৪] মুসলিম, আস-সহীহ ১/১০-১১।

وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا

"তোমরা সর্বদা সত্য আঁকড়ে ধরবে; কারণ সত্য পুণ্যের দিকে ধাবিত করে আর পুণ্য জান্নাতে নিয়ে যায়। একজন মানুষ যখন সর্বদা সত্য বলতে থাকে এবং সত্য বলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে তখন সে এক পর্যায়ে আল্লাহর কাছে "সিদ্দীক" বা মহাসত্যবাদী বলে লিখিত হয়ে যায়। আর তোমরা মিথ্যা সর্বোতভাবে বর্জন করবে। কারণ মিথ্যা পাপের পথে পরিচালিত করে এবং পাপ জাহান্নামে নিয়ে যায়। একজন মানুষ যখন মিথ্যা বলে এবং মিথ্যা বলার সুযোগ খুঁজে বেড়ায় তখন সে এক পর্যায়ে আল্লাহর নিকট মহামিথ্যাবাদী বলে লিখিত হয়ে যায়।[১]

হাযেরীন, এপ্রিল মাসে আমরা আরেকটি উৎসব করি, তা হলো ১৪ই এপ্রিল বা পহেলা বৈশাখে বাংলা নববর্ষ পালন করা। আমাদের দেশে প্রচলিত বঙ্গাব্দ বা বাংলা সন মূলত ইসলামী হিজরী সনেরই একটি রূপ। ভারতে ইসলামী শাসনামলে হিজরী পঞ্জিকা অনুসারেই সকল কাজকর্ম পরিচালিত হতো। মূল হিজরী পঞ্জিকা চান্দ্র মাসের উপর নির্ভরশীল। চান্দ্র বৎসর সৌর বৎসরর চেয়ে ১১/১২ দিন কম হয়। কারণ সৌর বৎসর ৩৬৫ দিন, আর চান্দ্র বৎসর ৩৫৪ দিন। একারণে চান্দ্র বৎসরে ঋতুগুলি ঠিক থাকে না। আর চাষাবাদ ও এজাতীয় অনেক কাজ ঋতুনির্ভর। এজন্য ভারতের মোগল সম্রাট আকবারের সময়ে প্রচলিত হিজরী চান্দ্র পঞ্জিকাকে সৌর পঞ্জিকায় রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

হাযেরীন, সম্রাট আকবার তার দরবারের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও জ্যোতির্বিদ আমির ফতুল্লাহ শিরাজীকে হিজরী চান্দ্র বর্ষপঞ্জীকে সৌর বর্ষপঞ্জীতে রূপান্তরিত করার দায়িত্ব প্রদান করেন। ৯৯২ হিজরী মোতাবেক ১৫৮৪ খৃস্টাব্দে সম্রাট আকবার এ হিজরী সৌর বর্ষপঞ্জীর প্রচলন করেন। তবে তিনি উনত্রিশ বছর পূর্বে তার সিংহাসন আরোহনের বছর থেকে এ পঞ্জিকা প্রচলনের নির্দেশ দেন। এজন্য ৯৬৩ হিজরী সাল থেকে বঙ্গাব্দ গণনা শুরু হয়। ইতোপূর্বে বঙ্গে প্রচলিত শকাব্দ বা শক বর্ষপঞ্জির প্রথম মাস ছিল চৈত্র মাস। কিন্তু ৯৬৩ হিজরী সালের মুহার্‌রাম মাস ছিল বাংলা বৈশাখ মাস, এজন্য বৈশাখ মাসকেই বঙ্গাব্দ বা বাংলা বর্ষপঞ্জির প্রথম মাস এবং ১লা বৈশাখকে নববর্ষ ধরা হয়।

হাযেরীন, তাহলে বাংলা সন মূলত হিজরী সন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হিজরত থেকেই এ পঞ্জিকার শুরু। ১৪১৫ বঙ্গাব্দ অর্থ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হিজরতের পর ১৪১৫ বৎসর। ৯৬২ চান্দ্র বৎসর ও পরবর্তী ৪৫৩ বৎসর সৌর বৎসর। সৌর বৎসর চান্দ্র বৎসরের চেয়ে ১১/১২ দিন বেশি এবং প্রতি ৩০ বৎসরে চান্দ্র বৎসর এক বৎসর বেড়ে যায়। এজন্য ১৪২৮ হিজরী সাল মোতাবেক বাংলা ১৩১৪-১৫ সাল হয়।

হাযেরীন, মোগল সময় থেকেই পহেলা বৈশাখে বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে কিছু অনুষ্ঠান করা হতো। প্রজারা চৈত্রমাসের শেষ পর্যন্ত খাজনা পরিশোধ করতেন এবং পহেলা বৈশাখে জমিদারগণ প্রজাদের মিষ্টিমুখ করাতেন এবং কিছু আনন্দ উৎসব করা হতো। এছাড়া বাংলার সকল ব্যবসায়ী ও দোকানদার পহেলা বৈশাখে 'হালখাতা' করতেন। কিন্তু বর্তমানে পহেলা বৈশাখ উপলক্ষ্যে এমন কিছু কর্মকাণ্ড করা হচ্ছে যা কখনোই পূর্ববর্তী সময়ে বাঙালীরা করেন নি এবং যা বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় মূল্যবোধের সাথে প্রচণ্ডভাবে সাংঘর্ষিক। পহেলা বৈশাখের নামে বা নববর্ষ উদযাপনের নামে যুবক-যুবতী, কিশোর-কিশোরীদেরকে অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। আজ থেকে কয়েক বছর আগেও এদেশের মানুষেরা যা জানত না এখন নববর্ষের নামে তা আমাদের সংস্কৃতির অংশ বানানো হচ্ছে।

---

[১] বুখারী, আস-সহীহ ৫/২২৬১; মুসলিম, আস-সহীহ ৪/২০১২-২০১৩; তিরমিযী, আস-সুনান ৪/৩৪৭।

হাযেরীন, বাংলার প্রাচীন মানুষের ছিলেন দ্রাবিড় বা হযরত নূহ (আ)-এর বড় ছেলে সামের বংশধর। খৃস্টপূর্ব ১৫০০ সালের দিকে ইয়াফিসের সন্তানদের একটি গ্রুপ আর্য নামে ভারতে আগমন করে। ক্রমান্বয়ে তারা ভারত দখল করে ও আর্য ধর্ম ও কৃষ্টিই পরবর্তীতে "হিন্দু" ধর্ম নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। ভারতের দ্রাবিড় ও অনার্য ধর্ম ও সভ্যতাকে সর্বদা হাইয্যাক করেছেন আর্যগণ। এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো "বাঙালী" সংস্কৃতি ও কৃষ্টিকে হাইয্যাক করা। আর্যগণ বাংলাভাষা ও বাঙালীদের ঘৃণা করতেন। বেদে ও পুরাণে বাংলাভাষাকে পক্ষীর ভাষা ও বাঙালীদেরকে দস্যু, দাস ইত্যাদি বলা হয়েছে। মুসলিম সুলতানগণের আগমনের পরে তারা বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। বাঙালী সংস্কৃতি বলতে বাংলার প্রাচীন লোকজ সংস্কৃতি ও মুসলিম সংস্কৃতির সংমিশ্রণ বুঝানো হতো। কিন্তু ক্রমান্বয়ে আর্যগণ "বাঙালীত্ব" বলতে হিন্দুত্ব বলে মনে করেন ও দাবি করেন। ভারতের হিন্দু জাতীয়তাবাদিগণ Hindutva অর্থাৎ ভারতীয়ত্ব বা "হিন্দুত্ব" হিন্দু ধর্মত্ব বলে দাবি করেন এবং ভারতের সকল ধর্মের মানুষদের হিন্দু ধর্মের কৃষ্টি ও সভ্যতা গ্রহণ বাধ্যতামূলক বলে দাবি করেন। তেমনিভাবে বাংলায় আর্য পণ্ডিতগণ বাঙালীত্ব বলতে হিন্দুত্ব ও বাঙালী জাতীয়তাবাদ বলতে হিন্দু জাতীয়তাবাদ এবং বাঙালী সংস্কৃতি বলতে হিন্দু সংস্কৃতি বলে মনে করেন। এজন্যই তারা মুসলমানদের বাঙালী বলে স্বীকার করেন না। শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত গল্পে আমরা দেখেছি যে বাঙালী বলতে শুধু বাঙালী হিন্দুদের বুঝানো হয়েছে এবং মুসলমানদেরকে তাদের বিপরীতে দেখানো হয়েছে। এ মানসিকতা এখনো একইভাবে বিদ্যমান। পশ্চিমবঙ্গে মুসলিমদেরকে "বাঙালী" পরিচয় দিলে বা জাতিতে "বাঙালী" লিখলে ঘোর আপত্তি করা হয়। এ মানসিকতার ভিত্তিতেই "পহেলা বৈশাখে" বাঙালী সংস্কৃতির নামে পৌত্তলিক বা অশ্লীল কৃষ্টি ও সংস্কৃতি আমাদের মধ্যে প্রচার করা হচ্ছে।

হাযেরীন, এক সময় বাংলা বর্ষপঞ্জি এদেশের মানুষের জীবনের অংশ ছিল। তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য কৃষি ও কর্ম এ পঞ্জিকা অনুসারেই চলত। এজন্য পহেলা বৈশাখ হালখাতা বা অনুরূপ কিছু আনন্দ বা অনুষ্ঠান ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু বর্তমানে আমাদের জীবনের কোথাও বঙ্গাব্দের কোনো প্রভাব নেই। কাগজে কলমে যাই লেখা হোক, প্রকৃতপক্ষে আমরা নির্ভর করছি খৃস্টীয় পঞ্জিকার উপর। যে বাংলা বর্ষপঞ্জি আমরা বছরের ৩৬৪ দিন ভুলে থাকি, সে বর্ষপঞ্জির প্রথম দিনে আমরা সবাই "বাঙালী" সাজার চেষ্টা করে এ নিয়ে ব্যাপক হইচই করি। আর এ সুযোগে দেশীয় ও বিদেশী বেনিয়াগণ ও আধিপত্যবাদীগণ তাদের ব্যবসা বা আধিপত্য প্রসারের জন্য এ দিনটিকে কেন্দ্র করে বেহায়াপনা, অশ্লীলতা ও অনৈতিকতার প্রচার করে।

হাযেরীন, পাশ্চাত্য সভ্যতার অনেক ভাল দিক আছে। কর্মস্পৃহা, মানবাধিকার, আইনের শাসন ইত্যাদি অনেক গুণ তাদের মধ্যে বিদ্যমান। পাশাপাশি তাদের কিছু দোষ আছে যা তাদের সভ্যতার ভাল দিকগুলি ধ্বংস করে দিচ্ছে। এ দোষগুলির অন্যতম হলো মাদকতা ও অশ্লীলতা। আমরা বাংলাদেশের মানুষের পাশ্চাত্যের কোনো ভালগুণ আমাদের সমাজে প্রসার করতে পারি নি বা চাই নি। তবে তাদের অশ্লীলতা, বেহায়াপনা ও মাদকতার ধ্বংসাত্মক দিকগুলি আমরা খুব আগ্রহের সাথে গ্রহণ করতে ও প্রসার করতে চাচ্ছি। এজন্য খৃস্টীয় ক্যালেন্ডারের শেষ দিনে ও প্রথম দিনে থার্টিফার্স্ট নাইট ও নিউ-ইয়ারস ডে বা নববর্ষ উপলক্ষ্যে আমাদের বেহায়পনার শেষ থাকে না।

পক্ষান্তরে, আমাদের দেশজ সংস্কৃতির অনেক ভাল দিক আছে। সামাজিক শিষ্টাচার, সৌহার্দ্য, জনকল্যাণ, মানবপ্রেম ইত্যাদি সকল মূল্যবোধ আমরা সমাজ থেকে তুলে দিচ্ছি। পক্ষান্তরে দেশীয় সংস্কৃতির নামে অশ্লীলতার প্রসার ঘটানো হচ্ছে।

হাযেরীন, বেপর্দা, বেহায়াপনা, অশ্লীলতা, মাদকতা ও অপরাধ একসূত্রে বাধা। যুবক-যুবতীদেরকে অবাধ মেলামেশা ও বেহায়াপনার সুযোগ দিবেন, অথচ তারা অশ্লীলতা, ব্যভিচার, এইডস,

মাদকতা ও অপরাধের মধ্যে যাবে না, এরূপ চিন্তা করার কোনো সুযোগ নেই। অন্যান্য অপরাধের সাথে অশ্লীতার পার্থক্য হলো কোনো একটি উপলক্ষ্যে একবার এর মধ্যে নিপতিত হলে সাধারণভাবে কিশোর-কিশোরী ও যুবক-যুবতীরা আর এ থেকে বেরোতে পারে না। বরং ক্রমান্বয়ে আরো বেশি পাপ ও অপরাধের মধ্যে নিপতিত হতে থাকে। কাজেই নিজে এবং নিজের সন্তান ও পরিজনকে সকল অশ্লীলতা থেকে রক্ষা করুন। আল্লাহ্ বলেছেন: "তোমরা নিজেরা জাহান্নাম থেকে আত্মরক্ষা কর এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা কর।" রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং তোমাদের প্রত্যেককেই তার দায়িত্বাধীনদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।

হাযেরীন, পহেলা বৈশাখ বা অন্য কোনো উপলক্ষ্যে ছেলেমেয়েদেরকে বেপর্দা ও বেহায়পনার সুযোগ দিবেন না। তাদেরকে বুঝান ও নিয়ন্ত্রণ করুন। আপনি মসজিদে নামায আদায় করছেন আর আপনার ছেলেমেয়ে পহেলা বৈশাখের নামে বেহায়াভাবে মিছিল বা উৎসব করে বেড়াচ্ছে। আপনার ছেলেমেয়ের পাপের জন্য আপনার আমলনামায় গোনাহ্ জমা হচ্ছে। শুধু তাই নয়। অন্য পাপ আর অশ্লীলতার পার্থক্য হলো, যে ব্যক্তি তার স্ত্রী-সন্তানদের বেহায়াপনা ও অশ্লীলতার সুযোগ দেয় তাকে "দাইউস" বলা হয় এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ বারংবার বলেছেন যে, দাইউস ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

হাযেরীন, নিজেকে এবং নিজের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করার পাশাপাশি মুমিনের দায়িত্ব হলো সমাজের মানুষদেরকে সাধ্যমত ন্যায়ের পথে ও অন্যায়ের বর্জনে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। কাজেই পহেলা বৈশাখ ও অন্য যে কোনো উপলক্ষ্যে ছেলেমেয়েদের অবাধ মেলামেশা ও বেহায়াপনার ক্ষতি, অন্যায় ও পাপের বিষয়ে সবাইকে সাধ্যমত সচেতন করুন। যদি আপনি তা করেন তবে কেউ আপনার কথা শুনুক অথবা না শুনুক আপনি আল্লাহর কাছে অফুরন্ত সাওয়াব লাভ করবেন। আর যদি আপনি তা না করেন তবে এ পাপের গযব আপনাকেও স্পর্শ করবে। কুরআন ও হাদীসে বিষয়টি বারংবার বলা হয়েছে।

হাযেরীন, ব্যবসায়িক, প্রশাসনিক, রাজনৈতিক বা সামাজিক কোনো স্বার্থে অনেক মুসলিম পহেলা বৈশাখ উপলক্ষ্যে ছেলেমেয়েদের অবাধ মেলামেশা ও বেহায়াপনার পথ খুলে দেওয়ার জন্য মিছিল, মেলা ইত্যাদির পক্ষে অবস্থান নেন। আপনার দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য এরচেয়ে ভয়ঙ্কর আর কিছুই হতে পারে না। অশ্লীলতা প্রসারের ভয়ঙ্কর পাপ ছাড়াও ভয়ঙ্কর শাস্তির কথা শুনুন:

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

"যারা চায় যে, মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রচার ঘটুক তাদের জন্য পৃথিবীতে এবং আখিরাতে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আর আল্লাহ্ জানেন, তোমরা জান না।"[১]

হাযেরীন, সাবধান হোন! সতর্ক হোন! আপনি কি আল্লাহর সাথে পাল্লা দিবেন? আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমে আপনি কি জয়ী হবেন? কখন কিভাবে আপনার ও আপনার পরিবারের জীবনে "যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি" নেমে আসবে তা আপনি বুঝতেও পারবেন না। আপনার রাজনৈতিক, সামাজিক, ব্যবসায়িক বা অন্য কোনো স্বার্থ উদ্ধারের জন্য অন্য পথ দেখুন। অন্য বিকল্প চিন্তা করুন। তবে কখনোই অশ্লীলতা প্রসার ঘটে এরূপ কোনো বিষয়কে আপনার স্বার্থ উদ্ধারের বাহন বানাবেন না।

মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে হেফাযত করুন। আমীন!!

---

[১] সূরা ২৪ নূর: ১৯ আয়াত।

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

أَمَّا بَعْدُ، فَيَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا

وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ

بَارَكَ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ فِيْ الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ. وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ. أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ، فَاسْتَغْفِرُوْهُ وَتُوْبُوْا إِلَيْهِ، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.

ঈদুল ফিতরের খুতবা: আরবী ১ম খুতবা

اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَـــرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ. إِنَّ الْحَمْـــدَ لِلَّــــهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَـــهُ وَمَـــنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّـــهُ وَحْـــدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. صَلَّى اللَّـــهُ عَلَيْـــهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّـــهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَـــا النَّـــاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِـــدَةٍ وَخَلَـــقَ مِنْهَـــا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّـــذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَـــا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا. يُـصْلِحْ لَكُـــمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَـــدْ

فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

أَمَّا بَعْدُ، فَيَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ، قَالَ اللهُ تَعَالَىَ: وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ لاَ إِلـــهَ إِلاَّ اللهُ، واللهُ أَكْبَـــرُ، اَللهُ أَكْبَرُ وَلِلهِ الْحَمْدُ.

وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِكُلِّ قَـــوْمٍ عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا

بَارَكَ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ فِيْ الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ. وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ. أَقُـــوْلُ قَـــوْلِيْ هَـــذا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُـــلِّ ذَنْـــبٍ، فَاسْتَغْفِرُوْهُ وَتُوْبُوْا إِلَيْهِ، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.

ঈদুল ফিতরের খুতবা: আরবী ২য় খুতবা

اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ. إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ.

أَمَّا بَعْدُ، فَيَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

وَارْضَ اللّهُمَّ عَنِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِيْنَ، خُصُوصاً مِنْهُمُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ، أَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، وَعَنِ

التَّابِعِيْنَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ، وَعَنَّا مَعَهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ اللهُ، واللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ وَلِلهِ الْحَمْدُ.

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.

ঈদুল ফিতরের খুতবাঃ বাংলা

হাযেরীন, আল্লাহর তাকবীর বলুন এবং প্রশংসা করুন যে, তিনি আমাদের রামাদানের সিয়াম পূর্ণ করে ঈদুল ফিতরের সালাত আদায়ের তাওফীক দিলেন। আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। ওয়াল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার ওয়ালিল্লাহিল হামদ।

হাযেরীন, ইসলাম প্রকৃতির ধর্ম। মানুষের জন্য যা মঙ্গলকর ও কল্যাণকর তা ইসলামের বিধান। ইসলাম মানুষদেরকে নিরানন্দ হতে, কঠোর হতে, অনুৎফুল্ল হতে নির্দেশ দেয় না। বরং ইসলাম মানুষকে মানবীয় প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে আনন্দ উৎসব করতে নির্দেশ দেয়। ইসলাম শুধুমাত্র দৈহিক বা জৈবিক আনন্দ ফুর্তির উৎসাহ না দিয়ে মানুষের প্রকৃতির সাথে মিল রেখে দৈহিক-জৈবিক, মানসিক, আত্মিক ও সামাজিক আনন্দের সমন্বয়কে উৎসাহ দেয়। ইসলামের 'ঈদের' আনন্দকে মানবতা, আধ্যাতিকতা ও সামাজিকতার সাথে সমন্বিত করেছে। একমাস 'সিয়াম' পালনের পরে 'ঈদের দিবস' নির্ধারণ করেছে। 'ঈদের আনন্দ-উৎসবের শুরুতে আল্লাহর কাছে সালাত আদায় ও দোয়ার ব্যবস্থা করেছে। যাকাত ও ফিতরা প্রদানের মাধ্যমে সমাজের গরীবদেরকে সহ পুরো সমাজকে ঈদের আনন্দে শরীক করার ব্যবস্থা করেছে। পাশাপাশি ঈদের দিনে সামাজিক শুভেচ্ছা বিনিময়, বেড়ানো, খেলাধুলা, হাসি-আনন্দ ইত্যাদি নির্দোষ বিনোদনের উৎসাহ প্রদান করেছে।

হাযেরীন, ঈদের মাঠে হেঁটে যাওয়া সুন্নাত ও উত্তম। এছাড়া এক রাস্তা দিয়ে যাওয়া ও অন্য রাস্তা দিয়ে ফিরে আসা সুন্নাত। কারণ এতে সকলের সাথে দেখা সাক্ষাত হয়, ভ্রাতৃত্ব, সাম্য ও ভালবাসা প্রকাশ পায়। ঈদের পরে শুভেচ্ছা বিনিময় ইসলামী আদব। জুবাইর ইবনু নুফাইর বলেন,

كان أصحاب رسول الله ﷺ إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك.

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাহাবীগণ ঈদের দিনে একে অপরকে বলতেন: তাকাব্বালাল্লাহু মিন্না ওয়া মিনকা: আল্লাহ আমাদের এবং আপনার আমল কবুল করুন।"[১] আমরা সাধারণত 'ঈদ মুবারক' ইত্যাদি বলি। এগুলিও ভাল। তবে সাহাবীদের বাক্যগুলি ব্যবহার করাই উত্তম।

হাযেরীন, সূর্য পুরোপুরি উদিত হওয়ার প্রায় আধ ঘন্টা পর থেকে দুপুরের আগ পর্যন্ত ঈদুল ফিত্‌র-এর সালাত আদায় করা যায়। ঈদুল ফিতরের সালাত একটু দেরী করে আদায় করা এবং ঈদুল আযহার সালাত একটু তাড়াতাড়ি আদায় করা সুন্নাত। কারণ ঈদুল ফিতরের দিনে সালাতের আগেই ফিতরা প্রদান করতে হবে। পক্ষান্তরে ঈদুল আযহার দিনে সালাত আদায়ের পরে কুরবানী করা, বন্টন করা ইত্যাদি অনেক দায়িত্ব থাকে। বিভিন্ন হাদীসের আলোকে আমরা বুঝতে পরি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সূর্য উদিত হওয়ার এক থেকে দেড় ঘন্টার মধ্যে ঈদুল ফিতরের সালাত আদায় করতেন। আর আধা ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার মধ্যে ঈদুল আযহার সালাত আদায় করতেন।

হাযেরীন, সালাতুল ঈদে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত ছিল ঈদের মাঠে পৌঁছে প্রথমে ঈদের সালাত আদায় করা। এরপর তিনি মুসল্লীদের উদ্দেশ্যে খুতবা প্রদান করতেন। এরপর উপস্থিত মহিলা মুসল্লীদের কাছে যেয়ে পৃথকভাবে তাদেরকে কিছু নসীহত করতেন।

হাযেরীন, ঈদের দিনে শরীরচর্চা ও বিনোদনের জন্য খেলাধুলা ও আনন্দে উৎসাহ দিয়েছেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)। আয়েশা (রা) বলেন,

---

[১] ইবনু হাজার আসকালানী, ফাতহুল বারী ২/৪৪৬।

رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَسْتُرُنِي وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ دَعْهُمْ أَمْنًا بَنِي أَرْفِدَةَ يَعْنِي مِنْ الأَمْنِ... وَكَانَ يَوْمَ عِيدٍ يَلْعَبُ السُّودَانُ بِالدَّرَقِ وَالْحِرَابِ فَإِمَّا سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَإِمَّا قَالَ تَشْتَهِينَ تَنْظُرِينَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ خَدِّي عَلَى خَدِّهِ وَهُوَ يَقُولُ دُونَكُمْ يَا بَنِي أَرْفِدَةَ. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ: لِتَعْلَمِ الْيَهُودُ أَنَّ فِي دِينِنَا فُسْحَةً إِنِّي أُرْسِلْتُ بِحَنِيفِيَّةٍ سَمْحَةٍ

"আমি দেখেছি, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে আড়াল করে রেখেছিলেন আর আমি মসজিদের মধ্যে ক্রীড়ারত হাবশীদের দিকে তাকিয়ে দেখছিলাম। এ সময় উমার (রা) এসে তাদের ধমক দেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, উমার, ওদের ছেড়ে দাও। ছেলেরা, তোমরা নিশ্চিন্তে খেল।... অন্য বর্ণনায়: ঈদের দিন ছিল। হাবশীরা ঢাল ও সড়কি নিয়ে খেলা করছিল। সম্ভবত আমি তাঁকে অনুরোধ করেছিলাম, অথবা তিনিই আমাকে বললেন, তুমি কি খেলা দেখতে চাও? আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি আমাকে তাঁর পিছনে দাঁড় করালেন। আমি তাঁর চিবুকের উপর আমার চিবুক রেখে দেখতে লাগলাম। তিনি ক্রীড়ারত হাবশীদেরকে উৎসাহ দিয়ে বলছিলেন, ছেলেরা, খেলে যাও। তিনি আরো বলেন, ইহূদীরা জানুক যে, আমাদের ধর্মে প্রশস্ততা আছে। আমাকে প্রশস্ত ধৈর্যশীল দীনে হানীফ সহ প্রেরণ করা হয়েছে।"[১]

হাযেরীন, বর্তমানে ঈদের দিনে এবং অন্যান্য সময়ে বিনোদনের নামে, খেলাধুলার নামে বেহায়াপনা, বেল্লেলপনা ও অশ্লীলতা সমাজকে গ্রাস করছে। এছাড়া শরীরচর্চামূলক খেলাধুলার স্থান দখল করছে অলস বিনোদন। বিনোদন বা আনন্দের নামে যুবক-কিশোরদেরকে ঘন্টার পর ঘন্টা টেলিভিশন, কম্পিউটার বা মোবাইল নিয়ে বসে থাকা বন্ধ করা জরুরী। এজন্য বিকল্প হিসেবে আমাদের কিশোর ও যুবকদেরকে শরীর ও মনের সুষম উন্নয়নের জন্য শরীরচর্চামূলক নির্মল বিনোদনের ব্যবস্থা করতে হবে। আল্লাহ আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নির্দেশের সঠিক অনুসারী হওয়ার তাওফীক দান করেন।

হাযেরীন, সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হলো ঈদের দিনে কঠিন পাপে লিপ্ত হওয়া। সারামাস সিয়াম ও কিয়ামুল্লাইল পালন করে ঈদের দিনে অনেকেই সিনেমা, গানবাজনা ও বেহায়াপনায় লিপ্ত হন। কিশোরী, যুবতী ও বয়স্ক মহিলারা ঈদের পোশাক ও অলঙ্কার প্রদর্শনীর জন্য দেহ ও পোশাক অনাবৃত করে রাস্তায় ঈদের বেড়ানোর জন্য বের হন। হাযেরীন, মুসলিম নারীর জন্য মাহরাম, অর্থাৎ যাদের সাথে বিবাহ বৈধ নয় এরূপ নিকটতম আত্মীয় ছাড়া অন্য সকল পুরুষের সামনে ও বাড়ির বাইরে বের হতে মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঢেকে রাখা ফরয। যখন কোনো মহিলা মাথার চুল, গলা, কান, ঘাড়, কনুই বাজু ইত্যাদি অঙ্গ অনাবৃত রেখে বাইরে বের হন তখন প্রতিটি মুহূর্তে তার আমলনামায় ব্যভিচারের মত একটি ভয়ঙ্কর মহাপাপ লেখা হয়। রামাদানের একটি মাসে যা কিছু নেক আমল করা হয়েছে তা কি সবই আমরা এভাবে একদিনের পাপে নষ্ট করে দিব?

হাযেরীন, মেয়েদের জন্য যেমন মাথা ও দেহ আবৃত করা ফরয, তেমনি তাদের অভিভাবকদের উপর ফরয দায়িত্ব হলো তাদেরকে পর্দা করানো। ঈদের নামায আদায় করা ওয়াজিব। আপনার মাথায় টুপি দেওয়া সুন্নাত। কিন্তু আপনার স্ত্রী ও মেয়ের মাথায় কাপড় দেওয়া ফরয। আপনি কি ফরয পরিত্যাগ করে সুন্নাত এবং ওয়াজিব আদায় করে জান্নাতী হতে চান? আমাদের সকলেরই দায়িত্ব সাধ্যমত আল্লাহর হুকুম মান্য করার প্রাণপন চেষ্টা করা। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন। আমীন।

---

[১] বুখারী, আস-সহীহ ১/১৭৩, ৩২৩, ৩৩৫, ৩/১০৬৪, ১২৯৮, ৫/২০০৬; মুসলিম, আস-সহীহ ২/৬০৮-৬০৯; ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ২/৪৪৪।

হাযেরীন, রামাদানের পূর্ণ একটি মাস ইবাদত করে আজ আপনারা সালাতুল ঈদের মাধ্যমে রামাদানকে বিদায় দিচ্ছেন। কিন্তু রামাদানের হাদিয়া প্রত্যাখ্যান করবেন না, ভালবেসে গ্রহণ করুন। রামাদান আমাদের জন্য তিনটি হাদিয়া নিয়ে আসেঃ সিয়াম, কিয়াম ও কুরআন। এগুলির সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন না। প্রতিমাসে কিছু নফল সিয়াম আদায় করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, রামাদানের সিয়াম পালন করার পরে যদি কেউ শাওয়াল মাসে ছয়টি সিয়াম পালন করে তবে সে সারাবৎসর সিয়াম পালনের সাওয়াব লাভ করবে। আজ শাওয়ালের এক তারিখ। আগামী কাল থেকে পরবর্তী ২৭/২৮ দিনের মধ্যে যে কোনো সময় এ ছয়টি সিয়াম পালন করা যায়। এছাড়া যুলহাজ্জ মাসের প্রথম নয় দিন, বিশেষত আরাফাতের দিন, আশুরার দিন ও তার আগে এক দিন বা পরে এক দিন, প্রতি আরবী মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ, প্রতি সপ্তাহে সোমবার ও বৃহস্পতিবার নফল সিয়াম পালনের বিশেষ সাওয়াব ও ফযীলতের কথা সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এছাড়াও সুযোগমত নফল সিয়াম গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত।

হাযেরীন, কিয়ামুল্লাইল ছাড়বেন না। বছরের প্রতিদিনই কিয়ামুল্লাইল বা তাহাজ্জুদ আদায়ের চেষ্টা করবেন। যদি শেষ রাতে উঠা কষ্টকর হয় তবে ঘুমানোর আগে ওযু করে অন্তত দু/চার রাকআত সালাত আদায় করে সামান্য কিছু সময় যিকর ও দরুদ পাঠ করে, আল্লাহর কাছে সারাদিনের গোনাহের তাওবা করে, সারাদিনের নিয়ামতের শুকরিয়া করে মনের আবেগ তাঁকে জানিয়ে শুয়ে পড়বেন।

হাযেরীন, কুরআন ছেড়ে দেবেন না। কুরআন তিলাওয়াত করা এবং কুরআন বুঝা গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। রামাদানে আমরা অন্তত একবার পূর্ণ কুরআন শুনেছি। কিন্তু না বুঝার কারণে আমাদের মধ্যে সত্যিকার সততা ও তাকওয়া তৈরি হয় নি। কোনো ভাল আলিমের কাছে সরাসরি পড়ে বা ভাল আলিমদের অনূদিত কুরআনের অর্থানুবাদ পড়ে কুরআনের অর্থ বুঝার চেষ্টা করুন। ইনশা আল্লাহ হৃদয়ের আনন্দ ও তৃপ্তি বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে এবং জীবনের ধারা পাল্টে যাবে।

হাযেরীন, রামাদানে আমরা প্রায় দু হাজার বার সূরা ফাতিহা পড়েছি বা শুনেছি। একটু চিন্তা করুন। সূরা ফাতিহা শুরু করা হয়েছে প্রশংসা দিয়ে। আর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতাই হলো সফল জীবনের পথ। আমরা সাধারণত জীবনের নিয়ামত ও ভাল বিষয়গুলি ভুলে যাই এবং কষ্টগুলি মনে রাখি। কিন্তু এর উল্টোটাই ইসলামের শিক্ষা। কষ্ট তো সকলের জীবনেই থাকবে। এজন্য কষ্ট অনুভব হলেও পাশাপাশি জীবনে আল্লাহর নিয়ামতগুলি হৃদয় দিয়ে অনুভব করে প্রাণভরে "আলহামদু লিল্লাহ" বলতে অভ্যস্থ হোন। নিয়ামতের ও কৃতজ্ঞতার অনুভূতি দিয়ে হৃদয়কে পূর্ণ করুন। এতে নিয়ামত বৃদ্ধি পাবে।

ইয়াওমুদ্দীন বা প্রতিফল দিবসের কথা সর্বদা স্মরণ রাখুন। দুনিয়ার মানুষ সমাজ বা রাষ্ট্র অধিকাংশ সময় আমাদের ভাল কাজের মূল্যায়ণ করতে ব্যর্থ হয় এবং অন্যায়ের শাস্তি দিতেও ব্যর্থ হয়। দুনিয়ার মানুষকে ফাঁকি দেওয়া যায়। কিন্তু "মালিকি ইয়াওমিদ্দীন" বা বিচার দিনের মালিককে ফাঁকি দেওয়া যায় না। দুনিয়ার কেউ না মূল্যায়ন করলেও তিনি আমার প্রতিটি কল্যাণ কর্মের পূর্ণ পুরস্কার দিবেন এবং প্রতিটি অন্যায়ের শাস্তি দিবেন। এ অনুভূতি যদি আমাদের মধ্যে উজ্জীবিত থাকে তাহলে আমাদের দেশের দুর্নীতি ও অন্যায় প্রায় নির্মুল হয়ে যাবে। সমাজ থেকে না হলেও, অন্তত আমরা প্রত্যেকে নিজের জীবনকে মালিকি ইয়াওমিদ্দীনের অসন্তুষ্টি ও শাস্তি থেকে রক্ষা করতে চেষ্টা করি।

হাযেরীন, রামাদানে আমরা প্রায় দুহাজার বার বলেছি বা শুনেছি, ইইয়াকা নাবুদু ওয়া ইইয়াকা নাসতায়ীন। আমরা কেবলমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য চাই। কথাটি আমাদের মনে রাখতে হবে। বিপদে আপদে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে সাহায্য চাওয়া, ত্রাণ ভিক্ষা

করা, অন্য কাউকে ডাকা, অন্য কারো নেক দৃষ্টির আশা রাখা বা অন্য কেউ ইচ্ছা করলে বিপদ কাটিয়ে দিতে পারেন বলে বিশ্বাস করা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিরকে পরিণত হয়। একমাত্র আল্লাহকেই ডাকুন এবং তারই উপর নির্ভর করুন। তিনি না দিলে কেউ দিতে পারে না এবং তিনি দিলে কেউ ঠেকাতে পারে না।

হাযেরীন, সূরা ফাতিহার মাধ্যমে আমরা আল্লাহর কাছে জীবনের সবচেয়ে বড় বিষয়টি প্রার্থনা করি। তা হলো সিরাতে মুসতাকীমের হিদায়াত। জীবনের কল্যাণ ও আখিরাতের মুক্তির একমাত্র পথ হলো সিরাতে মুস্তাকীম বা সরল পথ। এ পথ পেতে হলে মনের আকুতি দিয়ে আল্লাহর কাছে তা চাইতে হবে। আর সিরাতে মুসতাকিমের আলোকবর্তিকা কুরআন ও হাদীস সাধ্যমত নিজে পড়তে হবে।

হাযেরীন, রামাদানে আমরা ভাল থাকার চেষ্টা করেছি। এমন চেষ্টা অনেকেই বাকী মাসগুলিতে করতে পারবেন না। তবে একেবারে ছেড়ে দিলেও হবে না। ন্যূনতম মুসলিম হিসেবে বেঁচে থাকতে অন্তত নিম্নের ৪টি বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখুন: ঈমানকে বিশুদ্ধ করুন, সকল প্রকার শিরক, কুফর ও ঈমান বিরোধী চিন্তা চেতনা থেকে আত্মরক্ষা করুন। হালাল উপাজনের উপর নির্ভর করুন এবং হারাম ও অবৈধ উপার্জন বর্জন করুন। যে কোনো পরিস্থিতিতে যেভাবে সম্ভব সালাত আদায় করুন। পাঁচ ওয়াক্ত ফরয সালাত পরিত্যাগ করে মুসলিম হিসেবে আল্লাহর নিকট মাকবুল হওয়া বা জান্নাতে যাওয়ার চিন্তা করার কোনো সুযোগ নেই। আর হুকুকুল ইবাদ বা মানুষের অধিকার সঠিকভাবে আদায়ের চেষ্টা করুন। আল্লাহর হক্ক আদায়ে ত্রুটি হলে সহজেই তাঁর নিকট থেকে ক্ষমা পাওয়া যায়। কিন্তু মানুষের হক্ক নষ্ট হলে তার ক্ষমা পাওয়া খুবই কঠিন।

হাযেরীন, জীবনকে আল্লাহর রহমত ও বরকতে ভরে তুলতে অন্তত ৪টি বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখুন। মানুষকে ভালবাসুন। দলমত নির্বিশেষে সকল মানুষকে আল্লাহর প্রিয় সৃষ্টি হিসেবে ভালবাসুন। বিশেষত সকল মুসলিমকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উম্মাত হিসেবে হৃদয় দিয়ে ভালবাসুন। মুমিনের ঈমান ও ভাল কাজগুলিকে বড় করে দেখে সে জন্য তাকে ভালবাসুন। আর তার কোনো অন্যায় থাকলে তার সংশোধনের জন্য আল্লাহর কাছে অন্তর দিয়ে দুআ করুন। কিন্তু কখনোই মুমিনের অন্যায়কে তার ঈমানের চেয়ে বড় মনে করে মুমিনকে বিদ্বেষ করবেন না। বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, হৃদয়কে হিংসামুক্ত করা জান্নাত লাভের এবং তাঁর সাথে জান্নাতে অবস্থানের অন্যতম পথ।

হাযেরীন, সকল মুসলিমকে ভালবাসার পাশাপাশি সকল মুসলিমের, সকল মানুষের এবং সকল সৃষ্টির সেবা ও উপকার করার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করুন। জীবনের সকল ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাতের হুবহু অনুসরণ করার চেষ্টা করুন। সর্বোপরি সকল অবস্থায়, ওযু-গোসল সহ এবং ওযু গোসল ছাড়া, সদা সর্বদা আল্লাহর যিকর, দুআ ও দরুদ সালাম পাঠের অভ্যাস গড়ে তুলুন।

হাযেরীন, লাইফস্টাইল বা জীবনধারা সামান্য একটু পাল্টে আমরা অনেক সাওয়াব ও বরকত পেতে পরি। জীবনে চলার পথে সকল জাগতিক কাজের ফাঁকে সর্বদা মানুষের উপকার করার, মানুষকে ভাল কথা বলার, ভাল কাজে উৎসাহ দেওয়ার ও সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিকর করার অভ্যাস করুন। এজন্য আপনাকে ওযু করতে হবে না, টুপি মাথায় দিতে হবে না বা আপনার স্বাভাবিক কাজকর্মের কিছুই ব্যহত হবে না। কিন্তু আপনি অগণিত অফুরন্ত সাওয়াব লাভ করবেন এবং আপনার হৃদয়ে ও অবচেতনে আল্লাহর প্রেম ও তাকওয়া গভীর হবে।

মহান আল্লাহর কাছে আমরা দুআ করি তিনি আমাদের সকলের জীবনের প্রতিটি দিনকে ঈদের দিনের মতই আনন্দময়, পুন্যময় ও ভালবাসাময় করে দিন। আমীন।

ঈদুল আযহার খুতবা: আরবী প্রথম খুতবা

اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَـــرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ. إِنَّ الْحَمْـــدَ لِلَّـــهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَـــهُ وَمَـــنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّـــهُ وَحْـــدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. صَلَّى اللَّـــهُ عَلَيْـــهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّـــهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَـــا النَّـــاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِـــدَةٍ وَخَلَـــقَ مِنْهَـــا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّـــذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَـــا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا. يُـــصْلِحْ لَكُـــمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَـــدْ

فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

أَمَّا بَعْدُ، فَيَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ

اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ، واللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ وَلِلهِ الْحَمْدُ.

وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا

بَارَكَ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ فِيْ الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ. وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ. أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ، فَاسْتَغْفِرُوْهُ وَتُوْبُوْا إِلَيْهِ، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.

ঈদুল আযহার খুতবাঃ আরবী ২য় খুতবা

اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَـــرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ. إِنَّ الْحَمْــدَ لِلَّـــهِ نَحْمَــدُهُ وَنَــسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَـــهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَـــى آلِـــه وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ.

أَمَّا بَعْدُ، فَيَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: إِنَّ اللَّـــهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَـــلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّـــدٍ وَعَلَـــى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّـــكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَـــا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِيْنَ، خُصُوصاً مِنْهُمُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ، أَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، وَعَنِ

التَّابِعِيْنَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ، وَعَنَّا مَعَهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ لاَ إِلـــهَ إِلاَّ اللهُ، واللهُ أَكْبَـــرُ، اَللهُ أَكْبَرُ وَلِلهِ الْحَمْدُ.

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَـــسَنَةً وَقِنَـــا عَذَابَ النَّارِ.

رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَـــى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْـــيِ يَعِظُكُـــمْ لَعَلَّكُـــمْ تَذَكَّرُونَ.

ঈদুল আযহার খুতবাঃ বাংলা

হাযেরীন, আল্লাহর তাকবীর বলুন এবং প্রশংসা করুন যে, তিনি আমাদেরকে আজ ঈদুল আযহার সালাত আদায়ের তাওফীক দিয়েছেন। আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। ওয়াল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার ওয়ালিল্লাহিল হামদ।

হাযেরীন, আযহা অর্থ ত্যাগ আর কুরবানী অর্থ নৈকট্য লাভের জন্য ত্যাগ। আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য আমরা এ ঈদে ত্যাগের আনন্দে লিপ্ত হই। কুরবানী দিতে হবে আল্লাহর নামে। আমরা বাংলায় বলি, অমুকের নামে কুরবানী। আমাদের উদ্দেশ্য ভাল হলেও কথাটি ভাল নয়। এক্ষেত্রে বলতে হবে, "অমুকের পক্ষ থেকে কুরবানী"। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে কুরবানী বা জবাই করা শিরক এবং এভাবে জবাইকৃত পশুর গোশত খাওয়া হারাম।

বিভিন্ন হাদীস থেকে আমরা দেখি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো কখনো শুধু বিসমিল্লাহ বলেই কুরবানী করেছেন। এরপর তিনি কবুলিয়্যাতের দুআ করেছেন। সাধারণত তিনি "বিসমিল্লাহি ওয়া আল্লাহু আকবার" বলতেন। কখনো কখনো তিনি প্রথমে "ওয়াজ্জাহতু ওয়াজহিয়া লিল্লাযি ফাতারাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদা হানীফাও ওয়ামা আনা মিনাল মুশরিকীন। ইন্না সালাতী ওয়া নুসুকী ওয়া মাহইয়ায়াইয়া ওয়া মামাতী লিল্লাহি রাব্বীল আলামীন। লা শারীকা লাহু ওয়া বি যালিকা উমিরতু ওয়া আনা আউয়ালুল মুসলিমীন" বলতেন। এরপর বলতেনঃ বিসমিল্লাহি ওয়া আল্লাহু আকবার। এরপর তিনি কবুলের দুআ করে বলতেন "আল্লাহুম্মা লাকা ওয়া মিনকা", "আল্লাহুম্মা 'আন মুহাম্মাদিন ওয়া আলি মুহাম্মাদ", অথবা "আল্লাহুম্মা তাকাব্বাল মিন মুহাম্মাদিন ওয়া আলি মুহাম্মাদিন ওয়া উম্মাতি মুহাম্মাদিন" "আল্লাহ আপনারই জন্য এবং আপনার পক্ষ থেকে।" "হে আল্লাহ, মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদের পরিবারের পক্ষ থেকে", "হে আল্লাহ আপনি কবুল করুন এ কুবরানী মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে, মুহাম্মাদের পরিবারের পক্ষ থেকে ও মুহাম্মাদের উম্মাতের পক্ষ থেকে।"

হাযেরীন, কুরবানী নিজে হাতে দেওয়া সুন্নাত ও উত্তম। তবে নিজের অসুবিধা হলে অন্যকে দিয়ে কুরবানী করানো যায়। তবে আমি গোনাহগার, আমার কুবরানী বোধহয় হবে না, অথবা আলিমদের দিয়ে কুরবানী না করালে কুরবানী হবে না এরূপ চিন্তা করার কোনো ভিত্তি নেই। অমুক এসে কুরবানী করে দিলে বা দুআ করে দিলে আমরা কুরবানী আল্লাহর নিকট কবুল হবে, এরূপ চিন্তার কোনো ভিত্তি নেই। নিজের জন্য সম্ভব না হলে কারো সাহায্য নেওয়া যায়। কুরবানী করে দেওয়া, কুরবানীর পশুর চামড়া ছাড়ানো, গোশত কাটা, বন্টন করা ইত্যাদি সবই নিজে করতে পারলে ভাল। প্রয়োজনে অন্য কেউ সাহায্য করতে পারে। এ সাহায্যের বিনিময়ে তিনি পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারেন। জবাইকারীকে কুরবানীর গোশত, মাথা, বা চামড়া পারিশ্রমিক বা হাদিয়া হিসেবে দিলে কুরবানী নষ্ট হয়ে যাবে। তাকে কিছু দিতে হলে কুরবানীর বাইরে নিজের পকেট থেকে দিতে হবে।

হাযেরীন, আল্লাহ এ পৃথিবীকে মানুষের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করেছেন। কেবলমাত্র মানুষের নিশ্চিত কল্যাণ ও উপকারের জন্যই পশু জবাই বৈধ করেছেন। খাদ্য ও আহারের প্রয়োজন ছাড়া একটি ছোট্ট চড়ুই পাখী হত্যা করাও মহাপাপ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, এক মহিলা একটি বিড়ালের অত্যাচারে ক্রোধান্বিত হয়ে খাদ্য ও পানীয় না দিয়ে বিড়ালটিকে বেঁধে রাখে এবং বিড়ালটি মারা যায়। এজন্য আল্লাহ মহিলাটিকে জাহান্নামে শাস্তি দেন। অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ

مَا مِنْ إِنْسَانٍ يَقْتُلُ عُصْفُوراً فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا - يَذْبَحُهَا فَيَأْكُلُهَا- إِلاَّ سَأَلَهُ اللهُ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"যদি কোনো মানুষ একটি চড়ুই পাখী বা তার চেয়ে বড় কিছু না হক্ক ভাবে- অর্থাৎ জবাই করে খাওয়ার জন্য ছাড়া হত্যা করে তবে তাকে কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করবেন।"[১]

বিভিন্ন হাদীসে জবাই ও কুরবানীর ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বোচ্চ সতর্কতা গ্রহণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন, যেন পশুটি অতিরিক্ত কষ্ট না পায়। এক হাদীসে তিনি বলেন:

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ

"সকল কিছুকে করুণা করতে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন। কাজেই তোমারা যখন হত্যা করবে তখন উত্তম পদ্ধতিতে হত্যা করবে। যখন যবাই করবে তখন কল্যাণ ও মমতার সাথে জবাই করবে। তোমরা তোমাদের ছুরি ধার দিয়ে নেবে এবং জবাইকৃত প্রাণীটিকে যথাসম্ভব কষ্ট থেকে রক্ষা করবে।"[২]

একব্যক্তি একটি ছাগীকে জবাইয়ের জন্য শুইয়ে রেখে ছুরি ধার দিচ্ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

أَتُرِيدُ أَنْ تُمِيتَهَا مَوْتَاتٍ هَلاَّ حَدَدْتَ شَفْرَتَكَ قَبْلَ أَنْ تُضْجِعَهَا

"তুমি কি প্রাণীটিকে কয়েকবার মারতে চাও? তুমি তাকে শোয়ানোর আগে ছুরিটি ধার দিলে না কেন?"[৩]

হাযেরীন, আমাদের কুরবানীর মূল বিষয় হলে মনের তাকওয়া। নিজের সম্পদের কিছু অংশ একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বিলিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে কুরবানী করলেই তা প্রকৃত কুরবানী। আল্লাহ বলেন:

لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ

"এগুলির- অর্থাৎ কুবরানীকৃত পশুগুলির গোশত বা রক্ত আল্লাহর নিকট পৌঁছে না; বরং তোমাদের তাকওয়া তাঁর নিকট পৌঁছায়। এভাবেই তিনি এ সব পশুকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন, যাতে তোমরা আল্লাহর তাকবীর পাঠ করতে পার, এজন্য যে, তিনি তোমাদেরকে হেদায়াত করেছেন; সুতরাং তুমি সৎকর্মশীলদেরকে সুসংবাদ দাও।"[৪]

হাযেরীন, তাহলে মূল বিষয় হলো অন্তরের তাকওয়া, আল্লাহ ভীতি, আল্লাহর কাছে সাওয়াব পাওয়ার আবেগ, আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও শাস্তি থেকে আত্মরক্ষার আগ্রহ। একমাত্র এরূপ সাওয়াবের আগ্রহ ও অসন্তুষ্টি থেকে রক্ষার আবেগ নিয়েই কুরবানী দিতে হবে। আর মনের এ আবেগ ও আগ্রহই আল্লাহ দেখেন এবং এর উপরেই পুরস্কার দেন। কুরবানী দেওয়ার পর গোশত কে কতটুকু খেল তা বড় কথা নয়।

এ কথা ঠিক যে আমরা নিজেরা ও পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়স্বজন সকলেই কুরবানীর পশুর গোশত খাব। পশুটির গোশত সুন্দর হবে, মানুষ ভালভাবে খেতে পারবে ইত্যাদি সবই চিন্তা করতে হবে। কিন্তু গোশত খাওয়ার উদ্দেশ্যে বা মানুষের মধ্যে সুনামের উদ্দেশ্যে কুরবানী দিলে কুরবানীই হবে না। মূল উদ্দেশ্য হবে, আমি আল্লাহর রেযামন্দি ও নৈকট্য লাভের জন্য আমার কষ্টের সম্পদ থেকে যথাসম্ভব বেশি মূল্যের ভাল একটি পশু কুরবানী করব। কুরবানীর পর এ থেকে আল্লাহর বান্দারা

---

[১] হাকিম, আল-মুসতাদরাক ৪/২৬১; আলবানী, সহীহুত তারগীব ১/২৬৫, ২/২৭৫। হাদীসটি হাসান।

[২] মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৫৪৮।

[৩] হাকিম, আল-মুসতাদরাক ৪/২৬০; আলবানী, সহীহুত তারগীব ১/২৬৫। হাদীসটি সহীহ।

[৪] সূরা হাজ্জ: ৩৭ আয়াত।

খাবেন। আল্লাহর বান্দা হিসেবে আমি ও আমার পরিজন কিছু খাব। আর যথাসাধ্য বেশি করে মানুষদের খাওয়াব। কুরবানীর গোশত ঘরে রেখে দীর্ঘদিন ধরে খাওয়া বৈধ। তবে ত্যাগের অনুভূতি যেন নষ্ট না হয়। যথাসম্ভব বেশি পরিমাণ দান করতে এবং যথাসম্ভব বেশি দরিদ্রকে ঈদুল আযহার আনন্দে শরীক করতে চেষ্টা করতে হবে। এরপর কিছু রেখে দিলে অসুবিধা নেই। কিন্তু খবরদার! কখনোই যেন কুরবানীর গোশত রেখে দিয়ে বাজার খরচ বাচানোর চিন্তা না করি।

হাযেরীন, আমরা অনেক সময় কুরবানী করতে যেয়ে পরিবেশ দূষিত করে ফেলি। কুরবানীর পশুর রক্ত, ময়লা হাড়গোড় ইত্যাদি যেখানে সেখানে ফেলে রাখি। অথচ আমাদের আশপাশের মানুষ, প্রাণী বা পরিবেশকে কষ্ট দেওয়া বা কষ্টকর, বিরক্তিকর বা দুগন্ধময় কোনো দ্রব্য ফেলে রাখা কঠিনভাবে নিষিদ্ধ গোনাহের কাজ। পক্ষান্তরে কষ্টদায়ক বা বিরক্তিকর দ্রব্য সরিয়ে দেওয়া অত্যন্ত বড় সাওয়াবের কাজ। কোনোভাবে কোনো মানুষকে কষ্ট না দেওয়া জান্নাত লাভের অন্যতম শর্ত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

مَنْ أَكَلَ طَيِّبًا وَعَمِلَ فِي سُنَّةٍ وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ

"যে ব্যক্তি হালাল খাদ্য খেয়ে জীবনযাপন করবে, সুন্নাত অনুসারে আমল করবে এবং কোনো মানুষ তাঁর দ্বারা কষ্ট পাবে না, সে ব্যক্তি জান্নাতী হবে।"[১]

আর প্রতিবেশী, আশপাশের মানুষদেরকে কোনোভাবে কষ্ট দেওয়া জান্নাত থেকে বঞ্চিত হওয়ার অন্যতম কারণ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ

"যার কষ্ট থেকে আশপাশের মানুষেরা নিরাপদ নয় সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"[২]

হাযেরীন, রাস্তাঘাট থেকে কষ্টদায়ক দ্রব্য সরিয়ে দেওয়া ঈমানের অংশ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ فَأَخَّرَهُ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ

"একব্যক্তি রাস্তায় চলতে চলতে একটি কাটাওয়ালা ডাল দেখতে পায়, সে ডালটি সরিয়ে দেয়। আল্লাহ তার এ কাজ কবুল করেন এবং তাকে ক্ষমা করে দেন।"[৩]

অন্য হাদীসে তিনি বলেন:

مَنْ رَفَعَ حَجَراً مِنَ الطَّرِيقِ كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ وَمَنْ كَانَتْ (تُقُبِّلَتْ) لَهُ حَسَنَةٌ دَخَلَ الْجَنَّةَ

"যদি কেউ রাস্তা থেকে একটি পাথর সরিয়ে দেয় তবে তার আমলনামায় একটি নেকি লেখা হয়। আর যদি কারো একটি নেকিও কবুল হয়ে যায় তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[৪]

পরিচ্ছন্নতা ছিল মুমিনের পরিচয়। আর আজ অপরিচ্ছন্নতা আমাদের বৈশিষ্ট্য। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

نَظِّفُوا أُرَاهُ قَالَ أَفْنِيَتَكُمْ وَلا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ، تَجْمَعُ الأَكْبَاءَ فِيْ دُوْرِهَا

"তোমরা তোমাদের বাড়ির আঙ্গিনা-সর্বদিক পরিচ্ছন্ন রাখবে, ইহুদিদের অনুকরণ করবে না, ইহুদিরা তাদের বাড়ির আঙ্গিনা পরিষ্কার করে না। তারা বাড়িতে আবর্জনা জমা করে রাখে।"[৫]

হাযেরীন, কুরবানী করা ওয়াজিব। ঈদের সালাত আদায় করা ওয়াজিব। কিন্তু পাঁচ ওয়াক্ত

---

[১] তিরমিযী, আস-সুনান ৪/৬৬৯; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ৪/১১৭। হাকিম ও যাহাবী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।
[২] বুখারী, আস-সহীহ ৫/২২৪০; মুসলিম, আস-সহীহ ১/৬৮।
[৩] বুখারী, আস-সহীহ ১/২৩৩, ২/৮৭৪; মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৫২১, ৪/২০২১।
[৪] হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৩/১৩৫; আলবানী, সহীহুত তারগীব ৩/৮১। হাদীসটি হাসান।
[৫] তিরমিযী, আস-সুনান ৫/১১১; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ১/২৮৬; আলবানী, জিলবাবুল মারাআহ, পৃ: ১৯৭-১৯৮। হাদীসটির সনদ সহীহ।

সালাত আদায় করা ফরয। অনুরূপভাবে হালাল ও বৈধ উপার্জন ফরয। ফরয ইবাদত বাদ দিয়ে ওয়াজিব, সুন্নাত বা নফল ইবাদত ঘটা করে পালন করা কি বক-ধার্মিকতা নয়? আমরা যদি সত্যিই আল্লাহর রহমত চাই তাহলে ফরয আদায় করে এরপর ওয়াজিব আদায় করতে হবে।

হাযেরীন, ঈদ উপলক্ষ্যে শরীর চর্চামূলক বিনোদন ও সামাজিক দেখাসাক্ষাত ও আনন্দ ইসলামে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু দুঃখজনকভাবে অনেকেই ঈদের আনন্দের নামে হারাম পাপ, গান-বাজনা, বেপর্দা ও অশ্লীলভাবে চলাফেরা করে কঠিন পাপে নিমজ্জিত হন। আমাদের সাবধান হওয়া দরকার।

হাযেরীন, আমরা শুধু ভোগে ও প্রাপ্তিতেই আনন্দ পেতে অভ্যস্ত। ইসলাম আমাদেরকে ত্যাগের আনন্দ উপভোগ করতে শেখালো। কুরবানীর ঈদ থেকে আমাদের এ শিক্ষাটি ভালভাবে নিতে হবে।

হাযেরীন, ঈদুল আযহার মাস বা যুলহাজ্জ মাসই আমাদের আরবী-ইসলামী পঞ্জিকার শেষ মাস। এরপরেই শুরু হবে নতুন বছরের নতুন মাস: মুহার্‌রাম মাস। আল্লাহ তা'লা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং প্রত্যেক মানুষ দেখুক সে আগামীকালের জন্য কি সঞ্চয় করল। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ অবহিত।"[১]

হাযেরীন, জীবনের হালখাতা করুন। দুনিয়ার বাড়ি-ঘর, জমাজমি বা টাকা-পয়সার তো হিসেব অনেক করলেন। কিন্তু সত্যিকার জীবনের জন্য, আগামী জীবনের জন্য আল্লাহর কাছে কি সঞ্চচ করেছেন তা কি একটু ভেবে দেখেছেন। আজীবন তো পরের সম্পদের হিসাব করলেন। একবার কি নিজের সঞ্চয় হিসাব করেছেন? আসুন নতুন বছরের জন্য জীবনকে নতুন করে সাজাই। হৃদয়ের বাগানে হিংসা, অহঙ্কার, স্বার্থপরতা, লোভ ইত্যাদির যে আগাছা জন্মেছে তা কুরবানী দিয়ে হৃদয়ের বাগানকে পরিষ্কার করি। একমাত্র আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পন, শুধু তাঁরই কাছে চাওয়া-পাওয়ার অনুভূতি দিয়ে হৃদয়কে সুশোভিত করি। আল্লাহর ভালবাসা, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ভালবাসা, সকল মুমিনের ভালবাসা ও সকল সৃষ্টির ভালবাসা দিয়ে হৃদয়কে সুশোভিত করি।

হাযেরীন, আল্লাহর রহমত লাভের জন্য প্রত্যেকেরই দরবেশ হওয়া জরুরী নয়। কমপক্ষে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য রাখুন। ঈমানকে বিশুদ্ধ রাখুন ও হিফাযত করুন। একমাত্র আল্লাহর উপর সকল নির্ভরতা রাখুন। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করুন। মানুষের অধিকার নষ্ট করবেন না। অবৈধ উপার্জন থেকে আত্মরক্ষা করুন। সুযোগ পেলে মানুষের উপকার করুন। কারো ক্ষতি করবেন না। সকল অবস্থায় সর্বদা আল্লাহর যিক্‌র করুন।

হাযেরীন দুনিয়ামুখী জীবনের জন্য আল্লাহ আমাদের হৃদয় উৎকণ্ঠা ও টেনশনে ভরে দিয়েছেন। আর এ থেকে বাঁচতে অনেকেই বিভিন্ন প্রকারের ইয়োগা বা যোগব্যায়াম, ধ্যান বা মেডিটেশন করেন। মুসলিমের জন্য এগুলি কিছুই লাগে না। আল্লাহর যিকর ও দুআর মত মূল্যবান আর কিছুই নেই। প্রতিদিন রাতে ঘুমানোর আগে ওযু করে দু/চার রাকআত সালাত আদায় করুন। কয়েক মিনিট আল্লাহ যিকর ও সালাত সালাম পাঠ করুন। আল্লাহর কাছে সকল পাপের তাওবা করে কয়েক মিনিট দু'আ করে বিছানায় যান। বিছানায় শুয়ে ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আল-হামদু লিল্লাহ ও ৩৪ বার আল্লাহু আকবার বলুন। ভারমুক্ত মনে আল্লাহর রহমতের আশা নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ুন। আল্লাহ সকলকে তাওফীক দিন। আমীন।

[১] সূরা হাশর: ১৮ আয়াত।

বিবাহের খুতবাঃ আরবী

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

أَمَّا بَعْدُ، فَيَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ. أَيُّهَا الشَّابُّ، بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ.

বিবাহের খুতবাঃ বাংলা অনুবাদ

"নিশ্চয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আমরা তাঁর প্রশংসা করছি এবং তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করছি এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমরা আমাদের নফসের অকল্যাণ থেকে এবং আমাদের খারাপ কর্মগুলি থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহ যাকে হিদায়াত করেন তাকে কেউ বিভ্রান্ত করতে পারে না। আর আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন তাকে কেউ হিদায়াত করতে পারে না। এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবূদ নেই। তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই, এবং মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও তাঁর রাসূল। হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর সত্যিকারের ভয় এবং মুসলিম না হয়ে তোমরা মৃত্যুবরণ করো না" (সূরা আল ইমরান ১০২ আয়াত)। "হে মানব জাতি, তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একটি প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকেই তার জোড়াকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের থেকে বহু নর ও নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন। আর আল্লাহকে ভয় কর যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট জিজ্ঞাসা-যচঞা কর এবং সতর্ক থাক রক্ত-আত্মীয়তার বন্ধন সম্পর্কে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।" (সূরা নিসাঃ ১ আয়াত)। "হে মুমিনগণ, আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। তাহলে তিনি তোমাদের কর্মকে ত্রুটিমুক্ত করবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে তারা অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে।" (সূরা আহযাবঃ ৭০-৭১ আয়াত)।"

অতঃপর, হে মুসলিমগণ, আল্লাহ বলেছেনঃ "এবং তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে অন্যতম যে, তিনি তোমাদের থেকেই তোমাদের সঙ্গী-সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন যেন তোমরা তাদের নিকট শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন পারস্পারিক ভালবাসা ও দয়া। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে।"

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "বিবাহ আমার সুন্নাত বা রীতি। কাজেই যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত অনুযায়ী কর্ম করবে না সে আমার সাথে সম্পর্কিত নয়। তোমরা বিবাহ করো, কারণ আমি আমার উম্মতের বর্ধিত সংখ্যা দিয়ে অন্যান্য জাতির কাছে গৌরব প্রকাশ করব।"

হে যুবক, আল্লাহ তোমার জন্য বরকত দিন, তোমার উপর বরকত দিন এবং চিরকল্যাণের সাথে তোমাদেরকে সংযুক্ত রাখুন। আমীন।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসসমূহ

জানুয়ারী মাস

১৯ জানুয়ারী: জাতীয় শিক্ষক দিবস

হাযেরীন, জানুয়ারী মাসের ১৯ তারিখ আমাদের দেশে জাতীয় ভাবে "শিক্ষক দিবস" হিসেবে ঘোষিত। এ দিনে শিক্ষকদের মর্যাদা ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কাজ করা হয়। ইসলামে শিক্ষা, স্বাক্ষরতা, শিক্ষা উপকরণ ও শিক্ষকতার পেশাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব ও সম্মান দেওয়া হয়েছে। কুরআন ও হাদীসের আলোকে শিক্ষা ও শিক্ষকের গুরুত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কে আমরা রবিউস সানী মাসের প্রথম খুতবায় আলোচনা করেছি। এ বিষয়ে পৃথক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। এখন আমরা মূল আলোচনায় যেতে পারি।

ফেব্রুয়ারী মাস

১৪ ফেব্রুয়ারী: সাধু ভ্যান্টোইন দিবস বা বিশ্ব ভালবাসা দিবস

হাযেরীন, ফেব্রুয়ারী মাসের ১৪ তারিখ সাধু ভ্যালেন্টাইন দিবস। বর্তমানে এ দিনটিকে বিশ্ব ভালবাসা দিবস নামে প্রচার করা হয়। এ দিবসের ইতিহাস এবং এ দিবস উপলক্ষ্যে মুসলিমদের করণীয় ও বর্জনীয় সর্ম্পকে আমরা যুলকাদ মাসের দ্বিতীয় খুতবায় আলোচনা করেছি। এ বিষয়ে পৃথক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। এখন আমরা আজকের খুতবার মূল আলোচনায় যেতে পারি।

২১ ফেব্রুয়ার: শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

হাযেরীন, ২১ ফেব্রুয়ারী শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। ইসলামে মাতৃভাষার গুরুত্ব, মাতৃভাষার অধিকার রক্ষায় নিহতদের শাহাদত, ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস ও আমাদের করণীয় সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের আলোকে আমরা আলোচনা করেছি যুলকাদ মাসের প্রথম খুতবায়। এজন্য আমরা এখন আজকের খুতবার মূল বিষয় আলোচনা করব।

মার্চ মাস

৮ মার্চ বিশ্ব নারী দিবস

হাযেরীন, ৮ মার্চ বিশ্ব নারী দিবস। এদিনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নারী অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে অনেক প্রোগ্রাম করা হয়। রজব মাসের প্রথম খুতবায় আমরা ইসলামে নারীর অধিকার, এ বিষয়ক বিভ্রান্তি ও পাশ্চাত্যে নারী অধিকারের স্বরূপ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এজন্য আমরা এ বিষয়ে আর আলোচনা না করে আজকের মূল আলোচনা শুরু করছি।

মার্চ মাসের ২য় বৃহস্পতিবার: বিশ্ব কিডনি দিবস

হাযেরীন, মার্চ মাসের ২য় বৃহস্পতিবার বিশ্ব কিডনি দিবস হিসেবে ঘোষিত। এ দিনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কিডনি সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়। স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিষয়ক ইসলামের নির্দেশনা ও রোগ-ব্যধিতে আমাদের করণীয় ও বর্জনীয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি আমরা শাবান মাসের তৃতীয় খুতবায়। পাশাপাশি আমরা কিডনি সম্পর্কে দুটি কথা বলতে চাই।

হাযেরীন, আমাদের তলপেটের দুদিকে দুটি গ্রন্থি আছে যা আমাদের দেহের ফিলটারের কাজ করে আমাদের রক্ত থেকে মুত্রকে পৃথক করে যে গ্রন্থি তাকে কিডনি (kidney), বৃক্ক বা মুত্রগ্রন্থি বলা হয়।

দেহের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এরমধ্যে কিডনি অন্যতম। রাব্বুল আলামীন মহান আল্লাহ যে কত বৈজ্ঞানিকভাবে এ দেহ তৈরি করেছেন তা ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়। আমরা দেহের মধ্যে ফ্রি যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পেয়েছি তার একটি ছোট্ট অঙ্গ দেখে দেখে তৈরি করাও বৈজ্ঞানিকদের জন্য কষ্টকর বা অসম্ভব। কিডনি স্বাভাবিকভাবেই কাজ করে। তবে এটি অসুস্থ হলে তার চিকিৎসা এখনো খুবই কঠিন ও দুষ্কর। কিডনির অসুস্থতার মধ্যে রয়েছে সাধারণ ইনফেকশন থেকে শুরু করে কিডনি ফেইলইউর বা কিডনি নষ্ট হয়ে যাওয়া। ইসলাম আমাদেরকে খাদ্যগ্রহণ, পানীয় গ্রহণ, সালাত, সিয়াম ইত্যাদি ইবাদত চলাফেরা ইত্যাদির যে নিয়মতান্ত্রিক জীবন দিয়েছে আমরা যদি তা সঠিকভাবে মেনে চলি তাহলে সাধারণভাবে অনেক রোগব্যধির মত কিডনির অসুস্থতা থেকেও আমরা বহুলাংশে রক্ষা পাওয়ার আশা করতে পারি। পাশাপাশি অসুস্থ হলে দ্রুত চিকিৎসার বিষয়ে আমাদের সচেতন হতে হবে। ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের কিডনির সুস্থতা বিষয়ে অধিকতর সতর্ক থাকা দরকার।

হাযেরীন, কিডনির চিকিৎসার একটি দিক হলো কিডনি প্রতিস্থাপন করা বা বদল করা। মহান আল্লাহ প্রত্যেক মানুষকে দুটি করে কিডনি দিয়েছেন। দুটি কিডনি ভাগাভাগি করে ফিলটারের কাজ করে। আবার একটি কিডনি কোনো কারণে নষ্ট হলে একটি কিডনিই স্বাভাবিকভাবে সকল কাজ করতে পারে। এজন্য একজনের দুটি কিডনিই নষ্ট হলে অন্য একজনের একটি কিডনি তাকে দান করতে পারে। মক্কার আন্তর্জাতিক ফিকহ একাডেমি ও অন্যান্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান ফাতওয়া দিয়েছেন যে, কিডনি বা দেহের কোনো অঙ্গ বিক্রয় করা বৈধ নয়, তবে দান করা যেতে পারে। যদি যোগ্য চিকিৎসক দানগ্রহণকারী ও দানকারীর সুস্থতার সুদৃঢ় আশ্বাস প্রদান করেন তবে এরূপ দান করা জায়েয হবে। এছাড়া মরনোত্তর কিডনি দানও তারা শর্ত সাপেক্ষ বৈধ বলেছেন।

২২ মার্চ বিশ্ব পানি দিবস

হাযেরীন, ২২ মার্চ বিশ্ব পানি দিবস। পানি আল্লাহর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিয়ামত। আল্লাহ বলেন:

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ

"অবিশ্বাসীরা কি দেখে না যে, ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল ওতপ্রোতভাবে মিশে ছিল, অতঃপর আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম। এবং আমি পানি থেকে সকল প্রাণবান জিনিস সৃষ্টি করলাম। তবুও কি তারা ঈমান আনবে না।"[১]

হাযেরীন, পানি জীবনের উৎস। আল্লাহর অনেক নিয়ামতের বিকল্প আছে, কিন্তু পানির কোনো বিকল্প নেই। এজন্য কুরআন ও হাদীসে বারংবার পানির ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বর করতে এবং পানির অপচয় না করতে বিশেষভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি কাউকে পানির প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক দান করুন। আমীন।

২৬ মার্চঃ স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস

হাযেরীন, ২৬ মার্চ আমাদের স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস। কুরআন ও হাদীসের আলোকে স্বাধীনতার গুরুত্ব, স্বাধীনতার শহীদ ও যোদ্ধাদের প্রতি আমাদের দায়িত্ব এবং স্বাধীনতা রক্ষায় আমাদের করণীয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে শাওয়াল মাসের ৪র্থ খুতবায়। এখন আমরা

---

[১] সূরা আম্বিয়া: ৩০ আয়াত।

আজকের খুতবার মূল বিষয়ে মনোযোগ দিতে পারি।

৩১ মার্চঃ জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস

হাযেরীন, ৩১শে মার্চ আমাদের জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস। আমাদের দেশে সাধারণ প্রাকৃতিক দুযোর্গের মধ্যে অন্যতম হলো ঝড়, বন্যা, ঘুর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস ইত্যাদি। এছাড়া আমাদের দেশ ভূমিকম্প জনিত ভয়াবহ দুযোর্গের সম্ভাবনার মধ্যে রয়েছে। এ সকল বিষয়ে আমাদের সতর্কতা ও প্রস্তুতি প্রয়োজন। দুযোর্গ প্রস্তুতির মূলত দুটি দিক রয়েছে। একটি হলো জাগতিক ও দ্বিতীয়টি হলো আত্মিক ও ধর্মীয়। জাগতিকভাবে দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য আমাদের সাধ্যমত প্রস্তুতি নিতে হবে। সরকার ও জনগণের আন্তরিকতা ও সহযোগিত এক্ষেত্রে অতীব প্রয়োজন। এক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, দুর্যোগ মুকাবিলার ক্ষেত্রে আপনার একটি কথা, একটি কর্ম বা পরামর্শ যদি একটি মানুষেরও উপকার করে তাহলে আপনি এজন্য মহান আল্লাহর কাছে অফুরন্ত সাওয়াব লাভ করবেন। আমরা বিভিন্ন হাদীসে দেখেছি যে, মানুষের কল্যাণে কয়েক পা হেটে যাওয়া মহান আল্লাহর নিকট মসজিদে নববীতে বসে একমাস ইতিকাফ করার চেয়েও বেশি প্রিয়। কাজেই যে কোনো বিষয়ে মানুষের উপকার হতে পারে এরূপ বিষয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সাওয়াব অর্জনের খেয়ালে কথা বলবেন, পরামর্শ দিবেন। যদি দেখেন কারো কর্ম দুর্যোগ মুকাবিলায় আমাদের প্রস্তুতি ব্যাহত করছে, অথবা তার নিজের বা অন্যের জন্য ক্ষতিকর হবে তাহলে তাকে আন্তরিকতার সাথে পরামর্শ দিন।

হাযেরীন, দুর্যোগ মুকাবিলার দ্বিতীয় দিক হলো ধর্মীয় ও আত্মিক। কুরআন ও হাদীসে বারংবার বলা হয়েছে যে, মানুষের পাপ ও অপরাধের কারণে পৃথিবীতে দুর্যোগ এসে থাকে। বিশেষত মানুষের অধিকার নষ্ট করা, ন্যায়বিচার না করা, নিরপরাধ মানুষের শাস্তি, হত্যা, বা বিচারবহির্ভুত হত্যা, যাকাত না দেওয়া, অশ্লীলতার প্রসার, ওযনে বা পরিমাপে কম দেওয়া ইত্যাদি অপরাধ যখন সমাজে ব্যাপক ও গা সওয়া হয়ে যায় তখন আল্লাহ বিভিন্ন দুর্যোগের মাধ্যমে গযব দান করেন। পাশাপাশি কুরআন ও হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, তাওবা, দান, পরোপকার ও দুআর মাধ্যমে আল্লাহ গযব দূর করেন। এজন্য দুর্যোগ মুকাবিলার অন্যতম প্রস্তুতি হলো এ ধরণের পাপ থেকে সমাজকে রক্ষা করা এবং অপরাধীর শাস্তি ও ন্যায়বিচারের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। আর দুর্যোগের পূর্বাভাস পেলে ব্যক্তিগত এবং সামষ্টিকভাবে সকলে আল্লাহর কাছে তাওবা ও দুআ করা। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন।

এপ্রিল মাস

২ এপ্রিলঃ বিশ্ব অটিযম (Autism) দিবস

হাযেরীন, ২ এপ্রিলঃ বিশ্ব অটিযম (Autism) দিবস হিসেবে ঘোষিত। অটিযম Autism ব্রেনের দুর্বলতা জনিত একটি রোগ। এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি আশপাশের মানুষদের সাথে আচরণের কিছু অস্বাভাবিকতা বা দুর্বলতা প্রদর্শন করে। মূলত এটি শিশুদের রোগ। বংশগত, জন্মগত বা জন্মের সময়ের কোনো অসুবিধার কারণে মস্তিষ্কের কোনো কোনো কর্মকাণ্ডের দুর্বলতার কারণে শিশুদের মধ্যে যে আচরণগত অস্বাভাবিকতা দেখা যায় তা অটিজম নামে পরিচিত। আধুনিক সমাজে কমবেশি ৫০০ শিশুর মধ্যে একজন অটিজমে আক্রান্ত হচ্ছে। কন্যা শিশুদের চেয়ে পুরুষ শিশুদের মধ্যে এ রোগের প্রাদুর্ভাব চারগুণ বেশি। শিশুদের বয়স তিন বছর হওয়ার আগেই তাদের আচরণের মধ্যে রোগ ধরা পড়ছে। অটিস্টিক Autistic শিশু সাধারণ আশপাশের মানুষদের বিষয়ে কোনো আগ্রহ দেখায় না।

একাকি থাকতে বা খেলতে ভালবাসে। ভাইবোন, পিতামাতা বা বন্ধুদের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করতে পারে না। আশেপাশে কেউ আহত হলে, অসুবিধা হলে বা খুশি হলে স্বাভাবিক যে প্রতিক্রিয়া মানুষের মধ্যে পাওয়া যায় তা তার মধ্যে পাওয়া যায় না।

কোনো শিশুর মধ্যে অটিজম দেখা দিলে হতাশ হওয়া বা শিশুকে অবহেলা করা কঠিন অন্যায়। এতে হতাশার পাপ ছাড়াও সন্তানের প্রতি পিতামাতার দায়িত্বে অবহেলার পাপ হয়। একটু বিশেষ কেয়ার, যত্ন ও তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে অটিস্টিক শিশুরাও মোটমুটি সফল মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। কারো সন্তানের মধ্যে আচরণগত অস্বাভাবিকতা দেখা দিলে অভিজ্ঞ ডাক্তারের স্মরণাপন্ন হোন। আল্লাহ সবাইকে তাওফীক দিন। আমীন।

৭ এপ্রিলঃ বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস

হাযেরীন, ৭ এপ্রিল বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস। এ দিনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে স্বাস্থ্য সচেতনতার বিষয়ে বিশেষ প্রচার করা হয়। ইসলামের দৃষ্টিতে স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যরক্ষার গুরুত্ব, সুস্বাস্থ্য রক্ষায় ইসলামী নির্দেশনা, চিকিৎসা বিষয়ক ইসলামের নির্দেশনা ও অসুস্থ মানুষদের প্রতি আমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি আমরা শাবান মাসের তৃতীয় খুতবায়। কাজেই এ বিষয়ে নতুন আলোচনা না করে আমরা আজকের খুতবার মূল আলোচনা শুরু করতে পারি।

মে মাস

১ মেঃ মে দিবস বা বিশ্ব শ্রমিক দিবস

হাযেরীন, ১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস। শ্রমিকদের অধিকার সম্পর্কে এ দিনে বিশেষ প্রচার ও অনুষ্টানাদি করা হয়। ইসলামের শ্রম ও শ্রমিকের গুরুত্ব, শ্রমিকের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে আমরা রজব মাসের দ্বিতীয় খুতবায় আলোচনা করেছি। এখন আমরা আজকের আলোচনা শুরু করছি।

মে মাসের দ্বিতীয় রবিবারঃ বিশ্ব মা দিবস

হাযেরীন, মে মাসের দ্বিতীয় রবিবার বিশ্বের বিভিন্ন দেশে "মা দিবস" হিসেবে পালন করা হয়। পাশ্চাত্যের মানুষেরা সাধারণত সারাবৎসর পিতামাতার কোনো খোঁজ রাখেন না। তাই একটি বিশেষ দিনে পিতামাতাকে স্মরণ করে দু একটি হাদিয়া, কার্ড বা মেসেজ পাঠান। পাশ্চাত্য সভ্যতার আগ্রাসী প্রভাবে আমাদের দেশেও পিতামাতার প্রতি দায়িত্বের ক্ষেত্রে ক্ষমার অযোগ্য অবহেলা শুরু হয়েছে। জুমাদিয়া সানিয়া মাসের তৃতীয় খুতবায় আমরা মাতা ও পিতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কের ইসলামের দিক নির্দেশনা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এজন্য আজ আমরা এ বিষয়ে আলোচনা না করে আজকের খুতবার মূল বিষয় শুরু করতে পারি।

১৫ মেঃ আন্তর্জাতিক পরিবার দিবস

হাযেরীন, ১৫ মে আর্ন্তজাতিক পরিবার দিবস হিসেবে ঘোষিত। পরিবার, পরিবার গঠনের গুরুত্ব, পদ্ধতি, বিবাহের গুরুত্ব, পারিবারিক কাঠামোর অবক্ষয়ের কারণ ও পরিণতি বিষয়ে আমরা রজব মাসের তৃতীয় খুতবায় আলোচনা করেছি। এজন্য এ বিষয়ে আলোচনা দীর্ঘায়িত না করে আমরা আজকের বিষয়ে আলোচনা শুরু করছি।

২৮ মেঃ নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস

হাযেরীন, ২৮ মে নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস হিসেবে ঘোষিত। আমরা রজব মাসের প্রথম খুতবায়

নারীর অধিকার, রজব মারেস তৃতীয় খুতবায় বিবাহ ও পরিবার আর শাবান মাসের প্রথম খুতবায় আমরা স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করেছি। বিবাহ ও পারিবারিক দায়িত্বের অন্যতম বিষয় হলো স্ত্রীর সন্তানধারণ জন্মদান ও দুগ্ধদানের জন্য বা এককথায় নিরাপদ মাতৃত্বের জন্য সামগ্রিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা। আমরা দেখেছি যে, ইসলাম এ বিষয়টিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করেছে। ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিই হলো পারিবারিক কাঠামোর মধ্যে ভবিষ্যৎ প্রজন্মদেরকে পরিপূর্ণ মানবিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত করে গড়ে তোলা মানব জীবনের অন্যতম উদ্দেশ্য। এজন্য ইসলামের নারীদেরকে নিরাপদ মাতৃত্বের সাথে সাংঘর্ষিক সকল দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। স্বামীর উপর ফরয করা হয়েছে স্ত্রীর সামগ্রিক সংরক্ষণ করা ও সম্মানজনক জীবনযাত্রার যাবতীয় খরচপত্র বহন করা। পাশাপাশি মাতৃত্বকে নিরাপদ করতে এ বিষয়ক সুষ্ঠ জ্ঞান ও সচেতনতা প্রয়োজন। পবিত্র কুরআনে ও হাদীসে প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রয়োজনীয় জ্ঞান অত্যন্ত সহজ সরল ও স্বাভাবিকভাবে প্রদান করা হয়েছে। যা কোনোরূপ সুড়সুড়ি দেওয়া ছাড়াই মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করে।

হাযেরীন, নিরাপদ মাতৃত্বের একটি বিশেষ দিক হলো গর্ভবর্তী মায়েদের নিয়মিত চেকআপ ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। এজন্য স্বভাবতই মহিলা চিকিৎসকের প্রয়োজন। একজন দীনদার মহিলা কোনো পুরুষের সামনে নিজেকে অনাবৃত করতে বা গোপন কথাগুলি বলতে পারেন না বা খুবই কষ্ট পান। এতে অনেক সময় সব কথা না বলায় বা মানসিক অস্বস্তির কারণে চিকিৎসা ব্যাহত হয়। এজন্য আমরা সরকার ও সমাজের প্রভাবশালী মানুষদের অনুরোধ করি যে, সকল পর্যায়ের চিকিৎসাকেন্দ্রে মাতৃত্ব বিষয়ে মহিলা ডাক্তার ও সেবিকা রাখা হোক।

অনেক সময় আমরা নারী অধিকারের নামে পুরুষের কর্মে কোটা করে জবরদস্তিমূলকভাবে নারীদের চাকরী দেওয়ার ব্যবস্থা করি। এতে বহুমুখি সমস্যা হয়। প্রথমত, কোটার কারণে যোগ্য ব্যক্তি কর্ম থেকে বঞ্চিত হন। অনেক সময় স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের একই পদের যোগ্যতা থাকলে এবং স্বামী কিছুটা বেশি যোগ্যতা সম্পন্ন হলেও স্বামী বেকার থাকেন এবং স্ত্রী চাকুরী লাভ করেন। এতে পারিবারিক ও সামাজিক ভারসম্য নষ্ট হয়। প্রয়োজনে নারীরা চাকরী করবেন, কিন্তু স্বামীকে বেকার রেখে স্ত্রীকে চাকরী দেওয়ার ব্যবস্থা কত বড় অমানবিক তা আমরা বুঝতে পারি। দ্বিতীয়ত এরূপ ব্যবস্থা নিরাপদ মাতৃত্বের জন্য প্রতিবন্ধক। তৃতীয়ত এতে জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যে কর্মের জন্য মানসিক ও দৈহিকভাবে পুরুষ অধিকতর উপযোগী সে কর্মে নারীকে দিলে কর্মের ফলাফল কম আসে। এছাড়া নারীকে অতিরিক্ত কিছু ছুটি দিতে হয়। নারীর ছুটি পাওনা। কিন্তু পুরুষকে বেকার রেখে নারীকে কম খাটিয়ে জনগণের পয়সা খরচ করা কতটুকু যৌক্তিক তা আমরা বুঝতে পারি না।

পক্ষান্তরে যে কর্মগুলি নারীদের উপযোগী সে কর্মে আমরা নারীদের না দিয়ে পুরুষদের দিচ্ছি। মাতৃত্ব বিষয়ক চিকিৎসা, সেবা ও এ জাতীয় খাতে অগণিত মহিলার প্রয়োজন। কিন্তু সরকার ও সকল স্বাস্থ্য সংস্থা এ সকল খাতে পুরুষ নিয়োগ করছেন। আমরা প্রকৃতির সাথে সংঘর্ষ থেকে বিরত হতে সবাইকে আহ্বান জানাচ্ছি এবং স্বাস্থ্য সেবা খাতে নারীদের অগ্রাধিকার দেওয়ার দাবি জানাচ্ছি।

হাযেরীন, পাশাপাশি আমাদের বুঝতে হবে যে, প্রয়োজনের জন্য পুরুষ ডাক্তারকে সতর বা গোপন অঙ্গ দেখানো বা তাদের দিয়ে অপারেশন ও অন্যান্য চিকিৎসা করানো মুসলিম উম্মাহর সকল আলিম ও ফকীহের মতেই জায়েয। কুরআন ও হাদীসে বারংবার জীবন বাঁচানোর জন্য সকল প্রকার বিধিবিধানকে স্থগিত করা হয়েছে। এজন্য আমাদের সতর্ক হতে হবে যে, ধার্মিকতার নামে আমাদের

বাড়াবাড়িতে যেন মায়েরা চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত না হন।

৩১ মেঃ বিশ্ব তামাক মুক্ত দিবস

হাযেরীন, ৩১ মে বিশ্ব তামাক মুক্ত দিবস হিসেবে ঘোষিত। তামাক ও ধুমপানের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে আমরা অনেকেই জানি। ধুমপান ও তামাক বিষয়ে ইসলামের দিক নির্দেশনা আমরা যুলকাদ মাসের তৃতীয় খুতবায় আলোচনা করেছি। বিষয়টিকে সেদিনের জন্য রেখে এখন আমরা আজকের খুতবার মূল বিষয়ে আলোচনা শুরু করতে পারি।

জুন মাস

৫ জুনঃ বিশ্ব পরিবেশ দিবস

হাযেরীন, ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস। আমাদের চারিপার্শের ভূপ্রকৃতি, আবহাওয়া, গাছপালা, নদদনী ও দৃশ্যমান ও অদৃশ্য সবকিছু মিলিয়েই পরিবেশ। মহান আল্লাহ একটি ভারসম্যপূর্ণ ব্যবস্থার মধ্যে মানুষের চারিপার্শের পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষকে নির্দেশ দিয়েছেন এ পৃথিবীকে সুন্দর করে গড়তে। মানুষ যখন চূড়ান্ত স্বার্থপর হয়ে পড়ে এবং শুধু নিজের স্বার্থ রক্ষায় অন্য মানুষের সকল স্বার্থ নষ্ট করতে প্রস্তুত হয় তখন তার দ্বারা পরিবেশ ও সমাজ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। আল্লাহ বলেনঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ

মানুষের মধ্যে এমন কিছু মানুষ আছে জাগতিক বিষয়ে যার কথা তোমাকে অবাক-মুগ্ধ করে এবং সে তার অন্তরে কি আছে সে বিষয়ে আল্লাহকে সাক্ষী রাখে, অথচ প্রকৃতপক্ষে সে ঘোর ঝগড়াটে বা কথার মারপ্যাচের মানুষ। যখন সে ফিরে যায় তখন পৃথিবীতে অশান্তি-বিপর্যয়ের জন্য এবং ক্ষেতখামার ও প্রাণ-প্রজন্ম ধ্বংস করার কর্মে লিপ্ত হয়। আর আল্লাহ অশান্তি বিপর্যয় ভালবাসেন না। আর যখন তাকে বলা হয়, 'তুমি আল্লাহকে ভয় কর' তখন অহঙ্কার ও আত্মাভিমান তাকে পাপে লিপ্ত করে। আর তার জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট। নিশ্চয় তা নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল।"[১]

হাযেরীন, বর্তমান বিশ্বে শিল্পোন্নত বিশ্বের অনিয়ন্ত্রিত শিল্পায়ন, কলকারখানা স্থাপন, বিষাক্ত বর্জ্য অনিয়ন্ত্রিতভাবে ফেলা, পারমানবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতা ও অনিয়ন্ত্রিত বিলাসিতার কারণে আজ বিশ্বের পরিবেশ বিপর্যয়ের সম্মুখীন। এ সকল বিপর্যয় রোধে আন্তর্জাতিকভাবে ও জাতিসংঘের মাধ্যমে অনেক চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। আমেরিকা ও অন্য অনেক শিল্পোন্নত দেশ এ সকল চুক্তি গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে। এ সকল বিষয়ে তাদের বিবৃতি, বক্তব্য ও যুক্তি শুনলে আপনাদের মনে হবে কুরআন যেন এ আয়াতগুলিতে এদেরই চিত্র অঙ্কন করেছে।

হাযেরীন, শিল্প-কলকারখানা অনিয়ন্ত্রিত কার্বনের উৎপাদন, বিষাক্ত বর্জ্য যত্রতত্র ফেলা, পাহাড় ও বনজঙ্গল ধ্বংস করা, অপরিকল্পিত নগরায়ন, অনিয়ন্ত্রিত কীটনাশক ও রাসয়ানিক সার ব্যবহার, যানবাহনের ধোঁয়া ইত্যাদির ফলে বিশ্বের পরিবেশ কঠিন বিপর্যয়ের সম্মুখীন। পৃথিবীকে ঘিরে থাকা ওযনস্তর (Ozone Layer) কমে যাচ্ছে, সূর্যের ক্ষতিকারক অতিবেগুনি রশ্মি বেশি মাত্রায় পৃথিবীতে

---

[১] সূরা বাকারা: ২০৪-২০৫ আয়াত।

আসছে। ক্যান্সার ও অন্যান্য মারাত্মক রোগ দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশ্বের তাপমাত্রা বাড়ছে ও বরফ অঞ্চলের বরফ গলছে। ভূমিকম্প, সুনামি, সাইক্লোন ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্ভাবনা বাড়ছে। আল্লাহ বলেন:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

"পৃথিবীর স্থলভাগে ও সমুদ্রে প্রকাশিত সকল বিপর্যয় মানুষের কৃতকর্মের ফল। আল্লাহ তাদেরকে তাদের কিছু কর্মের স্বাদ আস্বাদন করান, যেন তারা ফিরে আসে।"[১]

হাযেরীন, পরিবেশ সংরক্ষণে প্রত্যেক মুসলিমের দায়িত্ব রয়েছে। জুমাদাস সানিয়া মাসের দ্বিতীয় খুতবায় বান্দার হক্ক ও মানবাধিকার এবং যুলহাজ্জ মাসের দ্বিতীয় খুতবায় খিদমতে খালক বা সৃষ্টির সেবা বিষয়ক আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, আমাদের আশাপশে সকল মানুষ, প্রাণী ও সৃষ্টির অধিকার রয়েছে আমাদের উপর। কারো কষ্ট দেওয়া, ক্ষতি করা বা অধিকার নষ্ট করা যেমন কঠিনতম পাপ, তেমনি জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষ ও প্রাণীর কল্যাণ ও সেবা করা সর্বোত্তম নেক আমল। জনগণের ব্যবহারের রাস্তায়, ঘাটে বা অনুরূপ স্থানে ময়লা ফেলা, মলমূত্র ত্যাগ করা কঠিন হারাম অভিশাপযোগ্য পাপ। আবার রাস্তা বা গণব্যবহারের স্থান থেকে কষ্টদায়ক দ্রব্য সরিয়ে দেওয়া অত্যন্ত বড় সাওয়াবের কাজ। কাজেই আমাদের সর্বদা চেষ্টা করেত হবে আমার দ্বারা যেন এমন কোনো কাজ না হয় যা বর্তমান বা ভবিষ্যত প্রজন্মের কারো ক্ষতি করবে। পরিবেশ বান্ধব, সৃষ্টির কল্যাণমুখি প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও ব্যবহারও একটি বড় ইবাদত, যা আমাদের জন্য সাওয়াব ও বরকত বয়ে আনবে। আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক দান করুন। আমীন।

জুন মাসের তৃতীয় রবিবারঃ বিশ্ব বাবা দিবস

হাযেরীন, জুন মাসের তৃতীয় রবিবারঃ বিশ্ব বাবা দিবস। জুমাদিয়া সানিয়া মাসের তৃতীয় খুতবায় আমরা মাতা এবং পিতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কের ইসলামের দিক নির্দেশনা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। কাজেই এ বিষয়টি সেদিনের জন্য রেখে আজকের মূল বিষয় আমরা শুরু করছি।

২৬ জুনঃ বিশ্ব মাদকমুক্ত দিবস

হাযেরীন, ২৬ জুন বিশ্ব মাদকমুক্ত দিবস। মদ, ড্রাগস, মাদকতা, মাদকাসক্তি, ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে এর ভয়াবহতা, বর্তমান বিশ্বে মদ ও ড্রাগস ব্যবহার জনিত অসুস্থতার পরিমাণ ও এ ভয়াবহ মহামারী থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি যুলকাদ মাসের তৃতীয় খুতবায়। কাজেই এ বিষয়ে আজ আর বিস্তারিত আলোচনা করব না।

জুলাই মাস

জুলাই মাসের ১ম শনিবারঃ আন্তর্জাতিক সমবায় দিবস

হাযেরীন, জুলাই মাসের ১ম শনিবার আন্তর্জাতিক সমবায় দিবস। সমবায় বা পারস্পরিক সহযোগিতা মাধ্যমে নিজেদের কমকাণ্ড নির্বাহ করা আমাদের জন্য অত্যন্ত কল্যাণকর। আল্লাহ বলেন:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

"তোমরা পরস্পরে সহযোগিতা কর কল্যাণ ও তাকওয়ার বিষয়ে। এবং তোমরা পরস্পর সহযোগিতা করো না পাপ ও অত্যাচার-সীমালঙ্ঘনের বিষয়ে।"[২]

---

[১] সূরা রূমঃ ৪১ আয়াত।

[২] সূরা মায়িদাঃ ২ আয়াত।

আগস্ট মাস

১ আগস্ট: বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ দিবস

হাযেরীন, ১ আগস্ট বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ দিবস। পাশ্চাত্য সভ্যতা মানুষের পাশাবিকতা ও অসভ্যতাকে উস্কে দিয়েছে। নারী অধিকারের নামে নারীকে ভোগের পন্য বানিয়েছে। নারীকে নারীত্ব বাদ দিয়ে পুরুষালি কর্ম ও চালচলনে উদ্বুদ্ধ করেছে। নারীকে মাতৃত্ব বাদ দিয়ে সৌন্দর্য চর্চার নামে পরুষের ভোগের দ্রব্য হতে উৎসাহ দিয়েছে। এজন্য পাশ্চাত্যের এবং প্রাচ্যের অনেকে দেশের অনেক নারীই মা হতে রাজি নয়। আর মা হলেও সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়াতে রাজি নয়। এ ছাড়াও নারী অধিকারের নামে মেয়েদেরকে পুরুষের মত কর্মে নামানো হয়েছে, যে কর্ম মাতৃত্বের দায়িত্বের সাথে সাংঘর্ষিক। ফলে অনেক নারীই ইচ্ছা থাকলেও সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়াতে পারে না। ফলে বিকল্প হিসেবে টিন, বোতল বা প্যাকেটের গুড়া বা তরল দুধ খাওয়ানো হয় শিশুদেরকে। আর বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রমাণ করেছে যে, শিশুদের জন্য মায়ের দুধের কোনো বিকল্প নেই। কুরআন কারীমে বারংবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, মায়েরা শিশুদেরেকে দু বছর বুকের দুধ খাওয়াবে। আল্লাহ বলেন:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু বছর বুকের দুধ খাওয়াবে, যে দুধ পান করানোর সময়টি পূর্ণ করতে চায়। আর পিতার উপর দায়িত্ব হলো যথাবিধি তাদের ভরণপোষণ করা।"[১]

দু বছরের মধ্যে যাতে তাদের বুকের দুধ বন্ধ করা যায় সে জন্য ছয় মাস বয়স থেকেই তাদেরকে অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণে অভ্যস্থ করতে হবে। এ বিষয়ে কিছু আলোচনা আমরা করেছি জুমাদিয়াস সানিয়া মাসের চতুর্থ খুতবায়।

সেপ্টেম্বর মাস

৮ সেপ্টেম্বর: বিশ্ব স্বাক্ষরতা দিবস

হাযেরীন, ৮ সেপ্টেম্বর বিশ্ব স্বাক্ষরতা দিবস। শিক্ষা ও স্বাক্ষরতার বিষয়ে আমরা রবিউস সানী মাসের প্রথম খুতবায় আলোচনা করেছি। এজন্য এ বিষয়টিকে সেদিনের জন্য রেখে দিয়ে আমরা আজকের খুতবার আলোচ্য বিষয় শুরু করছি।

২৩ সেপ্টেম্বর: বিশ্ব কন্যা শিশু দিবস

হাযেরীন, ২৩ সেপ্টেম্বর: বিশ্ব কন্যা শিশু দিবস। শিশুদের অধিকার, বিশেষত কন্যা শিশুদের প্রতি বৈষম্য না করার বিষয়ে ইসলামের নির্দেশনা আমরা জুমাদিয়াস সানিয়া মাসের চতুর্থ খুতবায় আলোচনা করেছি। আমরা এ বিষয়ে আর আলোচনা না করে আজকের মূল আলোচনা শুরু করছি।

২৯ সেপ্টেম্বর: বিশ্ব শিশু অধিকার দিবস

হাযেরীন, ২৯ সেপ্টেম্বর বিশ্ব শিশু অধিকার দিবস। শিশুদের অধিকার সম্পর্কে আমরা জুমাদিয়াস সানিয়া মাসের চতুর্থ খুতবায় আলোচনা করেছি। কাজেই এ বিষয়ে আর দীর্ঘ আলোচনা না করে আমরা আজকের মূল আলোচনা শুর করতে চাচ্ছি।

---

[১] সূরা বাকারা: ২৩৩ আয়াত।

অক্টোবর মাস

১ অক্টোবরঃ আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস

হাযেরীন, ১ অক্টোবর আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস। এ দিবসে বৃদ্ধ ও বয়স্ক মানুষদের প্রতি সচেতনতা তৈরির জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এ ছাড়া এ দিবসে বৃদ্ধদেরকে উপহার, মেসেজ ইত্যাদি প্রদান করা হয়। বস্তুত আধুনিক পাশ্চাত্য স্বার্থপর ও আত্মকেন্দ্রিক সভ্যতার অভিশাপে সমাজের বয়স্ক মানুষেরা অত্যন্ত অবহেলিত হন। পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে অধিকাংশ মানুষই বৃদ্ধ পিতামাতার তেমন খোঁজ রাখেন না। একাকী বাড়িতে বা বৃদ্ধ-নিবাসে তারা বসবাস করেন। পানাহার ও জাগতিক বিষয়গুলির ব্যবস্থা থাকলেও পুত্র, কন্যা, পৌত্র, দৌহিত্র ও আপনজনদ সাহচার্য থেকে একেবারেই বঞ্চিত হওয়ার কারণে তারা মানসিকভাবে অত্যন্ত কষ্ট ভোগ করেন। প্রবীণ দিবসে তাদেরকে দয়া করে উপহার, মেসেজ ইত্যাদি দিয়ে থাকে তাদের দূরবাসী পুত্রকন্যা ও আপনজনেরা।

হাযেরীন, ইসলামী সমাজে এ সমস্যাটির কোনো অস্তিত্ব থাকতে পারে না। বৃদ্ধ পিতামাতা, দাদাদাদী, নানানানীকে সেবা করা মানুষের অন্যতম ফরয দায়িত্ব। জুমাদাস সানিয়া মাসের দ্বিতীয় ও তৃতীয় খুতবায় আমরা বান্দার হক্ক ও পিতামাতার হক্ক প্রসঙ্গে এ সকল বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

হাযেরীন, প্রবীন বা বৃদ্ধদের প্রতি দায়িত্ব শুধু পরিবারেরই নয়, বরং সমাজের সকলেরই। প্রবীণদের সম্মান করা, তাদের সম্মানজনক জীবনযাত্রার ব্যবস্থা করা, তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, দেখতে যাওয়া, তাদের বৃদ্ধবয়সের কষ্ট ও অসুবিধা যথাসম্ভব লাঘব করা ইত্যাদি আমাদের সকলের দায়িত্ব। বিভিন্ন হাদীসে বিশেষ করে বয়স্ক, প্রবীন বা বৃদ্ধদের মর্যাদা ও অধিকার আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا (وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا) (يَعْرِفْ شَرَفَ كَبِيرِنَا)

" যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদেরকে স্নেহ করে না এবং আমাদের প্রবীন ও বয়স্কদেরকে সম্মান করে না, তাদের অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন নয় সে ব্যক্তি আমার উম্মত নয়।"[১]

১২ অক্টোবরঃ বিশ্ব আর্থ্রাইটি দিবস

হাযেরীন, ১২ অক্টোবর বিশ্ব আর্থ্রাইটি দিবস। এ দিনে এ রোগটি সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করা হয়। আর্থ্রইটিস (Arthritis) অর্থ গ্রন্থিবাত বা গেঁটেবাত। বস্তুত মানুষের দেহের অস্তিসন্ধি বা জয়ন্টগুলিতে যে বিভিন্ন প্রকারের ব্যাথা, ফোলা, অস্বস্থি বা ব্যবহারের অসুবিধা দেখা দেয় তা সবই আর্থ্রাইটিস বলে গণ্য। অনেক দেশেই মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ১৫ ভাগ বিভিন্ন প্রকারের আর্থ্রাইটিসে আক্রান্ত। ইসলামের দৃষ্টিতে স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যরক্ষার গুরুত্ব, সুস্বাস্থ্য রক্ষায় ইসলামী নির্দেশনা, চিকিৎসা বিষয়ক ইসলামের নির্দেশনা ও অসুস্থ মানুষদের প্রতি আমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি আমরা শাবান মাসের তৃতীয় খুতবায়। কাজেই এ বিষয়ে নতুন আলোচনা না করে আমরা আজকের খুতবার মূল আলোচনা শুরু করতে পারি।

১৫ অক্টোবরঃবিশ্ব সাদা ছড়ি নিরাপত্তা দিবস

হাযেরীন, ১৫ অক্টোবর বিশ্ব সাদা ছড়ি নিরাপত্তা দিবস। সাদা ছড়ি অন্ধদের প্রতীক। তারা সাদা ছড়ি ব্যবহার করেন। এ দিবসে অন্ধদের প্রতি আমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করা হয়।

[১] তিরমিযী, আস-সুনান ৪/৩২১; আবূ দাউদ, আস-সুনান ৪/২৮৬; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১২৭, ৫/৮১, সাহীহুত তারগীব ১/২৪-২৫। হাদীসটি সহীহ।

আমরা ৩রা ডিসেম্বর বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষ্যে প্রতিবন্ধীদের প্রতি আমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে আমরা আলোচনা করেছি। অন্ধগণ হলেন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী। ইসলামের প্রথম মুআয্যিনদের একজন অন্ধ ইবনু উম্ম মাকতূম। অন্ধগণ প্রথম যুগ থেকেই শিক্ষকতা, অধ্যাপনা, চাকরী, ব্যবসায় ইত্যাদি কর্মে সংযুক্ত থেকেছেন। এখনো মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলিতে অনেক অন্ধ তার পেশায় প্রসিদ্ধির শীর্ষে পৌঁছেছেন। গ্রান্ড মুফতী, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর, বিভাগীয় প্রধান, প্রসিদ্ধ কারী, সাহিত্যিক, কবি হিসেবে অনেক অন্ধের নাম আমরা জানি। কিন্তু দুঃখজনক হলো আমাদের দেশে অন্ধ মানেই ভিক্ষুক। এ বেদনা কোথায় রাখব! আমরা কঠিনতম অপরাধ করি অন্ধ শিশু, কিশোর বা মানুষকে অবহেলা বা ঘৃণার চোখে দেখে। অথচ ইসলাম আমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছে সকল দুর্বল ও অসহায়কে অতিরিক্ত সহযোগিতা করতে ও তাদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সচেষ্ট হতে। দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য দায়িত্ব আমাদের সকলের। তাদেরকে প্রয়োজনী সহযোগিতার মাধ্যমে সমাজের মূলধারায় কল্যানমুখী সদস্য করতে হবে। এজন্য যেমন দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য শিক্ষা ও পুনর্বাসনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে, তেমনি তাদের সহযোগিতায় ও তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় আমাদের সকলকেই চেষ্টা করতে হবে্ এরূপ চেষ্টার দ্বারা আমরা তাহাজ্জুদের সালাত, নফল সিয়াম ও যিকরের চেয়েও বেশি সাওয়াব লাভ করব। জুমাদিয়াস সানিয়া মাসের দ্বিতীয় খুতবায় আমরা বান্দার হক্ক বা মানবাধিকার সম্পর্কে আলোচনা করেছি। আর যুলহাজ্জ মাসের দ্বিতীয় খুতবায় আমরা খিদমাতে খালক বা সৃষ্টির সেবা সম্পর্কে আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি যে, যারা দুর্বল ও অসহায় তাদের অধিকার আদায় এবং তাদের খিদমত ও সেবা করা আল্লাহর রহমত এবং দুনিয়া ও আখিরাতের বরকত লাভের অন্যতম পথ। কাজেই প্রতিবন্ধীদের সেবায় এগিয়ে আসুন। তাদের অধিকার সংরক্ষণের জন্য চেষ্টা করুন। আর এগুলি দুনিয়ার স্বার্থে করবেন না। সাধ্যমত একমাত্র মহান আল্লাহর রহমত ও পুরস্কার লাভের নিয়্যাতে তা করুন। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন। আমীন।

১৬ অক্টোবর: বিশ্ব খাদ্য দিবস

হাযেরীন, ১৬ অক্টোবর: বিশ্ব খাদ্য দিবস। যে বিশ্বে মানুষকে খাদ্য বঞ্চিত করে বায়োডিজেল উৎপন্ন করা হচ্ছে, যে বিশ্বে মুক্ত বাজার অর্থনীতির নামে খাদ্যের উপরে বহুজাতিক কোম্পানিগুলির কতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা হচেছ, যে বিশ্বে খাদ্যের মূল্য বৃদ্ধির জন্য মানুষের খাদ্য সমূদ্রে ফেলে দেওয়া হচ্ছে সে বিশ্বে বিশ্ব খাদ্য দিবসে কি বা মূল্য আছে।

হাযেরীন, সকল মানুষের জন্য খাদ্যকে সহজলভ্য করতে ইসলাম খাদ্যদ্রব্য গুদামজাত বা মজুদদারি করা নিষিদ্ধ করেছে।

মানুষের কষ্ট প্রদানের একটি বিশেষ দিক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করা বা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে খাদ্যদ্রব্য গুদামজাত করে রাখা। হাদীস শরীফে এরূপ করাকে সুস্পষ্ট কঠিন পাপ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অনেক ধার্মিক মুসলিম তার সম্পদের যাকাত প্রদান করেন, কিন্তু না জানার কারণে হয়ত মজুদদারীর মাধ্যমে কঠিন পাপে নিপতিত হন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

مَنْ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ. لا يَحْتَكِرُ إِلا خَاطِئٌ

"যে ব্যক্তি গুদামজাত করে সে ব্যক্তি পাপী। একমাত্র পাপী ব্যক্তি ছাড়া কেউ গুদামজাত করে না।"[১]

---

[১] সহীহ মুসলিম ৩/১২২৭।

এ হাদীস থেকে স্পষ্টতই বুঝা যায় যে, ব্যবহারের প্রয়োজন ছাড়া যে কোনো প্রকারের পণ্য যে কোনো উদ্দেশ্যে গুদাজাত করে আটকে রাখা নিষিদ্ধ ও পাপ। আর যদি এরূপ গুদামজাত কৃত পণ্য খাদ্য বা জনগণের নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য হয় আর গুদামজাতের উদ্দেশ্য দ্রব্যমূলবৃদ্ধির মাধ্যমে সাধারণ জনগণকে কষ্ট দিয়ে নিজের কিছু কামাই করা হয় তবে তা নিঃসন্দেহে মুমিনের ঈমানের দাবি ও ইসলামী মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক। অন্য হাদীসে বলা হয়েছেঃ

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يُحْتَكَرَ الطَّعَامُ

"রাসূলুল্লাহ ﷺ খাদ্য জাতীয় পন্য গুদামজাত করতে নিষেধ করেছেন।"[১]

৩১ অক্টোবরঃ বিশ্ব মিতব্যয়িতা দিবস

হাযেরীন, ৩১ অক্টোবর বিশ্ব মিতব্যয়িতা দিবস। এ দিবসে অপচয় রোধের বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন অনুষ্ঠান করা হয়। মিত্যবায়িতা বা ব্যয়ের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা এবং অপচয় পরিহার করা ইসলামের বিশেষ নির্দেশ মহান আল্লাহ বলেনঃ

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

"তোমরা আহার কর এবং পান কর, আর অপচয় করো না; তিনি অপচয়কারীদের ভালবাসেন না।"[২]

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেছেনঃ

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

"নিশ্চয় অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই এবং শয়তান তার রব্বে প্রতি অবিশ্বাসী।"[৩]

নভেম্বর মাস

১ নভেম্বরঃ জাতীয় যুব দিবস

হাযেরীন, ১ নভেম্বর জাতীয় যুব দিবস। জাতির জীবনে যুবকদের গুরুত্ব বুঝাতে ওয়াজ আলোচনার প্রয়োজন হয় না। যুবকদের প্রতি দায়িত্ব আমাদের বহুমুখি। তাদের প্রতি দায়িত্ব রয়েছে তাদের পিতামাতা ও পরিবারের, তাদের আশপাশের মানুষদের এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের। সর্বোপরি যুবকদের নিজেদের রয়েছে নিজেদের প্রতি দায়িত্ব। আমরা জুমাদাস সানিয়া মাসের চতুর্থ খুতবায় সন্ত ান প্রতিপালন বিষয়ক আলোচনায় দেখেছি যে, সন্তানদেরকে মনোদৈহিকভাবে শক্তিশালী, পরিশ্রমী ও সৎ হিসেবে গড়ে তোলা আমাদের প্রত্যেকের অন্যতম ফরয দায়িত্ব। এছাড়া যুলকাদ মাসের দ্বিতীয় ও তৃতীয় খুতবায় ভালবাসা দিবস, অশ্লীলতা, মাদকতা, ধুমপান ইত্যাদি বিষয় আলোচনার সময় আমরা যুব সমাজের উচ্ছলতাকে বাণিজ্যিক পণ্যে রূপান্তরিত করার জন্য আন্তর্জাতিক ও জাতীয় বেনিয়া সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্তের বিষয়ে সজাগ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি যে, যুব সমাজকে শিক্ষা, ইবাদত, শরীরচর্চা মূলক খেলাধুলা ও সমাজগঠনমূলক কাজে ব্যস্ত রাখতে হবে।

হাযেরীন, যুব সমাজকে কর্মমুখি চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে হবে। পরনির্ভরতা নয়, বরং নিজের শ্রমে নিজের জীবন চালানোই যে সর্বোচ্চ মর্যাদা তা আমাদের সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। নইলে যুব সমাজ কর্মবিমুখ ও পরনির্ভর হয়ে পড়বে। সহজে টাকা কামানোর জন্য দুর্নীতি ও অসৎ পথে পা বাড়াবে।

---

[১] হাকিম, আলমুসতাদরাক ২/১৪; বাইহাকী, শু'আবুল ঈমান ৭/৫২৫।
[২] সূরা আরাফ: ৩১-৩২ আয়াত।
[৩] সূরা বনী ইসরাঈল: ২৭ আয়াত।

জুমাদাস সানিয়া মাসের প্রথম খুতবায় হালাল ও হারাম উপার্জন সম্পর্কে আলোচনায় এবং রজব মাসের দ্বিতীয় খুতবায় শ্রম ও শ্রমিকের অধিকার বিষয়ক আলোচনায় আমরা ইসলামে শ্রমের গুরুত্ব ও বেকারত্ব ও পরমুখাপেক্ষিতার নিন্দা সম্পর্কে আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি যে, যে যুবক শ্রমে ও কর্মে লিপ্ত সে জিহাদের ময়দানের মুজাহিদের মতই সাওয়াব লাভ করে।

হাযেরীন, যুবকদের দায়িত্ব রয়েছে নিজেদের প্রতি। যৌবন মহান আল্লাহ্র বড় নেয়ামত। এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা না করে আল্লাহ কাউকে ছুটি দিবেন না। এছাড়া যৌবনের ইবাদত সবচেয়ে বেশি মর্যাদাময়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

لا تَزُولُ قَدَمُ ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ

"কিয়ামতের দিন পাঁচটি বিষয়ে জিজ্ঞাসিত না হওয়া পর্যন্ত কোনো মানুষ তার পা সরাতে পারবে না: (১) তার জীবন কিভাবে কাটিয়েছে, (২) তার যৌবন কিসের পিছনে ব্যয় করেছে, (৩) তার সম্পদ কিভাবে উপার্জন করেছে, (৪) তার সম্পদ কিভাবে ব্যয় করেছে এবং (৫) সে যা জেনেছিল সে বিষয়ে কি কর্ম করেছিল।[১]

অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ

"সাত শ্রেণীর মানুষকে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাঁর (আরশের) ছায়ায় আশ্রয় দিবেন... দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ সে যুবক-যুবতী তার রব্বের ইবাদতের মধ্য দিয়ে বড় হয়েছে।"[২]

২১ নভেম্বর: সশস্ত্র বাহিনী দিবস

হাযেরীন, ২১ নভেম্বর সশস্ত্র বাহিনী দিবস। সশস্ত্র বাহিনী দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও নাগরিকদের নিরাপত্তা রক্ষা করেন। আর এই হলো ইসলামের পারিভাষিক জিহাদ। শাওয়াল মাসের তৃতীয় খুতবায় আমরা জিহাদ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এ বিষয়ে আর বিস্তারিত আলোচনা না করে এখন আমরা আজকের খুতবার আলোচ্য বিষয় শুরু করছি।

২৫ নভেম্বর: আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন বিলোপ দিবস

হাযেরীন, ২৫ নভেম্বর: আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন বিলোপ দিবস হিসেবে ঘোষিত। এ দিনে নারী নির্যাতনের বিরোধী প্রচারণা জোরদার করা হয়। সমাজের দুর্বলের প্রতি সবলের নির্যাতন মানুষের পশুত্বের একটি অতি প্রাচীন প্রকাশ। নারীও সৃষ্টিগতভাবে শক্তিতে পুরুষের চেয়ে দুর্বল। এজন্য বিভিন্নভাবে সে নির্যাতনের স্বীকার হয়েছে। বেছে বেছে কয়েকজন নারীকে মন্ত্রী বানালে, কোটা করে কয়েকজন নারীকে এমপি বানালে বা চেয়ারম্যান মেম্বার বানলে এ নির্যাতন বিলোপ হবে না। রেডিও টেলিভিশন, ইলেকট্রনিক মিডিয়া ও গণমাধ্যমে কোটি টাকার প্রচারণাতেও বিশেষ কিছুই হবে না। কঠিন ও শক্ত আইন করেও বেশি কিছু হবে না। এ নির্যাতন বন্ধ করতে হবে সবচেয়ে বড় বিষয় হলো মানুষের মধ্যে তাকওয়া বা আল্লাহ-ভীতি সৃষ্টি করতে হবে।

হাযেরীন, মানুষের মধ্যে রয়েছে পশু প্রকৃতি। পশু যেমন ভয় ও লোভের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়

---

[১] তিরমিযী, আস-সুনান ৪/৬১২; আলবানী, সহীহুত তারগীব ১/৩০, ২/১৪৯, ৩/২২৭। হাদীসটি সহীহ।

[২] বুখারী, আস-সহীহ ১/২৩৪, ২/৫১৭, ৫/২৩৭৭, ৬/২৪৯৬; মুসলিম, আস-সহীহ ২/৭১৫।

তেমনি মানুষের পশু প্রকৃতিও ভয় ও লোভের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়। দুর্বলের উপরে সবলের নির্যাতনের মাধ্যমে সবল নগদ কিছু লাভ পায়। সে তার ক্রোধ ও জিঘাংসা চরিতার্থ করে, সম্পদ কুক্ষিগত করে বা দেহের কোনো চাহিদা মেটায়। এ নগদ লাভ কেন সে বাদ দেবে? আপনার কোটি টাকার প্রচারণার কারণে? বিবেকের তাড়নায়? কখনোই নয়। তার মধ্যে লোভ ও ভয় না থাকলে কখনোই সে তার নগত লাভ ছাড়বে না। এ লোভ ও ভয় সমাজের হতে পারে, রাষ্ট্রের বা আইনের হতে পারে। এগুলিও মানুষের পশুত্ব নিয়ন্ত্রণ করে। তবে মানুষ জানে যে, সমাজের প্রশংসা বা নিন্দা পাশ কাটানো যায়। রাষ্ট্রের আইনকে ফাকি দেওয়া যায়। এজন্য আল্লাহর ভয়ই মানুষকে পরিপূর্ণ সততার দিকে নিয়ে যায়। মানুষ যখন অবচেতন থেকে বিশ্বাস করে যে, আমি নির্যাতন করলে আল্লাহ অবশ্যই আমাকে দুনিয়াতে এবং আখিরাতে শাস্তি দিবেন এবং আমি নির্যাতন থেকে বিরত থাকলে আল্লাহ অবশ্যই আমাকে দুনিয়া ও আখিরাতে পুরস্কৃত করবেন তখন সে খুব সহজেই নির্যাতন ও সকল অপরাধ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে। এক্ষেত্রে অধিকার আদায়ের গুরুত্ব ও নির্যাতনের ভয়াবহতা সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনা জানাই তার জন্য যথেষ্ট।

হাযেরীন, আমরা জুমাদিয়াস সানী মাসের দ্বিতীয় খুতবায় সাধারণভাবে মানবাধিকার, তৃতীয় খুতবায় মাতার অধিকার, চতুর্থ খুতবায় কন্যা শিশুর অধিকার, রজব মাসের প্রথম খুতবায় নারীর অধিকার এবং তৃতীয় খুতবায় স্ত্রীর অধিকার বিষয়ে আলোচনা করেছি। আমরা যদি সত্যিকারেই নারী নির্যাতন বন্ধ করতে চাই তাহলে কুরআন ও হাদীসের এ সকল শিক্ষা শ্রদ্ধেয় আলিমদের মাধ্যমে গণমাধ্যমে প্রচার করতে হবে। অন্যথায় এ বিষয়ক প্রচারণা বিশেষ কোনো ফল দেবে না।

ডিসেম্বর মাস

১ ডিসেম্বরঃ বিশ্ব এইডস দিবস

হাযেরীন, ১ ডিসেম্বর বিশ্ব এইডস দিবস। এ দিনে সারা বিশ্বে এইডস বিরোধী প্রচারণা জোরদার করা হয়। এইডস-এর মূল কারণ হলো অশ্লীলতা ও মাদকতা। ব্যভিচার ও মাদকদ্রব্য ব্যবহার ছাড়া এইডস-এর আর একটিই পথ থাকে তা হলো রক্ত। এইডস আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত গ্রহণ করলে বা আক্রান্ত ব্যক্তি যে সিরিঞ্জে ইনজেকশন নিয়েছে তা ব্যবহার করলে, বা যে ব্লেটে শেভ করতে যেয়ে তার রক্ত লেগেছে সে ব্লেটে সুস্থ মানুষের দেহ কাটলে রক্তের মাধ্যমে এইডস ছড়াতে পারে। ব্যভিচার ও মাদকতা বা ড্রাগসের ব্যবহার বন্ধ করতে পারলে এভাবে রক্তের মাধ্যমে এইডস ছড়ানোর সম্ভাবনা প্রায় শুন্যের কোটায় চলে আসে। আর রক্ত বা সিরিঞ্জ ব্যবহারে সতর্কতা খুবই সহজ। মূলত ব্যভিচার, সমকামিতা ও মাদকাশক্তিই হলো এইডসের মূল কারণ। ইসলাম তা বন্ধ করেছে। তাই মুসলিম সমাজগুলিতে এইডসের প্রাদুর্ভাব নেই। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য সভ্যতা এগুলি বন্ধ না করে, বরং আরো বেশি খুলে দিয়ে, পাশাপাশি সতর্কতার কথা বলে এইডস বন্ধ করার চেষ্টা করছে। ফলে তারা ব্যর্থ হচ্ছে।

হাযেরীন, এইডস-এর মহামারী থেকে রক্ষা পেতে ব্যভিচার, ছেলেমেয়েদের অবাধ মেলামেশা ও ব্যভিচারের পথে পরিচালনা করতে পারে এরূপ বেহায়াপনার পথ রোধ করা ছাড়া কোনো উপায় নেই। এ বিষয়ে আমরা যুলকাদ মাসের দ্বিতীয় খুতবায় বিস্তারিত আলোচনা করেছি। তাই আজ এ বিষয়ে আর বিস্তারিত আলোচনা না করে আজকের খুতবার মূল বিষয়ে চলে যাচ্ছি।

৩ ডিসেম্বরঃ বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস

হাযেরীন, ৪ এপ্রিল বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস হিসেবে ঘোষিত। শারীরিক বা মানসিক অসুবিধা বা

দুর্বলতার কারণে স্বাভাবিক কাজকর্মে অসুবিধা হয় এরূপ সকলকেই ইংরেজিতে disable, handicaped ও বাংলায় প্রতিবন্ধী বলতে বুঝায়। কেউ জন্মগতভাবে প্রতিবন্ধী এবং কেউ বা কোনো দুর্ঘটনার কারণে চোখ, কান, হাত, পা বা অন্যান্য অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ বা শক্তি হারিয়ে প্রতিবন্ধী হয়েছেন। আন্তর্জানিক সংস্থাগুলির হিসাব অনুসারে আমাদের দেশের জনসংখ্যার শতকরা দশভাগ প্রতিবন্ধী। অর্থাৎ পনের কোটি জনগণের মধ্যে প্রায় দেড় কোটি মানুষ প্রতিবন্ধী। অথচ আমাদের সমাজের মূলধারায়, চাকুরী, কর্ম, ব্যবসায়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আমরা এ সকল প্রতিবন্ধীদের দেখতে পাই না। তাহলে এরা কোথায়? এরা ভিক্ষা ও অন্যান্য অসামাজিক কাজে লিপ্ত। এজন্য দায়ী আমরা। বিশ্বের অন্যান্য দেশ, বা মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলি দেখুন। শতশত অন্ধ বা দৃষ্টি প্রৃতিবন্ধী, শ্রবণ প্রতিবন্ধী, হুইল চেয়ারে বসা বা অনুরূপ প্রতিবন্ধী মানুষ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্র, মন্ত্রী, সরকারী কর্মকর্তা, মুফতী, ইমাম ইত্যাদি কর্মে নিয়োজিত রয়েছেন।

হাযেরীন, আমরা প্রতিবন্ধীদের "অসুস্থ" বলে মনে করি এবং তাদেরকে ঘৃণা করি বা অবহেলা করি। এরূপ করা কঠিন পাপ ও মানুষের প্রতি অবিচারের জুলুম। প্রতিবন্ধীগণকে ঘৃণা করে জুলুম ও পাপে নিপতিত হবেন না বা আল্লাহর গযব ডেকে আনবেন না। প্রতিবন্ধীদেরকে সাহায্য করার মাধ্যমে আল্লাহর রহমত অর্জন করুন। জুমাদিয়াস সানিয়া মাসের দ্বিতীয় খুতবায় আমরা বান্দার হক্ক বা মানবাধিকার সম্পর্কে আলোচনা করেছি। আর যুলহাজ্জ মাসের দ্বিতীয় খুতবায় আমরা খিদমাতে খালক বা সৃষ্টির সেবা সম্পর্কে আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি যে, যারা দুর্বল ও অসহায় তাদের অধিকার আদায় এবং তাদের খিদমত ও সেবা করা আল্লাহর রহমত এবং দুনিয়া ও আখিরাতের বরকত লাভের অন্যতম পথ। কাজেই প্রতিবন্ধীদের সেবায় এগিয়ে আসুন। তাদের অধিকার সংরক্ষণের জন্য চেষ্টা করুন। আর এগুলি দুনিয়ার স্বার্থে করবেন না। সাধ্যমত একমাত্র মহান আল্লাহর রহমত ও পুরস্কার লাভের নিয়্যাতে তা করুন। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন। আমীন।

৯ ডিসেম্বর বেগম রোকেয়া দিবস

হাযেরীন, ৯ ডিসেম্বর বেগম রোকেয়া দিবস হিসেবে জাতীয় পর্যায়ে ঘোষিত ও পালিত। বেগম রোকেয়া ১৮৮০ খৃস্টাব্দে রংপুরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৩২ খৃস্টাব্দের মৃত্যুবরণ করেন। তৎকালীন সময়ে সমাজের শরীফ বা সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারগুলি মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোকে "শারাফাত" বা কৌলিন্যের অন্তরায় বলে মনে করত। অনেকেই পর্দার নামে অবরোধ প্রথা অনুসরণ করতেন এবং মেয়েদের লেখাপড়া শেখাতেন না। বেগম রোকেয় নিজের চেষ্টায় লেখাপড়া শিখেন এবং মুসলিম মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের জন্য দেশে এবং পরে কোলকাতায় ১৯১১ সালে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, যা ১৯৩১ সালে মাধ্যমিক স্কুলে রূপান্তরিত হয়। তিনি তার স্কুলে ছাত্রীদেরকে তাফসির-সহ কুরআন পাঠ থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দান করতেন। বেগম রোকেয়া পর্দার ভিতরে থেকেই মুসলিম নারীদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। এজন্য তাকে বাংলার নারী জাগরণের অগ্রদূত বলে গণ্য করা হয়। সে যুগে বাংলার অভিজাত শ্রেণীর মুসলিমদের ভাষা ছিল উর্দু। কিন্তু বেগম রোকেয়া বাংলার পক্ষে ছিলেন। ১৯২৭ সালে বঙ্গীয় নারী শিক্ষা সম্মেলনে তিনি বাংলা ভাষার পক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখেন। মুসলিম নারীদের মেধ্য সচেতনতা তৈরির জন্য তিনি ১৯১৬ সালে "আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম" বা "মুসলিম মহিলা সমিতি" প্রতিষ্ঠা করেন।

হাযেরীন, আমাদের জাতীয় জীবনের উন্নয়নে যারা অবদান রেখেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা

প্রকাশ করা আমাদের দায়িত্ব। তবে আমরা লক্ষ্য করি যে, অনেক সময় এদের অবদানকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করা হয়। প্রায়ই মুসলিম নারীদের শিক্ষা না দেওয়ার জন্য ইসলামকেই দায়ী করা হয়। অথচ এর মূল কারণ ছিল ইসলাম সম্পর্কে সমাজের মুসলিমদের অজ্ঞতা। জুমাদাল উলা মাসের প্রথম খুতবায় আমরা ইসলামের পর্দা ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি যে, ইসলামের পর্দা ব্যবস্থা কখনোই অবরোধ প্রথা নয়। ইসলামের সোনালি যুগে মুসলিম নারীগণ শিক্ষা, ব্যবসা, বাণিজ্য, চাকরী, যুদ্ধ ও অন্যান্য সকল কর্মে পর্দা-সহ অংশগ্রহণ করেছেন। বেগম রোকেয়ার সময়ে, আগে ও পরে অনেক মুসলিম আলিম, পীর ও সমাজ সংস্কারক মুসলিম সমাজের কুসংস্কার দূর করে নারী শিক্ষার কথা বলেছেন। এদের সকলের জন্যই আমরা দুআ করি।

১০ ডিসেম্বরঃ বিশ্ব মানবাধিকার দিবস

হাযেরীন, ১০ ডিসেম্বর মানবাধিকার দিবস। এ দিনে বিশ্বের কোনো কোনো দেশে মানবাধিকার বিষয়ক সচেতনতার জন্য বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কোনো কোনো দেশে দিনটি সরকারী ছুটি হিসেবে পালিত। ইসলামের দৃষ্টিতে মানবাধিকার এবং মানবাধিকার রক্ষায় ইসলামের নির্দেশনা সম্পর্কে আমরা জুমাদিয়াস সানিয়া মাসের দ্বিতীয় খুতবায় বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এজন্য আজ এ বিষয়ে পুনরায় আলোচনা না করে আমরা আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় শুরু করছি।

১৪ ডিসেম্বরঃ শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস

হাযেরীন, ১৪ ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবি দিবস। আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাসে এ দিবসটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামের দৃষ্টিতে স্বাধীনতা, স্বাধীনতার জন্য আত্মত্যাগ, শহীদদের প্রতি আমাদের করণীয় ইত্যাদি বিষয়ে শাওয়াল মাসের ৪র্থ খুতবায় আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না সে আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞ।" এ নির্দেশনার আলোকে আমরা যারা মুক্তিযুদ্ধে নিহত হয়েছেন এবং স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যে কোনোভাবে যারা অবদান রেখেছেন তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং তাদের মধ্যে যারা ঈমানসহ মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের আখিরাতের নাজাত ও মাগফিরাতের জন্য দুআ করে আমরা আজকের খুতবার মূল বিষয়ের আলোচনা শুরু করছি।

১৬ ডিসেম্বরঃ বিজয় দিবস

হাযেরীন, ১৬ ডিসেম্বর আমাদের বিজয় দিবস। এ দিনে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে এবং পাক বাহিনী আত্মসমর্পন করে। স্বাধীনতা ও বিজয়ের গুরুত্ব, এর সংরক্ষণে আমাদের দায়িত্ব ও বিজয় স্মরণে আমাদের করণীয় সম্পর্কে আমরা শাওয়াল মাসের ৪র্থ খুতবায় আলোচনা করেছি। মহান আল্লাহর কাছে আমাদের বিজয়ের স্থায়িত্বের দুআ করে আজকের আলোচনা শুরু করছি।

জাতীয় বৃক্ষরোপন পক্ষঃ

হাযেরীন, মুমিনের জীবনের অন্যতম ইবাদত হলো বৃক্ষরোপন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا (وَلاَ يَزْرَعُ زَرْعاً) إِلا كَانَ مَا أُكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةً وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةً وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَتْ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَلا يَرْزَؤُهُ أَحَدٌ إِلا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ

"যে কোনো মুসলিম যদি কোনো বৃক্ষ রোপন করে, অথবা কোনো ফসল বপন বা রোপন করে তবে তার বৃক্ষ বা ফসল থেকে কোনো কিছু ভক্ষণ করা হলে তা তার জন্য দান হিসেবে গণ্য করা হয়,

তা থেকে কোনো কিছু চুরি করা হলে তা তার জন্য দান হিসেবে গণ্য করা হয়, কোনো বণ্য প্রাণী তা থেকে খেলে তা তার জন্য দান হিসেবে গণ্য করা হয়, কোনো পাখী তা থেকে খেলে তা তার জন্য দান হিসেবে গণ্য করা হয়, কেউ তার ফসল নষ্ট করলেও তা তার জন্য দান হিসেবে গণ্য করা হয়।"[১]

অন্য হাদীসে তিনি বলেন:

لا يَغْرِسُ الْمُسْلِمُ غَرْسًا فَيَأْكُلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلا دَابَّةٌ وَلا طَيْرٌ إِلا كَانَ لَهُ صَدَقَةً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

"কোনো মুসলিম কোনো বৃক্ষ রোপন করলে তা থেকে কোনো মানুষ, পশু বা পাখি কিছু ভক্ষণ করলে কিয়ামত পর্যন্ত তা তার জন্য দান হিসেবে গণ্য হয়।"[২]

অন্য হাদীসে তিনি বলেন:

مَا مِنْ رَجُلٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلا كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ مِنَ الأَجْرِ قَدْرَ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرِ ذَلِكَ الْغَرْسِ

"যে কোনো মানুষ যদি কোনো কিছু রোপন করে তবে তা থেকে যে পরিমান ফল-ফসল উপপাদিত হয় সে পরিমান সাওয়াব তার জন্য আল্লাহ্ লিপিবদ্ধ করেন।"[৩]

অন্য হাদীসে তিনি বলেন:

مَا مِنْ شَيْءٍ يُصِيبُ زَرْعَ أَحَدِكُمْ مِنَ الْعَوَافِي إِلاَّ كَتَبَ اللهُ بِهِ أَجْراً

"তোমাদের কারো কোনো ফসল যদি কোনোপ্রকার দুর্যোগ বা আপদে নষ্টও হয় তবে তার জন্যও আল্লাহ্ সাওয়াব লিখবেন।"[৪]

অন্য হাদীসে তিনি বলেন:

إِنْ قَامَتِ السَّاعَةُ وَبِيَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لاَ يَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلْيَفْعَلْ

"যদি কিয়ামত শুরু হয়ে যায়, আর তোমাদের কারো হাতে একটি গাছের চারা থাকে তবে যদি তার পক্ষে সম্ভব হয় তবে সে যেন চারাটি রোপন না করে না উঠে।"[৫]

---

[১] বুখারী, আস-সহীহ ২/৮১৭; মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১১৮৮-১১৮৯।

[২] মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১১৮৯।

[৩] আহমদ, আল-মুসনাদ ৫/৪১৫; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৪/৬৭। হাদীসটির সনদ মোটামুটি গ্রহণযোগ্য।

[৪] হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৪/৬৮। হাদীসটির সনদ মোটামুটি গ্রহণযোগ্য।

[৫] যিয়া মাকদিসী, আল-মুখতারাহ ৭/২৬২-২৬৪; হাইসামী মাজমাউয যাওয়াইদ ৪/৬৩। হাদীসটি সহীহ।

সকল জুমুআর সানী খুতবা

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَـــهُ وَأَنَّ مُحَمَّـــدًا عَبْـــدُهُ وَرَسُولُهُ.

أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيث كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُـــدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَـــةٍ بِدْعَـــةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَـــى إِبْـــرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَـــى إِبْـــرَاهِيمَ وَعَلَـــى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِيْنَ، خُصُوصاً مِنْهُمْ

الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ، أَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، وَعَنِ التَّابِعِيْنَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ،

اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيبَاتِ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلْ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.

গ্রন্থপঞ্জী

এ খুতবা-গ্রন্থটি রচনায় যে সকল থেকে তথ্য গ্রহণ করা হয়েছে বা উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে সেগুলির একটি মোটামুটি তালিকা নিম্নে প্রদান করা হলো। পাঠক ও গবেষকদের সুবিধার্থে গ্রন্থাকারগণের মৃত্যুতারিখের ভিত্তিতে ঐতিহাসিক ক্রম অনুসারে সাজানো হলো।

১. আল-কুরআনুল কারীম।
২. আবূ হানীফা, ইমাম, নু'মান ইবনু সাবিত, আল-ফিকহুল আকবার, মোল্লা আলী কারীর শারহ-সহ, (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ ১৯৮৪)
৩. মা'মার ইবনু রাশিদ (১৫১ হি), আল-জামিয় (বৈরুত, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ২য় প্রকাশ, ১৪০৩ হি)
৪. মালিক ইবনু আনাস (১৭৯ হি), আল-মুআত্তা (মিশর, দারু এহইয়ায়িত তুরাস আল-আরাবী)
৫. ইবনুল মুবারাক, আব্দুল্লাহ (১৮১ হি), আয-যুহদ (বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ)
৬. আবু ইউসূফ ইয়াকুব ইবনু ইবরাহীম আল-আনসারী, (১৮২ হি.), (কিতাবুল আসার, বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৩৫৫ হি)
৭. মুহাম্মাদ ইবনে হাসান আশ-শাইবানী (১৮৯ হি.), কিতাবুল আসার (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৯৯৩)
৮. মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান, কিতাবুল আসল বা আল-মাবসূত, করাচি, ইদারাতুল কুরআন
৯. আবু দাউদ তায়ালিসী, সুলাইমান ইবনু দাউদ (২০৪ হি), আল-মুসনাদ (বৈরুত, দারুল মা'রিফাহ)
১০. আব্দুর রাযযাক সান'আনী (২১১ হি), আল-মুসান্নাফ (বৈরুত, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ২য় প্রকাশ, ১৪০৩ হি)
১১. ইবনে হিশাম (২১৩হি.), আস-সীরাতুন নাবাবীয়্যাহ (মিশর, কায়রো, দারুর রাইয়ান, ১ম প্র. ১৯৭৮)
১২. ইবনু সা'দ, মুহাম্মাদ (২৩০ হি) আত-তাবাকাতুল কুবরা (বৈরুত, দারু সাদির)
১৩. ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, আল-কিসমুল মুতাম্মিম (মদীনা মুনাওয়ারা, মাকতাবাতুল উলূম ওয়াল হিকাম, ২য় প্রকাশ, ১৪০৮)
১৪. ইবনু আবী শাইবা, আবু বাকর আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ (২৩৫ হি), আল-মুসান্নাফ (রিয়াদ, সৌদি আরব, মাকতাবাতুর রুশদ, ১ম প্রকাশ, ১৪০৯ হি)
১৫. আহমদ ইবনু হাম্বাল (২৪১হি), আল-মুসনাদ (কাইরো, মুআসসাসাতু কুরতুবাহ, ও দারুল মা'আরিফ, ১৯৫৮)
১৬. আবদ ইবনু হুমাইদ (২৪৯ হি), আল-মুসনাদ (কাইরো, মাকতাবাতুস সুন্নাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৮)
১৭. দারিমী, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দুর রাহমান (২৫৫ হি), আস-সুনান (বৈরুত, দারুল কিতাব আল-আরাবী, ১ম, ১৪০৭হি)
১৮. বুখারী, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল (২৫৬ হি), আস-সহীহ (বৈরুত, দারু কাসীর, ইয়ামাহ, ২য় প্রকাশ, ১৯৮৭)
১৯. বুখারী, খালকু আফআলিল ইবাদ (রিয়াদ, দারুল মাআরিফ, ১৯৭৮)
২০. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (২৬১হি), আস-সহীহ (কাইরো, মিশর, দারু এহইয়াইল কুতুবিল আরাবিয়্যা)
২১. আবু দাউদ, সুলাইমান ইবনু আশ'আস (২৭৫হি), আস-সুনান (বৈরুত, লেবানন, দারুল ফিকর)
২২. ইবনু মাজাহ, মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযিদ (২৭৫ হি.), আস-সুনান (বৈরুত, লেবানন, দারুল ফিকর)
২৩. তিরমিযী, মুহাম্মাদ ইবনু ঈসা (২৭৯ হি), আস-সুনান (বৈরুত, লেবানন, দারু এহইয়াইত তুরাস আল-আরাবী)
২৪. তিরমিযী, মুহাম্মাদ ইবনু ঈসা, আল-শামাঈল আল-মুহাম্মাদিয়্যাহ (মক্কা মুকাররামাহ, আল-মাকতাবাহ আল-তিজারিয়্যাহ, ৪র্থ মুদ্রন, ১৯৯৬)
২৫. ইবনু আবিদ দুনিয়া, আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ (২৮১ হি), মাকারিমুল আখলাক (কাইরো, মাকতাবাতুল কুরআন, ১৯৯০)
২৬. ইবনু আবীদ দুনিয়া, কিতাবুস সামত ও আদাবুল লিসান, মাওসূআতু ইবনে আবীদ দুনিয়া (বৈরুত, মুআস্সাসাতুল কুতুবিস সাকাফিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৩)
২৭. ইবনু আবি আসিম, আবূ বাকর (২৮৭ হি), কিতাবুস সুন্নাহ (বৈরুত, আল-মাকতাব আল-ইসলামী, ৩য়, ১৯৯৩)
২৮. আল-বাযযার, আবু বকর আহমদ ইবনু আমর (২৯২ হি.), আল-মুসনাদ (মদীনা মুনাওয়ারাহ, মাকতাবাতুল উলূম ওয়াল হিকাম, ১৪০৯ হি., ১ম প্রকাশ)
২৯. মুহাম্মাদ ইবনু নাসর আল-মারওয়াযী (২৯৪হিঃ), তা'যীমু কাদরিস সালাত (মদীনা মুনাওয়ারা, মাকতাবাতুদ দার, ১ম প্রকাশ, ১৪০৬হিঃ)

৩০. মুহাম্মাদ ইবনু নাসর আল-মারওয়াযী (২৯৪ হি), আস-সুন্নাহ (বৈরুত, মুআস্সাসাতুল কুতুবিস সাকাফিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪০৮ হি)
৩১. নাসাঈ, আহমদ ইবনু শু'আইব (৩০৩ হি) আস-সুনানুল কুবরা (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম, ১৯৯১)
৩২. নাসাঈ, আহমদ ইবনু শুআইব, আস-সুনান (হালাব, মাকতাবুল মাতবূ'আত আল-ইসলামিয়্যাহ, ২য়, ১৯৮৬)
৩৩. আবু ইয়ালা আল-মাউসিলী, আহমদ ইবনু আলী (৩০৭ হি), আল-মুসনাদ (দামেশক, দারুল মামূন, ১ম, ১৯৮৪)
৩৪. ইবনুল জারূদ, আব্দুল্লাহ ইবনু আলী (৩০৭ হি.) আল-মুনতাকা, বৈরুত, সাকাফিয়্যাহ, ১ম, ১৯৮৮)
৩৫. তাবারী, আবু জা'ফর মুহাম্মাদ ইবনু জারীর (৩১০ হি), তাফসীর: জামিউল বায়ান (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১৪০৫ হি)
৩৬. তাবারী, মুহাম্মাদ ইবনু জারীর (৩১০ হি), তারীখ তাবারী: তারীখুল উমামি ওয়াল মুলূক (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪০৭ হি)
৩৭. ইবনু খুযাইমা, আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক (৩১১ হি), আস-সহীহ (বৈরুত, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৯৭০)
৩৮. ইবনু খুযাইমা, কিতাবুত তাওহীদ (রিয়াদ, মাকতাবাতুর রুশদ, ৬ষ্ঠ প্রকাশ, ১৯৯৭)
৩৯. তাহাবী, আবু জাফর আহমদ ইবনু মুহাম্মাদ (৩২১ হি), শারহু মা'আনীল আসার (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৩৯৯ হি)
৪০. তাহাবী, আবু জাফর, শারহু মুশকিলিল আসার, বৈরুত, রিসালাহ, ১৯৯৪, ১ম প্রকাশ।
৪১. তাহাবী, আল-আকীদা আত-তাহাবীয়্যাহ: মুহাম্মাদ খুমাইয়িসের শারহ-সহ, (রিয়াদ, দারুল ওয়াতান, ১ম, ১৪১৪ হি)
৪২. তাহাবী, মাতনুল আকীদাহ আত-তাহাবিয়্যাহ, কাইরো, মাকতাবাতু ইবনি তাইমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৮)
৪৩. ইবনে দুরাইদ (৩২১হি.) জামহারাতুল লুগাত (হায়দ্রাবাদ, দাইরাতিল মাআরিফ উসমানিয়্যাহ, ১৩৪৫ হি.)
৪৪. ইবনু হিব্বান, আবু হাতিম মুহাম্মাদ (৩৫৪ হি), আস-সহীহ (বৈরুত, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ২য়, ১৯৯৩)
৪৫. তাবারানী, সুলাইমান ইবনু আহমদ (৩৬০হি.) আল-মু'জামুল কাবীর (মাওসিল, ইরাকী ওয়াকফ মন্ত্রণালয়, ১৯৮৫)
৪৬. তাবারানী, সুলাইমান ইবনু আহমদ, আল-মু'জামুস সাগীর (বৈরুত, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৫)
৪৭. তাবারানী, সুলাইমান ইবনু আহমদ, মুসনাদুশ শামিয়্যীন (বৈরুত, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৪)
৪৮. আবু বকর জাস্সাস (৩৭০হি.), আহকামুল কুরআন (আল-মাকতাবা আশ-শামিলা, http://www.al-islam.com
৪৯. ইবনুল মুকরি', আবু বকর মুহাম্মাদ বিন ইব্রাহীম (৩৮১হি.), আর রুখসাতু ফী তাকবীলিল ইয়াদ, রিয়াদ, দারুল আসিমা, ১ম সংস্করণ, ১৪০৮ হি.)
৫০. দারাকুতনী, আলী ইবনু উমর (৩৮৫ হি), আল-ইলাল (রিয়াদ, দারু তাইবা, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৫)
৫১. জাওহারী, ইসমাঈল ইবনে হাম্মাদ (৩৯৩ হি), আস সিহাহ (বৈরুত, দারুল ইলম লিল মালাঈন, ২য়, ১৯৭৯)
৫২. ইবনু ফারিস, আহমদ (৩৯৫হি.), মু'জাম মাকায়ীসুল লুগাহ (ইরান, কুম, মাকতাবুল ইলাম আল-ইসলামী, ১৪০৪ হি)
৫৩. হাকিম নাইসাপূরী, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ (৪০৫হি), আল-মুসতাদরাক (বৈরুত, লেবানন, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯০)
৫৪. আবু নুআইম ইসপাহানী, আহমদ ইবনু আব্দুল্লাহ (৪৩০), হিলইয়াতুল আউলিয়া (বৈরুত, দারুল কিতাব আল-আরাবী, ৪র্থ মুদ্রণ, ১৪০৫ হি)
৫৫. আবূ নুআইম ইসপাহানী, আল-মুসনাদ আল-মুসতাখরাজ আলা সাহীহ মুসলিম (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৬)
৫৬. বাইহাকী, আহমদ ইবনুল হুসাইন (৪৫৮ হি), শু'আবুল ঈমান (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম, ১৪১০ হি)
৫৭. বাইহাকী, আহমদ ইবনুল হুসাইন (৪৫৮হি.), আস-সুনানুল কুবরা (মাক্কা মুকাররামা, দারুল বায, ১৯৯৪)
৫৮. বাইহাকী, দালাইলুন নুবুওয়াহ, (কাইরো, দারুর রাইয়ান, ১৪০৮ হি)
৫৯. বাইহাকী, হায়াতুল আনবিয়া, (রিয়াদ, মাকতাবাতুর রুশদ, ১ম প্রকাশ)
৬০. সারাখসী, আবু বাকর, মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ (৪৯০ হি.), আল-মাবসূত (বৈরুত, দারুল মা'রিফাহ, ১৯৮৯)
৬১. গাযালী, আবু হামিদ, মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ (৫০৫ হি) এহইয়াউ উলূমিদ্দীন (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১৯৯৪)
৬২. রাগিব ইসপাহানী (৫০৭), আল-মুফরাদাত (বৈরুত. দারুল মারিফাহ, তা. বি.)
৬৩. আলাউদ্দীন সামারকান্দী (৫৩৯ হি.), তুহফাতুল ফুকাহা (বৈরুত, ইলমিয়্যাহ, ২য় প্রকাশ, ১৯৯৩ খ্রি.)
৬৪. আব্দুল কাদের জীলানী (৫৬১হি.), গুনিয়াতুত তালিবীন, (অনুবাদ নুরুল আলম রঈসী, চট্টগ্রাম, ইসলামিয়া লাইব্রেরী, ১ম সংস্করণ, ১৯৭২)

৬৫. কাসানী, আলাউদ্দীন(৫৮৭হি) বাদাইউস সানাইয় (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ)
৬৬. আল-মারগীনানী, আলী ইবনু আবী বাকর (৫৯৩) আল-হিদায়া (বৈরুত, দারু ইহইয়ায়িত তুরাস আল-আরাবী, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৫)
৬৭. ইবনুল জাওযী, আবুল ফারাজ আব্দুর রাহমান ইবনু আলী (৫৯৭ হি), আল-মাউযূআত (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৫)
৬৮. ইবনুল জাওযী, আবুল ফারাজ, তালবীসু ইবলিস (বৈরুত, দারুল ফিক্‌র, ১৯৯৪)
৬৯. ইবনুল জাউযী, আল-মুনতাযিম (আল-মাকতাবাতুশ শামিলাহ, http://www.alwarraq.com
৭০. ইবনুল আসীর, মুবারাক ইবনে মুহাম্মাদ (৬০৬হি.), জামেউল উসূল (বৈরুত, দারুল ফিকর, ২য় প্রকাশ, ১৯৮৩)
৭১. ইবনুল আসীর, মুবারাক ইবনু মুহাম্মাদ, আন-নিহাইয়া ফী গারীবিল হাদীস (বৈরুত, দারুল ফিকর, ২য়, ১৯৭৯)
৭২. মাকদিসী, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহিদ (৬৪৩ হি), আল-আহাদীসুল মুখতারাহ (মক্কা মুকাররামা, মাকতাবাতুন নাহদাহ আল-হাদীসাহ, ১ম প্রকাশ ১৪১০ হি)
৭৩. মুনযিরী, আব্দুল আযীম ইবনু আবুদল কাবী (৬৫৬ হি), আত-তারগীব ওয়াত তারহীব (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪১৭ হি)
৭৪. কুরতুবী, মুহাম্মাদ ইবনু আহমদ (৬৭১ হি) তাফসীর: আল-জামিয় লি আহকামিল কুরআন (কাইরো, দারুশ শু'আব, ১৩৭২ হি)
৭৫. নাবাবী, ইয়াহইয়া ইবনু শারাফ (৬৭৬ হি.), শারহু সহীহ মুসলিম, (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১৯৮১খ্রি.)
৭৬. নাবাবী, আল-আযকার, (বৈরুত, মুআস্‌সাসাতুর রিসালাহ, তাহকীক শু'আইব আনাউত)
৭৭. নাবাবী, আত-তার-তারখীস ফিল কিয়াম (দামিশক, দারুল ফিকর, ১ম মুদ্রণ, ১৯৮২)
৭৮. ইবনু মানযূর, মুহাম্মাদ ইবনে মুকাররম আল-আফরীকী (৭১১হি.) লিসানুর আরব (বৈরুত, দারুল ফিকর)
৭৯. ইবনু তাইমিয়া, আহমদ ইবনু আব্দুল হালীম (৭২৮হি), মাজমূউল ফাতাওয়া (রিয়াদ, দারু আলামিল কুতুব, ১৯৯১)
৮০. যাহাবী, মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (বৈরুত, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ৯ম, ১৪১৩ হি)
৮১. যাহাবী, আল-কাবাইর, মদীনা মুনাওয়ারা, দারুত তুরাস, ১৯৮৪, দ্বিতীয় প্রকাশ।
৮২. খাতীব তাবরীযী (৭৩০ হি.) মেশকাতুল মাসাবীহ, বৈরুত, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৩য়, ১৯৮৫।
৮৩. যাইলায়ী, উসমান ইবনু আলী (৭৪৩ হি) তাবয়ীনুল হাকায়িক শারহু কানযিদ দাকাইক (আল-মাকতাবাতুশ শামিলা, ২য় প্রকাশ, http://www.al-islam.com)
৮৪. ইবনুল কাইয়িম, মুহাম্মাদ ইবনু আবী বাকর (৭৫১ হি), আল মানার আল মুনীফ (সিরিয়া, হলব, মাকতাব আল মাতবুয়াত আল ইসলামিয়া, ১ম সংস্করণ, ১৯৭০),
৮৫. ইবনুল কাইয়িম, যাদুল মা'আদ (সিরিয়া ও বৈরুত, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ২য় প্রকাশ, ১৯৯৭)
৮৬. ইবনুল কাইয়িম, ইগাসাতুল লাহফান মিন মাসাইদিশ শায়তান (রিয়াদ, মাকতাবাতুল মুআইয়িদ)
৮৭. ইবনু কাসীর, ইসমাঈল ইবনু উমার (৭৭৪ হি) তাফসীরুল কুরআনিল আযীম (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১৪০১)
৮৮. ইবনু কাসীর, আল-বিদাইয়া ওয়ান নিহাইয়া (বৈরুত, লেবানন, দারুল ফিকর, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৬)
৮৯. শাতিবী, ইবরাহীম ইবনু মূসা (৭৯০ হি), আল-ই'তিসাম (বৈরুত, দারুল মা'রিফাহ, ১৯৮৫)
৯০. ইবনে রাজাব, আব্দুর রহমান ইবনু আহমাদ (৭৯৫হি.), লাতায়েফুল মাআরিফ (মাক্কা মুকাররামা, মাকতাবাতু নিযার মুসতাফা বায, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৭)
৯১. ইবনে রাজাব, জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম (বৈরুত, দারুল মারিফাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪০৮হি)
৯২. হাইসামী, নূরুদ্দীন আলী ইবনু আবী বাকর (৮০৭হি.) মাজমাউয যাওয়াইদ (বৈরুত, দারুল কিতাবিল আরাবী, ৩য় প্রকাশ, ১৯৮২)
৯৩. হাইসামী, মাওয়ারিদুয যামআন (দামেশক, দারুস সাকাফাহ আল-আরাবিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯২)
৯৪. আল বূসীরী, মিসবাহুয যুজাজাহ, বৈরুত, দারুল আরাবিয়্যাহ, ১৪০৩ হি., দ্বিতীয় প্রকাশ
৯৫. ইবনু হাজার আসকালানী, আহমাদ ইবনু আলী (৮৫২ হি), ফাতহুল বারী (বৈরুত, দারুল মা'রিফাহ, ১৩৭৯ হি)
৯৬. ইবনে হাজার, আল ইসাবাহ, বৈরুত, দারুল জীল, ১৯৯২, ১ম প্রকাশ।
৯৭. ইবনু হাজার, তালখীসুল হাবীর, মাদীনা মুনাওয়ারা, সাইয়িদ আব্দুল্লাহ হাশিম, ১৯৬৪।
৯৮. ইবনু হাজার আসকালানী, তাকরীবুত তাহযীব (সিরিয়া, হালাব, দারুর রাশীদ, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৬)
৯৯. ইবনু হাজার আসকালানী, তাহযীবুত তাহযীব (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৪)

১০০. ইবনু হাজার আসকালানী, তাগলীকুত তা'লীক (বৈরুত, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১ম প্রকাশ, ১৪০৫ হি)
১০১. আল-কাসতালানী, আহমদ বিন মুহাম্মাদ (৯২৩হি.), আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যা (বৈরুত, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, ১ম সংস্করণ ১৯৯৬)
১০২. মুহাম্মাদ ইবনে ইউসূফ আশ শামী (৯৪২হি.), সীরাহ শামীয়াহঃ সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ (বৈরুত, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৩ খ্রি.)
১০৩. ইবনু নুজাইম (৯৭০হি.), আল-বাহরুর রায়েক শারহু কানযুদ দাকাইক (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ ১৯৯৭)
১০৪. মোল্লা আলী কারী (১০১৪ হি), আল-আসরার আল-মারফূ'আহ (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম, ১৯৮৫)
১০৫. মোল্লা আলী কারী, শারহুল ফিকহিল আকবার, (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ ১৯৮৪)
১০৬. মুনাবী, মুহাম্মাদ আব্দুর রাউফ (১০৩১ হি), ফাইযুল কাদীর শারহু জামিয়িস সাগীর (মিশর, আল-মাকতাবাতুত তিজারিয়া আল-কুবরা, ১ম প্রকাশ, ১৩৫৬ হি)
১০৭. আল-যারকানী, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল বাকী, শরহুল মাওয়াহিব আল-লাদুন্নিয়্যা (বৈরুত, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, ১ম সংস্করণ ১৯৯৬)
১০৮. মুহাম্মাদ ইবনু হুসাইন তূরী (১১৩৮ হি), তাকমিলাতুল বাহরির রায়িক (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৭)
১০৯. আবুল হাসান সিনদী, নূরুদ্দীন (১১৩৮ হি.), হাশিয়াতুস সিনদী আলান নাসাঈ, (হালাব, মাতবূআত ইসলামিয়্যাহ, ১৯৮৬, ২য় প্রকাশ)
১১০. শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী, আহমদ ইবনু আব্দুর রাহীম (১১৭৬ হি), হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা (বৈরুত, দারু এহইয়ায়িল উলূম, ২য় মুদ্রণ, ১৯৯২)
১১১. ইবনু আবেদীন, মুহাম্মাদ আমীন (১২৫৬ হি), হাশিয়াতু রাদ্দিল মুহতার (বৈরুত, দারুল ফিকর, ১৯৭৯)
১১২. আব্দুল হাই লাখনবী (১৩০৪হি.), মাজমুআহ ফাতাওয়া মাওলানা আবুল হাই, উর্দূ (দেওবন্দ, মাকতাবা থানবী)
১১৩. আব্দুল হাই লাখনবী আন-নাফিউল কাবীর লিমান উতালিউল জামিয়িস সাগীর (ভারত, লাখনৌ, মাতবাআতুল ইউসূফী, ১ম প্রকাশ)
১১৪. রাহমাতুল্লাহ কিরানবী (১৩০৮ হি), ইযহারুল হক্ব (রিয়াদ, আর-রিয়াসাতুল আম্মাহঃ দারুল ইফতা, ১৯৮৯)
১১৫. রাহমাতুল্লাহ কিরানবী (১৩০৮ হি), ইযহারুল হক্ব, বঙ্গানুবাদ ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম প্রকাশ, ২০০৭)
১১৬. (রিয়াদ, আর-রিয়াসাতুল আম্মাহঃ দারুল ইফতা, ১৯৮৯)
১১৭. মুবারকপুরী, মুহাম্মাদ আব্দুর রাহমান (১৩৫৩হি), তুহফাতুল আহওয়াযী (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ)
১১৮. আযীমআবাদী, শামসুল হক, আউনুল মা'বুদ (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২য় প্রকাশ, ১৪১৫হি)
১১৯. থানবী, আশরাফ আলী (১৩৬২হি), ইমদাদুল ফাতওয়া (তারতীব, মুফতী মুহাম্মাদ শফী, দেওবন্দ, আফগানী দারুল কুতুব, ইদারাত তালিফাত আউলিয়া, ২য় মুদ্রণ, ১৯৮৪)
১২০. শুরনুবলালী, হাসান ইবনু আম্মার (১০৬৯ হি) মারাকিল ফালাহ (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম, ১৯৯৫)
১২১. আলবানী, মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন, যায়ীফুল জামিয়িস সাগীর (বৈরুত, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৩য়, ১৯৯০)
১২২. আলবানী, মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন, সহীহুল জামিয়িস সাগীর (বৈরুত, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৩য়, ১৯৮৮)
১২৩. আলবানী, মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন, সহীহুত তারগীব (রিয়াদ, মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ৩য় মুদ্রণ, ১৯৮৮)
১২৪. আলবানী, মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন, যায়ীফুত তারগীব (রিয়াদ, মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ৩য় মুদ্রণ, ১৯৮৮)
১২৫. আলবানী, যয়ীফু সুনানি ইবনি মাজাহ (সৌদি আরব, রিয়াদ, মাকতাবাতুল মাআরিফ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৭)
১২৬. আলবানী, সহীহু সুনানি ইবনি মাজাহ (রিয়াদ, মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৭) ৩/১৯৮।
১২৭. আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদীসিয যায়ীফাহ (রিয়াদ, মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯২)
১২৮. আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদীসিস সাহীহাহ (রিয়াদ, মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯২)
১২৯. আলবানী, মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন, সাহীহ ওয়া যায়ীফ সুনানি আবী দাউদ (আলেকজেন্দ্রিয়া, মারকায নুরিল ইসলাম, আল-মাকতাবাতুশ শামিলা, ২য় প্রকাশ, http://www.alwarraq.com)
১৩০. আলবানী, মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন, সাহীহ ওয়া যায়ীফ সুনানিত তিরমিযী (আলেকজেন্দ্রিয়া, মারকায নুরিল ইসলাম, আল-মাকতাবাতুশ শামিলা, ২য় প্রকাশ, http://www.alwarraq.com)

১৩১. আলবানী, আহকামুল জানাইয ওয়া বিদাউহা (বৈরুত, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৪র্থ মুদ্রণ, ১৯৮৬)
১৩২. আলবানী, ইরওয়াউল গালীল (বৈরুত, মুআসসাসাতুর রিসালাহ ১ম প্রকাশ)
১৩৩. আলবানী, সিফাতুস সালাত (রিয়াত, মাকতাবাতুল মাআরিফ)
১৩৪. আলবানী, জিলবাবুল মারআতিল মুসলিমা (জর্ডান, আম্মান, আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যাহ, ১ম, ১৪১৩ হি)
১৩৫. জাফর আহমদ উসমানী থানবী, ই'লাউস সুনান (করাচী, ইদারাতুল কুরআন)
১৩৬. ড. নাসির আল-আকল, আল-খাওয়ারিজ (রিয়াদ, দারুল ওয়াতান, ২য় মুদ্রণ, ১৪১৭ হি)
১৩৭. ড. আকরাম যিয়া আর-উমারী, আস-সীরাতুন নাবাবীয়্যাহ আস-সহীহা (মদীনা মুনাওয়ারা, মাকতাবাতুল উলুম ওয়াল হিকাম, ৪র্থ সংস্করণ ১৯৯৩)
১৩৮. ড. মাহদী রিযকুল্লাহ আহমদ, সীরাতুন নাবাবীয়াহ ফী দাওইল মাসাদিরিল আসলিয়্যাহ (সৌদি আরব, রিয়াদ, বাদশাহ ফয়সল কেন্দ্র, ১ম প্র. ১৯৯২)
১৩৯. আব্দুর রাহমান আল-জাযীরী, আল-ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবায়া (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ)
১৪০. ড. ওয়াহবাহ যুহাইলী, আল-ফিকহুল ইসালামী ওয়া আদিল্লাতুহু (দামিশক, দারুল ফিকর, ৩য়, ১৯৮৯)
১৪১. মুতয়িব ইবনু মুকবিল আশ-শাস্সান, খাতমুন নুবুওয়াত ওয়ার রাদ্দি আলাল বাহায়িয়্যতি ওয়াল কাদিয়ানিয়্যাহ (রিয়াদ, দারু আতলাস আল-খাদরা, ১ম প্রকাশ, ২০০৬)
১৪২. আল-ফাতাওয়া আল-হিনদিয়্যাহ (আলামগীরীয়্যাহ), বৈরুত, দারু এহইয়ায়িত তুরাস আল-আরাবী, ৪র্থ মুদ্রণ
১৪৩. মুফতী আযীযুর রহমান, ফাতাওয়া দারুল উলুম দেওবন্দ (করাচী, দারুল ইশাআত, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৬)
১৪৪. আখতার ফারুক, বাঙালীর ইতিকথা, ঢাকা, জুলকারনাইন পাবলিকেশন্স, ১ম প্রকাশ, ১৯৭৬
১৪৫. মুকুল চৌধুরী, সম্পাদক, ভাষা আন্দোলন, অগ্রপথিক সংকলন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম, ১৯৯৩
১৪৬. ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, এহইয়াউস সুনানঃ সুন্নাতের পুনরুজ্জীবন ও বিদ'আতের বিসর্জন (ঝিনাইদহ, আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ৫ম সংস্করণ, ২০০৭)
১৪৭. ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, হাদীসের নামে জালিয়াতি: প্রচলিত জাল হাদীস ও ভিত্তিহীন কথা (ঝিনাইদহ, আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ২য় প্রকাশ, ২০০৬)
১৪৮. ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, রাহে বেলায়াত; রাসূলুল্লাহর (ﷺ) যিক্র-ওযীফা (ঝিনাইদহ, আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ৪র্থ সংস্করণ ২০০৬)
১৪৯. ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, কুরআন-সুন্নাহ-র আলোকে পোশাক, পর্দা ও দেহ-সজ্জা (ঝিনাইদহ, আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ১ম সংস্করণ ২০০৭)
১৫০. ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, কুরআন-সুন্নাহ-র আলোকে ইসলামী আকীদা (ঝিনাইদহ, আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ১ম সংস্করণ ২০০৭)
১৫১. ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, বাংলাদেশে উশর বা ফসলের যাকাতঃ গুরুত্ব ও প্রয়োগ (ঢাকা, বাইতুল হিকমাহ পাবলিকেশন্স, ১ম সংস্করণ ২০০৩)
152. The Holy Bible, authorized Version/King James Version, (reprinted and published by Bible Society of South Africa, 1988) & Bangla Cary Version
153. Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic (Beirut, Librairie Du Liban, 1980)
154. The New Encyclopedia Britannica (knowledge in depth) 15th edition
155. I. A. Ibrahim & others, A Brief Guide To Understanding Islam, Houston, Darussalam, Publishers & Distributors, 1996.
156. Dr. Muhammad Mohar Ali, History of Muslim of Bengal (Riyadh, Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University, 1st Edition, 1985)
157. Asiatic Society of Bangladesh, Banglapedia, CD Edition, 2007
158. Microsoft Encarta 2007. Microsoft Corporation.
159. Encyclopedia Americana
160. The New Encyclopedia Britannica
161. Jewish Encyclopedia
162. Encyclopedia of Religion and Ethics

ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রচিত গ্রন্থাবালির মধ্যে রয়েছে

১. A Woman From Desert
২. কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা
৩. এহইয়াউস সুনান : সুন্নাতের পুনরুজ্জীবন ও বিদ'আতের বিসর্জন
৪. রাহে বেলায়াত : রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর যিক্র-ওযীফা
৫. মুসলমানী নেসাব : আরকানে ইসলাম ও ওযীফায়ে রাসূল (ﷺ)
৬. বাংলাদেশে উশর বা ফসলের যাকাত : গুরুত্ব ও প্রয়োগ
৭. সহীহ হাদীসের আলোকে সালাতুল ঈদের অতিরিক্ত তাকবীর
৮. আল্লাহর পথে দা'ওয়াত
৯. মুনাজাত ও নামায
১০. হাদীসের নামে জালিয়াতি : প্রচলিত মিথ্যা হাদীস ও ভিত্তিহীন কথা
১১. ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ : আলোচিত ও অনালোচিত কারণসমূহ
১২. কুরআন-সুন্নাহর আলোকে পোশাক, পর্দা ও দেহসজ্জা
১৩. সহীহ মাসনূন ওযীফা
১৪. بحوث في علوم الحديث (বুহূসুন ফী উলূমিল হাদীস)
১৫. ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) রচিত আল-ফিকহুল আকবার: বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা
১৬. কুরআন-সুন্নাহর আলোকে শবে বরাত: ফযীলত ও আমল

গ্রন্থকার রচিত বা অনূদিত ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত বা প্রকাশিতব্য কয়েকটি গ্রন্থ:

১৭. রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পোশাক
১৮. মুসনাদ আহমদ (ইমাম আহমদ রচিত): বঙ্গানুবাদ (আংশিক)
১৯. ইযহারুল হক্ক (রাহমাতুল্লাহ কিরানবী রচিত): বঙ্গানুবাদ
২০. ফিকহুস সুনানি ওয়াল আসার (মুফতী আমীমুল ইহসান রচিত): বঙ্গানুবাদ

সংগ্রহ বা পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন:

১. মো. বাহাউদ্দীন, ম্যানেজার, আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, জামান সুপার মার্কেট (৩য় তলা), বি. বি. রোড (পোস্ট অফিসের মোড়). ঝিনাইদহ-৭৩০০। মোবাইল নং ০১৭১১-১৫২৯৫৪, ০১৯২২-১৩৭৯২১।

২. মো. আব্দুল মমিন ইশায়াতে ইসলাম কুতুবখানা, ২/২ দারুস সালাম, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬। ফোন নং ০২-৯০০৯৭৩৮। মোবা. ০১১৯৯০৮৩৬৫২।

৩. মো. আনোয়ার হোসেন, ইশায়াতে ইসলাম কুতুবখানা, ৬৬, প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০। মোবা. ০১৯১৬২৬৭৩২৪, ০১৭১৫৫৯২৬৫১।

খুতবাতুল ইসলাম

সমাজ গঠনে মসজিদের মিম্বারের ভূমিকা অপরিসীম। কোটি কোটি টাকা প্রচারের চেয়েও অনেক বেশি কার্যকর ইমামের বক্তব্য। আমাদের দেশের অধিকাংশ ইমাম ও আলিমের জন্য সাধারণত সময়-সুযোগের অভাবে মৌলিক প্রাচীণ ইসলামী গ্রন্থাদি বা আধুনিক গ্রন্থাদি থেকে বিভিন্ন ধর্মীয়, সামাজিক ও জীবনমুখী প্রসঙ্গে আলোচনার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করা কষ্টকর হয়। তাঁদেরকে সহযোগিতা করতেই এ গ্রন্থ।

আরকানুল ঈমান, আরকানুল ইসলাম, আহকামূল ইসলাম ও সকল ইসলামী দিবস ও প্রসঙ্গ ছাড়াও দুর্নীতি, মানবাধিকার, নারী-অধিকার, শ্রমের গুরুত্ব, শ্রমিকের অধিকার, পরিবার, স্বাস্থ্যনীতি, জিহাদ, সন্ত্রাস, মাদকতা, ধুমপান, ভালবাসা দিবস, অশ্লীলতা, এইডস, মাতৃভাষা, স্বাধীনতা, এপ্রিল ফুল, বাংলা নববর্ষ, হিজরী নববর্ষ ও অন্যান্য সকল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস ও বিষয় সম্পর্কে ইসলামী দিক-নির্দেশনা ও পাশ্চাত্য সভ্যতার হাল হকিকত তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। সকল তথ্যের তথ্যসূত্র প্রদান করা হয়েছে। ইসলামী তথ্যগুলি কুরআন, হাদীস ও প্রসিদ্ধ আলিমগণের গ্রন্থ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। হাদীসের ক্ষেত্রে বিস্তারিত তথ্যসূত্র প্রদান ছাড়াও প্রত্যেক হাদীসের বিশুদ্ধতা বা দুর্বলতা সম্পর্কে পূর্ববর্তী ইমামগণের মতামত উল্লেখ করা হয়েছে। আধুনিক তথ্যগুলি বাংলাপিডিয়া, মাইক্রোসফ এনকার্টা, এনসাইক্লোপিডিয়া আমেরিকানা, এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা, জুয়িশ এনসাইক্লোপিডিয়া, এনসাইক্লোপিডিয়া ওব রিলিজিয়ন এন্ড এথিকস ও অন্যান্য সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। আমরা আশা করি, ইমাম ও খতীবগণ ছাড়াও সকল পর্যায়ের আলিম, ওয়ায়িয, গবেষক ও আল্লাহর পথে দাওয়াতকারীর জন্য গ্রন্থটি অত্যন্ত সহায়ক হবে এবং জীবনের সকল বিষয়ে তথ্যনির্ভর ইসলামী দিক নির্দেশনা জানতে সাধারণ পাঠকও এ পুস্তক থেকে উপকৃত হবেন।

- গ্রন্থকার

প্রকাশনায়
আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন
ঝিনাইদহ, বাংলাদেশ।